গ্যেটে রচনাসমগ্র

অনুবাদ
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ়, ১৩৬৬

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : প্রভাসচন্দ্র অধিকারী ॥ স্বপ্না প্রেস ॥ ৩৫/২/১এ, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : সত্য চক্রবর্তী

সূচীপত্র

GOETHE RACHANASAMAGRA

Translated by

Sudhansu Ranjan Ghosh

Price Rupees Forty Only.

ভূমিকা

কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের বিচিত্র খাতে গ্যেটের প্রতিভা সমান সাবলীলতার সঙ্গে প্রবাহিত হলেও তাঁর অমর কাব্যনাটক ফাউস্ট তাঁর এমনই এক শীর্ষস্থানীয় সৃষ্টি যার জন্য এক বিশ্ববিশ্রুত মর্যাদায় আজও অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন তিনি। দান্তে এবং মিলটনের মত গ্যেটেও শুধু একটি বিশেষ সৃষ্টির জন্যই এক সুচিরকালীন আবেদনের অক্ষয় গৌরবতিলকে পরিচিহ্নিত হয়ে আছেন আজও। ফাউস্টের আবেদনের এই অন্তহীন বিপুলতা ও বিশ্বজনীনতার প্রধানতম কারণ এই যে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এক শতাব্দীকাল ধরে যে যুগমানস আধুনিক ভাবধারা ও জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতটিকে গড়ে তোলে সে যুগমানসটিকে তার আনুষঙ্গিক আত্মিক সমস্যা ও সংকটসমূহের সঙ্গে এই কাব্যনাটকটির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিভাত করে তোলেন গ্যেটে।

ইউরোপীয় নবজাগরণ সত্যানুসন্ধিৎসার এক সুতীব্র সার্চলাইট ফেলে যুগান্তব্যাপী কুসংস্কারের অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে মানুষের স্বাধীন চিন্তার বিকাশের পথে বাধাগুলিকে অপসারিত করতে থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানজনিত যুক্তিবাদ এক বিরাট ব্যাপ্তি দান করে সে অনুসন্ধিৎসার আলোকে। গ্যেটে যে যুগের আবহাওয়ায় মানুষ হন সে যুগের আকাশে বাতাসে জীবনজিজ্ঞাসার এক সর্বব্যাপী আবেগ ভেসে বেড়াত অশান্ত তীক্ষ্ণতায়। লিপজিগ ও স্ট্রসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা ধীরে ধীরে সংশয়বাদের দিকে নিয়ে যায় তাঁর মনকে। প্যারাসেলসাস ও ব্রুনোর প্রকৃতিবাদী দর্শনের দ্বারা বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়ে ধর্মগত সত্যের সর্বাত্মকতায় ও সার্বভৌম ক্ষমতায় সন্দিহান হয়ে ওঠে তাঁর মন। ধর্মের প্রথাগত নিরাপদ সীমার মধ্যে জীবন ও জগতের যে সত্য একদিন এক সুস্থিত অস্তিত্বে প্রকটিত ও এক সুদীর্ঘকালীন নিশ্চয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সত্যের ভাবমূর্তিটিকে এক সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের শায়ক দিয়ে বার বার বিদ্ধ করতে থাকেন গ্যেটে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই সময় বলেন তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেও ধর্মান্ধতা পছন্দ করেন না।

১৫৮৭ সালে প্রকাশিত 'ফ্রাঙ্কফুর্ট ফাউস্ট বুক' ও মার্লোর লেখা 'ট্রাজিকাল

হিষ্ট্রি অফ ডক্টর ফস্টাসে' ফাউস্টের অদ্ভুত জীবনকাহিনী পড়ে ছাত্রাবস্থা থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট হন গ্যেটে। শুধু ফাউস্ট নয় যে সব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পুরুষপ্রবর তাঁদের সুমহান ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য বলিষ্ঠতাটিকে প্রথাগত ধর্মের একাধিপত্য হতে মুক্ত করে প্রচলিত মূল্যবোধকে হেলাভরে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে আত্মস্বাতন্ত্র্যের উদার উন্মুক্ত আকাশে মাথা তুলে এক অন্তহীন স্পর্ধায় দুহাত বাড়িয়ে জীবনের সত্যকে নূতনভাবে বুঝতে চেয়েছে, জীবন ও জগৎকে নূতনভাবে বুঝতে চেয়েছে সেই প্রমিথিয়ুস, সীজার, মহম্মদ প্রমুখদের দ্বারাও আকৃষ্ট হয়েছেন তিনি। তাঁদের নিয়ে কিছু না কিছু লিখতে চেয়েছেন।

যে ফাউস্টের অদ্ভুত জীবনকাহিনী আকৃষ্ট করেছিল গ্যেটের মনকে, সে ফাউস্ট কিন্তু নিছক কল্পনার সৃষ্টি নন, তিনি হলেন জার্মানির ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথারের সমসাময়িক এক রক্ত মাংসের মানুষ। ষোড়শ শতকের ইউরোপে প্রথাগত ক্যাথলিক ধর্মের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব দেখা দেয়, সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাধক ডক্টর জর্জ ফাউস্ট ছিলেন সেই বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক। তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ছিল অসাধারণ। তিনি আবার মধ্যযুগীয় রসায়নবিদ্যা ও যাদুবিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী। একই ধাতুকে অন্য এক ধাতুতে রূপান্তরিত করার রহস্য আয়ত্ত করার ফলে তিনি একই সঙ্গে প্রকৃতিজগৎ ও মানব জগতের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বিস্তার করে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেন। যে ক্ষমতা একান্তভাবে ঈশ্বরের করতলগত, যা কোন মানুষ অর্জন করতে পারে না অথবা করাটা নীতি ও ধর্মসম্মত নয় তার পক্ষে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়ে শয়তানের কাছে তার আত্মাকে হীনভাবে বিক্রি করে সেই ক্ষমতা অর্জন করে ফাউস্ট। এর জন্য ঐশ্বরিক অভিশাপও নেমে আসে তার জীবনে। এইভাবে দেখা যায়, মধ্যযুগের ফাউস্টকে নিয়ে যে কবিতা নাটক লেখা হয় তার মূল পরিকল্পনার সঙ্গে খৃস্টীয় পাপচৈতন্য ও নাস্তিকের শাস্তি ভোগের ব্যাপারটি যুক্ত হয়।

কিন্তু যুক্তিবাদী আবহাওয়ায় লালিত গ্যেটের মন অপরাজেয় পৌরুষের প্রতীক ফাউস্টের মত অসাধারণ পুরুষের জীবনকাহিনীর সঙ্গে খৃস্টীয় পাপ-পুণ্যতত্ত্বকে যুক্ত করে দেখার রীতিটিকে মেনে নিতে পারে না কিছুতেই। গ্যেটে ফাউস্টকে দেখেন অন্য দৃষ্টিতে। তার জীবনকাহিনীকে বিবৃত করতে

চান সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে। তাঁর মতে ফাউস্টের আত্মিক বিদ্রোহের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গোচ্ছ্বাস শুধু খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধেই প্রবাহিত হয়নি, ব্যক্তি ও সমাজজীবনে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সকল রকম জীবনবোধ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধেও তা পরিচালিত হয়। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন, তার একটি সীমা আছে, যেমন সমুদ্রতরঙ্গ যতই ঊর্ধ্বে উত্তাল হোক না কেন, তার সার্বিক ব্যাপ্তির পথে বাধা থাকবেই, তা কখনো বেলাভূমি অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু ফাউস্ট এই সীমাটি না মেনেই তার অতিমানবিক বুদ্ধির স্পর্ধিত তত্ত্বের সমন্বয়ে বিশ্বব্যাপী এক লালসার জাল বিস্তার করে। ধীরে ধীরে নিজেই জড়িয়ে পড়ে সে জালে।

ফাউস্টের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসাবে গ্যেটে যে উৎসর্গ ও মঞ্চসম্পর্কিত ভূমিকার অবতারণা করেছেন তার সঙ্গে মূল নাটকের সঙ্গে কোন অঙ্গগত সম্পর্ক নেই। 'প্রিলিউড' বা মঞ্চের ভূমিকা অংশে শুধু দেশের প্রচলিত নাট্যধারা ও আদর্শ নাট্যরীতি সম্পর্কে গ্যেটের কিছু মতামত আছে। কিন্তু 'প্রোলোগ ইন হেভেন' অংশে ঈশ্বর ও শয়তান মেফিস্টোফেলিস এর যে সব কথাবার্তা হয় তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঈশ্বর বললেন, বাস্তব কার্যক্ষেত্রে মেনে চলা কঠিন হলেও ন্যায় অন্যায়বোধই মানব চরিত্রের প্রধানতম ধর্ম। যতদিন এই ন্যায় অন্যায়বোধ মানুষের বিচারবুদ্ধির মর্মমূলে থেকে তার সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলে ততদিন ঈশ্বরের করুণা ও মোক্ষলাভ সহজ হয়ে ওঠে তার পক্ষে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈশ্বর নাম করলেন নরলোকের আদর্শ মানুষ ফাউস্টের। কিন্তু বাইবেলের স্যাটানের মত মেফিস্টোফেলিস এমনই এক শয়তান যে বিশ্বসৃষ্টির কোথাও কোন সত্য বা সৌন্দর্যকে স্বীকার করতে চায় না। এক অকারণ বিতৃষ্ণার অমিত বিষমিশ্রণে বিশ্বের সকল সত্যকে বিকৃত করে দেখাই ছিল তার ধর্ম। এইভাবে তার অসাধারণ বুদ্ধি ও চাতুর্যের সকল তীক্ষ্ণতা এক দুঃখবাদী ও ধ্বংসাত্মক মানসপ্রক্রিয়ার মধ্যে সংহত ও সংবদ্ধ হয়ে ওঠে। মেফিস্টোফেলিস তাই ফাউস্টের ন্যায়-অন্যায়বোধের সততায় স্পষ্টতঃ সন্দেহ প্রকাশ করে ঈশ্বরের আত্মপ্রসাদাত্মক ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিল। তখন ঈশ্বর বললেন, মানুষ তার বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সকল সময় নীতিচেতনানিঃসৃত বিচারবুদ্ধির সর্বাত্মক ও সুসংহত পরিচয় দান করতে না পারলেও স্বতোৎসারিত এই নীতি চেতনা ভালমন্দ সকল কর্মাকর্মকে স্পর্শ ও নিষিক্ত করে তার জীবন ও পশু জীবনের মধ্যে এক শাশ্বত ও অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করে চলেছে।

এরপর নাটকের প্রথম দৃশ্যে ফাউস্টকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তাকে অতুলনীয় পাণ্ডিত্যে সমৃদ্ধ এমনই এক ব্যক্তি বলে মনে হয় যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় লাভ করেছে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, অথচ যে কোন বস্তু বা ঘটনার চূড়ান্ত অর্থ উপলব্ধির উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এই বিশ্বসৃষ্টির মহাজাগতিক তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে গিয়ে ফাউস্ট বুঝতে পারে, যে জ্ঞানবিদ্যার মূঢ় অহঙ্কারে স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে উঠেছে সে, আপাত বিশাল সেই জ্ঞানবিদ্যার সকল ব্যাপ্তি ও গভীরতা শুধু তার পার্থিব অভিজ্ঞতার মধ্যেই শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। তার যুক্তিবাদী সহকারী ওয়াগনারের সহায়তায় ফাউস্ট আরো বুঝতে পারে, অপার্থিব তূরীয় জগতের কথা ত দূরের কথা. পার্থিব জগৎ সম্পর্কেও তার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। জ্ঞানবিদ্যার যে বিপুলায়তন অহঙ্কারের মধ্যে তার জীবনগত অস্তিত্বের সমস্ত সার্থকতাকে কেন্দ্রীভূত দেখেছিল ফাউস্ট, সেই জ্ঞানবিদ্যার শোচনীয় অপূর্ণতা ও ব্যর্থতার দুঃখে মুহ্যমান হয়ে উঠল সে। অপরিসীম হতাশার নিবিড়তায় আত্মহত্যার কথাও ভাবল। কিন্তু অকস্মাৎ শৈশবের স্মৃতির এক মধুর উত্তাপে ও নগরদ্বারে জনতার সংস্পর্শে বাঁচার এক দুর্মর এষণা এক প্রভাতসুলভ স্নিগ্ধ স্বচ্ছতায় সমীরিত হয়ে উঠল তার মনের মধ্যে। জীবনের যে অর্থ সে হারিয়ে ফেলেছিল সেই হারানো অর্থটি এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যে দ্যোতিত হয়ে উঠল তার কাছে, মূর্ছিত হয়ে উঠল অশ্রুত ধ্বনিতে। মনে মনে সংকল্প করল ফাউস্ট, প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত যে কোন উপায়ে জীবনের সেই সতত অপস্রিয়মান অর্থটিকে এবার সে তার প্রতিটি জীবকোষের খণ্ডিত জৈবচেতনায়, তার ইন্দ্রিয়যন্ত্রের প্রতিটি তন্ত্রীতে ধরে রেখে দেবে অক্ষয়ভাবে।

এমন সময় তার এই দুর্বল মুহূর্তে ছদ্মবেশে উপস্থিত হলো মেফিস্টোফেলিস। ফাউস্টের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ভোগবাসনা চরিতার্থ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক প্রলোভনজাল বিস্তার করল তার সামনে। সে জালে সহজেই ধরা পড়ল ফাউস্টের আত্মা। মেফিস্টোফেলিস এটা জানত। সে জানত ফাউস্ট তার আত্মাকে বাঁচাবার জন্য কেলিকপটিনী নারীর মত যে সব যুক্তি উপস্থাপিত করবে সে সব যুক্তির আসলে কোন ভিত্তি নেই, তা মানুষের অন্য সব যুক্তির মতই এক শাশ্বত দুর্বলতায় ও দ্বৈত সত্যের সংঘাতে খণ্ডিত।

মেফিস্টোফেলিস প্রথমে ফাউস্টকে ডাইনিদের রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দেখাল, ডাইনি বা যাদুকরেরা কিভাবে প্রাকৃত বস্তুর সাহায্যে এক অতিপ্রাকৃত আবেশ

ও ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। এ বিস্তার মোহে ধরা না দিয়ে পারে না কোন মানুষের আত্মা। কিন্তু কেউ যদি মনে করেন, ফাউস্টের যে আত্মা মেফিস্টোফেলিসের হাতে পাতা প্রলোভনজালে আকাশ থেকে ঝরে পড়া ভোরের শিশিরের মত পড়ে গিয়েছিল, সে আত্মার নিঃশব্দ অধঃপতনের নীরব ইতিহাসটিকেই দুটি খণ্ডে বিভক্ত এই নাট্যকাব্যের মধ্যে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন গোটে তাহলে তিনি ভুল করবেন। তা যদি হত তাহলে এ নাটকের মধ্যে এত সব সুজটিল ঘটনাজাল সংস্থাপন করতেন না গোটে, এত বুদ্ধি কল্পনা ও আবেগানুভূতি দিয়ে ফাউস্টের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে মেফিস্টোফেলিসের মত অসাধারণ দুঃখবাদী ও ধ্বংসাত্মক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সমকক্ষ করে তুলতেন না ফাউস্টকে।

ফাউস্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ১৮২৭ সালে ৬ই মে তারিখে একারম্যানকে গোটে নিজে একটি কথা বলেছিলেন, কারণ অনেকেই তাকে জিজ্ঞাসা করত এ বিষয়ে। তিনি ছিলেন, They come and ask what idea I meant to embody in my Faust as if I know myself, and could inform them. From heaven, through the world to hell could indeed be something ; but this is no idea, only a course of action. And further, the devil loses the wager and that a man continually struggling from difficult errors towards sum-thing better, should be redemed, be an effective and to many an enlightening thought ; but it is no idea at the foundation of the whole or of every individual scene. It would have been a fine thing indeed, if I had strung so rich, varied and highly diversified a life as I have brought to view in Faust upon the slender string of one pervading idea.

তিনি বলেছেন, শয়তানের সঙ্গে সংগ্রামরত মানবাত্মার মুক্তিলাভ এবং শয়তানের পরাজয় এ নাটকের বিষয়বস্তু হলেও নাটকের সমস্ত দৃশ্যের ঘটনাগুলি এই একটিমাত্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে সমাবিষ্ট হয় নি। যদি তিনি একটি মাত্র উজ্জ্বল ভাববস্তুর সুতো দিয়ে নাট্যবর্ণিত সকল ঘটনা জালকে গ্রথিত করতে পারতেন তাহলে খুবই ভাল হত।

ফাউস্টের দুটি খণ্ডেই পাঁচটি করে অঙ্ক আছে। অনেকের মতে প্রথম খণ্ডের থেকে দ্বিতীয় খণ্ডটি আরো দুর্বোধ্য। কিন্তু আমার মনে হয় প্রথম খণ্ডে আবেগানুভূতির প্রাধান্য বেশী থাকায় নাট্যবস্তু অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্ট মেফিস্টোফেলিসের অবাঞ্ছিত আধিপত্য হতে অনেকাংশে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারায় তার চরিত্রটি সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করতে পেরেছে; এ দিক দিয়ে এ খণ্ডের নাট্যমূল্য অনেক বেশী এবং নাটকীয় উদ্দেশ্য সাধনের দিক দিয়ে সমধিক তাৎপর্যপূর্ণ।

তবে দুটি খণ্ডের রচনাকালের মধ্যে পঁচিশ বছরের ব্যবধান থাকায় দুটি খণ্ডের রচনারীতি ও জীবনবোধের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্যেটে একারম্যানকে বলেন It all issues from a more composed more passionate individual, and this twilight may well explain its great appeal. But in the second part there is scarcely any thing subjective, here there appears a higher, broader, brighter, less passionate world and those who have not knocked a lot of gathered experience will not be able to make much of it.

মোহানাবিলীন কোন অবসন্ন নদীর কুয়াশা যেমন সমুদ্রনীল এক বৃহত্তর সত্যকে আভাসিত করে তোলে, জীবনসায়াহ্নে উপনীত ফাউস্টও তেমনি যথাসম্ভব যত সব আবেগানুভূতির উচ্ছলতাকে সরিয়ে দিয়ে এক বৃহত্তর জীবনসত্যের সাধনায় নৈর্ব্যক্তিকভাবে এগিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই তার পার্থিব অভিজ্ঞতার স্বল্পতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতি পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়েও এক বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনসত্যকে পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ফাউস্ট। শিশুর মত এক অবুঝ কামনার আতিশয্যে এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে তার দু' চোখের দৃষ্টি যে সে বিহ্বল দৃষ্টির সামনে সম্ভব অসম্ভবের বাস্তব সীমারেখাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কখন নিঃশেষে। কোন প্রতিকূল অবস্থাই বিচলিত করতে বা হার মানাতে পারেনি তাকে। তার পরাভূতপ্রায় আত্মশক্তি নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মত এক বিরল উজ্জ্বলতায় জলে উঠেছে বারবার।

প্রথম খণ্ডে ফাউস্ট মার্গারেটকে ভালবেসেছে। কিন্তু মার্গারেটের মত সাধারণ একটি মেয়ে ফাউস্টের মত এক বেগবান সত্তাকে কখনো ধরে রেখে

দিতে পারেনা। বর্তমানের সীমায়িত কালখণ্ডে ও ভূমিখণ্ডের মধ্যে জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতাকে যে খুঁজে পায় না কখনো, মন যার আকাশগামী পাখির মত বৃহত্তর জীবনসত্যের এক স্বপ্নলীন পিপাসায় সতত উড্ডীয়মান সেই ফাউস্ট কোন এক শান্ত গৃহকোণে এক সাধারণ নারীর বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে পারে না কখনো। এজন্য প্রতিকূল ঘটনার স্রোত এসে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে দুজনকে নির্মমভাবে। এই কারণেই পরে দেখা যায় কোন এক নির্বোধ রাজার অসংযত কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে শ্রেষ্ঠ নারীসৌন্দর্যের ক্লাসিকাল প্রতীক হেলেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে ফাউস্ট।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অঙ্কে ফাউস্টের সহকারী ওয়াগনার যে কৃত্রিম নলজাতক সন্তান সৃষ্টি করেছে, যে সন্তান শক্তিধর হলেও যার সমস্ত শক্তি চৈতন্যসর্বস্ব এক নিরাবয়ব সত্তামাত্র, সে সন্তানের মধ্য দিয়ে গ্যেটে দেখাতে চেয়েছেন মানুষ শত সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী হলেও দেহমনের সুষম সম্বন্ধে গড়া সার্থক মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। সেই কৃত্রিম সন্তান হোমুনকালাসের সাহায্যে হেলেনের দেখা পেয়েছে ফাউস্ট। মার্গারেটের প্রতি তার যে প্রেম একদিন ছিল কেন্দ্রানুগ সে প্রেম জৈব ইন্দ্রিয়চেতনায় সব স্তর পার হয়ে বহু যুগের কালগত ব্যবধান জয় করে হেলেনের কাছে গিয়ে সহসা হয়ে উঠেছে কেন্দ্রাতিগ। যে সর্বাত্মক দুর্লভ নারীসৌন্দর্য সর্বগ্রাসী কালের কুলিশ প্রভাবকে অগ্রাহ্য করে এক অখণ্ড সত্যের অম্লান ভাবমূর্তিতে পর্যবসিত, সে সৌন্দর্যকে লাভ করার জন্য ফাউস্টের কেন্দ্রাতিগ প্রেম স্বচ্ছন্দে উঠে গেছে এক নিষ্কাম বায়বীয়তার প্রতীকী ভাবরাজ্যে। এই ভাবরাজ্যেই হেলেনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। এ বিবাহ যেন কল্পনার সঙ্গে এক ভাবসত্যের মানসপ্রতিমার। এই ভাবসম্মিলনের ফলস্বরূপ যে সন্তান প্রসূত হয়েছে সে সন্তানও স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠেছে অলীক ভাবসর্বস্ব এক কল্পনামাত্র। সে উড়তে গিয়েও উড়তে পারেনি। উড়তে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। হেলেনের সন্তান ইউফোরিয়নের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের পার্থিব দেহটা সহসা বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায় ফাউস্টের চোখের সামনে দিয়ে। শুধু তার পোষাকগুলো তার হাতে থাকে। ফাউস্টের চৈতন্য হয়। fluechger Tage grossen Sinn. নশ্বর জীবনের ক্ষণভঙ্গুর অস্তিত্বের এক বিরাট তাৎপর্য সহসা উদ্ঘাটিত হয়ে উঠল ফাউস্টের কাছে। ফাউস্ট আবার বুঝল, নশ্বর দেহকে ফেলে যাওয়া অবিনশ্বর আত্মার মত সকল সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি তার বাস্তব অস্তিত্বের বাহ্য রূপায়বটি সাপের খোলসের মত ত্যাগ করে

চলে যায় এবং তখন হেলেনের পরিত্যক্ত উজ্জল পোষাকের মতই সে সৌন্দর্যের এক উজ্জল স্মৃতি শুধু পড়ে থাকে আশাহত বিহ্বল মনের কোণে। সকল প্রেম ও সৌন্দর্যের একটি আত্মিক তাৎপর্য আছে এবং সেই তাৎপর্য আত্মিক বা তুরীয় তাৎপর্যের আলোকে মৃত মার্গারেটের স্মৃতিটি ফাউস্টের মনে উজ্জল হয়ে উঠল সহসা। গ্যেটে এখানে পাপপুণ্যগত নৈতিক বিচার থেকে হেলেনকে মুক্ত করে এক পরিপূর্ণ আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। যে সৌন্দর্য মানুষের আত্মাকে প্রসারিত করে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে সেই শুচিশুদ্ধ সৌন্দর্যের নির্বিশেষ সত্তার কাছে মেফিস্টোফেলিসের মত কোন অশুভ শক্তি সশরীরে যেতে পারে না। এই জন্য শয়তান মেফিস্টোফেলিস ক্ল্যাসিকাল ওয়ালপার্গিস নৈশভোজের সভায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না হয়ে অশুভ দৈবশক্তির প্রতীক ফোর্সিয়ার মুখোস পরে হাজির হয়। ফোর্সিয়া ও মেফিস্টোফেলিস হেলেনের বাহ্য রূপটিকেই বড় করে দেখেছিল; তারা তার রূপসৌন্দর্যের অবিনাশী অতীন্দ্রিয় ভাবমূর্তিটি দেখতে পায়নি, কারণ সে অন্তর্দৃষ্টি তাদের ছিল না।

হেলেনের পরিপূর্ণ সর্বাত্মক সৌন্দর্যের সংস্পর্শে ফাউস্টের আত্মা যে প্রসারতা লাভ করে তাতে তার মধ্যে জেগে ওঠে এক অননুভূতপূর্ব বীরত্ব ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। মেফিস্টোফেলিসের যাদুর সাহায্যে যুদ্ধ জয় করে সম্রাটের কাছ থেকে পুরস্কারস্বরূপ এক বিরাট জলা জায়গা নিয়ে সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে তাকে উর্বর শস্যক্ষেত্রে পরিণত করার পরিকল্পনা করে সে। যত সব অলস রোমান্টিক ভাবকল্পনাকে বিদায় দিয়ে ফাউস্ট এবার সৃজনাত্মক এক কর্মোদ্দীপনায় ফেটে পড়তে চায়। এই উদ্দীপনার আতিশয্যে সমুদ্রের মত এক অসংযত অনুৎপাদিকা প্রাকৃতিক শক্তিকে সংযত ও উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত করে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে চায় তাকে।

আপাতশান্ত আপাতনিস্পৃহ প্রকৃতির অন্তঃস্থলে আবদ্ধ থাকে উল্লঙ্ঘন-অভিলাষী এক বিদ্রোহাত্মক শক্তির প্রচণ্ডতা যা মাঝে মাঝে ফেটে পড়ে পর্বত শৃঙ্গের অপ্রধৃষ্য উত্তুঙ্গতায়, সমুদ্রতরঙ্গের সর্বগ্রাসী উত্তালতায় ও প্রভঞ্জনের বৈপ্লবিক মত্ততায়। ফাউস্টের দ্বন্দ্বসঙ্কুক্ষিত দ্বৈতসত্তাটি যেন প্রকৃতির এই দুটি শক্তির প্রতীক। যে ফাউস্ট একদিন হতাশা আর বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পৃথিবীর সব আশা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতাকে অভিশাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, যে ফাউস্ট একদিন মেফিস্টোফেলিসের শয়তানী প্রভাবের শান্ত ক্রীড়নক

হিসাবে কাজ করে গেছে, সেই ফাউস্টই আবার অতিমানবিক কামনার স্পর্ধিত উচ্ছ্বাসে এক মহাজাগতিক অভিলাষে ফেটে পড়েছে। তার বিষণ্ণ প্রতিহত প্রাণের পথহারা প্রস্রবণটি সহসা তার চারদিকের সমস্ত প্রস্তরশৃঙ্খল ও গুহান্ধকার হতে নিজেকে মুক্ত করে মানবকল্যাণবোধের এক বিশ্বাত্মক সমুদ্র-সত্তায় বিলীন হয়ে গেছে। এই জন্যই মেফিস্টোফেলিসের সব বাধাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ফাউস্টের আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে গেছে মার্গারেটের আত্মা।

কিন্তু ফাউস্টের এই মোক্ষলাভের আগে তাকে যাদুবিদ্যার মোহ ত্যাগ করতে হয়েছে। যে যাদুবিদ্যা মানুষের কাছে প্রাকৃত অপ্রাকৃতের সীমারেখাটিকে বিলুপ্ত করে দেয়, তাকে বিধির বিধান লঙ্ঘন করতে উৎসাহ দেয়, সে বিদ্যা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে বিদ্যা ত্যাগ না করা পর্যন্ত নিজের মুক্তি বা জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পায়নি ফাউস্ট। এই জন্য সে বলেছে,

Not yet have I my liberty made good
If I could banish Magic's fell creations
And totally unlearn the incantation
Stood I, O Nature ! Man alone in thee,
Then were I it worth one's while a man to be !

শতবর্ষপূর্তির পর জীবনসায়াহ্নে এসে ফাউস্ট বুঝতে পেরেছে যাদুবিদ্যার মোহে ধরা না পড়লে সে জগতের মাঝে মানুষের মত এক মানুষ হয়ে উঠতে পারত। যখন সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারল তখন আর কোন উপায় নেই। উনিশ শতকের অনেক সমালোচক মনে করেন ফাউস্টের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে মেফিস্টোফেলিসের হাতে ধরা দেওয়া উচিত হয়নি। আমার মতে ফাউস্টের ট্রাজেডী এইখানে। শুধু ফাউস্ট নয়, আধুনিক মানব জীবনের ট্রাজেডীও এইখানে। বিজ্ঞান আজকের মানুষকে যে শক্তি দান করেছে মানুষ সে শক্তির সীমাকে মানতে চায় না। অসাধ্যসাধনের যে উদ্ধত প্রয়াস মানুষের জ্ঞান ও শক্তিগত সীমাকে অস্বীকার করে আধুনিক মানুষের আত্মার সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে, দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছে তার অন্তরাত্মাকে মেফিস্টোফেলিস হলো সেই প্রয়াসেরই প্রতীক। ফাউস্টের মত আমরা যখন বুঝতে পারি, আমাদের সংগ্রামশীল আত্মশক্তির বৃথা অপচয় করে সীমাহীন তলহীন শূন্যতার মাঝে যে অলীক নিশ্চয়তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছি সে

নিশ্চয়তা হলো আত্মপ্রতারণারই নামান্তর মাত্র তখন কোন উপায় থাকে না। সারা জীবনের সকল ভুলভ্রান্তির প্রান্ত ভূমিতে এসে আমরা যখন উপনীত হই তখন দেখি দিগন্তের পটে ফুটে উঠেছে তিমিরাঙ্কিত মৃত্যুর এক ভয়াল মূর্তি। দেখি, ক্লান্ত প্রাণের নদীটি আগেই ঢলে পড়েছে কুয়াশালীন সমুদ্রের ইন্দ্রনীল কোলে।

ফাউস্ট শুধু এক সাধারণ নাট্যকাব্য নয়, ফাউস্ট আধুনিক জীবনের এক সাহিত্য-মহাকাব্য। গ্যেটের মত আর কোন কবি বা নাট্যকার তাঁর রচনার মধ্যে আধুনিক মানবজীবনের আশা নিরাশা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, ধর্ম অধর্ম, পাপপুণ্য নিয়ে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের বিচিত্র দিকগুলি নিয়ে এমন করে ভাবেননি। তবে ফাউস্টের শেষদৃশ্যে দান্তের ডিভাইন কমেডিয়ার প্রভাব প্রকটিত হয়ে তাঁর ভাবকল্পনার মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। দান্তের বিয়াত্রিসের মত মার্গারেটের মৃত্যুহীন প্রেম ফাউস্টের আত্মাকে নিয়ে গেছে ঐশ্বরিক মার্জনা আর মোক্ষলাভমণ্ডিত স্বর্গের সর্বোচ্চ লোকে। আমার মনে হয় যে গ্যেটে একদিন শুধু বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করে ধর্মনিরপেক্ষ চূড়ান্ত জীবনসত্যটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, সেই গ্যেটে মিস্টিক বা মরমী খৃস্টান সাধক ল্যাভেতারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনের চূড়ান্ত সত্য ও পরম অর্থটি খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন।

গ্যেটের অন্য দুটি নাটক আয়রণ হ্যাণ্ড ও এগমঁত ট্র্যাজেডী হিসাবে সার্থক। দুটি নাটকেরই পটভূমি হলো সমকালীন রাজনৈতিক সংকট। আয়রণ হ্যাণ্ড নাটকের নায়ক বার্লিশিঞ্জেনের জীবনে ট্র্যাজেডী নেমে এসেছে এক ভ্রান্তি থেকে যে ভ্রান্তির বশে সে ভেবেছে দেশের কৃষকবিদ্রোহজনিত অরাজকতার মাঝেও তার শক্তি, সামর্থ্য, সততা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সমানভাবে কার্যকরী হবে। বিপ্লবী অশিক্ষিত অসংযত কৃষকরা তার নেতৃত্ব অস্বীকার করে তাকে আঘাত করেছে। এগমঁত নাটকের পটভূমি হলো স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহ। এই নাটকের নায়ক কাউণ্ট এগমঁত এক অসঙ্গত দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে শত্রুদের শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে উপযুক্ত আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষাগত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেনি, বন্ধুদের সতর্কবাণীতে কান দেয়নি। এগমঁতের এই বিচারবুদ্ধিগত ত্রুটিই ট্রাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে তার জীবনকে।

গ্যেটের উপন্যাস তিনটির মধ্যে তাঁর জীবনের প্রথম রচনা 'সাফারিংস

'অফ ইয়ং ওয়ার্দার উপন্যাসটি একান্তভাবে কাব্যগুণান্বিত। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমিকায় নায়ক ওয়ার্দারের আবেগানুভূতির বিস্তারের মধ্য দিয়ে তার আত্মজীবনের কিছু কিছু উপাদান প্রতিফলিত হয়েছে। লোত্তের প্রতি তার ব্যর্থ প্রেমের অসংযত অদম্য বেদনা অন্তরাবর্তন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মঘাতী হয়ে উঠেছে। গ্যেটে নিজেও একবার আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেন এবং এই আত্মহত্যার সপক্ষে উদ্‌ভাবিত যুক্তিগুলি এই উপন্যাসে পরিব্যক্ত করেন।

'উইলেম মেস্তার' উপন্যাসটি ঘটনাপ্রধান। অসংখ্য ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছে মেস্তার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তার নাট্যপ্রতিভা প্রাণরস আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের নায়কের মধ্যেও গ্যেটের আত্মগত প্রতিফলন পড়েছে। গ্যেটে একের পর এক করে যেমন ব্যক্তিজীবনে গ্রেচেন, ফ্রেডারিকা ও লিলি এই তিনটি মেয়েকে ভালবাসলেও তিনটি প্রেমের ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হন তেমনি উইলেম মেস্তারও একের পর এক কয়েকটি মেয়েকে ভালবেসে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তার নিরন্তর পথচলার গতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। তবে উপন্যাসের মধ্যে অহেতুক অসংখ্য ঘটনাজাল বিস্তার করায় নায়কের চিন্তাভাবনাগত মানসপ্রক্রিয়ার অবিচ্ছিন্ন ধারাটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মাঝে মাঝে।

গ্যেটের ঔপন্যাসিক প্রতিভার সার্থক পরিচয় পাই তাঁর 'কাইণ্ডার্ড বাই চয়েস' বা 'সিলেকটিভ এ্যাফিনিটি' উপন্যাসটিতে। একই পরিবেশে লালিত কয়েকটি নরনারীর স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিয়তির অপরিহার্য দ্বন্দ্ব এবং তার বিস্তারই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এ উপন্যাসে এডওয়ার্ড ও ওতিলে চরিত্র দুটি অস্বাভাবিকভাবে আবেগপ্রবণ। তাই তারা যখন দেখেছে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আপন আপন আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে লাভ করতে পারেনি তখন তারা আত্ম-হননের পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু অপরদিকে শার্লোতে ও ক্যাপ্টেনের চরিত্র অসাধারণ আত্মসংযমের জীবন্ত প্রতীকরূপে এক চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাসে ভাবগত ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে। অটল অটুট আত্ম-সংযমের দ্বারা মানুষ কিভাবে তার অদম্য উদ্দাম ইচ্ছাশক্তিকে দমন করে অবস্থার অবাঞ্ছিত প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে, শার্লোতে ও ক্যাপ্টেন তার প্রমাণ দিয়েছে তাদের জীবনে। আবেগের স্রোতে কোন অবস্থাতেই গা ভাসিয়ে না দিয়ে সব সময় তাদের যুক্তি ও বুদ্ধিগত প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একই উপন্যাসে ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ মননশীলতার সার্থক

রূপায়ণ বড় একটা দেখা যায় না। ভিন্ন জটিল পরিবেশের মধ্যে ফাউস্টের মধ্যেও এই দুটি মননশীলতার রূপায়ণ এক আশ্চর্য সার্থকতা লাভ করেছে। ফাউস্ট এক জায়গায় বলেছে :

I am so far away, yet so near
Still I am so fain to say here I am here.

কখনো মনে হয় আমি দূরে চলে গিয়েছি, আপন আত্মার কেন্দ্রগত শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভেঙ্গে যায়। মনে হয় আমি আছি, এখানেই আছি, আপন অন্তরাত্মার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছি আমি আর সেই সুসমন্বিত অন্তরাত্মা হতে বিচ্ছুরিত আলোকে অর্থময় হয়ে উঠছে জগতের সব বস্তু, অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে নিকট দূরের সব ব্যবধান। আপন মৃগনাভির গন্ধে আত্মহারা আকুল বনহরিণী যেমন দিক হতে দিগন্তের পথে ছুটে বেরিয়ে অবশেষে তার আরণ্যক বাসায় এসে আবিষ্কার করে এ গন্ধ তার নাভিদেশনিঃসৃত, তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের রোমান্টিক উন্মার্গগামী মনও সমস্ত দিগন্ত পিপাসার অবসানে ফিরে এসে আপন আত্মার চৈতন্যালোকিত বৃত্তসীমার মধ্যেই বিশ্বের বিপুল পরিধিটিকে অনিবার্যভাবে সীমায়িত ও বিন্যস্ত দেখতে পায়। আমাদের অসংযত রোমান্টিক মন ক্লাসিকাল সংযমে আবদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সাহিত্যরসিক, বন্ধুবর ডক্টর বিষ্ণু বসু সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন আমাকে।

—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

ফাউস্ট

উৎসর্গ

আবার এসেছ হে ছলবিলাসিনী মায়াবিনীরা! মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতির কুয়াশা সরিয়ে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি সুদূর অতীতে আর একবার এসেছিলে তোমরা তোমাদের আপাত-উজ্জ্বল রূপ দিয়ে আমায় মোহমুগ্ধ করতে। আজ আবার এক মোহপ্রসারী মায়াবরণ দিয়ে আবৃত করে দিতে এসেছ আমার অন্তরকে? এবার কি তোমাদের আমি বেঁধে রেখে দেব তোমাদের এই প্রকটিত রূপে? এলে যদি আরও কাছে এস। আমার জীবন-যৌবনের সার্বভৌম কর্তৃত্বভার গ্রহণ করো। তোমাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রসুলভ এক ক্ষণ-উন্মাদনায় ছায়ান্ধকার যে রহস্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় আমার ইন্দ্রিয়চেতনা, যে অশান্ত যৌবনাবেগের মেঘভারে মৃদু বিকম্পিত ও শিহরিত হয়ে ওঠে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা, সে কুয়াশা সে মেঘ থেকে মুক্ত করো আমায়। একান্তভাবে পার্থিব বিশাল বস্তুপুঞ্জমণ্ডিত বর্তমান দিয়ে ঘেরা প্রায়ান্ধকার এই অস্বচ্ছ চেতনার রাজ্য হতে আমাকে নিয়ে চল আরও উজ্জ্বল এক ভবিষ্যতের পানে।

তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীত দিনের অনেক সুখস্মৃতি ভিড় করে আসছে আমার মনে। প্রেম ও কত বন্ধুত্বের স্মৃতি সকরুণ বেদনার এক একটি মূর্তি ধরে গোলোকধাঁধাসদৃশ আমার জীবনের সুপ্রাচীন কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে আবার। কেলিকপটিনী ভাগ্যদেবী অতীত জীবনের চলমান সুখস্রোত হতে অকস্মাৎ আমায় বিচ্ছিন্ন করে দিলেও স্মৃতিসিক্ত এক অবিচ্ছিন্ন মানস-প্রক্রিয়া এক দুঃসহ বেদনার জাল বুনে চলেছে আজও। সুদূর অতীতে একদিন যাদের আমি গান শোনাতাম তারা আজ আমার গান শোনে না। তারা সবান্ধবে চলে গেছে আমার জীবন থেকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে সে গানের সব ধ্বনি প্রতিধ্বনি। হয়ত তারা আজও বেঁচে আছে, কিন্তু আমার কাছে আর আসে না। তারা সব পৃথিবীর জনারণ্যে ছড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। আজ যারা আমার গান শোনে, শুনে আনন্দ পায় তাদের আনন্দ আমাকে বেদনা দেয়। সে বেদনা যত বাড়তে থাকে বহু আকাঙ্ক্ষিত

এক আত্মিক প্রশান্তির জন্য ততই প্রবল হয়ে ওঠে আমার ব্যাকুলতা।

তবু আমি গান গেয়ে যাই। আইওনিয়ার গানের ধ্বনিকে ছাপিয়ে যাবার জন্য এক আকাশচুম্বী উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে চায় আমার গান। বাতাসের প্রতিটি কম্পনে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে আমার গানের বীণা। কম্পিত হয়ে ওঠে আমার সারা দেহ। একের পর এক করে উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঝড়ে পড়ে আমার চোখ থেকে। অশান্ত অধীর হয়ে ওঠে আমার হৃদয়। আমি যা পেয়েছি তারা আমাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে যায় আর যা কিছু আমি হারিয়েছি তাদের অশরীরী স্মৃতিরা আমার চোখের সামনে এসে মূর্ত হয়ে উঠে বিব্রত করে তুলছে আমায়।

মঞ্চ সম্পর্কে মুখবন্ধ

ম্যানেজার   কবি-নাট্যকার   মেরি এ্যাণ্ডরু

ম্যানেজার : তোমরা দুজনে আমাকে বিপদে আপদে অনেক সাহায্য করেছ। আমার অনেক প্রয়োজন মিটিয়েছ। আজ আমি আমাদের জার্মান দেশের জন্য যে নাট্যপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি সে বিষয়ে তোমাদের দুজনের অভিমত জানতে চাই। এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা হলো এই যে, জনতা বা দর্শকবৃন্দ হচ্ছে অসংখ্য জীবন্ত মানুষের সমষ্টি এবং তাদের দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। সুতরাং তাদের প্রতি যেন সুবিচার করা হয়। এখন মঞ্চ নির্মাণের কাজ সব শেষ। আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য এক নীরব প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে দর্শকরা। কৌতূহলবিহ্বল তাদের ভ্রূযুগল উত্তোলিত করে বিস্ময়কর অনেক কিছু দেখার প্রত্যাশায় এরই মধ্যে বসে আছে তারা। আমি জানি দর্শকদের কিভাবে খুশি করতে হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে এক অস্বস্তিসিক্ত কুণ্ঠা অনুভব করছি আমি। তারা কি ভালবাসে, প্রচলিত কোন শব্দদৃশ্যে তারা অভ্যস্ত সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। তবে একথাও ঠিক আজকের দর্শকরা অনেক কিছু পড়েছে। অনেক কিছু খবর রাখে। তাহলে কেমন করে আমরা আমাদের নাট্যপরিকল্পনায় এক অভিনব ও অভূতপূর্ব বস্তুকে উপস্থাপিত করব যা একই সঙ্গে অভিনব হয়েও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে দর্শকদের কাছে? এই দর্শকরা যখন দলবদ্ধভাবে বেগবান নদীস্রোতের মত মঞ্চাভিমুখে এগিয়ে আসে অথবা যখন তারা দিনের বেলায় রুটির দোকানের সামনে ভিড় করতে থাকা দুর্ভিক্ষপ্রপীড়

বুভুক্ষু জনগণের মত টিকিট কেনার জন্য অফিস ঘরে ভিড় করে তখন তা দেখতে আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে। বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য মানুষকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এক জায়গায় এভাবে সমবেত করার ইন্দ্রজাল একমাত্র কবিরাই সৃষ্টি করতে পারেন। হে কবি, সেই ইন্দ্রজাল এবার সৃষ্টি করো।

কবি: বিচিত্র বর্ণের পোষাকপরিহিত বিচিত্র মনোভাবাপন্ন ঐ জনগণের কথা আর আমায় বলো না। ওদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে গীতিকাব্য রচনার সমস্ত জলন্ত প্রেরণা আমার নির্বাপিত হয়ে যায় মুহূর্তে। আমার দৃষ্টিসীমার অন্তরালে চলে যেতে দাও ঐসব চলমান জনতার স্রোতকে। ওদের অস্থির মানসিকতার অশান্ত ঘূর্ণাবর্তে আমাকে যেন ওরা জোর করে কখনো না ফেলতে পারে। তার চেয়ে আমাকে নিয়ে চল সেই স্বর্গীয় নীরবতার রাজ্যে যেখানকার আকাশে বাতাসে এক আশ্চর্য অসীম স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে কবিসুলভ এক বিমল আনন্দের জ্যোতি। যেখানে এক অপরিসীম প্রেম আর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় সব মানুষ আর সেই প্রেমের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে মানুষের বাসনার সব আবেগ।

মানুষ তার অন্তরের গভীর থেকে ভীরুতার সঙ্গে আমতা আমতা করে যা প্রকাশ করে তার বেশীর ভাগ উন্মত্ত মুহূর্তের লোভাতুর বক্ষের মধ্যে নিঃশেষে তলিয়ে যায়। যা কিছু অস্থায়ী ও আপাতউজ্জ্বল তা ক্ষণভঙ্গুর মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষিত হয়ে যায়। যা কিছু খাঁটি, যা কিছু সত্য ও চিরায়ত তাই ভাবীকালের সম্পদ হয়ে বিরাজ করে যুগ যুগ ধরে।

মেরি এ্যাণ্ড্রু: ভাবীকালের কথা আমি যদি জোর করে প্রচার করে চলি তাহলে সমকালীন জীবনের রস কেমন করে উপভোগ করব? সব মানুষেরই উচিত এই জীবনের রস উপভোগ করা। এই রস উপভোগ করার জন্য কোন এক প্রাণোচ্ছল জীবনরসরসিক যুবকের সাহচর্য প্রত্যেক মানুষেরই দরকার। যে যুবক তার নিরন্তর পরিহাস রসিকতার মাধ্যমে তার অনর্গল স্বভাবের মাধুর্য ছড়িয়ে চলে তার প্রতি কেউ কখনো বিরূপ হয় না, কেউ কখনো ক্রুদ্ধ হয় না। এইভাবে সে তার বন্ধু ও অনুরাগীর সংখ্যা যতই বেড়ে চলে ততই সে পরিহাসরস পরিবেশনে প্রেরণা পায়। সুতরাং সাহস সঞ্চয় করো, হাস্যরস পরিবেশনে তোমাদের কল্পনাশক্তিকে পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত করো। তোমাদের নীতিজ্ঞান, যুক্তিবোধ, ভাবপ্রবণতা, আবেগ, অনুভূতি সব কিছু মিলিত হয়ে সেই কল্পনাশক্তির সহায়তা করুক।

ম্যানেজার : যে নাটক তোমরা মঞ্চস্থ করবে তা প্রধানতঃ ঘটনাবহুল হবে। মনে রাখবে দর্শকবৃন্দ নাটকের মধ্যে ঘটনাপারম্পর্যের একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রকে তাদের চোখের সামনে ক্রমোদ্‌ঘাটিত দেখতে চায়। দেখতে দেখতে তারা সম্মোহিতের মত এক অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মঞ্চের দিকে। এইভাবে তাদের আগ্রহ ও আবেগ আকর্ষণ করেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারবে। মনে রাখবে, একমাত্র সম্মিলিত প্রার্থনার দ্বারাই সমবেত জনগণের হৃদয় স্পর্শ করা যেতে পারে, কারণ এই ধরনের প্রার্থনায় প্রত্যেকে আপন আপন কণ্ঠের স্বর মিলিয়ে তৃপ্তি অনুভব করে। তেমনি একই নাটকের মধ্যে বিভিন্ন রুচির মানুষ বিভিন্ন রকমের আগ্রহের উপাদান খোঁজে আর তা পেলেই তারা এই রসতৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায় অভিনয় শেষে। একই ধরনের এক অখণ্ড ভাববস্তুকে সম্বল করে নাটক নাই বা লিখলে। নাটকে যদি বিভিন্ন ধরনের ভাব ও রসের উপাদান ছড়িয়ে থাকে তাহলে দেখবে বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন দর্শকরা তার থেকে এক একটি উপাদান কুড়িয়ে নেবে আপন আপন রুচি অনুসারে।

কবি : তুমি বুঝতে পারছ না কোন কবির পক্ষে একাজ কত অসম্মানজনক। যে শিল্পী যত আত্মসচেতন এবং সব সময় সত্য বস্তু দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে সমৃদ্ধ করেন সেই শিল্পীর পক্ষে একাজ মোটেই শোভা পায় না। যে সব ছলনাময় কুশলী শিল্পী অসত্য বস্তুকে সত্য বলে তাঁদের সৃষ্টিকার্যে চালিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত একমাত্র তাঁদের কাজই তোমার নীতির সঙ্গে খাপ খাবে।

ম্যানেজার : তোমার এই তিরস্কারবাক্য কোনক্রমেই রুষ্ট করতে পারবে না আমায়। কোন মানুষ যখন কোন কর্মকে ফলপ্রসূ করে তুলতে চায় তখন সে অবশ্যই এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করে যা সবচেয়ে কার্যকরী হয়ে উঠবে তার সে কর্মের পক্ষে। ভেবে দেখ, একটা নরম কাঠকে টুকরো টুকরো করার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে। আরও ভেবে দেখ। তুমি কাজের জন্য লিখছ। একই নাটক দেখে কেউ যখন বিরক্ত বোধ করে ক্লান্তিবোধ করে তখন আর একজন এক নিবিড় তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আবার কেউ বা খবরের কাগজ পড়ে কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে এক অলস ঔদাসিন্য সহকারে আসে নাটক দেখতে। আসে তাদের উজ্জ্বল পোষাকপরিহিতা অর্ধাঙ্গিনীদের সঙ্গে নিয়ে। তোমার মধ্যে যে কাব্যপ্রতিভা রয়েছে তার দ্বারা আর কি মহৎ কার্য সম্পাদন করতে চাও? আমার কাছে এসে দেখ, তোমার অনুরাগীদের মুখমণ্ডলগুলি দেখ। তাদের মধ্যে অর্ধেক হলো বড় নীরস ও স্থূল প্রকৃতির। নাটকাভিনয়

শেষ হয়ে গেলে তারা বাড়ি ফিরে কোন বারাঙ্গনার অঙ্কশায়ীরূপে পান ভোজন ইত্যাদি সহকারে এক উন্মত্ত রাত্রি যাপন করবে। দর্শকদের অপর অর্ধেক নাট্যরস আস্বাদনে সক্ষম। তাই বলি, হে নির্বোধ কবির দল, তোমরা কাব্যনাট্যগুলিতে এমন সব রসোত্তীর্ণ উত্তম নাট্যবস্তু দান করবে যা স্বচ্ছন্দে দর্শকদের প্রত্যাশার সীমাকে যাবে ছাড়িয়ে। এইভাবে তোমরা পার্থিব ধনসম্পদ ও গৌরব একই সঙ্গে দুই-ই লাভ করবে। দর্শকদের মনে এমন বিপুল পরিমাণ সন্তোষ উৎপাদন করবে যে তারা যেন বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এ কাজে কুণ্ঠা কেন? এ কাজ করতে গিয়ে আনন্দ না বেদনা কি অনুভব করছ?

কবি : যাও, অন্যত্র কোথাও গিয়ে তোমার এক অনুগত দাসানুদাসের সন্ধান করো। কী! যে কবিকে প্রকৃতি স্বয়ং এক সৃষ্টিশীল প্রতিভা দান করে সর্ব-শ্রেষ্ঠ মানবসন্তানরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে সর্বাপেক্ষা বড় মানবিক অধিকারে ভূষিত করেছেন সেই কবি কখনো তোমার আনন্দ বৃদ্ধির জন্য আপন প্রতিভার অপব্যয় করবে না। যে কবি জীবনের যত সব উপাদানগুলি করায়ত্ত করে তাঁর হৃদয়ের উপর তাই দিয়ে এক স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সে কবি কখনো কারো দাসত্ব করবে না। সকল কবির মধ্যে এমনই এক অগ্রপ্রসারী সত্তা আছে যা তার আপন অন্তর্নিহিত প্রেরণায় এক বিশ্বব্যাপী সূত্রজাল বিস্তার করে জগতের বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন করে। প্রাকৃতিক যত সব বাধাবিপত্তি দূর করে বিভেদ ও অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য আনে। কবিরা ছাড়া আর কারা ছন্দের নৃত্যের দ্বারা বিশ্বের অপরিবর্তনীয় জীবনধারার মধ্যে বৈচিত্র্য আনে? একমাত্র কবিরাই প্রতিটি ব্যক্তিমানুষকে বিশাল বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে। সকলকে এক মধুর মিলনের মধ্যে আবদ্ধ করে এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে প্রেরণা দেয়। কবি ছাড়া আর কে মানুষের বিষাদগ্রস্ত অন্তরে সহসা নিয়ে আসে বিক্ষুব্ধ কামনার ঝড়? প্রেমের উজ্জ্বল পথে কবি ছাড়া আর কেই বা বসন্তের ফুল ছড়ায়? একমাত্র কবিরাই সামান্য গাছের পাতা দিয়ে তৈরি মুকুটকেও রাজমুকুটের গৌরব দান করতে পারে। এভিয়নের প্রান্তরের মত ঊষর মরুভূমির মাঝেও ফুল ফোটাতে পারে। তাদের কল্পনার শক্তি দিয়ে দেবতাদের দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গের অলিম্পাসকে তারাই জীবন্ত করে তুলতে পারে। চারণ কবিরা যুগে যুগে মানুষের কীর্তি ও মহত্ত্বকে অমর করে রাখে, বর্ণনার দ্বারা সজীব করে তোলে তাদের।

মেরি অ্যাণ্ডরু : সুতরাং এই সব সূক্ষ্ম শক্তিগুলিই সম্মিলিতভাবে উচ্চতর কবিপ্রতিভাকে চালিত করে। এই সব সূক্ষ্ম শক্তিগুলিই কবিদের হৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ে আসে আনন্দ-বেদনার ঝড়। ঠিক যেমন প্রেমের ব্যাপারে হয়। প্রেমের ক্ষেত্রে একটি পরিস্কার রোমান্সের ঘটনা ঘটে যায় প্রেমিক-প্রেমিকাদের জীবনে। প্রথমে দুজনের দেখা সাক্ষাৎ, পরে সঙ্গপ্রবণতা, এইভাবে দুজনের অন্তর আপনা আপনি আবদ্ধ হয়ে পড়ে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। প্রথমে আনন্দ, পরে বেদনায় জর্জরিত হয় উভয়ের অন্তর। এই ধরনের প্রেমকাহিনী সম্বলিত একটি নাটক উপহার দিতে পার দর্শকদের। যে জীবন অসংখ্য মানুষ অহোরহঃ যাপন করছে সেই জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ রূপকেও ফুটিয়ে তুলতে পার নাটকে। প্রতিটি মানুষ যে জীবন যাপন করছে সেই জীবন যখন শিল্পে বা কাব্যে তুলে ধরা হয় তখন খুব কম লোকেই বুঝতে পারে সে জীবনের কথা। বিচিত্র রং ও রূপের ছবিতে যে জীবনকে শিল্পীরা উপস্থাপিত করেন তাতে সত্যের আলোর থেকে ভুলের কালিমাই থাকে বেশী। তবু জগতের লোকে শিল্প বা সাহিত্যবর্ণিত সেই জীবনকে কাহিনীকে উপভোগ করে। এইভাবে নাটকের মধ্যে এমন অনেক ভাল উপাদানও পরিবেশন করতে পার যার থেকে লোকে আনন্দের সঙ্গে কিছু শিক্ষাও পেতে পারে। আবার দেখবে তোমার এই নাটক দেখে কত সুন্দর সুন্দর যুবক-যুবতী সংযত করতে শিখছে তাদের প্রমত্ত যৌবনের উদ্দাম গতিবেগকে। ভাবাবেগপ্রবণ তরুণ তরুণীরা কত বিষাদের উপাদান খুঁজে পায় এই সব নাটকে।

আসল কথা, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দর্শক তাদের আপন আপন প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন রকমের উপাদান খুঁজে নেয় একই নাটক থেকে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ বা তোমার কল্পনার প্রসারতা ও ঔদ্ধত্য দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তবে সকলেই যে নাটকের নাট্যরস উপভোগ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনের ধাতু একবার গঠিত হয়ে গেলে পরে আর পরিবর্তিত বা অন্য পরিবেশে খাপ খায় না। তাই তরুণদের উপর নাট্যবস্তুর প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

কবি : তাহলে আমাকে আবার সেই বিগত যৌবনের আনন্দোচ্ছল দিনগুলি ফিরিয়ে দাও। যখন আমি মনের আনন্দে গান গাইতাম আর স্বতোৎসারিত ঝর্ণাধারার মত অসংখ্য সুললিত সাবলীল ছন্দের স্রোত অবাধে অপ্রতিহতবেগে বেরিয়ে আসত আমার মন থেকে। সেদিন এক শুচিশুভ্র কুয়াশার মোহপ্রসারী

অবগুণ্ঠন সতত আচ্ছন্ন করে রাখত আমার সামনের জগৎটাকে। সেদিন বনে প্রান্তরে উপত্যকায় যেদিকেই তাকাতাম সেদিকেই দেখতাম অজস্র অচিরোদ্গত কুসুমকোরক অস্ফুট লাবণ্যে টলমল করছে, অমিত পরিমাণে এক স্বর্গীয় সুবাস ছড়াচ্ছে চার দিকে। এক তরল বিস্ময়ে ভরে যেত আমার মন। যৌবনে মানুষের এমনিই হয়। কিছু না পেয়েও সব পেয়ে যেতাম আমি। ভ্রান্ত অথচ এক মধুর আনন্দে সত্যানুসন্ধানের এক আবেগোচ্ছ্বাসে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে উঠত আমার হৃদয়, আমার সমস্ত প্রাণমন। আমাকে আবার সেই অতীতের অবাধ আনন্দাবেগকে ফিরিয়ে দাও যার যাদু স্পর্শে মধুর হয়ে উঠত আমার জীবনের সমস্ত বেদনা, ঘৃণা ভক্তি ভালবাসা। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে ফিরিয়ে দাও।

মেরি অ্যাণ্ড্রু: হ্যাঁ বন্ধু, যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুরা এগিয়ে আসছে তোমার দিকে তখন অবশ্যই যৌবনের শক্তি তোমার প্রয়োজন। যখন সুন্দরী যুবতীরা এক মধুর কামনার আবেগে ঢলে পড়ছে তোমার বুকে, আদরে চুম্বনে বিব্রত করে তুলছে তোমায় তখন দূরস্থিত লক্ষ্যস্থলবর্তী কষ্টার্জিত এক জয়মাল্য এক নীরব উজ্জ্বলতায় যখন প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য। যখন একের পর এক নৃত্যোচ্ছল বিনিদ্র যামিনী যাপন করতে হয় শ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে তখন অবশ্যই যৌবন তোমার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হে প্রৌঢ় কবি মহাশয়, তোমার হৃত যৌবনের পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করে তোমার বর্তমানের স্বাভাবিক সৃষ্টিশক্তিকে সম্বল করেই একটি সুনির্বাচিত লক্ষ্যকে খাড়া করে এগিয়ে যেতে হবে সাহসের সঙ্গে। তোমার প্রকাশনৈপুণ্য ও সৃষ্টিকর্মে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্য আমরা কিছুমাত্র কম শ্রদ্ধা করব না তোমায়। লোকে বলে বার্ধক্য শিশুসুলভ নির্বুদ্ধিতা নিয়ে আসে, বলে বৃদ্ধ বয়সে শিশু হয়ে ওঠে মানুষ। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমি বলি বার্ধক্যের সুপক্ক ও সুপরিণত অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ হয়েই আমরা বয়োবৃদ্ধরা প্রত্যেকে প্রকৃত শিশু হয়ে উঠি। প্রকৃত শিশুর মত সরল এবং সৎ হয়ে উঠি মনে প্রাণে।

ম্যানেজার: অনেক কথা বলেছ তোমরা দুজনেই। এবার আমি কাজ চাই। যুক্তিজালমণ্ডিত বাক্যবিস্তারে দুজনেই সিদ্ধ তোমরা। এবার প্রকৃত শক্তির পরিচয় নিয়ে কাজের কাজ করো। প্রেরণার কথা বলে সময় নষ্ট করে কি লাভ? কোন অভাব কখনো বিলম্বের সঙ্গত অজুহাত হিসাবে গণ্য হতে পারে না। কাব্যরচনা যদি তোমার পেশা হয় তাহলে কাব্য অবশ্যই তোমার

ইচ্ছা ও আদেশ মেনে চলবে। তুমি ভালভাবেই জান কি ধরনের নাটক এখানে দরকার। এখানকার দর্শকসাধারণ চায় কড়া মদের মত এমন এক ধরনের নাট্যরস যা তাদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেবে এবং আমিও তোমাকে সেই ধরনের নাটক লিখতে অনুরোধ করি। আজ যদি এ ধরনের নাটক লেখা না হয় তাহলে আজকের এ প্রয়োজন কখনো ভবিষ্যৎ মেটাবে না। সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয়ে আর একটি দিনও নষ্ট না করে মনের মধ্যে সদ্যসম্ভূত প্রতিটি ভাবের সদ্ব্যবহার করে সাহস ও সংকল্পের সঙ্গে কাজে নেমে পড়। এ কাজ তোমাকে করতেই হবে, কারণ এটাই তোমার জীবিকা। তুমি জান আমাদের জার্মান দেশের মঞ্চ জগতের বর্তমান অবস্থা। সেখানে ইচ্ছামত যে যা খুশি নাটক লিখে বা মঞ্চস্থ করে যাচ্ছে। সুতরাং তুমি তোমার ইচ্ছামত নাট্য-উপাদান সংগ্রহ করে নাটক লিখে ফেল। ঈশ্বরপ্রদত্ত কবি-কল্পনার আলো অল্পবিস্তর প্রয়োগ করে প্রয়োজন মত নাট্যচরিত্র সৃষ্টি করে পশু, পাখি, পাহাড়, পর্বত, জল, আগুন, অন্ধকার, দিন-রাত্রি প্রভৃতি সব কিছুর থেকেই উপাদান গ্রহণ করে বিশাল বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ এমন এক নাট্যজগৎ সৃষ্টি করতে পার যা সুদূর স্বর্গলোক হতে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে মর্ত্যলোকে নেমে এসে সে লোক ভেদ করে নরক পর্যন্ত গমন করবে অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্য, নরক ত্রিভুবন প্রতিভাত ও প্রকটিত হয়ে উঠবে সে নাটকে!

স্বর্গলোকের অবতরণিকা

ঈশ্বর ও স্বর্গের দেবতাবৃন্দ

মেফিস্টোফেলিস

(তিনজন প্রধান দেবদূতের আবির্ভাব)

রাফায়েল : সূর্য তার আপন কক্ষপথে অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রদের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এ পথ যেদিন তার শেষ হবে সেদিন এক মহাপ্রলয় নেমে আসবে সর্বধ্বংসী বজ্রপাতে। এই সৌরলোক হতে দেবদূতেরা তাদের আপন আপন শক্তি সঞ্চয় করে তার পরিমাণের কথা কেউ বলতে পারে না। এই বিশ্বসৃষ্টির নির্মাণপদ্ধতি এমনই সূক্ষ্ম সুজটিল ও মহান যে তা কেউ কল্পনাও

করতে পারে না। এই সৃষ্টির উজ্জ্বলতা প্রথম দিন হতে আজ পর্যন্ত ম্লান হয়নি কিছুমাত্র।

গ্যাব্রিয়েল: এই বিশ্বসৃষ্টি তার অমিত ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে এত দ্রুত তার কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে যে তার গতিবেগ অকল্পনীয় প্রতীত হয় প্রতিটি মানুষের কাছে। ভয়াবহ রাত্রির গুমোট গভীর অন্ধকারের পর দিবসকালের স্বর্গীয় উজ্জ্বলতার তপ্ত আস্বাদন পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মানুষ। শুভ্রফেনশীর্ষ সমুদ্রতরঙ্গমালা অটল পর্বতমালার নিষ্ঠুর পাদদেশে বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। বিশ্বের দুটি গোলার্ধ আর তার মানুষ এক অনাদ্যন্ত চক্রাবর্তনে বিঘূর্ণিত হচ্ছে ক্রমাগত।

মাইকেল: এই বিশ্বসৃষ্টির মাঝেই চলছে ধ্বংসের লীলা। কখনো সমুদ্রবক্ষ হতে স্থলভাগে, আবার কখনো বা স্থলভাগ হতে সমুদ্রবক্ষে প্রতিকূল বাতাসের ঘনীভূত রূপ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার উন্মত্ত আলোড়ণে ফুলে ফুলে ওঠে। ক্ষান্তিহীন ধ্বংসের তাণ্ডব একের পর এক ফেটে পড়ে ভয়াবহ ক্রোধাবেগে। কোথাও বা বজ্রাগ্নিপ্রজ্জ্বলিত বিরাট অগ্নিকাণ্ড বিধ্বস্ত করে দেয় অনেক কিছু। তথাপি হে ঈশ্বর, হে প্রভু, তোমার দূতেরা তোমার সৃষ্টিলীলার প্রশংসা করে চলেছে।

তিনজনে একসঙ্গে: যদিও দেবদূতেরা নিজেরাই বিশ্বসৃষ্টির দুর্বোধ্য রহস্যজাল ভেদ করতে পারে না, তথাপি তারা হে ঈশ্বর, তোমারি সৃষ্ট সৌরলোক হতেই সঞ্চয় করে তাদের সমস্ত শক্তি। হে ঈশ্বর, তোমার এই বিশাল বিশ্বসৃষ্টি চির ঐশ্বর্যবতী ও মহতী। সেই আদিকাল হতে তার অক্ষয় উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে পড়েনি আজও।

মেফিস্টোফেলিস: হে ঈশ্বর, যেহেতু আমার মত এক অধমের উপর সদয় হয়ে আমরা এই পৃথিবীতে এখন কেমন আছি তা জানতে চেয়েছ সেইহেতু এখন আমার মুখটা দেখ। আমাকে ক্ষমা করো। আর আমি এই সব হীন মানুষদের নিয়ে পারছি না। ওরা আমায় ঘৃণা করে, অবজ্ঞার চোখে দেখে। তবু আমি ওদের মহান ভাবসমন্বিত বড় বড় কথা বলে ওদের বোঝাতে পারি না। আমার এই সব দুঃখের সকরুণ কথাগুলি নিশ্চয় তোমার মধ্যে হাসি জাগাবে। আনন্দ বা হাসিখুশির ত অভাব নেই তোমার জীবনে। তা তোমার বেশই জানা আছে। আমি কিন্তু আমাদের অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে সৌরলোক বা বিশ্বপ্রকৃতির কথা কিছু বলব না। বলব শুধু মানুষের সেই সব দুঃখকষ্টের কথা

যা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই মানবজগতের একটি নিজস্ব দেবতা আছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে সে দেবতা আপন মতে চলে আসছে একই পথে। যদি তুমি তোমার স্বর্গীয় আলোর একটি উজ্জ্বল রশ্মি সে দেবতাকে না দিতে তাহলে জীবনটা তার কাছে আর একটু বেশী আনন্দদায়ক ও বেশী উপভোগ্য হত। মানুষ বলে সে দেবতা হলো যুক্তি। বলে এই যুক্তিবোধ হতে শক্তি সঞ্চয় করে বড় হয়েছে তারা। বড় হয়েছে মানে পশুর থেকেও হীন হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার সুমহান সর্বব্যাপী উপস্থিতি ছাড়া এই বিশ্বজগৎ ও জীবনের কোন অর্থ নেই। তুমি ছাড়া মানুষকে আমার দৃষ্টিতে লম্বা লম্বা ঠ্যাংওয়ালা ফড়িং বলে মনে হয়, যে ফড়িং ঘাসের বনে আর ঝর্ণার ধারে চিরদিন ধরে সেই একই গান গেয়ে বেড়ায়। সেই ঘাসের বনে নাক ডুবিয়ে মানুষ কি আজও শুধু গোবরের দানা খুঁজে যাবে?

ঈশ্বর: তোমার কি আর কিছু বলার নেই? এই রকম কুমতলব নিয়ে কেন এসেছ? এই বিরাট পৃথিবীতে ভাল ও চিরন্তন কিছু পেলে না?

মেফিস্টোফেলিস: না প্রভু! আমি পৃথিবীতে সব কিছু আগের মতই খারাপ দেখছি। মানুষের দুঃখ আমার মত শয়তানের হৃদয়কেও বিগলিত করে তুলছে। এই সব হতভাগ্য মানুষদের নূতন করে দুঃখ দিতে আর আমার প্রাণ চায় না।

ঈশ্বর: তুমি ফাউস্টকে চেন?

মেফিস্টোফেলিস: ডাক্তার ফাউস্ট?

ঈশ্বর: হ্যাঁ, আমার সেবক।

মেফিস্টোফেলিস: তা বটে! সে কিন্তু অদ্ভুতভাবে তোমার সেবা করে। তাকে যত বেশী পরিমাণেই মাংস বা মদ দাও না কেন সে তাতে তৃপ্ত হবে না। কিন্তু তার চির উত্তপ্ত চিত্তের আশা আরও অনেক কিছু চাইবে। সে তার উন্মত্ত অশান্ত চিত্তাবস্থায় অর্ধাবগুণ্ঠিত চেতনায় অনেক সময় দূর আকাশের সুন্দরতম নক্ষত্রকেও কামনা করে বসবে। লঘু ও সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক আমোদপ্রমোদ ছাড়া দূরস্থিত ও নিকটস্থ এমন অনেক কিছু ভোগ্য দ্রব্যকে সে চায়। কিন্তু কোন কিছুই তার বিক্ষুব্ধ বুকের উত্তাল কামনারাশিকে তৃপ্ত বা অবদমিত করতে পারে না।

ঈশ্বর: যদিও এখনো পর্যন্ত আমার প্রতি তার সেবার নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় সন্দেহের অবকাশ আছে তথাপি শীঘ্রই আমি তাকে সমস্ত অশুভ শক্তির

তমিস্রাবসানে এক উজ্জ্বল প্রভাতের আলোয় নিয়ে যাব। যে বাগানের গাছে গাছে ফুল ফোটাবার জন্য কুঁড়িগুলিকে প্রস্তুত করে তুলছে সে বাগানের মালীকে সে আজও দেখেনি। অদূর ভবিষ্যতে সে ফুল ও ফল একই সঙ্গে পাবে। সে ফুলে ও ফলে সমৃদ্ধ ও শোভিত হয়ে উঠবে তার ভবিষ্যৎ জীবন।

মেফিস্টোফেলিস: কি বাজী তুমি রাখবে প্রভু? তুমি তাকে ভাল করতে পারবে না। তবে তাকে উদ্ধার করার শোধন করার একটা মাত্র পথ আছে। সে পথ হলো তাকে আমার উপর ছেড়ে দেওয়া। আমার মতে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার জন্য যদি আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাও তাহলেই তার পুনর্জীবন সম্ভব।

ঈশ্বর: যতদিন সে পৃথিবীতে জীবিত থাকবে আমি তাকে কোন বিষয়ে বাধা দেব না। কোন নিষেধাজ্ঞা জারি করব না তার উপর। মানুষ জীবনে যতদিন কামনা বাসনার দ্বারা চঞ্চল হবে ততদিন সে ভুল করবেই। কামনাকবলিত মানুষ ভুল না করে পারে না।

মেফিস্টোফেলিস: ধন্যবাদ। আমি কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে চাই না। তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি চাই জীবন্ত মানুষকে যার গণ্ডভিত্তির উজ্জ্বল ত্বকের উপর লাল তাজা রক্ত উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। যখন কোন মৃতদেহ আমার বাড়ির কাছ দিয়ে যায় তখন মনে হয় যেন কোন ইঁদুর কোন বিড়ালের দ্বারা নিহত হয়েছে।

ঈশ্বর: যথেষ্ট হয়েছে। তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ। তার মাথা থেকে তাহলে বর্তমানের যত সব সুবুদ্ধি ও যুক্তিবোধ অপসারিত করে দাও। তার পরিবর্তে তার মাথায় পেতে দাও তোমার অশুভ শক্তির ফাঁদ। তাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আরও নীচে নেমে যাও। তারপর একসময় তুমি নিজেই লজ্জা পাবে। দেখবে তার যত সব জটিল অতৃপ্ত কামনাবাসনা সত্ত্বেও আসলে লোকটা ভাল। ন্যায়পথে সৎপথে চলার এক নিগূঢ় প্রবৃত্তি আজও রয়ে গেছে তার বাসনাবিক্ষুব্ধ চিত্তের তলায়।

মেফিস্টোফেলিস: রাজী। কিন্তু এটা আমার পক্ষে স্বল্পকালের কাজ। এজন্য আমি কোন ভয় করি না। যদি আমি আমার আশানুরূপ কাজ করতে পারি, যদি আমি সফল হই তাহলে যেন বিজয়গৌরবে আমার বুকটাকে স্ফীত করে তুলো। আমার এক নিকট আত্মীয় যেমন একবার হাসিমুখে আমার পায়ের ধুলো চেটেছেন সেও তাই করবে।

ঈশ্বর : এ ব্যাপারে যা ভাল বোঝ করো। এ বিষয়ে তুমি স্বাধীন। তোমার মত আর কোন আত্মা আমার মধ্যে এতখানি ঘৃণা সঞ্চার করেনি। তোমার মত আরও যে সব দুঃসাহসী নাস্তিক শয়তান আছে তারা কেউ আমাকে এতখানি বিরক্ত করেনি কখনো। নিয়ত ক্রিয়াশীল মানুষের স্বরূপ এমনই যে তার চিত্ত কামনায় মাঝে মাঝে উত্তাল ও অশান্ত হয়ে উঠলেও আসলে সে চিত্ত শান্তি চায়। নিঃশর্ত শান্তি। সে অশান্ত চিত্ত শীঘ্র শান্ত হয়ে ওঠে। যে মানুষ মাঝে মাঝে কামনা বাসনায় উত্তেজিত হয়ে শয়তানের মত কাজ করে অনেক কিছু অশুভ বস্তু ও ঘটনা সৃষ্টি করে তাকেও আমি শান্তি দিই। কিন্তু যারা ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান কর্তব্যপরায়ণ ও প্রেমময়, সেই তোমরা সকলে একমাত্র যা কিছু অক্ষয় ঐশ্বর্য ও অনন্ত সৌন্দর্যে ভরা সেই সব বস্তুকেই উপভোগ করবে, কামনা করবে। এমন সৃষ্টিশীল শক্তির উপাসনা করবে যার দ্বারা চিরন্তন কিছু সৃষ্টি করে যেতে পারবে। চঞ্চল উচ্চাশার বিকম্পিত প্রেক্ষাপটে যা কিছু উজ্জ্বল মনে হয় সেই সব আপাত-উজ্জ্বল বস্তুর জায়গায় সুচিরকালীন অক্ষয় ভাবসত্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করো।

(স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল : পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল প্রধান প্রধান দেবদূতেরা)

মেফিস্টোফেলিস (একাকী) : যে কথা শাশ্বত সনাতন তা আমার এক এক সময় বড় ভাল লাগে। তখন আমার ইচ্ছা জাগে আমি যেন খুব ভাল ও ভদ্র হয়ে উঠি। আমার মত এক শয়তানের সঙ্গে মানুষের মত কথা বলা মহান ঈশ্বরের পক্ষে কত বড় দয়া ও মহানুভবতার কাজ তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

ট্রাজেডীর প্রথম অংশ

প্রথম দৃশ্য

রাত্রিকাল

(একটি উন্নত ধরনের ফুলবাগানের মাঝে গথিক ধাঁচের এক অপ্রশস্ত কক্ষে দেরাজের সামনে একটি চেয়ারে অশান্ত অবস্থায় উপবিষ্ট ফাউস্ট।)

ফাউস্ট : আমি দর্শনশাস্ত্র, আইনবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা পড়েছি। হায়, এমন কি বহুকষ্ট স্বীকার করে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ধর্মতত্ত্বেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছি। কিন্তু আমার এত সব অধীত জ্ঞানবিদ্যা থাকা সত্ত্বেও আজ আমি আগের মতই মূর্খ রয়ে গেছি। কখনো শাসক ও কখনো ডাক্তাররূপে আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সোজা বা বাঁকা পথে ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায়ভাবে বহু পণ্ডিতকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছি ; কিন্তু পরিশেষে শুধু এই কথাই জেনেছি যে কিছুই ঠিকভাবে জানা যায় না। উপরন্তু জ্ঞান আমার ক্ষতি সাধনই করেছে। আমার অধীত জ্ঞানবিদ্যার ফলে আমি শিক্ষক, ডাক্তার, শাসক, কেরানী ও ধর্মপ্রচারক থেকে বেশী চতুর হয়ে উঠেছি। কোন কুণ্ঠা বা সংশয় এখন আমায় আঘাত করতে পারে না। কোন নরক বা শয়তানের কোন ভয় আমাকে আর ভীত করে তুলতে পারে না। তার ফলে জীবনে কোন আনন্দই উপভোগ করতে পারছি না আমি। জগতে আমি কোন কিছুই জানার যোগ্য বলে ভাবতে পারছি না। কোন মানুষকে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা অথবা সৎপথে টেনে আনার ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকারও কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমার অধিকারে কোন জমি জায়গা বা টাকাকড়ি নেই। কোনসম্পদ ঐশ্বর্য বা সম্মান কিছুই নেই আমার। এই হীন অভিশপ্ত জীবন কোন কুকুরেও সহ্য করতে পারবে না। এই দুঃখে বর্তমানে আমি যাদু বা ইন্দ্রজাল-বিদ্যা শিক্ষা করে এই জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই, যাতে আমি আত্মতত্ত্ব ও অভূতপূর্ব এক আত্মশক্তি অধিগত করে প্রভূত বাকশক্তি অর্জন করতে পারি। যে বিষয়ে আমি কিছু জানি না সে বিষয়ে যতসব মিথ্যা অসার কথা বলে মানুষকে আর ভোলাতে চাই না আমি। বিশ্বের অন্তর্নিহিত যে নিগূঢ় নিবিড় শক্তি সব কিছুকে আবদ্ধ করে রেখেছে, যে শক্তি তার গতি-প্রকৃতিকে

পরিচালিত করছে, সেই সৃষ্টিশীল অন্তঃশায়ী শক্তির রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে চাই আমি। আর আমি যত সব শূন্য অসার কথার ফুলঝুরি ছোটাব না মুখে।

আয়ত উজ্জ্বল হে পূর্ণচন্দ্র, সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কতদিন আমার এই জানালা থেকে দেখছি তুমি ধীরে ধীরে দিগন্ত থেকে উঠে গেছ মধ্য গগনে। জানি না, তোমার রশ্মির মাধ্যমে আমার সর্বশেষ দুঃখের কথা জেনেছ কি না। হে আমার দুঃখের বন্ধু, বিষাদের সাথী, তোমার উজ্জ্বল চক্ষু কত রাতে বইএর উপর ঝুঁকে পড়া শাস্ত্রপাঠে নিবদ্ধ আবার ম্লান দেহটিকে নিরীক্ষণ করেছে। আমার এই বদ্ধ গ্রন্থজগতের বিষবাষ্প হতে নিজেকে মুক্ত করে তোমার আলোর দ্বারা পরিপ্লাবিত কোন পর্বতের অধিত্যকাপ্রদেশে যার চারদিকের পর্বতকন্দরে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়, সেইখানে আমি গিয়ে যদি এখন দাঁড়াতে পারতাম! তোমার ঝাপসা-ধূসর আলোর ঝর্ণাধারাপ্রবাহিত প্রতিটি প্রান্তরে আমি যদি ভেসে বেড়াতে পারতাম, আমি যদি সে ধারায় অবগাহন করে অভিস্নাত হতে পারতাম তাহলে সত্যিই কত আনন্দ লাভ করতাম।

হায়, আমি এখনো সেই অন্ধকার কক্ষটিতে বিরাজ করছি। সেই নীরস নিরানন্দ অট্টালিকার একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষ যার বহুবর্ণচিত্রিত কাঁচের রুদ্ধ গবাক্ষপথ দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে দিবালোকও ম্লান হয়ে যায়, যে কক্ষের ভিতরে চারদিকে স্তূপাকৃত বইগুলি উদ্ধত স্পর্ধায় কড়িকাঠটাকে স্পর্শ করে, যে কক্ষের মধ্যে সর্বত্র ছড়ানো আছে গ্লাস, বাক্স, নানা রকমের যন্ত্রপাতি আর কিছু পৈত্রিক পুরনো আমলের আসবাবপত্র। এইসব নিয়ে আমার জগৎ আর এই জগতে আমি বাস করি।

আজ আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, কেন আমার হৃদয়ে আজ এত দ্বিধা ও কুণ্ঠা, কেন আজ কতকগুলি অপার্থিব অতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনের সুতীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষণে ক্ষণে বিকম্পিত হচ্ছে সে হৃদয়? অনির্বচনীয় সে আঘাত আমার স্বচ্ছন্দ-প্রবহমান প্রাণপ্রবাহকে স্তব্ধ ও অবরুদ্ধ করে দিতে চাইছে কেন? হায়, জীবন্ত প্রকৃতির যে রাজ্যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট মানবজাতিকে সংস্থাপিত করেছেন সে রাজ্য বড় ভীষণ। ধূমায়িত বিষবাষ্পে ভরা বিদেহী মানুষ ও পশুর করোটি কঙ্কালের সে এক অদ্ভুত জগৎ।

হে আত্মা, এই দুঃসহ জগৎ থেকে পালিয়ে চল। মুক্ত আকাশের এক আয়ত উদার বিশালতায় আপন মুক্তিকে খুঁজে নাও এবং এ বিষয়ে নস্ট্রাডামাস রচিত রহস্যের বইটির সুনিবিড় সাহচর্য ও সহায়তাই যথেষ্ট

মনে করি। আমি যখন গ্রহনক্ষত্রদের গতিবিধি জানি এবং আমার ভবিষ্যৎ জীবনধারা সম্পর্কে নিয়তির কাছ থেকে নির্দেশের সন্ধান করি তখন আমি যদি মৃত আত্মাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার মনের কথা তাদের বোঝাতে পারি তাহলে এক নিগূঢ় অতিপ্রাকৃত শক্তির অত্যাশ্চর্য আলোকোচ্ছাসের চকিত উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে আমার আত্মা। কিন্তু এখানে বসে বসে শুধু ব্যর্থ চিন্তায় সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। সেই সব আত্মাদের পবিত্র প্রতীকগুলির সঙ্গে শুধু নিষ্প্রাণ অনুমানের মাধ্যমে পরিচিত হওয়াতেও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে হে আত্মারা, তোমরা আমার কাছে এস, আমার অনেক কাছে এস। যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাক তাহলে তার উত্তর দাও।

(ফাউস্ট সেই রহস্যের বই খুলে আত্মাদের লক্ষণ দেখতে পেল) হায় আমার স্বতঃ প্রবাহিত ইন্দ্রিয়চেতনাগুলিকে অতিক্রম করে সহসা এক অদম্য আবেগ কেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে আমার অন্তরে ? সহসা এক যৌবনসুলভ শক্তি অনুভব করছি আমি দেহে। আমার এ দেহের প্রতিটি শিরায় ও স্নায়ুতে অনুভব করছি এক পবিত্র পরমানন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ। তবে কি কোন দেবতা আমার বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত চিত্তের গভীরে অন্তহীন এক প্রশান্ত আনন্দকে সঞ্চারিত করে এক অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক আবেগের সুষমায় আমার সমগ্র অস্তিত্বকে রোমাঞ্চিত করে বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় শক্তির রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করছেন আমার জীবনে ? এই কি তার অভ্রান্ত অভিজ্ঞান ? তবে আমিই কি দেবতা হয়ে উঠেছি ? আমার দৃষ্টি কত স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে সহসা ! আমার দেহমনের এক অভূতপূর্ব অকৃত্রিম পবিত্রতায় আমি এক সৃষ্টিশীল শক্তির বিরাট রহস্যকে ক্রমোদ্‌ঘাটিত দেখছি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে। ধর্মসাধকদের বাণীর মর্মার্থ আজ আমি বুঝতে পারছি। তাঁরা বলতেন, রুদ্ধদ্বার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মৃত অন্তরের অধস্তন স্তরে তোমার আত্মজগৎকে সীমায়িত ও অবরুদ্ধ করে রেখো না। হে আমার প্রিয় শিষ্য, ওঠ, নূতন আশায় বুক বাঁধ। নিশাশেষে নবারুণ ঊষালোকে অভিস্নাত হয়ে নবজীবন লাভের জন্য ছুটে চল অক্লান্ত গতিতে।

(অলৌকিক অতিপ্রাকৃত লক্ষণ সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগল ফাউস্ট) কেমন সুন্দরভাবে প্রতিটি বস্তুই তার প্রতিটি অংশকে তার অন্তর্নিহিত শক্তির অংশবিশেষ দান করে আর সেই অংশগুলি কেমন চমৎকারভাবে পরস্পরে মিলেমিশে [illegible] ও কাজ করে। দেখে মনে হয় যেন অনন্ত স্বর্গীয় শক্তিপূর্ণ

এক স্বর্গপাত্র স্বর্গ থেকে মর্ত্য ও মর্ত্য থেকে স্বর্গে ক্রমাগত ওঠানামা করতে করতে বিশ্বের সকল বস্তুকেই এক স্বকীয় সামর্থ্য, মূল্য ও সঙ্গতি দান করছে। এ দৃশ্য বড়ই মহান। তবু শুধু দৃশ্য। হে অসীম বিশ্বপ্রকৃতি, আমাকে তোমার আপন করে নাও, আমাকে একাত্ম করে নাও। বিশ্বের সকল বস্তুসত্তার উজ্জ্বল উৎসস্বরূপ, কোথায় তুমি? যে উৎস হতে স্বর্গ মর্ত্যের সকল কামনা উৎসারিত হয়, যে উৎসস্থল আমাদের সকল অতৃপ্ত উচ্চাশার প্রাণকেন্দ্র সেই উৎস হতে আজ অমিত অমৃতধারা ঝরে পড়ুক আমার চিত্তে। আমার সকল ক্ষুধা তৃপ্ত হোক চিরতরে। নিবৃত্ত হোক আমার সকল প্রবৃত্তির সকাম উচ্ছ্বাস। তা না হলে বুঝব ব্যর্থ হলো আমার সকল দুঃখভোগ।

(অধৈর্য সহকারে বইএর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা অপদেবতার চিহ্ন দেখতে পেল)

এই চিহ্ন বা লক্ষণটি আমার উপর কেমন পরোক্ষভাবে কাজ করে! হে ধরিত্রীরূপী অপদেবতা, তুমি আমার আরও কাছে এস। আমার অন্তর্বৃত্তিগুলি আগের থেকে আরও সমুন্নত হয়ে উঠেছে। আরও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে আমার দৃষ্টিশক্তি। সদ্যপ্রস্তুত মদ্যপানে মত্ত ব্যক্তির মত আকস্মিক এক শক্তিতে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছি আমি। এক নূতন শক্তি অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র জগতের মুখোমুখি হবার জন্য অনুপ্রাণিত করছে আমায়। পৃথিবীর সুখদুঃখ আকর্ষণ করছে আমায় দুর্বার বেগে। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝার প্রবল আঘাত যতই ভীতি প্রদর্শন করুক না আমায় আমার জীবনতরীকে কোনদিন নিমজ্জিত করতে পারবে না তা। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার চারদিকে পুঞ্জীভূত হচ্ছে কৃষ্ণকুটিল মেঘমালা। ঢেকে ফেলছে পূর্ণচন্দ্রের সব আলোকে। সব আলো নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে। আকাশ থেকে এক ভীতিপ্রদ কুয়াশা নেমে আসছে। কার ক্রোধারুণ দৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ তীর নেমে আসছে যেন আমার উপর। এক অজানিত শঙ্কার শিহরণ আচ্ছন্ন করে ফেলছে আমার চেতনাকে। হে অপদেবতা, আমি তোমার উপস্থিতি অনুভব করছি আমার মর্মের মাঝখানে। আমি তোমাকে আবাহন করে এনেছি। এবার স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করো। হায়, আমার অন্তরে এক মৃদু অথচ মর্মভেদী আঘাতের মাধ্যমে আবার ইন্দ্রিয় চেতনাকে আলোড়িত করে তুলছে কে যেন। আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার অন্তরে এসে গেছ, নিঃশেষে আত্মসাৎ করে নিয়েছ আমার সমগ্র সত্তাকে বেশ করেছ, আমি তাই চাই। তাই চাই। তাতে এ জীবন গেলেও ক্ষতি নেই।

(বইটি ভাল করে শক্ত করে ধরে অপদেবতার নাম করতেই এক লালাভ অগ্নিশিখা সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিখার মাঝে আবির্ভূত হলো পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা অপদেবতা)

অপদেবতা : কে ডাকে আমায় ?

ফাউস্ট : (কম্পিত ও বিচলিত অবস্থায়) এ দৃশ্য সত্যিই ভয়ঙ্কর।

অপদেবতা। আমাকে তুমি দীর্ঘ দিন ধরে আকৃষ্ট করে এসেছ। আমার রাজ্য থেকে তোমার খাদ্য সংগ্রহ করেছ।

ফাউস্ট : বড় দুঃখের কথা। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না।

অপদেবতা : কিন্তু আমাকে দর্শন করার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়েছ, আমার কণ্ঠস্বর শুনতে ও আমার মুখমণ্ডল দেখতে চেয়েছ। তোমার ইচ্ছার নিবিড়তা বিচলিত করে তোলে আমায়। আমি তাই এসেছি। এতে এত বিচলিত হবার কি আছে তোমার ? তুমি না অতিমানব, ভয়ে কাঁপছ ? তোমার আত্মার সেই গর্বোদ্ধত ভাব কোথায় গেল ? কোথায় গেল তোমার সেই বুক, যে বুক নিজেই সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ ও বহন করার বড়াই করত। আমাদের মত সমস্ত দেবতা অপদেবতা সমন্বিত এমন এক বিরাট পৃথিবী গঠন করে তাকে ইচ্ছামত রূপ দিতে চেয়েছিলে যে পৃথিবীতে চির-আনন্দ বিরাজ করবে অন্তহীন প্রসারতায়। কোথায় তুমি ফাউস্ট যার কণ্ঠস্বর আমার মর্মকে ভেদ করে, যে তুমি তোমার সমস্ত শক্তির নিবিড়তা দিয়ে চাপ দিতে থাক আমার উপর। আমাদের প্রভু হতে চাও। হ্যাঁ, তুমিই সেই ফাউস্ট যে আজ আমার উপস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে আর তার সমগ্র অস্তিত্ব আমূল কেঁপে কেঁপে উঠছে সেই ভয়ে। তোমার শঙ্কাপীড়িত দেহই এ কথার প্রমাণ।

ফাউস্ট : তোমাকে মানে এই ক্ষীণ অগ্নিশিখাটুকুকে ভয় করব আমি ? হ্যাঁ, আমি ফাউস্ট, আমিই তোমার পরিচালক, তোমার প্রভু।

অপদেবতা : উত্থানপতনসংকুল বিচিত্র জীবনতরঙ্গ ও বিভিন্ন কর্মের ঝঞ্ঝা-সমন্বিত, জন্মমৃত্যুর চক্রাবর্তনে চির আবর্তিত এক বিক্ষুব্ধ বিশাল সমুদ্র চিরকাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কালের চরকায় আমি নিজের হাতে সুতো কেটে যে সব জীবনের পোষাক তৈরি করি দেবতা ও অপদেবতারা তাই পরিধান করে থাকে।

ফাউস্ট : যে তুমি সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকে থেকে আবর্তিত হচ্ছ, সেই তোমাকে কত কাছে আজ অনুভব করছি আমি।

অপদেবতাঃ তুমি আমাকে বুঝতে পারনি বা ধরতে পারনি। তুমি তোমার বোধায়ত্ত এক দেবতার মত হবার চেষ্টা করছ। (অন্তর্হিত হলো)

ফাউস্ট: (অভিভূত অবস্থায়) তোমাকে পাইনি আমি! তাহলে কে এসেছিল আমার কাছে? যে আমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই আমি তোমার মত হতে পারলাম না, তোমাকে ধরতে পারলাম না। (দরজায় করাঘাত) মৃত্যুও ভাল ছিল এর থেকে। আমি জানি—যে এসেছে সে হচ্ছে আমার প্রিয় ফেমুলাস। হায়, সৌভাগ্য লাভ করেও কোন ফল হলো না। আমি যখন আমার মধুর স্বর্গরাজ্যে পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন ছিলাম তখন এই নির্মম লোকটা আমায় বাধা দিল।

(রাত্রিকালীন টুপী ও ড্রেসিংগাউন পরিহিত অবস্থায় ওয়াগনারের প্রবেশ। ফাউস্ট অধৈর্য সহকারে মুখ ঘুরিয়ে নিল)

ওয়াগনার: ক্ষমা করো। আমি তোমার বিরক্তিসূচক চিৎকার শুনে এলাম। মনে হয় গ্রীক ট্রাজেডী পড়ছিলে। যেহেতু এইসব নাটক পাঠ করে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে সেই হেতু এ নাটক পড়তে জানা চাই। তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। আমি অনেকবার একটা কথা শুনেছি যে কোন ধর্মপ্রচারক হাস্য-রসের অভিনেতার কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারে।

ফাউস্ট: হ্যাঁ, এখন যেমন হয়েছে অর্থাৎ ধর্মযাজক নিজেই যখন হাস্যরসের অভিনেতা।

ওয়াগনার: তোমার মত যে লোক পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের মত শুধু ঘরের মধ্যে বসে বসে বই পড়ে দিনরাত, যে একমাত্র ছুটির দিন বা উৎসবের দিন চশমার ভিতর দিয়ে ছাড়া বাইরের জগৎটাকে একবারও দেখে না, সে লোক কোন মানুষকেই কিছু বোঝাতে পারবে না।

ফাউস্ট: মানুষকে বোঝানো অত সহজ কাজ নয়। মানুষকে তুমি বোঝাতে কিছুতেই পারবে না যদি না এক নিবিড় অনুভূতি তোমার অন্তরাত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে জেগে উঠে প্রশান্ত অথচ আদিম অদম্য শক্তিতে তোমার অন্তর হতে শ্রোতাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। তা না হলে তুমি শুধু অপরকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাবে চিরকাল, অপরের খাদ্যদ্রব্যের অবশিষ্ট টুকরো বৃথাই রান্না করে যাবে আর ছাইএর গাদা হতে ফু দিয়ে অনেক কষ্টে একটা ক্ষীণ শিখা জাগিয়ে তুলে শুধু কিছু শিশু আর বাঁদরকে মুগ্ধ করতে পারবে। কিন্তু

আগে তোমার অন্তর যদি অনুভূতির রসে সিক্ত ও সোচ্চার না হয়ে ওঠে তাহলে অন্তর দিয়ে অপরের অন্তরকে স্পর্শ করতে বা অনুপ্রাণিত করতে পারবে না।

ওয়াগনার: তবু বলার ভঙ্গিমার জোরে বাগ্মীরা অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করে। আমি অবশ্য এখনো সে সাফল্য লাভ করতে পারিনি।

ফাউস্ট: সে সাফল্য সৎভাবে লাভ করার চেষ্টা করো। নির্বোধের মত কাজ করো না। যথাসম্ভব কম কলাকৌশল অবলম্বন করে শুধু স্পষ্ট বুদ্ধি ও অনুভূতির দ্বারা শ্রোতাদের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবে। যদি সত্যি সত্যিই তাদের কিছু বলার জন্য গভীরভাবে আগ্রহ বোধ করো এবং শ্রোতাদের মধ্যে আগ্রহ জাগাতে পার তাহলে আর কি চাই? কিন্তু তোমার বক্তব্য বিষয় যদি জাঁকজমকপূর্ণ ও অলঙ্কার বহুল হয় তাহলে মোচড়ানো কাগজের মত তোমার সে বক্তব্য বিকৃত হয়ে যাবে। গাছের পাতাদের হাড় কাঁপিয়ে তোলা হেমন্তের কুয়াশা ভেজা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের মতই সে বক্তব্য বিষয় অবাঞ্ছিত ও অস্বস্তিকর মনে হয় শ্রোতাদের কাছে।

ওয়াগনার: হা ভগবান! জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু শিল্প অক্ষয়, চিরস্থায়ী। সমালোচক হিসাবে আমার পবিত্র কর্তব্যের খাতিরে আমি প্রায়ই দেখতে পাই আমাদের মাথার চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তি আর বুকের অনুভূতির মাঝে কোথায় যেন বড় রকমের একটা গলদ আছে। সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সত্যিই কত কঠিন। উৎসের পথে যেতে যেতে অর্ধেক রাস্তাতেই অসহায় মানুষকে তার মরদেহ ত্যাগ করতে হয়।

ফাউস্ট: তৃষ্ণার্ত শুষ্কতাই কি তোমার কাছে পবিত্র ঝর্ণাধারা বলে মনে হয় যে ধারা থেকে মাত্র এক অঞ্জলি জল পান করলেই তোমার সকল তৃষ্ণার শান্তি হবে? জেনে রাখবে, তোমার আপন আত্মা থেকে স্বতোৎসারিত কোন রসধারা ছাড়া বাইরের কোন জলধারাই তা যতই স্নিগ্ধ বা শীতল হোক না কেন, তোমার তৃষ্ণাকে যথাযথভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না।

ওয়াগনার: ক্ষমা করো আমায়, অতীতের কথা ভেবেও অনেক সময় আনন্দ পাই। যুগের আত্মার মধ্যেও অনেক আনন্দ নিহিত আছে। যখন আমরা দেখি আমাদের আগের যুগ দূর অতীতে অনেক বিজ্ঞ মুণি ঋষিরা কত ভাল কথা ভেবে গেছেন, কত বড় কাজ করে গেছেন এবং আমরা তাঁদেরই চিন্তাধারার উত্তরসাধক, তখন মনে মনে অনেক আনন্দ পাই।

ফাউস্ট: তাহলে ত তুমি দেখছি নক্ষত্রদের জগতে বিচরণ করছ। শোন বন্ধু,

যে যুগ অতীত হয়ে গেছে তা মুখবন্ধ বইএর মতই অর্থহীন। তুমি যাকে যুগের আত্মা বলছ তা হলো তোমাদের সকলের সম্মিলিত আত্মা যার মধ্যে যুগগুলি প্রতিফলিত হয়। সুতরাং যারা মনে করে যুগ গতিশীল এবং ক্রমবিলীয়মান, তারা ভুল করে। আসলে বিভিন্ন যুগে তথাকথিত মহাপুরুষেরা যে সব বড় বড় কথা বলে মানুষের মনকে নাড়া দেবার চেষ্টা করেন তা পুতুলের মুখেই শোভা পায়।

ওয়াগনার ঃ কিন্তু মানুষের অন্তরে আবেগ অনুভূতি আছে, তার মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে এবং এগুলো খারাপ জিনিস নয়। কিন্তু এসব বিষয়ে অনেকেই জানতে চায় না।

ফাউস্ট ঃ হঁ্যা, মানুষ অন্তর দিয়ে অন্তরকে জানতে চায় না, চায় শুধু গোপনতা। কেউ তার সন্তানের আসল গুণের কথা, তার প্রকৃত স্বরূপকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে চায় কি? একমাত্র যারা শুধু নির্বোধের মত সরল ও অকপট এবং যে কোন রকমের গোপনতাকে ঘৃণার চোখে দেখে তারাই আপন সন্তানের দোষের কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না। তারাই বারবার লোকের কাছে ধিকৃত হয়েছে, জ্বালাময়ী অপমানের শিকার হয়ে এসেছে চিরকাল। আমার কথা শোন বন্ধু, এখন আর না; এখন মধ্যরাত্রি। আমাদের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হওয়া উচিত।

ওয়াগনার ঃ তোমার কথা শুনে আমি খুশি হতাম যদি আমাদের এই মনোজ্ঞ আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে পারতাম। আগামী কাল ঈস্টারের ছুটি আছে। তোমার আপত্তি না থাকলে এ বিষয় ও আরো কিছু বিষয় আলোচনা করা যাবে। বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে আমি বিদ্যা অর্জন করতে চাই। যদিও আমি অনেক কিছুই জানি তথাপি আমি আরো অনেক কিছু জানতে চাই এবং জ্ঞানার্জন সম্পর্কে আমার উচ্চাভিলাষের অন্ত নেই। (প্রস্থান)

ফাউস্ট ঃ (একা) আমাদের মস্তিষ্ক কখনো কোন অবস্থাতেই আশা ছাড়ে না। তবে সে মস্তিষ্কের প্রবলতার স্রোত চিরকাল অগভীর তুচ্ছ বস্তুর প্রতিই প্রবাহিত হয়ে থাকে। সেই অগভীর তুচ্ছ বস্তুর গভীরে কোন সোনার খনি আবিষ্কারের এক দুর্মর আশায় আর অপরিসীম আগ্রহের সঙ্গে আমাদের মন যেন মাটি খুঁড়ে চলে। এমন মানুষ পৃথিবীতে কি কেউ নেই যার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর আমার সম্মুখস্থিত এই অতিপ্রাকৃত অপদেবতার অবাঞ্ছিত উপস্থিতির অশুভ প্রতিক্রিয়ার মাঝে বিঘ্ন ঘটাতে পারে? যদি এমন কেউ থাকে তাহলে সে

সর্বাপেক্ষা দরিদ্র ও নির্বোধ ব্যক্তি হলেও আমি তাকে অজস্র ধন্যবাদে ভূষিত করব। কারণ তাহলে এক নিদারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা হতে উদ্ধার পাব আমি। যে অপদেবতা তার দৈত্যসুলভ বিরাট ছায়াবয়ব নিয়ে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়চেতনাকে অভিভূত করে দিয়েছে, আমার আত্মার সমস্ত ক্রিয়াশীলতাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে সেই অপদেবতার হাত থেকে আমাকে মুক্ত করবে সেই মানবিক কণ্ঠস্বর।

যে আমি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, যে ভাবে চিরন্তন সত্যের সন্ধান সে পেয়ে গেছে, যে ভাবে স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রদীপ্ত স্বচ্ছতা আর স্বর্গীয় আলোর সুবিরল সুষমায় অন্তরাত্মা তার স্বতোদ্‌ভাসিত, আপন মদমত্ততার আতিশয্যে পৃথিবীর অন্য সব মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করত, সে ভাবত চেরাবের থেকে সে বেশী শক্তিধর। যে সামান্য মানুষ হয়েও তার মানবিক সীমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে এই মর্ত্যভূমির মাঝে থেকেই ঐশ্বরিক জীবন যাপন করতে চেয়েছিল, সেই আমির আজ অবস্থা দেখ। শুধু এক অপদেবতার বজ্রগম্ভীর একটি শব্দ আমার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কেন্দ্রচ্যুত করছে।

আজ আমি নিজেকে তুলনা করতে সাহস পাচ্ছি না। যদিও তোমাকে আকর্ষণ করা ও কাছে টানার মত প্রভূত ক্ষমতা আমার হাতে ছিল তথাপি তোমাকে আমার কাছে রেখে দেওয়ার ক্ষমতা আমার হাতে শেষ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। যখন সেই আবেগঘন মুহূর্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আবার, নিজেকে একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মহান বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু তুমি আমাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ মানবজীবনের অনিশ্চিত ভাগ্যের কঠিন ভূমির উপর নিক্ষেপ করেছিলে। কী আমি বর্জন করব? কার নির্দেশ আমি মেনে চলব? আমি কি সেই দুঃখ আর দ্বন্দ্বের জীবন মেনে নেব? শুধু আমাদের মত সব দুঃখ নয়, আমাদের যে কোন কর্মই আমাদের জীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে তোলে। যখনই আমাদের মন কোন মহৎ ও সুন্দর বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয় তখনি কোথা হতে সম্পূর্ণ বিরূপ বিপ্রতীপ এক ভাবসত্তা সে মনের অখণ্ডতাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করে তার গতিবেগকে প্রতিহত করে দেয়। যখনই এ জগতে আমরা ভাল কিছু লাভ করতে যাই তখনি আরো ভাল কিছুর প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে এইভাবে আমাদের জীবনের সব শুভ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়। যে সূক্ষ্ম সুকুমার আবেগানুভূতি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ক্রমোন্নতির পথে নিয়ে যায় সেই সব আবেগানুভূতি প্রায়ই

পার্থিব উন্মত্ততার অসংখ্য কলরবের স্তূপান্তরালে এক হিমশীতল স্তব্ধতায় মূক হয়ে থাকে। আমাদের আশান্বিত কল্পনা যদি এক স্পর্ধিত কামনার অনন্ত-প্রসারিত উচ্ছ্বাসে ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে চায় তাহলে সে বাস্তব অবস্থার সীমায়িত বন্ধন ও বেষ্টনীকে অতিক্রম করতে পারে না কখনো। কালের দুর্বার স্রোত অনেক মানুষের ভাগ্যকেই ব্যর্থতার চরায় ফেলে দিয়ে যায় ও আটকে দিয়ে যায়। আসলে সকল মানুষের অন্তরের তলদেশে বিরাজ করছে অন্তহীন অবিচ্ছিন্ন দুঃখ। না পাওয়ার এক গোপন বেদনা নীরবে কাজ করে চলেছে সব অন্তরের মধ্যে। আশাহত কল্পনার পৌনপুনিক আঘাতে অস্থির ও চঞ্চল হয়ে ওঠে আমাদের জীবন। সমস্ত আনন্দ, আরাম ও বিরাম হতে বিচ্যুত হয়ে একই জীবন বিচিত্র রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন জীব বা জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়! একই জীবন কখনো পত্নী, কখনো পুত্র, কখনো পথ, কখনো ঘর, কখনো তরল, কখনো কঠিন, কখনো জল, কখনো অগ্নি প্রভৃতি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। যে আঘাত আমরা কখনো অনুভব করি না সে আঘাতের কল্পনা করে ভীত হয়ে পড়ি অনেক সময়। যে বস্তু আমরা কখনো হারাই না তার জন্যও শোক প্রকাশ করে থাকি অনেক সময়। আমি দেবতাদের মত নই—এই সত্যটি নিবিড়ভাবে অনুভব করি আমি। আমার শুধু এই কথাটি মনে হয় যে আমি পথের ধূলির মধ্যে বসবাসকারী এক ক্ষুদ্র জীব। পথের ধূলির মধ্য হতেই আমার খাদ্য আহরণ করে জীবন ধারণ করি আমি এবং একদিন কোন পথচারীর পদচাপেই নিষ্পেষিত হবে আমার দেহ। ধূলিরাশির মধ্যেই অকালে সমাধিলাভ করব আমি।

আমার এই ধূলিমলিন পার্থিব দেহসত্তার প্রাচীরবেষ্টনী আর তার অসংখ্য স্তরভেদ বাস্তব জগৎ ও জীবনের বিচিত্র ঐশ্বর্য ও অলংকৃত বাগবিন্যাসের অর্থহীন জৌলুস আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত করে চলেছে। সেই অন্তরাত্মার মুক্তির ব্যাপারে আমি কোন শাস্ত্রপাঠ বা পুঁথিগত বিদ্যালাভ হতে সাহায্য পাব? অসংখ্য বই পড়ে আমি কি শুধু এই শিক্ষাই পাব না যে এই পৃথিবীর সর্বত্র আত্মনিপীড়িত মানুষের হৃদয় হতে রক্ত ঝরছে? হয়ত কোন অজ্ঞাত নির্জনে দুই একজন সুখী মানুষ নির্বিঘ্নে দিনাতিপাত করছে। বোকার মত হাসছে কেন? তুমি আমি—আমরা সবাই নির্বোধ; অসার অনুর্বর আমাদের মস্তিষ্ক। জেনে রেখো, আমার মত তোমার মস্তিষ্কও অসচ্ছম্লান দর্পণের মত আলোকদীপ্ত এক উজ্জ্বল দিবসের জন্য মুহূর্ত গণনা করে করে

পরিশেষে ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে গোধূলির প্রায়ান্ধকার ধূসরতার দ্বারাই আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সত্যের প্রতি তার পিপাসা তীব্র হলেও মিথ্যার প্রতি তার অধোগমন অব্যাহত রয়েছে।

হে যন্ত্রসমূহ, তোমরা তোমাদের অদ্ভুত আকৃতি ও বিচিত্র রূপ নিয়ে আমাকে যে বিদ্রূপ করছ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অনেক কষ্টে আমার গন্তব্যস্থল এক বিরাট সৌধের দ্বারদেশের সন্ধান পেয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রবেশ করতে পারিনি তার মধ্যে। হায় চাবি, তুমি ব্যর্থ হয়েছ। তুমি কোন সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা কৌশলে নির্মিত হলেও আমার সম্মুখস্থ সেই রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটিত করতে পারনি। তোমার যান্ত্রিক শক্তির সমস্ত ক্রিয়াশীলতা এই স্পষ্ট দিবালোকেও উদ্ঘাটিত করতে পারেনি সেই রুদ্ধদ্বারের রহস্যকে। আমাদের সকল চিৎকার ও তর্জনগর্জন সত্ত্বেও প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপ ও শক্তি এইভাবে অবগুণ্ঠিত ও রহস্যাবৃত হয়ে থাকে আমাদের কাছে। প্রকৃতি তার অন্তর্নিহিত কোন রহস্য যদি স্বেচ্ছায় নিজে থেকে উদ্ঘাটিত না করে তাহলে কোন জটিল যন্ত্রশক্তিই তা করতে পারে না। হাতুরী দিয়ে পিটিয়ে বা স্ক্রু ঢুকিয়ে সে রহস্য উদ্ঘাটিত করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। হে প্রাচীন যন্ত্রসমূহ, এক আমার পিতা তোমাদের ব্যবহার করতেন। তারপর হতে তোমরা অব্যবহৃতই রয়ে গেছ, কারণ আমি তোমাদের ব্যবহার জানি না। আজ এই অস্পষ্ট দীপালোকে আমার দেরাজের উপর অবস্থিত তোমাদের অবয়বগুলিকে বড় বিবর্ণ মনে হচ্ছে আমার। আমি এখন স্বীকার করছি, এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার থেকে আমি যদি আলস্য সহকারে জীবন যাপন করতাম তাহলে অনেক ভাল হত। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন বিদ্যা না শিখলে তা আয়ত্ত করতে পারা যায় না। আর কোন যন্ত্রের প্রয়োগ না হলে তা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য সাময়িক প্রয়োজনই মানুষকে কোন যন্ত্রপ্রয়োগে বাধ্য করে। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে কোন যন্ত্রের যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা।

কিন্তু সহসা আমার দৃষ্টি ওদিকে নিবদ্ধ হলো কেন? ঐ ফ্লাস্ক বা জলপাত্রটি চুম্বকের মত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে কেন? চন্দ্রালোকদীপ্ত নৈশ বনভূমির মত আমার অন্ধকার গৃহাভ্যন্তর সহসা আলোকিত হয়ে উঠল কেন?

হে বিরল বিস্ময়কর জলপাত্র, তোমাকে স্বাগত জানাই। তোমাকে পরীক্ষা

করার অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করলাম তোমাকে। তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি মানুষের বুদ্ধি ও কলাকৌশলের মিলিত পরিচয়। তুমি হচ্ছ মানুষের সুখনিদ্রার সুমধুর রসনির্যাস। তার ভয়ঙ্করসুন্দর শক্তির সার তুমি। তোমার প্রভুর কাছে অকপটে তোমার প্রকৃত গুণের পরিচয় দাও। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ঘটছে। তোমাকে হস্তে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ঘটছে নিঃশেষিত অবসান। আমার অন্তরের বিক্ষোভের জোয়ারে ভাটা পড়ছে। এক বিশাল মহাসমুদ্রের উপর পাখা মেলে যতই উড়ে চলেছে আমার স্বপ্ন ততই মনে হচ্ছে অসংখ্য আলোর ঢেউ উচ্ছলিত হয়ে উঠছে আমার পদতলে। ততই মনে হচ্ছে সেই সব আলোর ঢেউগুলো যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে দূরস্থিত এক নূতন তটভূমির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আমার।

আজ উজ্জ্বল বাতাসে ভর দিয়ে এক আগ্নেয় রথ আমার কাছে এসে পড়েছে। আমি সেই রথে চেপে সুদূর আকাশমণ্ডলের কত অজানা স্তর ভেদ করে এক নূতন কর্মলোকে গিয়ে উপনীত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছি। দেবতা-সুলভ এক উচ্চাভিলাষের দ্বারা যখন আমার প্রাণমন স্পন্দিত, ঊর্ধায়িত এক মহান অস্তিত্বে আমি যখন উন্নীত হতে চলেছি তখন আমি সামান্য এক কীটের মত কোন পথচারীর দ্বারা পদদলিত হতে পারি না। উজ্জ্বলতর ও সুদূরতর কোন আলোর জগতে যাবার জন্য আমি পৃথিবীর সূর্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি। এ বিষয়ে আমি কৃতসংকল্প। আজ একথা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করার সময় এসেছে যে আমি মানুষ হয়েও নিজেকে উন্নীত করে মানব জগতের বহু-আকাঙ্খিত স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটন করতে পারি। আমি দেখিয়ে দিতে পারি মানুষও তার যোগ্যতার দ্বারা দেবতার স্তরে উন্নীত হয়ে দেবতাদের মত সম-মর্যাদা লাভ করতে পারে। মানবলোক ও দেবলোকের মধ্যে অন্ধকার যে অন্তহীন শূন্যতা চিরবিদ্যমান, যার চারদিকে প্রজ্জ্বলিত নরকাগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধায়িত হয়ে ওঠে প্রতিনিয়ত, সে শূন্যতার ব্যবধান অতিক্রম করার জন্য মানুষের কল্পনা এক নিষ্ফল বেদনায় সংগ্রাম করে আসছে চিরকাল। আমি কিন্তু ভীত হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসব না। যদিও জানি এর পরিণামে এক নঞর্থক শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই তথাপি আমি সানন্দে এ সিদ্ধান্ত এ সংকল্প গ্রহণ করেছি।

হে আমার স্ফটিকস্বচ্ছ পানপাত্র, তুমি যেন বহু যুগের ওপার হতে উঠে

আসছ আমার কাছে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে বহু দিনের বহু বিস্মৃত কথা উঠে আসছে আমার মনে। সুদূর অতীতে একদিন তুমি আমার পূর্বপুরুষদের কত ভোজসভা উজ্জ্বল করে তুলতে। কত গণ্যমান্য অতিথিদের প্রীত করতে তুমি। তুমি তখন এক হাত হতে অন্য হাতে ফিরতে। সেই সব নৈশভোজসভায় কত ধনী ও সুদক্ষ ব্যক্তি তোমাকে পেয়ে মত্ত হয়ে উঠত। অনেক সময় আমি এক চুমুকে একটি পূর্ণ পাত্র নিঃশেষিত করতাম। আবার অনেক সময় নিজে না খেয়ে একটি পাত্র অপরের হাতে তুলে দিতাম। আমার যৌবনকালের সেই সব আনন্দোচ্ছল উৎসবরজনীর কত স্মৃতি ছন্দোবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসছে আমার মন থেকে। আর কিন্তু কখনো তোমায় কোন ভোজসভায় আমার পার্শ্ববর্তী কোন অতিথির হাতে তোমায় তুলে দেব না। তোমার গর্ভনিহিত সমস্ত মদ্য পান করেও কিভাবে আমার চেতনা ও বুদ্ধি অক্ষত থাকে তার পরীক্ষা আর কোনদিন করব না। আজ তোমার স্ফটিকস্বচ্ছ গর্ভে বাদামী রঙের যে রসমাধুরী বিরাজ করছে তা পান করার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত নিদ্রা নেমে আসে চোখে। আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে রসমাধুরী নিঃশেষে পান করতে চাই। তারপর সুগভীর সুখনিদ্রায় নিবিড় নিশাকাল যাপন করে এক উজ্জ্বল প্রভাতকে বরণ করে নিতে চাই আমি। (পানপাত্রটি মুখের কাছে নিয়ে গেল)

(মৃদু ঘণ্টাধ্বনি ও সমবেত সঙ্গীত)

দেবদূতদের সমবেত গান

খৃস্টের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে
সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এ এক বিপুল আনন্দের কারণ।
অসংখ্য প্রয়োজনের বন্ধনে
খৃস্টকে নূতন করে আবদ্ধ করতে চাইছে
অযোগ্য মানুষ।

ফাউস্ট : আমার ওষ্ঠাধরের সঙ্গে পানপাত্রের মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই কিসের এক মৃদুমধুর গুঞ্জনধ্বনি চমকিত করে তুলছে আমায়। তবে কি এ ধ্বনির মধ্যে খৃস্টের জন্মমুহূর্ত ঘোষণাকারী সানন্দ ঘণ্টাধ্বনিই ঘোষিত হয়ে উঠছে নূতন রূপে ? হে অস্ফুট সঙ্গীত, খৃস্টের মৃত্যুর পর সারা রাত্রিব্যাপী দেবদূতদের কণ্ঠ-নিঃসৃত সান্ত্বনার বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল স্বর্গ মর্ত্যের আকাশে বাতাসে। ঈশ্বরের নূতন আদেশবিধৃত যে দৈববাণী বারবার ঘোষিত হয়েছিল, তোমার মধ্যে আজ কি সেই বাণীই ধ্বনিত হয়ে উঠছে বারবার ?

নারীদের সমবেত গান

মূল্যবান ওষধি আর মশলা দিয়ে প্রলেপ তৈরি করে
লাগিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর ক্ষতস্থানে।
যথাযোগ্য শ্রদ্ধা আর সম্মানের সঙ্গে
তাঁকে আমরা শুইয়ে দিয়েছিলাম।
পরিস্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম ক্ষতগুলি।
কিন্তু পরিশেষে চোখ মেলে দেখলাম
খৃস্ট নেই; আমাদের এতগুলি চক্ষের
প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর দেহাবয়ব।

দেবদূতদের সমবেত গান

পুনরভ্যুত্থিত হয়েছেন খৃস্ট
পরম স্বর্গীয় সুখে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর নবজীবন।
যে দুঃখকষ্টে একদিন তিনি প্রপীড়িত হন,
যে অপমানে একদিন তিনি অপমানিত হন,
যে পরীক্ষায় একদিন তিনি পরীক্ষিত হন,
আজ তার সব কিছুর অবসান ঘটেছে
এক অভিনব গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর দেহ।

ফাউস্ট: স্বর্গলোকাগত হে শান্ত অথচ বলিষ্ঠ শব্দসুষমা, কেন তুমি এই ধূলিমলিন জগতে এসে আমাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছ? তার থেকে বরং তুমি আমার থেকে দুর্বলমনা ব্যক্তিদের কাছে যাও। তোমার অন্তর্নিহিত সুরময় বাণী আমি শুনেছি। কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস হতে দৈববাণীর প্রতি এক ঐন্দ্রজালিক আসক্তি ও ভক্তির জন্ম হয় সে ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বর আমাকে দেয়নি। যেখান হতে উৎসারিত হচ্ছে এই পরমানন্দ-অভিনিষ্যন্দী বাণী সেই স্বর্গলোকে আমি উঠে যেতে চাই না। তথাপি আমার সুদূর শৈশবকাল হতে আমি এ বাণী এ গান শুনে আসছি। আজ আমার সেই গান সেই বাণী আনুগত্যের এক নূতন দাবি নিয়ে এসেছে আমার জীবনে।

আজও আমার মনে আছে অতীতে কোন এক ছুটির দিনে সহসা এক স্বর্গীয় প্রেমের এক উত্তপ্ত চুম্বন নেমে আসে আমার ললাটদেশে। এক পবিত্র ধর্মভাবের আভাসে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমার অন্তর। কোথা হতে ভেসে আসা চার্চের মৃদু ঘণ্টাধ্বনিসমন্বিত প্রার্থনার অশ্রুত সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে

ওঠে আমার কর্ণকুহরে। এক পরম স্বর্গীয় সুখানুভূতির অতলে নিঃশেষে বিগলিত হয়ে যায় আমার সমগ্র অন্তরসত্তা। এক মধুর অথচ দুর্বোধ্য ব্যাকুলতায় মদাবেশাকুলা অরণ্যপ্রান্তরচারিণী বনহরিণীর মত লঘু হয়ে ওঠে আমার পদযুগল। অজস্র অশ্রুবিন্দুর তপ্ত জ্বালা সত্ত্বেও আমার মনে হলো স্তবকিত আশা ও আনন্দের অমিত ঐশ্বর্যভারে সজ্জিত এক বিরাট পৃথিবী প্রতীক্ষায় রয়েছে আমার জন্য।

আমার যৌবনে এই গান একদিন আনত বসন্তের আনন্দোচ্ছ্বাস। কিন্তু আজ সে সব কথা মনে পড়লে মনে হয় শিশুসুলভ এক বাতুলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম তখন আমি। স্থিতপ্রজ্ঞ এই পরিণত বয়সে সে পথ থেকে ফিরে এসেছি। হে স্বর্গসুধাসিক্ত সুমধুর দৈববাণী, তুমি গীত হয়ে চল এমনি করে অবিরাম। তোমার অন্তর্নিহিত গীতিরসসুধাপানে চোখে জল আসছে আমার। তবু তোমাকে সহজ বিশ্বাসের দ্বারা বরণ করে নিতে পারছি না। আমি মাটির পৃথিবীর সন্তান। আমার সেই কল্পলোকবিহারিণী সুউচ্চ স্বর্গসুখদ্বার হতে আমি আমার পৃথিবীমাতার মাটির কোলেই ফিরে এসেছি আবার।

শিষ্যগণের গান

শূন্যবদ্ধ সমাধিগহ্বর হতে তিনি কি
উঠে এসেছেন পুনরুজ্জীবিত হয়ে ?
পুনরায় কি সমাসীন হয়েছেন তিনি
পূর্ণ গৌরবের আয়ত উন্নত আসনে ?
পুনর্জন্মের গৌরবে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
কি তাঁর এই অপ্রত্যাশিত নবজীবন ?
কিন্তু আমরা এই মর্ত্যভূমির অধিবাসী
তাঁর দর্শনাভিলাষী একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর হয়েও
কেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না ?
দেখা দাও হে প্রভু। আমরা কাঁদছি।
আমাদের অশ্রুসজল এই সকাতর প্রার্থনায় সাড়া দাও।
তোমার সন্দর্শনসুধাদানে ধন্য করো আমাদের।

দেবদূতদের গান

সমস্ত নরকের পাপ আর দুর্নীতির গর্ভ
বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এসে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন খৃস্ট।

যতসব অবিশ্বাস আর সঙ্কীর্ণতার কারাগার ভেঙে
বেরিয়ে এস তোমরা।
স্বার্থসম্পৃক্ত আত্মার দূষিত গুহা থেকে তোমরাও বেরিয়ে এস।
দীর্ণ বিদীর্ণ করে ফেল সমস্ত অন্ধকার।
দিকে দিগন্তে অনন্ত প্রসারিত হয়ে উঠেছে যে বিপুল আলোকতরঙ্গ
তাতে অবগাহন করো, অভিস্নাত হও।
খৃস্টের প্রশস্তি গান করো।
অখণ্ড অন্তরের অনন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে কামনা করো
সেই প্রেমঘন মূর্তিকে।
ভাইএর মত তার হাত ধরে খাওয়াও।
তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে তাঁর বাণী প্রচার করো।
মনে রেখো, আমাদের প্রভু এইখানেই আছেন
আমাদের কাছেই আছেন।

২য় দৃশ্য

নগরদ্বারের সম্মুখস্থ স্থান

(বিভিন্ন শ্রেণীর পথচারীদের আগমন)

কয়েকজন শিক্ষানবিশী : ওদিকে যাচ্ছ কেন তোমরা?

অন্যান্যরা : আজ আমরা শিকারীর বাসভবনের দিকে যাচ্ছি।

অন্যান্যদের মধ্যে একজন : আমরা অদূরবর্তী ঐ নিচু জায়গায় অবস্থিত একটা কারখানায় যাচ্ছি।

প্রথম শিক্ষানবিশী : আমার মতে ট্রাভার্ণ নদীতে তোমাদের যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় শিক্ষানবিশী : কিন্তু যাই হোক, পথটা ভাল নয়।

অন্যান্যরা : কিন্তু তোমরা কোথায় যাবে?

তৃতীয় শিক্ষানবিশী : সবাই যেখানে যায় আমিও সেইখানে যাব।

চতুর্থ শিক্ষানবিশী : বার্গডর্ফ পর্যন্ত যাবে? সেখানে গেলে প্রচুর আনন্দের খোরাক পাবে। কত উৎকৃষ্ট মদ আর সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে পাবে সেখানে। কত হাসিঠাট্টার উপকরণ যে আছে! আমার কথা বিশ্বাস করো।

পঞ্চম শিক্ষানবিশী: তোমার গোপন কথা কি আবার ফাঁস করে ফেলতে চাও? এই নিয়ে তিনবার হলো। খুব হয়েছে। আর বড়াই বা বাহাদুরি করতে হবে না। আমি আর সেখানে যাব না। ও সব হাসিঠাট্টা আর ভাল লাগে না আমার।

তরুণী ভৃত্য: না না, আবার শহরে ফিরে যাব।

অন্য তরুণী: নিশ্চয় আমরা তাকে ঐ সব পপলার গাছের পাশে পাব।

প্রথম তরুণী: তাতে আমার কোন সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে না, তা আমি বেশ জানি। তুমি তাকে পাবে এবং তারই সঙ্গে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে। তুমি হবে তারই নৃত্যের সহচরী কিন্তু তাতে আমার কি যায় আসে?

অন্য তরুণী: সে নিশ্চয় একা নেই আজ। আমি তাকে বলতে শুনেছিলাম তার সঙ্গে থাকবে কোন কুঞ্চিতকেশা তরুণী।

জনৈক ছাত্র: হা ভগবান, মেয়েগুলো কেমন হাঁটছে দেখ। আমরা তাদের বসে বসে দেখব। পুরনো কড়া মদ আর একটা পাইপ যদি পাই তাহলে রবিবারের উজ্জ্বল পোষাকপরিহিতা এই সব মেয়েদের দেখে বড় মজা পাই আমি।

জনৈক ভদ্র নগরবাসীর কন্যা: ঐ সব সুন্দর যুবকগুলোর কাণ্ড দেখ। আমি বলছি, সমাজে যখন ভদ্র পরিবারের মেয়েরা রয়েছে তখন ঐ সব নিম্ন-শ্রেণীর দাসী মেয়েদের পিছনে ছোটা ওদের পক্ষে সত্যিই লজ্জাজনক ব্যাপার।

দ্বিতীয় ছাত্র (প্রথম ছাত্রের উদ্দেশ্যে): এত তাড়াতাড়ি যেও না বাছা! একজন সামনে, আর দুজন পিছনে। কী চমৎকার ঝকঝকে পোষাক পরেছে দেখ। ওদের মধ্যে একজন আমার প্রতিবেশিনী দেখছি। ও আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছে। তারা কোন দিকে না তাকিয়ে এক কৃত্রিম ঔদাসিন্যে আত্মলীন হয়ে এগিয়ে চলেছে। তবু তারা আমাদের নিবেদিত প্রেমকে স্বীকার করে নেবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

প্রথম ছাত্র: না ভাই। তাদের গতিবিধি আমার কিন্তু ভাল লাগছে না। তাড়াতাড়ি করো। তা না হলে ওরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় চলে যাবে। শনিবারে তাদের যে হাত সম্মার্জনী ধারণ করে গৃহমার্জনা করে রবিবার সেই হাতই আদর প্রভৃতি নানারূপ শৃঙ্গারকার্যে থাকবে ব্যাপৃত।

জনৈক নাগরিক: নূতন পৌরপতিকে আমার ত মোটেই ভাল লাগে না। উনি ওঁর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে কোন কাজ হয়নি। ওঁর

অহঙ্কার শুধু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। উনি আসার পর আমাদের শহরের কি কোন উপকার বা উন্নতি হয়েছে? উন্নতি ত দূরের কথা শহরের অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। উনি শুধু আমাদের কাছ থেকে আগের থেকে আরো বেশী করে আনুগত্য আর কর চাইছেন আর আমরা তা অকাতরে দিচ্ছি।

ভিক্ষুকের গান: হে ভদ্রমহোদয়গণ এবং সুন্দরী নারীগণ! আপনাদের মুখমণ্ডল কত সুন্দর, আপনাদের পোষাক কত সুন্দর। একবার আমার দিকে তাকান। দেখুন আমার পক্ষে আপনাদের সাহায্য কতখানি প্রয়োজনীয়। আপনারা ইচ্ছা করলেই আমার দুঃখ দুর্দশার অনেকখানি লাঘব করতে পারেন। আপনাদের নিকট আমার আবেদন যেন ব্যর্থ না হয়। দেখবেন দানেতেই আছে প্রকৃত আনন্দ। আজ ছুটির দিন আপনারা যদি একটু দয়া করেন তাহলে সেটা আমার পক্ষে সত্যিই লাভজনক হবে।

অন্য একজন নাগরিক: রবিবার আমার মোটেই ভাল লাগে না। শুধু যুদ্ধের গল্প আর গল্প। সুদূর তুরস্কের কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, পৃথিবীর আর কোথায় কারা যুদ্ধ করছে, ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বন্ধুদের সঙ্গে মদের গ্লাস হাতে বসে বসে শুধু সেই গল্প করে সময় কাটাতে হয়। আর মাঝে মাঝে নদীর উপর দিয়ে নিঃশব্দে যে সব জাহাজ চলে যায় তা দেখা। তারপর রাত্রিতে বাড়ি ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়া।

তৃতীয় নাগরিক: হে আমার প্রিয় প্রতিবেশী, আমার মতও তাই। মাথা খারাপ ওদের সুবুদ্ধি সুমতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে রিপুপরবশ হয়ে ওরা যা করে করুক। ওদের তাই করতে দাও। আমরা কিন্তু প্রাচীন প্রথাগত রীতিনীতিকেই মেনে চলব।

জনৈক বৃদ্ধা (ভদ্রনাগরিকের কন্যার প্রতি): হা ভগবান! কী চমৎকার! যেমন দেহভরা যৌবন তেমনি লাবণ্য উপচে পড়ছে। তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় দিয়ে দেবে না এমন কে আছে? তবে অত দর্প আর মেজাজ দেখিও না। আমি অবশ্য কোন কথা বলব না। তুমি যা চাইবে আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

নাগরিকের কন্যা: এস আগাথা! ওই ডাইনি বুড়ীর কাছ থেকে আমি সরে যেতে চাই। সকলের সামনে ওর কাছে থাকলে আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা হবে লোকের মনে। ও অবশ্য সেই সেণ্ট এ্যাণ্ড্রু রাত্রিতে

আমার ভাবী প্রণয়ীকে দেখিয়েছিল।

অন্য তরুণী: আমারও ভাবী প্রণয়ীকে দেখিয়েছিল ও। পরিষ্কারভাবে। কয়েকজনের মধ্যে একটি যুবক সৈনিক ছিল। সেই সৈনিকই আমার প্রণয়ী। আমি তাকে তার পর থেকে সর্বত্র খুঁজে চলেছি, কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না।

সৈনিকরা: সুউচ্চ প্রাকার ও চূড়াসহ কত সৌধমালা ও কত সুন্দরী কুমারী আমাদের করতলগত হবে। আমরা যদি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাই তাহলে তার যথাযোগ্য পুরস্কার পাবই। সুতরাং হে যুবকগণ, তোমাদের আহ্বান করে দিকে দিকে জয়ঢাক নিনাদিত হোক। তার ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা জীবনের যত সব ভোগসুখ ও পরিশেষে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাও। আমাদের বিক্ষুব্ধ জীবনে এই ভোগসুখই হলো একমাত্র সান্ত্বনা। সুন্দরী ললনা আর সৌধাবলী লাভ করার জন্য সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চল। পুরস্কার একদিন পাবেই। সৈনিকরা এইভাবেই চিরকাল এগিয়ে যায় তাদের আপন আপন জীবনে।

ফাউস্ট ও ওয়াগনার: উদার বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন বরফের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নদী প্রস্রবণগুলি ছুটে চলেছে সমতলভূমির পানে! নূতন আশার রঙে রঙীন হয়ে উঠেছে উপত্যকাগুলি। দুর্বল শৈত্যরাজ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিঃসঙ্গ নির্জন পর্বতচূড়ায় গিয়ে মুকুটহীন সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। তবে পশ্চাদ্ধাবনকালে সে মাঝে মাঝে কয়েক পশলা নিষ্ফল বৃষ্টি আর কিছু মেঘান্ধকার দ্বারা ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে সবুজ সমতল ভূমিগুলিকে। সূর্যকিরণ ক্রমশঃ প্রখর হয়ে ওঠায় তুষারপাত বন্ধ হয়ে যায়। দিকে দিকে অব্যাহত ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে যত সব সৃষ্টি আর অগ্রগতির স্রোত। সূর্যের সুপ্তগুপ্ত ইচ্ছায় রঙে রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সমগ্র জগৎ। নীল, হলুদ, লাল প্রভৃতি রঙ বেরঙের কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

এবার প্রকৃতিজগৎ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নগরের দিকে একবার তাকাও। বিচিত্র রঙের পোষাক পরে আনন্দোচ্ছল নরনারীরা তাদের রুদ্ধদ্বার গৃহান্ধকার হতে বেরিয়ে এসেছে। তাদের ভগবান যীশুর পুনরভ্যুত্থানের দিনটি আনন্দের সঙ্গে উদ্‌যাপন করছে তারা। তারা যেন নিজেদের মধ্যেও অনুভব করছে নব-জীবনের এক উন্মাদনা। অন্ধকার গলি আর সংকীর্ণ গৃহকোণের বন্ধন, দারিদ্র্যের পীড়ন, কর্মের তীব্রতা আর স্তব্ধগম্ভীর ধর্মীয় পরিবেশ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে তারা যেন নবজীবন লাভ করেছে। চারদিকে মাঠে প্রান্তরে বাগানে

নদীবক্ষে নৌকারোহণে অসংখ্য নরনারী নবজীবনের অদম্য উন্মাদনার উচ্ছসিত আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীতে ছোট ছোট ডিঙি নৌকোগুলো যাত্রীদের ভারে ডুবতে বসেছে। দূরে ঐ পাহাড়ী পথে বিচিত্র রঙের পোষাক পরিহিত লোক যাচ্ছে। আমি দূর গ্রাম থেকে কলরবের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আজ যেন স্বর্গ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। উচ্চ নীচ সকল ব্যক্তি সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে খুশিতে।

ওয়াগনার : স্যার ডক্টর, আপনার সাহচর্য ও সঙ্গলাভ আমার পক্ষে সত্যিই সম্মানজনক এবং লাভজনক। কিন্তু এই সব অগভীর বিষয়ে কোন আলোচনা করতে আমি চাই না। কারণ যা কিছু স্থূল তার প্রতিই বিতৃষ্ণা জাগে আমার মনে। সাধারণ মানুষের এই উল্লসিত কলরব এই আনন্দোন্মত্ততাকে আমি ঘৃণা করি। তারা যাকে আমোদপ্রমোদ বা গান বলছে তা হলো মত্ততাজনিত এক ক্রীড়া আসলে যা শয়তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

লিন্‌ডেন গাছের তলায় একদল কৃষক

(নাচগান)

লাল ফিতে, ফুলের মালা আর মজার পোষাক পরে
গ্রামের যত সব রাখাল বালক বালিকারা
নাচতে এসেছে এই গাছের তলায়।
এই লিন্‌ডেন গাছের চারদিকে
উন্মত্ত চরণক্ষেপে নৃত্য শুরু করার জন্য
প্রস্তুত হয়ে উঠেছে একযোগে।
হুররে! কী মজা!
নাচিয়েদের মধ্য থেকে এক তরুণ যুবক
সহসা বেরিয়ে এসে দর্শকদের মধ্য থেকে
এক কুমারীকে ধরে বগলদাবা করে নিয়ে গেল।
মেয়েটি দর্শকদের মধ্যে থেকে নাচ দেখছিল।
মেয়েটি তখন তাকে বলল, তুমি একটি মাথামোটা ছেলে।
হুররে! কী মজা!
যারা নাচ দেখতে চাও, ভালভাবে দাঁড়িয়ে থাক।

তারপর ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল তারা

কখনো বাঁয়ে কখনো ডাইনে নেচে যেতে লাগল অক্লান্তভাবে।
নাচতে নাচতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল তাদের দেহ
মুখচোখ হয়ে উঠল লাল।
হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে হাঁপাচ্ছিল তারা।
অনেকে থেমে পড়ছিল হাঁপাতে হাঁপাতে।
তাদের পাছা আর বগল খুব দুলছে।
এখানে কিন্তু তোমরা সব খুব মাথামাথি করো না,
কারণ অনেকেই এখানে ভাব করে পরে তার প্রেমিকাকে ছেড়ে দেয়।
অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে।
এই লিন্‌ডেন গাছের তলায় এক নিবিড় ও অসতর্ক মুহূর্তে
যে প্রেম গড়ে ওঠে তা দুদিন পরেই উবে যায়।
হুররে, হুররে, খুব করে 'ফিডন বো' খেল।

জনৈক বৃদ্ধ কৃষক : হে মহাশয় ডাক্তার ফাউস্ট, আপনার মত একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে এই উল্লসিত জনতার মাঝখানে দয়া করে নেমে এসেছেন সেটা আপনার মহানুভবতার পরিচায়ক। যদি এসেছেন তাহলে সবচেয়ে সুন্দর পানপাত্রটি ধরুন, আমি তাতে মদ ঢেলে দিই। আমার বিনীত ইচ্ছা, আপনি এখন পান করুন এবং অসংখ্য মদের বিন্দুর মতই আপনার জীবনের আয়ুর দিন বেড়ে যাক।

ফাউস্ট : তুমি ভালবেসে যে পাত্র দিচ্ছ আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তা গ্রহণ করছি। তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করি আমি।

(ফাউস্টের চারপাশে জনতা ভিড় করে দাঁড়াল)

বৃদ্ধ কৃষক : সত্যি কথা বলতে কি, আপনি আমাদের আনন্দের দিনেই এসে পড়েছেন। খুব ভাল হয়েছে। আপনি যিনি আমাদের দুঃখের দিনে আমাদের প্রচুর সাহায্য করেন আজ সুখের দিনে তাঁকে পেয়ে আমাদের বড় ভাল লাগছে। এখানে আজ এমন অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে যাদের প্রাণ আপনার পিতা সুদক্ষ হাতে ভয়ঙ্কর জ্বর বা প্লেগের কবল থেকে রক্ষা করেন। আপনি নিজেও যত সব দীন দুঃখীর বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেক অনেক সাহায্য দান করেন। বহু মৃতদেহ নিজের ঘাড়ে করে সৎকার করেন। তাতে আপনার কোন ক্ষতি হয়নি। জীবনের কোন পরীক্ষাই এড়িয়ে যাননি আপনি। আপনার সাহায্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন কোন দয়ালু দেবতার আশীর্বাদে ধন্য ও সমৃদ্ধ ছিল।

সকলে : আমরা সেই সুদক্ষ ও বহু পরীক্ষিত সুমহান ডাক্তারের স্বাস্থ্য কামনা করি। আমাদের সকলের উপকার ও সাহায্য দানের জন্য তিনি যেন দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন।

ফাউস্ট : যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের সমস্ত সাহায্য দান করেন, যিনি আমাদের সমস্ত বিষাদ থেকে উদ্ধার করেন, হে বন্ধুগণ তোমরা তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করো। তাঁকে প্রণাম করো।

(ফাউস্ট ওয়াগনারের সঙ্গে এগিয়ে চলল)

ওয়াগনার : হে মহান, জনগণের এই স্বতস্ফূর্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য কিভাবে কি মনে গ্রহণ করবেন তা জানি না, তবে এইটুকু জানি যে যিনি আপন গুণে ও যোগ্যতায় এই ধরনের শ্রদ্ধা ও সম্মানে ভূষিত হন তিনি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান ব্যক্তি। তরুণদের কাছে ওরা আপনাকে পরিচিত করে দিচ্ছে। আপনার জন্য ওদের নৃত্যগীত থেমে গেছে। ওরা আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার কথা বলাবলি করছে। আপনি যাচ্ছেন আর ওরা ওদের মাথার টুপী খুলে উঁচুতে তুলে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। আপনি যদি ওদের কাছে আর একটু এগিয়ে যান তাহলে ওরা হয়ত নতজানু হয়ে আপনার বন্দনা করবে, মনে হবে যেন কোন দেবদূত এসেছে ওদের কাছে।

ফাউস্ট : আর একটু উপরে উঠে চল। ঠিক ঐ পাথরটার কাছে। ওখানে গিয়ে আর আমরা এগোব না। ওখানেই আপাততঃ কিছুক্ষণ থাকব। আগে যখন আমি প্রায় উপবাস আর উপাসনায় নির্বোধের মত দিন কাটাতাম তখন কতদিন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন অবস্থায় ঐ পাথরটার কাছে একা একা বসে থেকেছি আমি। ওখানে আমি কতদিন মনেতে এক বলিষ্ঠ আশা আর ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে চোখে অশ্রু আর বুকভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে কত মৃত্যু কামনা করেছি। অনন্ত প্রসারিত মৃত্যুর শান্তিময় অঞ্চলভাগটাকে কোন রকমে একটুখানি স্পর্শ করার জন্য কত কাতর প্রার্থনা করেছি ঈশ্বরের কাছে।

আজ জনগণের এই উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে ঘৃণাবোধ করছি আমি। আমার ও আমার পিতার উদ্দেশ্যে ওরা যে প্রশংসার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল তাতে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে কি অনুভূতি জাগছে তা যদি তুমি একবার বুঝতে পারতে। আমার পিতা ছিলেন একজন গম্ভীর প্রকৃতির চিন্তাশীল লোক। তিনি শুধু প্রকৃতির রাজ্য থেকে কল্যাণকর উপাদানগুলি ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে

তাই দিয়ে মানুষের রোগযন্ত্রণার প্রতিকার হিসাবে কিছু ঔষধ প্রস্তুতের জন্য নির্বোধের মত শ্রম ও সংগ্রামে মেতে উঠতেন। তিনি তাঁর প্রায়ান্ধকার দোকান-ঘরে সব সময় কুঁজো হয়ে বসে বিচিত্র উপাদানের সংমিশ্রণে ওষুধ তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তৈরি ওষুধটার মধ্যে রঙের জৌলুস থাকলেই তা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই যেন রোগীদের রোগ সেরে যেত। কিন্তু কেউ জানতে চায়নি সঠিকভাবে কার্যতঃ কার কার রোগ সেরেছে সেই ওষুধে। আমাদের প্রদত্ত সে ওষুধ অনেক সময় বিষের মত কাজ করত আর তাতে অসংখ্য লোক মারা যেত। এইভাবে পার্শ্ববর্তী এই সব পার্বত্য এলাকায় আমরা দুজন এক জীবন্ত মহামারী রূপে ঘুরে বেড়াতাম। আজ সেই নির্লজ্জ নরঘাতকদেরই ওরা প্রশংসা করছে আর আমাকে তা শুনতে হচ্ছে।

ওয়াগনার: তার জন্য আপনি চিন্তান্বিত হচ্ছেন কেন? পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রদত্ত কোন পেশার উন্নতি সাধনে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা যে কোন সৎ লোকেরই উচিত। তুমি একজন যুবক; তুমি নিশ্চয় তোমার পিতাকে শ্রদ্ধা করো। তাহলে তাঁর দেওয়া পেশাগত শিক্ষা থেকে অবশ্যই তোমার আনন্দ পাওয়া উচিত। মানুষ হিসাবে তুমি নিশ্চয় তোমার জীবনের লব্ধ সত্যের ভাণ্ডার বর্ধিত করতে চাও। তাহলে তুমি অবশ্যই তোমার পুত্রকেও এই পেশা শেখাবে যাতে সে তোমাকেও যোগ্যতায় ছাড়িয়ে যেতে পারে পরবর্তী কালে।

ফাউস্ট: ভ্রান্তিজনিত অধঃপতনের গভীরে পতিত হয়েও পুনরুত্থানের আশা রেখে যারা নূতন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে আবার ওঠার চেষ্টা করে তারা সত্যিই সুখী। ভবিষ্যতের যে সত্য তার কাছে অজ্ঞাত সেই সত্যেই আস্থা স্থাপন করে চলে মানুষ ইচ্ছা করে; কিন্তু যে সত্য তার জ্ঞাত তা সে মেনে চলতে চায় না। কিন্তু সে যাই হোক, এই সব হতাশার কথা ভেবে আজকেই এই মুহূর্তের আনন্দকে তিক্ত করে লাভ নেই। ঐ দেখ, প্রাকসন্ধ্যার এই অস্ত-গতপ্রায় সূর্যের শেষ সোনালি আলোয় সবুজ বাড়িগুলো কেমন চকচক করছে। এখন ক্রমশই ম্লান হয়ে আসছে সূর্যের আলো। অবসান ঘটেছে সারাদিনের যত সব কাজ কর্মের। এখন শেষ সূর্যরশ্মি এ জগৎ ছেড়ে নূতন কোন জগৎ ও জীবনের আশায় যাত্রা শুরু করেছে। হায়, এমন কোন পাখা নেই যার উপর ভর করে আমি এখান থেকে বহু ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে এই সূর্যরশ্মির যাত্রাপথটির অনুসরণ করতে পারি। তাহলে অনন্ত এক স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যাস্ত দেখে ধন্য হতাম

আমি। অস্তম্লান স্বর্ণরশ্মির আভায় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠত আমার নিম্নস্থ ধরণীতল। এক আগ্নেয় দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠত পর্বতশৃঙ্গগুলি। সেই অমিত দীপ্তিরাশি ঝরে পড়ে রূপালি নদীজলধারাগুলিকে স্বর্ণপ্রভ করে তুলত চিরকালের জন্য। চিরশান্তি বিরাজ করত পার্বত্য উপত্যকাগুলিতে। তখন আমি হয়ে উঠতাম দেবতাদের মতই অবাধ ও অপ্রতিহতগতি। অসংখ্য পর্বত-মালাসংলগ্ন গভীর খাদগুলি কোনক্রমেই গতিরোধ করতে পারত না আমার। আমার চক্ষুর সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত মহাসমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাগুলি কোন যাদুমন্ত্রে যেন এক চিরউজ্জ্বল ও আয়তনীল মুখে সমাহিত হয়ে থাকত। মরণ-শীল মানবজীবনসুলভ অবসাদ মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে যেত আমার দেহমন থেকে। অনন্ত স্বর্গীয় আলোকসুধা পান করে জরামৃত্যুহীন এক দৈব প্রাণের উন্মাদনায় আশ্চর্যরূপে সপ্রতিভ হয়ে উঠতাম আমি। অবিরাম অনাবিল সুখে সমৃদ্ধ সেই স্বর্গবাস গৌরবময় এক স্বপ্নমাধুরী দিয়ে পরিপূরিত করে তুলত আমার দিনরাত্রি-গুলিকে।

কিন্তু হায়, সে গৌরব কত ক্ষণভঙ্গুর। হায়, আমার এই মাটির দেহটিকে এই মাটির পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে যাবার মত কোন পাখা সৃষ্ট হয়নি আজও। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখনি এই পৃথিবীর নদীতে হ্রদে সমুদ্রে পাল তুলে কোন জাহাজ ভেসে যায় দূর আকাশে, কোন উদ্ধত পাখা মেলে কোন ঈগল উড়ে যায় অথবা ঊর্দ্ধগগনে উড্ডীন কোন লার্ক পাখি মুঠো মুঠো গান ছড়িয়ে দেয় পাহাড়ে প্রান্তরে ঠিক তখনই প্রতিটি মানুষের অন্তরের মধ্যে জেগে ওঠে সীমাহীন ঊর্দ্ধগতির এক অভ্রভেদী উন্মাদনা। অবুঝ উচ্চাকাঙ্খী পাখির মত সে তখন আকাশের ওপারে গিয়ে নীল আলোর গভীরে হারিয়ে যেতে চায় নিঃশেষে।

ওয়াগনার: আমার মনের মাঝে সময়ে সময়ে এই ধরনের এক অদ্ভুত খেয়াল জাগত বটে, কিন্তু কখনো আপনার মত এমন উন্মাদনা কখনো অনুভব করিনি আমি। কোন অরণ্য বা প্রান্তর যত মনোরমই হোক না কেন তার পানে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ক্লান্তি অনুভব করি আমি। কোন আকাশ-গামী পাখির গানে যত মায়াই থাক না কেন সে পাখির পাখা আমি কখনো কামনা করি না। বই পড়তে পড়তে যে কল্পনা প্রসারিত হয়ে ওঠে আমার মনে আমি তাতেই পাই আনন্দ আর নবজীবনের আস্বাদ। শীতের রাত্রিতে আমি যখন কোন আরামশয্যায় ডুব দিয়ে থাকি, তখন আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরায় শিরায় কৃত্রিম তাপের যে বন্যাপ্রবাহ খেলে যায় তাতে মনে হয় আমার

চারদিকে তখন স্বর্গ নেমে এসেছে। এক অফুরন্ত স্বর্গসুখ ঘন হয়ে উঠেছে আমার এই পার্থিব জীবনে।

ফাউস্ট: একটা কথা ভালভাবে মনে রেখো, অপর কোন মানুষকে যেন জানতে যেও না। আমার নিজের বুকের মধ্যেই দু'টো আত্মা আছে। আমি ভেবেছিলাম এই দুই আত্মার মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ এক গভীর ও অবিচ্ছিন্ন সম্প্রীতি বিরাজ করবে। কিন্তু হায়, একে অন্যকে ঘৃণার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। একজন যদি সমগ্র বিশ্বজগৎকে এক গভীর ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়, অন্য আত্মাটি তখন সে ভালবাসার বন্ধনকে ঘৃণাভরে ছিন্নভিন্ন করে ধূলোর মত উড়িয়ে দিতে চায় শূন্যে। স্বর্গ আর মর্ত্যলোকের মধ্যবর্তী কোন জগতে যদি কোন প্রেতাত্মা থাকত, যদি সে আমার নির্দেশমত আকাশে বাতাসে অবাধে ছুটে বেড়াতে পারত, তাহলে আজ সে এক সোনালি ইন্দ্রজাল বিস্তার করে আমাকে এক নূতন সত্তা দান করতে পারত। আমি যদি আমার সেই ঐন্দ্র-জালিক শক্তি আবার ফিরে পাই, যদি সে শক্তির প্রভাবে জগতে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পাই তাহলে রাজ-ঐশ্বর্যের বিনিময়েও আমি সে শক্তি হারাতে চাইব না কখনো।

ওয়াগনার: অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত আত্মাদের এভাবে আবাহন করো না। তারা তাহলে তাদের অশুভ শক্তিবলে এ দেশের সমস্ত আকাশ বাতাসকে কলুষিত করে তুলবে। আমাদের জাতিকে সব দিক থেকে বিপদাপন্ন ও বিব্রত করে তুলবে তারা। তাদের একটি দল যখন উত্তর দিক থেকে তীক্ষ্ণ কাঁটাতার দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করবে, পূব দিক থেকে আর একটি দল নিয়ে আসবে ভয়াবহ উত্তাপ আর শুষ্কতা। আবার একটি দল যখন দক্ষিণের মরু অঞ্চল থেকে নিয়ে আসবে অগ্নিপ্রবাহ, তখন সে আগুন নির্বাপিত করার জন্য পশ্চিম থেকে একদল নিয়ে আসবে প্রবল বন্যার ধারা। সে বন্যার স্রোতে মাঠ ঘাট পাহাড় প্রান্তর সব ভেসে যাবে। ঐ সব অতিপ্রাকৃত আত্মার দল সব সময় মানুষের ক্ষতি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ওরা সানন্দে আমাদের সাদর আহ্বানে সাড়া দেয়, কারণ ওরা তার ফলে সহজেই প্রতারিত করতে পারে আমাদের। তারা এমন ভাব দেখায় যাতে মনে হয় তারা স্বর্গ হতে দেবতাদের প্রতিনিধি হিসাবে দেবদূত রূপে নেমে এসেছে। কিন্তু আসলে তারা ছলনা করে আমাদের সঙ্গে। যাই হোক, চল, এখন যাওয়া যাক। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শিশির পড়ছে। শীতের রাতে গৃহকোণই সবচেয়ে মূল্যবান।

কিন্তু চোখগুলো অমন বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রয়েছ কেন? কী এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিষাদে কাতর হয়ে উঠেছে তোমার মন?

ফাউস্ট: অদূরে শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে একটা কালো কুকুরকে হেঁটে যেতে দেখছ?

ওয়াগনার: অনেকক্ষণ আগে থেকেই দেখছি। কিন্তু কোন গুরুত্ব দিইনি।

ফাউস্ট: ভাল করে দেখ দেখি। কি মনে হয় পশুটাকে?

ওয়াগনার: কোন একটা সামান্য কুকুরমাত্র যে তার প্রভুকে দেখতে না পেয়ে পথ শুঁকে শুঁকে তার বাড়ি ফিরছে।

ফাউস্ট: দেখছ না, একটা অগ্নিগোলক কুকুরটাকে রহস্যময়ভাবে অনুসরণ করে চলেছে। কুকুরটা যতই এগিয়ে আসছে ততই সেটাকে আর দেখা যাচ্ছে না আর ঐ অগ্নিগোলককে কেন্দ্র করে যে আলোকবৃত্ত গড়ে উঠেছে তার পরিধিটা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে।

ওয়াগনার: আমার ত মনে হচ্ছে তোমার চোখ কিছুটা প্রতারিত করছে তোমায়। কারণ আমি একটা কালো লোমছাঁটা কুকুর ছাড়া আর কিছু দেখছি না।

ফাউস্ট: আমার মনে হচ্ছে এক মোহপ্রসারী কৌশলের দ্বারা ঐ পশুটা আমাদের চলৎশক্তিটাকে বিকল করে দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমাদের গতিশক্তিকে শৃংখলিত করে দেবে একেবারে।

ওয়াগনার: আমি দেখছি পশুটা আমাদের কাছে এসে সংশয়াচ্ছন্ন মনে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছে। কারণ ও ওর প্রভুর খোঁজে এসে দেখছে তার জায়গায় দুজন অপরিচিত ব্যক্তিকে।

ফাউস্ট: আলোকবৃত্তটার পরিধি আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। ও এসে গেছে আরও কাছে।

ওয়াগনার: ওটা একটা কুকুরমাত্র, তুমি যা ভাবছ সে ধরনের কোন অলৌকিক বস্তু নয়। ঐ দেখ ও থেমে গেছে। এখন ও বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে। ওর লেজ নড়ছে। ঠিক সাধারণ পশুর মতই অবিকল ওর আচরণ।

ফাউস্ট: কই এস, আমাদের পিছু পিছু এস। আমাদের অনুসরণ

করো। কাছে এস।

ওয়াগনার: এ এক আশ্চর্য অদ্ভুত পশু। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে ও বসে থেকে অপেক্ষা করবে। আর ওকে কোন কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে ও সে আদেশ পালন করবে। যদি কোন জিনিস তোমার হারিয়ে যায়, যদি জলস্রোতে তোমার হাতের বেতের ছড়িটি পড়ে যায় তাহলে ও হয়ত তৎক্ষণাৎ তা এনে হাজির করবে।

ফাউস্ট: তুমি যে এ বিষয়ে ঠিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি ঐ পশুটার মধ্যে মন বলে কোন পদার্থ দেখতে পাচ্ছি না। শুধু দেখছি অভ্যাসের গুণ।

ওয়াগনার: কোন কুকুর যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায় তাহলে সে জ্ঞানী-লোকেরও সঙ্গী হতে পারে। এখন দেখছি কুকুরটা সত্যিই তোমার সঙ্গলাভের যোগ্য। মেধাবী ছাত্রের মতই ও চতুর। (তারা নগরদ্বারের ভিতর দিয়ে চলে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

পাঠাগার

ফাউস্ট: (লোমছাঁটা একটি কুকুরসহ প্রবেশ) আমার পশ্চাতে মাঠ ঘাট প্রান্তর সব ঘুমোচ্ছে। এই গভীর রাত্রিতে আমি সম্পূর্ণ একা। নিশীথনিবিড় রাত্রির এই স্তব্ধ অবকাশে চিন্তাশীল বহু মনীষী অনেক জ্ঞানের আলো খুঁজে পান তাঁদের মগ্ন চৈতন্যের গভীরে। যত সব দুর্বার কামনা ও উদ্ধত উত্তপ্ত আবেগানুভূতিরা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে একে একে। এখন তাদের জায়গায় মনের মাঝে জেগে উঠছে উদার মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের প্রশান্তগম্ভীর এক অনুভূতি।

শান্ত হও হে সারমেয়! অশান্ত হয়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করো না অকারণে। ওখানে তক্তপোষের কাছে কি শুঁকছ? ঐ চুল্লীটার কাছে শান্ত হয়ে বিশ্রাম করো। আমি তোমাকে আমার একটি নরম আরামপ্রদ আসন দান করেছি। কিছুক্ষণ আগে তুমি ঐ অদূরবর্তী পাহাড়ে ছোটাছুটি ও লাফালাফি করে আমাদের অনেক আনন্দ দান করেছ। তাই এখন আমি চাই তুমি আমার ঘরে

শান্ত হয়ে বিশ্রাম করো আমার কাছে।

আমার এই সংকীর্ণপরিসর কক্ষটিতে বাতিটি শান্তভাবে জ্বলছে। এক একটি অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে জ্বালানী কাঠগুলি ক্রমশই স্তিমিত হয়ে পড়ছে। আমি আমার অন্তরের অন্ধকারে অনুভব করলাম সহসা উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে এক দুর্মর আশার আলো। নূতন উৎসাহে উৎসাহিত করছে আমায়। স্তিমিত তন্দ্রাহত যুক্তিবোধ জেগে উঠছে আবার। সত্তার শ্লথগতি নদীগুলি জীবনের উৎস সন্ধানে তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অদম্য আশায়।

গর্জন করো না হে সারমেয়। জগৎ ও জীবনের অশ্রুত অথচ পবিত্রমধুর যে ঐক্যতান, যে শান্ত সুরসঙ্গতি আমার অন্তরাত্মা তার গভীরে খুঁজে পেয়েছে, তাকে আগ্রহভরে আলিঙ্গন করছে সে বারবার। তার সঙ্গে তোমার এই পাশবিক গর্জন মোটেই মানায় না। আমরা জানি মানুষ যা বুঝতে পারে, যা তার বোধগম্য হয়ে ওঠে উপলব্ধির জগতে তাকেই সে ঘৃণার চোখে দেখে। জীবনে যা কিছু শুভ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সত্য, তার বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতাহেতু তার যথার্থ মূল্য অনেক সময় নিরূপণ করতে পারে না মানুষ। তবে কি তার বোধাতীত সুন্দরকে বুঝতে না পেরেই তার প্রতি এই অশান্ত গর্জনের মাধ্যমে এক তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে এই সারমেয়?

আমি বেশ বুঝতে পারছি কামনার প্রবলতর প্রতিকূলতায় সন্তোষের নদীটি সহজ সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হতে পারছে না আগের মত। এক জ্বলন্ত কামনার বিস্তীর্ণ মরুপথে যেতে যেতে সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে সে নদী। এক বিশাল তৃষ্ণার জ্বালাময়ী শুষ্কতা নিঃশেষে শোষণ করে নিচ্ছে আমার সত্তার সব রস। আমি জীবনে অনেক জ্ঞানবিদ্যা অর্জন করেও এই জ্বলন্ত কামনার বেগকে জয় করতে পারিনি। তাই আজ আমি চাই কোন না কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির অলৌকিক সহায়তা। নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত ঈশ্বরপ্রেরিত বোধি বা এক অধ্যাত্ম অনুভূতি ব্যাকুলভাবে কামনা করি আজ আমি। আমি তার অর্থ আজ নূতন করে উপলব্ধি করতে চাই। মূল ভাষায় লেখা ঈশ্বরের সেই পবিত্র অলৌকিক বাণী আজ আমি আমার প্রিয় জার্মান ভাষায় অনুবাদ করতে চাই।

(একখানি গ্রন্থ খুলে পড়তে লাগল)

এতে লেখা আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শুধু শব্দ। কিন্তু একথা আমি মানতে পারি না। শব্দ?—অসম্ভব। শব্দকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া কখনই

উচিত হবে না। দৈবের কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি লাভ করেছি তা যদি সার্থক হয় তাহলে আমি ঠিকই বলছি, কথাটাকে ঘুরিয়ে বলছি। ‘সৃষ্টির আদিতে শুধু ছিল চিন্তা।’ তবে কথাটাকে ভাল করে তলিয়ে দেখতে হবে, আমি আবার অধৈর্য হয়ে তাড়াহুড়ো করে কিছু বলে ফেলছি না ত? আচ্ছা, চিন্তাই ত সকল কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার মূলে। আমি পড়েছি, সৃষ্টির আদিতে ছিল শক্তি। কিন্তু কথাটাকে আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখিনি। দৈবানুকুল্যে এখন আমি আলো দেখতে পাচ্ছি এ বিষয়ে। আমি বুঝেছি। তাই লিখছি, সৃষ্টির আদিতে ছিল কর্ম।

হে সারমেয়, আমার এই ঘরে একান্তই যদি তুমি থাকতে চাও তাহলে তোমাকে অবশ্যই গর্জন থামাতে হবে। তুমি আর চিৎকার করো না। এমন ভাবে গোলমাল করলে আমি তোমাকে থাকতে দেব না আমার কাছে। শোন আমার কথা। তোমাকে যেতেই হবে। আর আমি তোমাকে আমার আতিথেয়তা দান করতে পারব না। আমার ঘরের দরজা খোলা, তুমি যেতে পার। কিন্তু আমি কি দেখছি? এটা কি স্বাভাবিক, বাস্তব সত্য না কল্পনা? সেই সামান্য কুকুরটা কি বিরাট লম্বা হয়ে উঠেছে সহসা। এখন ওকে দেখে পশু বলে মনে হয় না। কী অদ্ভুত দৃশ্যই না আমি দেখছি। ওকে দেখে এক ভয়ঙ্কর জলহস্তী বলে মনে হচ্ছে। ওর চোখগুলো আগুনের মত জ্বলছে। এর দাঁতগুলো খুবই ভয়ঙ্কর। এবার আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। তোমার অর্ধ-নারকীয় ভয়ঙ্কর আকৃতি সত্ত্বেও সলোমনের জ্ঞানের চাবিকাঠির সাহায্যে আমি তোমার স্বরূপ জানতে পেরেছি।

অপদেবতাবৃন্দ (বারান্দায়) ঘরের ভিতর একজন মানুষ আমাদের জালে ধরা পড়েছে। তোমরা সব বাইরে থাক, তার কাছে যেও না। ফাঁদে পড়া খেঁকশিয়ালের মত সে ছটফট করছে। এধার ওধার করতে করতে সে নিজেই বেরিয়ে আসবে। তবে এ কাজে যদি তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তার তাহলে যেন তাকে দিও, কারণ সে আমাদের খুশির শিকার হিসাবেই এভাবে ধরা পড়েছে।

ফাউস্ট: এই জন্তুটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে চারটি ভৌতিক দেবতাকে আবাহন করতে হবে। হে সালামান্দার বা অগ্নিদেবতা তুমি উজ্জ্বলভাবে কিরণ দান করে যাও। হে জলদেবতা, তুমি বেগে প্রবাহিত হও। হে সিলফ, বায়ু, তুমি আপাততঃ লুক্কায়িত থাক। হে নম্ বা মৃত্তিকা, তুমিও

কাজ করে যাও, চুপ করে থেকো না।

এই সব ভৌতিক দেবতাদের গুণের কথা কে জানে না। তাদের শক্তি ও গুণের কথা সবাই জানে। অপদেবতাদের দমন করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই।

হে সালামান্দার, হে জলদেবতা, হে সিলফ, হে নম্, তোমরা সব এক একটি অশুভ অপদার্থ অপদেবতা। তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও। অদৃশ্য হয়ে যাও। তোমাদের আর আমার কোন প্রয়োজন নেই।

এই চার ভৌতিক দেবতা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারল না ঐ জন্তুটার উপর। সে অবাধে শুয়ে শুয়ে অহেতুক ঘৃণাসূচক চিৎকারে ফেটে পড়ছে। এখনও পর্যন্ত আমি তাকে কোন কষ্ট দিইনি। এবার আয়, শোন হীন জানোয়ার, এবার আমি তোর মুখোশ খুলে ফেলে প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করার জন্য ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করব তোর উপর। তুই কি নরক হতে বিতাড়িত হয়ে আমার কাছে এসেছিস? এবার আমি তোকে এমন এক চিহ্ন দেখাব যার কাছে নরকের সব জীবই মাথা নত করে।

গায়ের লোমগুলো খাড়া করে জানোয়ারটা ফুলে উঠছে।

শোন রে হীন ঘৃণ্য পশু, তুই কি সেই নামহীন অন্তহীন আদি শক্তিকে জানিস যে শক্তি সমগ্র দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপ্ত করে আছে। সূক্ষ্ম অথচ অপরিহার্য যে শক্তির প্রভাব হতে সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই মুক্ত হতে পারে না?

ঐ চুল্লীটার পাশে এখন ওকে একটা বিরাট হাতীর মত দেখাচ্ছে। আরও বড় হও। ফুটে ওঠ। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন ওটা কুয়াশার মত সারা বায়ুমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে আছে। আবার দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আর উঠতে হবে না। এবার তোর প্রভুর পায়ের কাছে বসে থাক। এবার বুঝতে পারছিস ত? আমি তোকে বৃথা ভয় দেখাইনি। আমার ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা সত্যিই আছে কিনা দেখ। এবার এক মন্ত্রপূত অগ্নির দ্বারা তোকে দগ্ধ ও বিদ্ধ করব। এখন জানতে চাস না যে তিনটি জ্যোতি আমার মাথার চারদিকে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছে তা আসলে কি। জানতে চাস না কি শক্তিশালী বিদ্যা আয়ত্তাধীনে আছে আমার।

(কুহেলিসদৃশ বাষ্প ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যেতেই ভ্রাম্যমান এক পণ্ডিতের বেশে মেফিস্টোফেলিস প্রবেশ করল)

মেফিস্টোফেলিস : গোলমাল কিসের ? আমার প্রভুর কি হুকুম তামিল করতে হবে ?

ফাউস্ট : তাহলে এই হলো সেই রেঁা ওঠা কুকুরটার আসল রূপ ? একদা ভ্রাম্যমান পণ্ডিত ব্যক্তি। এই হলো তার পরিবর্তিত রূপ।

মেফিস্টোফেলিস : হে সুপণ্ডিত ভদ্রমহোদয়, আমার প্রণাম গ্রহণ করো। তুমি আমাকে রীতিমত কষ্ট দান করেছ।

ফাউস্ট : তোমার নাম কি ?

মেফিস্টোফেলিস : এ ত সামান্য প্রশ্ন দেখছি। জেনে রাখ, আমি এমনই একজন যে বেশী কথা বলতে ঘৃণা বোধ করে, যে কোন বস্তুর বাইরের রূপের জৌলুসকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার গভীরতর সত্তাকেই মূল্য দেয় বেশী।

ফাউস্ট : সব ত জানলাম। তবু বলব, নামের মধ্য দিয়ে যে কোন বস্তু বা ব্যক্তির আসল পরিচয় অনেকটা প্রকাশিত হয়। যেমন ধরো, 'বীলজীবাব,' 'ডেস্ট্রয়ার' বা সর্বসংহারকর্তা, বা 'ফাদার অফ লাইজ' বা মিথ্যার জনক। তোমার নামটি তাহলে কি ?

মেফিস্টোফেলিস : যে শক্তি সব সময় মন্দ ও অমঙ্গল পরিকল্পনা করা সত্ত্বেও সবসময় মঙ্গল করে চলে সে শক্তিকে কোন নামের মাধ্যমে ঠিক বোঝা যাবে না। সে শক্তির সবটুকু বোঝা যায় না।

ফাউস্ট : এই জটিল হেঁয়ালিপূর্ণ কথার মধ্যে কি গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে ?

মেফিস্টোফেলিস : আমি এমনই এক অপদৈবশক্তি যে সব কিছুকে অস্বীকার করে। আর তার যথেষ্ট কারণও আছে, কারণ শূন্য থেকেই সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়, আবার তা ধ্বংসের পর শূন্যেই বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং কার সত্যতাকে স্বীকার করব ? তাই বলি, আমার জন্ম না হলেই ভাল হত। তোমরা যাকে বল পাপ, যাকে বল অশুভ আসলে তা ধ্বংস ছাড়া অন্য কিছুই না। সেই ধ্বংস বা সংহারকারিণী শক্তিই হলো আমার আসল রূপ।

ফাউস্ট : তুমি নিজেকে কোন এক শক্তির অংশ বললে কেন ? আমার ত মনে হচ্ছে তুমি এক পূর্ণায়ত অখণ্ড শক্তি।

মেফিস্টোফেলিস : আমি এক মহতী সত্যের কথা তোমায় বুঝিয়ে বলছি। মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নির্বোধ এক সত্তা। সেই মানুষ কখনো তার সত্তার পূর্ণতা বা অখণ্ডতাকে কখনই বুঝতে পারবে না। তা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে এক আদিম অন্তহীন অন্ধকারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল সব কিছু। তারপর এক সময় সেই চিররাত্রিরূপিণী আদিম অন্ধকারের সঙ্গে আলোর সংগ্রাম বাধে এ জগতের অধিকার নিয়ে। সেই আলোই অন্ধকারের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিন্ন করে আমাকে সৃষ্টি করেছে। আলো থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি। কিন্তু সৃষ্টির আদিযুগ থেকে এই অনন্তশক্তিসম্পন্ন আলো-অন্ধকারের সঙ্গে সংগ্রাম করেও সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কালের অর্ধাংশের বেশী অধিকার করতে পারেনি, আলোর মত অন্ধকারও সত্য হয়ে আছে আজও। আজও প্রতিদিন সৌরমণ্ডলের হিংসাশ্রয়ী শরসন্ধানকে ব্যর্থ করে সেই আদিম অন্ধকার রাত্রিরূপে আসে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে। সমগ্র বিশ্বের সমগ্র ভূখণ্ড ও কাল-খণ্ডের অর্ধাংশের উপর জানিয়ে যায় তার অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠাকে। বিশ্বের সকল বস্তু বা শক্তির অবয়ব আলোর দ্বারাই গঠিত হয়। আলোই সমস্ত দেহা-বয়বকে উজ্জ্বলতা দান করে, তাদের সুন্দররূপে করে তোলে প্রতিভাত। তথাপি যে দেহাবয়বকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে তোলে আলো সেই দেহের দ্বারাই ব্যাহত হয় তার গতি। সৃষ্টির এই হলো নিয়ম। তাই প্রতিহতগতি এই আলোর অভিশাপেই হয়ত এমন ক্ষণজীবী ও ক্ষণভঙ্গুর হয়ে উঠেছে প্রতিটি দেহাবয়ব। জন্মের পর হতে সকল দেহই দ্রুত এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। প্রতিটি দেহের পতনে বা মৃত্যুতে তার সম আয়তন স্থান আলোর অধিকারে আসে। সে স্থানে আলোর গতি হয় স্বচ্ছ এবং অবাধ।

ফাউস্ট : আমি তোমার মতলবের কথা বুঝতে পেরেছি। তুমি সাধারণ-ভাবে সমগ্র বিশ্বের উপর কোন ধ্বংসকার্য ঘটাতে পার না বলেই ছোটখাটো ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যেতে চাও।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এত করেও কিছুই করতে পারলাম না। আমার সমস্ত সংগ্রামী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বসেছে। এই কুৎসিত অবাঞ্ছিত পৃথিবীটার অতি ক্ষুদ্র একটা অংশকেই আমি আমার ধ্বংসকার্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছি। অবশ্য মাঝে মাঝে ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎগার প্রভৃতির মাধ্যমে ধ্বংসের দুর্বার ধারা নেমে আসে পৃথিবীতে। কিন্তু তা শুধু ক্ষণকালের জন্য। ক্ষণকাল পরেই আবার শান্ত হয়ে ওঠে বিক্ষুব্ধ জল ও স্থল। আর হতভাগ্য পশুসুলভ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করেই বা কি হবে? আমি কত মানুষের জীবনাবসান ঘটিয়েছি। কিন্তু আবার অসংখ্য নূতন মানুষ সৃষ্ট হয়েছে। জলে স্থলে বাতাসে শীতে গ্রীষ্মে সর্বত্র সর্বক্ষণ অসংখ্য

জীবকণা জন্মলাভ করে চলেছে। তা দেখে এক প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠি আমি। আমার এই অলৌকিক শক্তির শিখাটুকু না থাকলে আমিও তাদের সঙ্গে মিশে যেতাম।

ফাউস্ট: সৃষ্টিশীল যে প্রাণশক্তি বিশ্বের প্রতিটি কন্দরে কাজ করে চলে সর্বত্র জীবনের ধারাকে চিরপ্রবহমান ও অবিচ্ছিন্ন রেখেছে, তুমি এক নারকীয় ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাসহযোগে সে শক্তির বিরোধিতা করছ। কিন্তু জেনে রেখো, ব্যর্থ হবে তোমার সব বিরোধিতা। বিপর্যয় ও বিশৃংখলার হে ঘৃণ্য সন্তান, এভাবে বিরোধিতা করে কিছু করতে পারবে না। অন্য কোন উপায় খুঁজে বার করো।

মেফিস্টোফেলিস: ঠিক আছে। ভেবে দেখো। তুমি এখনো আমার আসল মনোভাবটা বুঝতে পারনি। আমি কি এখন যেতে পারি?

ফাউস্ট: একথা জিজ্ঞাসা করার কি আছে? এর কোন কারণ দেখি না আমি। যদিও অবশ্য আমাদের পরিচয় খুব একটা বেশী দিনের নয়। এর পরেও তুমি যখন খুশি আসতে পার। আমার ঘরের জানালা খোলা, অদূরে ঐ দরজাও খোলা আছে। ওখানে একটা চিমনিও আছে।

মেফিস্টোফেলিস: আমি একথা স্বীকার করছি আমি আর এগিয়ে যেতে পারছি না। একটা সামান্য বাধা আমার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। তোমার ঘরের মেঝের উপর কোন এক ঐন্দ্রজালিকের পায়ের যে ছাপ রয়েছে সেই ছাপই হলো সে বাধা।

ফাউস্ট: ঐ ছাপটা তোমাকে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। নরকের হে ঘৃণ্য সন্তান, বল আমায় ওটাতে বাধা পেলে তুমি কি করে আমার কাছে আসবে? তোমার মত এক বিরাট অপদৈব শক্তি সামান্য ঐ বাধার দ্বারা হবে প্রতারিত ও প্রতিহত?

মেফিস্টোফেলিস: ভাল করে পরীক্ষা করে দেখ। ছাপটা এখনো ঠিক মত আঁকা হয়নি। বাইরের দিকের রেখাগুলো এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

ফাউস্ট: ঠিক আছে, তাতে ভালই হয়েছে। তাতে আমাদের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। এখন তুমি আমার কাছে বন্দী।

মেফিস্টোফেলিস: একদিন যে রোঁয়া ওঠা কুকুরটা তোমার পিছু নিয়েছিল আজ সেটা আর বেরোতে পারছে না। শয়তানটা দেখছি বন্দী হয়ে পড়েছে।

ফাউস্ট: খোলা জানালাটা তার জন্য ব্যবহার করে দেখতে পার।

মেফিস্টোফেলিস : শয়তান ও ভূতপ্রেতদের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম প্রচলিত আছে। তারা একবার যদি কোন জায়গায় ঢুকে পড়তে পারে তাহলে সেখান থেকে বেরোতেও পারবে। আমরা একটা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু আর একটা বাকি আছে।

ফাউস্ট : নরকেও তাহলে নিয়মকানুন মেনে চলা হয়? ভাল কথা। তাহলে তোমার মত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এক চুক্তি করা যেতে পারে। আশা করি সেটা অবশ্যই মেনে চলবে।

মেফিস্টোফেলিস : আমি যা যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা সব ঠিক মত পালন করব এবং তাতে তুমি আনন্দ পাবে। চিন্তাভাবনাহীন ব্যস্ততার মধ্যে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের মত এ চুক্তি ব্যর্থ হবার নয়। আমরা এ বিষয়ে শীঘ্রই আবার আলোচনা করব। এখন আমি শুধু তোমার কাছে একটামাত্র বর প্রার্থনা করি—এখান থেকে চলে যাবার অনুমতি দাও।

ফাউস্ট : আর কিছুক্ষণ থাকতে বলব তোমায়। আমাকে অন্ততঃ কিছু সুসংবাদ শোনাও।

মেফিস্টোফেলিস : এখন আমাকে মুক্তি দাও। শীঘ্র আবার আসব আমি। তখন আমাকে প্রশ্ন করে অনেক কিছু জেনে নিতে পারবে তুমি।

ফাউস্ট : আমি ত তোমাকে ধরার জন্য জাল বিস্তার করিনি তোমার চারদিকে। তুমি ত নিজে থেকেই এ ফাঁদে ধরা দিয়েছ। কেউ যদি শয়তানকে একবার ধরতে পায় তাহলে তাকে শক্ত করে ধরে রাখে, কারণ এত বড় দামী শিকার দ্বিতীয়বার কখনো পাওয়া না যেতেও পারে।

মেফিস্টোফেলিস : আমার সাহচর্যে তুমি আনন্দ পাবে জেনে আমি খুশি। আমি তোমার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকে তোমার সেবা করে যাব। আমি আমার কলাকৌশলের দ্বারা তোমাকে আনন্দ দান করতে পারব ভেবে আমি সব সময় খুশি মনে কাজ করে যাব। তোমার সেবা করে যাব।

ফাউস্ট : এ বিষয়ে আমার কোন অমত নেই, তবে অবশ্য তোমার আনন্দ দানের বিষয়বস্তুটার মধ্যে সত্যি সত্যিই যদি আনন্দের খোরাক থাকে।

মেফিস্টোফেলিস : হ্যাঁ বন্ধু, পাবে। সারা বছরের একটানা নীরস জীবনযাপনের পর এক অনাবিল আনন্দের খোরাক অনেক পাবে। আমার অধীনস্থ অতিপ্রাকৃত শক্তিরা যে গান তোমায় শোনাবে, যে ছবি তারা তোমাকে দেখাবার জন্য আনবে তা সামান্য ইন্দ্রজাল-খেলার থেকে অনেক

বেশী। তোমাকে অতি উপাদেয় যে সুখাদ্য দেওয়া হবে তার সুবাস তোমাকে দেবে অভূতপূর্ব আনন্দ। তাদের স্পর্শের মাধুরী কত আবেগের রোমাঞ্চ জাগাবে তোমার দেহের স্নায়ুতে। কোন প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও আমরা এই-খানেই সব কিছু উপস্থাপিত করব এখনি।

অপদেবতারা: হে চাপ চাপ ঘনান্ধকার, তোমরা সবাই ওঁর মাথার উপর থেকে সরে যাও। শূন্য বায়ুমণ্ডল হতে উজ্জ্বল আলোকমালা নির্গত হয়ে ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালাকে অপসারিত করে দাও। শান্ত ও স্থিরায়ত সূর্য সুদূর আকাশে তির্যকভাবে কিরণ দান করছে। উজ্জ্বল পোষাকপরিহিত স্বর্গের সন্তানস্বরূপ আলোকতরঙ্গগুলি সুদূর আকাশ হতে নেমে এসে মর্ত্যভূমির সব কিছুকে আলোকিত করে তুলছে। তাদের গতিপথে যে সব বনস্থলী ও নিভৃত কুঞ্জবন পড়ে, যেখানে মোহমুগ্ধ প্রেমিক প্রেমিকারা অলস প্রেমচিন্তায় একান্তভাবে হয়ে ওঠে মগ্ন সেই সব বন ও কুঞ্জবনও আলোকিত হয়ে উঠুক আলোকতরঙ্গ-গুলির দুর্বার আঘাতে। কুঞ্জবনে কত আঙ্গুরলতা অবাধে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠছে। সে লতায় একদিন কত আঙ্গুর ধরবে। সেই আঙ্গুর থেকে যে উত্তম মদ হবে তা অসংখ্য স্বচ্ছ সুন্দর ঝকঝকে পাত্রে শোভা পাবে। মাঠে মাঠে কত সবুজ শস্য পান্নার মত শোভা পাচ্ছে। বহু কীটপতঙ্গ ফুলের মধু পান করে সূর্যের পানে উড়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা আলোর মহা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে কোন দ্বীপের সন্ধান করছে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে। ঐ শোন, তাদের উড়ে চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তাদের চক্রাকার নৃত্যের মোহপ্রসারী ছন্দ বড় মধুর। দূর আকাশে ও শূন্য বাতাসে ভাসমান পাখিগুলি কত মুক্ত ও সুন্দর। কেমন চমৎকারভাবে তারা উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের কারো কারো গতি চক্রাকার, আবার কারো কারো গতি উর্ধ্বায়িত। তারা সকলেই বাঁচতে চায়। উৎকেন্দ্রিক আনন্দময় ও প্রেমময় এক জীবনাস্তিত্বের চির-উজ্জ্বল নক্ষত্রলোকের উর্দ্ধাভিসারে উধাও হয়ে যেতে চায় তারা সবাই।

মেফিস্টোফেলিস: ও এখন ঘুমোচ্ছে। যথেষ্ট হয়েছে। হে সুন্দরী পরীগণ, তোমাদের বায়বীয় উপস্থিতির ফলে চারদিকে যে গতিময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাতে অভিভূত হয়ে ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তোমাদের এ কাজের জন্য আমি ঋণী তোমাদের কাছে।—তুমি আর এখন মানুষ নও। তুমি আর এখন আমার মত কোন শয়তানকে ধরে রাখতে পারবে না।—হে আমার প্রিয় পরীগণ, যত সব সুখস্বপ্নের চিত্রকল্প দিয়ে ওকে ঘিরে ফেলে এক

মধুর মিথ্যার সমুদ্রে ওকে ডুবিয়ে দাও। তবু ওর ঘরের মেঝের উপর অঙ্কিত সেই ঐন্দ্রজালিক ছাপটা তোলার জন্য তীক্ষ্ণদন্ত এক বড় ইঁদুরের প্রয়োজন। আমি কোন দীর্ঘ আবাহন ভালবাসি না। কোন চঞ্চলমতি ইঁদুর এখানে শীঘ্র এসে আমার মুক্তির জন্য পথ করে দেবে।

হে ছোট বড় ইঁদুর, মাছি, ছারপোকা, ব্যাঙ ও উকুনের দেবতা, আমি এই ঘরের দ্বারপ্রান্তে তোমার উপস্থিতি কামনা করে তোমাকে এখানে আনার জন্য আহ্বান করছি। আমাকে বন্দী করার জন্য ও যেখানটায় একটা ঐন্দ্রজালিক ছাপ এঁকে তার উপর তৈল লেপন করেছে তুমি এই মুহূর্তে সেখানে লাফিয়ে চলে এস। আমার মুক্তির পথ প্রশস্ত করো। আমি অনেকটা এগিয়ে আছি। তুমি এসে একটা কামড় দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ছাপটা উঠে যাবে। সুতরাং হে ফাউস্ট, তুমি তোমার স্বপ্ন দেখে যাও। পরে আমাদের আবার দেখা হবে।

ফাউস্ট: (জেগে উঠে) আমাকে কি আবার মোহমুগ্ধ করে প্রতারিত করা হয়েছে? এখন আর সেই অপদেবতাটা নেই। আমাকে স্বপ্ন দিয়ে ভুলিয়ে সারমেয়রূপী শয়তানটা পালিয়ে গেছে কোথায়।

চতুর্থ দৃশ্য

পড়ার ঘর। ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস

ফাউস্ট: দরজায় করাঘাত? ভিতরে এস। আবার আমার নীরব নির্জনতা ভঙ্গ হলো।

মেফিস্টোফেলিস: আমি।

ফাউস্ট: ভিতরে এস।

মেফিস্টোফেলিস: একথা তিনবার বলতে হবে।

ফাউস্ট: ভিতরে এস।

মেফিস্টোফেলিস: এবার আমি তোমার ব্যবহারে খুশি হয়েছি। আশা করি, এবার থেকে আমরা দুজনে মিলে মিশে চলতে পারব। আমি তোমার স্বপ্নের ঘোর কাটাবার জন্য সোনার জরির কাজকরা বেগুনি রঙের কোটপরা এক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জমিদারের বেশে এসেছি। আমার মাথার টুপীর উপর শোভা পাচ্ছে এক লম্বা মোরগের পালক। লোককে দেখানো বা ঝগড়া-

বিবাদের সময় প্রয়োগের জন্য আমার কটিবন্ধে ঝুলিয়ে রেখেছি এক লম্বা তীক্ষ্ণ তরবারি। আমি তোমাকেও এই ধরনের উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করার জন্য উপদেশ দান করছি। এই প্রায়ান্ধকার পাঠকক্ষ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তুমি একবার বাইবে বার হলেই জীবনের আসল সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠবে তোমার কাছে।

ফাউস্ট: আমার পোষাক যত উজ্জ্বলই হোক না কেন, এই প্রথাগত পার্থিব জীবন দুঃসহ হয়ে উঠবে আমার কাছে। আমার বয়স বর্তমানে এমনই এক স্তরে উপনীত যে আমি একদিকে যেমন কামনা বাসনাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারছি না, আবার অন্য দিকে সেই কামনার আবেগানুভূতিগুলিকে বেশী প্রশ্রয় দিতেও পারছি না। আমার বয়স যেমন খুব একটা বেশীও নয়, আবার খুব একটা কমও নয়। পৃথিবী থেকে আর আমি এখন কি পাব? ত্যাগ ও সংযমের পথে ঠেলে দেব নিজেকে? এই একটিমাত্র গানই নিত্যকাল ধরে সকল মানুষের কানে কানে ধ্বনিত হয়ে আসছে। সারা জীবন ধরে এ গান শুনে আসছি আমরা। প্রতিদিন সকালে আমি ভয়ে ভয়ে উঠি। ভাবি আশাভঙ্গের বেদনায় সিক্ত আর একটি প্রভাতের সূচনা হলো। এ কথা ভেবে চোখে জল আসে আমার যে একটি আশাও সফল হয়নি আমার জীবনে। যত কিছু আশার আনন্দ সব ক্ষীণ হয়ে আসে দিনে দিনে। জীবনের সব হাসি মুখোসের মতই নকল বলে কোন ভাল কাজও করতে চাই না। আবার যখন রাত্রি আসে তখনও এক গভীর উদ্বেগের বোঝা নিয়ে শুয়ে থাকি বিছানায়। তখনও শান্তি পাই না মনে। তখন যত সব দুরন্ত স্বপ্ন কার নির্দেশে ভিড় করে আসে যেন আমার মনে। আমার বুকের মাঝে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন তিনি আমার অন্তরকে আলোড়িত করতে থাকেন। আবার আমার শক্তির বাইরে উর্দ্ধ জগতে যে ঈশ্বর বিরাজ করেন তিনিও বহিরাগত অশুভ শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। এইভাবে আমার এই হতভাগ্য জীবনধারণের গ্লানি দিনে দিনে বেড়ে আমাকে পীড়িত করে চলেছে বলে আমি মৃত্যুকে কামনা করি নিবিড়ভাবে।

মেফিস্টোফেলিস: তথাপি মৃত্যু এমনই একজন অতিথি যাকে শত কারণ সত্ত্বেও কোন মানুষ অকুণ্ঠভাবে স্বাগত জানাতে পারে না।

ফাউস্ট: যে ব্যক্তি সত্যিই ভাগ্যবান ভাগ্যদেবী যার উপর সুপ্রসন্ন হয়ে যার গলায় জয়ের মালা পরিয়ে দেন, সে ব্যক্তি নর্তনক্লান্ত অবস্থায় কোন কুমারী

যুবতীর সপ্রেম বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত হয়। কিন্তু আমি কি জীবনের এই সব ভোগসুখ হতে বঞ্চিত রয়ে যাব? আমার অধীনস্থ অপদেব শক্তি কি আমাকে এই সব ভোগ্য বস্তু কিছু এনে না দিয়েই বিদায় নেবে?

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু সেদিন রাত্রিতে কোন লোক কাছে পেয়েও মদ ছোঁয়নি।

ফাউস্ট: পরের গোপন কথা শোনা ও গোপন কাজ দেখায় তুমি আনন্দ পাও দেখছি।

মেফিস্টোফেলিস: আমি অবশ্য সর্বজ্ঞ নই, তবু অনেকের অনেক কথাই আমি জানি।

ফাউস্ট: যেন কোন পরিচিত এক মধুর কণ্ঠস্বর আমার মনকে যত সব অন্তর্দ্বন্দ্ব আর চিন্তার অশান্ত আলোড়ন হতে মুক্ত করে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছে। শৈশবসুলভ কত বিশ্বাস ও আশা জাগিয়ে তুলছে তার মাঝে। তথাপি যে সব মিথ্যা আশার ছলনা আমার আত্মাকে স্বপ্নের ফাঁদে ফেলে পীড়িত করতে চায় তাদের আমি ধিক্কার দিই। মিথ্যা আশা বা স্বপ্নের উজ্জ্বল ছলনাজাল আমাদের মনকে শুধু এক নিবিড় বেদনার অন্ধকার গুহার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। তাতে কোন ফল হয় না। যে উচ্চাভিলাষ আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে আমি তাদের অভিশাপ দিই। যে সব স্থূল আপাত উজ্জ্বল প্রলোভন আমাদের সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত অনুভূতির উপর আলোড়ন সৃষ্টি করে আমি তাদের ধিক্কার দিই। ধিক সেই সব নাম, যশ ও জয়ের স্বপ্নকে ভবিষ্যতে যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আমাদের আয়ত্তাধীন বা অধিকৃত বস্তুরূপে অথবা আত্মীয় বা আপনজনরূপে যারা আমাদের প্রীত করতে চায় আমি তাদেরও ধিক্কার দিই। যে নিয়তি প্রভূত ধনরত্নের লোভ দেখিয়ে আমাদের উন্মত্ত কর্মচঞ্চলতার মধ্যে ঠেলে দেয় আমি তাকে যেমন ধিক্কার দিই, তেমনি আবার যে নিয়তি আমাদের আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় তাকেও ধিক্কার দিই। উত্তম আঙ্গুরের যে মদ মানুষের মনকে তুরীয় লোকে নিয়ে যায়, মানুষের মনে প্রেমবোধ জাগায়, সে মদকেও ধিক। আশা, ধর্মবিশ্বাস ধৈর্য—সব কিছুকেই ধিক্কার দিই।

অদৃশ্য অপদেবতাদের সমবেত সঙ্গীত:

ধিক ধিক তোমাকে! এই সুন্দর জগৎকে ধ্বংস করে দিয়েছ তুমি। তোমার মত একটি অপদেবতার প্রচণ্ড দেহশক্তিসঞ্জাত আঘাতে সে জগৎ আজ বিধ্বস্ত। সে জগতের ছিন্নভিন্ন ধ্বংসাবশেষ শূন্যে বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা।

জগতের যে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে, যে সৌন্দর্য আর কখনো ফিরবে না সে সৌন্দর্যের জন্য দুঃখ না করে পারছি না। মানবজাতির হে শক্তিমান ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, তোমরা আবার নতুন করে সেই সুন্দর জগৎকে গড়ে তোল। তোমাদের হাতে সুন্দরভাবে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক সে জগৎ। সেই অপরূপ সৌন্দর্যের জগৎ তোমরা তোমাদের বুকের মধ্যে গড়ে তোল। স্বচ্ছ নূতন বোধশক্তি সহকারে নূতন জীবন শুরু করো। দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠুক নবজীবনের গান।

মেফিস্টোফেলিস: এরা সব নির্ভরযোগ্য এক একটি শক্তি, এরা সবাই আমার সেবা করে। ওদের কথা শোন। প্রতিটি কর্মে ও চিন্তায় ওদের পরামর্শ মেনে চল। এই দ্বন্দ্বময় জগতে, তোমার নির্জন নির্বান্ধব জগতে তোমার বুদ্ধিবৃত্তি পদে পদে তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও ওরা তোমায় ঠিক-ভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যে বেদনা যে যন্ত্রণা এতদিন ধরে তোমার বুকের ভিতরটা শকুনির মত ছিঁড়ে খাচ্ছিল সে বেদনা সে যন্ত্রণা চলে যাবে। আর পাঁচজনের মত তুমিও একজন মানুষ। কিন্তু যে জনতাকে তুমি ঘৃণার চোখে দেখ তার মাঝে তোমাকে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না। আমি এমন কোন মহান ব্যক্তি নই, তবু তুমি আমাকে সৎ নির্ভরযোগ্য এক বন্ধু হিসাবে বিশ্বাস করতে পার। আমি স্বেচ্ছায় সব সময় তোমার পাশে থেকে তোমাকে জীবনের পথে চালিত করব। যদি তুমি আমার কাজে তুষ্ট হও তাহলে আমি আজ থেকে সারা জীবন যত্ন ও সততার সঙ্গে তোমার সেবা করে যাব।

ফাউস্ট: তার জন্য আমায় কি দিতে হবে তোমায়?

মেফিস্টোফেলিস: এখনও অনেক সময় আছে। এই মুহূর্তে তার জন্য জেদ করো না।

ফাউস্ট: না, না, সব শয়তানরাই আত্মকেন্দ্রিক। তারা অকারণে মানব-বিদ্বেষী হয় এবং কাউকেই সাহায্য করতে চায় না। তুমি কি চাও তা স্পষ্ট করে বল। আমার ভয় হচ্ছে, এই ধরনের শয়তান ভৃত্য হতে অনেক বিপদ আসে।

মেফিস্টোফেলিস: আমি ক্রীতদাসের মত অক্লান্তভাবে তোমার সেবা করে যাব। তোমার প্রতিটি আদেশ পালন করে যাব। পরে যখন অন্যলোকে আবার আমাদের দেখা হবে, আমাদের মিলন ঘটবে, তুমি এমনি করে আমার সেবা করে যাবে।

ফাউস্ট : তোমার এই অন্যলোক কোন বিকার সৃষ্টি করতে পারবে না। তুমি যদি এই জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও তাহলে সেই পরলোক রইল বা না রইল একই কথা। এই জগতে আমাদের সকল আনন্দ বেদনারই একটা কারণ বা উৎসদেশ আছে। সূর্য তার গতিপথে আমাদের সে আনন্দ-বেদনার সাক্ষী হয়। এই জগৎ থেকে আমার জীবন যখন বিচ্ছিন্ন হবে চিরতরে তখন পরলোকে কি ঘটবে না ঘটবে তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। আমি তখন কিছুই শুনতে বা দেখতে পাব না। তখন সেই পারলৌকিক জীবনে আমি ঘৃণা না ভালবাসা কি চাইব? পরজন্মে উচ্চ না নীচ কোন বংশে জন্ম-গ্রহণ করব তা এখন ভাবার কোন অর্থ হয় না।

মেফিস্টোফেলিস : এদিক দিয়েও তুমি আমাকে বিশ্বাস করে দেখতে পার। আমার সঙ্গে চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে পার। আমার কৃতিত্ব ও কলাকৌশল তুমি আনন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করবে। মানুষ যা জীবনে কখনো চোখে দেখেনি আমি তোমাকে তাই দেব।

ফাউস্ট : হে হতভাগ্য শয়তান, তা হলেও তুমি আমাকে কিছুই দিতে পারবে না। নিজের কৃতিত্বটাকে বড় করে দেখছ কিন্তু মানবাত্মার কৃতিত্ব-সমূহকে কখনো তোমার মত শয়তানে বুঝতে পেরেছে? ভেবে দেখ, তোমার কাছে এমন খাদ্য আছে যে তাতে তোমার কখনো পেট ভরবে না। তোমার হাতে এমন স্বর্ণসম্ভার আছে যা শুধু বারবার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়, যার ছলনাময় উজ্জ্বলতা জয় করা যায় না। কোনদিন ধরা দেয় না আমাদের কাছে। সে সোনা ছলনাময়ী কোন যুবতী কুমারীর মত আমাদের প্রতারিত করে শুধু। যে যুবতী নারী আমাদেরই বুকে থেকে অন্য কোন লোকের উপর নিষ্ঠুর দৃষ্টিশর হানে এবং উপরে কপট সম্মানের ভান করে। মনে হয় কক্ষচ্যুত কোন উল্কা নেমে এসে নাচছে তার চোখের তারায়। আমাকে এমন কোন গাছ দেখাতে পার যে গাছে প্রতিদিন নূতন পাতা গজিয়ে উঠে ফলগুলিকে ঢেকে রাখে আর যে গাছের ফলগুলি পাকতে না পাকতেই পচে যায়।

মেফিস্টোফেলিস : তোমার এ দাবির কথা শুনেও ভয় পাই না আমি। আমি তোমাকে তাও দিতে পারি। কিন্তু তার এখনও সময় হয়নি বন্ধু। তখন আমরা আরও শান্তি ও উপাদেয় খাদ্য আশা করতে পারব।

ফাউস্ট : যখন আমি আলস্যভরে নির্জন শয্যায় শুয়ে থাকব তখন

আমায় হয়ত সহজেই মিথ্যা মোহপ্রসারী তোষামোদে আমাকে তুষ্ট ও পার্থিব আনন্দের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে পার, কারণ তখন আমার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি কাজ করবে না। তবে সেই দিনই যেন আমার জীবনের শেষ দিন হয়। তারপর আর আমি বাঁচতে চাই না।

মেফিস্টোফেলিস: ঠিক আছে।

ফাউস্ট: আমি আনন্দে সে মুহূর্ত বরণ করে নেব। তবু একটু দেরি করো। তুমি বড় সুন্দর। তুমি প্রথমে আমাকে এক অনন্ত বন্ধনে আবদ্ধ করো। তারপর আমার মৃত্যুর দিন ঘোষণা করো। আমার মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠলেই আমার সেবাকার্য হতে মুক্ত হবে তুমি। কালের ঘড়ির কাঁটা ভেঙ্গে যাবে, তার সব গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে আমার কাছে।

মেফিস্টোফেলিস: ভাল করে ভেবে দেখ। আমার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল।

ফাউস্ট: এ বিষয়ে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে। আমি কিন্তু আমার শক্তির মূল্যায়ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছি। হঠকারিতার সঙ্গে একাজ করিনি। আমি যাই করি না কেন, আমি আসলে একজন ক্রীতদাস। তোমার না অন্য কার সে বিষয়ে তর্ক করে লাভ নেই। যারই হই, আমি যেন এক ক্রীতদাস।

মেফিস্টোফেলিস: আজ তাহলে ডাক্তারের ভোজসভায় আমি চাকরের বেশে তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকব। তবে একটা কথা, কোন কিছুর ঝুঁকি না নিয়েই তুমি দু এক ছত্র লিখে দিতে পার প্রতিশ্রুতি হিসাবে।

ফাউস্ট: অহঙ্কারী কোথাকার? তুমি আমার কাছে দলিল চাইছ, প্রতিশ্রুতি দাবি করছ? কোন সত্যিকারের মানুষকে চেন না তুমি? তার কথার সত্যতার প্রমাণ কখনো পাওনি? আজ আমি যা বলছি ভবিষ্যতে তার কোন নড়চড় হবে না। একথা কি যথেষ্ট নয়? তাছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুই অক্ষয় নয়। নিরন্তর পরিবর্তনের যে স্রোত বয়ে চলেছে তাতে পৃথিবীর অনেক কিছুই পাল্‌টে যাচ্ছে। তুমি কি ভাব এই পরিবর্তনের স্রোতের মাঝে আমার প্রতিশ্রুতির বন্ধনটাই শুধু অক্ষয় হয়ে থাকবে? তবু ভ্রান্তি যায় না মন থেকে। সে ভ্রান্তি থেকে কে মুক্ত করবে আমাদের মনকে? নিবিড় সত্যোপলব্ধির দ্বারা যাদের অন্তর নির্মল ও সুন্দর হয়ে ওঠে তারা সত্যই ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য। তাদের কাছে কোন ত্যাগই দুঃখের নয়। মানুষের

বলা কথা বা লিখিত প্রতিশ্রুতির কি দাম আছে? কলমের কালি শুকোতে না শুকোতেই প্রতিশ্রুত কথারা মরে যায়। শুধু তাদের প্রেতমূর্তিগুলো জেগে থাকে কাগজের উপর। হে হীন শয়তান, বল কি চাও আমার কাছ থেকে? মর্মরপ্রস্তর, চামড়ার কাগজ, কাগজ না কাদামাটি? আমি তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি নির্বাচনের ভার। বল কি চাও?

মেফিস্টোফেলিস: কেন সঙ্গে সঙ্গে এত বেশী কথা বলে নিজেকে অকারণে উত্তপ্ত করে তুলছ? এই ধরনের চুক্তিপত্র লিখে রাখাই ভাল। এতে কাজ হয়। তবে তোমার নামটা কালির বদলে রক্ত দিয়ে সই করতে পার।

ফাউস্ট: যদি তুমি এতে খুশি হও তাহলে হাস্যকর হলেও একাজ আমি করব।

মেফিস্টোফেলিস: রক্ত হচ্ছে সবচেয়ে দামী ও বিরল বস্তুর নির্যাস।

ফাউস্ট: ভয় করো না, এ চুক্তির বন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নেব আমি। এ প্রতিশ্রুতি আমি বহু চেষ্টা করে করেছি। আমি নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার আসল স্থান তোমার পাশে। কোন দেবতা অপদেবতা আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। নিষ্করুণ প্রকৃতি তার সব দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে আমার সামনে। এতদিনের সঞ্চিত জ্ঞান এনেছে শুধু সীমাহীন বিতৃষ্ণা। চিন্তার সূত্র গেছে ছিঁড়ে। চল, আমরা দুজনে আমাদের কামনা বাসনার উচ্ছ্বসিত আবেগকে শান্ত করার জন্য ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির গভীরে চলে যাই। অজানার অস্পষ্ট কুয়াশা ভেদ করতে করতে প্রতি মুহূর্তে মূর্ত হয়ে উঠবে এক একটি চমক। নর্তনশীল কালের অশান্ত স্রোতধারায় ঘূর্ণিজটিল অবস্থার উন্মত্ত আবর্তের গভীরে ডুবে যাব আমরা। সুখ দুঃখ জয় পরাজয় ক্রমান্বয়ে সঙ্গ দান করবে আমাদের। অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যাওয়াই হলো মানুষের কাজ।

মেফিস্টোফেলিস: তোমার জন্য শর্তের বন্ধন থাকবে না। তুমি সব সময় সুখলাভের জন্য চেষ্টা করবে। তবে সে সুখ পাবে কি না সে বিষয়ে আমার কোন কিছু বলার নেই। আমার কথা শুধু এই যে, যাই করো সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাবে। কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করবে না।

ফাউস্ট: তুমি হয়ত শুনে থাকবে আমি নিজের আনন্দের জন্য একথা বলছি না। যে চঞ্চল চপল আনন্দ তীক্ষ্ণতম বেদনার কারণ সেই মধুর অথচ ঘৃণ্য আনন্দের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চাই আমি। কোন ব্যর্থতার বেদনাই

আমার অশান্ত চিত্তের অনন্ত জ্ঞানপিপাসাকে নিবারিত করতে পারবে না। সৃষ্টির আদি কাল হতে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে বিশ্বের মানুষ যে জীবন যাপন করে এসেছে, যে সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ভোগ করে এসেছে আমি আমার বোধ-শক্তির সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে তাদের সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখতে চাই আমার আপন সত্তার গভীরে। এইভাবে সুদূর অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত ছোটবড় সমস্ত মানুষের আত্মার মধ্যে আমার আত্মাটি হবে স্বচ্ছন্দে প্রসারিত। তাদের সঙ্গে আমি হয়ে উঠব একাত্ম।

মেফিস্টোফেলিস: আমার কথা বিশ্বাস করো। আমিও হাজার বছর ধরে এ পরীক্ষা করে এসেছি। ছোট বড় বহু মানুষের আত্মার মাংসগুলিকে চিবিয়ে এসেছি আমি। পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যে সুদূর আবহমান কাল থেকে নিয়তির নিয়ন্ত্রণপ্রভাবে নিরন্তর রূপান্তর লাভ না করে আসছে। আমার কথা বিশ্বাস করবে, আমরা যাকে স্বর্গ আর স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ও সুষমা বলি তা শুধু ঈশ্বর নিজের ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঠেলে দিয়ে দিবারাত্রির তরঙ্গদোলায় আমাকে তোমাকে দুলিয়ে তিনি চির আলোকোজ্জ্বল স্বর্গপুরীতে বাস করছেন।

ফাউস্ট: তা হোক, তবু আমি!

মেফিস্টোফেলিস: ভাল উত্তরই দান করেছ। তবে একটা ভয়ের কথা আছে। নদীর স্রোতের মত নিরবধি কালস্রোত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই কালস্রোতের আঘাত থেকে বাঁচতে হলে সেই কলাবিদ্যা শিখতে হবে যে কলাবিদ্যা দীর্ঘস্থায়ী করে রাখে সব কিছুকে। আমি বলছি, তুমি এই মুহূর্তে কোন কবির কাছে যাও। বল্গাদ্বারা তার অবাধ কল্পনাশক্তিকে প্রতিহত করগে। তার সৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের গুণের কথা বলে দাও। বল সিংহের প্রবল বিক্রম, বন্য হরিণের দ্রুত গতি, হঠকারী জ্ঞানীদের উত্তপ্ত রক্তের উচ্ছ্বাস, উত্তর ইউরোপের দেশগুলির শীতল সহনশীলতা প্রভৃতি গুণগুলির দ্বারা সমৃদ্ধ তার কাব্য। তাকে বলবে সে অনেক কিছু করেছে, তবে আর একটা জিনিস করতে হবে। তাকে বলবে সে যেন এমন এক গোপনসূত্র সৃষ্টি করে যা দিয়ে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাওয়ানো যায়, যা দিয়ে উচ্চ নীচে মিলন ঘটানো যায়, মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। আর একটা জিনিস শিখবে তার কাছে। তোমার জীবন ও যৌবনের আনন্দকে একটু অনুশাসিত করে চলতে শিখবে। দেখবে তোমার ভালবাসা ও ঘৃণার আবেগ যেন সব সময়

একটা নিয়ম ও ছন্দ মেনে চলে। আমি কিন্তু মোটেই বড় হতে চাই না। আমি চাই এমন একজন মানুষকে চাক্ষুষ করতে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে ছোট।

ফাউস্ট: তাহলে আমি কি পেলাম। আমি যদি সমগ্র মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের গৌরবমুকুটে ভূষিত হতে না পারলাম তাহলে আমার জীবনের দাম কি। আমি ত সারাজীবন ধরে তাই চেয়ে এসেছি।

মেফিস্টোফেলিস: দেখ, মোটের উপর তুমি যা তাই আছ, তাই থাকবে। বহিরঙ্গের কিছু রূপান্তর সত্ত্বেও মানুষের জীবনের মূল ধাতুর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। আজ তুমি যদি বড় হবার জন্য মাথায় অনেক পরচুলা পর আর তোমার জুতোর তলায় অনেক চামড়া লাগাও তাহলে সত্যিই তুমি বড় হবে ?

ফাউস্ট: এখন আমার মনে হচ্ছে এতকাল ধরে মানুষের চিন্তার জগৎ পরিক্রমা করে এত জ্ঞানবিদ্যা অর্জন করে কোন লাভই হয়নি আমার। আমি কিছুই পাইনি। যখন কোন অলস মুহূর্তে শান্ত নীরব অবকাশে বসে থাকি তখন অনেক চেষ্টা করেও আমার মস্তিষ্কের কোন গুহ্য প্রদেশে নূতনতর কোন শক্তির প্রাণকেন্দ্র আমি খুঁজে পাই না। আমি বেশ বুঝতে পারি আমার মানসিক সমুন্নতি এক চুলও বাড়েনি। ঈশ্বরের অনন্ত মহিমার কাছে এক পাও এগিয়ে যেতে পারিনি।

মেফিস্টোফেলিস: বাঃ, এইত চাই। এখন দেখছি, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত তুমি নিজের বাস্তব অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারছ। জীবনের আনন্দ সব ফুরিয়ে যেতে না যেতেই আমরা তোমাকে আরও জ্ঞানী করে তুলব। তোমার হাত আছে পা আছে মাথা আছে আর আছে যত সব অশুভ শক্তিনিচয়। এই সব দিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে তুমি। আমার কাছে যদি ছ'টা বড় আরবী ঘোড়া থাকে তাহলে আমার মনে হবে আমার বিশটার পা আছে আর তাই দিয়ে অনেক জোরে ছুটতে পারব। কিন্তু তুমি তোমার অবাধ কল্পনাশক্তিকে বিদায় দাও। জাগতিক কাজ কর্মে মন দাও। আমার কথা শোন, আমার মতে কোন কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তি হলো অনুর্বর মরু প্রান্তরে কোন অশুভ শক্তির দ্বারা ভুলপথে পরিচালিত কোন পশুর মত যে পশু অদূরবর্তী কোন সবুজ গোচারণ ভূমিতে না গিয়ে শুধু ঊষর তৃণহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

ফাউস্ট: কাজটা তাহলে কিভাবে শুরু করব ?

মেফিস্টোফেলিস: আরও বড় ক্ষেত্রে আমরা এ সত্য যাচাই করে দেখতে চাই। এটা শহীদ হবার জায়গা নয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এইভাবে নিজেকে ও অনুরাগী ভক্ত ও ছাত্রদের সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করে জ্ঞানবিস্তার বড়াই করাটাই কি বিজ্ঞতার পরিচায়ক? এটাই কি প্রকৃত জীবনযাপনের আদর্শ। তোমার জীবনের যে জ্ঞান সবচেয়ে বড় সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তা তোমার কোন ছাত্রের কাছে বলার কোন সাহস হবে না তোমার। কখনই না। কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

ফাউস্ট: তাকে দেখার কোন ইচ্ছা নেই আমার।

মেফিস্টোফেলিস: বেচারা ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরে আমার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে এভাবে নিরাশ হয়ে চলে যেতে দেওয়া উচিত হবে না। তোমার টুপী ও পোষাকটা আমাকে একবার ধার দাও। আমি ভালভাবেই একটা অভিনয় করব। (ছদ্মবেশ ধারণ করল) আমার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে। আমার বুদ্ধি ঠিক কাজ করে যাবে। তবে পনের মিনিট সময় আমার পক্ষে যথেষ্ট। এর মধ্যেই আমি আমার যাত্রা শেষ করে ফিরে আসব। তুমি তৈরি হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। (ফাউস্টের প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস: (ফাউস্টের লম্বা পোষাক পরে) যে যুক্তি যে জ্ঞান মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি তুমি সেই যুক্তি ও জ্ঞানকে ঘৃণা করো। মিথ্যা ছলনার অপদেবতা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার বন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ করে পতনের অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে যাক। তোমাকে সেই অবস্থায় আমি শীঘ্রই দেখব। অপ্রতিরোধ্য নিয়তি তাকে এমন এক মনোভাব দান করেছে যার ফলে সে তার প্রাপ্ত ও প্রাপনীয় পার্থিব ভোগসুখকে অগ্রাহ্য করে শুধু নিরন্তর অপ্রাপনীয়ের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। আমি তাকে কৌশলে বশীভূত করে উদ্দাম উচ্ছৃংখল জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব। অবিরাম দুঃখ বাধা আর সংগ্রামে পীড়িত করতে করতে তার মনকে এমনই উত্তপ্ত অতৃপ্ত ও অশান্ত করে তুলব যে সে শুধু মদ্যপানের স্বপ্নই দেখে যাবে, কিন্তু মদ্য পান করতেও পারবে না, সে কখনো জলযোগ করতে পারবে না। সে পুরোপুরি শয়তানে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কোন দিকেই পরিত্রাণ নেই তার। শয়তান হোক বা না হোক তাকে জাহান্নামে যেতেই হবে। (জনৈক ছাত্রের প্রবেশ)

ছাত্র : আমি অল্পক্ষণ এখানে এসেছি। যে যশস্বী ব্যক্তির নাম অনেকেই আমার কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনেকবার করেছে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ও তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছি।

মেফিস্টোফেলিস : তোমার সৌজন্যে আমি খুশি হলাম। তবে আমি আর পাঁচজনের মতই এক সাধারণ মানুষ। আচ্ছা, তুমি এর আগে নিশ্চয় কোথাও পড়াশুনো শুরু করেছিলে ত ?

ছাত্র : আমি একজন ভদ্র ও সঙ্গতিসম্পন্ন ঘরের সন্তান। আমি এখানে সাহসের সঙ্গে এসেছি। আমার মা আমাকে ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু উন্নততর জ্ঞানলাভের বাসনার বশবর্তী হয়ে চলে এলাম আমি।

মেফিস্টোফেলিস : তাহলে উপযুক্ত জায়গাতেই এসে পড়েছ।

ছাত্র : না আমি থাকব না, চলে যাব এখান থেকে। আমি শপথ করে বলছি। এই ঘর, এর দেওয়ালগুলো, এর ছাদ সব দেখেশুনে আমার বড় খারাপ লাগছে। এই সংকীর্ণ অনুদার পরিবেশে আনন্দের কোন অবকাশ নেই। এখানে কোথাও কোন গাছ বা সবুজের চিহ্ন নেই। পড়ার ঘরে আমি যখন বক্তৃতা শুনব তখন শব্দ দৃশ্য সহযোগে আমি কিছু কল্পনা বা চিন্তা করার কোন সুযোগ পাব না।

মেফিস্টোফেলিস : অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে সব কিছু। প্রথমে দেখবে অনেক সদ্যজাত শিশু মাতৃস্তনে মুখ দিতে গিয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে। মাতৃস্তন পান করতে গিয়ে কাঁদে। পরে অনবরত সেই মাতৃস্তনের সন্ধান করে। তেমনি জ্ঞানদেবীর স্তনদুগ্ধ পান করে একবার যদি আস্বাদ পাও তাহলে দেখবে তা ছাড়তে পারবে না। দিনে দিনে বেড়ে যাবে জ্ঞানলাভের আনন্দ।

ছাত্র : আমি সানন্দে লেগে থাকব। নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমি জ্ঞানলাভ করে যাব শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তার সঠিক পথটি দয়া করে বলে দিন।

মেফিস্টোফেলিস : তার আগে তুমি প্রথমে বল কোন বিশেষ বিষয়ে তুমি জ্ঞানলাভ করতে চাও ?

ছাত্র : স্বর্গে মর্ত্যে প্রকৃতিজগতে ও মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে যত রকমের বিদ্যা আছে আমি সেই সব বিষয়ে সর্বোচ্চ বিদ্যা লাভ করতে চাই।

মেফিস্টোফেলিস : এখানেই তুমি পাবে সঠিক পথের সন্ধান। তবে কঠোরভাবে তোমার মনকে নিবদ্ধ করতে হবে এবিষয়ে।

ছাত্র : দেহ মন দুটোকেই আমি সমানভাবে নিযুক্ত করব। তবে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। শুধু গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলোতে আমাকে কিছু স্বাধীনতা দিতে হবে।

মেফিস্টোফেলিস : যে সময় আমাদের ফাঁকি দিয়ে অতি দ্রুত পালিয়ে যায় সেই পলায়মান সময়কে কাজে লাগাতে হবে। আমি জোর করে বলতে পারি, একমাত্র নিয়মানুবর্তিতার দ্বারাই সময়কে জয় করা যায়, আয়ত্তাধীনে আনা যায়। তাহলে বন্ধু, প্রথমে তোমাকে তর্কবিদ্যা পড়তে হবে। এই বিদ্যা শিক্ষা করার ফলে তোমার মন মার্জিত হবে। স্প্যানিশ বুটজুতোর শক্ত করে লাগানো ফিতের মত সব বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে শিখবে। এলোমেলো বাতাসের মত এখানে সেখানে ঘুরে না বেড়িয়ে সঠিক চিন্তার পথ ধরে অর্থাৎ সঠিক চিন্তনপদ্ধতি অবলম্বন করে তোমার মন এগিয়ে চলতে শিখবে। তখন তোমার মন তোমার অতীত জীবনের কর্মাকর্মও বিচার করে দেখতে শিখবে। মানুষের মনের পশমী জমিটা হলো কোন বয়নশিল্পীর দ্বারা সৃষ্ট শিল্পকর্মের মতই আশ্চর্যজনক। হাজার হাজার সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে যেমন এক কাপড় তৈরি হয় তেমনি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য চিন্তাভাবনার সুতো দিয়ে তৈরি হয় মানুষের মনের জমি। দার্শনিকের কাজ হলো কাযকারণতত্ত্বের মাধ্যমে মনের জমির সুতোগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে দেখা। এই সম্পর্ক অপরিহার্য। এক না হলে যেমন দুই আসে না, তেমনি তিন না হলে চার আসে না। তবে দার্শনিক পণ্ডিতরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও বয়নশিল্পীদের মত সমগ্রতা সাধনে সার্থক হন না। বয়ন শিল্পীরা সব সুতো সুন্দরভাবে মিলিয়ে একখানি কাপড় করেন। কোন সুতোকে বাদ দেন না। কিন্তু বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতরা বড় একদেশদর্শী। যাঁরা শরীরবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞান চর্চা করেন তাঁরা আবার আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। জোর করে উড়িয়ে দেন। যে আংশিক জ্ঞানকে তিনি আয়ত্ত করেন তাকেই তিনি বড় করে দেখেন। কিন্তু প্রতিটি অংশের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক আছে এবং সে সম্পর্ক না থাকলে কোন অংশ কখনো সমগ্রে পরিণত হয় না সে সম্পর্ক তাঁরা স্বীকার করেন না। রসায়ণবিদ্যা বলে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এক অন্তর্নিহিত স্বরূপ আছে। সেটিকে জানলেই বস্তুর স্বধর্মকে জানা যাবে আর তাহলে সব রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। আত্মার কোন প্রয়োজন নেই।

ছাত্র : আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।

মেফিস্টোফেলিস : সবকিছু শেখার পর যখন শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে তখন সব কিছু বুঝবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছাত্র : আপনার কথা শুনে আমার মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল : আমার মাথাটা যেন আরো বেশী মোটা হয়ে গেল। আমার মাথার মধ্যে যেন একটা মিলের চাকা ঘুরছে।

মেফিস্টোফেলিস : তোমার প্রথম এবং প্রধানতম কর্তব্য হবে অধিবিদ্যা শেখা। তারপর তার প্রয়োগটা শিখবে। দেখবে ব্যাপারটা কত সুন্দর। দেখবে যে সুকঠিন বিদ্যা মানুষের মাথায় ঢোকে না তার থেকে কত লাভবান হচ্ছ তুমি। এমন কি যে সব তত্ত্ব তোমার মাথায় ঢুকবে না তুমি তাও মানুষকে উপযুক্ত ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারবে। তবে ছ'টা মাস তোমাকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে পড়াশুনো করতে হবে। বুঝতে পারছ ? দৈনিক পাচ ঘণ্টা করে পড়তে হবে। ঘড়ি ধরে। তোমাকে এমনভাবে পড়া মুখস্থ করতে হবে যাতে বইএর একটা কথাও বাদ না যায়। আবার এমনভাবে তাড়াতাড়ি লিখতে শিখবে যাতে মনে হবে সেই ধর্মীয় পবিত্র প্রেত তোমাকে শ্রুতিলিখন লেখাচ্ছে।

ছাত্র : এ কাজ আমি ঠিক করব। আর আমাকে দুবার বলতে হবে না। আমারও মনে হয় লেখার মত জিনিস আর নেই। কোন বিষয় একবার কাগজে লিখে নিতে পারলে তা আমার আয়ত্তে এসে যাবে চিরদিনের মত।

মেফিস্টোফেলিস : তা ত হলো। তবে একটা বিষয় নির্বাচন করো।

ছাত্র : আমি আইন-তত্ত্বের সঙ্গে মোটেই খাপ খাওয়াতে পারি না নিজেকে।

মেফিস্টোফেলিস : তার জন্য ছাত্রদের আমি দোষও দিতে পারি না। এই আইন-তত্ত্বের আজ কি অবস্থা হয়েছে আমি তা জানি। এক যুগ হতে অন্য যুগে, এক স্থান হতে অন্য স্থানে এই সব আইন আর যত সব আইনগত অধিকার এক চিরস্থায়ী রোগের মত পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হচ্ছে সকলের মধ্যে। যুক্তি, পরোপকারপ্রবৃত্তি সব গোল্লায় গেছে। তুমি ত আমার পৌত্রের মত। এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। আমরা যারা বয়োপ্রবীণ তারা সব ভেবে দেখব।

ছাত্র : আপনার কথা শুনে আইন-তত্ত্বের উপর আমার স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেল। আপনার কাছে পড়তে পারাটা সত্যিই ভাগ্যের কথা। আমি প্রায় ঠিক করে ফেলেছি আমি ধর্মতত্ত্ব শিখব।

মেফিস্টোফেলিস : আমি চাই না তুমি এ বিষয় শিখতে গিয়ে কারো দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হও। এই তত্ত্বের ব্যাপারে আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। মানুষ সাধারণতঃ ভুল পথে না গিয়ে পারে না। চিকিৎসাবিদ্যায় যেমন মানুষ ঠিক রোগ ধরতে পেরে ঠিকমত ওষুধ প্রয়োগ করতে পারে না সব সময় তেমনি ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রেও আসল তত্ত্ব ধরতে পারে না। অনেক গোপন ভ্রান্তি বিষের মত কাজ করে যাচ্ছে এই তত্ত্বের মধ্যে। শুধু তোমার শিক্ষকের কথা শুনে যাবে। সেই কথাকেই সত্য বলে মেনে নেবে। শুধু এই কথাকে অবলম্বন করেই একদিন নিশ্চিত সত্যের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে।

ছাত্র : তবে এই কথার মধ্যে কিছু ভাব বা আদর্শ থাকা চাই।

মেফিস্টোফেলিস : অবশ্যই। তবে খুব বেশী উগ্র বা তীক্ষ্ণ ভাব থাকা ঠিক নয়। কথা দিয়েই খুব ঝগড়া করা যায় আবার কথা দিয়েই খুব ভাল বন্ধুত্বও গড়ে তোলা যায়। কথা দিয়েই বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় মানুষের মনে। এই কথার সম্পদ কেউ চুরি করলেও কথার কিছু যায় আসে না।

ছাত্র : মাপ করবেন। আপনাকে অনেক প্রশ্ন করেছি। আরো কিছু জানার আছে। আমি আপনার কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাই। আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন। হা ভগবান! মাত্র তিন বছরে কখনো এই শাস্ত্রের ক্ষেত্রটি পুরোপুরি জানা যায়?

মেফিস্টোফেলিস : (স্বগত) এই নীরস কথার কচকচি আর আমার ভাল লাগছে না। আমি বিরক্তি বোধ করছি। আবার আমাকে শয়তানের মত আচরণ করতে হবে। (উচ্চকণ্ঠে) চিকিৎসাবিদ্যার মূল তত্ত্বটি জানা খুবই সহজ। যদিও পরিশেষে তোমাকে একদিন তোমার এই ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে তথাপি এই জগৎ সম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করাই হলো বিজ্ঞানের যে কোন শাখার কাজ। বিজ্ঞানের এক একটি বিশাল ক্ষেত্রকে মানুষ যতই পরিক্রমা করুক না কেন, মানুষ তার নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত কিছুই শিখতে পারে না। তবে যে মানুষ যে শিক্ষার্থী প্রতিটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে ঠিকমত সেই হচ্ছে প্রকৃত মানুষ। তোমার দেহটি বেশ সুগঠিত, এটা অস্বীকার করা যায় না। তুমি অবশ্যই

একটু চেষ্টা করলে কৃতকার্য হবে। যদি তুমি নিজের উপর আস্থা রাখ, তাহলে অবশ্যই বাইরের সব মানুষ আস্থা রাখবে তোমার উপর। আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের মত শক্তি আর নেই। তবে নারীজাতির মন জয় করতে হলে তোমাকে বিশেষভাবে তাদের আবেগানুভূতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে হবে। তা যদি বুঝতে পার তাহলে দেখবে অনন্তকাল ধরে যে বেদনা যে ব্যর্থতার হাহাকার অসংখ্য নারীকণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার মূল উৎস কিন্তু এক এবং তার প্রতিকারের উপায়ও এক। যদি তোমার কাজকর্ম অর্ধেক কলাকৌশলেরও পরিচয় দিতে পারে তাহলে তারা তোমার পদানত হয়ে থাকবে। তবে তোমার নামের সঙ্গে একটা জাঁকজমকপূর্ণ উপাধি জুড়ে দিতে হবে এবং দেখাতে হবে তোমার দক্ষতা এ ব্যাপারে আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। তখন তুমি সামান্য অভিবাদনের ভঙ্গিতে অবাধে তাদের দেহ স্পর্শ করতে পারবে। কেউ কোন বাধা দেবে না। এমনি করে বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকলে তুমি আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তখন তুমি তাদের হাত টিপে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া পরীক্ষা করতে গিয়ে আড়চোখে তাদের পানে তাকিয়ে তাদের নিতম্বগুলিকে জড়িয়ে ধরতে পারবে। আর দেখবে তখন তাদের দৃঢ়সংবদ্ধ কটিতটের নীবিবন্ধগুলি শিথিল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

ছাত্র: ভাল কথা। তবে কিভাবে সে দক্ষতা অর্জন করা যায় সেইটাই হলো কথা।

মেফিস্টোফেলিস: শোন বন্ধু, একমাত্র জীবনকে উপভোগ করো। জীবনের সোনালি গাছই হলো একমাত্র সবুজ আর সজীব। বাকি সব তত্ত্ব হলো ধূসরবর্ণ, সব নীরস।

ছাত্র: এসব কথা আমার কাছে স্বপ্নের মত শোনাচ্ছে। বুকে অন্তহীন বিশ্বাস নিয়ে আমি যদি আবার আপনার জ্ঞানের কথাগুলি শুনতে পেতাম এবং সেই সঙ্গে দুর্বোধ্য জটিল অংশগুলি আপনি সরল করে বুঝিয়ে দিতেন আমায়।

মেফিস্টোফেলিস: সানন্দে আমি তা যথাসাধ্য অবশ্যই করতাম।

ছাত্র: না না, আমি চলে যেতে পারি না কিছুতেই। আমার স্বাক্ষরসংগ্রহ পঞ্জীটি আপনি দেখুন প্রথমে। আমার এ অনুরোধ রাখতেই হবে। এতে আপনাকে কিছু লিখে দিতে হবে।

মেফিস্টোফেলিস: অবশ্যই। (কি লিখে তা ফিরিয়ে দিল ছাত্রের হাতে)

ছাত্র : (বইটি বন্ধ করে মেফিস্টোফেলিসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল)

মেফিস্টোফেলিস : প্রাচীন শাস্ত্রকে অনুসরণ করে চল। যে সাপকে পদদলিত করার জন্য একদিন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তোমাকে সেই সাপকেই অনুসরণ করে যাবে। তোমাকে দেখতে যতই দেবতার মত মনে হোক না কেন, আসলে তোমার অবস্থা হবে বড় সকরুণ।

(ফাউস্ট প্রবেশ করল)

ফাউস্ট : এবার কোথায় কোন দিকে যাব আমরা?

মেফিস্টোফেলিস : যেখানে তোমার খুশি যেতে পার। আমরা প্রথমে ক্ষুদ্র তারপর বৃহত্তর জগৎকে পরিক্রমা করি। কিন্তু এবার তোমাকে খতিয়ে দেখতে হবে এতদিন ধরে এ দুটি জগৎ পরিক্রমা করে, প্রথম থেকে জীবন শুরু করে কী আনন্দ কী উত্তম বস্তু লাভ করলে?

ফাউস্ট : আমি আমার দাড়ি ধরে শপথ করে বলতে পারি কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা সম্মান আমি পাইনি সে জগতে। এক অর্থহীন সংগ্রাম সন্ধান আর প্রচেষ্টার মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে আমার সকল উদ্যম। আমি আমার জীবনযাত্রার সঠিক পথটি চিনতে পারিনি। আর পাঁচজন মানুষের মাঝে নিজেকে বড় ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আর তাই ভেবে বড় অস্বস্তি জাগে মনে।

মেফিস্টোফেলিস : তুমি আত্মস্থ হও। ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে সব কিছু ভেবে দেখ। তোমার মন থেকে সকল অস্বস্তি দূর হয়ে যাবে। জীবনধারণের সব কলাকৌশল তোমার আয়ত্তের মধ্যেই আছে জেনে রেখো।

ফাউস্ট : এখন কি আমার এই বাড়িটা ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ব? তোমার লোকজন গাড়ি ঘোড়া সব গেল কোথায়?

মেফিস্টোফেলিস : আমরা একখানি বস্ত্র কায়দা করে শূন্যে বিছিয়ে দেব। তারপর শূন্যে সাঁতার কেটে পথ করে যাব। দেখবে শূন্যে এইভাবে যখন উড়ে যাব আমরা তখন আমাদের মানপত্রগুলোকে খুব হালকা লাগবে। এইভাবে আমরা পৃথিবী ছেড়ে বহু উর্দ্ধে খুব দ্রুত উড়ে যাব। আমি তোমাকে তোমার এই নূতন জীবনে স্বাগত জানাই।

পঞ্চম দৃশ্য

লিপজিগে অবস্থিত অয়েরবাকের কক্ষ।

পানোন্মত্ত সঙ্গীদের উল্লাসধ্বনি।

প্রসক্ : কই, কেউ হাসছে না? কেউ মদ্যপান করছে না? আমি ভাবাঃ কেমন করে হাসতে হয় তা তোমাদের শিখিয়ে দেব। সাধারণতঃ তোমরা বেশ গরম হয়ে থাক, কিন্তু ভিজে খড়ের মত এমন মিইয়ে উঠেছ কেন?

ব্র্যাণ্ডার : সেটা তোমারও দোষ। তুমি মদ্য পান করলেও তোমার মধ্যে তার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। কোন পাশবিকতা বা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় পাচ্ছি না।

প্রসক্ : (ব্র্যাণ্ডারের মাথায় একপাত্র মদ ঢেলে দিল)

এই নাও দুইএরই পরিচয়।

ব্র্যাণ্ডার : আবার দাও।

প্রসক্ : তুমি যা চেয়েছিলে আমি তা দিয়েছি।

সীবেল : যারা ঝগড়া করছে ঘর থেকে বার করে দাও তাদের। পুরো ভরা গলায় কোরাস গাও। মদ পান করো ইচ্ছামত। হৈহুল্লোড়ে মেতে ওঠ। চিৎকার করো, হুল্লা!

আলত্‌মেয়ার : হা ভগবান! ষাঁড়ের মত চিৎকার করছে কে? তুলো নিয়ে এস তাড়াতাড়ি। আমার কানের পর্দা ফেটে গেছে।

সীবেল : যখন গানের শব্দে আকাশ ফাটে তখন বুঝতে হবে পানের পাত্রটি গভীর আর তাতে অনেক মদ আছে।

প্রসক্ : বাঃ বেশ বলেছে। যারা এ সব একটুও পছন্দ করে না তারা বেরিয়ে যেতে পারে। গাও, টারা লারা তা।

আলত্‌মেয়ার : টারা লারা ডা।

প্রসক্ : এবার গলায় স্বর এসেছে। নাও, শুরু করা।

গান

হে আমার প্রিয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য,

কেমন করে তুমি বিধৃত আছ একটিমাত্র ঐক্যসূত্রে!

ব্র্যাণ্ডার : বাজে গান। ধিক ধিক! এ হচ্ছে রাজনৈতিক গান। অত্যন্ত আপত্তিকর গান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে প্রতিদিন সকালে তোমাদের

রোমান রাজ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। আমি যে দেশের চ্যান্সেলার বা কাইজার হয়ে উঠিনি এজন্য ভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে। তবে আমাদের মাথার উপরে অবশ্যই একজন শাসক চাই। তুমি জান গুণই মানুষকে বড় করে তোলে। গুণের জন্যই মানুষ মানুষকে বড় হিসাবে নির্বাচিত করে।

প্রসক্: হে আমার মানসী প্রিয়া নাইটিঙ্গেল, তোমাকে হাজার বার আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাই।

সীবেল: না না, ও আমার প্রিয়া। আমার প্রিয়াকে তোমার বলে চালিও না। এতে আমার রাগ হচ্ছে।

প্রসক্: আমার প্রিয়াকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, তাকে চুম্বন করছি। আমি তোমার উক্তির প্রতিবাদ করছি।

গান

চাবি খোল, দরজা খোল, আঁধার হয়েছে
চাবি খোল, দরজা খোল, প্রেমিক জেগেছে।
চাবি দাও, দরজা লাগাও, সকাল হয়েছে।

সীবেল: তুমি যত খুশি গান করো। তার গুণগান করো। তার জন্য গর্ব করো। উপযুক্ত সময়ের জন্য আমি অপেক্ষা করব। একদিন সে আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে, এবার তোমাকেও তাই করবে। তার প্রেমিক হবে কোন একটা কুৎসিত স্থূল প্রকৃতির লোক। ব্লকসবার্গ থেকে আসা একটা বুড়ো পাটা তার সঙ্গে প্রেম করবে। আমাদের মত ভদ্র বংশের সন্তান তার উপযুক্ত পাত্র নয়। আমি তাকে স্মরণ করে দেব? অন্তরের প্রতি অভিনন্দন জানাব? কখনই নয়। বরং তার ঘরের জানালা ভেঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করব।

ব্র্যাণ্ডার: শোন সকলে। আমার কথা শোন মনোযোগ দিয়ে। আমি স্বীকার করছি, হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমি জানি কেমন করে বাঁচার মত বাঁচতে হয়। এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই প্রমোদাভিলাষী। তাঁদের আপন আপন গুণানুসারে আমি সকলকেই কিছু না কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করব। শোন তোমরা, এই সুরটা আমার নূতন ধাঁচের। শুনতে শুনতে সকলেই তাল দেবে।

গান

কোন একটা বাড়িতে বাসা নিয়েছিল একটা ধেড়ে ইঁদুর।
মাখন আর যত সব চর্বিজাতীয় খাদ্য খেয়ে তার দেহটা
হয়ে উঠেছিল গোলগাল আর মসৃণ।

ডাক্তার লুথারের মত তার পিঠে একটা কুঁজ ছিল।
একদিন রাঁধুনি মেয়েটি কৌশলে বিষ মিশিয়ে
দিল খাবারের সঙ্গে আর সেই খাবার খেল ধেড়ে ইঁদুরটি।
তখন তার প্রাণান্তকর অবস্থা।
তখন তার সে অবস্থা দেখে মনে হলো,
তার বুকের ভিতর প্রেমের পাখিটা যেন ছটফট করছে।

কোরাস

যেন তার বুকের ভিতর প্রেমের পাখিটা ছটফট করছে।

ব্র্যাণ্ডার

সে তখন যন্ত্রণায় ছোটাছুটি করতে লাগল।
তার গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্য চৌবাচ্চার
ময়লা জলে ডুব দিল।
সারা বাড়িটা আঁচড় কেটে বেড়াতে লাগল;
কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম ঘটল না তার।
উন্মাদের মত যেখানে সেখানে ঝাঁপাতে লাগল,
ঘুরপাক খেতে লাগল; দেখে মনে হলো,
তার বুকের ভিতর প্রেমের পাখিটা যেন ছটফট করছে।

কোরাস

যেন তার বুকের ভিতর প্রেমের পাখিটা ছটফট করছে।

ব্র্যাণ্ডার

অবশেষে সেদিন সেই স্পষ্ট দিবালোকেই
সে নির্লজ্জের মত ছুটে চলে গেল রান্নাঘরে।
তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্বলন্ত উনোনটার উপর।
প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে থাকা দেহটা তার হঠাৎ নিথর
হয়ে গেল শেষবারের মত আর ঠিক তখনি
খুনী রাঁধুনি মেয়েটা হি হি করে হাসতে হাসতে
বলল, বাছাধন এবার তাহলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন,
যেন ওর বুকের ভিতর প্রথম প্রেম জেগেছে।

কোরাস

যেন ওর বুকের ভিতর প্রথম প্রেম জেগেছে।

সীবেল : দেখ দেখ, বোকা লোকগুলো কেমন ঘটনাটাকে মজার ব্যাপার হিসাবে উপভোগ করছে। আমার কাছে কিন্তু এর অর্থ ভিন্ন। আমার মতে এভাবে বিষ দিয়ে ইঁদুর মারা একটা জঘন্য কৌশলমাত্র।

ব্র্যাণ্ডার : তুমি তাহলে তাদের পক্ষ অবলম্বন করবে।

আলত্‌মেয়ার : আমি জানি ন্যাড়ামাথা ভুঁড়িমোটা লোকটা জীবনে অনেক ঘা খেয়েই একথা বলেছে। বিষ খেয়ে মরা ঐ ইঁদুরটার মধ্যে ও হয়ত নিজের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতিটাই দেখতে পাচ্ছে।

ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস

মেফিস্টোফেলিস : এই সব প্রমোদপিপাসু স্ফূর্তিবাজ লোকদের সামনে তোমাকে নিয়ে এসেছি। আমি তোমাকে এখানে এনে দেখাতে চাই এখানে জীবনের গতি কত সাবলীল কত স্বচ্ছ। এখানে এরা প্রতিটি দিনই ছুটির দিন হিসাবে উপভোগ করে। বিড়ালছানারা যেমন তাদের লেজ নিয়ে একটা ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে খেলা করে ওরাও তেমনি একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সারা জীবন ধরে ঘুরপাক খায়, ওদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। যদি বড় রকমের কোন মাথা-ব্যথা না ঘটে এবং যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীতে ওদের আতিথেয়তার অবসান না হয় ততদিন ওরা বেশ হাসি খুশির মধ্যেই জীবন যাপন করে।

ব্র্যাণ্ডার : আসল কথাটা খুবই সহজ। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন দেশভ্রমণ থেকে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছে। যেন এক ঘণ্টাও এখনো অতিবাহিত হয়নি।

প্রসক্ : ঠিক আসল জায়গায় ঘা দিয়েছ তুমি। ঠিক বলেছ লিপজিগ আমার খুবই প্রিয়। প্যারিসও অবশ্য কিছুটা বটে। ওখানকার লোকগুলো কি করে এত মার্জিত হয় কে জানে।

সীবেল : আমাদের মধ্যে বিদেশী বলে কাদের মনে হয় তোমার ?

প্রসক্ : ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তাদের মদপান করাব। তারপর যেমন কৌশলের সঙ্গে ছেলেদের মুখ থেকে দুধ-দাঁত টেনে বার করে নেওয়া হয় আমিও তেমনি ওদের ভিতর থেকে সব গোপন কথা বার করে নেব। ওদের দেখে বেশ বড় ঘরের লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে ওদের মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে।

ব্র্যাণ্ডার : আমাদের এই সব হৈ হল্লোড়ের মাঝে ও আল্পস পর্বতের মঁ ব্ল্যাঁ শৃঙ্গের মত অটল গম্ভীর হয়ে আছে।

আলত্‌মেয়ার : এই দেখ, আমি এবার ওদের সিগারেট খাওয়াব। মুখে ধোঁয়া দেব।

মেফিস্টোফেলিস : এই লোকগুলো এত সরল প্রকৃতির যে শয়তান যদি ওদের ঘাড় না ধরে তাহলে কোনমতেই কাউকে শয়তান বলে সন্দেহ পর্যন্ত করবে না।

ফাউস্ট : আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন ভদ্রমহোদয়গণ!

সীবেল : আমাদেরও অভিবাদন ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

(পাশে মেফিস্টোফেলিসকে দেখতে পেয়ে কিছু গুঞ্জনধ্বনি তুলল উপস্থিত সকলে)

লোকটার একটা পা খোঁড়া।

মেফিস্টোফেলিস : এখানে বহু চেষ্টা করেও মদপানের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। আপনাদের এই প্রমোদানুষ্ঠানে আমরা যোগদান করতে পারি কি? আপনাদের সাহচর্যে আমরা যথেষ্ট আনন্দ পাব।

আলত্‌মেয়ার : আপনাকে দেখে খুব খুঁতখুঁতে লোক বলে মনে হচ্ছে।

প্রসক্ : রিপাক থেকে রওনা হতে নিশ্চয় আপনারা দেরি করেছিলেন? মনে হয় সেখানে হ্যানদের সঙ্গে নৈশভোজন সারতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়।

মেফিস্টোফেলিস : আজ অবশ্য আমাদের কেউ কোথাও ডাকেনি। তবে রওনা হবার সময় ঐ ভদ্রলোকের জ্ঞাতিভাইরা আমাদের ছেঁকে ধরেছিল। তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলাম আমরা। তারা চাইছিল আমরা তাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে বিদায় জানাই।

(মাথা নত করে প্রসক্‌কে নমস্কার জানাল)

আলত্‌মেয়ার (জনান্তিকে) : এবার নাও। ও বুঝতে পেরে গেছে।

সীবেল : একটা আস্ত জুয়োচোর। মুখে চোখে একটা তীক্ষ্ণ চাতুর্যের ভাব।

প্রসক্ : দাঁড়াও না। আমি ওকে দেখছি।

মেফিস্টোফেলিস : কিছুক্ষণ আগে আমরা সুদক্ষ গায়কদের সমবেত কণ্ঠের মধুর গান শুনেছিলাম। সে গান আমরা ভাল করে আবার শুনতে চাই। সুগীত সে গানের সুরধারা আমাদের উপর আবার ঝরে পড়ুক।

প্রসক্ : আপনারা কি তীর্থযাত্রী?

মেফিস্টোফেলিস : না না, অবশ্য ধর্ম করার ইচ্ছা আমার অনেক বড়

কিন্তু ক্ষমতায় কুলায় না।

আলত্‌মেয়ার : আমাদের একটা গান শোনান।

মেফিস্টোফেলিস : আপনারা যদি একান্তই চান, তবে ঠিক গান নয়, এমনি একটা সুরেলা ছড়া।

সীবেল : তবে যেন একেবারে নতুন ধরনের হয়।

মেফিস্টোফেলিস : যে দেশ নিয়ত শুধু মদ, গান আর ঘুমে ভরা সেই সুন্দর স্পেন দেশ থেকে এইমাত্র ফিরে এসেছি আমরা।

গান

কোন এক সময়ে এক রাজা রাজত্ব করত
তার এক বড় কালো রক্তচোষা গিরগিটি ছিল।

শোন শোন! গিরগিটি। কথাটার মানে বুঝেছ? তবে গিরগিটি আমার মতে বেশ পরিচ্ছন্ন অতিথি।

মেফিস্টোফেলিস

কোন এক সময়ে এক যে ছিল রাজা
তার ছিল একটা বড় কালো গিরগিটি।
তাকে সে নিজের ছেলের মত ভালবাসত;
সে ভালবাসার কারণ কিছু বোঝাই যেত না।
রাজা একদিন তাঁর দর্জিদের ডেকে বললেন,
ঐ ছেলেটার গায়ের মাপ নিয়ে একটা কোট বানাও।

ব্র্যাণ্ডার

তবে দেখো যেন দর্জি আবার খেয়ালখুশি মত
কোন ভুল না করে। মাপটা যেন ঠিক নেওয়া হয়।
কাপড়টা যেন ঠিকমত ছাঁটা হয়
আর সেলাইটাও যেন ঠিকমত হয়।

মেফিস্টোফেলিস : এইভাবে দামী রেশমী আর মখমলের পোষাকে সাজানো হলো। তার কোটের উপর ফিতে ঝুলত। বুকে ছিল ক্রুশ চিহ্ন। সে লাভ করল মন্ত্রীর নাম এবং পদমর্যাদা। আর তার আত্মীয়-স্বজনরা পরিণত হলো রাজদরবারের সভাসদবর্গে।

তারপর দেখা গেল, গিরগিটিগুলো রাজবাড়িতে যত্রতত্র, শোবার ঘরে ও বিছানায় ঘুরে বেড়িয়ে রাণী ও রাণীর সহচরীদের কামড়িয়ে রক্ত বার করে

দিচ্ছে। কিন্তু রাজার ভয়ে তাদের গায়ে কারো হাত দেবার সাহস হলো না। কিন্তু আমাদের যদি তারা একবার কামড়ায় তাহলে আমরা তাদের পিষে মেরে ফেলব।

কোরাস

আমাদের যদি একবার তারা কামড়ায় তাহলে
তাদের পিষে মেরে ফেলব আমরা তৎক্ষণাৎ।

প্রসক্ঃ চমৎকার, খুব ভাল হয়েছে।

সীবেল ঃ প্রত্যেকটা গিরগিটি যেন এমন রাজসম্মান লাভ করে।

ব্র্যাণ্ডার ঃ তোমার আঙ্গুল বারিয়ে এই ধরনের গিরগিটিদের মেরে ফেল।

আলত্মেয়ার ঃ স্বাধীনতা আর মদ দীর্ঘজীবী হোক।

মেফিস্টোফেলিস ঃ তোমাদের সঙ্গে মদ পান করা মানেই স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাছে মদপান করা। অবশ্য তোমাদের যে মদ পান করতে দেখছি তা যদি ভাল হয়।

সীবেল ঃ আবার সেই গান শোনাবে না আমাদের ?

মেফিস্টোফেলিস ঃ আমার ভয় হচ্ছে বাড়িওয়ালা রেগে যাবে। তা না হলে দেখিয়ে দিতাম কিভাবে আপনাদের মত সুযোগ্য অতিথিদের আনন্দ দান করতে হয়।

সীবেল ঃ সে আনন্দ দান করো তুমি। বাড়িওয়ালা যা বলার আমাকে বলবে।

প্রসক্ঃ মদ ভাল হলে আমাদের কাছ থেকে প্রশংসাও পাবে প্রচুর। তবে যেন নমুনা হিসাবে যা দেবে তা যেন খুব অল্প দিও না। কোন মদ ভাল কি মন্দ তা যাচাই করতে হলে অনেকখানি খেয়ে দেখতে হবে।

আলত্মেয়ার ঃ (স্বগত) রাইন থেকে আনা হয়েছে। আমি অবশ্য তা আগেই ভেবেছিলাম।

মেফিস্টোফেলিস ঃ আমাকে একপাত্র এনে দাও।

ব্র্যাণ্ডার ঃ তা দিয়ে কি করবে ? এ ত খুবই অল্প।

আলত্মেয়ার ঃ ঐ অদূরে বাড়িওয়ালার যন্ত্রপাতির বাক্সটার মধ্যে আর এক বোতল আছে।

মেফিস্টোফেলিস (পানপাত্র হাতে নিয়ে)

(প্রসকের প্রতি)

এখন তোমাদের কি ধরনের মদ পছন্দ সেকথা বল।

প্রসক্: একথার মানে? তোমার কাছে কি বিভিন্ন রকমের মদ আছে?

মেফিস্টোফেলিস: তোমরা ইচ্ছামত বাছাই করতে পার। মন ঠিক করে ফেল।

আলত্‌মেয়ার: তুমি ত মদের কথা শুনেই তোমার হাতের চপটাকে চাটতে শুরু করে দিয়েছ।

প্রসক্: ঠিক আছে। আমার পছন্দের কথা যদি বল তাহলে আমাকে দিতে পার রেনিশ মদ। আমাদের পিতৃভূমিতেই এ মদ প্রচুর পাওয়া যাবে।

মেফিস্টোফেলিস: (প্রসক্ যেখানে বসেছিল সেইখানে টেবিলের ধারে একটা ছিদ্র করে) আমাকে শীঘ্র একটু মোম দাও। এই বোতলের মুখটা ছিপির মত আটকে দিতে হবে।

আলত্‌মেয়ার: এ যে দেখছি যাদুকরের ইন্দ্রজাল।

মেফিস্টোফেলিস (ব্র্যাণ্ডারের প্রতি): আর তুমি কি নেবে?

ব্র্যাণ্ডার: আমি চাই শ্যাম্পেন। বেশ যেন উজ্জ্বল আর টাটকা হয়।

মেফিস্টোফেলিস: (টেবিলে আবার একটা ছিদ্র করল। ইতিমধ্যে একজন মোমের ছিপি দিয়ে বোতলের মুখগুলো বন্ধ করে দিল)

ব্র্যাণ্ডার: যা বিদেশী জিনিস যা ভাল জিনিস তা হাতের কাছে সব সময় পাওয়া যায় না। আবার বিদেশী মানুষের থেকে বিদেশী ভাল জিনিসকে আমরা পছন্দ করি বেশী। দেখ, একজন জার্মান একজন ফরাসীকে কাছে পেয়ে সহ্য করতে পারে না; কিন্তু সে ফরাসী মদ খেতে খুব ভালবাসে।

(মেফিস্টোফেলিসকে তার আসনের দিকে আসতে দেখে)

সীবেল: আমার কথা যদি বলতে চাও, আমি টক মদ একেবারে পছন্দ করি না। আমার পাত্রে খুব মিষ্টি মদ ঢেলে দাও।

মেফিস্টোফেলিস: অবশ্যই মিষ্টি মদে পানপাত্র ভরে উঠবে তোমার।

আলত্‌মেয়ার: না না, আমার পানে তাকাও। আমার মুখপানে তাকাও। আমার মনে হচ্ছে আমাদের ঠকিয়ে তুমি মজা করছ।

মেফিস্টোফেলিস: না না, তোমাদের মত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি প্রতারণা করতে কখনো সাহস পাই? বল বল, তোমাদের পছন্দের কথা বল তাড়াতাড়ি। বল, কি মদ তোমাদের দেব?

আলত্‌মেয়ার: যে কোন মদ—তবে আমাদের চাহিদা যেন মেটে।

মেফিস্টোফেলিস : (নিজে একক অঙ্গভঙ্গী সহকারে)

আঙুরগাছে আঙুর থোকা যেমন শোভা পায়
তেমনি মাথায় শিং নিয়ে পাঁটারা বেড়ায়।
আঙুর গাছে কাঠ আছে আঙুর ভর্তি রসে
বল, কাঠের টেবিলে মদ কেমন করে আসে।
দেখবে যাদু প্রকৃতিতে যেদিকে তাকাও
ছিপি খুলে বোতল থেকে দেদার মদ খাও।

(তারা সবাই ছিপি খুলতেই সকলে আপন আপন বোতলে পছন্দমত মদ পেয়ে গেল)

বাঃ চমৎকার, মদের ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে যেন। যে যত খুশি মদ খেয়ে যাও।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু দেখো, যেন মদ মাটিতে পড়ে না যায়। ফেলো না।

(তারা বারবার মদ পান করল)

সকলে (গান করতে লাগল)

যেন পাঁচশত বনশূয়োর মিলিত হয়েছে
আমরা এক পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করছি।

মেফিস্টোফেলিস : দেখ দেখ, ওরা কেমন সুখী, ওরা কেমন স্বাধীন।

ফাউস্ট : আমি এখন এখান থেকে চলে যেতে চাই।

মেফিস্টোফেলিস : লক্ষ্য করবে, ওদের এই পাশবিক আনন্দোন্মত্ততা হতে এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হবে।

(সীবেল অন্যমনস্কভাবে মদ পান করতে গিয়ে কিছু মদ মাটিতে পড়ে যেতেই তা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল।)

সীবেল : কে আছ বাঁচাও। বাঁচাও। আগুন, আগুন। সাক্ষাৎ নরকাগ্নি কে যেন পাঠিয়ে দিয়েছে।

মেফিস্টোফেলিস : (মন্ত্র দ্বারা আগুন নিভিয়ে দিয়ে) শান্ত হও বন্ধুগণ, শান্ত হও।

(উপস্থিত প্রমোদাভিলাষী ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে)

আমাদের বাড়াবাড়ির জন্য এ শুধু এক ভর্ৎসনা।

সীবেল : কি বলতে চাও তুমি? থাম থাম। এর জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা তোমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব আমরা কে আর

সেটা ভাল হবে না তোমার পক্ষে।

প্রসক্ : ও খেলা আর যেন খেলতে এসো না আমাদের সঙ্গে।

আলত্‌মেয়ার : আমার মনে হয় ওকে আমরা যদি একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে প্যাক করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিই তাহলে ভাল হয়।

সীবেল : কি দাদা! এতদূর সাহস কোথা হতে পেলেন? আমাদের ঠকানো হচ্ছে ম্যাজিকের নাম করে।

মেফিস্টোফেলিস : চুপ করে থাক, একটা বুড়ো মদের পিপে কোথাকার!

সীবেল : ঝাঁটা কোথাকার! দূর হয়ে যা বেয়াদব, মাথা মোটা।

ব্র্যাণ্ডার : থাম থাম, সবাই মিলে ঘুঁষি মার ওকে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আলত্‌মেয়ার : (দেশলাইএর একটা কাঠি জ্বালতেই আগুন মুখে এসে লাগল) পুড়ে গেলাম। পুড়ে গেলাম।

সীবেল : আবার ম্যাজিক। ওকে মার। শয়তানটা আস্ত দস্যু। ছুরি দিয়ে কেটে ওকে টুকরো টুকরো করো।

(সকলে ছুরি নিয়ে ছুটে গেল মেফিস্টোফেলিসের দিকে)

মেফিস্টোফেলিস : (গম্ভীরভাবে) মিথ্যা কথা আর হাওয়া দিয়ে ভরা এক একটা ফানুস কোথাকার! আপন আপন স্থান পরিবর্তন করো। এখানে ওখানে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাক। আপন আপন বিপন্ন বিহ্বল ইন্দ্রিয়-চেতনার মাঝে বন্দী হয়ে থাক অসহায়ভাবে।

(তারা হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরের মুখপানে আশ্চর্য হয়ে তাকাতে লাগল)

আলত্‌মেয়ার : কোথায় আমি? কী সুন্দর দেশ!

প্রসক্ : আঙ্গুর গাছ নয়? আমি কি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি?

সীবেল : কত নীলচে থোকা থোকা আঙ্গুরের গুচ্ছ হাতের কাছে।

ব্র্যাণ্ডার : এখানে হাতের কাছে নুয়ে পড়া শাখায় আঙ্গুর ঝুলছে। কী চমৎকার! (একে অন্যকে ধরাধরি করে দেখাতে লাগল। পরে ছুরি নিয়ে গাছ থেকে আঙ্গুর পাড়ার জন্য হাত বাড়াল)

মেফিস্টোফেলিস : (আগের মত গম্ভীরভাবে) ওদের চোখ থেকে মায়ার কাজল ঘুচিয়ে দাও। এবার দেখ শয়তানের খেলা। এবার তোমরা চেতনা ফিরে নাও।

(ফাউস্টসহ মেফিস্টোফেলিস চলে যেতেই আমোদকারীরা স্থান পরিবর্তন করল)

সীবেল : কি ঘটে গেল ?

আলত্‌মেয়ার : কেমন্‌ করে ঘটল ?

প্রসক্‌ : আমি তোমার নাকটা কি ধরেছিলাম ?

ব্র্যাণ্ডার : আমি কি তোমার নাকটা এখনো ধরে রয়েছি ?

আলত্‌মেয়ার : প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আঘাত করে। আমাকে একটা চেয়ার দাও। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলছি আমি।

প্রসক্‌ : কিন্তু যা ঘটল তা একবার আমাকে খুলে বল ত।

সীবেল : লোকটা গেল কোথায় ? যদি একবার ধরতে পারি কাপুরুষটাকে তাহলে সে আর জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে পারবে না। এখন হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে।

আলত্‌মেয়ার : আমি নিজের চোখে দেখেছি মদের বোতলের একটা ছিপির উপর চড়ে সে ঐ দরজা দিয়ে সোজা ছুটে পালিয়ে গেল।

এখনো ভয়ের বোঝায় পাগুলো ভারী হয়ে আছে আমার।

(টেবিলের কাছে গেল)

আমার মনে হয় এখনো মদের নেশা কাজ করে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে।

সীবেল : সব মিথ্যা মায়া, প্রতারণা।

প্রসক্‌ : তবু আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন মদ পান করছিলাম।

ব্র্যাণ্ডার : কিন্তু আঙ্গুর কোথা থেকে এল তা বল।

আলত্‌মেয়ার : আচ্ছা অলৌকিক কোন ঘটনায় বিশ্বাস করা কি উচিত নয় ?

যাদুকরীর রান্নাঘর

একটা ছোট চুল্লীর উপর একটা কড়াই বসানো ছিল। চুল্লীতে আগুন জলছিল। কড়াই থেকে যে ধোঁয়া উঠছিল তাতে নানারকমের মূর্তির আবির্ভাব হচ্ছিল। কড়াইএর ফুটন্ত জল যাতে উথলে কড়াই উপচে না পড়ে তা দেখার জন্য পাশে একটা বানরী বসেছিল। অদূরে তার বাচ্চাদের

নিয়ে একটা বানর বসেছিল। রান্নাঘরের দেওয়াল ও কড়ি বরগাগুলো অদ্ভুত ধরনের আবরণে ঢাকা। দেখেই বোঝা যায় কোন যাদুকরের আবাসগৃহ।

ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস।

ফাউস্ট : যাদুকরীর এই সব যাদুবিদ্যার কৌশলগত জিনিসপত্র আমার মোটেই ভাল লাগে না। তুমি কি বলছ এই যাদুকরীর উন্মাদসুলভ কিছু যুক্তি-হীন ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে আমার পূর্ণজ্ঞান আমি ফিরে পাব? আমি কি এই সামান্যা বৃদ্ধা যাদুকরীর কাছ থেকে সাহায্য চাইব? আর তার অশুভ প্রভাব আমার জীবনের তিরিশটি বছরের এক বিরাট অস্তিত্বকে মুছে দেবে আমার কাছ থেকে? ধিক আমাকে! অন্য কোন ভাল উপায় থাকে ত বল। আর একটি আশা নিশ্চয় সকরুণভাবে ব্যর্থ হবে। প্রকৃতি বা মানবজগতে এর কি কোন শক্তিশালী ওষুধ আজও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি?

মেফিস্টোফেলিস : আবার একবার তুমি বিজ্ঞের মত কথা বললে। তোমার যৌবনসুলভ প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনার একটা সহজ উপায় আছে। তোমার কথা অন্য একটি পৃথক গ্রন্থে লেখা আছে আর তা বড় জটিল।

ফাউস্ট : তবু তা আমি জানতে চাই।

মেফিস্টোফেলিস : ঠিক আছে। উপায় খুঁজে পাওয়া গেছে। টাকাপয়সা যাদু বা চিকিৎসক কিছুই চাই না। শুধু হাতে তুমি ঐ নিকটবর্তী মাঠটায় চলে যাও। ওখানে এক খণ্ড জমি খুঁড়তে থাক। নিজের কামনা বাসনাকে সংযত করে ঐ ভূমিখণ্ডটুকুর মাঝে এমন ফসল ফলাবার চেষ্টা করো যা দিয়ে তোমার শরীর পুষ্ট হতে পারে, যা দিয়ে তুমি ভালভাবে বেঁচে থাকতে পার। ভূমি-চাষের জন্য যে বলদ ব্যবহার করবে তার সঙ্গে বলদের মত বাস করতে হবে। যে ভূমিতে তুমি ভাল ফসল ফলাতে চাও তাতে সেই সব বলদের গোময় সার হিসাবে ব্যবহার করবে। মনে রাখবে এটাই হলো সবচেয়ে সোজা পথ এবং এই পথেই তুমি দীর্ঘ আশী বছর পর্যন্ত তোমার যৌবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে দিতে পারবে তোমার দেহে।

ফাউস্ট : আমি এ কাজে অভ্যস্ত নই। আমি তা চেষ্টা করে দেখতেও পারব না। কোদাল হাতে নিয়ে কাজ করা বা লাঙল দিয়ে কর্ষণ করা আমার দ্বারা হবে না। ছোট একখণ্ড জমি নিয়ে সারাক্ষণ কাটানো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

মেফিস্টোফেলিস : তাহলে যাদুকরীর সাহায্যই তোমাকে চাইতে হবে।

ফাউস্ট : কেন একমাত্র বুড়ী যাদুকরী ছাড়া আর কোন উপায় নেই? তুমি নিজে কোন ওষুধ তৈরি করে দিতে পার না?

মেফিস্টোফেলিস : এ এক মজার খেলা এবং এ খেলা আমি ভালই জানি। ইতিমধ্যে হাজারটা সেতু নির্মাণ করব আমি। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। শুধু বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার দ্বারা সব কাজ হয় না, বড় কাজ করতে হলে ধৈর্য্যের দরকার। আমার শান্ত শীতল মস্তিষ্ক দীর্ঘদিন যে সৃষ্টিশীল কাজে নিরত রয়েছে কালের দীর্ঘতা সে কাজের প্রচেষ্টাকে নিবিড় আর তার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করে তুলেছে। সে কাজের সাফল্য দেখে তুমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। সে কাজ অদ্ভুত মনে হবে তোমার কাছে। শয়তান স্বয়ং আমাকে তা শেখায়, কিন্তু তবু শয়তান নিজে সে কাজ সমাধা করতে পারবে না।

(কয়েকটি প্রাণী দেখে)

দেখ দেখ, কত সূক্ষ্ম প্রাণী ওরা। ওরা হলো নারী, ওই হলো পুরুষ।

প্রাণীদের প্রতি

মনে হচ্ছে তোমাদের রাণী চলে গেছে?

প্রাণীরা : আজ মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে কোথায় পালিয়ে গেছে চিমনি দিয়ে।

মেফিস্টোফেলিস : কোন সময়ে সে পালিয়ে যায়?

প্রাণীরা : যখন আমরা আমাদের থাবাগুলো গরম করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

মেফিস্টোফেলিস : (ফাউস্টকে) কেমন লাগছে এই সব শান্ত প্রাণী-গুলোকে?

ফাউস্ট : জীবনে যা কিছু আমি দেখেছি তার থেকে বিদকুটে লাগছে।

মেফিস্টোফেলিস : এই ধরনের কথাবার্তা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে কেন তা বুঝতে পারি না।

প্রাণীদের উদ্দেশ্যে

হে অভিশপ্ত প্রাণীগণ, বল, কেন তোমরা ওই কড়াইটাকে এমন করে ঘাঁটছ?

প্রাণীগণ : আমরা ভিক্ষুকদের জন্য জলের ঝোল বানাচ্ছি।

মেফিস্টোফেলিস : তাহলে অনেক লোক তোমরা আমাদের দেখাতে পারবে।

বানর : (মেফিস্টোফেলিসের কাছে আবদারের ভঙ্গিতে বলল) নাও পাশার চাল ফেল। তিন দানে আমাকে ধনী করে দাও। আমাকে জিতিয়ে দাও। আজকাল সময় বড় খারাপ যাচ্ছে। মাথার ঠিক থাকছে না। কিন্তু টাকাকড়ি ধনদৌলত পেলেই আমার মাথার সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেফিস্টোফেলিস : কি করে বানরটা জানল একবার তার ভাগ্য পরীক্ষা করলেই তার ভাগ্য ফিরে যাবে।

(যে সব বাচ্চা বানরগুলো একটা বড় বল নিয়ে খেলা করছিল তারা খেলা বন্ধ করে এগিয়ে এল)

বানর : পৃথিবীটা একটা বলের মতই ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে ওঠানামা করছে। অবিরাম ঘুরছে। একটা গোলাকার কাঁচের ফাঁপা জিনিসের মত ঘুরছে। যে কোন মুহূর্তে এটা পড়ে যেতে পারে। ভেঙ্গে যেতে পারে। কোথাও এটাকে উজ্জ্বল আবার কোথাও উজ্জ্বলতর লাগছে। হে আমার প্রিয় পুত্র; আমি বর্তমানে বেঁচে আছি। তুমি সরে যাও। তোমার মৃত্যুর দিন বিধিনির্দিষ্ট। জীবনের এই পাত্রটি মাটির মতই ঠুনকো। যে কোন সময়ে ভেঙ্গে যেতে পারে মাটির পাত্রের মত।

মেফিস্টোফেলিস : ওই ছাঁকনিটাতে কি হবে ?

বানর : (ছাঁকনিটা হাতে নিয়ে) তুমি কি একজন চোর ? আমি তোমার স্বরূপ প্রকাশ করব এবং তোমায় লজ্জায় ফেলব।

(বানর বানরীর কাছে ছুটে গিয়ে ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে বলল)

দেখ্, দেখ্, ছাঁকনির ভিতরটা ভাল করে তাকিয়ে দেখ্। চোরটাকে চিনতে পারছিস ? কিন্তু তার নামটা জোর করে বলতে সাহস পাচ্ছিস না ?

মেফিস্টোফেলিস : (চুল্লার কাছে গিয়ে) এটা কিসের পাত্র চাপানো আছে চুল্লার উপর ?

বানর ও বানরী : নির্বোধরা তা জানে না। তারা এই পাত্র ও কেটলির মর্ম বুঝবে না।

মেফিস্টোফেলিস : বেয়াদব পশু কোথাকার !

বানর : এই ব্রাশটা নিয়ে ঐ পিঠওয়ালা বেঞ্চটার উপর অন্তত বস।

(মেফিস্টোফেলিসকে বসার জন্য অনুরোধ করল)

ফাউস্ট : (ফাউস্ট এতক্ষণ একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সে সেখান থেকে সরে এল) আমি কি দেখছি ? কোন সে ইন্দ্রপুরী হতে আগত ও স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত এই ঐন্দ্রজালিক মূর্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠল সহসা এই কাচের আয়নার মধ্যে ! হে প্রেম, তোমার দ্রুতগামী পাখা দুটি একটি বারের জন্য দাও আমায়। সে পাখা আমাকে নিমেষমধ্যে নিয়ে যাক ওর অনিন্দ্যসুন্দর রূপের মায়াময় জগতে। আমি ওর কথা মনে ভাবতে ভাবতে এখান থেকে যেখানেই যাই যেদিকেই তাকাই সেখানেই একরাশ আলতো কুয়াশায় আবির্ভূত হয় তার অতুলনীয় রূপমাধুর্য। অত্যুজ্জ্বল রূপযৌবনসম্পন্না এক নারী। কোন নারী, সামান্য এক মর্ত্যের মানবী কখনো এত সুন্দর হতে পারে ? স্বর্গীয় দ্যুতি আর সুষমার উজ্জ্বলতম মূর্তিমতী প্রতীক ঐ নারীকে আমি কি ওখানে বাস্তব অবস্থায় পাব ? সারা মর্ত্যভূমিতে কি এই ধরনের এত সুন্দরী নারী দেখতে পাওয়া যায় কোথাও ?

মেফিস্টোফেলিস : আমার মনে হয় নিশ্চয় কোন দেবতা ছয়দিন নিদারুণ দুশ্চিন্তার পর নিজে নিজেই এক অকারণ আত্মপ্রসাদ লাভ করে আপন মনে বলে ওঠেন, এই ধরনের সুচতুর এক জীবকে সৃষ্টি করতে হবে। এবার হয়েছে ত ! তৃপ্ত হয়েছে তোমার দু চোখের দৃষ্টি। আমি তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দরী প্রেমাস্পদকে খুঁজে বার করবই। যে ব্যক্তি তার সুন্দরী প্রিয়তমাকে বধূ হিসাবে ঘরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় সে ব্যক্তি সত্যিই খুব ভাগ্যবান।

(ফাউস্ট সেই আয়নার দিকে অবিরাম অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল। মেফিস্টোফেলিস সেই বেঞ্চের উপর পা ছড়িয়ে শুয়ে ব্রাশটা হাতে নিয়ে খেলা করতে লাগল)

সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার মতই এখানে বসে আছি আমি। মাথায় আমার রাজমুকুট না থাকলেও এই ব্রাশটাই যেন আমার রাজদণ্ড।

প্রাণীরা : (যে সব বানরগুলি এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন রকমের ও অদ্ভুত ধরনের অঙ্গভঙ্গি করছিল তারা একটি মুকুট এনে মেফিস্টোফেলিসকে দিল) তুমি এবার ভাল হয়ে ওঠ। ঘাম আর রক্তের সঙ্গে এই মুকুট তুমি পরিধান করো।

(তারা মুকুটটাকে এমনভাবে দিল যে তা পড়ে দুখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেল।) ঠিক আছে। তা যাক। আমরা কথা বলছি, আমরা সব দেখছি। আমি কানে সব শুনছি এবং ছন্দ সৃষ্টি করছি।)

ফাউস্ট : (আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে) ধিক ধিক আমাকে। আমার মনে

হচ্ছে আমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে।

মেফিস্টোফেলিস : (প্রাণীদের দিকে তাকিয়ে) আমার নিজের মাথাও ঘুরছে। আমিও হয়ত চেতনা হারিয়ে ফেলব।

প্রাণীরা : আমাদের লক্ষ্য যদি ঠিক হয়, আমাদের চেষ্টা যদি সঠিক হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে আমরা চিন্তা। আমরা শুধু চিন্তা করে যাচ্ছি।

ফাউস্ট : সেই অত্যুজ্জ্বল রূপের স্মৃতি বুকের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমার। চল, এখান থেকে যত শীঘ্র পালিয়ে যাই।

মেফিস্টোফেলিস : তবে যে কোন মানুষকে একথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতে হবে যে এই সব প্রাণীরা যথার্থ কবি।

(বানরীটি এতক্ষণ চুল্লীর উপর বসানো কড়াইটার দিকে নজর দেয়নি। এখন তার জল ফুটতে ফুটতে উথলে উঠল। সহসা তীব্র এক অগ্নিশিখা জ্বলে উঠে চিমনি স্পর্শ করল আর সেই অগ্নিশিখাকে অবলম্বন করে উপর থেকে এক ডাইনির আবির্ভাব ঘটল)

ডাইনি : ওঃ! ওঃ! ওঃ! শয়তান জন্তুটা পালিয়ে গেল কেটলি থেকে। আবার গান গাইতে শুরু করেছে। জাহান্নামে যাক।

(ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিসকে দেখে)

ওখানে কারা? তোমরা কারা? কি চাও তোমরা? কে আমাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে? যারা তা করছে তাদের ঘর আর মাথা আগুনে জ্বলে পুড়ে যাক।

(ডাইনি কড়াইএর মধ্যে হাতাটি ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু আগুন ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস ও বানরদের দিকে ছুঁড়ে দিল। বানরগুলো চিৎকার করতে লাগল)

মেফিস্টোফেলিস : (হাতে ধরে থাকা ব্রাশটা উল্টে তা দিয়ে জার ও কাচের পাত্রগুলোতে আঘাত করতে লাগল)

সব ভেঙে দুখান হয়ে যাও, সব পাত্র ভেঙে যাক। যত সব নক্সা জারিজুরি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বদমাস গাধা কোথাকার!

(যাদুকরী ডাইনি ক্রোধে সন্ত্রাসে অভিভূত হয়ে পড়ল)

এবার বুঝেছ আমি কে? তোমাকে আমি ঘৃণা করি। অবশেষে তোমার প্রকৃত মালিক ও প্রভু কে তা জানতে পারলে? জানতে পারলে কোন কারণে আমি এই মুহূর্তে তোমাকে ও তোমার বানরসন্তানদের আঘাতে আঘাতে

জর্জরিত ও বিপন্ন করে তুললাম না? খয়েরি এই কোটের প্রতি কি কোন শ্রদ্ধা অনুভব করছ না? সেই লম্বা মোরগের পালক চিনতে পারছ এবার? আমার মুখটাকে আমি কি ঢেকে রেখেছি? আমি কি আমার নাম বলব? চামড়ার মুখওয়ালা বুড়ী কোথাকার!

ডাইনি: আমাকে ক্ষমা করুন মশাই। আমি সাদা সাপটাভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকে। কিন্তু আপনার সেই খোঁড়া পা-টা কোথায়? আর আপনার সেই দুটো দাঁড়কাকই বা কোথায়?

মেফিস্টোফেলিস: এবারকার মত আমি তোমাকে ঋণের ভার থেকে মুক্তি দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হওয়ার পর থেকে বহুদিন কেটে গেছে। যে কৃষ্টি যে সংস্কৃতি সারা জগৎকে আচ্ছন্ন করে আছে তা শয়তানদেরও অব্যাহতি দেয় না। উত্তরের সেই সব ভূতপ্রেতদের দিন আর নেই। সেই সব শিং লেজ আর থাবা আজ তুমি কোথায় পাবে? আর যে খোঁড়া পাটার কথা বললে সে পা রাখলে কেউ আমার কাছে আসত না, সবাই আমাকে ত্যাগ করে যেত। আমি তাই আর পাঁচজন যুবকের মত এই কয় বছর ধরে নকল পা ধারণ করেছি।

ডাইনি: (নাচতে নাচতে) এই জমিদার শয়তানটাকে দেখার পর থেকে আমি আমার যুক্তি ও বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলেছি।

মেফিস্টোফেলিস: হে নারী, ও নাম আর করো না।

ডাইনি: কেন নয়, তাতে তোমার কি?

মেফিস্টোফেলিস: রূপকথার বই-এ অনেক কাল আগে হতেই একথা লেখা আছে। কিন্তু একথা কেউ ঠিক মেনে চলে না বলে ভাল মানুষ একটাও দেখতে পাচ্ছি না। সেই আদি শয়তানটা চলে গেছে, কিন্তু তার জায়গায় অসংখ্য শয়তান নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছে। আমাকে নাইট উপাধিধারী একজন ব্যারণ বা সামন্ত বলে ডাকবে। তাহলে খুবই ভাল হয়। আমি একজন বীর অশ্বারোহী। আমার বংশমর্যাদা সম্বন্ধে তোমার মনে নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই। আমি যে কো অফ আর্মস্ চিহ্ন ধারণ করে রয়েছি তা দেখ।

(এক অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করল)

ডাইনি: (কুৎসিত এক হাসি হেসে) হা হা। আমি জানি এটাই তোমার রীতি। তুমি একটি আস্ত শয়তান-ই। সব সময় সেই একভাবেই আছ।

মেফিস্টোফেলিস : শোন বন্ধু, আমার অনুরোধ, খুব সাবধান। ভাই, নিজের থেকে সাবধান হও। ওদের এই হলো রীতি।

ডাইনি : আপনার কি সেবা করতে পারি মহাশয় ?

মেফিস্টোফেলিস : আমাকে সুপরিচিত এক মিষ্টি রসে ভরা এক পানপাত্র দাও। তবে পুরনো হলেই ভাল হয়। এসব জিনিস যত পুরনো হবে ততই তার শক্তি বাড়বে।

ডাইনি : সানন্দে এবং আন্তরিকতার সঙ্গেই আমি তা করব। এই নাও বোতল। এই বোতলের রস থেকে মাঝে মাঝে আমিও আমার গলা ভেজাই। এর কোন খারাপ গন্ধও নেই। আমি বোতল থেকে এক গ্লাস ঢেলে দিচ্ছি।

(চুপিচুপি বলতে লাগল)

কিন্তু এই ভদ্রলোক যদি ঠিকভাবে প্রস্তুত না হয় এবং অভ্যস্ত না থাকে, যদি হঠাৎ এই রস পান করে তাহলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃত্যু হবে। তুমি তা জান।

মেফিস্টোফেলিস : ও আমার এক বন্ধু। ওটা খেলে ওর কিছু হবে না। তোমার রান্নাঘরের সবচেয়ে ভাল খাদ্য ও খাবার যোগ্যতা রাখে। একটা গণ্ডী টান। মন্ত্রপাঠ করো। পানপাত্রটা ভরে দাও।

(ডাইনি উন্মাদের মত অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে একটা গণ্ডী টেনে অদ্ভুত কতকগুলো জিনিস তার মধ্যে রাখল। এমন সময় কাঁচের পাত্রগুলো আপনা থেকে বেজে উঠলো এবং চুল্লীর উপর কড়াইটা হতে শব্দ হতে লাগল। কারা যেন বাজনা বাজাচ্ছে। এরপর ডাইনি বানরদের ডেকে তাদের অর্ধবৃত্তাকারে সাজিয়ে বসিয়ে তাদের মাথার উপর একটা মোটা বই এনে রাখল। বানরগুলো হাতে করে মশালের আলো দেখাতে লাগল। অবশেষে ফাউস্টকে ইশারা করে ডাকল ডাইনি।)

ফাউস্ট : (মেফিস্টোফেলিসকে) এসবে কি হবে ? এই সব প্রাণীগুলো অতি প্রাচীন। এদের আচরণ অদ্ভুত এবং উন্মাদসুলভ এদের অঙ্গভঙ্গি। আমার সামনে যত সব ঘৃণ্য প্রতারকদের দেখছি। আমি এদের জানি এবং ঘৃণা করি।

মেফিস্টোফেলিস : বাজে। ওটা একটা হাসির ব্যাপার। তুমি ওটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন ? ও তোমাকে একজন ডাক্তার হিসাবে জ্ঞান করছে।

পরে যথাসময়ে তার প্রদত্ত মদ তার প্রভাব বিস্তার করবে।

(ফাউস্টকে গণ্ডীর মধ্যে পা দিতে বাধ্য করল)

ডাইনি : (বই থেকে মন্ত্র পড়তে শুরু করল জোর দিয়ে) এই দেখ, এইভাবে এটা হলো। এক থেকে দশ করো এবং তার থেকে দুই বা তিন করো। তাহলেই তুমি ধনী হবে। পাঁচ ও ছয় থেকে চারের উপর জাল ফেল। যাদুর কসরৎ দেখাও। তারপর সাত আর আট করো। ব্যাস, তাহলেই সব শেষ। নয় মানেই এক। দশের কোন দাম নেই। এই হলো যাদুকরীর এক থেকে একের খেলা।

ফাউস্ট : ও এমনভাবে কথা বলছে যেন মনে হচ্ছে ও জ্বরে প্রলাপ বকছে।

মেফিস্টোফেলিস : এখান থেকে যাবার আগে আরো অনেক কিছু শুনবে। বই-এর কথাই ও বলছে। আমিও বই থেকে মুখস্থ বলতে পারি। আমি ইতিহাস পড়ে কত সময় নষ্ট করেছি। এক বিরাট বৈপরীত্য, জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদের মধ্যে সমানভাবে এক রহস্যের সৃষ্টি করে আসছে। চিরকাল ধরে সেই এক শিক্ষা সকল মানুষ শিখে আসছে—সেই এক আর তিন আর তিন আর এক সারা জগৎ জুড়ে যুগে যুগে এক মিথ্যাকে সত্য বলে ছড়িয়ে আসছে। তারা ভুল শিখিয়ে আসছে, মিথ্যা শিখিয়ে আসছে। অথচ কোন মানুষ তার প্রতিবাদ করে না। নির্বোধ শিক্ষকের হাতে শুধু অসংখ্য নির্বোধ তৈরি হচ্ছে। মানুষ সাধারণতঃ যা শোনে তা বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার সব উপাদানও বিনষ্ট হয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ডাইনি : (বলে চলল) বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল আজও মানুষের জ্ঞানের সীমার বাইরে গভীর গোপনে লুকিয়ে আছে। যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই, জ্ঞান নেই, যে চায় না, অযাচিতভাবে বিজ্ঞানের সম্পদকে তারই কাছে এনে দেওয়া হয়।

ফাউস্ট : কী যা তা বাজে সব বকে চলেছে। সব কিছুর নিন্দা করে চলেছে। আমার ভয় হচ্ছে আমার মাথার সব স্নায়ু ছিঁড়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে এক লক্ষ নির্বোধ গান করে চলেছে সমবেতভাবে।

মেফিস্টোফেলিস : হে সিবিল, চমৎকার। অনেক মন্ত্র পাঠ করেছ! এইবার তোমার রান্নার জিনিসপত্র সব নিয়ে এস। পানপাত্র পূর্ণ করো কানায় কানায়। এই পানীয় আমার বন্ধুর কোন ক্ষতিই সাধন করবে না। সে হচ্ছে এমনই এক মানুষ যে জীবনে অনেক ডিগ্রী লাভ করেছে এবং অনেক

রকমের মদ পান করেছে।

(ডাইনি অনেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের পর পাত্রে মদ ঢেলে দিল। ফাউস্ট পাত্রটি ঠোঁটে স্পর্শ করতেই আগুন জ্বলে উঠল)

খেয়ে নাও, খেয়ে নাও! পানপাত্রটি শেষ করে ফেল এখনি। এটা পান করার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন কামনা ও কামনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠবে তোমার অন্তর। মনে রেখো, শয়তানের সঙ্গে কলাবিদ্যার গলায় গলায় ভাব। তুমি আগুনকে ভয় পাচ্ছ?

(ডাইনি গণ্ডীটা মুছে দিতেই ফাউস্ট ভিতরে ঢুকল)

মেফিস্টোফেলিস : এবার তুমি যাও। তুমি বিশ্রাম লাভ করনি অনেকক্ষণ।

ডাইনি : এই মদ তোমার অনেক ভাল করবে।

মেফিস্টোফেলিস : ওয়ালপারগিসের রাত্রিতে তোমার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করা হবে সর্বসমক্ষে। পারিতোষিক হিসাবে তোমাকে যা কিছু আমার দেবার আমি সেই সময় দেব।

ডাইনি : একটা গান আছে। যদি তুমি মাঝে মাঝে সেটা গাও তাহলে এক আশ্চর্য ফল পাবে।

মেফিস্টোফেলিস (ফাউস্টকে) এস এস, এখনি চলে এস। হঠাৎ হাতে কাজ এসে গেলে শত পরিশ্রম সত্ত্বেও ঘর্মাক্ত কলেবরে তা করা উচিত। এক মদের প্রভাব এখনি তোমার দেহের মধ্যে ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। এক মধুর আলস্যের মাধ্যমে কিভাবে আনন্দ লাভ করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেব তোমায়। এক নিবিড় পুলকের রোমাঞ্চ জাগবে তোমার দেহ মনে আর সেই সঙ্গে তুমি বুঝতে পারবে লঘুচঞ্চল এক পক্ষবিস্তার করে কিভাবে কামদেবা উড়ে বেড়াচ্ছে তোমার অন্তরের আকাশে।

ফাউস্ট : কী সুন্দর ঐ নারীর রূপ। যে আয়নায় তার প্রতিফলন পড়েছে সেটা আমায় একবার দেখতে দাও।

মেফিস্টোফেলিস : না না, আমায় বিশ্বাস করো, সৌন্দর্যের এক সাক্ষাৎ খনি। আয়না কেন, তুমি শীঘ্রই তাকে জীবন্ত দেখতে পাবে। তার দেহের উত্তাপ স্পর্শ করতে পাবে। (স্বগতঃ) এই মদ পানের ফলে তোমার দেহের রক্ত এমনই উত্তপ্ত ও উত্তাল হয়ে উঠবে যে, যে কোন নারীকেই তোমার হেলেনের মত সুন্দরী মনে হবে।

সপ্তম দৃশ্য

রাজপথ

ফাউস্ট ও মার্গারেট পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল

ফাউস্ট : হে সুন্দরী, কিছু মনে করো না, রুষ্ট হয়ো না। আমি তোমার হাত ধরে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে সঙ্গ দান করব তোমার পথে।

মার্গারেট : আমি নারীও নই, সুন্দরীও নই এবং তোমার সাহায্যে ছাড়াই আমি বাড়ি যেতে পারব।

(ফাউস্টের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল)

ফাউস্ট : সত্যিই অপূর্ব ! জীবনে আমি যত নারী দেখেছি তার মধ্যে সৌন্দর্যে অতুলনীয়া সে। তার অন্তঃকরণ কত পবিত্র এবং বিবিধ গুণরাজিতে পরিপূর্ণ। তবে কিছুটা অহঙ্কারী। তার ওষ্ঠাধর কী চমৎকার লাল। তার গণ্ডদ্বয় প্রথম প্রত্যুষের মতই উজ্জ্বল। যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি তাকে ভুলব না। চকিত হরিণের মত যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করেছিল আমার অন্তরে তা মুদ্রিত হয়ে থাকবে চিরদিন। সে স্বল্পভাষিণী, অথচ তার কণ্ঠস্বর কত তীক্ষ্ণ। তার সঙ্গলাভ সত্যিই এক গভীর আনন্দের ব্যাপার। একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

(মেফিস্টোফেলিস প্রবেশ করল)

ফাউস্ট : আমি যে মেয়েটিকে এখনি লাভ করতে গিয়েছিলাম তার কথা জান ?

মেফিস্টোফেলিস : কোন মেয়েটি ?

ফাউস্ট : এই ত এখনি চলে গেল।

মেফিস্টোফেলিস : ওই ওখানে যে যাচ্ছে ? ও ত স্বীকারোক্তি করে এইমাত্র আসছে। যত রকমের পাপ আছে তা ও করেছে এবং তা স্বীকার করেছে। আমি নিকটে পিছনে থেকে সব শুনেছি। এত পাপ সত্ত্বেও ও খুবই নিরীহ এবং নির্দোষ। স্বীকারোক্তির কোন প্রয়োজনই ছিল না। এমন কাঁচা বয়সের ছেলে-মেয়েদের উপর কোন অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারি না আমি।

ফাউস্ট : তবে ওর বয়স ত চোদ্দর থেকে বেশী।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি বাজে লোকের মত কথা বলছ। এমনভাবে কথা বলছ যাতে মনে হবে জগতে যেখানে যত সুন্দর ফুল ফোটে তা শুধু তোমার জন্য। জগতে সব শ্রদ্ধা ও সম্মানের একমাত্র পাত্র তুমি। কিন্তু এততেও তুমি সব সময় সব বিষয়ে সাফল্য লাভ করতে পার না। তোমার আকাঙ্খিত বস্তুকে আয়ত্ত করতে পার না।

ফাউস্ট: হে সুযোগ্য প্রচারক, শোন। আর নৈতিক আইনের কোন কথা বলো না। আমি আমার অধিকারের কথাই বলছি। আজ রাত্রির মধ্যে যদি আমার সেই আনন্দের প্রতিমাকে হাতে না পাই তাহলে রাত্রি মধ্যপথে উপনীত হতে না হতেই আমাদের সব চুক্তি ভঙ্গ হবে।

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু সুবিধা সুযোগের কথাটাও ত একবার ভাবতে হবে। আমি অন্ততঃ এক পক্ষকাল সময় চাইছি যাতে তার মধ্যেই কোন সুযোগ পেয়ে যাব।

ফাউস্ট: যদি আমি সাতটা ঘণ্টা হাতে পাই তাহলে কোন শয়তানকে ডাকব না আমার সাহায্যে। আমি নিজেই তাকে বুঝিয়ে করায়ত্ত করব।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি ঠিক ফরাসীদের মত বড় বড় কথা বলছ। আমার কথা শোন, বিরক্ত হয়ো না। কেন হঠাৎ এমন করে আমোদ প্রমোদে ছেদ টেনে দিচ্ছ? তুমি ভাবছ তোমার সমগ্র জীবন এমনই অন্তহীন অবিচ্ছিন্ন সুখ-আর সৌভাগ্যে ভরা যাতে করে তুমি ইচ্ছা করলেই সমস্ত সুন্দর বস্তুকে করায়ত্ত করতে পার আর ইতালীয় প্রেমকাহিনীর নায়কের মত তার মনটাকে জয় করে স্বমতে নিয়ে আসতে পার।

ফাউস্ট: ওসব কথা বাদ দাও। আমার ক্ষুধা আছে।

মেফিস্টোফেলিস: এখন ঠাট্টা বিদ্রূপ বাদ দাও। আমি তোমাকে শেষ কথা বলে দিচ্ছি। অত তাড়াতাড়ি ঐ সুন্দরী বালিকাকে করায়ত্ত করতে পারবে না। ঝটিকা আক্রমণের দ্বারা যে বস্তুকে লাভ করা যায় না তাকে কৌশল প্রয়োগের দ্বারা লাভ করতে হয়।

ফাউস্ট: দেবদুতোপমা ঐ সুন্দরীর কোন না কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন আমাকে দাও। যেখানে সে নিদ্রা যায় তার সেই সুরম্য শয়নকক্ষে আমাকে নিয়ে যাও। তার বক্ষের রুমাল একটা এনে দাও অথবা তার পায়ের মোজার একটা গার্টার অন্ততঃ দাও।

মেফিস্টোফেলিস: এবার দেখবে কত শীঘ্র তোমার অতৃপ্ত কামনাকে

পরিতৃপ্ত করতে পারি। আর এক মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করব না। তার শয়নকক্ষ খুঁজে বার করে সেখানে আজ তোমাকে নিয়ে যাবই।

ফাউস্ট : আমি কি তাকে দেখতে পাব—তাকে লাভ করব ?

মেফিস্টোফেলিস : না। কোন এক প্রতিবেশীর কাছে সে নিশ্চয় যাবে। ইতিমধ্যে তুমি ভবিষ্যৎ আনন্দোপভোগের আশায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমরা সেখানে গিয়ে তাকে ধরব। তার সাহচর্য সেখানে তুমি পূর্ণমাত্রায় পাবে।

ফাউস্ট : সেখানে কি আমরা এখন যেতে পারি ?

মেফিস্টোফেলিস : এখনো সে সময় হয়নি।

ফাউস্ট : আমি চাই তার কাছ থেকে তার কোন উপহার আমাকে এনে দাও। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস : এখনি সেটা চাও ? ঠিক আছে। অবশ্যই সে মেয়েটিকে পাবে। আমোদ প্রমোদের বহু স্থানই আমার জানা আছে। বহু গুপ্তধনের সন্ধানও আমার জানা আছে। দরকার হলে এ বিষয়ে আমাকে জোর করতে হবে। বলপূর্বক ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে হবে। (প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

ক্ষুদ্র ও পরিচ্ছন্ন একটি প্রকোষ্ঠ

সন্ধ্যাকাল

মার্গারেট : (চুল বাঁধছিল) আমি যদি জানতে পারতাম ভদ্রলোক কে তাহলে আমি তাকে কিছু না কিছু দিতে পারতাম। নিশ্চয় ভদ্রলোক সম্ভ্রান্ত বংশজাত কোন বীরপুরুষ হবেন। তাঁর মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। তা না হলে তাঁর মুখে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার চিহ্ন ফুটে উঠত না। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস। ফাউস্ট

মেফিস্টোফেলিস : এসো, কিন্তু খুব ধীর গতিতে। আমাকে অনুসরণ করো।

ফাউস্ট : (কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর) আমাকে একা থাকতে দাও, আমি অনুরোধ করছি।

মেফিস্টোফেলিস : সকল মেয়েই এমন পরিচ্ছন্ন থাকে না।

ফাউস্ট (চারদিক তাকিয়ে) হে সুন্দর ও মেদুর গোধূলি, এই পবিত্র স্থানটিকে উজ্জ্বল করে আছ। হে মধুর প্রেমের বেদনা, ক্রমবিলীয়মান আশার শিশির বুকে নিয়ে যে অন্তর এক ব্যর্থ প্রতীক্ষায় সঁপে দিয়েছে নিজেকে সে অন্তরকে অনতিশক্ত এক বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ করো। চারদিকে কেমন এক শান্তি শৃংখলা আর তৃপ্তির স্রোত বয়ে চলেছে। এক পরমানন্দের প্লাবন বয়ে চলেছে আমার ক্ষুদ্র অন্তরে, অথচ কিসের এক অনির্দেশ্য আকুতি প্রবল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ।

(বিছানার কাছে চামড়ার এক আর্মচেয়ারে বসে)

হে আমার প্রেয়সী, তোমার মুক্ত ও প্রসারিত বাহুর দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করো। তোমার বাহুলগ্ন হয়ে আমার মনে হচ্ছে আমার হারানো আনন্দবেদনাখচিত অতীতের উজ্জ্বল দিনগুলি আবার ফিরে এসেছে আমার কাছে। আমার মনে হচ্ছে এই আসনে যেখানে আজ আমি বসে রয়েছি সেখানে আমার পিতা একদিন বসে থাকতেন এবং আজও বসে আছেন। আর তুমিও আমার কলগুঞ্জনরত দুরন্ত সন্তানদল পরিবৃত হয়ে খৃস্টোৎসবের উপহার হাতে বসে রয়েছ। চঞ্চল ছেলেরা ভয়ে ভয়ে তাদের পিতামহের শীর্ণ শুষ্ক হাতটি চুম্বন করছে। হে আমার প্রিয়তমা, আমি যেন অনুভব করছি তোমার উপস্থিতি। তুমি যেন চুপিসারে কথা বলছ আমার সঙ্গে। তোমার দেহের বহির্বাসবিমুক্ত কোন কোন অংশে ফুটে উঠেছে যৌবনসমৃদ্ধ মাতৃত্বের বিরল মহিমা। শুচিশুভ্র হয়ে উঠেছে তোমার পায়ের তলার মাটি। তোমার এই সুন্দর হাতই মর্ত্যভূমিবিধৃত এই গৃহকোণকে পরিণত করে তুলতে পারে স্বর্গলোকে।

(বিছানা থেকে মশারি তুলে দিয়ে)

আমার রক্তে এমন মধুর রোমাঞ্চ জাগছে কেন? এখানে আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। এখানে প্রকৃতি তার নিজের হাতে ফুলের কুঁড়ির মত এক শুচিশুভ্র দেবদূতকে গড়ে তুলেছে খেলাচ্ছলে। এইখানেই শায়িত ছিল একদিন আমার সন্তান। তার সুন্দর কচি বুকে ছিল প্রাণের উত্তাপ। তার দেবোপম দেহে ছিল স্বর্গীয় সুষমা আর পবিত্রতা।

আর আমি? যথাযোগ্য ক্ষমতা সংগ্রহ করে কি কারণে আমি এখানে এসেছি? এই মুহূর্তে এত বিচলিত হয়ে উঠেছি কেন? কি চাই আমি? আমার অন্তরে কেন এত সংক্ষোভ? কেন এত আঘাত, কিসের ক্ষত? হে হতভাগ্য ফাউস্ট! আমি আর তোমাকে চিনতে পারছি না।

এখানে কি ঐন্দ্রজালিক কোন বায়বীয় শক্তি কাজ করছে? আমি এখানে এসেছিলাম ক্ষণকালীন আনন্দের সন্ধানে। সে আনন্দ প্রেমের স্বপ্নের এক মধুর অবকাশে নিঃশেষে কোথায় তলিয়ে গেছে। প্রতিটি পরিবর্তনশীল ক্ষণ-ভঙ্গুর কালখণ্ডের হাতে আমরা কি তবে খেলার পুতুল?

আর যদি সে ঠিক এই মুহূর্তে এখানে এসে পড়ে তাহলে কেমন করে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব? আমার অন্তরস্থিত উদ্ধত অহঙ্কারী দৈত্যটা কিভাবে তখন শান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়বে তার পায়ে?

মেফিস্টোফেলিস: তাড়াতাড়ি করো। আমি দেখতে পাচ্ছি সে ফিরে আসছে।

ফাউস্ট: যাও, যাও, আমি আর কখনো ফিরে যাব না।

মেফিস্টোফেলিস: এখানে একটা কৌটো রয়েছে। আমি কিছুক্ষণ আগে এটা পেয়েছি। এটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখ। কারণ এটা সে দেখতে পেলেই তার মাথাটা ঘুরে যাবে। এর মধ্যে আমি কিছু খেলনা রেখেছি যাতে তুমি আর একটা কৌটো লাভ করতে পার। খেলা খেলা এবং শিশু শিশু। তুমি একটা শিশু ছাড়া আর কিছু নও।

ফাউস্ট: আমি বুঝতে পারছি না এ কাজ করা আমার উচিত হবে কি না।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি আবার জিজ্ঞাসা করছ, কুণ্ঠা করছ? তুমি কি নিজেই গোলমালটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও? আমি তোমাকে বলছিলাম আজকের এই সুন্দর দিনটার মত তোমার কামনাকে সংযত করে রাখ। আমাকে আর কষ্ট দিও না। তাতে তোমার বিষাদ বা দুঃখের কোন কারণ দেখি না। যাই হোক, আমি আবার হাতটা ঘষে দেখি ভাল কিছু করতে পারি কি না।

(কৌটোটা হাতে চেপে ধরে তাতে তালা দিল)

এখন তাড়াতাড়ি চলে যাও। যাও, সেই সুন্দরী কুমারীকে ছলনার দ্বারা মুগ্ধ করে তোমার ইচ্ছার বশীভূত করে তোল তাকে। তার কাছে তুমি এমন একটা ভাব দেখাবে যাতে মনে হবে তুমি এই মুহূর্তে পদার্থবিদ্যা ও অধিবিদ্যার মত কঠিন দুটি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনার জন্য কোন বক্তৃতাসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। যাও, চলে যাও। (উভয়ের প্রস্থান)

মার্গারেট: (প্রদীপ হাতে) জায়গাটা বড় সংকীর্ণ। এখানে বড় গুমোট

গরম। (জানালাটা খুলে দিল) কিন্তু বাইরে এতটা গরম নেই। আমার ভয় হচ্ছে। অথচ বুঝতে পারছি না কেন এই ভয়। আমার মা কি এসে পড়বে? মা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে? আমার গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। আমার কাঁপুনি আসছে। আমার মনটা বড় দুর্বল। আমি বড় ভীরু প্রকৃতির।

(পোষাক খুলতে খুলতে গান গাইতে লাগল)
থিউল দেশে এক যে ছিল রাজা।
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে তার রাণীর
প্রতি ছিল একান্তভাবে বিশ্বস্ত, যে রাণী মৃত্যুকালে
তাকে দিয়ে গিয়েছিল এক সোনার পানপাত্র।
রাজার কাছে এ পাত্র ছিল সবচেয়ে মূল্যবান।
যখনি তিনি এ পাত্রে মদ পান করতেন
এক চুমুকে শেষ করতেন সে মদ আর
সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ত
নিঃশেষিত সেই পাত্রের বুকে।
অবশেষে এসে গেল রাজার মৃত্যুর দিন।
উপস্থিত সভাসদদের প্রয়োজনীয় সব কথা
বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর বিষয় সম্পত্তির
সব অধিকার বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীকে ;
কিন্তু তাঁর সেই প্রিয় পানপাত্রটি কাউকে দিলেন না।
কাউকে বললেন না তাঁর অশ্রুসজল গোপন রহস্যের কাহিনী।
তখন রাত্রিকাল।
রাজার সামনে বসেছিল ভোজসভা।
প্রাসাদের বাইরে গর্জন করছিল তখন
তরঙ্গায়িত রাত্রির সমুদ্র।
প্রিয়তমার সোনালি স্মৃতিবিজড়িত সেই পানপাত্রে
শেষবারের মত মদ পান করলেন রাজা।
তারপর খোলা জানালা দিয়ে পাত্রটা ছুঁড়ে
ফেলে দিলেন সমুদ্রের জলে।
তবু সজল আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন রাজা।

দেখলেন চকিত আলোর মুকুটপরা অন্ধকার তরঙ্গগুলোর সঙ্গে
লড়াই করতে করতে সেই স্বর্ণোজ্জ্বল পানপাত্রটা
একবার ডুবছে অসহায়ভাবে, আবার পরমুহূর্তে ভেসে উঠছে।
অবশেষে চিরকালের মত ডুবে গেল সেটা।
এদিকে দেখতে দেখতে চিরদিনের মত মুদ্রিত হয়ে এল
রাজার ক্লান্ত অবসন্ন চক্ষুপল্লব।

(মার্গারেট তার পোষাক গুছিয়ে রাখতে গিয়ে মণিমাণিক্যপূর্ণ কৌটোটা দেখতে পেল)

এই সুন্দর কৌটোটা কোথা হতে কি করে এল ? আমি ত এটা অবশ্যই সিন্দুকের মধ্যে চাবি দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক-ভাবে সুন্দর। কি থাকতে পারে এর ভিতর ? হয়ত মার কাছে কেউ এটা বন্ধক দিয়ে গেছে এবং মা তাকে কিছু টাকা ধার দিয়েছে। এর সঙ্গে একটা চাবিও রয়েছে। এটা খুলে দেখতে মন হচ্ছে। একি ? হা ভগবান। এ সব জিনিস কোথা থেকে এল ? এত সব সুন্দর বস্তু কখনো চোখে দেখিনি আমি। এত সব মূল্যবান গয়না নিশ্চয় কোন ধনীকন্যার যে উৎসবের দিন এই সব পরে বেড়ায়। এই মুক্তোর চেনটা আমার চুলে থাকবে। এত ঐশ্বর্য কার ?

(সব গয়না পরে নিজেকে সাজিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল)

এই কর্ণকুণ্ডলটা যদি আমার নিজস্ব হত ! এ কুণ্ডল পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে চেহারার ভাবটা কেমন বদলে যায় মুহূর্তে ; কেমন উদ্দীপিত করে তোলে যে কোন নারীর যৌবনসৌন্দর্যকে ! যারা এই মূল্যবান অলঙ্কারের অধিকারিণী তাদের কতই না সৌভাগ্য ! আর যাদের এ বস্তু নেই তারা কিছু মুগ্ধ বিস্ময় আর কিছু ঈর্ষাসহযোগে খণ্ডিত অন্তরে প্রশংসা করে এ বস্তুর সত্তাধিকারিণীদের। তবে স্বর্ণালঙ্কার কে না চায় ? সোনার উপরে জীবনের সৌন্দর্য সম্মান অনেকখানি নির্ভর করে। আমরা যারা এই সোনা হতে বঞ্চিত তারা সত্যই হতভাগ্য।

নবম দৃশ্য

পদচারণা

(ফাউস্ট চিন্তান্বিত অবস্থায় পদচারণা করছিল। এমন সময় মেফিস্টোফেলিস তার কাছে এল)

মেফিস্টোফেলিস : জীবনে কোথাও কোন প্রেম পেলাম না ; পেলাম শুধু ঘৃণা আর প্রত্যাখ্যান। প্রজ্জ্বলিত নরকাগ্নির অপরিহার্য লেলিহান শিখার দ্বারা সতত উত্তপ্ত আমার দেহমন। আমি যদি হীনতর ছলনা ও চাতুর্যসহকারে মিথ্যা শপথবাক্যের দ্বারা মুগ্ধ করতে পারতাম মানুষকে।

ফাউস্ট : তোমার কি হলো ? কিসের বিষাদ তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যাদুকর ? তোমার এমন বিষণ্ণ মুখ কখনো দেখিনি।

মেফিস্টোফেলিস : আমি যদি শয়তান না হই তাহলে শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করব নিঃশেষে।

ফাউস্ট : দুঃখে তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমি এখন উন্মাদের মত আচরণ করবে আর আবোল তাবোল বকবে।

মেফিস্টোফেলিস : এখন ভেবে দেখ, মার্গারেটের জন্য যে মুদ্রা রাখা হয়েছিল তা এখন পুরোহিতের পকেটে যাবে। মা তাদের দেখে ফেলে আর সঙ্গে সঙ্গে এক গোপন ভীতিবিহ্বলতা আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে। এক দূষিত আবহাওয়ার এক স্পষ্ট গন্ধ পেয়েছে সে। তার মা এমনই মেয়ে যে তার প্রার্থনার বই খুলে তার গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে কোন শব্দটা ধর্মসম্মত আর কোন শব্দটা ধর্মসম্মত নয়। তাই মার্গারেটের গায়ে মণিমুক্তোর অলঙ্কার দেখে তার মা বুঝতে পারে এ সব অলঙ্কার সৎ পথে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ আসেনি। মা বলে, বৎসে, অসৎ পথে অর্জিত বস্তু মানুষের আত্মাকে ফাঁদে ফেলে কুপথে নিয়ে যায়, তার রক্ত শোষণ করে নেয়। সুতরাং এই সব বস্তু আমরা ঈশ্বরমাতা মেরীর সামনে উপস্থাপিত করব, তিনি স্বর্গীয় কোন উপায়ে এর ঋণ পরিশোধ করবেন। মার্গারেট কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে বলল, উপহারের দান-প্রতিদান আজও চলছে। যে ব্যক্তি আমাকে এই সব বস্তু উপহার হিসাবে দান করেছে সে একেবারে নাস্তিক নয়। মার অলক্ষ্যে অগোচরে এক ব্যক্তি আমার ঘরে আসে। এই গয়নার কৌটোটা যেখানে লুকোন ছিল সেখানে তাকিয়ে দেখে এগুলো উদ্ধার করে। তারপর সে বলে, কোন বস্তু হাতের কাছে পেলে তা আয়ত্ত করতে হয় ; এটাই হলো মানব-

জগতের রীতি। যে সব পবিত্র গীর্জা দেখছ, তাদের বিশাল ও বলিষ্ঠ উদর অনেক মানুষের অনেক জমি গ্রাস করেছে। তথাপি তারা কেউ কখনো অভিযোগ করে বলেনি তাদের উদরস্থ জমির পরিমাণ অতিরিক্ত হয়েছে। এই সব পবিত্র গীর্জাগুলির অসদুপায়ে অর্জিত সব বস্তুগুলি হজম করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে।

ফাউস্ট : এ কাজ সবাই করে। এ ক্ষেত্রে রাজা ও সুদখোর ইহুদী একই পথের পথিক।

মেফিস্টোফেলিস : তারপর এক পুরোহিত সেই সব রত্ন ও মণিমুক্তো একটা থলেতে ভরে নিয়ে চলে গেল। ঠিক যেন এক বস্তা বাদাম অথবা ব্যাঙের বিষ্ঠা। কোন ধন্যবাদ নয়, শুধু বলে গেল স্বর্গে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে। যাবার সময় মার্গারেট ও তার মাকে প্রচুর নীতিশিক্ষাও দিয়ে গেল।

ফাউস্ট : আর মার্গারেট ?

মেফিস্টোফেলিস : অশান্ত ও চঞ্চলভাবে বসে বসে শুধু ভাবছে। সে এখন ভেবে ঠিক করতে পারছে না এখন তার কি করা উচিত। অলঙ্কারগুলির কথা দিনরাত ভাবছে। বিশেষ করে ভাবছে তার কথা যে তাকে এই আনন্দের বস্তুটি দান করে।

ফাউস্ট : আমার প্রিয়তমার দুঃখে আমি বড় ব্যথা পাচ্ছি। ওকে আমার এক সাজ গয়না এনে দাও। আগেরগুলো খুব একটা এনো না।

মেফিস্টোফেলিস : তা বটে। এটা যেন একটা ছেলে-খেলা।

ফাউস্ট : আমার ইচ্ছানুসারে সব কিছুর ব্যবস্থা করো। তার কোন প্রতিবেশীর মাধ্যমে কৌশলে কাজ করবে। শয়তানের মত অযথা শক্ত হয়ে থেকো না। তার পছন্দমত নূতন এক সাজ গয়না এনে দাও।

মেফিস্টোফেলিস : ঠিক আছে মহাশয়, তোমার কথামতই কাজ হবে। (ফাউস্টের প্রস্থান) এই ধরনের মোহগ্রস্ত নির্বোধ প্রেমিকরা তাদের প্রেমিকাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকে।

দশম দৃশ্য

প্রতিবেশীর গৃহ

মার্থা : (একাকী) ঈশ্বর আমার স্বামীকে ক্ষমা করুন, যদিও সে আমার প্রতি তার কর্তব্য পালন করেনি। আমাকে এই তৃণগুচ্ছের উপর শুতে বাধ্য করে, এই দুঃখের মধ্যে রেখে সে খুশিমত পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছে। তথাপি আমি তাকে কোনরূপ মনোকষ্ট দিতে চাই না। ঈশ্বর জানেন আমি তাকে কত ভালবাসি এবং তাকে আমি ভুলতে পারি না। (সে কাঁদতে লাগল) হয়ত আমার স্বামী মারা গেছে। হায় হায়! মৃত্যুর কোন সার্টিফিকেটও নেই।

মার্গারেট : (এল) শোন মার্থা।

মার্থা : মার্গারেট, কি হয়েছে তোমার?

মার্গারেট : আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমার হাঁটুদুটো কাঁপছে। আমি আমার কক্ষে একটা কৌটো দেখতে পাই। তাতে নানারকমের উজ্জ্বল অলঙ্কার ছিল। এত উজ্জ্বল গয়না আগে কেউ কখনো দেখেনি।

মার্থা : তোমার মাকে তা বলো না। তাহলে তিনি পুরোহিতকে সব দিয়ে দেবেন।

মার্গারেট : দেখ দেখ, তাকিয়ে দেখ।

মার্থা : (তাকে সাজিয়ে) ওঃ, তোমার কি বিরল সৌভাগ্য!

মার্গারেট : কিন্তু হায়, আমি পথে এইসব অলঙ্কার পরে বেড়াতে পারি না, আবার গীর্জাতেও যেতে পারি না।

মার্থা : তবে এই সব অলঙ্কার গোপন করে এ পথে বেড়াতে পার না যখন তখন। এখন আমার ঘরের ঐ আয়নাটার সামনে পায়চারি করে বেড়াও। তাতে আমাদের দুজনেরই আনন্দ হবে। আপাততঃ এই থাক। তারপর যখন কোন ছুটি বা উৎসবের দিন আসবে তখন একে একে গয়নাগুলো বার করবে। যেমন ধরো প্রথমে হার, তারপর অন্যান্য গয়না। তোমার মা দেখতে পাবে না। তারপর কি করা যাবে বা বলা যাবে তা আমরা ভেবে ঠিক করব।

মার্গারেট : যেই আমাকে এই সব মূল্যবান অলঙ্কার এনে দিক না কেন, নিশ্চয় কোথাও একটা গলদ আছে, এর মধ্যে কিছু একটা অন্যায় আছে— আমার সন্দেহ হচ্ছে। (দরজায় করাঘাত) হা ভগবান! নিশ্চয় আমার মা এসে গেছে।

মার্থা : (ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে) কোন এক অপরিচিত ভদ্রলোক দেখছি —ভিতরে আস্থন।

(মেফিস্টোফেলিসের প্রবেশ)

মেফিস্টোফেলিস : আমাকে এভাবে উপযাচক হয়ে আপনাদের ঘরে ঢুকতে হলো এজন্য আমি ক্ষমা চাইছি হে ভদ্রমহোদয়া।

(মার্গারেটকে দেখে সম্ভ্রমসহকারে কিছুটা পিছনে হটে)

আমি মার্থা শোয়াইর্লিনকে চাই।

মার্থা : আমিই মার্থা। ভদ্রলোকের কি প্রয়োজন আমাকে ?

মেফিস্টোফেলিস : (মার্থাকে জনান্তিকে) তোমাকে পেয়ে ভালই হয়েছে। তবে তোমার ঘরে এখন এক সম্ভ্রান্ত মহিলা অতিথি হিসাবে রয়েছেন। আমি না হয় বিকালে আবার আসব।

মার্থা : (উচ্চৈঃস্বরে) নিশ্চয় নিশ্চয়! শোন মার্গারেট, উনি তোমাকে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা ভাবছেন।

মার্গারেট : আমি একজন দরিদ্র তরুণী। ভদ্রমহোদয় দয়াপরবশ হয়ে আমার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করছেন। এ সব অলঙ্কার আমার নয়।

মেফিস্টোফেলিস : শুধু অলঙ্কার নয়। আপনার চোখের দৃষ্টি ও হাবভাবও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মত। যাই হোক, আমি এখানে অবস্থানের অনুমতি লাভ করে খুশি।

মার্থা : আপনার কি দরকার ? আমি তা মেটাবার চেষ্টা—

মেফিস্টোফেলিস : আমার গলার স্বরটা যদি দুঃখে এমন ভারী হয়ে উঠত। কথাটা বলার জন্য যেন কিছু মনে করো না। অন্যভাবে নিও না। তোমার স্বামী মারা গেছে।

মার্থা : মারা গেছে! হায়, তার অন্তঃকরণ কি সরলই না ছিল। আমার স্বামী মারা গেছে, আমাকেও মরতে দাও।

মার্গারেট : শোন মেয়ে। বিপদে ধৈর্য ও সাহস হারিও না।

মেফিস্টোফেলিস : আমাকে এই দুঃখপূর্ণ কাহিনীটা পুরো বলতে দাও।

মার্গারেট : সুতরাং আমি আর কখনো কাউকে ভালবাসব না। প্রিয়-জনের মৃত্যুজনিত এই ধরনের ক্ষতি আমাকে মর্মাহত করবে।

মেফিস্টোফেলিস : যেমন বেদনার পর আনন্দ আসে তেমনি আনন্দের পরও বেদনা উড়ে এসে জুড়ে বসবেই।

মার্থা : তার জীবনাবসান কিভাবে হল তা বল আমায়।

মেফিস্টোফেলিস : পতুয়ায় তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে সেণ্ট এ্যাণ্টনির পাশে।

মার্থা : তোমার কি আর কিছু বলার আছে ?

মেফিস্টোফেলিস : দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ের কিছু দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর তার কিছুই ছিল না। তাকে ঋণের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্য আমি নিজের তিনশো টাকা খরচ করেছি। ফলে আমার হাত এখন খালি।

মার্থা : কি! তার পকেটে একটা কানাকড়িও নেই ? কোন মণিমুক্তো কিছুই নেই ? যে কোন মানুষই হয় চাকরি করে অথবা ভিক্ষে করে কিছু না কিছু সঞ্চয় করে। এমন নিঃস্ব হয়ে কেউ মরে না।

মেফিস্টোফেলিস : এটা সত্যিই দুঃখের বিষয় ভদ্রমহোদয়া। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, সে কোন বিষয়ে কখনো বাজে খরচ করেনি। তাছাড়া তার অনুশোচনাও কম ছিল না। তার দুর্ভাগ্যের জন্য প্রায়ই খেদ করত সে।

মার্গারেট : হায়! মানুষ কতই হতভাগ্য! আমি অবশ্যই তার আত্মার জন্য প্রার্থনা জানাব ঈশ্বরের কাছে।

মেফিস্টোফেলিস : আপনি শীঘ্রই আবার বিবাহের প্রস্তাব পাবেন। আপনার সে যোগ্যতা আছে। আপনি দয়ালু, মমতাময়ী।

মার্গারেট : না না। তাতে কোন ফল হবে না।

মেফিস্টোফেলিস : দ্বিতীয়বার স্বামী না হলেও একজন সুদর্শন প্রেমিক হিসাবে কাউকে গ্রহণ করতে পারেন। প্রেম নিবেদন করার জন্য মনোমত লোক পাওয়াটা ঈশ্বরের একটা বড় দান।

মার্গারেট : এ দেশের প্রথা তা নয়।

মেফিস্টোফেলিস : প্রথা থাক বা নাই থাক, এটাই সাধারণতঃ ঘটে থাকে।

মার্গা : আপনি বলে যান।

মেফিস্টোফেলিস : আমি মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। শয্যা নয়, যেন আধপচা খড় দিয়ে তৈরি সারের স্তূপ। তথাপি সে একজন খৃস্টান হিসাবেই মৃত্যুবরণ করে। সে যখন দেখে মৃত্যুর পর দুর্নাম রটবে চারদিকে তখন সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি আমার নিজের আচরণকেই ঘৃণ্য বলে মনে করি। এইভাবে আমার স্ত্রী, পরিবার, আমার ব্যবসাকে ছেড়ে যাওয়া উচিত

নয়। এই সব কিছুর স্মৃতি মৃত্যুযন্ত্রণার সমতুল। আশা করি আমি আমার স্ত্রীর প্রতি যদি কোন অন্যায় করে থাকি ঈশ্বর তাহলে তা ক্ষমা করবেন।

মার্থা : (কাঁদতে কাঁদতে) আহা, কী ভাল সে। সে ক্ষমা সে পেয়েই গেছে।

মেফিস্টোফেলিস : তথাপি তার স্ত্রীকেই সে দোষ দিয়ে গেছে। আমাকে নয়।

মার্থা : সে মিথ্যা বলেছে। মৃত্যুকালে সে মিথ্যা নিন্দার কথা বলে গেছে আমার নামে।

মেফিস্টোফেলিস : শেষ সময়ে তার চেতনা শিথিল হয়ে পড়ে, আমার যতদূর মনে হয়। সে বলে, আমার কোন স্বাধীনতা ছিল না, খেলাধূলা বা আনন্দোৎসবের কোন সময় ছিল না। প্রথম কথা সন্তানদের ভাবনা ভাবতে আর তাদের খাবার জোটাতেই সব সময় কেটে যেত আমার। তার জন্য রাতদিন খাটতে হত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। তবু শান্তিতে পেট ভরে দুবেলা দুমুঠো খেতে পেতাম না।

মার্থা : মরণকালে বিস্মৃতিবশতঃ সে কি সব প্রেম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা ভুলে গিয়েছিল একেবারে ? আমিও যে দিনরাত খাটি, সমান উদ্বেগ ভোগ করি সেকথা ভুলে গিয়েছিল সে।

মেফিস্টোফেলিস : ঠিক তা নয়। সে কথা তার মনে ছিল। সে বলছিল যখন আমি মালটা থেকে চলে এসেছিলাম তখন আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই নিবিড়ভাবে। দয়া করে ঈশ্বর বিশেষ এক সৌভাগ্যও দান করেন। একজন তুর্কী ব্যবসায়ীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তার কাছে ছিল প্রচুর সম্পদ। সে তাই নিয়ে সোভান যাচ্ছিল। সাহসের সঙ্গে তাঁর সঙ্গী হিসাবে আমি তাকে পথে সাহচর্য দান করি আর তার ফলে সেই সাহসিকতার মূল্যস্বরূপ আমার প্রাপ্য সে যথাযথভাবে দিয়ে দেয়।

মার্থা : বল বল কেমন করে ? কোথায় ? তার কাছে কি টাকাটা ছিল ?

মেফিস্টোফেলিস : কে তার খবর রাখে ? কে জানে কোথায় কোন বাতাসে সে টাকা উড়ে গেছে ? সে যখন নেপলস্‌এ একাকী নির্বান্ধব অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন এক সুন্দরী কুমারী তাকে ভালবেসে সঙ্গ দান করে। সে ভালবাসার কথা শেষ দিন পর্যন্ত মনে ছিল তার।

মার্থা। শয়তান ! নিজেদের ছেলেদের না দিয়ে সে টাকা ভোগ করা

মানে চুরি করা। এত দুঃখকষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও তার চৈতন্য হয়নি? সে এই ধরনের নির্লজ্জভাবে উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে?

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু দেখ! যাই হোক, সে এখন মৃত। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম, এই সব কিছু সত্ত্বেও তার জন্য পুরো এক বছর শোক প্রকাশ করতাম আমি। তার পরের বছর আমি নিজের দিকে তাকাতাম। নিজের কথা ভাবতাম।

মার্থা। হা ভগবান! আমার প্রথম স্বামীর মত এমন ভালবাসার লোক জগতে কোথাও পাব না আমি। লোকটা বোকা-বোকা হলেও তার স্বভাবটা ছিল বড় মিষ্টি। শুধু সে মাঝে মাঝে আমাকে ছেড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াত। বিদেশী মদ, মেয়েমানুষ আর পাশাখেলায় ঝোঁক ছিল তার।

মেফিস্টোফেলিস: ঠিক আছে। তাও যদি বা সে সুচতুরভাবে তোমার পদস্খলনের ব্যাপারগুলোকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে এড়িয়ে যেত। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার এই অবস্থা জেনেও আমি তোমার সঙ্গে আংটি বিনিময় করতে রাজী আছি।

মার্থা: ভদ্রমহোদয় ঠাট্টা করতে ভালবাসেন।

মেফিস্টোফেলিস: (স্বগত) সময় বুঝে এখান থেকে কেটে পড়ব আমি। তার কথায় বিশ্বাস করে সে শয়তানকেই গ্রহণ করবে আমার মনে হয়। মার্গা-রেটকে) কথাটা শুনে তোমার কেমন লাগছে?

মার্গারেট: আপনি আসলে কি বলতে চাইছেন?

মেফিস্টোফেলিস: (স্বগত) তুমি যেমনি সুন্দরী তেমনি নির্দোষ। (উচ্চৈঃ-স্বরে) ভদ্রমহোদয়াগণ, বিদায়।

মার্গারেট: বিদায়।

মার্থা: বিদায়ের আগে এক মুহূর্তের জন্য একটা কথা আছে। আমি আমার স্বামীর মৃত্যুর আইনসঙ্গত সাক্ষ্য প্রমাণাদি পেতে চাই। কোথায় কখন কিভাবে তার মৃত্যু হয় তা জানা দরকার। আমি তার মৃত্যুর কথা কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত করব।

মেফিস্টোফেলিস: হ্যাঁ, হে আমার প্রিয়তমা, উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদিই কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমার এক উচ্চপদস্থ বন্ধু আছে। সেও এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। আমি তাকে নিয়ে আসব।

মার্থা: হ্যাঁ, তাই করুন।

মেফিস্টোফেলিস : এই তরুণীই তখন উপস্থিত থাকবেন। আমি যাকে আনব, আমার সেই বন্ধু একজন সাহসী যুবক, প্রচুর দেশভ্রমণ করেছে। তাকে পেয়ে এঁর মত মেয়েরা আনন্দ পাবেন।

মার্গারেট : তাঁর কাছে যেতে আমার লজ্জা পাবে।

মেফিস্টোফেলিস : কোন রাজার সামনে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়। ও কথা বলা ঠিক নয়।

মার্থা : আমার বাড়ির পিছনের দিকে বাগানে আজ সন্ধ্যায় তাহলে আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব।

একাদশ দৃশ্য

রাজপথ

ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস

ফাউস্ট : কি ব্যাপার? সব ঠিক হয়ে গেছে? প্রস্তুতিপর্ব শেষ?

মেফিস্টোফেলিস : থাম থাম। তুমি যে দেখছি কামনার আগুনে জলছ? ঠিক আছে, শীঘ্রই তুমি মার্গারেটকে পাবে। তার প্রতিবেশিনী মার্থার বাড়িতে তুমি তাকে আজ সন্ধ্যায় দেখতে পাবে। অবৈধ প্রেমসম্পর্কের ব্যাপারে তার মত মেয়ের কোন তুলনা নেই জানবে।

ফাউস্ট : ভাল কথা।

মেফিস্টোফেলিস : তবে আমাদের দিক থেকে একটা কাজ করার আছে।

ফাউস্ট : কারো কাছ থেকে কিছু পেতে হলে কিছু দিতেই হবে।

মেফিস্টোফেলিস : তাকে আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে তার স্বামীর মৃতদেহ এখন পদুয়ার পবিত্র ভূমিতে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে সমাধির মধ্যে শায়িত আছে।

ফাউস্ট : খুব ভাল কথা। তবে আমাদের এখন সর্বপ্রথম সেখানে অর্থাৎ পদুয়ায় যেতে হবে ত?

মেফিস্টোফেলিস : কষ্ট করে যাওয়ার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু বলে দেবে তুমি এটা জান।

ফাউস্ট : তুমি যদি ভাল কথা না শোন, তাহলে আমি তোমার পরিকল্পনা

ছিন্নভিন্ন করে দেব'।

মেফিস্টোফেলিস : ঠিক আছে, ধার্মিক সাধু মহাশয়! এই কি জীবনে প্রথম তুমি মিথ্যা সাক্ষ্যদান করছ? যে ঈশ্বর এই পৃথিবীর স্রষ্টা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন সেই ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে তুমি কি এক নির্লজ্জ সাহসিকতার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলনি? ব্যাপারটা যদি তুমি গভীরভাবে তলিয়ে দেখ তাহলে দেখবে তুমি সোয়ার্দতেনের মৃত্যু আর সমাহিত হওয়ার খবরটা জান। আর সেই কথাটাই পরিস্কার বলে দেবে।

ফাউস্ট : তুমি দেখছি বরাবর নাস্তিক আর মিথ্যাবাদী রয়ে গেছ।

মেফিস্টোফেলিস : হ্যাঁ, আমি তোমার মনের গভীর কথা সব জানি বলেই একথা বলেছি। তুমি কি মার্গারেটের মত সুন্দরী প্রেমিকাকে পাবার জন্য করায়ত্ত করার জন্য তার তোষামোদ করবে না? অন্তরের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে তার জন্য শপথ করবে না?

ফাউস্ট : আমি আন্তরিকতার সঙ্গেই তা করব।

মেফিস্টোফেলিস : চমৎকার। তোমার অনন্ত ভালবাসা আর সুগভীর বিশ্বাসই কি তোমার অন্তরকে শক্তি যোগাবে?

ফাউস্ট : থাম, থাম। যদি আমার এই জলন্ত কামনার অগ্নিশিখা আর আমার ইন্দ্রিয় চেতনার সমস্ত তীক্ষ্নতা দিয়ে অনুসন্ধান করেও আমার মনের মত মেয়ে না পাই তা হলে সারা বিশ্বসৃষ্টি পরিভ্রমণ করে বেড়াব আমি তার সন্ধানে। এর জন্য যে বিপুল উদ্যম আমি ব্যয় করব তা অনন্ত, মহৎ, চিরন্তন। তুমি কি এটাকে শয়তানি খেলা বলে অভিহিত করতে চাও?

মেফিস্টোফেলিস : তা যদি বলি তাহলেও আমি ঠিকই করব।

ফাউস্ট : শোন। আমার একটা অনুরোধ, আমাকে রেহাই দাও। অনেক বকেছি। কারো যদি জিহ্বার জোর থাকে তাহলে সে তার অধিকার অবশ্যই আদায় করে নেবে। তবে এবিষয়ে আর কথা বাড়ালে তাতে তিক্ততারই সৃষ্টি হবে। আমি একাজ করবই তাতে তুমি যাই বল।

দ্বাদশ দৃশ্য

বাগান

(ফাউস্টের বাহুলগ্ন অবস্থায় মার্গারেট। মার্থা ও মেফিস্টোফেলিস পায়চারি করছিল)

মার্গারেট : আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমার জন্য নিজেকে ছোট করে তুলছেন। আর তাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অবশ্য পথিকরা যে কোন ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত। আমি জানি আমার এই সব কথাবার্তা আপনার মত একজন অভিজ্ঞ লোককে তৃপ্তি দান করতে পারবে না।

ফাউস্ট : তোমার চোখের একটি দৃষ্টি, তোমার মুখের একটিমাত্র কথা জ্ঞানীদের সমস্ত জ্ঞানগর্ভ কথার থেকেও আমাকে বেশী তৃপ্তিদান করবে। (মার্গারেটের হাত চুম্বন করল)

মার্গারেট : না না, নিজেকে এমন ছোট করবেন না। আমার এই নোংরা দেখতে খারাপ হাতটা কেন চুম্বন করছেন আপনি? আমাকে যে কাজ করতে হয় তার জন্য হাতটা এমন শক্ত হয়ে উঠেছে। আমার মা আমার খুব কাছেই রয়েছে। (তারা চলে গেল)

মার্থা : আপনি কি সব সময়ই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান ?

মেফিস্টোফেলিস : হায়! আমার ব্যবসা আর কর্তব্যের খাতিরেই আমাকে এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে ছুটে বেড়াতে হয় দেশে বিদেশে। কোন জায়গায় কিছুদিন থাকার পর সে জায়গা ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়। তবু বেশীদিন সেখানে থাকার সাহস পাই না।

মার্থা : যৌবনের উদ্দামতা যতদিন থাকে ততদিন এভাবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো চলে। মুক্ত পাখির মত বাধাবন্ধহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্দিন। তখন আত্মীয় স্বজনহীন অবস্থায় অসহায়ভাবে কবরে যেতে হয়। তার জন্য চোখে জল ফেলার মত কাউকে পাওয়া যায় না। এই ধরনের মানুষের শেষ পরিণতি বড় দুঃখের।

মেফিস্টোফেলিস : আমি ভয়ে ভয়ে দেখতে চাই ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে যায়।

মার্থা : তাহলে আপনার ভাগ্যের উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করুন। (তারা চলে গেল)

মার্গারেট : হ্যাঁ, চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল। আপনার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার এখন আমার খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু আপনার অন্য অনেক জায়গায় বন্ধুবান্ধব আছে। তারা আমার থেকে অনেক জ্ঞানী।

ফাউস্ট : আমাকে বিশ্বাস করো প্রিয়তমা। লোকে সাধারণতঃ যাদের জ্ঞানী বলে তারা অহঙ্কারী, সংকীর্ণচেতা।

মার্গারেট : তা কি করে হয় ?

ফাউস্ট : যারা সরল প্রকৃতির, যারা নির্দোষ তারা জানে না তাদের সরলতা ও নির্দোষিতার মূল্য এবং আবেদন কতখানি। এই সরলতা ও নম্রতা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ।

মার্গারেট : আপনি যদি আমার কথা মনে এক মুহূর্তের জন্যও স্থান দেন, তাহলে আপনি যখন যেখানেই থাকুন আপনার কথা আমি ভাবব।

ফাউস্ট : তোমার হয়ত খুব একা একা লাগে।

মার্গারেট : আমাদের সংসার খুবই ছোট। আপনি সেখানে গেলে বড় আদরযত্ন পাবেন। আপনার মনে হবে এটা আপনার নিজের সংসার। আমাদের বাড়িতে কোন দাসী নেই। আমি নিজে ঝাঁট দেওয়া, সেলাই করা উল বোনা, রান্না করা প্রভৃতি সব কাজই করি। সংসার সম্বন্ধে আমার মার জ্ঞান বেশ পাকা। শুধু যে খরচ বাঁচাবার জন্য আমার সংসারের সব কাজ নিজেরা করি তা নয়। আমাদের আয় ছিল, আমরা আর পাঁচজনের থেকে আরামে থাকতে পারতাম। আমার বাবা আমাদের বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তি রেখে যান। শহরের কাছে একটা বাড়ি আর একটা বাগান আছে আমাদের। বর্তমানে আমাদের জীবনে খুব একটা অভাবের তাড়না বা ব্যস্ততা নেই। আমার ভাই সৈনিকের কাজ করে। আমার একটা ছোট্ট বোন ছিল। সে মারা গেছে। তাকে নিয়ে অবশ্য আমাকে বেশ কষ্ট সহ্য করতে হয় কিছুকাল। তবু সে ছিল আমার বড় প্রিয় এবং তার জন্য আবার আমি সেই কষ্টের জীবন যাপন করতে রাজী আছি।

ফাউস্ট : দেবদূতের মতই গুণবতী তুমি।

মার্গারেট : আমিই তাকে মানুষ করতাম। আমি তাকে দারুণ ভালবাসতাম। সে ভূমিষ্ট হবার আগেই বাবা মারা যান। মা তখন রোগে শয্যাশায়ী, তার অবস্থা তখন বড়ই খারাপ। কোন রকমে মা ধীরে ধীরে সেরে উঠছিলেন। তাঁর অত্যাধিক দুর্বলতার জন্য তিনি শিশুটার দিকে নজর দিতে

পারছিলেন না মোটেই। তাই আমিই তার দেখাশোনা করতাম। জল দুধ যা খাওয়াবার আমি তাকে খাওয়াতাম। আমিই তাকে কোলে রেখে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতাম। তারপর দিনে দিনে সে বেড়ে উঠতে লাগল। তার স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল। সে আমার মুখপানে তাকিয়ে প্রায়ই হাসত।

ফাউস্ট: তখন নিশ্চয় তুমি এক পবিত্রতম আনন্দ লাভ করতে। তোমার কষ্টের লাঘব হত।

মার্গারেট: তবে তাকে নিয়ে আমাকে অনেক ক্লান্তিকর মুহূর্ত যাপন করতে হত। রাত্রিতে আমার সেই ছোট্ট বোনের দোলনাটা রাখতাম আমার বিছানার ঠিক পাশেই। সে একটু নড়লেই আমি টের পেতাম আর আমার ঘুম ভেঙ্গে যেত। তখন আমি তাকে কোলে নিয়ে আদর করতাম। আমার নরম বুকে নিবিড় ভাবে চেপে ধরতাম তাকে। অনেক সময় সে কাঁদলে চুপ করাবার জন্য তাকে নিয়ে বিছানা ছেড়ে ঘরে পায়চারি করতাম অশান্তভাবে। তারপর দেখতে দেখতে সকাল হয়ে যেত। মুখ হাত ধুয়ে বাজার করতে যেতাম। রান্নাঘরের কাজে মন দিতাম। দিনের পর দিন কাটতে থাকে এইভাবে। যতই পরিশ্রমী হোক না কেন কোন মানুষ, মাঝে মাঝে ক্লান্তি আর অবসাদ আসে তার শরীরে। সে তখন ভাল আহার আর বিশ্রাম চায়। (তারা চলে গেল)

মার্থা: এটা সত্যি কথা। গরীব ঘরের মেয়েগুলো বড় নির্লজ্জ। যে সব পুরুষ গোঁড়ামির সঙ্গে কৌমার্যব্রত পালন করে তাদের বিয়েতে মন বসাতে পারে না।

মেফিস্টোফেলিস: তোমার মত যদি কোন মেয়ে পাই তাহলে প্রেমের এইসব চটুল অভিনয় ছেড়ে আমার জীবনের পরিবর্তন করি। তাহলে সুদিন নিয়ে আসি আমার জীবনে।

মার্থা: আমাকে সব কথা খুলে বলুন মশাই। আপনি কি এর আগে মনের মত কোন মেয়ে পাননি জীবনে? কাউকে আপনার মন দেননি?

মেফিস্টোফেলিস: একটা প্রবাদ আছে, যে কোন মানুষের জীবনে একটা গরম চুল্লী আর সতীলক্ষ্মী স্ত্রী সোনা বা মণিমুক্তোর মতই দামী।

মার্থা: আমি বলতে চাই, আপনি কখনো এ বিষয়ে কোন কামনা অনুভব করেননি?

মেফিস্টোফেলিস: আমি যেখানেই গিয়েছি সর্বত্রই আদর আপ্যায়ন অবশ্য পেয়েছি। পেয়েছি ভদ্র ব্যবহার।

মার্থা : আমি বলতে চাই, আপনি কি কোথাও কোন প্রেমময় স্পর্শ পাননি ?

ফাউস্ট : মেয়েদের ঠাট্টা করা মোটেই উচিত নয় কারো পক্ষে।

মার্থা : আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।

মেফিস্টোফেলিস : আমি দুঃখিত যে আমি তা বুঝতে পারছি না। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে আমার প্রতি তোমার দয়ার অন্ত নেই।

(তারা চলে গেল)

ফাউস্ট : আচ্ছা, আমি যখন তোমাদের বাগানের গেট দিয়ে ঢুকি তখন দেখে আমাকে চিনতে পেরেছিলে ?

মার্গারেট : তুমি কি দেখতে পাওনি আমি তোমাকে দেখে আমার চোখ নামিয়ে নিই ?

ফাউস্ট : তুমি যখন গীর্জা থেকে চলে যাচ্ছিলে তখন যদি কিছু বেয়াদবি করে থাকি তবে সে দোষ আমার। আমার এই স্বাধীনতাটুকুকে ক্ষমার চোখে দেখো।

মার্গারেট : আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি আমার জীবনে। আমাকে অবশ্য কেউ কোন দোষ দেয়নি। তবু আমার ভাবনা হচ্ছিল আমার আচরণের মধ্যে যদি উনি কিছু অশালীন অসংযমের পরিচয় পেয়ে থাকেন ? তাঁর এমনও মনে হতে পারে যে এই মেয়েটি সহজলভ্যা ও বহুবল্লভা। আমি স্বীকার করছি তোমাকে পাবার জন্য আমার বুকের মাঝে তখন কি ধরনের আকুতি জেগে ওঠে আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে তোমার প্রতি তখন কঠোর হয়ে উঠতে পারিনি, রাগ করতে পারিনি বলে নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার।

ফাউস্ট : হে আমার প্রিয়তমা !

মার্গারেট : একটু থাম। (একটি ফুল তুলে তার পাতাগুলো একের পর এক করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল)

ফাউস্ট : ফুলটা কি নাকে নিয়ে শুঁকবে ?

মার্গারেট : না, খেলা করব।

ফাউস্ট : কিভাবে ?

মার্গারেট : যাও, তুমি ঠাট্টা করবে আমাকে। (পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল)

ফাউস্ট : কি বিড়বিড় করে বলছ ?

মার্গারেট (অর্ধস্ফুট স্বরে) সে আমায় ভালবাসে না—মোটেই ভালবাসে না।

ফাউস্ট : হে আমার সুন্দরী প্রিয়তমা। দেবদূতের মত তোমার আত্মা।

মার্গারেট : আমায় ভালবাসে না—ভালবাসে না। না, না। (ফুলের বৃন্ত হতে শেষ পাতাটা ছিঁড়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল)

হ্যাঁ, আমায় ভালবাসে। ভালবাসে।

ফাউস্ট : হ্যাঁ, তোমার শিশুসুলভ কণ্ঠে এই ফুলের কুঁড়িটি যে কথা বলছে তার মধ্যে যেন স্বর্গের সুষমা নেমে আসে। হ্যাঁ, সে তোমায় ভালবাসে। একথার মানে নিশ্চয় তুমি জান ? সে তোমায় ভালবাসে।

(মার্গারেটের দুটি হাত ধরল)

মার্গারেট : আমার কাঁপুনি আসছে।

ফাউস্ট : না না, কেঁপো না। আমার এই দৃষ্টি আর হাতের উষ্ণনিবিড় স্পর্শের খাতিরে তোমার মনের গভীরগোপন সেই অব্যক্ত কথাটি বলে ফেল। জেনে রেখো, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্যে যে আনন্দ আছে সে আনন্দ শাশ্বত চিরন্তন। বিচ্ছেদে হতাশা আছে ঠিক, কিন্তু বিচ্ছেদ যেন না ঘটে।

মার্থা : (সামনে এগিয়ে এসে) রাত্রি নেমে আসছে।

মেফিস্টোফেলিস : এবার আমাদের চলে যেতে হবে।

মার্থা : এখানে তোমাদের আরো কিছুদিন থাকার জন্য বলতাম। কিন্তু এ শহরে নিন্দুকদের জিহ্বা বড় তীক্ষ্ণ। প্রতিবেশীদের কাজকর্মের উপর নজর রাখা ছাড়া তাদের অন্য কোন কাজ নেই। যে যাই করুক, তাই নিয়ে কথা বলাবলি করবে প্রতিবেশীরা। ওরা আবার গেল কোথায় ?

মেফিস্টোফেলিস : বসন্তের সুখী পাখির মত অদূরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মার্থা : ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছে।

মেফিস্টোফেলিস : আর মেয়েটাও তার প্রেমে পড়ে গেছে। এইভাবে এই সব ভালবাসাবাসির মধ্য দিয়েই জগৎ এগিয়ে চলেছে।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

বাগানবাড়ি

(মার্গারেট ঘরের ভিতর ঢুকে দরজার কপাটের আড়ালে লুকিয়ে ফুটো দিয়ে দেখতে লাগল)

মার্গারেট : ঐ এসে গেছে ও।

ফাউস্ট : (প্রবেশ করে) দুষ্টু কোথাকার ! তুমি আমায় বেশ ঠকিয়েছ। এবার ধরে ফেলেছি। (চুম্বন করল)

মার্গারেট : (ফাউস্টকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনের প্রতিদান দিল)

হে আমার প্রিয়তম ! আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি।

(মেফিস্টোফেলিস দরজায় করাঘাত করতে লাগল)

ফাউস্ট : কে ওখানে ?

মেফিস্টোফেলিস : তোমার বন্ধু।

ফাউস্ট : একটা পশু।

মেফিস্টোফেলিস : আমাদের যাবার সময় হয়ে গেছে।

মার্থা : হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে।

ফাউস্ট : আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না ?

মার্গারেট : আমার মা ডাকছে—বিদায়।

ফাউস্ট : হায়, আমি কি থেকে যেতে পারি না ? বিদায়।

মার্থা : বিদায়।

মার্গারেট : আবার শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে।

(ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিসের প্রস্থান)

মার্গারেট : হা ভগবান ! একটা মানুষ এত কিছু জানতে পারে ? আমি তার কথা শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছি আর মাঝে মাঝে তার সব কথায় 'হাঁ' দিয়ে এসেছি। তার কাছে আমি এক অজ্ঞ শিশুমাত্র। জানি না আমার মধ্যে সে কি পেয়েছে। (প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

অরণ্যপ্রদেশ সংলগ্ন পার্বত্যগুহা

হে মহতী দৈবীশক্তি, আমি যা যা প্রার্থনা করেছিলাম তুমি তা সব দিয়েছ। তুমি শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আলোকে তোমার রহস্যময় মুখমণ্ডলটি উদ্‌ঘাটিত করনি, তুমি আমাকে দান করেছ প্রকৃতির বিরাট রাজ্য আর আমাকে দিয়েছ তা অনুভব করার ও উপভোগ করার ক্ষমতা। তোমার যে মুখমণ্ডল আজ আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত তা শুধু হিমশীতল ঔদাসীন্যে প্রস্তরীভূত নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত তোমার বুকের গভীরে সব কিছু প্রত্যক্ষ করতে পাচ্ছি আমি। সমস্ত সচেতন প্রাণীদের আমার কাছে নিয়ে এসে বশীভূত করে দিয়েছ আমায়। বাতাসে জলে নীরব বনভূমিতে আমার ভ্রাতৃপ্রতিম যে সব শক্তি আছে তুমি তাদের চিনিয়ে দিয়েছ আমায়। প্রচণ্ড ঝড়ের গর্জনে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যখন সমগ্র বনভূমি, দৈত্যাকার ফারগাছগুলির পতনশীল শাখাপ্রশাখা ও কাণ্ড-গুলি পরস্পরের আঘাতে বিচূর্ণিত হতে থাকে, তখন তুমি আমাকে কোন নির্জন গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাও। আমার নিজের অন্তরাত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করে তোল আমার কাছে। আমার বুকে লুকিয়ে আছে যে রহস্যের ইন্দ্রজাল তার গ্রন্থিগুলিকেও উন্মোচিত কর আমার কাছে। তারপর পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো যখন আমার চোখের সামনে নেমে আসে তখন চারদিকের জটিল বনান্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে যেন সুদূর অতীত যুগের শুভ্রোজ্জ্বল অজস্র প্রেতাত্মা। আমার আনন্দের সমস্ত উচ্ছ্বাসকে সংযত করে তারা। আজ আমি একটি বিষয়ে পূর্ণ-মাত্রায় সচেতন যে কোন মানুষই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এই সত্যোপলব্ধির গভীরতা আমাকে ঈশ্বরের সামীপ্যে নিয়ে যায়। তারপর হে শক্তি, তুমি আমাকে দাও এমনই এক বন্ধু ও সহকর্মী যাকে ছাড়া আমি আর এক-বিন্দুও চলতে পারি না, অথচ যে আমাকে আমার নিজের কাছে ছোট করে তোলে সব সময়ে। সে কেমন যেন উদাসীন, তার সাহচর্য ঘৃণ্য বোধ হয় আমার কাছে। তোমার সব দানকে তুচ্ছতায় নিরর্থক করে তোলে। আমার অশান্ত বুকের ভিতর জাগিয়ে তোলে অবৈধ কামনার এক অক্লান্ত অনির্বাণ আগুন। সেই সুন্দরীকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি আমি। কামনা পরিতৃপ্তির জন্য আমি উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলি। কিন্তু সে কামনার বস্তুকে যতই উপভোগ করি ততই বেড়ে যায় সে কামনা।

(মেফিস্টোফেলিস প্রবেশ করল)

মেফিস্টোফেলিস : এই সব চিন্তা ও অনুধ্যান জীবনে ত অনেক করেছ। এ নিয়ে আবার পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন কি? জীবনে যে কোন পরীক্ষা-একবারই করতে হয়। এখন নূতন কিছুর কথা ভাব।

ফাউস্ট : আমার এই শুভ দিনটাকে অশুভ ও দূষিত করে দেওয়ার জন্য আবার কি কাজের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ?

মেফিস্টোফেলিস : হ্যাঁ, আমি তোমাকে নূতন কাজেই নিযুক্ত করব। কিন্তু একথা তোমার মুখ ফুটে আমার কাছে বলা ঠিক নয়। তোমার মত একটা আধপাগলা, অভদ্র সহকর্মী আমার না থাকলেও আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু কাজ ছাড়া ত মানুষ থাকতে পারে না। হাতে কিছু কাজ ত দরকার। সুতরাং তোমার মুখে একথা সাজে না।

ফাউস্ট : তোমার সেই এক কথা। সেই এক সুর। তোমাকে আর আমার মোটেই ভাল লাগে না। ধন্যবাদ, যাও।

মেফিস্টোফেলিস : হে ধরিত্রীর অসহায় সন্তান! আমাকে ছাড়া কেমন করে একা তুমি থাকবে? একদিন আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। তোমার চিন্তার দীনতা আর তোমায় পীড়িত করে না। আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম তাহলে তুমি অবশ্য এই গোলাকার পৃথিবীতে ঠিকই চলে ফিরে বেড়াতে। কিন্তু তবে কেন এই পার্বত্যগুহার অন্ধকারে বসে পেঁচার মত মিটমিট করে চেয়ে আছ? এই সব শ্যাওলাধরা পাথর হতে বিষাক্ত ব্যাঙের মত চিন্তার কী এমন খোরাক সংগ্রহ করছ? সময় কাটাবার চমৎকার উপায়! আমি দেখছি তোমার মধ্যে সেই ডাক্তারটা এখনো রয়েছে।

ফাউস্ট : এই অরণ্যময় পার্বত্যপ্রদেশের সঙ্গে নিবিড় সহযোগে কী এমন অভিনব প্রাণশক্তি আহরণ করতে পারি বলে তোমার মনে হয়। তবে সত্যিই তোমার যদি ধারণাশক্তি থাকত তাহলে নিশ্চয় তুমি আমি যে শক্তি যে সম্পদ লাভ করেছি এর থেকে তাতে ঈর্ষাবোধ করতে।

মেফিস্টোফেলিস : অতিপ্রাকৃত উৎস হতে পরম সুখ। রাত্রিতে শিশির ভেজা পাহাড়ের উপর আকাশের পানে তাকিয়ে ভাববে আর তোমার আকাশ-চারী কল্পনার অনন্তপ্রসারী প্লাবনে স্বর্গমর্ত্য সব একাকার হয়ে ভেসে যাবে। তোমার মনে হবে তুমি ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি চলে গেছ। মনে হবে এক বিরাট দৈবশক্তি লাভ করেছ। সেই শক্তির এক অনাস্বাদিতপূর্ব অহঙ্কার এক

অপার্থিব সূক্ষ্ম সুখানুভূতি তোমার কর্মজীবনের সমস্ত কঠোরতাকে দূরীভূত করে দিয়ে পৃথিবীর প্রতি অস্থিমজ্জায়, তার প্রতিটি অন্ধকার সংকীর্ণতায়, প্রতিটি বস্তুর উপর ঝরে পড়বে। আর ঠিক তখন পরমার্থরূপ চূড়ান্ত পুষ্পটি চয়ন করার এক সমুন্নত প্রবৃত্তি আচ্ছন্ন করে তুলবে তোমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে। (অঙ্গভঙ্গি করে) অবশ্য কেমন করে তা সম্ভব হবে তা বলতে পারব না।

ফাউস্ট : তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

মেফিস্টোফেলিস : হ্যাঁ বুঝেছি, কথাটা তোমার খুবই অপ্রিয় লাগছে। বর্তমানে অবশ্য আমাকে লজ্জা দেবার মত নৈতিক অধিকার আছে তোমার। কোন সং লোকের কাছে এ কথা কেউ বলতে পারে না এবং সং লোকের অন্তঃ-করণ তা সহ্য করতে পারে না। নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে প্রতারিত করার তোমার এই আনন্দে কখনই ঈর্ষাবোধ করি না আমি। কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না তোমার। তুমি এখনই দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছ। শীঘ্রই ভয়ে তুমি উন্মাদ হয়ে যাবে। যাই হোক ও কথা ছেড়ে দাও। অদূরে বসে রয়েছে তোমার প্রিয়তমা। তাকে বড় বিমর্ষ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। এক প্রবল প্রেমানুভূতিতে আলোড়িত হয়ে উঠছে তার অন্তর। তোমাকে আরো নিবিড় করে পাবার জন্য সে হয়ে উঠেছে আগের থেকে আরও ব্যাকুল। পাহাড় থেকে সমতলভূমির দিকে নেমে আসা বরফগলা জলের স্রোতের মত একদিন তোমার উচ্ছ্বসিত প্রেমের বন্যায় অবগাহন করে ধন্য হয় সে। আজ তোমার বিরহে শুকিয়ে গেছে সে স্রোতোধারা। আমার মতে এই নির্জন বনপ্রদেশে একা একা বসে না থেকে ঐ তরুণ যুবতীর কাছে গিয়ে তার প্রেমলাভে ধন্য হওয়া ঢের ভাল। তার সময় এখন দুঃখে কাটতে চাইছে না। তার এই ক্রম-প্রলম্বিত সময় কাটানোর জন্য জানালার মধ্য দিয়ে নগর প্রাচীরের উপর ভাস-মান মেঘমালার পানে তাকিয়ে থাকে। 'আমি যদি পাখি হতাম' এই গানটি সে সারাদিন ও অর্ধরাত্রি পর্যন্ত গেয়ে চলে সকরুণ সুরে। কখনো সে অত্যধিক দুঃখের তাড়নায় চোখের জল ফেলছে, আবার কখনো বা নীরবে বসে বসে ভাবছে। এখন প্রেমোন্মত্ততার লক্ষণগুলি প্রকটিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায়।

ফাউস্ট : সাপ। সাপ। কুটিল সাপের মতই তুমি ভয়ঙ্কর।

মেফিস্টোফেলিস : (স্বগত) হা হা। এবার কি তাহলে ফাঁদে ফেলতে পেরেছি তোমায়!

ফাউস্ট : যে অন্যায় করেছ, তাই নিয়েই চলে যাও। আর না। সেই সুন্দরীর নাম আর আমার কাছে করো না। আমার অর্ধাবিষ্ট অর্ধাচ্ছন্ন চেতনার উপর তার লাবণ্যবতী দেহের প্রতি কোন জারজ লালসাকে নূতন করে জাগিয়ে তুলো না আর।

মেফিস্টোফেলিস : এখন তাহলে কি তুমি করবে? সে ভাবছে তুমি হয়ত চলে গেছ, পালিয়ে গেছ। এখন দেখছি সত্যিই তোমার সত্তার অর্ধেক পালিয়ে গেছে তোমাকে ছেড়ে আর অর্ধেক অবশিষ্ট আছে তোমার মধ্যে।

ফাউস্ট : অথচ আমি কাছেই রয়েছি। আমার প্রিয়তমা আমি দূরে না গেলেও আমাকে পাচ্ছে না। আমার প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গণনা করছে। আমি তার মধুর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করতে পেলে বেদীর সামনে সহসা আবির্ভূত ঈশ্বরের দেহকেও চাইব না।

মেফিস্টোফেলিস : তোমাদের সুন্দর জুটি দেখে আমার বড় ঈর্ষা হয়। তোমরা দুজনে যখন ঘুরে বেড়াও তখন দেখে মনে হয় তোমরা যেন গোলাপের মধু খেয়ে বেড়াচ্ছ গোলাপ বনে।

ফাউস্ট : দূর হয়ে যাও মিথ্যাবাদী।

মেফিস্টোফেলিস : তুমি আমাকে গাল দিচ্ছ, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি কৌতুক করছ। যে ঈশ্বর বিশ্বে যৌবন ও সুন্দরী তরুণীদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যুবক-যুবতীদের মিলনের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন তাঁর সৃষ্টি রক্ষার্থে। এই মিলনের পিছনে আছে গভীর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য। সুতরাং যাও। মনে রেখো মৃত্যুর কবলে নয়, তোমার প্রতীক্ষমানা প্রিয়তমার নিভৃত কক্ষে যাওয়াই তোমার এখন সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

ফাউস্ট : তার আলিঙ্গনের মধ্যে কি আছে? স্বর্গীয় সুখের সুষমা? যদিও তার অমিত চুম্বনমাধুর্যে আমি ধন্য, তথাপি তার কোন অভাব বা প্রয়োজন মেটানোও কি আমার কর্তব্য নয়? আমি একজন পলাতকের মত গৃহহারা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার কোন উদ্দেশ্য নেই, লক্ষ্যস্থল নেই। উদ্দেশ্য-হীনভাবে ছুটে চলা উন্মত্ত কোন পার্বত্য নদীর মতই আমার জীবন। আর সে আমার এই চলমান জীবনস্রোতের ধারে প্রস্তরকঠিন এক দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর শান্ত সংসারজীবন যাপন করছে। তার জগৎ সেই শান্ত সরল সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আমি আমার অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন গতির উন্মত্ত আঘাতে পথের দুপাশের পাথরগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ধূলো করে দিচ্ছি। তবু তার

শান্ত গৃহকোণের সেই সুখকে এখনো ঘৃণা করি, তুচ্ছ জ্ঞান করি আমি। হে নরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি কি তাকে তোমার বলি হিসাবে চাও? হে আমার প্রিয় শয়তান, আমাকে এই দুঃখের মাঝে পথ দেখাও। যা হবার তা যেন তাড়াতাড়ি হয়। তার ভাগ্যকে আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। তারপর দুটি ভাগ্যকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও। আমরা দুজনেই ধ্বংস হয়ে যাই এক সঙ্গে একেবারে।

মেফিস্টোফেলিস: আবার আবেগে বকতে শুরু করছে। যাও নির্বোধ, তার কাছে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দাওগে। তোমরা যখন কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাও না, কোন পথ খুঁজে পাও না তখনই ভাব মৃত্যু এসে গেছে নিকটে। যে বিপদের মধ্যেও স্থির থাকতে পারে দৃঢ়চেতা স্থিতবুদ্ধি সেই মানুষকে সাদরে বরণ করে নেবে। এমন কি দরকার মনে করলে শয়তানের রূপ ধারণ করবে। হতাশার মত আর কোন জিনিস কোন মানুষকে এত দুর্বল করতে পারে না।

পঞ্চদশ দৃশ্য

মার্গারেটের কক্ষ

মার্গারেট: (একাকী চরকা কাটছিল) আমার মনের শান্তি চলে গেছে। আমার হৃদয়ের ক্ষতে রক্ত ঝরছে। হায়, আমি আর তাকে কখনো দেখতে পাব না। কখনো না। অথচ তাকে কাছে না পেলে আমার মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। গোটা জগৎটা বিষাক্ত ঠেকছে আমার চোখে। তিক্ত লাগছে সবকিছু। আমার অসহায় মস্তিষ্ক উন্মাদের মত ঘুরছে। আমি আমার চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। বিহ্বল হয়ে পড়েছে আমার চেতনা। আমার মনের শান্তি চলে গেছে। হৃদয়ের ক্ষতে রক্ত ঝরছে। হায়, আমি তাকে আর কখনো দেখতে পাব না। অথচ তাকে দেখার জন্য আমি এই জানালার ধারে বসে আছি। শুধু তাকে দেখার জন্যই আমি আমার বাড়ি ত্যাগ করেছি। তার আনন্দোচ্ছল স্বভাব, উন্নত চেহারা, তার সুন্দর মুখের হাসি, তার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি, তার কথা বলার আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক ভঙ্গিমা, তার হাতের স্পর্শ ও চুম্বনের মাধুর্য সবকিছু পেতে চাই আমি। আজ আমার অন্তর শুধু তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে একান্তভাবে। আজ আমি যদি তাকে

আলিঙ্গন করতে পারতাম নিবিড়ভাবে। আজ যদি তাকে প্রাণভরে চুম্বন করতে করতে সেই চুম্বনানন্দের মধ্যে নিঃশেষে তলিয়ে যেত আমার সমস্ত জীবনচেতনা তাহলে কত ভাল হত।

ষোড়শ দৃশ্য

মার্থার বাগান

মার্গারেট। ফাউস্ট

মার্গারেট: বল, আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও হেনরি—

ফাউস্ট: বল কিসের প্রতিশ্রুতি!

মার্গারেট: তোমার ধর্ম কি? মানুষ হিসাবে তুমি ভাল, তোমার অন্তঃকরণ সৎ। তবু মনে হয় ধর্মেকর্মে তোমার তেমন মন নেই।

ফাউস্ট: ওকথা এখন বাদ দাও বাছা। তুমি জান আমার প্রেম কত গভীর, কত খাঁটি। এই প্রেমের খাতিরে আমি আমার দেহের রক্ত ও প্রাণ পর্যন্ত দান করতে রাজী আছি। কিন্তু ধর্মের জন্য নয়।

মার্গারেট: সেটা ঠিক নয়। ধর্মে বিশ্বাস রাখা ভাল।

ফাউস্ট: তাই নাকি?

মার্গারেট: তোমার উপর যদি কোন প্রভাব খাটাতে পারতাম তাহলেও হয়ত তুমি ধর্মে বিশ্বাস করতে না।

ফাউস্ট: ধর্মে শ্রদ্ধা আমার আছে।

মার্গারেট: কিন্তু ধর্মের কোন সত্যকে তুমি লাভ করতে চাও না। বহুদিন হলো তুমি প্রার্থনা বা স্বীকারোক্তি করনি। অথচ বলছ ঈশ্বরে বিশ্বাস করো।

ফাউস্ট: হে আমার প্রিয়তমা, কে জোর গলায় বলতে পারে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি? কোন পুরোহিত বা সাধককে জিজ্ঞাসা করো। তার উত্তরটা প্রশ্নকারীর কানে উপহাসের মত শোনাবে।

মার্গারেট: তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না?

ফাউস্ট: আমার কথায় ভুল বুঝো না সুবদনে। কে ঈশ্বরের মহিমাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে? কে ঈশ্বরকে সর্বক্ষণ অবলম্বন করে

বলতে পারে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি? আবার এমনই বা কে আছে যে তার সমস্ত অনুভূতি ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে পারে? ঊর্ধ্ব অধঃ ও সর্ব দিকে যিনি ব্যাপ্ত তিনি তোমাকে আমাকে ও নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই? আমাদের মাথার উপরে কি আকাশ নেই, আমাদের পায়ের নীচে কি পৃথিবীর মাটি নেই? সেই আকাশের উপর কি উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি কিরণ দান করে না? তোমার চোখে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি কি আমার মস্তিষ্কে ও অন্তরের অন্তঃস্থলে সেই আশ্চর্য শক্তির অস্তিত্বকে অনুভব করছি না, চিরন্তন যে শক্তি অনন্তকাল ধরে আমাদের জীবনে কখনো দৃশ্যত আবার কখনো অপরিদৃশ্যভাবে রহস্যের জাল বুনে চলেছে? সেই মহাশক্তির দ্বারা তোমার অন্তঃকরণকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পার। যখন সেই মহাশক্তিকে অন্তরে অনুভব করবে আর সেই অনুভূতির দ্বারা তোমার সমগ্র প্রাণমন আচ্ছন্ন হয়ে উঠবে তখন তুমি তাকে পরম সুখ, ঈশ্বর প্রভৃতি যে কোন নামে অভিহিত করতে পার। আমি তাকে কোন নামে ডাকতে চাই না। অনুভূতিই হলো আসল কথা। যত সব নামই বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতিকে ম্লান করে দেয়।

মার্গারেট: এসব কথা শুনতে খুবই ভাল লাগে। ধর্মপ্রচারকরা এইভাবেই কথা বলেন। শুধু শব্দ প্রয়োগের কিছু তারতম্য আছে।

ফাউস্ট: সব জায়গায় সেই একই ব্যাপার চলেছে। কোন ধর্মীয় উৎসবের দিনে সব মানুষ যেমন একই আনন্দ অনুভব করে আর সেই আনন্দ আপন আপন ভাষায় প্রকাশ করে আমিও তেমনি আমার আনন্দ আমার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করছি।

মার্গারেট: তোমার কথা শুনে মনে হয় ঠিক আছে। কিন্তু পরে বোঝা যায় তোমার কথার মধ্যে কিছু অবাঞ্ছিত দিক আছে, কারণ তুমি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করনি।

ফাউস্ট: হে আমার প্রিয়তমা!

মার্গারেট: আমি বহুদিন ধরে আশা করে এসেছি তুমি এই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক হয়ে উঠবে।

ফাউস্ট: কেমন করে?

মার্গারেট: যে লোকটি তোমার সাথী হিসাবে তোমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করে তাকে আমি অন্তর থেকে গভীরভাবে ঘৃণা করি। মুখ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে

আমার অন্তরে যে দুঃসহ ঘৃণার অনুভূতি জেগে ওঠে আমার সারাজীবনের মধ্যে তেমন অনুভূতি আর কখনো জাগেনি।

ফাউস্ট : না না, তাকে ভয় করো না প্রিয়তমা।

মার্গারেট : সে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় কোন অশুভ শক্তি এসে হাজির হয়েছে। সে ছাড়া আর সব লোকের প্রতিই আমার সহানুভূতি আছে। যখনি তোমাকে দেখার জন্য অন্তর আমার ব্যাকুল হয়ে ওঠে তখনি তার সম্বন্ধে একটা গোপন বিভীষিকা আমাকে পেয়ে বসে, একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার মনে হয় লোকটা এক পাকা জুয়াচোর।: যদি আমি তার প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন।

ফাউস্ট : এই ধরনের কিছু অদ্ভুত পাখি এখানে ওখানে আছে।

মার্গারেট : ওই ধরনের লোকের সঙ্গে বাস করা কখনই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। সে ঘরের ভিতর ঢুকেই চারদিকে নাসিকা কুঞ্চিত করে কি সব দেখতে থাকে। তার দৃষ্টির সঙ্গে মিশে থাকে অহেতুক রোষ। তার কপালের উপর যেন একটা কথা লেখা আছে। সে কথা হোলো, প্রেম মাত্রই ঘৃণ্য তার কাছে অথচ দেখ, তোমার আলিঙ্গনের মধ্যে আমি কত সুখ পাই। মুক্তিতে কত অন্তহীন, আত্মসমর্পণে কত নিবিড় আর প্রেমে কত উত্তপ্ত হয়ে উঠি আমি। অথচ তার উপস্থিতিতে পাথরের মত কঠিন হয়ে ওঠে আমার অন্তরাত্মা।

ফাউস্ট : খুব ভীতু তুমি।

মার্গারেট : এই ভয় আমাকে এতদূর আচ্ছন্ন করে ফেলে যে যখন যেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়, মনে হয় আমি তোমার প্রতিও আমার সব ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছি। সে কাছে থাকলে আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে পারি না। আমার অন্তরে জ্বলতে থাকে শুধু তখন অহেতুক এক বিতৃষ্ণার আগুন। সে আগুনের ছোঁয়া থেকে তুমিও বাদ যাও না।

ফাউস্ট : আসলে ওটা তোমার মনের স্বাভাবিক বিরাগ।

মার্গারেট : কিন্তু আমি ওটাকে দূর করতে পারি না।

ফাউস্ট : আচ্ছা আমরা কি কোথাও পরস্পরের খুব কাছাকাছি কিছু নিবিড় নির্জন মুহূর্ত কাটাতে পারি না। যে নৈকট্যের নিবিড়তায় দুজনের দেহ মন এক হয়ে মিশে যায় সে নৈকট্য লাভ করতে পারি না?

মার্গারেট হায়, যদি আমার পৃথক শোয়ার ঘর থাকত! আমি তাহলে

তোমাকে নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দিতে পারতাম! কিন্তু আমাকে মার কাছে শুতে হয় এবং মার ঘুম এমনই সজাগ যে আমরা সেখানে যাওয়া মাত্র তিনি জানতে পারবেন আর সেটা হবে আমার পক্ষে মৃত্যুর সমতুল।

ফাউস্ট: ভয় করো না প্রিয়তমা। এই শিশিটায় ওষুধ আছে। এর তিন ফোঁটা কোন পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁকে যদি খাইয়ে দিতে পার তাহলে এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বেন তিনি যে কোন চেতনাই তাঁর তখন থাকবে না। কিছুই টের পাবেন না।

মার্গারেট: তোমার আনন্দ বিধানের জন্য এমন কি কাজ আছে যা আমি পারব না? এ ওষুধ প্রয়োগ করলে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না ত?

ফাউস্ট: ক্ষতি হলে আমি তোমাকে এটা প্রয়োগ করতে বলতাম না।

মার্গারেট: হে প্রিয়তম, তোমার মুখপানে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে জানি না কেন আমি সব কিছু ভুলে যাই। তোমার ইচ্ছাপূরণই তখন আমার একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। তোমার জন্য আমি আগেই অনেক কিছু করেছি। সুতরাং করার আর অল্পই বাকি আছে। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিসের প্রবেশ

মেফিস্টোফেলিস: ওহে বাঁদর মশাই! মেয়েটা চলে গেছে?

ফাউস্ট: আবার গুপ্তচরগিরি করছ?

মেফিস্টোফেলিস: আমি শুনতে পেয়েছি কিভাবে মেয়েটা তোমাকে তার কাছে টেনে নেয় আপন করে। এটা এখন পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ডাক্তার ফাউস্ট এখন তার কবলে। আমার আশা, এতে তোমার অনেক মঙ্গল হবে। প্রাচীনদের মতে মেয়েরা চায় তাদের প্রণয়ীরা একই সঙ্গে যৌবনসৌন্দর্য ও সততায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। কারণ একমাত্র সৎ যুবকরাই তাদের অকুণ্ঠভাবে অনুসরণ করে।

ফাউস্ট: তুমি একটা পশু। তুমি জানতে চাও না এত ভাল মেয়েটা যার অন্তঃকরণ এত পবিত্র সে কেন খারাপ হলো (যদি কিছু খারাপ থাকে তার মধ্যে)। তার বিশ্বাস প্রেমের মধ্যেই সে খুঁজে পাবে তাঁর মুক্তি। তার একমাত্র ভয় যাকে সে ভালবাসে সেই ভালবাসার মানুষ বুঝিবা তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

মেফিস্টোফেলিস: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত কামনাবাসনায় পূর্ণ তুমি। তুমি বুঝতে পারছ না একটা সামান্যা নারী তোমায় নাকে ধরে ঘোরাচ্ছে।

ফাউস্ট : এইসব কুচিন্তা মন থেকে দূর করে দাও।

মেফিস্টোফেলিস : মানুষের চেহারা দেখে মনের ভাব সে চমৎকার বুঝতে পারে। আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে সে সচকিত হয়ে ওঠে। কেন জানি না, আমার মুখোসের আড়ালে মনের যে ভাব লুকিয়ে থাকে তা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, আমি একটা আস্ত শয়তান হলেও আমি একটা বিরাট প্রতিভা। ঠিক আছে, আজই রাত্রিতে—

ফাউস্ট : কি আজ রাত্রিতে ?

মেফিস্টোফেলিস : আজ রাত্রিতে আমিও কিছু আনন্দ উপভোগ করব।

সপ্তদশ দৃশ্য

ঝর্ণায়

কলসীসহ মার্গারেট ও লিসবেথ

লিসবেথ : বারবারার কথা কিছু শুনেছ ?

মার্গারেট : না, কোন কথাই শুনিনি।

লিসবেথ : সত্যিই তাই। আজই সিবিল্লা বলেছে বারবারা যে ঠকেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অহঙ্কার ও দম্ভের প্রতিফল সে পেয়েছে।

মার্গারেট : কিভাবে ?

লিসবেথ : তার বমি বমি ভাব আসে। পানাহারের সময় সে বেশ বুঝতে পারে তার পেটে সন্তান এসেছে।

মার্গারেট : আঃ !

লিসবেথ : অবশেষে সে যোগ্য প্রতিফল লাভ করেছে। মেয়েটা ছোকরাটাকে দীর্ঘদিন নিবিড়ভাবে ধরে রেখেছিল ! সে কি গলায় গলায় ভাব ! গাঁয়ের সর্বত্র তাদের দুজনকে দেখা যেত, দেখা যেত নাচগানের আসরে। ছেলেটা মেয়েটাকে দেখত মদের মতই ভোগের এক উপকরণরূপে আর মেয়েটা চাইত তার বেশভূষার পারিপাট্য আর রূপের প্রসাধনে ছেলেটার মন ভোলাতে। মেয়েটা এত নীচ আর নির্লজ্জ যে সে ছেলেটার কাছ থেকে যে কোন উপহার গ্রহণ করতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করত না। এইভাবে কত সব মদির চুম্বন, আলিঙ্গনের পালা শেষ হতেই প্রেমের কুসুম শুকিয়ে গেল।

মার্গারেট : আহা বেচারী !

লিসবেথ : তার প্রতি দয়া দেখাচ্ছ ? যখন আমরা রাত্রিতে মার কাছে বসে সেলাইএর কাজ করতাম কষ্ট করে, মা আমাদের একবারও বাইরে কোথাও যেতে দিত না। মেয়েটা তখন তার প্রেমিকের সঙ্গে অন্ধকার গলির মধ্যে ভাব জমাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গল্প করত। সময়ের কোন জ্ঞান থাকত না। এখন বাছাধন আর মুখ তুলতে পারবে না, গীর্জার এককোণে বসে শুধু অনুতাপের আগুনে জ্বলবে।

মার্গারেট : ছেলেটা নিশ্চয় তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবে।

লিসবেথ : তাহলে বোকার মত কাজ করল ছেলেটা। তরুণ যুবকের চঞ্চল মন। আবার অন্য কোথায় চলে যাবে। তাছাড়া সে এর মধ্যেই চলে গেছে।

মার্গারেট : এটা কিন্তু খুব খারাপ।

লিসবেথ : মেয়েটা যদি ছেলেটাকে বিয়েও করে তাহলে তাকে সাবধান করে দিও। পাড়ার ছেলেরা ও আমরা তা বরদাস্ত করব না। তারা তার গলার মালা ছিঁড়ে দেবে আর আমরা তার ঘরের দরজার সামনে আবর্জনা ফেলে দেব।

মার্গারেট : একটি মেয়ে যখন প্রতারিত হয় একটি ছেলের দ্বারা তখন আমি ঘৃণাভরে কত তার নিন্দা করেছিলাম। তীক্ষ্ণ ভাষায় অপরের দোষের সমালোচনা করেছিলাম। তাদের দোষটা যত না কালো ছিল তার থেকে বেশী কালো মনে হয়েছিল আমার কাছে এবং নিজেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য মনে করেছিলাম। অথচ আসলে জীবন্ত পাপের এক মূর্ত প্রতীক আমি। তবু আমার অন্তর থেকে যেকথা তখন বেরিয়েছিল তা সব সত্য।

অষ্টাদশ দৃশ্য

ডন জন

(একটি দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি বেদীর উপর কুমারী ডলোরোসার প্রতিমূর্তি। মূর্তির সামনে একটি ফুলদানি)

মার্গারেট : (ফুলদানিতে টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখতে রাখতে) আমার কথা শোন হে কুমারী মাতা। দুঃখে ভারাক্রান্ত তোমার হৃদয়। তোমার মুখের উপর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বেদনার ছাপ। অন্তর্বেদনার যে তীক্ষ্ণ তরবারি তোমার বুকের মাঝে লুকোন আছে তাই নিয়ে তুমি তাকিয়ে আছ সেই স্থানের উপর যেখানে তোমার পুত্র নিহত হয়। তুমি মাঝে মাঝে পরম পিতার পানেও তাকাচ্ছ। ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তোমার দীর্ঘশ্বাস। পরম পিতার দুঃখের সঙ্গে তোমার দুঃখকে মিশিয়ে তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরছ তুমি।

হায়, যে গভীর গোপন অন্তর্বেদনায় আমার সারা দেহমন মুচড়ে উঠছে আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এই উদ্বিগ্ন অন্তরে কিসের এত জ্বালা, সংশয়ের কেন এত কম্পন, কামনার কেন এই ব্যাকুলতা তা একমাত্র তুমিই জান। একমাত্র তুমিই জান যেখানেই আমি যাই কিসের দুঃখ, সে কোন বেদনায় পীড়িত হতে থাকে আমার অন্তর। ঘরে আমি যখন একা থাকি তখন সর্বক্ষণ বিনিদ্র অবস্থায় আমি শুধু কাঁদতে থাকি। অবিরলভাবে চোখের জল ফেলে যাই। আর সহ্য করতে পারছি না। অন্তর ভেঙ্গে পড়ছে আমার। প্রথম সকালের শিশিরভেজা ফুলের মত জানালার ধারের পাত্রগুলো আমার চোখের জলে ভিজে যায়। আমার অন্তরের নিভৃতে সকালের সূর্য লাল আলো ফেলে। তবু আমি বুকের ভিতর একরাশ বিষাদ নিয়ে বিছানার উপর বসেছিলাম।

হে কুমারী দেবী, মৃত্যু ও যন্ত্রণার এই দুর্বিসহ পীড়ন থেকে উদ্ধার করো আমায়। হে বিষাদময়ী, তোমার উদার মুখের মমতা নিয়ে আমার অবস্থার উপর নজর দাও।

উনবিংশ দৃশ্য

রাত্রি

(মার্গারেটের ঘরের সম্মুখস্থ রাজপথ)

ভ্যালেণ্টাইন

মার্গারেটের ভাই ও একজন সৈনিক

মাঃ ভাইঃ আমি বসে বসে এতক্ষণ কতকগুলো লোকের দম্ভোক্তি ও গর্বোক্তি শুনছিলাম। প্রত্যেকেই তাদের আপন আপন সুন্দরী প্রেমিকাদের প্রশংসা করছিল আমার কাছে। তারা তখন সকলেই টোষ্ট আর মদ খাচ্ছিল। আমি এককোণে শান্তভাবে বসে বসে তাদের গর্বোক্তি শুনছিলাম। আমি তখন আমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললাম, সকলেই ত প্রেমের ব্যাপারে বাহাদুর। কিন্তু সারা দেশের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে মার্গারেটের মত খাঁটি মেয়ের সামনে বাতি তুলে ধরতে পারে? তখন সকলেই আমার কথায় সচকিত হয়ে উঠল। কেউ কেউ বলল, 'ও ঠিকই বলছে।' আবার কেউ বলল, মার্গারেট সত্যি সত্যিই এক নারীরত্ন। নারীত্বের নিষ্পাপ কুসুম আজও ফুটে আছে তার মধ্যে। আমার সেই কথায় তাদের সব গর্বোক্তি স্তব্ধ হয়ে যায় একেবারে। কিন্তু আজ? আজ ক্রোধে ও বিরক্তিতে আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে এবং মাথাটাকে ফাটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আজ যে কোন একটা বাজে ছোকরা আমার মুখের উপর তার নাক নেড়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দ্বারা বিদ্ধ করতে পারে আমায়।

আমাকে অপমান করতে পারে। আমি তখন কোন দেউলিয়া ভাগ্য-বিড়ম্বিত অধোমর্ণের মত বসে বসে শুধু ঘামতে থাকি লজ্জায়। আমিও অবশ্য তাদের মুখের উপর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারি। কিন্তু তাদের মিথ্যাবাদী বলতে পারি না। কিন্তু কারা আসছে এই দিকে? আমার যদি দেখতে ভুল না হয় তাহলে ওরা দুজন আছে। যদি একা হয় তাহলে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তাকে তাহলে আর একা জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে হবে না।

ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস

ফাউস্টঃ দেখ দেখ, কেমনভাবে তার পবিত্র কক্ষের গবাক্ষপথ হতে এক স্বর্গীয় দ্যুতি বেরিয়ে আসছে। কিন্তু একমাত্র সামনে ছাড়া কোন পাশ থেকে সে আলো দেখা যাচ্ছে না। আর সে আলো দেখতে না পেলেই চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আর তার ফলে আমার অন্তরের মাঝেও

অন্ধকার জমছে।

মেফিস্টোফেলিস: আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কোন ভাবপ্রবণ বিড়ালের মত আগুনের লম্বা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছি। চুপিসারে চঞ্চল গতিতে চোরের মত উপরে উঠে যাচ্ছি। তথাপি আমার মধ্যে আছে টনটনে ধর্মজ্ঞান। আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আমি অনুভব করছি যেন আগামী পরশু তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অপেরার সুর বাজছে।

ফাউস্ট: আমার প্রিয়তমারূপ রত্ন এখনো কি ওঠেনি? আমার মনে হচ্ছে আমি ওই জানালার ধারে তাকে দেখতে পাচ্ছি।

মেফিস্টোফেলিস: কেটলির ঢাকনা খুললেই যেমন গরম চা পাওয়া যায় তেমনি একটু পরেই তুমি আনন্দ উপভোগ করবে। একটু আগে আমি আড়-চোখে দেখেছিলাম সে ঘরের মধ্যেই আছে এবং তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

ফাউস্ট: আমার প্রিয়তমাকে সাজাবার মত কোন গয়না ত দূরের কথা, একটা আংটি পর্যন্ত নেই।

মেফিস্টোফেলিস: আর পাঁচটা জিনিসের মধ্যে আমি একছড়া মুক্তোর হার রেখেছিলাম।

ফাউস্ট: তাহলে খুবই ভাল হয়। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যদি কোন উপহার দিতে না পারি তাহলে সেটা বড় দুঃখের।

মেফিস্টোফেলিস: বিনা উপহারে তাকে উপভোগ করার ব্যাপারটাতে এত অস্বস্তিবোধ করো না। এই শান্ত সুন্দর রাত্রিতে আকাশে যখন নক্ষত্ররা কিরণ দান করছে আমি তখন এক চমৎকার গান গাইব। এ গানের মধ্য দিয়ে প্রথমে তাকে কিছু নীতিশিক্ষা দান করব। পরে তাকে প্রতারিত করব।

গান

তোমার প্রেমিকের দরজার সামনে
এই আলোকোজ্জ্বল সোনালি সকালে
কি করছ প্রিয়তমা ক্যাথারিন?
কিন্তু সাবধান! ঐ ঘরের মধ্যে একটি
মেয়ে ঢুকেছে এবং সে এখনো বেরোয়নি।
এমন লোকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে
দেবে জোর করে। একবার ছাড়াছাড়ি হয়ে
গেলেই সব ফুরিয়ে যাবে চিরদিনের মত।

মনে রেখো, প্রেমের জীবনকাল বড়ই স্বল্প বড়ই সীমিত।
সুতরাং হাতে বিয়ের আংটি না নিয়ে কোন
ভণ্ড প্রতারকের কাছে বিকিয়ে দিও না নিজেকে।

ভ্যালেন্টাইন: (এগিয়ে এসে) ইঁদুর ধরার বাঁশি বাজিয়ে কার মন ভোলাতে চাও। প্রথমে বাজনাটা, তারপর ঐ গায়কটাকে শয়তানের কাছে পাঠিয়ে দেব।

মেফিস্টোফেলিস: আমরা দুজনেই গেলাম।

ভ্যালেন্টাইন: আর একটা মাথা আমায় ভাঙতে হবে।

মেফিস্টোফেলিস: (ফাউস্টের প্রতি) হে ডাক্তারমশাই, পালিয়ে যেও না, আমার অনুরোধ। তুমি শুধু যদি একটু সরে দাঁড়াও, আমি তাহলে এ লড়াইএ জিতে যাব। তুমি এখনি চলে যাও বলছি। আমি এখনি ঘুঁষি আর তরবারি চালাব।

ভ্যালেন্টাইন: ঠিক আছে, চালাও।

মেফিস্টোফেলিস: কেন চালাব না? এখন আলো ফুটে উঠেছে।

ভ্যালেন্টাইন: সত্যি নাকি!

মেফিস্টোফেলিস: অবশ্যই তাই।

ভ্যালেন্টাইন: শয়তান দুটো তাহলে লড়বে। কিন্তু আমার হাত যে খোঁড়া। আমি কি করব?

মেফিস্টোফেলিস: (ফাউস্টকে) তরবারিটা একেবারে আমূল বসিয়ে দাও।

ভ্যালেন্টাইন (পড়ে গেল) হা ভগবান!

মেফিস্টোফেলিস: এবার দুষ্ট বদমাসটা জব্দ হয়েছে। কিন্তু পালিয়ে চল তাড়াতাড়ি। এখানে আর থাকা চলবে না আমাদের। খুন খুন বলে চিৎকার করছে লোকে। পুলিসকে তবু পার পাওয়া যায়, কিন্তু ফৌজদারি আদালতে এর বিচার হবে। (প্রস্থান)

মার্থা: (জানালায়) শীগগির এস। শীগগির এস।

মার্গারেট: (জানালায়) তাড়াতাড়ি একটা আলো নিয়ে এস।

মার্থা: (উপর থেকে) ওরা আমাদের আক্রমণ করার ও লড়াই করার হুমকি দিচ্ছে।

জনতা: এখানে একটা লোক মরে রয়েছে। দেখ দেখ।

মার্থা : (উপর থেকে নেমে এসে) খুনীরা কোন দিকে পালাল ?

মার্গারেট : (বেরিয়ে এসে) কে ওখানে পড়ে রয়েছে ?

জনতা : তোমার মার পুত্র।

মার্গারেট : হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ! কী দুঃখের কথা।

ভ্যালেণ্টাইন : আমি মরতে চলেছি। তবে একেবারে এখনো মরে যাইনি। কথাটা বড তাড়াতাডি বলা হয়ে গেছে। কই মেয়েরা, চেঁচাচ্ছ কেন ? তার চেয়ে এদিকে এস। এখানে এস। আমার কথা শোন। (সকলে এসে জড়ো হলো) হে আমার প্রিয় বোন মার্গারেট, তুমি এখনো বয়সে তরুণী আছ। তোমার এখনও বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হয়নি। তুমি বড় হালকা। তাই আমি একটা উপদেশ তোমায় দিতে চাই। মনে রাখবে। এখন তুমি যখন একটা বারবনিতায় পরিণত হয়েছ তখন প্রকাশ্যেই তোমার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

মার্গারেট : ভাই হয়ে এমন কথা বলতে তুমি পারলে ? হা ভগবান !

ভ্যালেণ্টাইন : এই সব প্রমোদক্রীড়ায় বলা যায় না একদিন ঈশ্বরও হয়ত জড়িয়ে পড়তে পারে। যা একবার হয়ে গেছে তা আর ফিরবে না। এর পরে কি ঘটবে তাই ভেবে দেখতে হবে। প্রথমে একজনকে নিয়ে এ খেলা শুরু করলে। তারপর আর একজন এসে জুটবে। এইভাবে যখন ডজন খানেক লোক আনাগোনা করবে তখন শহরে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে সব জায়গায়। এ ব্যাপারে যখন প্রথম লজ্জা জন্মায় মনে তখন এ ধরনের মেয়েরা তাদের সব কাজ গোপন রাখার চেষ্টা করে এবং ধীরে ধীরে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। পরে লজ্জার কালো অবগুণ্ঠনটা মাথার উপর তা তুলে দেয়। তখন সকলেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে। আর তারাও তখন মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে করতে প্রকাশ্যে দিনের আলোতেও পাপকাজ চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যত তারা নির্লজ্জ হয়ে পড়ে ততই তাদের কুৎসিত দেখায়। আমি বেশ বুঝতে পারছি এমন সময় আসতে তোমার দেরি নেই যখন সকলেই তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। একমাত্র মৃত্যু ছাড়া তখন তুমি কোথাও কোন নিরাপদ আশ্রয় পাবে না। যে গলিত মৃতদেহ সংক্রামক রোগ ছড়ায় তার থেকে মানুষ যেমন দূরে থাকতে চায় তেমনি তোমাকেও এড়িয়ে যাবে সবাই। তোমার নিজের পাপ-আত্মা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তোমার কাছে। তোমার মুখপানে কেউ তাকিয়ে সোনার হার উপহার দেবে না। পূজার বেদীতে, নাচগানের আসরে, সব জায়গায় তোমাকে পরিহার

করে চলবে সবাই। তোমাকে তখন এককোণে নির্জনে বসে শুধু বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে থাকতে হবে। ভিখারী আর পঙ্গুদের মাঝখানে লুকিয়ে থাকতে হবে তোমায়। ঈশ্বর না করুন, পৃথিবীতে যতদিন বাঁচবে, এক অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হবে তোমাকে।

মার্থা : ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাও। পরনিন্দার দ্বারা নিজেকে অহেতুক ভারাক্রান্ত করে তুলছ তুমি।

ভ্যালেণ্টাইন : চুপ কর, ঘৃণ্য পাজী বুড়ী কোথাকার। আমি যদি তোর এই শুকনো রোগা দেহটাকে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমার সব পাপ ঈশ্বর ক্ষমা করে দিতেন।

মার্গারেট : চুপ করো ভাই। এসব কথা নারকীয়।

ভ্যালেণ্টাইন : চোখের জল ফেলো না আর। আমার কথা শোন। তুমি যখন জীবনে সম্মান হারিয়ে ফেল তখন আমি অন্তরে বড় আঘাত পাই। এখন আমি অন্তহীন নিদ্রার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি বীর সৈনিকের মত।

বিংশতি দৃশ্য

শেষকৃত্য, শোকসঙ্গীত

অন্যান্যদের মাঝে মার্গারেট। মার্গারেটের পিছনে অশুভ আত্মা

অশুভ আত্মা : এটা কেমন হলো মার্গারেট ? তুমি যখন নির্দোষ নিষ্পাপ তখন কেন তুমি এই বেদীমূলে এসে ঐ পুরনো বই খুলে প্রার্থনার বাণী পাঠ করলে ? এই বাণীপাঠের মধ্যে কিছুটা ছিল তোমার শিশুসুলভ ক্রীড়ার ভাব আর কিছু ছিল ঈশ্বরভক্তি। মার্গারেট, কি ভাবছ ? তোমার বুকের মধ্যে কোন গোপন পাপকে লুকিয়ে রেখেছ ? তুমি কি তোমার যে মা দীর্ঘদিন পরলোকগমন করেছেন তাঁর আত্মার নামে প্রার্থনা করছ ? তোমাদের ঘরের সামনে কার রক্ত দেখা যাচ্ছে ? কে নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং তোমার অন্তরটাই বা কাঁপছে কেন ? তোমার এই অশান্ত জীবনের ভবিষ্যৎ খুবই শঙ্কাকীর্ণ।

মার্গারেট : হায়, হায় ! যে সব চিন্তাগুলো বারবার আমার মনের চার-

দিকে ভীড় করে আসছে সেই সব চিন্তা থেকে আমি যদি মুক্তি পেতাম !

অশুভ প্রেতাত্মা : ক্রোধে তোমাকে আচ্ছন্ন করে বসেছে। জয়ঢাক বাজছে। কবরের মাটি কাঁপছে। হিমশীতল প্রাণহীন ভস্মস্তূপ থেকে জেগে উঠে তোমার জীবন জলন্ত আগুনে জ্বলছে।

মার্গারেট : আমি যদি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম কোথাও। আমার মনে হচ্ছে অন্তিম সঙ্গীতের এই বাদ্যধ্বনি আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ করে দিচ্ছে। আমার অন্তর বিগলিত হয়ে যাচ্ছে।

কোরাস

(গীত ও বাদ্য)

মার্গারেট : আমি আর নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে চারদিকের বিরাট বড় বড় স্তম্ভগুলোর মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি আমি। মনে হচ্ছে গোটা ছাদটা ভেঙ্গে পড়ছে আমার উপর। বাতাস কই ?

অশুভ আত্মা : নিজেকে কোথাও লুকিয়ে রাখ। মনে রাখবে পাপ ও লজ্জার কাজ কখনো গোপন থাকে না। আলো বাতাস চাও ? জাহান্নামে যাও তুমি।

কোরাস

গান

অশুভ আত্মা : তারা ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তোমার উপর থেকে। যারা পূতঃ চরিত্র নিষ্পাপ তারা তোমার হাতে হাত রাখতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিচ্ছে ঘৃণায়।

মার্গারেট : হে আমার প্রতিবেশী ! তোমার আন্তরিক সহানুভূতি আমি চাই। (মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

একবিংশতি দৃশ্য

হার্তস পর্বত

(স্কার্ক ও এলেন্দ অঞ্চল)

ওয়ালপার্গিস রাত্রি

ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস

মেফিস্টোফেলিস: তুমি কি কোন তেজী ঘোড়ার সাহায্য নিতে চাও না? আমি ত একটা বলিষ্ঠ পাঁটার দেখা পেলেও বেঁচে যাই। আমরা যে পথে চলেছি তাতে লক্ষ্য এখনো অনেক দূর।

ফাউস্ট: আমি ত আমার দু পায়ে বেশ সজীবতা অনুভব করছি। চারদিকের এই অরণ্যসমাচ্ছন্ন জটিল পর্বতমালা আমার ত ভালই লাগছে। পথের দূরত্বকে স্বল্প করার চেষ্টা করছ কেন? প্রথমে এই সব উপত্যকার গোলকধাঁধায় কিছু ঘুরে বেড়ানো, তারপর ঐ সব অদূরবর্তী পর্বতপ্রাচীরের উপর আরোহণ করা। সেখানে দেখবে কত ঝর্ণা হতে অন্তহীন জলধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছে অনন্তকাল হতে। সে দেখার আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে আপনা থেকে শ্লথ হয়ে আসবে আমার পায়ের গতি। ফুল্লকুসুমিত ও সুবাসিত বার্চ ও ফার গাছের বনে এখন বসন্ত এসেছে। তাদের বুকে বুকে এখন উল্লাসের দোলা। এই দোলা থেকে এই বসন্তের ছোঁয়া থেকে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বঞ্চিত রয়ে যাবে বলতে চাও?

মেফিস্টোফেলিস: আমি স্বীকার করছি, আমি কিন্তু ও সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এখনো বিরাজ করছে শীতের জড়তা। আমার পথের উপর আমি শুধু আশা করি বরফ আর তুষারের দুঃসহ শীতলতা। অসম্পূর্ণ চাঁদের নির্জন থালাটা কেমন ধীরে ধীরে আকাশে উঠছে দেখ। তার আলোর মধ্যে কোন উজ্জ্বলতা নেই। সে আলোয় পথ চলতে গেলে পায়ে পায়ে পাথরে হোঁচট লাগবেই। এখন আমাদের পথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি অদূরে কে আগুন জ্বালাচ্ছে। কে আছ বন্ধু, আমরা তোমার কাছে যাচ্ছি। কেন বৃথা আলোটার অপচয় করছ?

তার চেয়ে আমাদের ঐ খাড়াই পথটা ওঠার সময় একটু আলো দেখাও।

জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি: আশা করি আমার শ্রদ্ধা আমার চঞ্চল মেজাজটাকে শান্ত রাখবে। পথটা খাড়াই আর আঁকাবাঁকা বলে আমি আলো জ্বালাচ্ছি।

মেফিস্টোফেলিস: দেখছি সে গোটা মানবজাতিটাকেই তার আদর্শে দীক্ষিত করে তুলতে চায়। এখন শয়তানের নামে সোজা চলে যাও। তা না হলে তোমার সব আগুন ও আলো লাথি মেরে ফেলে দেব।

অপরিচিত ব্যক্তি: আমি দেখছি কোন বাড়ির কর্তার মতই আপনার মেজাজ। আমি আমার সাধ্যমত আপনার সেবা করে যাব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আজ পাহাড়ের অবস্থা ভাল নয়। এতে আমার মত এক অজানা লোক পথ দেখালে আপনারা পথ চিনে যেতে পারবেন না।

(ফাউস্ট মেফিস্টোফেলিস ও অপরিচিত ব্যক্তি তিনজনে মিলে গান গাইতে লাগল)

আমার মনে হচ্ছে যেন আমরা এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে এসে পড়েছি। আমাদের কথা শোন। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও যাতে আমরা এই জনহীন স্থানে ঠিকমত পথ চিনে এগিয়ে যেতে পারি।

ঐ দেখ গাছগুলো কত তাড়াতাড়ি এক জায়গা হতে আর এক জায়গায় লাফিয়ে যাওয়া আসা করছে। খাড়াই পাহাড়গুলো মাথা নত করছে আমাদের সামনে। আমরা কি কোন গোলমাল শুনছি? না'কি কোন গান? পাথরের উপর দেখছি ঘাস গজিয়েছে। প্রবহমান জলস্রোতগুলো কোন গুহার মাঝে আশ্রয় খুঁজছে। আমরা কি কোন গোলমাল শুনছি, নাকি কোন গান অথবা কোন প্রেমের আবেদন? অনন্ত আশা ও অমরত্ব সম্বলিত কোন স্বর্গীয় দেবদূতের কণ্ঠস্বর শুনছি কি আমরা? পুরাতন প্রথার মত তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে চারদিকে। 'হু হু' করে পেঁচা ডাকছে। ওরা কি এখনো জেগে আছে? সালামান্দার কি পেটমোটা লোকটাকে ঝোপের মাঝে ফেলে দিল? বড় বড় সাপগুলো কিলবিল করতে করতে আমাদের জড়িয়ে ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। আমাদের গা শিউরে উঠছে। শ্যাওলাধরা পাথর ও ঝোপের উপর দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ইঁদুর ছুটে বেড়াচ্ছে। যে জোনাকিরা জলতে জলতে উড়ে বেড়ায় তারা বিষণ্ণ হয়ে ঝাঁক বেঁধে বসে রয়েছে।

আমাকে বলে দাও, আমরা কি দাঁড়িয়ে রয়েছি না উপরে উঠছি। আমার মনে হচ্ছে সব কিছু ঘুরছে, সব কিছু ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। গাছ পাথর পাহাড় সব। দূরের ইতস্তত সঞ্চরমান আলোকবিন্দুগুলো ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে

মেফিস্টোফেলিস: আমার জামার দিকটা সাহসের সঙ্গে ধর। এখানে

মাঝামাঝি ধরনের একটা পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। এখান থেকে আশ্চর্য রকমের এক আগুন দেখা যাচ্ছে। এই আগুনের মধ্যে এক আশ্চর্য সম্পদ পাবে।

ফাউস্ট: ঐ শৃঙ্গটার ভিতর থেকে প্রত্যূষের উজ্জ্বল আলোর মত এক আলোকশিখা বেরিয়ে আসছে। যেন মনে হচ্ছে এক গভীর শূন্যতায় কোথায় এক অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আর তার থেকে কখনো এক ঝলক অগ্নিশিখা কখনো বা একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো বা ঝর্ণাধারার মত জ্বলন্ত আগুনের একটা স্রোত সমস্ত উপত্যকাভূমিকে প্লাবিত করছে আর তার থেকে অসংখ্য অগ্নিস্ফূলিঙ্গ সোনালি বালুকণার মত ছড়িয়ে পড়ছে চার-দিকে। মোট কথা সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আগুনের শিখায় সমস্ত পার্বত্যপ্রদেশ আলোকিত হয়ে উঠছে।

মেফিস্টোফেলিস: পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা ম্যাথন আজ রাতে এক ভোজ-সভা আহ্বান করেছেন। তুমি ভাগ্যবান যে এ দৃশ্য দেখতে পেয়েছ। নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসছে একে একে।

ফাউস্ট: কী প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছে দেখ। আমার ঘাড়ের উপর যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে ঝড়টা।

মেফিস্টোফেলিস: পিছনের দিকে পাহাড়ের পুরনো পাথরগুলোকে শক্ত করে ধর, তা না হলে পাশের শূন্য খাদের মধ্যে পড়ে যাবে। চারদিকে কালো কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রাত্রি। ঝড়ের আঘাতে ঘর্ষণক্লিষ্ট গাছগুলোর আর্ত মর্মরধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ভয় পেয়ে পেঁচার ছানাগুলো চার-দিকে ছুটে পালাচ্ছে। সমস্ত বনভূমি কাঁপছে, পাথরের স্তম্ভগুলো যেন ভেঙ্গে পড়ছে। প্রতিটি গাছের কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখাগুলি মুচড়ে একে অন্যের উপর পড়ে যাচ্ছে। তাদের শিকড়গুলো পর্যন্ত উপরে যাচ্ছে। পাহাড়ের প্রতিটি কন্দরে ও গুহায় ঝড় প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাচ্ছে গর্জন করতে করতে। এর মাঝে কাদের গান শুনতে পাচ্ছ? দূরে অথবা নিকটে কারা যেন গান গাইছে সমবেত কণ্ঠে। পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই গানের সুর।

ডাইনিরা: (সমবেত কণ্ঠে) ডাইনিরা এখন ব্রোকেন পাহাড়ের উপর উঠেছে। ফসলের মাথাগুলো সবুজ। কিন্তু তাদের গোড়াগুলো হলুদ। ফসল ওঠার উৎসবে সমবেত হয়েছে উল্লসিত জনতা। সকলের উপরে বসে আছে ইউরিয়ান। সে হচ্ছে এক ডাইনি।

একটি কণ্ঠস্বর

বুড়ী ববো একা আসছে। সে আসছে লাঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত মই-এর উপর চেপে।

কোরাস: তাহলে যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দাও। তাহলে বুড়ী ববোই এখন ডাইনিদের পরিচালিত করে নিয়ে যাবে। ডাইনিরা এবার তারই অনুসরণ করবে।

কণ্ঠস্বর: এখান থেকে তাহলে কোন পথে যাবে?

অন্য কণ্ঠস্বর: ইনসেন পাহাড়ের উপর দিয়ে। আমি একটা পেঁচার বাসায় উঁকি মেরে দেখেছিলায় সে কেমন আমার পানে কটমট করে তাকাচ্ছিল।

প্রথম কণ্ঠস্বর: নরকে যাও তুমি। এত তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছ কেন? তার ফলে পড়ে যাচ্ছ।

ডাইনিরা: (সমবেত কণ্ঠে) এ পথ একই সঙ্গে দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। জনতা উন্মত্ত। ঝাঁটাগুলো সব তারা ফেলে দিচ্ছে। শিশুগুলো চুপ করে আছে। কিন্তু মারা বিরক্তিতে ফেটে পড়ছে।

পুরুষ ডাইনিরা: খোলার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে যেমন করে শামুক চলে আমরাও তেমনি শামুকের মত এগিয়ে চলেছি। আমাদের সামনে যাচ্ছে মেয়েরা। তবে যখন কোন শয়তানের বাড়ির সামনে আমরা এসে পড়ি তখন মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি অতি দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়।

অন্যদল: আমরা কিন্তু এভাবে বিচার করি না। মেয়েরা পুরুষদের থেকে হাজার পা এগিয়ে থাকলেও পুরুষরা এক লাফে তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারে।

কণ্ঠস্বর: (উপর থেকে) ঐ পাহাড়ঘেরা হ্রদ থেকে চলে এস।

কণ্ঠস্বর: (নিচের থেকে) আমরা উপরে উঠে যেতে চাই। আমরা নিরন্তর জলধারার দ্বারা বিধৌত এবং শুচিস্নাত। তথাপি আমরা চিরকালের জন্য সৃষ্টিকার্যে অক্ষম।

উভয় কোরাস: এখন ঝড় থেমে গেছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে। তবে চাঁদ নাই আকাশে। অন্ধকারের ভিতর কার এক ঐন্দ্রজালিক গানের সুর ঝড়ে পড়ছে মৃদু বৃষ্টিধারার মত।

কণ্ঠস্বর: (নিচের থেকে) কে যাচ্ছ ওখানে, থাম।

কণ্ঠস্বর : (উপর থেকে) নিচের থেকে কে ডাকছে ?

কণ্ঠস্বর : (নিচের থেকে) আমাকেও নিয়ে যাও। আমাকেও সঙ্গে নাও। আমি তিনশ বছর ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করছি। কিন্তু আজও দেখা পাইনি শিখরদেশের। আমিও ঐ উৎক্রমণরত জনতার সামিল হতে চাই।

উভয় কোরাসদল : যত সব কাজের যন্ত্রপাতি নিয়ে আজ রাত্রির মধ্যে যারা উঠতে পারবে না তাদের আর কোন আশা নেই। তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অর্ধ ডাইনি : (নিচের থেকে) এখন আমি শুধু বারবার পড়ে যাচ্ছি। আমি বড় দুরবস্থার মধ্যে আছি। অথচ অন্যেরা আমাকে ছাড়িয়ে কত দূরে চলে গেছে। বাড়িতে আমার কোন বিরাম বা শান্তি নেই। আর এখানেও সে বিরাম বা শান্তি লাভ করতে পারছি না।

ডাইনিদের কোরাস : ডাইনিদের খুশি করলেই সব পাবে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একটা কম্বল তাদের দান করলে একটা জাহাজ পেয়ে যাবে। অথচ আমাদের সঙ্গে যদি আজ রাতে না আসতে পার তাহলে পরে জাহাজ পেলেও কোন ফল হবে না।

উভয় কোরাসদল : আমরা যখন এই শিখরদেশের চারদিকে উঠে বেড়াচ্ছি তখন তোমরা সোজা নিচে মাটিতে নেমে যাও। নেমে চারদিকে বনের আশে-পাশে ডাইনিদের কাজকর্মের উপাদান খুঁজে বেড়াবে।

মেফিস্টোফেলিস : তারা এক সঙ্গে সমবেতভাবে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে কলরব করতে করতে। তারা কখনো আগুনে পুড়ছে, এবং তাদের গা থেকে গন্ধ বার হচ্ছে। আবার কখনো শুধু আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাদের গা থেকে। প্রকৃত ডাইনি কাকে বলে তা আমরা বুঝতে পারছি তাদের দেখে। কাছে এস। তা না হলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব ওদের দল থেকে। কোথায় তুমি ?

ফাউস্ট : (দূরে) এই যে এখানে।

মেফিস্টোফেলিস : সে কি ! এত দূরে ছিটকে পড়েছ ? আমাকেই পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে দেখছি। হে জনতা, একটু সরো দেখি, একটু পথ করে দাও। আমাকে ধরো ডাক্তার। এক লাফে আমরা জনতার থেকে কিছুটা দূরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ব। অদূরে বিসের একটা স্পষ্ট আলো জ্বলছে ঐ বনের মধ্যে। ওখানে গিয়ে তা দেখতে ইচ্ছা করছে আমার। চলে

এস। ঐ বনটার কাছে চলে যাই।

ফাউস্ট: হে বিরোধ ও বিভেদের আত্মা। এগিয়ে চল। আমি তাকে অনুসরণ করব প্রত্যক্ষভাবে। ঠিকভাবে বিচার করে দেখতে গেলে এ পরিকল্পনা ভালই হয়েছে। আমরা আজ এই ওয়ালপার্গিস নৈশ উৎসবের দিন ব্রোকেন পাহাড়ের শিখরদেশে আরোহণ করব। আর তার জন্য আমরা ইচ্ছা করে তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু দেখ, দেখ, কত বিচিত্র বর্ণের অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে বনের ভিতর।

ফাউস্ট: আমার পক্ষে এখন এই শিখরদেশে উঠে যাওয়াই ভাল। সেখানে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছে। মানুষ বিবাদ ও গোলমালের সময় কোন অশুভ শক্তিরও সন্ধান করে। সেই শক্তির কাছে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়।

মেফিস্টোফেলিস: সেখানে আবার অনেক নূতন সমস্যার জটও পাকিয়ে যায়। জনতা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে চেঁচামেচি করে মরুক। আমরা এই নির্জনে শান্তিতে থাকব। এইভাবে এই বিরাট পৃথিবীর মাঝে মানুষ ছোট ছোট এক একটি শান্ত নির্জন জায়গা বেছে নেয়। আমি দেখছি তরুণ যুবতী ডাইনিরা উলঙ্গ অবস্থায় সমবেত হয়েছে এবং বৃদ্ধারা ঘোমটা মাথায় দিয়ে কাপড়ে গা ঢেকে এসেছে। আমার খাতিরে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। এতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং মজা পাবে। আমি শুনতে পাচ্ছি বাদ্যযন্ত্র বাজছে। এই যন্ত্রধ্বনি অশুভ হলেও তা শুনতে হবে। আমার সঙ্গে এস। আমি আগে গিয়ে তোমাকে পরিচিত করে দেব তাদের সঙ্গে। তুমি এই প্রথম আসছ। জায়গাটা ছোট নয়, কি বল বন্ধু? সামনে তাকিয়ে দেখ, দেখবে তার শেষ দেখতে পাবে না। প্রায় একশোটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে আর তার চারদিকে তারা রান্না করছে, পানাহার করছে এবং উন্মত্তের মত নাচছে। এটা কি কম মজার কথা?

ফাউস্ট: আমাকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে গিয়ে তুমি কি পুরুষ ডাইনি না শয়তানের ভূমিকা গ্রহণ করবে?

মেফিস্টোফেলিস: আমি অবশ্য অজানা পথিক হিসাবে তাদের মাঝে যেতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই ঝড় ও দুর্যোগের রাত্রিতে আজ আমার পরিচয় দিতে হবে। তবে এখানে পা দিয়ে ঘরের মত স্বস্তি পাচ্ছি। অদূরে একটা

শামুক দেখতে পাচ্ছ ? কেমন ধীর গতিতে আসছে ওটা ! তেমনি এখানকার লোকরা ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। আমার আগমন আগেই বুঝতে পেরেছে। এখানে চেষ্টা করেও আমি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারব না। এখন এস, এখন এই আগুন থেকে অন্য একটা আগুনের কুণ্ডের কাছে যাই। আমিই প্রথমে যাব। (পোড়া কাঠের পাশে বসে থাকা কিছু লোককে বলল) হে ভদ্রমহোদয়গণ, কেন তোমরা এক পাশে বসে রয়েছ ? তোমরা যদি ঐ সব যুবকদের মাঝে গিয়ে আনন্দোৎসব করতে পার তাহলে তোমাদের আমি প্রশংসা করব।

সকলে : বল, কে বৃদ্ধদের আর বিশ্বাস করবে। যদিও বৃদ্ধদের পরিকল্পনা-মত অনেক কাজ হয়েছে। সাধারণ জনগণ আর নারীদের কাছে যুবকরাই বেশী খাতির পায়।

মন্ত্রী : তারা এখন ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে দূরে সরে গেছে। আমি বৃদ্ধদের আজও প্রশংসা করি আর তার কারণও যথেষ্ট আছে। আমাদের হাতে যখন শাসন ক্ষমতা ছিল তখন দেশে ছিল স্বর্ণযুগ।

পারভেন্নু : আমরাও তখন ভাল কাজ করেছি। কিন্তু এখন সে সব কিছু হচ্ছে না।

গ্রন্থকার : আজ ভাল বই কে পড়বে ? আজকালকার লোকে ভাল বইকে বলে সেকেলে। আজকের যুবকরা বড় উদ্ধত এবং অমার্জিত।

মেফিস্টোফেলিস : (সহসা বুড়ো হয়ে গেল) আমার মনে হয় শেষ বিচারের দিন এসে গেছে। আমি শেষবারের মত এসেছি এই ডাইনিদের পাহাড়ে। আমার জীবনরূপ মদ্য হয়ে গেছে নিঃশেষিত। এবার পৃথিবীর শেষ।

হাক্সটার ডাইনি : শোন হে ভদ্রলোক, এভাবে আমাকে উপেক্ষা করো না। এ সুযোগ নষ্ট হতে দিও না। আমার জিনিসপত্রগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখ। আমি বেশী কিছু সংগ্রহ করতে না পারলেও আমার কাছে আছে অনেক বিরল বস্তু। আমার মত এই দোকান পৃথিবীতে কোথাও পাবে না তুমি। এই দোকানে যে সব জিনিস আছে তার প্রত্যেকটি পৃথিবীর মানবজাতির কোন না কোন ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে এমন কোন ছুরি নেই যা কোন মানুষের রক্তপাত ঘটায়নি। এমন কোন কাপ নেই যা বিষ প্রয়োগের দ্বারা কারো না কারো মৃত্যু ঘটায়নি। এখানে এমন কোন মণিমুক্তা নেই যা কোন নারীকে বিপদাপন্ন করে তোলেনি। এমন

কোন তরবারি নেই যা পিছন থেকে কোন প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করেনি।

মেফিস্টোফেলিস: থামাও তোমার কথার কচকচি। এখনকার সময়টা ধরতে পারছ না। বুঝতে পারছ না কালের স্বরূপ। যা হয়ে গেছে গেছে। অতীতের কথা ছেড়ে দাও। নূতন কি জিনিস আছে বল। একমাত্র নূতনত্ব দিয়েই আমাদের ভোলানো যায়।

ফাউস্ট: আমি যেন এই সব জিনিস দেখে ভুলে না যাই। এ রকম মেধা জীবনে কখনো দেখিনি আমি।

মেফিস্টোফেলিস: এই ঘূর্ণিটা উপরে উঠতে চাইছে। আর তার সঙ্গে তোমাকেও টেনে নেওয়া হচ্ছে।

ফাউস্ট: কিন্তু কে ও?

মেফিস্টোফেলিস: ওকে বিশেষভাবে দেখ। ওর নাম লিলিথ।

ফাউস্ট: কে সে?

মেফিস্টোফেলিস: ও হচ্ছে আদমের প্রথম স্ত্রী। ওর মাথার সুন্দর কেশপাশ আর তার বিন্যাস ও অলঙ্করণই হলো ওর একমাত্র লোভনীয় সৌন্দর্য-সম্ভার। তাই দিয়েই ও অনেক যুবককে ফাঁদে ফেলে। আবার তাকে শীঘ্রই মুক্তি দেয়।

ফাউস্ট: ঐ যে ওরা দুজন—একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবক—ওরা অনেকক্ষণ নেচেছে।

মেফিস্টোফেলিস: আজ রাতে কারো কোন বিশ্রাম নেই। আজ বুড়ো ছোকরা সর্বক্ষণ শুধু নাচবে। একবার হয়ে গেলে আবার নাচবে।

ফাউস্ট: (এক তরুণী ডাইনির সঙ্গে নাচতে নাচতে) একদিন আমি একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখি। সেই স্বপ্নের মাঝে আমি একটি ফলন্ত আপেল গাছ দেখি। তাতে দুটি সুন্দর পাকা আপেল ছিল। আমি তার আবেদনে মুগ্ধ হয়ে গাছে উঠে পড়ি তৎক্ষণাৎ।

সুন্দরী ডাইনি: যে আপেল তুমি কামনা করেছিলে সে আপেল প্রথমে স্বর্গে জন্মায়। আজ আমি একথা জেনে খুব আনন্দ পেলাম যে এ আপেল আমার বাগানে এখন জন্মাচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস: (এক তরুণী ডাইনির সঙ্গে নাচতে নাচতে) একদিন একটা ভয়ঙ্কর অসুন্দর স্বপ্ন আমি দেখি। তাতে একটা ভাঙা গাছ দেখতে পাই। যাই হোক, আমি স্বপ্নে তাই দেখেছিলাম।

ডাইনি : আমি বুড়ো পাভাঙা নাইটকে আমার সাধ্যমত সেবা ও সম্মান দান করলাম।

কোন এক পুরুষ ডাইনি : তোমার সাহস ত কম নয়। তুমি কি জান না যে বাড়ির মালিক বা আশ্রয়দাতা আর অতিথির মর্যাদা এক নয়। অথচ তুমি তার সঙ্গে নাচছ।

সুন্দরী ডাইনি : ও তাহলে এসেছে কেন আমাদের এই নাচের আসরে ?

ফাউস্ট : (নাচতে নাচতে) সব জায়গায় ওর উপর তোমরা কেন পড়ছ ? অন্যেরা যখন নাচছে ও তখন তাদের নাচ দেখছে। ও আগে থেকে হয়ত ঠিক নাচতে পারে না। কিন্তু যদি তোমরা আগে যাও ও পিছনে যাবে অথবা তোমরা যদি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নাচ তাহলেও ও ভালই নাচবে। অবশ্য তোমরা যদি তার কথা শুনে চল।

পুরুষ ডাইনি : এখনো তুমি এখানে রয়েছ ? এমন কথা কখনো শুনিনি। এখনি চলে যাও। শয়তানরা কোন ভাল কথা শুনতে চায় না। কোন আইন কানুন মানতে চায় না। আমরা সব নির্বুদ্ধিতাকে মন থেকে সরিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করার জন্য কত ঝাঁট দিয়েছি।

সুন্দরী ডাইনি : আমাদের নাচের আসরে এভাবে বিরক্ত করো না আমাদের।

পুরুষ ডাইনি : শোন প্রেতাত্মারা, আমি তোমাদের মুখের সামনে বলে দিচ্ছি, আমি তোমাদের কোন আধিপত্য মানব না। আমার মন তা কখনো মানবে না আর সে আধিপত্য দেখাতেও চায় না।

(নাচ চলতে থাকে)

ফাউস্ট : এই সব আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে আমি কোন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারব না। তবু আমি আশা করি মৃত্যুর আগে আমি কবি আর শয়তানদের করায়ত্ত করব।

মেফিস্টোফেলিস : সে এবার জলের ধারে মাটির ঢিবির উপর বসবে। যখন জোঁকগুলো তার পায়ে ধরে রক্ত চুষতে থাকবে তখনই তার ঘাড় থেকে সব ভূত প্রেত নেমে যাবে। (ফাউস্টের নাচ শেষ হতে) যে সুন্দরী মেয়েটি নাচের সময় ভাল গান গাইছিল তাকে কেন ছাড়লে ?

ফাউস্ট : নাচের সময় সে যখন গান গাইছিল তার মুখ থেকে তখন হঠাৎ একটা ইঁদুর বার হলো। এই কারণেই তাকে ত্যাগ করেছি।

মেফিস্টোফেলিস : ওটা কিছু নয়। এতে রাগ করার কিছু নেই। একটা ইঁদুর থেকে তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। বিশেষ প্রেমের সময় ওসব দিকে কেউ নজর দেয় না। ওসব কথা কেউ ভাবে না।

ফাউস্ট : তারপর আমি দেখলাম—

মেফিস্টোফেলিস : কী দেখলে ?

ফাউস্ট : মেফিস্তে, তুমি কি দেখেছ, একা একা একটি সুন্দরী মেয়ে মলিন ও বিষণ্ণ মুখে দূরে বসেছিল ? মনে হচ্ছিল তার পায়ে যেন বেড়ী লাগানো ছিল। আমার মনে হচ্ছিল সে যেন আমার প্রিয়তমা মার্গারেট।

মেফিস্টোফেলিস : হতে দাও। ও সব মায়ার সৃষ্টি। প্রাণহীন ঐন্দ্রজালিক প্রতিমা। এসব দেখা ভাল কথা নয়। ঐ সব প্রতিমার শূন্য দৃষ্টি মানুষের রক্ত হিমশীতল করে জমাট বাঁধিয়ে দেয়। মানুষ পাথর হয়ে যায়। মেডুসার গল্প তুমি জান।

ফাউস্ট : সত্যি করে বলছি, তার চোখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন মৃত নারীর চোখ, যে চোখ কোন প্রিয়জন হাত দিয়ে বন্ধ করে দেয়নি। মনে হচ্ছিল তার ঐ বুকের উপর আমি কত সময় শুয়ে থেকেছি। তার পাশে কত বিশ্রাম, কত শান্তি লাভ করেছি আমি।

মেফিস্টোফেলিস : সব মায়া। ইন্দ্রজাল। এত অল্পতে গলে যাও তুমি। তাকে দেখে যে কোন লোক তার প্রিয়তমা ভাববে।

ফাউস্ট : তার প্রেমের আবেগে আমি এতদূর আবদ্ধ হয়ে পড়েছি যে তার চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলাম না আমি। আর একটা আশ্চর্য এই যে তার গলার কাছে ছুঁরির ফলকের মত একটা জিনিস দেখছিলাম।

মেফিস্টোফেলিস : ঠিক ঠিক। লাল একটা দাগ আমিও দেখেছিলাম। তার কোন পুরনো শত্রু তার মাথাটা কেটে দিয়েছে আর সেই মাথাটাকে তাকে হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি এখনো মায়ার জিনিস দেখতে চাও ? এস আমার সঙ্গে। এই ছোট্ট পাহাড়টায় উঠে পড়। আমি যদি খুব একটা ভুল না দেখি তাহলে সেখানে দেখবে একটা থিয়েটার হচ্ছে। কি হচ্ছে ?

রঙ্গমঞ্চের ভৃত্য : শীঘ্রই আবার শুরু হবে। নূতন নাটক। সাতটি নাটকের শেষ নাটক। কোন এক সৌখীন নাট্যকারের দ্বারা এ নাটক লিখিত। আমিও একজন সৌখীন নাট্যানুরাগীরূপেই যবনিকা উত্তোলন করছি।

মেফিস্টোফেলিস : তোমার সঙ্গে আমার ব্লকস্‌বার্গে দেখা হওয়াই ভাল সেটাই তোমার উপযুক্ত স্থান।

দ্বাবিংশ দৃশ্য

ওয়ালপার্গিস রাত্রির স্বপ্ন

ওবেরন ও টিটানিয়ার বিবাহ

বিরতি

ম্যানেজার : আজ তোমাদের বিশ্রাম। তোমাদের যন্ত্রপাতির আজ কোন প্রয়োজন নেই। এক ধূসর পাহাড় আর কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকাই হবে আজকের দৃশ্যপট।

প্রহরী : এ বিয়ে হবে সোনার বিয়ে। এ বিয়ের জীবনকাল হবে পঞ্চাশ বছর। তবে যদি কোন ঝগড়াঝাঁটি হয় তাহলে আমাকে সব সোনাদানা দিয়ে দিও।

ওবেরন : হে প্রেতাত্মাগণ, যদি তোমরা এখানে অবস্থান করো তাহলে তোমরা আনন্দোজ্জ্বল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করো। তোমরা দেখা দাও। পরীদের রাজা আর রাণী আজ বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হলো।

পাক : পাক এসে গেছে। হালকা পায়ে সে নাচছে। তার সাথে এসো আরও একশো জন। এসে তার আনন্দের অংশ গ্রহণ করো।

এরিয়েল : এরিয়েলের গান হচ্ছে স্বর্গের সুরধারার মতই পবিত্র। তার কণ্ঠস্বর অতীব মধুর। তার মুখটা কুৎসিত হলেও সুন্দরীরা তাঁর দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

ওবেরন : বর-কনে যদি তার দাম্পত্য জীবনে প্রেম ভালবাসা চায় তাহলে আগে তাদের বিচ্ছেদ ভোগ করা উচিত।

টিটানিয়া : স্ত্রী যদি তার মেজাজ সংযত করা সত্ত্বেও স্বামী তাকে অপমান করে তাহলে স্বামী উত্তর মেরুতে আর স্ত্রীকে বিষুবরেখায় রেখে এস।

অর্কেস্ট্রা : ঘাসের মাঝে লুকিয়ে থাকা সাপ ব্যাঙ আর ঝিঁ ঝিঁ পোকারাই হলো আজকের গায়ক।

একক সঙ্গীত : আমাদের পথে পাখি ডাকছে। সাবানের ফেনার মত বুদ্বুদ উঠছে তার কণ্ঠে। তার ছুটো নাসারন্ধ্র দিয়ে গানের সুর বেরিয়ে

আসছে।

প্রেতাত্মা প্রথম আকার ধারণ করল

মাকড়সা আর বিষাক্ত ব্যাঙের পা, ছোট ছোট পাখা,—আমরা তাদের চিনি। ছোট্ট প্রাণী হলে কি হবে। দেখে মনে হবে যেন ছোট্ট একটি কবিতা।

ছোট্ট একজোড়া বর-কনে

ছোট ছোট পা ফেলে যতই লাফাও না কেন শিশিরভেজা সুবাসিত বন-পথের উপর দিয়ে, তোমরা কখনো শূন্যে উঠতে পারবে না।

কৌতূহলী পথিক : এটা কি কোন মুখোশনৃত্যের নাটক? আমি কি দেখছি? হে ওবেরন, সুন্দরী নারীদের রাজা, তুমি রাত্রিকালে আমার স্বপ্নের মাঝে এস।

কোন গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তি

আমি ত এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না। গ্রীক নাটকের মত শেষকালে কোন দেবতার পরিবর্তে হয়ত আসবে কোন শয়তান। সব সমস্যার হয়ত সমাধান করে দেবে।

উত্তরের শিল্পী : আমি কিন্তু কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি এ নাটকের। আমি এখন ইতালি পরিভ্রমণের কথা ভাবছি।

বিশুদ্ধ ভাববাদী : হায়, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি এখানে এসে পড়েছি। মানুষখেকো দৈত্যের মত কী চিৎকার করছে। ডাইনিদের মধ্যে শুধু দুজন পাউডার মেখেছে।

তরুণী ডাইনি : এই পাউডারই জামার কাজ করছে আমার। আমি তাই নগ্ন হয়ে বসে আছি আমার ছাগলের উপরে।

ধাত্রী : যে কোন মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দেবার মত কলাকৌশল আমাদের যথেষ্ট জানা আছে।

বাদ্যকারদের নেতা : হে মাছি আর মশার দল, তোমরা যেন নগ্ন দেহের চারদিকে ঘিরে ধরো না। এখন ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকারাই গান করবে সময় বুঝে।

ভবিষ্যদ্বক্তা : (একদিকে তাকিয়ে) সুন্দরী কনে হাতে পেলেই যুবকদের রক্ত ফুটে ওঠে টগবগ করে। তারা চায় সমস্ত সমাজ তাদের মনোমত চলবে।

ভবিষ্যদ্বক্তা : (আর একদিকে তাকিয়ে) বাচাল প্রচারকদের গ্রাস করার জন্য পৃথিবী যদি এখনো মুখ না খোলে তাহলে আমি কেন এত তাড়াতাড়ি নরকে ঝাঁপ দেব ?

জনৈক প্রেত : আমাদের দেখতে ছোট্ট পতঙ্গ মনে হলেও আমাদের পিতা হচ্ছে শয়তান। সুতরাং ইচ্ছা করলে আমরা যে কোন সম্মানে ভূষিত করতে পারি নিজেদের।

অন্য প্রেত : ভিড়ের মধ্যে সব মানুষই নির্লজ্জের মত বড়াই করে। বলে তারা নির্দোষ।

জনৈক ডাইনি : ডাইনিদের নাচগানের আসরে অনেকেরই মাথা ঘুরে যায়।

কৌতূহলী পথিক : বল, কে সবচেয়ে কড়া আর জাঁকজমকপূর্ণ লোক ? যে উদ্ধতভাবে হাঁটে, তার চলার মধ্যেই বোঝা যায় সে কত অহঙ্কারী।

প্রেতাত্মা : পরিস্কার ও কর্দমাক্ত যে কোন জলাশয় ও জলধারাতেই আমি মাছ ধরতে বা খেলা করতে ভালবাসি। তেমনি দেখবে ধার্মিক লোকরা শয়তানদের সঙ্গেও মেলামেশা করেন।

অন্য প্রেত : হ্যাঁ, ধার্মিক লোকরা যে কোন অবস্থা বা উপাদানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নিজেদের।

বিপদ : আমি সব সময় ভবিষ্যতের জয়ঢাক শুনতে পাই।

নৃত্যশিক্ষক : খোঁড়া পায়ে কেমন পা ফেলছে আর লাফাচ্ছে।

জনৈক সজ্জন ব্যক্তি : সাধারণ মানুষগুলো এমন ইতর যে তারা লোক খুন করে মানুষকে কষ্ট দিয়ে বিদ্রূপ করে আনন্দ পায়। তবে তারা অর্ফিয়াসের বাঁশির মত নাচগানের দ্বারা বশীভূত হয়।

গোঁড়া ব্যক্তি : আমি কোন সংশয় বা সমালোচনার দ্বারা মুগ্ধ হব না। শয়তানও যদি কোন বিষয়ে নিশ্চিত এবং অটল থাকে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

আদর্শবাদী : যে কল্পনা আমাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করে মাঝে মাঝে তা অনিবারণীয়। কিন্তু আমি যা নিজেকে দেখছি আমি যদি তাই হই তাহলে কল্পনামুক্ত আমার সেই স্বরূপ খুবই খারাপ।

বস্তুবাদী : সব দেশেই এই ধরনের নাচগান ও হৈহল্লোড় হয়। এতে আমার ভীষণ বিরক্তি লাগে। এখানে এসে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করছি। মনে হচ্ছে অশক্ত ভূমির উপর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

অতিপ্রাকৃতবাদী : আমার ত এ নাটক দেখতে খুব ভাল লাগছে। এ

নাটক আমাকে বেশই আনন্দ দান করেছে। অভিনেতাদের যোগ্যতার প্রশংসা করি। শয়তানদের মধ্যে থেকেও আমি ভাল আত্মা বেছে নিতে পারি।

সংশয়বাদী: যে অগ্নিশিখাকে তারা অনুসরণ করে চলেছে তার শেষ নেই। তাদের চলারও শেষ নেই! তারা ভাবছে তারা তাদের ঈপ্সিত সম্পদের রাজ্যে চলে এসেছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না শয়তান সংশয়ের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের প্রতারিত করছে। আমি কিন্তু এখানে বেশ আনন্দে আছি।

বাদ্যকারদের নেতা: ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ পোকার থেকে মাছি আর মশা ভাল গায়ক।

মঠাধ্যক্ষ: আমরা সর্বজীবে দয়ার নীতি প্রচার করি। তাহলে আমাদের পায়ে হেঁটে চলা উচিত নয়, আমাদের মাথা নিচে দিয়ে চলা উচিত।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তি: নাচতে নাচতে আমাদের জুতো ছিঁড়ে গেছে। এখন আমরা খালি পায়ে হাঁটি।

জলজ আগাছা: জলাশয়ে আমাদের জন্ম। তবু আজ আমরা এখানে সমাজের বড় বড় লোকদের কাছে এসে পড়েছি।

কক্ষচ্যুত নক্ষত্র: আকাশ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে আমি পড়ে আছি এই ঘাসের উপর। হায়, কে আমাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে আবার।

স্থূলাঙ্গ ব্যক্তিরা: আমাদের জন্য একটু জায়গা করে দাও। চারদিকে শুধু মোটা লোক ঘাসগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

পাক: হাতির ছানার মত এখানে এস না তোমরা। পাক নিজেই একজন মোটা লোক।

এরিয়েনা: প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্যকে পিছনে ফেলে মনকে পাখা করে আমার সঙ্গে শূন্য পথে চলে এস। আমি তোমাদের নিয়ে যাব গোলাপের সুন্দর পাহাড়ে।

অর্কেস্ট্রা: আমাদের মাথার উপর জমে থাকা মেঘ আর কুয়াশা এখন উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। চারদিকে বাতাস বইছে আর সে বাতাসে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য

একটি দুর্দিন

প্রান্তর

ফাউস্ট। মেফিস্টোফেলিস

ফাউস্ট: দুঃখে হতাশায় অনেক হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে খারাপ হয়ে যায়, কুপথে চলে যায়। ফলে অপরাধীদের মত কারাগারে তাদের অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। বিশ্বাসঘাতক ঘৃণ্য শয়তান কোথাকার! তুমি তার ব্যাপারটা গোপন রেখেছ আমার কাছে। দাঁড়াও ওখানে। তোমার রোষকশায়িত রক্তচক্ষু যত পার ঘোরাও। তোমার যত শক্তি আছে তাই নিয়ে আমার সম্মুখীন হও। আমাকে যত পার চাপ দাও। আমাকে কারাগারে আবদ্ধ করবে? আমাকে অশেষ দুঃখ দেবে? আমাকে শয়তানের হাতে সঁপে দেবে এবং হৃদয়হীন মানুষদের নিন্দার বলিতে পরিণত করবে? এতদিন তুমি আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিলে বাজে চিন্তার দ্বারা। আমার প্রিয়তমার দুঃখকষ্টের কথা গোপন রেখেছিলে আমার কাছে। তার জন্য অসহায়ভাবে ধ্বংসের পথে নেমে যেতে হয় তাকে।

মেফিস্টোফেলিস: একা সেই শুধু কষ্ট পায়নি।

ফাউস্ট: কুকুর, ঘৃণ্য জানোয়ার কোথাকার! হে ঈশ্বর, এই ঘৃণ্য সরীসৃপটাকে আবার ওর প্রিয় কুকুররূপে পরিণত করো। ও একদিন কুকুর-রূপেই রাত্রিতে আমার পায়ের কাছে গড়াগড়ি যেত। ও যেন আবার আমার পায়ের কাছে ধূলোর উপর বুক দিয়ে শুয়ে থাকে আর আমি পা দিয়ে ওকে মাড়িয়ে দেব। এ দুঃখ প্রথম নয়। তার মানে যে দুঃখ মানুষ কল্পনাও করতে পারেনা সেই অকল্পনীয় অসহনীয় দুঃখের গভীরে পড়ে আরো অনেক মানুষ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবে। অথচ এই একটি মানুষের দুঃখ আমার মর্ম ভেদ করে আমার অস্থিমজ্জাকে কাঁপিয়ে তুলছে আর তুমি অজস্র মানুষের দুঃখে হাসছ!

মেফিস্টোফেলিস: এখন তোমরা আমরা সবাই বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। কেন তুমি মানুষ হয়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছিলে যদি শেষ পর্যন্ত সে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে না পার? তুমি কি এসব সইতে না পেরে পালিয়ে যাবে? কিন্তু তুমি প্রথম আমাদের কাছে আসবে না আমরা তোমার কাছে যাব?

ফাউস্ট: দাঁতে দাঁত চেপে গর্জন করো না আমার দিকে তাকিয়ে। ভয়ঙ্কর ঘৃণা ও বিরক্তিতে মন আমার ভরে উঠছে। হে গৌরবময় শক্তিশালী

আত্মা, তুমি আমাকে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছ, তুমি আমার মনের কথা জান। বল, কেন তুমি এমন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছ আমাকে যে ক্ষয়ক্ষতি আর ধ্বংস ছাড়া আর কিছু জানে না ?

মেফিস্টোফেলিস : তোমার যা বলার তা বলা হয়ে গেছে ?

ফাউস্ট : তাকে উদ্ধার করো, তা না হলে তুমি জাহান্নামে যাবে। হাজার বছর ধরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ ভোগ করতে হবে তোমায়।

মেফিস্টোফেলিস : তাকে উদ্ধার করব ? কে তার ধ্বংস ডেকে এনেছে ? আমি না তুমি ? (ফাউস্ট চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল) তুমি বজ্র ধারণ করতে চাও ? কোন মরণশীল মানুষ তা পেতে পারে না। কোন দুর্গত মানুষকে মুক্ত করার নামে এইভাবে অত্যাচারীরা নির্দোষ ব্যক্তিকে শেষে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চায়।

ফাউস্ট : সেখানে নিয়ে চল আমাকে। তাকে মুক্ত করব আমি।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু তাহলে যে বিপদে পড়বে তার কথা ভেবেছ ? মনে রেখো, তুমি নিজের হাতে যে রক্ত পাত করেছ তা এখনো শহর থেকে মুছে যায়নি। যেখানে তুমি হত্যা করেছিলে সেই ঘটনাস্থলে এখনো প্রতিশোধ-গ্রহণকারী প্রেতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হত্যাকারীর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ফাউস্ট : তুমিও তাই করছ। পৃথিবীর সমস্ত হত্যার অপরাধে অভিশপ্ত হও তুমি। জানোয়ার কোথাকার। আমাকে সেখানেই নিয়ে চল তুমি। আমি বলছি, তুমি তাকে মুক্ত করো।

মেফিস্টোফেলিস : আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। শোন আমি কি করতে পারি। আমার কি স্বর্গমর্ত্যের সব শক্তি করায়ত্ত আছে ? প্রথমে আমি জেলরক্ষীর চেতনাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলব। তারপর কারাকক্ষের চাবি নিয়ে তাকে বাইরে নিয়ে আসব। বাইরে প্রস্তুত থাকবে ঐন্দ্রজালিক ঘোড়া। আমি তোমাদের দূরে নিয়ে যাব। এত ক্ষমতা আমার আছে।

ফাউস্ট : চল।

চতুর্বিংশতি দৃশ্য

রাত্রি

মুক্ত প্রান্তর

(কালো ঘোড়ার উপর চেপে ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস যাচ্ছিল)

ফাউস্ট : ঐ পাথরের চারদিকে বসে কি ওরা বুনছে ?

মেফিস্টোফেলিস : আমি জানি না ওরা কি করছে।

ফাউস্ট : কখনো উপরে উঠছে, কখনো নিচে নামছে, কখনো মাথা নত করছে।

মেফিস্টোফেলিস : ডাইনিদের রাজ্য। চল, চল।

পঞ্চবিংশতি দৃশ্য

কারাগার

(এক হাতে বাতি আর এক হাতে একগোছা চাবি নিয়ে লৌহকপাটের বইরে)

ফাউস্ট : এক অভূতপূর্ব কম্পন জাগছে আমার মধ্যে। সমগ্র মানবজাতির পুঞ্জীভূত দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ছি আমি। সে এখন অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষে বাস করে। অথচ সে এক মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত। আমি কি তাকে মুক্ত করতে বিলম্ব করছি ? আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাচ্ছি ? চল এগিয়ে চল। এভাবে দেরি করলে মৃত্যুবরণ করতে হবে আমায়। (তালা ধরে খুলতে গেল। ভিতরে গানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল)।

গান

আমার মা এক বারবণিতা ; সেই আমার
মৃত্যু ঘটিয়েছে। আমার পিতা ছিল এক ভৃত্য ;
সে আমার মাথাটা খেয়েছে।
কিন্তু আমার ছোট্ট বোনটা ছিল খুব ভাল।
সে আমার অস্থিগুলোকে এক বনের শ্যাওলাধরা
ভিজে মাটির মধ্যে কবর দেয়।
তখন আমি ছিলাম ছোট একটা পাখি।
হে পাখি উড়ে যাও। উড়ে যাও।

ফাউস্ট (তালা খুলে) : সে এখনো বুঝতে পারছে না তার প্রেমিক কত কাছে। সে হাতের শৃঙ্খলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। (ঘরে ঢুকল)

মার্গারেট (বিছানার চাদরে মুখ লুকিয়ে) : ধিক ধিক! আবার তারা আসছে। এর থেকে মৃত্যু ভাল।

ফাউস্ট : (চুপি চুপি) চুপ, চুপ। তোমার মুক্তির সময় উপস্থিত।

মার্গারেট : (ফাউস্টের সামনে পড়ে গেল) তুমি যে আমার দুঃখে করুণা দেখাচ্ছ, তুমি কি মানুষ ?

ফাউস্ট : তোমার চিৎকারে রক্ষীরা জেগে উঠবে। তারা তোমায় ধরে ফেলবে। (তার পায়ের বেড়ী খুলে দিল)।

মার্গারেট : (নতজানু হয়ে) আমার উপর এতদূর অধিকার ফলাতে কে তোমায় দিয়েছে ? এই নিশীথ রাতে তুমি এসেছ আমার কাছে। আমার উপর দয়া করো, আমাকে বাঁচতে দাও। একটু পরেই সকাল হবে। (উঠে) আমি কি এখনো তেমনি যুবতী আছি ? তবু মৃত্যু আমার কাছে আসছে কেন ? আমিও একদিন সুন্দরী ছিলাম। আর সেই সৌন্দর্যই হয়ে ওঠে আমার ধ্বংসের কারণ। একদিন আমার প্রণয়ী আমার কাছে ছিল, কিন্তু আজ সে দূরে। আমাদের মিলনের মালা আজ ছিঁড়ে গেছে, ছড়িয়ে গেছে যে মালার ফুল। এত জোরে আমাকে ধরো না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার কাছে কি করেছি ? আমার অনুরোধ যেন বৃথা না হয়। আমি জীবনে তোমাকে কখনো দেখিনি।

ফাউস্ট : এ দুঃখ জীবনে আমি সহ্য করতে পারব ?

মার্গারেট : এখন আমি সম্পূর্ণ তোমার কবলে। কিন্তু প্রথমে আমার বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাইয়ে নিতে দাও। আমি সারারাত বাচ্চাটাকে আদর করেছি। কিন্তু ওরা তাকে জোর করে নিয়ে গেছে। অথচ বলছে আমি তাকে হত্যা করেছি। জীবনে আর কোনদিন সুখী হতে পারব না আমি। ওরা আমাকে নিয়ে গান গায়।

ফাউস্ট : (নতজানু হয়ে) তোমার প্রণয়ী আজ তোমার পদতলে। সে তোমার দাসত্বের বন্ধন ছিন্ন করতে চায়।

মার্গারেট : (পাশে পড়ে গিয়ে) এস, আমরা নতজানু হয়ে সাধুদের কাছে প্রার্থনা করি তারা যেন আমাদের লুকিয়ে রাখে। লুকিয়ে রাখে কোন তক্তার তলায়। বজ্রাঘাতে সমগ্র নরক কাঁপছে। শয়তানরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে শিকার

খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফাউস্ট : (উচ্চৈঃস্বরে) মার্গারেট, মার্গারেট !

মার্গারেট : (মনোযোগ সহকারে শুনে) এ কণ্ঠস্বর আমার প্রেমিকের না ! (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) কোথায় সে ? সে আমার নাম ধরে ডাকছিল। আমি শুনতে পেয়েছি। আমি এখন মুক্ত, কেউ আমাকে আর বাঁধতে পারবে না। আমি আমার প্রণয়ীর কাছে চলে যাব। তার বুকের উপর শোব। সে একটু আগে আমার নাম ধরে ডাকছিল। নরকের গোলমালের মাঝে নানারূপ নারকীয় তর্জনগর্জনের মাঝে আমি তার মধুর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

ফাউস্ট : এই সেই আমি।

মার্গারেট : সেই তুমি ! আবার বল (জড়িয়ে ধরে) আমার সেই ভালবাসার মানুষ। কোথায় আমার যন্ত্রণা ? কোথায় কারাগার আর শৃংখলজনিত মনোবেদনা ? তুমি ! তুমি এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে। এখন আমি মুক্ত। আবার আমি দেখতে পারি সেই রাজপথ যেখানে প্রথম দেখি তোমায়। দেখব সেই ফুল্লকুসুমিত উদ্যান যেখানে একদিন আমি মার্থার সঙ্গে তোমার প্রতীক্ষা করতাম।

ফাউস্ট : (যাবার জন্য উদ্যত হয়ে) এস, এস আমার সঙ্গে।

মার্গারেট : একটু থাম। আমি তোমার সঙ্গে কিছুটা সময় থাকতে চাই।
(চুম্বন করে)

ফাউস্ট : এখনি পালিয়ে চল। দেরি করলে পরে আমাদের দুঃখ ভোগ করতে হবে।

মার্গারেট : আমাকে চুম্বন করো। তাও কি করতে পার না ? তুমি কি আগের মত চুম্বন করতে ভুলে গেছ ? আজ তোমার বুকে এত সংশয় জাগছে কেন ? একদিন তোমার চোখের দৃষ্টির মধ্যে স্বর্গ খুঁজে পেতাম আমি। তোমার কথার মধ্যেও স্বর্গলাভ করতাম। একদিন তুমি এমন নিবিড়ভাবে চুম্বন করতে যাতে আমার মনে হত আমি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাব। আমাকে চুম্বন করো। (আলিঙ্গন করল) হায়, তোমার ঠোঁটগুলো এত ঠাণ্ডা কেন ? কেমন যেন প্রাণহীন। তোমার প্রেমাবেগের মধ্যে আর সেই নিবিড়তা নেই। কে আমার এই ক্ষতি করেছে ? (নিজেকে সরিয়ে নিল)

ফাউস্ট : এস আমার সঙ্গে। প্রিয়তমা, সাহস অবলম্বন করো। পরে আমি হাজার গুণ নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরব। কিন্তু এখন আমার পিছু পিছু

চলে এস।

মার্গারেট : সেই তুমি ঠিক বটে ত ?

ফাউস্ট : সেই আমি, চলে এস।

মার্গারেট : তুমি আমার শৃংখল খুলে দেবে। তুমি আমায় আবার স্থান দেবে তোমার কোলে। তুমি আমায় দেখে ঘৃণা করছ না কেন ? তুমি জান ত কাকে মুক্ত করছ ?

ফাউস্ট : চলে এস, রাত্রি শেষ হয়ে গেছে।

মার্গারেট : আমি আমার মাকে হত্যা করেছি। তোমার ঔরসজাত সন্তানকে আমি জলে ডুবিয়ে মেরেছি। তোমার হাতটা দাও। স্বপ্ন দেখছি না ত ? কিন্তু এ হাত ভিজে কেন ? চোখের জল মুছে ফেল। কিন্তু এ হাতে রক্ত কেন ? হা ভগবান ! কি করছ তুমি ? তরবারিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ। আমাকে ভয় দেখিও না।

ফাউস্ট : অতীতকে ভুলে যাও। তোমার কথায় মরতে ইচ্ছা করছে আমার।

মার্গারেট : না না, তুমি আমাদের থেকে বাঁচবে। তুমিই আমাদের সকলকে কবর দেবে। সবচেয়ে ভাল কবরে আমার মাকে শায়িত করবে। তার পরের টাতে আমার ভাইকে। তার থেকে একটু দূরে আমাকে কবর দেবে। আমার ডান দিকে থাকবে আমার শিশুসন্তান, আর কেউ না। তোমার বাহুলগ্ন হয়ে থাকাটা আমার কাছে স্বর্গসুখ। কিন্তু সে সুখ সম্ভব নয়। তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে তাহলে আমাকে। তুমি আমার চুম্বন এখন আর চাও না। অথচ তুমি কত ভাল, কত দয়ালু।

ফাউস্ট : তুমি যদি আমাকে চিনতে পেরে থাক, তাহলে আমার সঙ্গে এস।

মার্গারেট : বাইরে ?

ফাউস্ট : স্বাধীনতার রাজ্যে।

মার্গারেট : যেতে পারি যদি সেখানে থাকে উন্মুক্ত সমাধি, যদি মৃত্যু আমার জন্য প্রতীক্ষা করে সেখানে, যদি সেখানে পাই অনন্ত শান্তি। আর কোথাও যেতে চাই না আমি। তুমি চলে যাও হেনরি ! আমি কি করে যাব ?

ফাউস্ট : তুমি পারবে। দ্বার উন্মুক্ত।

মার্গারেট : যেতে আমার সাহস হচ্ছে না। আমার আর কোন আশা নেই। কি হবে পালিয়ে গিয়ে? ভিক্ষা করতে বাধ্য হব। আহত বিবেক আমার দুঃখ বাড়িয়ে দেবে। আমি পরিত্যক্ত অবস্থায় কিভাবে থাকব? আমাকে আবার ওরা ধরে ফেলবে।

ফাউস্ট : আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

মার্গারেট : তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো। তোমার ডুবন্ত ছেলে-টাকে বাঁচাও। বনের মাঝে নদীর উপর সাঁকোর তলায় বাঁ দিকে এখনো শিশুটা ওঠার জন্য আঁকপাক করছে, চেষ্টা করছে। তাকে ধরো ধরো।

ফাউস্ট : আর এক পা গেলেই মুক্তি। তারপর যত খুশি পুরনো কথা স্মরণ করো।

মার্গারেট : সেই পাহাড়টা কি আমরা পার হয়ে গেছি, যে পাহাড়টার একটা পাথরের উপর আমার মা বসে আছে। আর মাথা নাড়াচ্ছে। অনেক দিন ধরে আমার মা ঘুমোচ্ছে, কিন্তু জাগছে না।

ফাউস্ট : এখানে এসব কথা বলে বা প্রার্থনা করে লাভ নেই। আমি জোর করে বয়ে নিয়ে যাব।

মার্গারেট : না না, আমাকে ছেড়ে দাও। জোর করো না। তোমার প্রেমের খাতিরে অন্য যে কোন কাজ করতে পারি।

ফাউস্ট : সকাল হয়ে গেছে প্রিয়তমা।

মার্গারেট : সকাল? হ্যাঁ, আমার জীবনের শেষ দিন। অথচ আজ আমার বিবাহের দিন হওয়া উচিত ছিল। কাউকে যেন বলো না তুমি মার্গারেটকে ভালবেসেছিলে। আবার আমাদের অবশ্যই দেখা হবে। তবে নাচের আসরে নয়। মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। সমাধিভূমির মত মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে পৃথিবীতে।

ফাউস্ট : হায়, আমার যদি জন্ম না হত!

মেফিস্টোফেলিস : (বাইরে থেকে) তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস। না হলে সকাল হবার আগেই ধরা পড়বে। শুধু বাজে কথা বলে দেরি করছ। এদিকে আমার ঘোড়াগুলো চিৎকার করছে। ভোর হয়ে গেছে।

মার্গারেট : কে ওখানে? এই পবিত্র স্থানে কি সে চায়? সে আমাকে চায়।

ফাউস্ট : তুমি বাঁচবে।

মার্গারেট : হে ঈশ্বর ! আমি তোমার বিচারের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।

মেফিস্টোফেলিস : চলে এস। তা না হলে তোমাদের দুজনকেই ফেলে রেখে চলে যাব।

মার্গারেট : হে পিতা, আমি তোমার। আমাকে উদ্ধার করো। হে দেবদূতগণ, আমাকে রক্ষা করো। হেনরি, তোমার কথা মনে করতে ভয়ে কাঁপুনি আসছে আমার।

মেফিস্টোফেলিস : ওর বিচার হয়ে গেছে।

অজানা কণ্ঠস্বর : (উপর থেকে) ও উদ্ধারলাভ করেছে।

মেফিস্টোফেলিস : (ফাউস্টকে) আমার কাছে এস।

(দুজনে অদৃশ্য হয়ে গেল)

কণ্ঠস্বর : (ভিতর থেকে) হেনরি ! হেনরি।

ট্রাজেডীর দ্বিতীয় অংশ

পঞ্চ অঙ্কে সমাপ্ত

প্রথম অঙ্ক

একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য

গোধূলিবেলা

ফুলছড়ানো ঘাসের উপর ক্লান্ত ও অশান্ত অবস্থায় শুয়ে ছিল ফাউস্ট। তার চারদিকে বৃত্তাকারে সুন্দর ও ছোট আকারের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

(বীণাযোগে গান)

এরিয়েল : যখন দিকে দিকে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে বসন্ত আসে, মুক্ত মাঠ সবুজের সম্ভার নিয়ে সবুজ শিশুদের আহ্বান জানায়, তখন আমাদের মত মায়াবী পরীরাও অসহায় মানুষদের সাহায্য করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। ভাল মন্দ নির্বিশেষে সকলের উপর করুণা করে বেড়ায় তারা।

তোমরা যারা ওর মাথার চারপাশে অদৃশ্য অবস্থায় বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছ, তারা অবশ্যই যে দুঃখের আবেগে আলোড়িত হচ্ছে ওর বুক তার কারণ আবিষ্কার করবে। তার অনুশোচনার আগুন নিবিয়ে দেবে। সমস্ত রকমের

দুঃখের বোঝা হতে মুক্ত করো ওর অন্তর। সারারাত্রির মধ্যে চারটি প্রহর আছে। এখন আর দেরি করো না। প্রথমে ওকে ঠাণ্ডা বালিশের উপর ঘুম পাড়াও। তারপর ওর উপর লেথি নদীর জল ছড়াও। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আর তাহলে কোন ব্যথা থাকবে না। ওর ঘুম পরিপূর্ণ হলে তোমরা তোমাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করবে। তারপর ওকে জাগিয়ে দেবে।

কোরাস: যে সবুজ প্রান্তরের বিশালতায় মন্থর বাতাস খেলা করে যায়, যেখানে কুয়াশাচ্ছন্ন গোধূলির স্ববাসিত ছায়া ঘন হয়ে উঠে সোনালি আলোর শেষ দরজাটা বন্ধ করে দেয় সেখানে নীরব শান্তি যেন চুপিসারে কথা কয় বাতাসের সাথে, সেখানে এক শিশুসুলভ চপল খেলায় সকলেরই মন মেতে ওঠে।

এখন রাত্রি ঘন হয়ে উঠেছে। একের পর এক করে তারা ফুটে উঠছে মেঘ-হীন মুক্ত আকাশে। পাশের হ্রদের শান্ত জলে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সব তারার চকিত আলো। রাজকীয় ঐশ্বর্যে বিরাজমান পূর্ণায়ত চাঁদ অতন্দ্র দৃষ্টিতে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে চারদিকের সর্বব্যাপী শান্তি আর নীরবতা।

এখন তুমি কালের সীমাবন্ধন থেকে যেন মুক্ত। তোমার আনন্দ বেদনারা সব পালিয়ে গেছে ওই শান্তির রাজ্য থেকে। এখন তুমি তোমার পূর্ণ অখণ্ড সত্তায় বিরাজিত। যে বিশ্বাস তুমি হারিয়ে ফেলেছিলে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত তোমার হৃদয়ে। আলোকোজ্জ্বল নূতন প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করো। চেয়ে দেখ ভোরের কুহেলিঘেরা আরামশয্যা থেকে পাহাড়গুলো জেগে উঠছে, উপত্যকাগুলোকে কেমন সবুজ দেখাচ্ছে। মাঠে মাঠে প্রভাতী আলোর রুপালি ঢেউ তুলে তাদের পরিণতি ঘোষণা করছে সবুজ শস্যের দল।

যদি অন্তরের অসীম অসংযত কামনাদের জয় করতে পার তাহলেই অদূরে দেখতে পাবে এক উজ্জ্বল গৌরবের রাজ্য। যে মোহনিদ্রার হালকা আবরণে আবৃত তোমার জীবন, ছিন্ন করে ফেল সে আবরণ। অবিশ্বাসী অপরিণামদর্শী সাধারণ মানুষ শুধু কামনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে জানে, কিন্তু কামনা পূরণের পথ জানে না। যে সব কিছু দেখে ভাবনা চিন্তা করে কাজ করে যায় সেই তার আকাঙ্খিত বস্তুকে লাভ করে জীবনে।

(একটি জোর শব্দ সূর্যের আগমন ঘোষণা করল)

এরিয়েল: ঐ শোন, আকাশে নবজাত দিনের আবির্ভাব ঘোষিত হচ্ছে প্রচণ্ড শব্দে। সূর্যদেবতা ফীবাসের রথচক্রনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। স্বর্গমর্ত্যব্যাপী সে আলোর উজ্জ্বলতায় চোখ ধাঁধিয়ে

উঠছে। ঐ শোন পাহাড়ে অরণ্যে প্রতিটি কুসুমকোরকের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট সে আলোর আশ্চর্য অশ্রুত ধ্বনি।

ফাউস্ট: হে পৃথিবী, যদিও এখন রাত্রির অন্ধকার অবিচলভাবে ঘন হয়ে রয়েছে তোমার বুকে তথাপি এক নূতন প্রাণস্পন্দনে সজীব হয়ে জেগে উঠেছি আমি। নূতন আশার আনন্দ জাগছে আমার হৃদয়ে, আমার বহু আকাঙ্খিত বৃহত্তর জীবনলাভের জন্য এক বলিষ্ঠ সংকল্প অটল হয়ে উঠছে আমার মধ্যে। উপত্যকার বুক থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে ভোরের আকাশ। অসংখ্য কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে কুঞ্জবনে। নানাবিধ বৃক্ষের পত্রপুষ্পশোভিত শাখাপ্রশাখাগুলো প্রত্যুষের আলোয় মুখ তুলে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। সূর্যকিরণ প্রথমে পর্বত-শৃঙ্গের মুকুটগুলিকে চুম্বন করে সানুদেশের ঢালু প্রান্তরভূমি পার হয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে সমতল-ভূমিতে। সে কিরণে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে আমার। এইভাবে আমাদের সব ইচ্ছা যদি পূরণ হয়, যদি আমাদের সর্বোচ্চ আশার আলো পূর্ণতার প্রান্তর-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সার্থক হই আমরা। কিন্তু যদি সে আশার আলোর পরিবর্তে নেমে আসে জ্বলন্ত অগ্নিপ্রবাহ, আসে ঘৃণা অথবা প্রেমের আগুন, আনন্দ বেদনার দ্বৈত উত্তাপে পীড়িত হই আমরা, তখন অনিবারণীয় কামনার আবেগে সংসারের দিকে ছুটে যাই আমরা, ছদ্ম যৌবনের মিথ্যা রঙে রূপে অলঙ্কৃত করে তুলি নিজেদের।

এইভাবে আমি ছুটে যাই সামনের দিকে আর আমার পিছনে পড়ে থাকে উজ্জ্বল সূর্যের আলোকমালা, ঝর্ণারা ছুটে যাক পাহাড়ের গা বেয়ে। উপত্যকার বুকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাক নদীরা। রামধনু ফুটে উঠুক দিগন্তে। মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রকৃত কোন প্রতীক কিন্তু প্রকৃতি জগতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বেশ বোঝা যায় জীবন আসলে আলো নয়, অস্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিরুদ্ধ প্রতিসৃত আলোকতরঙ্গ হতে বিচ্ছুরিত বর্ণমালামাত্র।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাটের সৌধ

দরবারগৃহ। সম্রাটের জন্য প্রতীক্ষারত রাজ্য পরিষদের সদস্যরা।

বাস্ত। সুসজ্জিত সভাসদবর্গের পিছু পিছু সম্রাট সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল জনৈক জ্যোতিষ।

সম্রাট : হে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত পারিষদবর্গ, আপনারা বহু দূর দুরান্ত হতে এসেছেন। আমার পাশে এক বিজ্ঞজনকে দেখছি, কিন্তু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভাঁড় কোথায় ?

ভূম্যধিকারী : আপনার পোষাকের আঁচলে আটকে গিয়ে হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। সে প্রচুর মদ্যপান করেছে কি না কেউ জানে না। তবে তার মোটা দেহটাকে লোকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেছে। এখন সে মৃত কি অচৈতন্য কেউ তা জানে না।

দ্বিতীয় ভূম্যধিকারী : সেই ভাঁড়ের স্থান অধিকার করার জন্য অদ্ভুত পোষাক পরে আর একজন ভাঁড় সকলকে ঠেলে এসে হাজির হয়। তার অদ্ভুত চেহারা দেখে চমকে ওঠে সকলে। প্রহরীরা তাকে আটক করলেও সে জোর করে ঢুকে পড়ে। ঐ এসে গেছে সে।

সিংহাসনের সামনে নতজানু হয়ে

মেফিস্টোফেলিস : মানুষ কোন জিনিস অভিশপ্ত হলেও তা আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যাশা করে ? মানুষ কোন জিনিস কামনা করে তা পেয়ে সারা জীবন ছুটে চলে তার পিছনে ? কোন জিনিস যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে চলে মানুষ ? কে সব-চেয়ে ধিক্কৃত ও অপমানিত ? কার কথা আপনারা শুনতে চান না ? আবার কার কথা মানুষ স্বেচ্ছায় শুনতে চায় ? কে আপনার সিংহাসনের কাছে আসতে চায় ? আবার কে আপনার সিংহাসন হতে দূরে থাকতে চায় ?

সম্রাট : এখন এ সব কথা থাক। এখন সময়ের বড় অভাব। এখন ধাঁধার সমাধানের উপযুক্ত স্থান এটা নয়। এই ভদ্রমহোদয়গণ এক সময় এই সব ধাঁধার উত্তর দেবেন। তুমি নিজেই এর সমাধান করো। আমি তা শুনতে চাই। আমার পুরনো ভাঁড় এখন চলে গেছে সীমাহীন দূরত্বের দেশে। তার স্থান অধিকার করে আমায় সাহায্য করো। আমার কাছে এসে বস।

মেফিস্টোফেলিস সম্রাটের বাঁ পাশে গিয়ে বসল

জনতারা গুঞ্জনধ্বনি করে বলতে লাগল

আবার এক ভাঁড় এল—চিন্তার কথা। কোথা থেকে এল ? কেমন করে

ঢুকল এখানে? পুরনোটা মারা গেল। সে ছিল পিপের মত মোটা। লাঠির মত সরু।

সম্রাট: হে আমার প্রিয়, অনুরক্ত ও দূরাগত পারিষদবর্গ! আপনাদের স্বাগত জানাই। এখন আমাদের রাজ্যে সুসময় এবং সৌভাগ্য বিরাজ করছে। কিন্তু এই আনন্দের দিনে যখন সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে উৎসব করা উচিত তখন আপনারা কেন কোন এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগদান করতে চান?

প্রধান প্রশাসক: আমরা যাকে মানুষের মহৎ গুণ বলে থাকি তা একমাত্র সম্রাটের মাথাতেই আছে এবং একমাত্র সম্রাটই তার প্রয়োগ করতে পারেন। এই রাজ্যে এখন একের পর এক করে অন্যায় এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে প্রতিটি মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে আপনার কাছে ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করছে। চার দিকে অসত্য আর অরাজকতা বিরাজ করছে। অশুভ দুঃস্বপ্নের মত আইন-শৃংখলার অভাবজনিত ভয়ে পীড়িত হয়ে উঠছে মানুষের মন।

এ রাজ্যে কেউ মানুষের গবাদি পশু চুরি করছে, কেউ মেয়ে চুরি করছে। চোরেরা বড়াই করে বেড়াচ্ছে। অভিযোগকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে। এমন কি ধর্মস্থানের বেদী থেকে কাপ, ক্রশ ও বাতি চুরি হচ্ছে। নির্দোষ নিরীহ লোকদের ধনপ্রাণ নষ্ট করছে দুর্বৃত্তরা। এই ব্যাপক অন্যায় আর অরাজকতার রাজত্বে কোন মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি অবশিষ্ট থাকতে পারে? ফলে ভালরাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এমন কি বিচারকরাও দোষীর শাস্তি বিধান করতে পারছেন না। আমি দেশের বর্তমান দুরবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছি তা কালো হলেও তা প্রকৃত অবস্থার অংশমাত্র। (কিছুটা থেমে) যেখানে সকলেই অপরাধ করে এবং কেউ সুবিচার পায় না সেখানে স্বয়ং সম্রাটকেই দোষী সাজতে হয়।

প্রধান সেনাপতি: এই অরাজকতার দিনে ঝগড়া বিবাদের সংখ্যা ও গোলমাল বেড়েই চলেছে। একে অন্যকে আঘাত করে চলেছে। কেউ কোন আইনের নির্দেশ মানছে না। চোর চুরি করেও নিরাপদ আড্ডায় রয়ে গেছে। নাইটরা মিথ্যা শপথ করছে আর ভঙ্গ করছে। ভাড়াটে সৈন্যরা মাইনে চাইছে। না দিলে তারা একযোগে পালিয়ে যাবে। যে রাজ্য তারা একদিন পাহারা দিতে রক্ষা করতে এসেছিল আজ তা তারা বিধ্বস্ত করে দিতে চায়। আমাদের রাজ্যের সীমান্তের বাইরে যে সব রাজা আছে তারা মাথা ঘামাতে চায় এ সব

কোষাধ্যক্ষ : আর মিত্রশক্তিকে বিশ্বাস করলে আমাদের ঠকতে হবে। তারা আমাদের অসময়ে টাকা দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পূরণ করেনি। তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য এসে পৌঁছায়নি। বলুন মহারাজ, আপনার এই বিশাল রাজ্যের শাসনভার কার হাতে ন্যস্ত এখন। এখন দেখা যাচ্ছে ঘরে ঘরে সবাই রাজা। সবাই স্বাধীন, আপন আপন মতে চলছে। আমাদের ভৃত্যরাও স্বাধিকারে মত্ত হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দলগুলোকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। তারা শুধু ঝগড়া করে পরস্পরের সঙ্গে, দেশের কোন ভাল করে না। কেউ প্রতিবেশীর মঙ্গল চায় না। চায় শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থপূরণ। সকলেই ব্যক্তিগত-ভাবে অর্থসঞ্চয় করছে। এদিকে আমাদের রাজকোষ শূন্য।

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক : এমন কি আমি নিজে যা কিছু পাচ্ছি সব সঞ্চয় করছি শুধু। তবু প্রয়োজন মিটছে না। মাংসের জন্য বনের পশু নির্বিচারে শিকার করা হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যে ভাল মদ নেই। রাজকোষে টাকা না থাকলেও নাচ-গানের খরচ মেটাতে হয়। ইহুদীদের দেনা কয়েক বছরেও শোধ হবে না। শূকরদের গায়ে চর্বি না জমতেই তাদের বধ করতে হয়। অনেককে মাথার বালিশ বাঁধা দিতে হয়। রুটিগুলো সেঁকতে না সেঁকতেই পেটে চলে যায়।

সম্রাট : (কিছু চিন্তার পর মেফিস্টোফেলিসকে) বল ভাঁড, এত সব অভাবের সঙ্গে তুমি কোন অভাবের কথা জুড়ে দিতে পার কি না।

মেফিস্টোফেলিস : আমি ? মোটেই না। আমি শুধু দেখছি আপনাকে আর আপনার মস্তকোপরি বৃত্তাকারে বিরাজিত সৌভাগ্যের জ্যোতিঃপুঞ্জকে। রাজা যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যেখানে রাজশক্তি শত্রুশক্তিকে ছত্রভঙ্গ ও দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারে, যেখানে রাজার পিছনে অনুরক্ত প্রজাদের সংগঠিত আনুগত্য এখনো অটুট, সেখানে অবিশ্বাস ও হতাশার কি থাকতে পারে ? যেখানে এত সব উজ্জ্বল নক্ষত্র বিরাজমান সেখানে কোন অশুভ শক্তি খারাপ কিছু করতে পারে ?

জনতা : লোকটা ভবঘুরে। কে জানে কি আছে ওর মনের মধ্যে। এ আবার জ্যোতিষ নয় ত ?

মেফিস্টোফেলিস : জগতে অভাব কোথায় নেই। হয় এখানে, নয় ওখানে, টাকার অভাব সর্বত্র। এটা ঠিক যে এই মুহূর্তে আপনি অর্থ সংগ্রহ করতে পারছেন না। পর্বতকন্দরে বা বহু গুপ্ত স্থানে বহু সোনা টাকা গুপ্ত অবস্থায় আছে। তা খুঁজে বার করতে হবে। আপনি হুকুম দিন, কে তার সন্ধান

দিতে পারে। যার মন এবং প্রকৃতি শক্তিসম্পন্ন সেই তা পারে।

প্রধান প্রশাসক : মন আর প্রকৃতি—খৃস্টানদের কাছে এ কথা বলি না আমরা। এসব নাস্তিকদের কথা এবং তাদের আমরা পুড়িয়ে মারতে চাই। এসব কথা বিপজ্জনক। প্রকৃতি মানেই পাপ আর মন হচ্ছে শয়তান। তারা শুধু নির্লজ্জভাবে সংশয় উৎপন্ন করে যায়। আমরা এ সব মানি না। দু শ্রেণীর মানুষ আমাদের রাজ্য চালাচ্ছে—তারা হলো সাধু সন্ন্যাসী আর বীর নাইট। তারাই যত গীর্জা আর রাষ্ট্র চালায়। আর যে সব কুৎসিত মনের মানুষ সংশয় সৃষ্টি করে চলে তারা মায়াবী নাস্তিক। তারা বিভ্রান্তির দ্বারা রাজ্য ধ্বংস করে ফেলে। তাদের আমরা শত্রু হিসাবে দেখি এবং ধ্বংস করে থাকি। তুমি কি দুর্নীতি আমদানি করতে চাও বিদেশ থেকে ?

মেফিস্টোফেলিস : বাঃ, আমি দেখছি আপনি এক বিজ্ঞ সভাসদ। আপনি যেটা ছুঁতে পারছেন না তা কিন্তু আপনার অদূরেই আছে। আপনি যা ধরতে পারছেন না ভাবছেন তার অস্তিত্ব নেই। আপনি যা বুঝতে পারছেন না ভাবছেন তা সত্য নয়। আপনি যা ওজন করতে পারছেন না ভাবছেন তার ওজন নেই। যে মুদ্রা ভাঙ্গাতে পারছেন না ভাবছেন তা অচল।

সম্রাট : এখন ভেবে দেখ আমাদের এই প্রয়োজনে কিভাবে সাহায্য করতে পার তুমি। উপদেশ নিয়ে কোন লাভ নেই। এখন চাই টাকা। দেখ, কোথায় কিভাবে সে টাকা পাওয়া যায়।

মেফিস্টোফেলিস : আপনি যা চাইছেন আমি তার থেকে আরো বেশী দেব আপনাকে। এটা খুবই হালকা কাজ। তবে হালকা কাজই করা কঠিন। আসল কথা সোনা ত আপনার হাতের কাছেই রয়েছে। শুধু কৌশলে তা হস্তগত করতে হবে। মনে ভাবুন, অতীতে কত সম্রাট কত রাজ্য জয় করেছেন। সেই সব রাজ্যের কত ধনরত্ন তাঁরা মাটির তলায় পুঁতে রেখেছেন। সেই মাটি যখন আপনার তখন তার গর্ভনিহিত ধনরত্নও আপনার।

কোষাধ্যক্ষ : বোকা ভাঁড় হলেও ওর কথাগুলো বুদ্ধিদীপ্ত। হ্যাঁ, এ অধিকার সম্রাটের আছে।

প্রধান প্রশাসক : শয়তান আমাদের ধরার জন্য স্বর্ণজাল বিস্তার করছে। এসব কাজ কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক : ওকে আগে সেইসব ধনরত্ন রাজসভায় আনতে দাও। ও নিজেও তার অংশ নিক। আর যদি তাতে অন্যায় হয় তাহলেও আমি

তা সব নিয়ে যাব।

প্রধান সেনাপতি : ভাঁড় অত্যন্ত কূটনীতিজ্ঞ। সে সকলের লোভ জাগিয়ে তুলছে। আমরা ধনরত্ন চাই, তা কোথা থেকে আসছে তা দেখব না।

মেফিস্টোফেলিস : আপনারা হয়ত ভাবছেন আমি বাজে কথায় মন ভোলাচ্ছি। এই ত জ্যোতিষী রয়েছেন। ওকে জিজ্ঞাসা করুন। কালের গতি ত ওঁর নখদর্পণে। উনি বলুন এখন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান কি।

জনতার গুঞ্জন : ওরা দুজনেই দুর্বৃত্ত। ওরা দুজনেই এখন মিলেছে। দুজনেই রাজার সিংহাসনের পাশে জড়ো হয়েছে। লোকটা ভাঁড় হলেও বিজ্ঞের মত কথা বলছে।

(মেফিস্টোফেলিস যা বলার তাই বলে)

জ্যোতিষ : রবি এখন খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল। রবি সিংহাসনে, বুধ প্রহরী, স্নেহ আর বেতনের জন্য সেবা করে। মোহময়ী নারীরূপিনী শুক্র আপনাদের সকলেরই পানে স্নেহভরে তাকাচ্ছেন। সতী চন্দ্র বড় খেয়ালী ভাবাপন্ন। মঙ্গল আপনাদের ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু আঘাত করবে না। ভয় নেই। বৃহস্পতি এখনো চমৎকার ঐশ্বর্যময় নক্ষত্ররূপে বিরাজ করছে। শনি খুব দূরবর্তী এবং আকারে ছোট দেখালেও আসলে কিন্তু গ্রহ হিসাবে অনেক বড়। আমরা এমন কোন ধাতুকে গুরুত্ব দিই না যা ওজনে ভারী কিন্তু মূল্যবান নয়। যখন সোনা আর রূপা এই দুই ধাতু এক জায়গায় হয় তখন মানুষের অপ্রাপ্য কিছু থাকে না। তখন প্রাসাদ বাগান সম্পত্তি সবকিছু হয়। সেই সোনা এবং রূপা কে কোথা থেকে সংগ্রহ করবে তা কেউ জানে না।

সম্রাট : আমি তার কথার মধ্যে দুটো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না।

জনতা : তাহলে সে কথা বলার অর্থ কি। আমরা শুনেও কিছু বুঝতে পারিনি।

মেফিস্টোফেলিস : তারা হতবুদ্ধি ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে। তারা কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছে না আমার যাদুতে। কিন্তু কেন তারা অবিশ্বাস করবে, কেন তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে ? তারা নিজেরা তাদের পায়ের মধ্যেই এর প্রভাব বুঝতে পারছে। তারা হাঁটতে গেলেই তা বুঝতে পারবে। এইভাবে প্রকৃতির যে গোপন শক্তি বিশ্ব সৃষ্টির সর্বত্র কাজ করে যায় তার প্রভাব যে কোন জায়গায় পেতে পারে মানুষ। তার আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনুভব

করতে পারে সে শক্তি। সুতরাং যে কোন জায়গাতেই মাটি খুঁড়লেই সোনা পাওয়া যাবে না কেন? সোনা ত প্রকৃতিরই দান।

জনতা: আমার পা টা সীসের মত ভারী হয়ে উঠেছে। আমার হাতে বাতের মত ব্যথা করছে। আমার পিঠেতেও ব্যথা করছে। মনে হচ্ছে এই জায়গাতেই গুপ্তধন আছে প্রচুর।

সম্রাট: তাড়াতাড়ি করো। তোমার কথার পরীক্ষা হয়ে যাক। কোথায় কোন জায়গায় সোনা পাওয়া যাবে দেখিয়ে দাও। আমি আমার রাজমুকুট আর রাজদণ্ড ছুঁয়ে শপথ করছি, আমি আমার যথাসর্বস্ব তোমাকে দান করব যদি তোমার কথা সত্য হয়। তেমার সঙ্গে আমার চিরদিনের অক্ষয় বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। আর তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তোমাকে নরকে পাঠাব।

মেফিস্টোফেলিস: আমি পথটা দেখিয়ে দেব। কিন্তু ঠিক জায়গাটা বলব না। তা খুঁজে নিতে হবে। যে কোন জায়গাতেই সোনা পাওয়া যেতে পারে। একটা গরীব চাষীও মাটির কোন দেওয়ালের ভিতর সোনার হাঁড়ি পেয়ে যেতে পারে। তবে সোনার অনুসন্ধানকারীদের রাত্রির অন্ধকারে বার হতে হয়। যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তাদের বিশ্বাস করবে। শুধু সোনা নয়, ভাল মদও নিহিত আছে মাটির গর্ভে। যে রহস্য দিনের বেলায় হাসির উদ্রেক করে রাত্রিতে তাই জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সম্রাট: তুমি তাহলে তাদের পথ দেখিয়ে দাও। এসব হেঁয়ালির দরকার কি? সত্যিকারের মূল্যবান বস্তু যদি কোথাও থাকে তাহলে তা দিনেরবেলায়ও পাওয়া যাবে। রাত্রিবেলায় ত সব কিছুই কালো দেখায়। গরু বেড়াল সব। তখন কোনটা সোনা কোনটা কি বোঝাই যায় না। সুতরাং এখন মাটি কর্ষণ করে সোনা বার করো।

মেফিস্টোফেলিস: আপনি নিজে কোদাল নিয়ে চাষীর মত মাটি কর্ষণ করুন। তাহলে তার পুরস্কারস্বরূপ আপনি একপাত্র সোনার মহর পাবেন। তার সঙ্গে অনেক মণিমুক্তাও পাবেন। সেই সব জিনিস আপনার ও রাণীমার রাজকীয় ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে।

সম্রাট: তাহলে তাড়াতাড়ি করো। কতক্ষণ লাগবে?

জ্যোতিষী: (মেফিস্টোফেলিসের কথামত বলতে লাগল) মহারাজ, আপনার কামনার এই ব্যাকুলতাকে সংযত করতে হবে প্রথমে। প্রথমে এইসব উৎসব আনন্দ বন্ধ করতে হবে। এর দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না।

প্রথমে আত্মস্থ হতে হবে আমাদের। উচ্চ বস্তু নীচু জায়গা থেকেই পাওয়া যাবে। কিছু ভাল পেতে হলে ভাল হতে হবে। আনন্দ লাভ করতে হলে প্রথমে রক্তের উদ্দামতাকে সংযত করতে হবে। মদ পেতে হলে আঙুর পিষতে হবে। অলৌকিক কোন ফল পেতে হলে আগে বিশ্বাসকে অটল করতে হবে।

সম্রাট: ঠিক আছে, উৎসব শেষ হবে আসছে বুধবার। ঐদিন সব আনন্দোৎসবের শেষ। তবে তার আগে আমরা বিজয় উৎসব পালন করব।

(বাদ্য ও সকলের প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস: ভাগ্যের সঙ্গে সদ্‌গুণের সম্পর্ক কত নিবিড়। এই বোকাগুলোর মাথায় এ কথাটা কিছুতেই ঢোকে না।

তৃতীয় দৃশ্য

কতকগুলি কক্ষসমন্বিত এক প্রশস্ত হলঘর

(উৎসব ও মুখোসনৃত্যের জন্য সাজানো)

প্রহরী: ভেবো না, আমাদের এই জার্মান দেশে এসে তোমাদের মত ভাঁড়দের মৃত্যু হবে। আমাদের সম্রাট আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে রোমে অভিযান করে যে বিজয়গৌরব লাভ করেছেন এ উৎসব তারই জন্য। আজ আমরা সকলে নবজাত শিশুর মত চঞ্চল নিরুদ্বেগ। আজ হাজার হাজার নরনারী মত্ত হয়ে উঠেছে এ উৎসবে। সমস্ত পৃথিবীটাই মনে হচ্ছে যেন নির্বোধদের আড্ডাখানা।

উদ্যানবালিকারা

(ম্যাণ্ডোলিনসহযোগে গান)

আজ আমরা এই উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে
অর্জন করছি তোমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির প্রশংসা।
জার্মানদেশের রাজদরবারে আমাদের দেখে মনে হচ্ছে
আমরা যেন ফ্লোরেন্সের বালিকা।
আমাদের বাদামী চুলের উপর ফুলের গয়না
পরি আমরা আর বাঁধি রেশমী ফিতে
বসন্তের বিচিত্র ফুল দিয়ে যে মালা আমরা গাঁথি

সেই মালাগাঁথার কারুকার্য দেখেই বুঝতে পারবে আমাদের গুণ।
প্রতিটি রঙের ফুল ঠিক ঠিক জায়গায় বসেছে।
সব মিলিয়ে তোমাদের আনন্দ দান করবে।
আমরা সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা উদ্যানবালিকা
হালকা খুশির হাওয়ায় ভরা আমাদের বুক
নারী হয়েও আমরা কলাকুশলিনী।

প্রহরী : হে উদ্যানবালিকারা, হাতে ও গলায় ফুলের গয়না পরে যে সব ফুলের ঝুরি মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছ তা একবার দেখতে দাও।

উদ্যানবালিকারা : এ ফুল বিক্রির জন্য নয়। যারা শুধু ফুল দেখে আনন্দ পায় তারাই ফুলের প্রকৃত মানে কি তা জানে।

ফলবতী অলিভশাখা : আমি ফুলে লোভ করি না। যে কোন ধরনের বিরোধ আমি এড়িয়ে চলতে চাই। সব দেশে আমি শান্তির প্রতীক। আজ এই উৎসবের দিনে যোগ্য ব্যক্তির মাথাকে শোভিত করতে চাই আমি।

অন্যান্য ফুলেরা : আমরা প্রকৃতির কন্যা। আমাদের উজ্জ্বল রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ওঠে অজস্র মানুষের চক্ষু।

গোলাপের কুঁড়ি : যারা আমাদের প্রথম দেখতে পায় তারাই ভাগ্যবান। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের কুঁড়িরা ফুটে ওঠে দিকে দিকে। কে এমন মনোহর দৃশ্য উপভোগ করতে না চায় ? এইসব ফুলেদের দেশে এসে কে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারকে রুদ্ধ ও সংযত করে রেখে দিতে পারে ?

(সবুজ পাতা আর ঘাসের উপর ঝুরি নামিয়ে উদ্যানবালিকারা তাদের ফুল দেখাতে লাগল)

মালীরা

(বাদ্যসহ গান)

ফুলের কুঁড়িগুলি কেমন ফুটে উঠছে আপনা হতে ;
সেই সব ফুল শোভা পাচ্ছে তোমাদের মাথায়
তাদের দেখে ফলের কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে।
গোলাপ যাম, পীচ কত সব উজ্জ্বল ফলের মুখ।
গোলাপ ফুল নিয়ে কবিতা লেখা যায়,
কিন্তু পাকা সুস্বাদু ফল খাওয়ার আনন্দও কম নয়।
ফুলের সঙ্গে পাকা ফল যেমন ভাল লাগে

তেমনি তোমাদের ফুলকুসুমিত যৌবনসৌন্দর্যের
সঙ্গে আমাদের মিলিত হতে দাও।
ফুল পাতা, ফল, কুঁড়ি সব মিলিত
হোক একসঙ্গে।

(গান করতে করতে সকলে আপন আপন ফুল ফলের পশরা দেখাতে লাগল দর্শকদের)

মাতা ও কন্যা

মাতা : হে কুমারী, তুমি যখন প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে তখন তোমার দেহটা কত নরম আর তুলতুলে ছিল। তোমার গায়ের রংটা ছিল সাদা ধবধবে। আমি তোমাকে কত আদরের সঙ্গে পালন করতাম। ভাবতাম বড় হয়ে তুমি কোন ধনী লোকের ছেলের প্রেমে পড়বে, তার স্ত্রী হবে। কিন্তু হায়, কত বছর বৃথাই কেটে গেল। কেউ তোমার প্রেমে পড়ল না। মাঝে মাঝে এক একজন এসে নাচতে চায় তোমার সঙ্গে আবার কেউ চকিত দৃষ্টি হানে তোমার দিকে। কিন্তু তোমার আপন প্রেমিক আজও খুঁজে পাওনি তুমি। কত উৎসবে ও নাচগানের আসরে নিয়ে গিয়েছি তোমায় তোমার প্রেমিকের আশায় কিন্তু কোন ফল হয়নি। হে সুন্দরী, দেখ কোন মনের মানুষ পাও কি না।

(অন্যান্য সুন্দরী কুমারীরা সমবেত হলো খেলার ছলে)

কাঠুরিয়াগণ : তোমাদের আনন্দোৎসবে আমাদের যোগদান করতে দাও। আমরা গাছ কাটি। আমরা কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গাছ না কাটলে তোমরা শীতে জমে যেতে।

অলস ব্যক্তিরা : তোমরা হচ্ছ নির্বোধ। আমরা সুখী, কারণ আমাদের কোন বোঝা বইতে হয় না। আমরা বাজার দিয়ে বেড়াতে যাই। সব সময় আনন্দ করে ঘুরে বেড়াই।

মাতাল : আজ আর কোন বিষাদের কথা নয়। আজ শুধু গান আর আনন্দ। আজ আমি প্রাণ খুলে বলব মনের কথা। আমি গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেয়ে যাই। গ্লাসের ঠুংঠাং বাজনা শুনি। আমার স্ত্রী মদ খেতে কত নিষেধ করে। কত বকে আমায় তবু আমি মদ খেয়ে যাই। হোটেলের মালিক আমাদের মদ না দিলে মালিকপত্নী দেবে আর মালিকপত্নী না দিলে তার ঝি দেবে।. আমরা সব সময় খুঁজে বেড়াই শুধু আনন্দ আর তামাশা।

এখানেই আমায় এখন শুয়ে পড়তে দাও, কারণ আর আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

কোরাস: সবাই আপন আপন আসনে বসে যে যত পার মদ খেয়ে যাও।

(প্রহরী প্রতিযোগী কবিদের আহ্বান জানাতেই গ্রাম্য কবি, সভা কবি ও চারণকবির দল এসে কয়েকছত্র করে কবিতা বলেই চলে গেল)

হাস্যরসের কবি: তোমরা জান কি, কি ধরনের কবিতা আমি ভালবাসি ? আমি যদি কবিতা পাঠ করি অথবা গান হিসাবে গাই তাহলে কেউ তা শুনতে চাইবে না।

(প্রহরী এবার গ্রীক পুরাণের চরিত্রদের ডাকল যারা আধুনিক কালেও তাদের মূল প্রকৃতি ও মনোহারিণী ক্ষমতা হারায়নি)

এ্যাগ্লাতা: বিবিধ গুণাবলীসহ বেঁচে থাকাই প্রকৃত বেঁচে থাকা। যারা তা পারে আমরা তাদের আশীর্বাদ করি। সুতরাং দানশীলতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত করো নিজেদের।

হেজিমনি: গ্রহণকালেও উদার হবে।

ইউফোসিনে: তোমাদের চিন্তাও হবে মুক্ত এবং উদার।

এ্যাট্রপস: আমি সবচেয়ে বয়সে বড়। আমাকে সুতো কাটতে ডাকা হয়েছে। ডাকা হয়েছে জীবনের সুতো যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে। সেইদিন থেকে প্রয়োজন হয়েছে চিন্তা আর ধ্যান ধারণার। আমার হাত থেকে সুতোগুলো নিয়ে আরও সরু করো। যদি তোমরা শুধু আনন্দের পিছনে মত্ত হয়ে ছুটে চল তাহলে বুঝে রাখবে, এই জীবনের সুতো অনন্তকাল ধরে প্রসারিত থাকবে না। তা একদিন ছিঁড়ে যাবেই।

ক্লোদো: মানুষ আমাদের আদিম পিতার কথা ঠিকমত শোনেনি বলে আমাকে আগে কত আলগা পশম পরতে হয়েছে। কত সুখের স্বপ্ন ও আশার জাল বুনে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছে মানুষ। প্রথম প্রথম আমিও অনেক ভুল করেছি। কিন্তু আজ আমি আত্মস্থ ও সংযত হয়ে এই স্থানটিকে বেছে নিয়েছি।

ল্যাচেসিস: আমার কাছে দক্ষতা ও কৌশলটাই বড় কথা। তাড়াতাড়ি করে কোন কাজ খারাপ করতে চাই না আমি। কত সুতো আসছে। আমি সেগুলোকে ঠিকমত জায়গায় স্থাপিত করি। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে আর আমি কালের সুতো দিয়ে এক অন্তহীন শৃংখল বুনে

চলেছি।

প্রহরী : এবার যারা আসছে তোমরা তাদের চিনতে পারবে না। তাদের নাম কোথাও শোননি বা পড়নি। তাদের দেখতে আপাতদৃষ্টিতে এমন ভাল যে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা না জানিয়ে পারবে না। তারা হচ্ছে রিপুর দল। সুন্দরী তরুণী। কিন্তু আলাপ পরিচয় করলেই বুঝতে পারবে তাদের চরিত্র কেমন সাপের মত কুটিল। তবে তারা ঘৃণ্য হলেও একটা গুণ আছে। আজ এই আনন্দের দিনেও অন্যান্যদের মত তারা কোন আনন্দ উল্লাস বা যশ মান চায় না। তারা শুধু দুঃখ চায়।

এ্যালেকটো : আমাদের বিশ্বাস করতে পার তোমরা। আমরা সুন্দরী তরুণী। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ প্রেম করে আঘাত পাও তাহলে তার কানে আমরা এমন মন্ত্র দেব যাতে সে বলতে বাধ্য হবে তার প্রেমিকা একটা বাজে মেয়ে। আমার প্রেমিকাদের মনকেও আমরা বিষিয়ে দিতে পারি। এই ত এক সপ্তা আগে একজন প্রেমিক স্পষ্ট বলল, তার প্রেমিকা একটা ঘৃণ্য জীব। এইভাবে তাদের মধ্যে এনে দিই বিচ্ছেদ আর বিতৃষ্ণা। জোড়াতালি দিয়ে মিলন হলেও ঝগড়া লেগেই আছে।

থেগেরা : বিবাহের বন্ধনে প্রেমিকরা একবার আবদ্ধ হলেই আমি চলে যাই সেখানে। খেয়ালী মানুষের মনকে করে তুলি আরও খামখেয়ালী। সে তখন ভালকে ছেড়ে আরও ভাল চায়। সূর্যের আলো আর তাপ ছেড়ে তুষারকে কামনা করে। এইভাবে সুখ ছেড়ে দুঃখকে ডেকে আনে জীবনে। এইভাবে আমি ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন করে চলি মানুষের মধ্যে।

টিসফোনে : বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি বিধান করাই হলো আমার কাজ। আমার একমাত্র কথা হলো প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসা। আমার হাতে কোন ক্ষমা নেই। আমি তাদের পানপাত্রে বিষ ঢেলে মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটাই।

প্রহরী : এখন দয়া করে সরে দাঁড়াও। এখন যারা আসছে তাদের সঙ্গে তোমাদের কোন মিল নেই। একটা পাহাড়ের মত জন্তু এগিয়ে আসছে জনতার মধ্যে। জন্তুটার মুখে সাপের মত একটা শুঁড়। তার পিঠের উপর একটা শীর্ণকায়া মেয়ে বসে আছে। সেই মেয়েটার পিছনে এক সুদর্শন যুবাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে আর দুদিকে আছে দুটি মেয়ে। একটি বিষন্নমুখ আর একটি হর্ষোৎফুল্ল। একজন স্বাধীনতা চায় আর অন্যজন নিজেকে স্বাধীন মনে করে।

ভয় : যদিও এই উৎসব-রজনীতে চারদিকে ধূমায়িত মশাল আর বাতি

জলছে, যদিও উল্লাসে মত্ত দেখছি প্রতিটি মুখ তথাপি আজ এক অচ্ছেদ্য কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ। তোমরা সবাই এখন হাস্যাস্পদভাবে আনন্দোন্মত্ত। কিন্তু বুঝছ না, তোমাদের প্রত্যেকেরই শত্রু আছে, নির্মম শত্রু ওৎ পেতে বসে আছে প্রত্যেকের জন্য। এখানে আমার শত্রু মিত্র সবাই সমান। সবাই আমার ক্ষতি করার জন্য ব্যস্ত। তবু আমি মুখোসের অন্তরালে প্রত্যেকের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারি। একজন আমায় হত্যা করতে চেয়েছিল। আমি বুঝতে পারায় সে এখন পালিয়ে গেছে। আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যেদিকে পাই ঘুরে বেড়াই। তবে আমার মন থেকে ভয় আর যায় না।

আশা: হে আমার প্রিয় ভগিনীগণ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করো। তোমরা এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করলেও জানি তোমরা শুধু ভাবছ ভবিষ্যতের কথা। আমরা কিন্তু আজকের এই আলোকোজ্জ্বল উৎসবরাত্রিতে আমাদের আকাঙ্খিত আনন্দ না পেলেও আশা ছাড়ি না। ভবিষ্যতে একদিন সে আনন্দ পাবই। জীবনে কোন দুঃখই আমাদের হতোদ্যম করতে পারে না। আমরা শুধু আরো কিছু ভালর জন্য সংগ্রাম করি, চেষ্টা করি। শ্রম আর বিশ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের কর্মব্যস্ত জীবন। আমাদের কাম্য ধন আজ না পেলেও জীবনে একদিন পাবই।

বিজ্ঞতা: এই ভয় আর আশা হলো মানবজীবনের দুটি সবচেয়ে বড় শত্রু। আমি হচ্ছি তাদের প্রভু এবং তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখি। আমি অনেকের জীবন চালনা করি। তাদের ধাপে ধাপে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে নিয়ে যাই। সেখানে উজ্জ্বল এক জ্যোতির্মণ্ডলে পরিবৃত হয়ে জয়ের দেবী বসে আছেন।

শয়তান: তোমরা সবাই খারাপ। কোথায় জয়ের দেবী? সে ভেবেছে তার তুষারশুভ্র পাখা দিয়ে সারা পৃথিবী উড়ে বেড়াবে। ভেবেছে সব লোক তার দাস। কিন্তু যেখানে যে কোন লোক লাভ করে খ্যাতি বা জয়ের গৌরব আমি সেখানে ছুটে যাই। ছোটকে নিচু থেকে তোলা ও বড়কে উঁচু থেকে নামানোই আমার কাজ। বাঁকাকে সোজা ও সোজাকে বাঁকা করেই আনন্দ পাই আমি।

প্রহরী: হীন পথকুকুর কোথাকার! তোমাকে শায়েস্তা করছি দাঁড়াও। এই যে ডিমের মত যে জিনিস গড়িয়ে যাচ্ছে টেবিলে এর থেকে দুটো বাঁদরের মত জীব বার হয়ে তোমাকে ঘায়েল করবে।

জনতা: চলে এস, এ নাচের আসরে থেকে আর লাভ নেই। যত ভূত

এসে মাটি করে দিল উৎসবটাকে। কি যেন আমার চুলের পাশ দিয়ে চলে গেল। কি যেন আমার পায়ের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি তাতে আঘাত না পেলেও দারুণ ভয় পেয়ে গেছি।

প্রহরী : যেহেতু আমি প্রহরী, এই আসরের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই কাজ, আমি তাই অতন্দ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছি যাতে কোন শয়তান এই আনন্দানুষ্ঠানে প্রবেশ করে তোমাদের সব উল্লাস নষ্ট করে না দেয়। যদিও আমি ভয় করি না কোন কিছুতে, তবু আমার মনে হয় কোন ভূতুড়ে বস্তু প্রবেশ করেছে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সতর্কতা সত্ত্বেও। প্রথমে বামনের মত এক জীব ঢোকে। পরে একটা বিরাট দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমরা দেখ কিছু বুঝতে পার কি না। চার ঘোড়ায় টানা এক আশ্চর্য রথে চেপে এক বালক আসছে। সে রথের চারদিকে বিচিত্র বর্ণের নক্ষত্র কিরণ দিচ্ছে। সেগুলো ঠিক ম্যাজিক লণ্ঠনের মত দেখাচ্ছে। এত শব্দ হচ্ছে সে রথের, অথচ জনতারা কেউ তা শুনতে পাচ্ছে না।

বালক সারথি : হে অশ্বগণ, থাম। আমার আদেশ, তোমাদের গতিবেগ সংযত করো। বল্গার নির্দেশ মেনে চল। আমি নির্দেশ দিলেই আবার যাত্রা শুরু করবে। শোন প্রহরী, তুমি এসে বলে দাও এখানে খ্যাতিমান গৌরবময় কে কে আছে। আমি তাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

প্রহরী : না, তা পারি না; কারণ তোমার নাম আমি জানি না।

বালক সারথি : তবু চেষ্টা করে দেখ।

প্রহরী : আপাতদৃষ্টিতে তোমাকে দেখে সুন্দর এক তরুণ যুবক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে অর্ধপরিণত এক যুবক, এখনো নারীসুলভ স্বভাব ঘোচে নি তোমার। মনে হচ্ছে চপলমতি এক চটুল প্রেমিক যে তার পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নূতন একজনের সন্ধান করছে।

বালক : বলে যাও, খুব ভাল লাগছে। এ রহস্যের সমাধান তুমিই করবে।

প্রহরী : তোমার ভ্রমরকৃষ্ণ চোখে বিদ্যুতের ঝলক। মাথায় নারীসুলভ কেশপাশে কৃষ্ণাভ দীপ্তি। তোমার আজানুলম্বিত পোষাকে বিচিত্র ফুলের কারুকার্য। তোমাকে দেখে কোন কুমারী মেয়ের মত মনে হয়। যদিও অবশ্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়লে সে তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেবে।

বালক সারথি : আর যে জ্যোতির্ময় পুরুষ রথোপরি সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন?

প্রহরী : ওকে দেখে মনে হবে স্বর্গলোকের রাজা। ওর কৃপা যারা লাভ করতে পেরেছে তারা সত্যই ভাগ্যবান। তাঁর যেন পাবার বা চাইবার কিছুই নেই। তিনি পরম পূর্ণ পুরুষ। তাঁদের চোখের সামান্য পলকপাতে সব অভাব সব অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে যায়। এক পরম পাওয়ার উল্লাস সব চাওয়ার আর্তিকে ভুলিয়ে দেয়।

বালক সারথি : সব কথা বলতে সাহস করছ না। আমি বলছি পরিপূর্ণ ভাবে তার রূপ বর্ণনা করো।

প্রহরী : আমি শুধু তাঁর মর্যাদা ও মহিমার কথা বলিনি। মাথায় পাগড়ীর নিচে উজ্জ্বল দুটি গণ্ডসমন্বিত মুখে পূর্ণচন্দ্রের প্রভা বিরাজ করছে। তার উপর তাঁর পোষাকের ঔজ্জ্বল্য। কি বর্ণনা করব। নিশ্চয় তিনি কোন রাজাধিরাজ।

বালক সারথি : উনি হচ্ছেন স্বর্ণ ও সম্পদের দেবতা প্লুটাস। সম্রাটের অনুরোধক্রমে উনি এসেছেন আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে।

প্রহরী : এ বিষয়ে যা জান বল আমায়।

বালক সারথি : আমি হচ্ছি আবেগ, আমি হচ্ছি কাব্য। আমি হচ্ছি কবি যে পার্থিব কোন সম্পদ গ্রাহ্য করে না। অথচ যার অন্তর সব সময় আপন অপরিমেয় সম্পদে পরিপূর্ণ। প্লুটাসের মত আমিও সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমি আমার কাব্যকলার দ্বারা তার ভোজসভাকে অলঙ্কৃত করি। তার সব অভাব পূরণ করি।

প্রহরী : শুধু মুখে বড়াই করলে হবে না। তোমার কাব্যকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় দাও।

বালক সারথি : (হাতের আঙুল নেড়ে) এই দেখ, আমি আমার আঙুলগুলো নাড়ছি, আর কত রকমের রঙীন আলো বেরিয়ে আসছে। কত মণিমুক্তাখচিত অঙ্গুরীয় আর অবতংস ঝরে পড়ছে আমার আঙুল থেকে। এইভাবে আলোকপাত ছড়িয়ে দিতে পারি প্রয়োজন হলে।

প্রহরী : জনতা কত ব্যাকুলভাবে এই সব মণিমুক্তো পাবার জন্য চেষ্টা করছে।

তারা দাতার চারদিকে ভিড় করে ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করছে। স্বপ্নদৃষ্ট অলীক বস্তুর মত তারা ঐ সব ধরার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। এই সব মণিমুক্তো ধরতে না ধরতে তাদের হাত থেকে উড়ে যাচ্ছে। মণিমুক্তো

মত রঙীন প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াচ্ছে তাদের চারপাশে।

বালক সারথি : তুমি তোমার কাজ করো। দেখে মনে হচ্ছে তুমি যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি ঝগড়া করতে চাই না। আমার প্রধানের কাছে যা বলার বল। (প্লুটাসের প্রতি) বল হে স্বর্গদেবতা, তুমি কি আমার উপর বিশ্বাস রেখে এই রথচালনা ও রথাশ্বের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করার ভার দাওনি? তোমার কথামতই আমি থেমেছি। আমি যে যুদ্ধে তোমাকে সাহায্য করেছি সে যুদ্ধে সহজ হয়েছে তোমার জয়। আমি অলঙ্কৃত করে তুলেছি তোমার জয়ের মালাকে।

প্লুটাস : সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন হলে আমি সানন্দে বলব তুমি হচ্ছ আমার আত্মার আত্মীয়। তোমার কলানৈপুণ্য সত্যিই বড় অদ্ভুত। তোমার কাব্যকলার খাতিরেই আমি আমার স্বর্ণমুকুটের থেকে সবুজ বৃক্ষশাখাকে বড় মনে করি। সকলের কাছে আমি জোর গলায় শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমি তোমার সাহচর্যে বিশেষ আনন্দ পাই।

বালক সারথি : মণিমুক্তাসদৃশ যে সম্পদ আমি আমার চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি তা হচ্ছে আমার শুধু উজ্জ্বল কথার ফুলঝুরি। কিন্তু তার উজ্জ্বলতা কত ক্ষণস্থায়ী। সে আলো অনেকের চোখে ধরা পড়তে না পড়তেই আঁধারে পরিণত হয়।

নারীদের কথাবার্তা

রথের উপর যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে তার পিছনে ভাঁড়ের মত যে লোকটা রয়েছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সে কৃশকায় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে তার গায়ে হাড়ের উপর শুধু চামড়া ঢাকা আছে, মাংস নেই।

অর্থলোভ : হে নারীগণ, তোমরা বড় বিতৃষ্ণাজনক। আমি যেখানেই যাই তোমরাও সেখানে যাও। আমি যে মিতব্যয়িতাকে ভালবাসি তোমরা সেটাকে দোষ ভাব। টাকার থেকে তোমাদের কামনা বাসনার পরিমাণ বেশী। তোমরা তোমাদের দেহ ও প্রেমিকদের পিছনে অযথা টাকা খরচ করে তোমাদের স্বামীদের ঋণগ্রস্ত করে তোল। খাদ্য ও পানীয় তোমাদের কাছে বিলাসিতা।

নারীদের নেত্রী : ড্রাগনের মতই ভয়ঙ্কর। জনতাকে অনুপ্রাণিত করতে এসে বড় গোলমাল বাধাচ্ছে।

নারী জনতা : ওকে রথের উপর থেকে নামিয়ে দাও। ও ভেবেছে ওর

কুৎসিত মুখ দেখে আমরা ভয় পাব। ওর লম্বা লম্বা কথার জন্য ওকে দুঃখভোগ করতে হবে।

প্রহরী: আমি আমার এই যাদুকাঠি ছুঁয়ে বলছি, সব স্থির হয়ে থাক। কেউ নড়বে না। আমার সাহায্যের অবশ্য কোন দরকার নেই। দেখ দেখ, কেমন করে সর্পাকৃতি ড্রাগনগুলো গলায় জ্বলন্ত আগুন নিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। ওদের জন্য জনতার অনেকেই চলে গেছে। এখন ঘর ফাঁকা।

(প্লুটাস রথ থেকে নেমে এলেন)

প্রহরী: কেমন রাজার মত উনি রথ হতে নেমে আসছেন। ওঁর সামান্য অঙ্গুলিহেলনে ড্রাগনগুলো সরে যাচ্ছে। এবার ওঁর পায়ের কাছে যে সোনা-ভর্তি সিন্দুকটা রয়েছে সেটা নিয়ে এস। সোনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থলোভও বেড়ে যাবে।

প্লুটাস: (সারথিকে) তুমি এবার তোমার উপর একান্তভাবে ন্যস্ত বোঝা-ভার হতে মুক্ত। এখন তুমি তোমার আপন জগতে ফিরে যাও। এখানে যত সব বিকৃত জীবনের ছবি ভিড় করে আসছে চারদিকে। এমন কোন নির্জন স্থানে চলে যাও তুমি যেখানে সৌন্দর্য এবং সততা অবাধে কাজ করে যায়। সেখানে গিয়ে তুমি তোমার নূতন জগৎ গড়ে তোল। নূতন জীবন শুরু করো।

বালক সারথি: তাহলে আপনার দৌত্যকার্যে আমি সফল হয়েছি। আমি আপনাকে আপন আত্মীয় ভেবে ভালবাসি। আপনি যেখানেই যান চারদিক সম্পদের প্রাচুর্যে ভরে যায়। আর আমি যেখানে যাই সেখানে আমাদের দু'জনের মধ্যে মানুষ কাকে বেছে নেবে তাই নিয়ে সংশয়ের দোলায় দুলতে থাকে। আপনার না আমার কার কৃপা লাভ করবে তা ঠিক করতে না পারায় অসঙ্গতিতে ভরে ওঠে তাদের জীবন। আপনার অনুসরণকারীরা সাধারণতঃ অলস হয় আর আমার অনুসরণকারী কর্মঠ হয়। আমি যা করি প্রকাশ্যেই করি। আমার কিছু গোপন থাকে না, কোন কথা অব্যক্ত থাকে না। আপনি আমায় যথেষ্ট সুখ ও সম্পদ দান করেছেন। আবার ডাকলেই আসব। এখন চলি।

(প্রস্থান)

প্লুটাস: এবার সিন্দুকটা থেকে মূল্যবান ধাতুটাকে বার করতে হবে। প্রহরীর যাদুকাঠি দিয়ে সিন্দুকের তলায় আঘাত করলেই মুখটা খুলে যাবে। দেখ, দেখ, একটা লোহার কেটলিতে যেন গলন্ত সোনা জলের মত ফুটছে, আর

মুকুট আংটি প্রভৃতি যত সব অলঙ্কার ও মণি-মাণিক্য তাতে সব গলে যাচ্ছে।

জনতার চিৎকার : দেখ দেখ, সোনাগুলো সব গলে গিয়ে সিন্দুকটা উপচে পড়ছে। সব ফুটছে। সোনা টাকা সব। আমাদের অন্তর লাফাচ্ছে। আমাদের কামনা বাসনাগুলো সব যেন ঘুরপাক খেতে খেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে ধূলোয়। একটু থাম, ঠাণ্ডা হোক। সবাই পাবে। ধনী হয়ে যাবে। সিন্দুক খালি করে আমরা সব নিয়ে নেব।

প্রহরী : যত সব বোকা কোথাকার! কি ভাবছ তোমরা? তোমাদের কামনা বাসনাকে আজ সংযত করো। এ হচ্ছে উৎসবের মজা, এক বিভ্রান্তিকর মায়ার ছলনা। ভেবেছ এই সব সোনা তোমাদের দেব? এ হচ্ছে এক মজার ঠাট্টা। একটু পরে বুঝবে নগ্ন সত্য কাকে বলে। তোমাদের কাছে সত্যের কীই বা দাম আছে? যত সব মায়া চারদিকে ঘিরে আছে তোমাদের। হে মুখোসধারী স্বর্ণদেবতা প্লুটাস, আত্মপ্রকাশ করে এই জনতাকে অপসারিত করো।

প্লুটাস : তোমার যাদুকাঠিটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সক্ষম। একবার দাও জলন্ত আগুনে পুড়িয়ে নিই। দেখছ তোমরা। কাঠিটা কেমন গরম আগুন হয়ে উঠছে। যে আমার কাছে আসবে তাকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারব। এবার আমি এই যাদুকাঠি নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াব।

জনতার চিৎকার : হায়, হায়! আমরা গেলাম। কোন পরিত্রাণ নেই। পালাও পালাও। সরে যাও, পথ করে দাও। আমার চোখে আগুনের ফুলিঙ্গ লাগছে। জলন্ত যাদুকাঠিটা আমার ঘাড়ের উপর পড়ছে। নির্বোধ জনতা পালাও। আমার পাখা থাকলে আমি উড়ে যেতাম।

প্লুটাস : আগুনের ভয়ে সব পালিয়ে গেছে। কেউ অবশ্য পোড়ে নি। আর শান্তি শৃঙ্খলার জন্য একটি অদৃশ্য অংশ আমি বার করছি।

প্রহরী : আজ রাত্রিতে আপনি খুব একটা বড় কাজ করেছেন। আপনার জ্ঞান ও শক্তিমত্তার জন্য ধন্যবাদ।

প্লুটাস : ধৈর্য ধারণ করো বন্ধু। এখনো অনেক গোলমাল বাকি আছে।

অর্থলোভ : জনতার সামনে আছে নারীরা। আমার ইন্দ্রিয়চেতনা এখনো মরচেপড়া লোহার মত ভোঁতা হয়ে যায় নি। সুন্দরী নারী আজও মোহ জাগায় আমার মনে। যেহেতু আজ কোন টাকা পয়সা লাগবে না,

আজ আমি যে কোন নারীকে প্রেম নিবেদন করতে পারি। কিন্তু এই ভিড়ের মাঝে কেউ কারো কথা শুনতে পাবে না। তাই আমাকে মূকাভিনয়ের মাধ্যমে আমার কথা ব্যক্ত করতে হবে। শুধু অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কাজ হবে না। আমাকে আর এক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কাদার মত একতাল গলা সোনা আমি নিয়ে নেব, পরে ইচ্ছামত সেটাকে যে কোন রূপ দান করব।

প্রহরী : ঐ নির্বোধ অনশনক্লিষ্ট শীর্ণকায় লোকটা আবার কি মজা করছে? সে একতাল নরম সোনা নিয়ে সেটাকে ঘাঁটতে ঘাঁটতে মেয়েদের দিকে যাচ্ছে। আর মেয়েরা চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে। মেয়েরা ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। তবু বোকাটা থামছে না। সকলের শালীনতা নষ্ট করেই যেন ও আনন্দ পাচ্ছে। আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না। আমার যাদুকাঠিটা দাও, এর প্রতিবিধান করতে হবে।

প্লুটাস : ওকে এখন একা থাকতে দাও, বহিরাগত বিপদের আভাস এখনো পায়নি। ওর নির্বুদ্ধিতার কাল শেষ হয়ে আসছে। আইনের অমোঘ বিধান ওকে মানতেই হবে।

গোলমাল ও গান : হে তুষারঝড়, দূর পর্বতশৃঙ্গ ও অরণ্যাচ্ছাদিত উপত্যকাপ্রদেশ হতে দুর্বার বেগে ছুটে এস প্রমত্ত গর্জনে। ছুটে এস নির্মম নিয়তির মত। অবাধে প্রদর্শন করো তোমাদের অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা। তোমাদের গতিপথ কেউ নির্ণয় করতে পারে না আগে হতে।

প্লুটাস : আমি তোমাদের ও তোমাদের অতিপ্রাকৃত দেবতা প্যানকে চিনি। তোমাদের যথাকর্তব্য পালন করেছ। এখানে আরো অনেক বিস্ময়কর জিনিস ঘটার আছে। কিন্তু জনতা যে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। কারণ তাদের দূরদৃষ্টি নেই। সামনে কি আছে তা দেখতে জানে না।

গান

জনতা এমনিই হয়। এমন অপরিণামদর্শিতার সঙ্গে তারা আসে আর যায়। ঝড়ের বেগে আসে। ঝড়ের বেগে চলে যায়।

গ্রাম্য দেবদেবী : হে গ্রাম্য দেবদেবীরা, তোমরা মাথায় ওক পাতার মুকুট পরে জোড়ায় জোড়ায় নাচতে এস। তোমাদের মোটা নাক, চওড়া ও থ্যাবড়া মুখ মেয়েদের খুব একটা অপছন্দ হবে না।

হাস্যরস : এই দেখ হাস্যরসের পিছনে ছাগলের মত সরু সরু পা নিয়ে কারা আসছে। তারা পাহাড়ের উপরে একা একা থাকতে ভালবাসে।

ঘরসংসার বা ছেলে পরিবার ভালবাসে না। তারা বলে তারাই একমাত্র পূতচরিত্র ঊর্ধ্ব জগতের মানুষ, সবকিছু থেকে মুক্ত।

মাটির দেবতা : জোনাকির ঝাঁকের মত লণ্ঠন হাতে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। চারদিকে এখানে সেখানে ভিড় করছে। তারা কিন্তু জোড়া জোড়া নেই। সব একা একা আপন স্বার্থের তাড়নায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা কিন্তু একমাত্র ভাল বা সৎ মানুষের বন্ধু। পাহাড়ের পাথর থেকে আমরা মূল্যবান ধাতু বার করি। আমাদের ভাণ্ডারেই আছে সেই সোনারখনি যার জন্য লুণ্ঠন মারামারি ও কাড়াকাড়ি করে। যে লোহার দ্বারা নির্মিত অস্ত্র দিয়ে পৃথিবীর মানুষ খুনোখুনি করে সেই লোহাও আমাদের ভাণ্ডারেই আছে। আমাদের ধৈর্য অসাধারণ। মানুষের অসদাচরণে আমরা কখনো ধৈর্য হারাই না।

দৈত্যগণ : ওরা হচ্ছে অরণ্যচারী দৈত্যাকার মানুষ। হাতে ঝাউগাছের গুঁড়ি নিয়ে আসছে। পরণে শুধু গাছের পাতা।

জলপরীদের কোরাস : (প্যানের চারদিকে ভিড় করে) আমরা জানি পৃথিবীর যে অংশ প্রকৃতির দেবতা শক্তিশালী প্যানের অধীনে তার পরিমাণ বিশাল। তোমাদের মধ্যে যারা নৃত্যপটু তারা তাঁর কাছে গিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকলা প্রদর্শন করো। তিনি দয়ালু, তিনি চান আমরা সকলে মিলে হাসিখুশির সঙ্গে বাস করি মুক্ত আকাশের তলে। তিনি সব সময় অতন্দ্র দৃষ্টিতে জেগে থাকেন স্থির হয়ে। অথচ তাঁরই নির্দেশে নদী অন্তহীন কলতানে তাঁকে গান শোনায়। গাছে গাছে পাতার মর্মরধ্বনি ওঠে, বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। পরীরা তাঁর কাছে যেতে সাহস পায় না। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে যখন বজ্রগর্জনে চিৎকার করে ওঠেন তখন চারদিকে সবাই ভয়ে পালিয়ে যায়। বীরপুরুষরাও ভয়ে কাঁপতে থাকে।

মাটির দেবতাদের প্রতিনিধিবৃন্দ : (প্যানের কাছে) যখন তুমি যত সব উজ্জ্বল রত্নসম্ভার ও সম্পদরাশি মানুষের মধ্যে ভাগ করে দাও আমরা তখন অন্ধকার গুহার মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে বাস করি। কিন্তু আমাদের কথা বিশ্বাস করো, এখানে এক আশ্চর্য ঝর্ণাধারা বয়ে চলেছে। এই ঝর্ণাই আমাদের দেবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। কিন্তু তাতে চাই তোমার সক্রিয় সাহায্য। মায়ার আবরণ ছিন্ন করে সে সম্পদ করায়ত্ত করো ও বিশ্বের সকলের উপকার সাধন করো।

প্লুটাস্ (প্রহরীকে) : সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

অপ্রত্যাশিত হলেও যা ঘটার ঘটুক। তোমার সাহস আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ভয়াবহ বস্তু দেখবে তা বিশ্বে কেউ কখনো দেখেনি এর আগে। এর বিবরণ ঠিকমত লিখে রাখবে।

প্রহরী: (প্লুটাসধৃত যাদুকাঠিটি ধরে) বামনাকৃতি মাটির দেবতারা প্রকৃতি-দেবতা প্যানকে সঙ্গে করে সেই মায়াময় ঝর্ণার ধারে নিয়ে যাচ্ছে। তার উপরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। কানায় কানায় ভরা ঝর্ণার জলটা ফুটছে। তার থেকে বুদ্বুদ উঠছে। ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্যান প্রফুল্লচিত্তে সেই ঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে সেটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তিনি যেমন ঝুঁকে পড়ে ঝর্ণার জলধারা দেখতে গেলেন অমনি হঠাৎ তাঁর দাড়িটা থুথনি থেকে খসে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা বুক ও গলার মালায় আগুন ধরে। এইভাবে আনন্দানুষ্ঠান মাটি হয়ে গেল। সবাই তখন সে আগুন নেবাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কেউ তা পারল না। মুখোসধারী সব লোকের মুখে আগুন ধরে গেল। এইভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিন্তু শোন শোন, কি এক দুঃসংবাদ লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দুঃখবৃদ্ধিকারী সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা আগামী কাল জানতে পারবে। সর্বত্র শুনছি এক কথা, আমাদের সম্রাট নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছেন। তার মাথা ও বুক অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। ঈশ্বর করুন এ সংবাদ যেন মিথ্যা হয়। যারা তাঁকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে তারা জাহান্নামে যাক। হে উদ্দাম উদ্ধত যৌবন, তুমি কি এই দুঃখের দিনেও তোমার আনন্দের উচ্ছলতা বন্ধ করবে না, সীমায়িত করবে না? হে আমাদের প্রিয় সর্বশক্তিমান সম্রাট, তুমি কি তোমার স্বভাবসিদ্ধ বিজ্ঞতা সহকারে আমাদের পরিচালিত করবে না? এক সর্বগ্রাসী দাবানলে দগ্ধ হচ্ছে সমস্ত বনভূমি। আগুনের লেলিহান শিখাগুলি তাদের লোলজিহ্বা ঊর্ধ্বে তুলে দিয়ে দাহ্য বস্তুর সন্ধান করছে। আমাদের দুঃখের পাত্র পরিপ্লাবিত, কে জানে কে আমাদের উদ্ধার করবে? আজকের এই রাজকীয় ঐশ্বর্যের পুঞ্জীভূত অহঙ্কার রাত্রি শেষে একরাশ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে থাকবে।

প্লুটাস: যথেষ্ট সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে। এবার সাহায্য দাও ওদের। তোমার জ্যোতির্ময় যাদুকাঠিটি দিয়ে আঘাত করে তোমার পদতলের মাটি কম্পিত করো। হে বাতাস, শীতল কুয়াশার জাল বিস্তার করে এই ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করো। মেঘ হতে জল বর্ষণ করো অগ্নিকাণ্ডের

উপর। হে আর্দ্রতা, অগ্নির লেলিহান শিখাকে প্রশমিত করে গ্রীষ্মের ক্ষয়-ক্ষতিহীন নির্দোষ বিদ্যুতালোকে পরিণত করো। মনে মনে সব মানুষ যখন জব্দ তখন এবার আসল যাদুর খেলা দেখাও। আগুনের খেলা শেষ করো।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রমোদ উদ্যান

প্রভাত সূর্য

সম্রাটের দরবার। সভাসদগণ পরিবৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাটের সম্মুখে ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস নতজানু অবস্থায় উপস্থিত।

ফাউস্ট: হে মহারাজ, আগুন নিয়ে এই খেলার মারাত্মক অপরাধ মার্জনা করুন।

সম্রাট: (ফাউস্টকে উঠে দাঁড়াবার আদেশ দিয়ে) আমি এই খেলা আরও দেখতে চাই। আমি তার মাঝে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি যেন প্লুটোর মত জলন্ত নরকাগ্নির মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। চারদিকে আগুন। আগুনের লেলিহান শিখাগুলো আকাশকে লেহন করতে চাইছিল। সেই আগুনের আলোয় দেখলাম অন্ধকারে অসংখ্য মানুষ প্রতিকারের আশায় আমার কাছে এসে ভিড় করছে। আমাকে প্রথামত অভিবাদন করছে। তাদের মধ্যে অনেক রাজকুমারও ছিলেন। আমি তাদের চিনতে পেরেছি।

মেফিস্টোফেলিস: আপনি প্রকৃতির সকল বস্তুরই রাজা। প্রকৃতির প্রতিটি প্রধান প্রধান উপাদানও আপনার ইচ্ছা ও বিধান মেনে চলবে। অগ্নির আনুগত্যের প্রমাণ এইমাত্র পাওয়া গেছে। এবার দেখবেন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের আনুগত্য। আপনি সমুদ্রের জলরাশির উপর পা রাখতেই দেখবেন জলের এক বিশাল গোলাকৃতি প্রাসাদ গড়ে উঠবে আপনার মাথার উপর। জলের স্তম্ভ ও প্রাচীর দ্বারা নির্মিত সেই প্রাসাদের মধ্যে সুবর্ণ অস্ত্র ধারণ করে ড্রাগন ও হাঙরেরা ভেসে বেড়াচ্ছে। আপনি এই রাজদরবার যতই ভালবাসুন সেই সামুদ্রিক রাজপ্রাসাদ দেখে বিস্মিত হয়ে যাবেন। সেখানে কত সুন্দরী জলপরী আপনার অন্তরকে প্রীত করার জন্য আসবে। আসবে তাদের প্রধানা জলদেবী থেটিস। সে আপনাকে দ্বিতীয় পেলেউস হিসাবে বরণ করে নেবে।

একদিন এইভাবে আপনি অলিম্পাসের সিংহাসনেও বসতে পারেন।

সম্রাট : আমি আমার শূন্য বায়ুমণ্ডল তোমাকে দান করলাম। তুমি হবে তার অধিপতি।

মেফিস্টোফেলিস : সমগ্র পৃথিবী ত আগেই আপনার অধিকারে এসেছে।

সম্রাট : আমাদের পরম সৌভাগ্যবলে তুমি এখানে এসেছ। এই একটি রাত্রির আনন্দ হাজার রাত্রির আনন্দের সমান। তুমি যদি স্কেহেরাজাদের মত কাহিনী বর্ণনায় ওস্তাদ হও তাহলে আমি তোমাকে অনেক বড় পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করব। যত সব দৈনন্দিন জীবনের কথা আমার আর ভাল লাগে না।

প্রধান কর্মচারী : (তাড়াতাড়ি প্রবেশ করল) হে মহারাজ, এক অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ সানন্দে ঘোষণা করছি আপনার নিকট। আমাদের রাজ্য এখন সকল অর্থকষ্ট হতে মুক্ত। এখন এখানে স্বর্গসুখ বিরাজ করবে।

প্রধান সেনাপতি : সৈন্যদের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। নূতন সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

সম্রাট : কি ব্যাপার! তোমাদের সকলের বুক স্ফীত হয়ে উঠেছে আনন্দে। সকলেরই মুখ উজ্জ্বল। সকলেরই পায়ের গতিতে দেখছি এক প্রাণোচ্ছলতা।

কোষাধ্যক্ষ : (প্রবেশ করে) ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন, ওঁরাই এই সব কিছুর জন্য দায়ী।· ওঁরাই এসব করেছেন।

ফাউস্ট : প্রধান প্রশাসককে একথা জানাতে হবে।

প্রধান প্রশাসক : (ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে) অতীতে দেখেছি হঠাৎ কার ভাগ্যের পাতাটা উল্টে গিয়ে কত দুঃখ সুখে পরিণত হয়েছে। এখন দেখছি উল্টো হলো। (পড়তে লাগল) আমার হাতে যে পত্রটি দেখছেন তার দাম হাজার স্বর্ণমুকুটের সমান। এতে আছে সম্রাটের স্বাক্ষর। সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্ত গুপ্তধন উদ্ধার করার ভার একটি লোকের হাতে দিয়ে নিজে সই করেছেন।

সম্রাট : এক বিরাট প্রতারণা। অপরাধ। কে সম্রাটের এই স্বাক্ষর জাল করেছে? এর কোন শাস্তি এখনো দেওয়া হয়নি?

কোষাধ্যক্ষ : স্মরণ করে দেখুন, আপনি গতরাত্রে আপনার এই স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দান করেন। তখন আপনি শক্তিমান প্রকৃতিদেবতারূপে দাঁড়িয়ে

ছিলেন আর প্রধান প্রশাসক আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে মহারাজ, শুধু কলমের ডগা দিয়ে কয়েকটি অক্ষর লিখে জনগণের মঙ্গল করুন। তাদের আনন্দ দান করুন। আপনি তাই একটি পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে যে সব চতুর যাদুকর ছিল আপনার কাছে সেই সই জাল করে হাজার হাজার কাগজের নোট ছাপিয়ে ফেলে। সেই সব নোট এখন শহরে বাজারে সর্বত্র চলছে।

সম্রাট: টাকা বা সোনার পরিবর্তে সেই নোট এখন চলছে? যদি চলে তাহলে ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও আমাকে তা মেনে নিতে হবে।

প্রধান কর্মচারী: দাবানলের মত সেই নোট সব জায়গায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং সোনা ও রূপোর পরিবর্তে মূল্য মান হিসাবে কাজ করছে। যে কোন দোকানে এই নোট ভাঙিয়ে টাকা বা যে কোন জিনিস কেনা যাচ্ছে। অনেক লোক আমোদপ্রমোদ করতে শুরু করে দিয়েছে পান ও ভোজনের মাধ্যমে।

মেফিস্টোফেলিস: নির্জন প্রাসাদশীর্ষে যদি কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী মহিলাকে প্রীত করার প্রয়োজন হয় তাহলে সেখানে আর কাউকে থলেতে করে টাকা বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এই হালকা কাগজের নোট তার হাতে ধরে দিলেই সে মেয়ে প্রীত হবে। কোন যাজক বা সৈনিককে দূরে কোথাও যেতে হলে কোমরের থলে ভর্তি সোনারূপো বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। এই হালকা কাগজের নোট নিয়ে গেলেই যথেষ্ট। এইবার তাহলে মহারাজ বিচার করবেন আমি ভাল করেছি না মন্দ করেছি।

ফাউস্ট: আপনার রাজ্যে এই ভুল মুদ্রাপদ্ধতির ফলে কত সব ধনরত্ন মানুষ মাটিতে গুপ্ত স্থানে পুঁতে রাখত। কেউ বলতে পারত না কার কত সম্পত্তি আছে। অনেক সময় সে সম্পত্তির মালিক নিজেই তা জানত না। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ যে মন প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও সত্য সন্ধানে সক্ষম সে মন একদিন সব গুপ্তধনের পরিমাণও নির্ণয় করবেই।

মেফিস্টোফেলিস: এই সব কাগজের নোট এত হালকা এবং বহন করা সহজ যে মানুষ যে কোন জায়গায় তা বহন করে নিয়ে গিয়ে যে কোন কাজ করতে পারবে। সে তার নিজের সম্পত্তির পরিমাণ বা মূল্য সহজেই নিরূপণ করতে পারবে। তাকে আর কোন পণ্যবস্তু কেনার সময় পণ্য বিনিময়ের ব্যাপারে দরকষাকষি করতে হবে না। এবার থেকে আপনার রাজ্যের দূর প্রান্তেও আপনি যে কোন বস্তু বা অর্থ বা গয়নাপত্র পাঠাতে পারবেন অতি

সহজে।

সম্রাট : তুমি আমাদের রাজ্যকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছ। তার উপযুক্ত পুরস্কার তোমাকে দান করা উচিত। রাজ্যের সমস্ত জমির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর দিলাম। তুমি তা পরীক্ষা করে যেখানে বুঝবে কোন গুপ্তধন আছে সেখানেই সে জায়গা খননের আদেশ দেবে। এইভাবে সব গুপ্তধন মাটির অন্ধকার থেকে প্রকাশের আলোয় নিয়ে আসবে।

কোষাধ্যক্ষ : আমি এই যাদুকরকে আমার সঙ্গে নিলাম। আমাদের মধ্যে কোনদিন কোন বিবাদ দেখা দেবে না। (ফাউস্টের সঙ্গে প্রস্থান)

সম্রাট : এই রাজসভায় উপস্থিত প্রত্যেককেই আমি কিছু করে টাকা দেব। কিন্তু প্রত্যেককেই একে একে স্বীকার করতে হবে সে কি করবে সেই টাকা দিয়ে।

জনৈক ভৃত্য : (টাকা নিয়ে) আমি টাকা নিয়ে ভাল খাওয়া দাওয়া করব। আনন্দ উপভোগ করব।

দ্বিতীয় ভৃত্য : আমি আমার প্রণয়িনীর জন্য কিছু উপহার কিনব।

প্রধান ভৃত্য : আরো বেশী মদ কিনে গলাধঃকরণ করব আমি।

অন্য ভৃত্য : আমার মনে হচ্ছে আমার পকেটে জুয়ার পাশা নড়াচড়া করছে।

নাইট ব্যানীরেট : আমার বাড়ি ও জমি ঋণবন্ধক হতে মুক্ত হবে।

অন্য নাইট : আমার যা সম্পত্তি আছে তার উপর আরও কিছু বাড়াব।

সম্রাট : আমি আশা করেছিলাম টাকা পেয়ে তোমরা সবাই সৎ কাজে বড় কাজে সে টাকা ব্যয় করবে। কিন্তু এখন দেখছি এতে তোমাদের কোন উন্নতি হবে না। যে যেখানে ছিলে সেখানেই থাকবে।

ভাঁড় : (এগিয়ে এসে) সবাইকে টাকা দিচ্ছেন, আমাকে কিছু দিন।

সম্রাট : তুমি ত টাকা পেলেই মদ খাবে।

ভাঁড় : সবাই যাতে টাকা ঢালে আমি তাতে ঢালব না।

সম্রাট : এই নাও টাকা, কুড়িয়ে নাও। (প্রস্থান)

ভাঁড় : পাঁচ হাজার সোনার টাকা। কী অপ্রত্যাশিত!

মেফিস্টোফেলিস : আবার নূতন করে প্রাণ ফিরে পেলে।

ভাঁড় : আমার অবশ্য টাকা আছে, কিন্তু এত টাকা কখনো পাইনি এর আগে।

মেফিস্টোফেলিস : তুমি এত আনন্দ পেয়েছ যে তোমার দেহে ঘাম দিচ্ছে।

ভাঁড় : কিন্তু দেখত, এই নোট দিয়ে টাকার কাজ হবে ত? জায়গা জমি গবাদি পশু কেনা যাবে ত?

মেফিস্টোফেলিস : সব কিনতে পারবে।

ভাঁড় : আজই আমি কিছু জায়গা জমি কিনব। আমি জমিদার হয়ে বসব। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস : বোকা ভাঁড়ের যে বুদ্ধি আছে কে তাতে সন্দেহ করবে?

পঞ্চম দৃশ্য

কোন এক অন্ধকার অলিন্দ

ফাউস্ট ও মেফিস্টোফেলিস

মেফিস্টোফেলিস : এই অন্ধকার অলিন্দে আমার কাছ থেকে কি চাও তুমি? সেই জনবহুল রাজসভায় অনেক কৌতুক করে আনন্দ লাভ করেছ।

ফাউস্ট : ওসব কথা বলো না, ওসব আনন্দ আমি চাই না। এখানে সেখানে বৃথা ঘুরে বেড়িয়ে তুমি শুধু আমার দাবিটাকে এড়িয়ে গেছ। কিন্তু আমার মনে একটা জিনিসের জন্য শান্তি নেই। সম্রাট আদেশ দিয়েছেন হেলেন আর প্যারিসকে তাদের সেই প্রাচীন পোষাকে সজ্জিত করে এখানে হাজির করতে হবে। আমি কথা দিয়েছি আর সে শপথ ভাঙতে পারি না।

মেফিস্টোফেলিস : ভাবনা চিন্তা না করে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

ফাউস্ট : তুমি তোমার ঐন্দ্রজালিক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা যখন প্রয়োগ করেছিলে তার পরিণামের কথা তুমিও ভাবনি বন্ধু। তুমি তাদের ধনী করে তুলেছ সম্রাটের। এখন সেই সব অলস ধনীদের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।

মেফিস্টোফেলিস : তুমি ভেবেছ সব যেন প্রস্তুত হয়ে আছে। বলে দিলাম তুমি খাড়াই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছ। অনেক পাপকাজের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। তুমি কি ভাবছ হেলেন তোমার ডাকে ঐ সব ভুতুড়ে কাগজের নোটের মত সাড়া দেবে? আমি কোন নির্দেশ এ বিষয়ে দেব না। তুমি তাদের

দেখতে পাবে না।

ফাউস্ট : ও সব পুরনো কথা ছেড়ে দাও। তুমি বড় হেঁয়ালিকরা কথা বল। তাতে কিছু বোঝা যায় না। পদে পদে সব কাজে তুমি বাধা দাও। তুমি বিড় বিড় করে একটা কথা বলামাত্র এই মুহূর্তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে হেলেন।

মেফিস্টোফেলিস : সেই সব অখৃস্টীয় নাস্তিকদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখন নরকে বাস করছে। তবে একটা উপায় আছে।

ফাউস্ট : দেরি না করে বলে ফেল তাড়াতাড়ি।

মেফিস্টোফেলিস : অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বড় রকমের একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন করব। নির্জনতার নিভৃত কন্দরে দেবীরা বিরাজ করেন। তাঁদের চারদিকে স্থানকাল বলে কোন জিনিস নেই। তাদের কাছে গিয়ে তোমার দুঃখের কথা বলবে। তাঁরা হলেন আদি মাতৃদেবতা।

ফাউস্ট : (ভীত হয়ে) আদি মাতৃদেবতা!

মেফিস্টোফেলিস : তুমি ভয় পাচ্ছ ?

ফাউস্ট : মাতৃদেবতা—অদ্ভুত কথা ত।

মেফিস্টোফেলিস : হ্যাঁ অদ্ভুত কথাই বটে। তোমার মত মরণশীল মানুষদের কাছে এই সব দেবদেবীরা অপরিচিত ও অজানিত। তাঁদের কাছে পৌঁছতে হলে অনেক গভীরে ডুব দিতে হবে। তোমার দোষের জন্যই তাঁদের কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করতে হবে।

ফাউস্ট : তাঁদের কাছে যাবার পথ কোথায় ?

মেফিস্টোফেলিস : পথ নেই। তাঁরা অগম্য, আবেদন নিবেদনের অতীত। তুমি প্রস্তুত ত ? সেখানে যাবার কোন সহজ দরজা বা অর্গল নেই। শুধু সীমাহীন নির্জনতায় তোমাকে ভাসতে হবে। জীবনে কখনো কোন নির্জন মরুভূমিতে গিয়ে পড়েছ ?

ফাউস্ট : আমার মনে হয় এ সব কথা না বলাই ভাল। এতে ঐন্দ্রজালিক প্রতারণার গন্ধ পাচ্ছি। জীবনে অনেক পার্থিব জ্ঞানের অহঙ্কারে ভুগেছি পাগলের মত। ঘৃণ্য ছলনার দ্বারা প্রতারিত হয়ে জনমানবহীন নির্জনতায় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। একা থাকা ঠিক নয়, একাকীত্বের দুঃসহ অবকাশে আমি শয়তানের কবলে পড়ে গিয়েছি।

মেফিস্টোফেলিস : সীমাহীন দূর সমুদ্রে কোনদিন সাঁতার কেটেছ ? আসন্ন

মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে একের পর এক করে তরঙ্গমালার আঘাত সহ্য করেছ? সেই প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে অনেক মৎসকন্যাকে হয়ত সাঁতার কাটতে দেখেছ। ঊর্ধ্ব আকাশে দেখেছ সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র ও মেঘেদের আনাগোনা। কিন্তু এবার যখন শূন্যতার সাগরে সাঁতার কাটবে তখন কোন কিছুই দেখবে না, কোন কিছুই শুনতে পাবে না, এমন কি তোমার পদশব্দও না। পা রাখার কোন জায়গাও পাবে না।

ফাউস্ট : তুমি এমন সব রহস্যময় দুর্বৃত্তের মত কথা বলছ যারা মানুষের সকল সততার সুযোগ নিয়ে তাকে দুঃখের ফাঁদে ফেলে। আমি আমার শক্তিবৃদ্ধির জন্য শূন্যতায় পারি দেব। তুমি তাই চাও। তুমি চাও আগুনের ভিতর থেকে বাদাম এনে তোমাকে খাওয়াই। ঠিক আছে। আমি তাই করব যাই ঘটুক না কেন। এতে আমার আকাঙ্খিত সব বস্তু পাব। তুমি কিছু পাও বা না পাও।

মেফিস্টোফেলিস : তোমাকে বিদায় জানাবার আগে তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। আমি দেখছি তুমি শয়তানকে চিনে ফেলেছ। এই নাও চাবিকাঠি।

ফাউস্ট : ঐ ছোট্ট জিনিসটা?

মেফিস্টোফেলিস : তুচ্ছ জ্ঞান না করে নিয়ে নাও।

ফাউস্ট : এটা চকচক করছে, আমার হাতে এসে যেন বড় হয়ে উঠছে।

মেফিস্টোফেলিস : এই জিনিসটার দাম কত শীঘ্রই তা বুঝতে পারবে। এই চাবিই তোমাকে আসল জায়গায় নিয়ে যাবে। একে অনুসরণ করে যাবে। এই তোমাকে মাতৃদেবতার কাছে নিয়ে যাবে।

ফাউস্ট : কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এখনো কেন হিমশীতল এক ভয়ের শিহরণ অনুভব করছি আমি?

মেফিস্টোফেলিস : নূতন কথায়, কেন ভয় পাও তুমি? অনেক ঘটনার সঙ্গে আগেই ত পরিচিত হয়েছ তুমি।

ফাউস্ট : ভয়ের এই শিহরণ মানুষের একটি বড় গুণ। আমাদের মধ্য দিয়ে অনেক বড় জিনিসের গভীরে নিয়ে যায় এ শিহরণ।

মেফিস্টোফেলিস : তাহলে নেমে পড়। উঠে পড়ও বলতে পারি। নামা ওঠা একই ব্যাপার। বিশ্বসৃষ্টির রূপবৈচিত্র্য হতে রূপহীন চিরমুক্ত শূন্যের রাজ্যে চলে যাও যেখানে শুধু মেঘমালা ছাড়া আর কিছু নেই। তবে এই চাবিকাঠিটা ধরে থাকবে হাতে।

ফাউস্ট : এটাকে ধরে আমি আরো শক্তি পাচ্ছি দেহে মনে। আমার

বুক ফুলে উঠছে। এবার শুরু হোক আমার যাত্রা।

মেফিস্টোফেলিস: অবশেষে এক জলন্ত তিনপায়া পদার্থ তোমাকে আলো দেখিয়ে আদি মাতৃদেবতার কাছে নিয়ে যাবে। সেখানে দেখবে রূপ, রূপান্তর, শাশ্বত মনের শাশ্বত আনন্দ। বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব ভেসে বেড়াচ্ছে অবাধে। কিন্তু তারা তোমায় দেখতে পাবে না। তারা শুধু মৃত ব্যক্তিদের প্রেতকেই দেখতে পায়। সাহস অবলম্বন করো। তুমি এই চাবিকাঠি দিয়ে সেই তিনপায়া পদার্থটাকে স্পর্শ করবে। (ফাউস্ট চাবিটা শক্ত করে ধরে মুখের উপর দৃঢ় সংকল্প কাটিয়ে তুললে তা দেখে মেফিস্টোফেলিস খুশি হলো) ঠিক আছে। এই চাবিই তোমাকে আলোর কাছে নিয়ে যাবে! কাজ সেরে আবার ফিরে আসবে। সেই তিনপায়া পদার্থটি তোমাকে বয়ে এনে এখানে নামিয়ে দেবে। তারপর তুমি অতীতের অন্ধকার থেকে হেলেন ও প্যারিসের আত্মাকে আহ্বান করবে। এই কাজ তুমিই প্রথম করবে এবং এর জন্য নির্বাচিত হয়েছ তুমি। ঐন্দ্রজালিকভাবে শূন্যের কুয়াশা থেকে দেবদেবীর মূর্তি আবির্ভূত হবে।

ফাউস্ট: এখন আর কি করতে হবে?

মেফিস্টোফেলিস: এবার নীচের দিকে নাম। তারপর উপরে উঠবে। (ফাউস্ট অদৃশ্য হয়ে গেল) চাবিকাঠিটার নির্দেশ যদি সে মেনে চলে তাহলে আমার মনে হয় ঠিক ফিরে আসবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

উজ্জ্বলভাবে আলোকিত দরবার কক্ষ

সম্রাট ও যুবরাজ। রাজসভা চলছিল।

প্রধান ভৃত্য: (মেফিস্টোফেলিসকে) তুমি বলেছিলে প্রেতদের দৃশ্য দেখাবে। এখনো দেখাওনি। আমাদের সভাসদরা অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

প্রধান কর্মচারী: সম্রাট আমাকে একটু আগে এর কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আর বিলম্ব করবেন না। উনি রুষ্ট হবেন।

মেফিস্টোফেলিস: আমার সহকর্মী এই কাজের জন্যই গেছে। কিভাবে কাজটা শুরু করতে হবে সে তা জানে। অতীতের বিস্মৃতির গর্ভ হতে সুন্দরকে বার করার জন্য বিরাট কলাকৌশল দরকার। মুণি ঋষিদের কাজ।

প্রধান কর্মচারী : তোমার কি দরকার তা জানি না। সম্রাটের আদেশ, তুমি প্রস্তুত হও।

কোন এক সুন্দরী : (মেফিস্টোফেলিসের প্রতি) একটা কথা মশাই। আমার দেহটা সুন্দর দেখছেন ত। কিন্তু প্রতিবার গ্রীষ্মকালে আমার চেহারাটা পাল্টে যায়। লাল লাল অসংখ্য ফোড়া হয়ে আমার চামড়াটাকে নষ্ট করে দেয়।

মেফিস্টোফেলিস : দেহের উজ্জ্বল ত্বকে দাগ—এটা সত্যি দুঃখের কথা। একটা কাজ করতে পার। কোলাব্যাঙের বাচ্চা আর বিষাক্ত ব্যাঙের জিব সিদ্ধ করবে পূর্ণিমার দিন। তারপর সেই মিশ্রচার গায়ে লাগাবে। পরের বসন্ত-কালে দেখবে গায়ে আর দাগ থাকবে না।

জনৈক সুন্দর যুবক : তোমাকে বিরক্ত করতে কত লোক এদিকে আসছে। আমার পায়ের পাতাটা ব্যথায় তুলতে পারছি না। আমি হাঁটতে বা নাচতে পারছি না। এর একটা বিহিত করতে হবে তোমায়।

মেফিস্টোফেলিস : আমি আস্তে করে একটা লাথি মারব তোমার পায়ে। তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে।

যুবক : একমাত্র প্রেমিকই তার প্রেমাস্পদকে লাথি মারতে পারে।

মেফিস্টোফেলিস : আমার এ লাথির দাম আছে, কারণ রোগ সারাবার জন্য এ লাথি মারছি। পা দিয়ে আঘাত করছি পায়ে। প্রতিটি অঙ্গ তার সম-জাতীয় অঙ্গের আঘাত সহ্য করতে পারে। তুমি কিছু মনে করো না।

যুবক : তোমার লাথিটা ত সাংঘাতিক। ঠিক যেন ঘোড়ার ক্ষুর।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু এতে তাড়াতাড়ি সেরে যাবে তুমি। এবার ঠিকভাবে নাচতে পারবে। টেবিলের তলা দিয়ে তোমার প্রেমিকার পায়ের উপর পা দিয়ে চাপ দিতে পারবে।

জনৈক তরুণী : (এগিয়ে এসে) আমাকে একটু যেতে দাও ওখানে। আমার বড় দুঃখ। গতকাল পর্যন্তও আমার সামান্য চোখের দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রেমিক জগতের সব সুখ খুঁজে পেত। কিন্তু আজ সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় আমার উপর থেকে। আজ সে একটি মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস : ব্যাপার সত্যিই গুরুতর। তবে আমার কথা শোন। এই কয়লাটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে যাবে। গিয়ে শান্ত দৃষ্টিতে তার পোষাক, ঘাড় আর দস্তানার পানে তাকাবে। সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর হবে

অনুতপ্ত। তারপর কয়লাটা গিলে ফেলবে কোন মদ বা জল না মিশিয়ে। দেখবে আজকের রাত্রিতেই সে তোমার দরজার সামনে এসে কাতরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।

তরুণী : এটা বিষ নয় ত ?

মেফিস্টোফেলিস : এসব জিনিসকে শ্রদ্ধা করতে হয়, মান্য করতে হয়। এসব কয়লা সস্তায় পাওয়া যায় না। এর জন্য তোমাকে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হবে। এ কয়লা জ্বলন্ত চিতার নেবানো আগুন থেকে বার করা।

ভৃত্য : আমি একজনকে ভালবাসি। কিন্তু লোকে বলে আমি অর্বাচীন।

মেফিস্টোফেলিস : (স্বগত) জানি না, কার কথা শুনব, কার কথা না শুনব। (ভৃত্যকে) অল্পবয়সের মেয়েদের কখনো ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে চেষ্টা করবে না। একমাত্র প্রাপ্তবয়স্করাই তোমার মূল্য বুঝতে পারবে। (আরো লোককে আসতে দেখে) আবার লোক ? মহাবিপদে পড়লাম ত। এবার আমাকে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। নগ্ন সত্যের পথ ধরতে হবে। হে আদি মাতৃদেবতারা, ফাউস্টকে অবাধে তার কাজ করতে দাও। (চারদিকে তাকিয়ে) দরবার কক্ষে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। রাজসভায় লোকরা একে একে সমবেত হচ্ছে। বীর নাইটরা যেখানে বসে আছে সেখানে কত রকমের উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র চকচক করছে। এখানে যাদুর আর দরকার হবে না। আপনা হতেই প্রেতরা আসবে।

সপ্তম দৃশ্য

স্বল্পালোকিত দরবার কক্ষ

সম্রাট ও সভাসদবর্গের প্রবেশ

প্রহরী : আমার কাজ হচ্ছে ঘোষণা করা। কিন্তু প্রেতদের প্রভাবে আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সে প্রভাব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা যায় না। এখন আবার অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এ সভা। সম্রাট সামনেই বসেছেন। তারপর সভাসদ ও রাজকুমারেরা বসেছে। প্রেমিক প্রেমিকারা বসেছে পাশাপাশি। এবার আমরা প্রস্তুত।

(বাদ্য)

জ্যোতিষী : নাট্যানুষ্ঠান শুরু করো। সম্রাটের আদেশ। হে

দেওয়ালগণ, তোমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রসারিত হও। এবার আমরা যাদু প্রদর্শন করব। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ এক রহস্যময় স্বল্প আলোর দ্বারা আলোকিত হচ্ছে। এবার নাটক শুরু হবে। আমি এবার মঞ্চে যাচ্ছি।

মেফিস্টোফেলিস: (প্রম্পটারের আসনে উঠে) আমি এই কাজেই নাম করব। শয়তানের এটাই হলো কাজ। (জ্যোতিষীকে) তুমি শুধু নক্ষত্রদের গতিপ্রকৃতির কথা জান। আমার প্রতিটি কথা শিষ্যের মত মন দিয়ে শুনে যাবে।

জ্যোতিষী: এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে যে অ্যাটলাস একদিন ত্রিভুবন ধারণ করেছিল সেই অ্যাটলাসের মন্দিরের মত এক বিশাল প্রাচীন মন্দির দেখতে পাচ্ছি। তার বড় বড় স্তম্ভগুলো পাথরের ছাদটাকে ধারণ করে আছে।

স্থপতি: ও মন্দিরটা বড় প্রাচীন। এ সব আজকাল কেউ ভাল বলে না। আজ লোকে চায় সূক্ষ্ম কারুকার্য।

জ্যোতিষী: গ্রহ নক্ষত্রদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সময় অসময়ের কথা ছেড়ে দাও এখন। এখন আর কোন যুক্তির কথা নয়। এখন যুক্তির সব শক্তি যাদুর দ্বারা আবদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে অবাধ উদ্ধত কল্পনার রঙীন ও উজ্জ্বল পাখাগুলো উন্মুক্ত করে দাও। তোমাদের উদ্ধত উচ্চাশাগুলি আজ পূরণ হবে। শুধু অসম্ভবকে বিশ্বাস করে যাবে। (মঞ্চের একধারে ফাউস্টের প্রবেশ) যাজকের পোষাক পরে এক আশ্চর্য মানুষ তার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করে এসেছে। তার সঙ্গে শূন্যে ভেসে এসেছে এক তিনপায়া পদার্থ। ধূপের গন্ধ পাচ্ছি।

ফাউস্ট: হে আদিমাতাগণ, অনন্ত মহাশূন্যে চিরন্তন নির্জনতার রাজ্যে অধিষ্ঠিত আছ তোমরা। তোমাদের চারদিকে মৃতদের উজ্জ্বল আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। আজকের এই রাত্রিতে এই প্রেক্ষাগৃহে কিছু আত্মার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে পাঠাও। ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে তাদের প্রদর্শন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করব আমরা।

জ্যোতিষী: উজ্জ্বল চাবিকাঠিটি কাপে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার মত একটা বস্তু উঠে মেঘ হয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলল চারদিক। ঐ দেখ, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে এক প্রেতমূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসছে এক মধুর সঙ্গীতের ধ্বনি। সে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে সমগ্র মন্দির-চত্বরটি। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘমালা কেটে গেলে সেই অস্পষ্ট প্রেতমূর্তিটি এক সুন্দর যুবার

বেশ ধারণ করল। এখানেই আমার কাজের শেষ। তার নাম বলার প্রয়োজন নেই। প্যারিসের নাম কে না জানে?

জনৈক মহিলা: যৌবনের কি অমিত শক্তি আর উজ্জ্বলতা তার দেহে।

দ্বিতীয় মহিলা: সজীব ও সুপক্ক ফলের রসে পরিপূর্ণ যেন সে।

তৃতীয় মহিলা: তাঁর ঠোঁটগুলো কী চমৎকার।

চতুর্থ মহিলা: এই ওষ্ঠাধরের মাধুর্য কে না উপভোগ করতে চায়।

পঞ্চম মহিলা: সে খুব সুন্দর, তবে কিছুটা অমার্জিত।

ষষ্ঠ মহিলা: আমার মতে আর একটু মার্জিত হলে ভাল হত।

নাইট: তাকে দেখে মনে হচ্ছে এক রাখাল। রাজকীয় কোন নিদর্শন নেই তার দেহে।

অন্য নাইট: অবশ্য যুবকের অর্ধনগ্ন দেহ খারাপ নয়। তবে তাকে যোদ্ধা-বেশে দেখতে চাই আমরা।

মহিলা: কত শান্তভাবে সে আসন গ্রহণ করল।

নাইট: তার কোলটা তোমাদের কাছে এক পরম রমণীয় স্থান।

অন্য নাইট: তার মাথার উপর হাত তুলল সে।

প্রধান ভৃত্য: এটা ঠিক নয়। রাজকীয় আদব-কায়দা কিছু জানে না। সম্রাটের সামনে হাই তুলছে।

মহিলা: তোমরা শুধু সবেতেই দোষ ধর। ও ভাবছে ও একা।

জনৈক লর্ড: এটা নাটক হলেও নাটকটা যথাযথভাবে দেখানো উচিত।

মহিলা: ধীরে ধীরে নিদ্রা এসে আচ্ছন্ন করছে সুন্দর যুবককে।

লর্ড: এবার হয়ত তার নাক ডাকবে।

জনৈক তরুণী: ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে কি এক মিষ্টি গন্ধ এসে আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত করে তুলছে।

জনৈক বৃদ্ধা: এটা তার যৌবনের গন্ধ, আমাদের অনুভূতিকে উত্তপ্ত করে তুলছে।

অন্য বৃদ্ধা: তার অম্লান যৌবনকুসুমের সৌন্দর্য ও অমৃতরস সমস্ত পরিবেশটাকে মধুরভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। (হেলেন এগিয়ে এল)

মেফিস্টোফেলিস: তাহলে উনি এলেন। কিন্তু আমার ঘুমের এতে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। সে সুন্দরী হলেও তার সৌন্দর্য আমার কাম্য বা রুচিসম্মত নয়।

জ্যোতিষী : সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর কিছু করার নেই। তার সৌন্দর্যদর্শনে গানের অফুরন্ত সুরে সুরে ভরে উঠেছে আমার অন্তর। আমি আমার জিব দিয়ে সে সুরের আগুন যদি ছড়িয়ে দিতে পারতাম। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে যে কোন মানুষ। তাকে যে লাভ করেছে সে সত্যিই ভাগ্যবান।

ফাউস্ট : আমি কি চোখে এখনো দেখতে পাচ্ছি? আমার অস্তিত্বের গভীরে সৌন্দর্যের এক প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে প্রবল ধারায়। অনেক ভয়াবহ শূন্যতা পার হয়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে আমি এই স্বর্গীয় বস্তুকে বয়ে এনেছি। আমাদের কল্পিত সেই সৌন্দর্যমূর্তি এখন যাদুর দ্বারা সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। হে সুন্দরী, আমি আমার জীবনের সমস্ত শক্তি, আবেগ, কল্পনা, প্রমত্ত প্রেম, প্রীতি সব উৎসর্গ করলাম।

মেফিস্টোফেলিস : শান্ত হও,—তা না হলে তুমি তোমার ভূমিকায় ঠিকমত অভিনয় করতে পারবে না।

বৃদ্ধা : বেশ লম্বা আর সুগঠিত চেহারা। তবে মাথাটা ছোট দেহের তুলনায়।

তরুণী : তার পায়ের পাতাটা কেমন ভারী দেখ।

কূটনীতিজ্ঞ : এমন রাজকন্যা আমি অনেক দেখেছি। তবে ও সত্যিই সর্বাঙ্গসুন্দরী।

সভাসদ : ঘুমন্ত যুবকের কাছে ও কেমন কৌশলে ও ধীর গতিতে যাচ্ছে।

মহিলা : যুবকের পবিত্র যৌবনসৌন্দর্যের পাশে ওকে কত কুৎসিত দেখাচ্ছে।

কবি : ওর সৌন্দর্যের জ্যোতি ঘুমন্ত যুবকের সামনে উজ্জ্বল উষালোকরূপে প্রতিভাত হবে।

মহিলা : ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন এণ্ডিমিয়ন আর চন্দ্রাদেবী।

কবি : ঠিক। মনে হচ্ছে দেবী যেন যুবকের উপর ঝুঁকে পড়ে তার সুগন্ধি নিঃশ্বাস ছাড়ছে। তাকে চুম্বন করছে।

ফাউস্ট : যুবকের প্রতি এতখানি আসক্তি তার ভাল নয়।

মেফিস্টোফেলিস : শান্ত হও। ওরা যা করে করতে দাও নীরবে।

সভাসদ : মেয়েটি হালকা পায়ে নিঃশব্দে সরে যেত। যুবকটি জেগে উঠল।

মহিলা : মেয়েটির চোখের সামনে ত কেউ নেই।

সভাসদ : মেয়েটি যুবকের কাছে যথোচিত আত্মসমর্পণসহকারে আসছে।

মহিলা : ও যুবকটিকে ওঠাতে চাইছে। এমন অবস্থায় সব যুবকই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এখানে যুবকটি ধরে নিয়েছে সেই মেয়েটির প্রেম সে লাভ করেছে।

ভৃত্য : আমি যদি যুবকটির অবস্থায় পড়তাম।

সভাসদ : এ অবস্থায় কে পড়তে না চায়?

মহিলা : ঐ মূল্যবান নারীরত্ন কত হাত যে ফিরে এসেছে। তার জৌলুসও অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে।

অন্য মহিলা : মেয়েটা দশ বছর বয়স থেকেই খারাপ হয়ে গেছে।

নাইট : যে যা বলুক, আমি যুবতীর সৌন্দর্যে বিমোহিত।

জনৈক পণ্ডিত : যদিও আমি চোখের সামনে স্পষ্ট তাকে দেখছি তথাপি সে সত্যিই হেলেন বটে কি না তাতে সন্দেহ আছে। তবে সর্বত্র যা পড়েছি তা সত্যিই মনে হচ্ছে। ওর সৌন্দর্য ট্রয়বাসীদের একদিন মুগ্ধ করে এবং আমার দেহে যৌবন না থাকলেও আমাকে মুগ্ধ করছে।

জ্যোতিষী : এখন মনে হচ্ছে তরুণ বালক নয়, এক বলিষ্ঠ বীরপুরুষ তাকে জড়িয়ে ধরছে। তাকে তুলে ফেলছে। তাকে বয়ে নিয়ে হয়ত পালাবে। তা দেখে কে আবেগ সংযত করতে পারে?

ফাউস্ট : হে হঠকারী নির্বোধ, তুমি সত্যিই পালিয়ে যাবে? তোমার সাহস হচ্ছে?

মেফিস্টোফেলিস : এই ভৌতিক নাটকের তুমিই অবতারণা করেছ।

জ্যোতিষী : আমরা আজ যা দেখেছি তাতে নাটকের নাম দেওয়া উচিত হেলেনার ধর্ষণ।

ফাউস্ট : ধর্ষণ? আমি এখানে রয়েছি না? আমার হাতে সেই চাবিকাঠি এখনো জলজল করছে। এই চাবিকাঠি আমায় জনহীন শূন্যতার মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে এই অমূল্য সম্পদকে আনতে সাহায্য করেছে। কল্পনা আজ এখানে বাস্তবে পরিণত। অবশ্য দর্শকদের মনে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তবু বলব একদিন ওরা কত দূরে ছিল। আজ ওরা কত কাছে, কত সুন্দর। আমি সুন্দরী হেলেনাকে উদ্ধার করে চিরদিন আমার করে রাখব। হে আদি মাতৃদেবতারা! আমার চেষ্টাকে ফলবতী করে তোল।

জ্যোতিষী : কি করছ ফাউস্ট? দেখ দেখ। ও তাকে ধরছে। ও

মিলিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার মত। চাবি নিয়ে প্যারিসকে ছুঁচ্ছে। হায় হায়।
(বিস্ফোরণ। ফাউস্ট মাটিতে পড়ে গেল, প্রেতরা শূন্যে মিলিয়ে গেল)

মেফিস্টোফেলিস : (ফাউস্টকে কাঁধে তুলে) তোমার নির্বুদ্ধিতার প্রতিফল তুমি পেলে। (অন্ধকার ও হট্টগোল)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উঁচু তলায় একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাতে অপরিবর্তিত অবস্থায় ফাউস্ট শায়িত।

মেফিস্টোফেলিস : (শায়িত ফাউস্টকে পর্দার আড়াল থেকে দেখতে দেখতে) ওইখানে শুয়ে থাক, হে নির্বোধ হতভাগ্য! প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ থাক। হেলেনা তোমার যে যুক্তিবোধকে বিকল করে দিয়েছে তা সহজে শক্তি ফিরে পাবে না। (পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে চারদিকে তাকিয়ে) দেখে মনে হচ্ছে এ ঘরের সবকিছু যা যেখানে সব ঠিক আছে। জানালায় কাচের সার্সিটা কিছু ম্লান দেখাচ্ছে। মাকড়শার জালগুলো বড় হয়েছে দীর্ঘ হয়েছে কয়েক বছর ধরে। লেখার কালি শুকিয়ে গেছে। কাগজগুলো বাদামী রঙের হয়ে গেছে। কিন্তু প্রতিটি জিনিস তার আগের জায়গাতেই আছে। এমন কি যে পালকের কলমটা দিয়ে শয়তানের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সেই কলমটাও ঠিক আছে। যে পোষাকটা পরিয়ে আমি তাকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিলাম সেটা এখনো হুকেতে ঝুলছে। হে কর্কশ ছদ্মবেশ, তোমার সাহায্যেই আমি কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে সেই বিদ্যা শিখিয়েছিলাম যা যুবকদের মুগ্ধ করে সহজে। (পোষাকটা ধরে নাড়া দিতে কতকগুলো পোকামাকড় উড়ে বেড়াতে লাগল)

পতঙ্গদের কোরাস : হে পিতা, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করো। তুমিই আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ। আমরা হাজারে হাজারে ওখানে বাস করি। তবে বুকের ভিতর দাগ থাকলে ধরা পড়ে না, কেউ তা দেখতে পায় না, কিন্তু জামায় পোকা বা উকুন থাকলে সহজেই তা দেখতে পাওয়া যায়।

মেফিস্টোফেলিস : এই সব কচি প্রাণের উচ্ছলতা দেখে আমার বড় বিস্ময় ও আনন্দ জাগছে। হে পতঙ্গদল, তোমরা পুরনো কাগজে, বইএর ভিতরে এখানে ওখানে জারে লুকিয়ে থাকগে। (পোষাকটা পরে) হে পোষাক, আবার এস আমার দেহে। তবে আমি কলেজে পড়াব না। কে আমার দাবি সমর্থন করবে? (একটা ঘণ্টা বাজাতেই ভীষণ জোর শব্দ হলো)

(ফেমুলাস টলতে টলতে অন্ধকার বারান্দা থেকে এল)

কী ভীষণ শব্দ! বাড়ির সিঁড়িগুলো সব ভয়ঙ্করভাবে কাঁপছে। জানালার রঙীন কাচের ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎ দেখতে পাচ্ছি আমি। ছাদটা মনে হচ্ছে ফেটে যাচ্ছে। অর্গলবদ্ধ দরজা খুলে যাচ্ছে কোন যাদুমন্ত্র বলে। ফাউস্টের ঘরে তার কোট পরে একটা বিরাট দৈত্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আমার পানে তাকিয়ে ইশারায় ডাকছে। আমি কি পালাব? না কি অপেক্ষা করব? কে জানে আমার ভাগ্যে কি আছে?

মেফিস্টোফেলিস : এখানে এস বন্ধু। তোমার নাম নিকোডমাস নয়?

ফেমুলাস : হে সম্মানিত মহাশয়, আমার নাম ওরেমাস।

মেফিস্টোফেলিস : ও নাম রেখে দাও।

ফেমুলাস : কী আনন্দের কথা! আপনি আমাকে এখনো চিনতে পারছেন না?

মেফিস্টোফেলিস : এক পুরনো ছাত্র। আমি ভুলিনি। পণ্ডিত লোকের পড়াশুনো শেষ হয় না। তারা ছাত্র রয়ে যায় চিরকাল। তোমার প্রভু একজন জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক। মহান ডাক্তার ওয়াগবারকে সকলেই চেনে। আজও দিনে দিনে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় বেড়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের তৃষ্ণাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর চারদিকে আজ কত লোক ভিড় করছে। জ্ঞানের যে চাবিকাঠি তাঁর হাতে আছে তা দিয়ে তিনি স্বর্গ-মর্ত্য পাতালের সব রহস্যেরই সন্ধান করতে পারেন। সব জ্ঞানের আলো আজ তাঁর করায়ত্ত। সকলের যশকে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন, এমন কি তার পূর্ব জীবনের ডাক্তার ফাউস্টও ম্লান তাঁর কাছে।

ফেমুলাস : ক্ষমা করবেন মশাই, আপনার কথার প্রতিবাদ করলে কিছু মনে করবেন না। আপনি যা যা বললেন তা আমি শুনতে চাইনি। সেই মহান পুরুষের হঠাৎ অন্তর্ধানের অর্থ আজও বুঝতে পারিনি আমি। তাঁর এই রূপান্তরও দুর্বোধ্য এবং দুঃখজনক। ডাক্তার ফাউস্টরূপে তাঁর পুনরাবির্ভাবের

প্রত্যাশা করি আমরা। তাঁর ঘরের জিনিসপত্র সব অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সব তাঁর আগমন প্রত্যাশা করছে। তাঁর কাছে আমি যেতে সাহস পাচ্ছি না। জানি না এখন আকাশে কোন নক্ষত্র কিরণ দিচ্ছে। অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর এক শব্দে গোটা বাড়িটার ভিত্তিমূলটা কেঁপে উঠল। দরজাগুলো প্রবলভাবে কেঁপে উঠতে খিল খুলে গেল আর সেই ফাঁকে প্রবেশ করলেন আপনি।

মেফিস্টোফেলিস: বর্তমানে তিনি যেখানে থাকেন আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যাবে? অথবা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস।

ফেমুলাস: তাঁর নিষেধ আছে। আমি সাহস পাচ্ছি না। মাসের পর মাস তিনি এক নির্জন নিভৃতে বড় রকমের এক কাজ করতে চলেছেন। কিসের যেন গবেষণা করে চলেছেন গভীরভাবে। তাঁর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে। তাঁর মুখখানা হয়ে উঠেছে কয়লার উনোনের মত কালো, চোখগুলো অঙ্গারের মত লাল। তিনি সব সময় হাঁপাচ্ছেন।

মেফিস্টোফেলিস: আমাকে কেন তিনি ঢুকতে দেবেন না? তিনি আমাকে একবার ঢুকতে দিলে আমার থেকে তাঁর ভাগ্যোন্নতি ত্বরান্বিত হবে। (ফেমুলাস চলে গেলে মেফিস্টোফেলিস গম্ভীরভাবে বসে পড়ল) আমি এখানে বসতে না বসতেই একটা প্রেত এসে হাজির হলো। আমি তাকে চিনি। সে পুরনো পাপী আর তাই তার দুঃসাহসটা হবে অপরিসীম।

বেকালেরেউস: (বারান্দা দিয়ে এসে) সব দ্বার এখন উন্মুক্ত। এখন আশা হচ্ছে আর তিনি দীর্ঘ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবেন না। মনে হচ্ছে আর তিনি জীবন্ত মারা যাবেন না। কিন্তু এই গোটা প্রাসাদটা কাঁপছে কেন। মনে হচ্ছে বসে যাচ্ছে, ধ্বসে যাচ্ছে। যদি বেরিয়ে না যাই তাহলে নিষ্পেষিত হতে হবে। কিন্তু আমার চোখের সামনে কি দেখছি? আমি সরল প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু যত সব পাকা মাথা বৃদ্ধদের দ্বারা চালিত হতে হয় আমাকে। ঐ সব পুরনো বইগুলো পড়ে তারা যা জানত বা লিখত তা তারা ঠিকমত বোঝাতে পারত না, তারা ভুল শেখাত মানুষকে। আবার তারা যা জানত বা শিখত তাতে তারা নিজেরাই বিশ্বাস করত না। এইভাবে তারা জীবনটাকে ক্ষয় করে। সে ক্ষয় কোন কালে পূরণ হয়নি। কি ব্যাপার! অদূরে ঐ অন্ধকার ঘরে কে বসে রয়েছে? তার কাছে যেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি। মোটা পশম আর লোম দিয়ে তৈরি কোট পরে বসে রয়েছে লোকটা! তাকে কেতাদুরস্ত দেখালেও তাকে চিনতে পারছি না। তবে তাকে আমি ভয়ও করি না। কই হে বৃদ্ধ

মহাশয়, আপনি এখনো যমের বাড়ি যাননি ? আমি আগে আপনাকে ছেলে-বেলায় দেখেছি মনে হচ্ছে। অবশ্য আমি এখন আর সে মানুষ নেই।

মেফিস্টোফেলিস : আমার ঘণ্টাধ্বনি শুনে তুমি যে এসেছ এতে আমি খুশি হয়েছি। আগে তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতাম আমি। একটি ছেলের প্রথম থেকেই বুঝতে পারি ভবিষ্যতে সে কেমন হবে। তোমার মাথায় লম্বা লম্বা চুল ছিল। তোমার মুখে ছিল শিশুসুলভ হাসিখুশির ভাব। তুমি প্রেম করতে। কিন্তু এখন তোমার মাথা কামানো। তোমার চোখে মুখে এখন কঠিন সংকল্পের ছাপ। এখান থেকে একেবারে বাড়ি চলে যেও না।

বেকালেরেউস : একজন বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক হিসাবে আপনি এই পুরাতন শিক্ষা-দানের স্থানে বসে জীবনের পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। কিন্তু আপনাদের দ্ব্যর্থ-বোধক কথা আর বলবেন না। ও সব কথার এখন ভিন্ন অর্থ বার করি আমরা। ও সব কথা বলে আপনি আমাদের যৌবনকে অহেতুক বিব্রত করে তুলতেন। অথচ আপনারা জানতেন আসলে সত্য কত সহজ।

মেফিস্টোফেলিস : আমরা যদি ছোট ছোট ছেলেদের সহজ সত্য সরল-ভাবে বলি তাহলে তারা আর খেলাধূলা করবে না। আমরা চাই বড় হয়ে তারা সত্যকে তার মিথ্যা মায়ার গোপন গহ্বর থেকে আবিষ্কার করুক, বাইরে টেনে আনুক। তারপর তারা নিজের মত করে সত্যকে জানুক, গ্রহণ করুক। তখন তারা বলবে, তাদের শিক্ষকরা ছিল নির্বোধ। তারা যা পড়িয়েছে, ভুল পড়িয়েছে।

বেকালেরেউস : শুধু নির্বোধ নয়, বদমাস। এমন কোন শিক্ষক আছে যে সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারে ছাত্রদের কাছে। তারা সত্যকে হয় কম করে না হয় বেশী করে জানে এবং সেইভাবে প্রকাশ করে। ছেলেদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের শিক্ষা দেয়।

মেফিস্টোফেলিস : নিঃসন্দেহে মানুষের শিক্ষার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময় তোমার পার হয়ে গেছে। এখন তুমি শিক্ষা দিতে চাও, বহু বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় এখন তুমি সমৃদ্ধ।

বেকালেরেউস : অভিজ্ঞতা! ওটা ত কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মতে বিভিন্ন রূপ লাভ করে। এখন স্বীকার করুন, মানুষ আজ পর্যন্ত যা শিখেছে তার মধ্যে অনেক কিছুই শিক্ষনীয় নয়।

মেফিস্টোফেলিস : এখন বিলম্বে বুঝছি। আমি সত্যিই একদিন নির্বোধ

ছিলাম। আমার জ্ঞানের অগভীরতাকে আমার নিজেই উপহাস করতে ইচ্ছা করছে।

বেকালেরেউস: কথাটা শুনে খুশি হলাম। আপনিই প্রথম বয়োপ্রবীণ ব্যক্তি যার মুখে যুক্তির কথা শুনলাম।

মেফিস্টোফেলিস: আমি খনির ভিতর কত গুপ্তধন ও মণিমাণিক্যের সন্ধান করেছিলাম। কিন্তু পরিণামে আমি লাভ করেছি কয়লা আর ভস্মরাশি।

বেকালেরেউস: আপনি তাহলে স্বীকার করুন আপনার এই টাকপড়া পক্ককেশ মাথাটা শূন্য। তাতে কিছু নেই।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি কিন্তু আমার প্রতি বড় কঠোর আচরণ করছ।

বেকালেরেউস: সৌজন্য কথাটাই মিথ্যা।

মেফিস্টোফেলিস: (চেয়ারটা দর্শকদের সামনে ঘুরিয়ে নিয়ে) এখানে আলো বাতাস নেই। আমি কি তোমাদের কাছে গিয়ে বসতে পারি?

বেকালেরেউস: বৃদ্ধ বয়সে যুবক হবার সাধ এক অর্থহীন ঔদ্ধত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের জীবন রক্তের জোরের উপর নির্ভর করে। যৌবনে রক্তের তেজ সবচেয়ে বেশী থাকে এবং সেই সময় সেই রক্ত থেকে এক জীবন থেকে উদ্ভব হয় আর এক জীবনের। তারপর যারা দুর্বল তারা শুধু ঝগড়া বিবাদ করে, কাজের কাজ কিছু করে না, যারা শক্তিমান তারা সবেতেই সাফল্য লাভ করে। আপনি সারা জীবন ধরে কি করেছেন?—শুধু চিন্তা আর পরিকল্পনা? বার্ধক্য হচ্ছে ঠিক দূষিত জ্বরের মত। আর তিরিশ বছর পার হলেই মানুষ তার আসল প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে।

মেফিস্টোফেলিস: শয়তানরা এর থেকে ভাল কথা বলতে পারে না।

বেকালেরেউস: শয়তান কোথাও থাকে ত তা একমাত্র মানুষের মনে।

মেফিস্টোফেলিস: শয়তান শীঘ্রই তোমার ঘাড়ে চাপবে।

বেকালেরেউস: ওটা হচ্ছে যৌবনের ডাকে সাড়া দেওয়া যথাযোগ্য অতিথি। আমার আগে এ পৃথিবীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এ পৃথিবী আমিই সৃষ্টি করেছি। আমিই পূর্বাচলের মহাসমুদ্র হতে সূর্যকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। স্পষ্ট দিবালোক উজ্জ্বল পোষাক পরে অভ্যর্থনা জানায় আমাকে। চাঁদ আমারই সঙ্গে গতি পরিবর্তন করতে শুরু করে। পৃথিবী সবুজ পত্র ও পুষ্পশোভিত হয়ে আমাকে প্রীত করতে থাকে। আমারই ইশারা

পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার আকাশ হতে তাদের অবগুণ্ঠন সরিয়ে অনন্ত আলোকের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটিত করে আমার চোখের সামনে। আমি ছাড়া কে তোমাকে চিরাচরিত চিন্তার বন্ধন থেকে মুক্ত করত? আমি স্বাধীন, আমি গর্বিত। আমি নিজের মনের আলোয় সব চিনে আমারই আপন আনন্দের বেগে এগিয়ে চলি। যত সব অন্ধকার মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে আমার পিছনে। অন্তহীন চিরঅম্লান এক গৌরবের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে আমায়। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস: যাও, চলে যাও হে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসমৃদ্ধ মহান পুরুষ। এমন কি নূতন ও বিজ্ঞজনোচিত চিন্তা আছে যা অতীতে কখনো চিন্তিত হয়নি? এখন তোমরা যতই মৌলিক চিন্তার বড়াই কর না, শীঘ্রই কোন না কোন মতের কবলে ধরা দেবে। আর ধরবে মদ। (তরুণ দর্শকের উদ্দেশ্যে) আমার কথা এখন তোমাদের নীরস লাগছে। তবে মনে রাখবে আমি শয়তান হলেও বয়োপ্রবীণ এবং আমার কথা বুঝতে পারবে তোমাদের বয়স হলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গবেষণাগার

মধ্যযুগীয় ধরনের কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি ঘরময় ছড়ানো। ওয়াগনার এক জ্বলন্ত চুল্লীর সামনে উপবিষ্ট।

ওয়াগনার: ঘণ্টার প্রচণ্ড শব্দে বাড়ির দেওয়ালগুলো কাঁপছে। তবে শীঘ্রই সব আগ্রহ ও প্রত্যাশার অবসান ঘটবে। বড় নলটার মধ্যে জ্বলন্ত কাঠের মত কি একটা জিনিস চকচক করছে। এই পেয়ে গেছি। কিন্তু দরজায় কিসের শব্দ?

মেফিস্টোফেলিস: (প্রবেশ করে) স্বাগত বন্ধু!

ওয়াগনার: (উদ্বেগের সঙ্গে) ঠিক সময়েই এসে গেছ। বর্তমান গ্রহের প্রভাবেই তুমি এসে গেছ। (চুপি চুপি) কিন্তু এখন কোন কথা নয়। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করো। একটা বড় রকমের কাজ এখনি সম্পন্ন হবে। কাজটা বিরাট আর চমৎকার।

মেফিস্টোফেলিস: কাজটা কি?

ওয়াগনার: এক কৃত্রিম মানুষ জন্ম নিচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস : মানুষ ? কোন প্রেমিকযুগলকে চিমনির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ ?

ওয়াগনার : না,. লুকিয়ে রাখার কথা নয়। এই কৃত্রিম প্রজনন এক বিরল ঘটনা। অতীতের অর্থহীন প্রজননপদ্ধতি হতে আমরা আজ মুক্ত হলাম। বিশ্বে জীবনের প্রথম উদ্ভবের কথা একবার ভাব। বাইরের শক্তি ও প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তির মিলনে যে মানবজীবনের উদ্ভব হয় তা বড় পাশবিক, তা বড় স্থূল। মানব জাতির উচিত তার প্রজন্মকে উন্নত করা। (চিমনির ভিতর তাকিয়ে) শত শত বিচিত্র উপাদানের সঙ্গে মানবিক উপাদান কিছু মিশিয়ে সেটাকে পরিশ্রুত করে কেমন চমৎকার ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমার আশাটা ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের যে সৃষ্টিরহস্য এতদিন প্রকৃতির মধ্যে ঢাকা ছিল আজ আমরা জ্ঞানের দ্বারা তা পরীক্ষা নীরিক্ষার দ্বারা সহজভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তুলছি।

মেফিস্টোফেলিস : মানুষ বেঁচে থাকলে অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতে শেখে। জগতের সব নূতন নূতন জিনিস কালক্রমে পুরনো হয়ে যায় তার কাছে। আমার ভ্রমণকালে আমি নিজেই অনেক উন্নতমানের মানুষ দেখেছি।

ওয়াগনার : (নলের দিকে তাকিয়ে) দেখ দেখ মানুষটা হাঁ করছে। কি রকম চঞ্চল দেখাচ্ছে। ওর মাথাটায় এবার থেকে বিশুদ্ধ চিন্তার সৃষ্টি হবে। ও আবার কত চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্ম দান করবে। কাঁচের নলটা নড়ছে। তার ভিতরে ছোট আকারের এক সুন্দর মানুষ নড়াচড়া করছে। দেখ এক জীবন্ত পদার্থ সৃষ্ট হলো। আর কি আশা করতে পার ? সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার এই রহস্য এবার থেকে সব মানুষই জানতে পারবে। ঘণ্টাধ্বনির মত একটা এলোমেলো শব্দ এসে মানুষের এক সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের রূপ নিচ্ছে।

কৃত্রিম মানুষ হোমুনোলাস : কেমন আছ বাবা ? আমাকে বুকের উপর চেপে ধর। তবে খুব জোরে নয়, কারণ তাহলে কাঁচটা ভেঙ্গে যাবে। জগতে শুধু প্রকৃতির বস্তুরই অবাধ স্থান। কৃত্রিম বস্তুর স্থান বড় সংকীর্ণ। (মেফিস্টোফেলিসের প্রতি) হে দুর্বৃত্ত খুল্লতাত মহাশয়, তোমাকেও দেখছি। ঠিক সময়েই দেখছি। ধন্যবাদ, সৌভাগ্যবশতঃ আমার কাছে এসে পড়েছ। আমি যখন সঞ্জাত হয়েছি তখন কাজও শুরু করব অবিলম্বে। কৌশলে তুমি আমার কাজকে ত্বরান্বিত করবে।

ওয়াগনার : কিন্তু একটা কথা। এর আত্মাকে খুঁজে পাচ্ছি না আমি। একটা কথা আগে ভাবিনি, কেমন করে দেহের আত্মাকে এক করা যাবে। তাদের পারস্পরিক বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা বিচ্ছিন্ন হয় না।

মেফিস্টোফেলিস : থাম, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব স্বামী স্ত্রী তাদের তিক্ততা সত্ত্বেও কেমন মিলেমিশে থাকে। তুমি এখন বুঝবে না বন্ধু, এখনো কাজের অনেক বাকি আছে।

হোমুনোলাস : কি করতে হবে ?

মেফিস্টোফেলিস : (একটা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে) তোমার কলা-কৌশল যা আছে ওখানে প্রয়োগ করতে পার।

ওয়াগনার : (ফাইলের ভিতর তাকিয়ে) তুমি দেখতে খুবই সুন্দর হে বালক। (পাশের দরজাটা খুলে যেতেই দেখা গেল ফাউস্ট একটা সোফার উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে।)

হোমুনোলাস : (বিস্মিত হয়ে) চমৎকার! (বড় শিশিটা ওয়াগনারের হাত হতে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ফাউস্টের উপর ঝুলতে লাগল) কী সুন্দর দৃশ্য! ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির ভিতর দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা স্নান করছে সে ঝর্ণার জলে। কী সুন্দর তাদের দেহসৌষ্টব! মেয়েরা যখন স্নান করছিল ঝর্ণার জলে হঠাৎ এক অনিন্দ্যসুন্দরী দেবী অথবা রাজকন্যা এসে পা ভেজাল সেই স্বচ্ছ জলে। এমন সময় পাখার ঝটপট শব্দ করে এক বড় রাজহাঁস এসে তার গায়ের পালক ঘষতে লাগল সেই রাণীর হাঁটুর উপর। তাই দেখে কুমারী মেয়েরা ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু রাণী পালাল না। রাজহাঁসটার সঙ্গে মিতালি পাতাল রাণী। কিন্তু হাঁসটা হঠাৎ কোথায় জলের উপর ভেসে গেল আর এক ঘন কুয়াশায় ছবিটা ঢাকা পড়ে গেল। এত সুন্দর ছবি কেউ কখনো আঁকেনি বা স্বপ্নেও দেখেনি।

মেফিস্টোফেলিস : তুমি দেখতে আকারে কত ছোট। অথচ কত কথা বললে, কত গল্প! তোমার কল্পনাশক্তি কত বড়!

হোমুনোলাস : নিশ্চয় তুমি উত্তরদেশীয় লোক এবং কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছ। নিশ্চয় তুমি কোন নাইট অথবা যাজকের ঘরে জন্মেছ। তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে কোথা হতে? অন্ধকারেই তুমি ভাল থাক। (চারদিকে তাকিয়ে) বাদামী রঙের বাড়িটা ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে। এখনও যদি জেগে ওঠে লোকটা, আর একটা বিপদ আসছে ওর। তখন ঘটনাস্থলেই ও মারা যাবে। সেই

বনভূমি, ঝর্ণা, নারীদের নগ্ন সৌন্দর্য, রাজহংসরূপী রাজপুত্র—ও এইসব স্বপ্নে দেখছিল। এই প্রায়ান্ধকার পরিবেশ ওর কামনা বাসনার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও।

মেফিস্টোফেলিস: নবজাতকের সৌভাগ্য কামনা করি আমি।

হোমুনোলাস: বীরকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দাও। কুমারী মেয়েদের নাচে যোগদান করতে বল। আমি চোখে একটা উজ্জ্বল আলো দেখতে পাচ্ছি। এ আলো হচ্ছে প্রাচীন ওয়ালপার্গিস উৎসবরাত্রির আলো। যাই ঘটুক না কেন, এ হচ্ছে সবচেয়ে উপভোগ্য ঘটনা। সুতরাং ওকে জাগাও।

মেফিস্টোফেলিস: একথা কখনো শুনিনি কারো কাছে।

হোমুনোলাস: একথা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি করে? শুধু রোমান্টিক ভূত দেখতেই তুমি অভ্যস্ত। খাঁটি ক্ল্যাসিকাল ভূতও যে ভাল তা জান না।

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু কোন দিকে যাব আমি বলতে পার? তোমার কথা শুনে আগে হতেই বিরক্তিতে ভরে উঠছে আমার মন।

হোমুনোলাস: উত্তর দিকে যাও শয়তান। আমরা যাব দক্ষিণ দিকে। সেখানে আছে পেলেউস, এক তৃণাচ্ছাদিত বিশাল সমভূমি বনের পাশ দিয়ে চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। সে পাহাড়ের উপর আছে নূতন পুরনো কত ফার্সানাস দৈত্য।

মেফিস্টোফেলিস: হায়! একান্তই যাবে তাহলে! অত্যাচারী মালিক আর ক্রীতদাসের সেই পুরনো যুদ্ধ বিবাদের ছবিটা আর আমার সামনে তুলে ধরো না। আমার বিরক্তি লাগছে। আসলে ওরা সবাই অন্ধ, সবাই পরাধীন। ক্রীতদাসগুলো স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। কিন্তু জানে না আসলে ওদের মালিকরাও ক্রীতদাস, পরাধীন, অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

হোমুনোলাস: ও সব ঝগড়া বিবাদের ব্যাপারটা আমি বুঝব। ছোট থেকে প্রত্যেকেই নিজেকে রক্ষা করে চলবে। এখন বল, মানুষ কি করে প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার কোন পদ্ধতি জানা আছে তোমার?

মেফিস্টোফেলিস: গোপন পদ্ধতি ভাল নয়। গ্রীসীয় পদ্ধতি কিছুটা ভাল। যে পাপকাজে মানুষ আনন্দ পায় তা সবাইকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু আমাদের পাপকাজে কোন আনন্দ নেই বলে লোকে খারাপ বলে আমাদের।

ওয়াগনার: (উদ্বেগের সঙ্গে) আমি এখন কি করব?

হোমুনোলাস : হ্যাঁ, তোমাকে এখন ঘরে বসে একটা ভারী কাজ করতে হবে। জীবনের সব উপাদানগুলো মিশিয়ে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। এমন জীবন সৃষ্টি করতে হবে যার মধ্যে স্বর্ণ সম্পদ, গৌরব, জ্ঞান বিজ্ঞান স্বাস্থ্য গুণরাজি সব সমন্বিত হবে। বিদায়।

ওয়াগনার : বিদায়! আমার খারাপ লাগছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের আর দেখা হবে না।

মেফিস্টোফেলিস : তার সহায়তায় আমি পেনেউস যাব। (দর্শকদের প্রতি) আমাদের সৃষ্ট জীবের উপর আমাদেরই নির্ভর করতে হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

সুপ্রাচীন ওয়ালপার্গিস উৎসবরাত্রি (প্রথম)

ফার্সানীয় প্রান্তর। অন্ধকার।

এরিখথো : এই ভয়ঙ্কর রাত্রির উৎসবে আগের মতই এসেছি আমি। আমি বিষাদগ্রস্ত এরিখথো। আমাকে যতটা নিষ্ঠুর হিসাবে চিত্রিত করে বদ কবিরা আমি ততটা নিষ্ঠুর নই। আমি শুধু বিহ্বল হয়ে দেখছি সামনে ধূসর রঙের তাঁবুর পর তাঁবুর ঢেউ। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির স্মৃতি বার বার আনাগোনা করছে আমার মনে। কোন অযোগ্য শাসক কখনো তার রাজ্যকে অপর কোন যোগ্যতর শাসকের হাতে ছেড়ে দেয় না। এই জন্যই তাকে হয়ত দেখা যায় বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্রতর শক্তির দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। আসলে আত্মজয় করতে না পারলে বাইরের কোন শক্তিকে জয় করা যায় না। স্বাধীনতার সাজানো মালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অত্যাচারী শাসকের শক্ত মাথাও নত হয়। ইতিহাস জানে সীজারের লুব্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় পম্পের প্রথম জীবনের সব বিজয়-গৌরব ম্লান হয়ে যায়। শক্তিমানের লালসার লেলিহান শিখা চারদিকে বিস্তার লাভ করে। সবলের অনিবারণীয় আঘাতে ঝরে পড়া দুর্বলের বহু রক্ত শোষণ করে নেয় পৃথিবীর মাটি। আজকের এই উৎসবরাত্রির আলোকোজ্জ্বল ঐশ্বর্য অতীত কালের বহু বিজয়োৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অসম্পূর্ণ চন্দ্রকলার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেইসব ভূতুড়ে তাঁবুগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অকস্মাৎ আমার মাথার উপরে উল্কার আলো দেখছি। সেই আলোর ছটায় আমি এক জীবন্ত প্রাণীর আগমন

প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আমার উপস্থিতি তার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তাই আমার এখানে থাকা উচিত হবে না। (প্রস্থান)

ঊর্ধ্বে এক বায়বীয় অতিথির আবির্ভাব

হোমুনোলাস: আমার মাথার উপরে ভয়ঙ্কর এক চক্রাকার জ্বলন্ত আলোর শিখা দেখছি।

মেফিস্টোফেলিস: আমি যখন উত্তরাঞ্চলে থাকতাম আমার ঘরের জানালায় অনেক ভয়ঙ্কর প্রেতমূর্তি দেখতাম। এখানেও তাই দেখছি। এ জায়গাটাকেও আমার বাড়ির মত মনে হচ্ছে।

হোমুনোলাস: দেখ দেখ, একটা লম্বা লোক আমাদের সামনে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে।

মেফিস্টোফেলিস: ওকে বাতাসে ভর করে আসতে দাও। মনে হচ্ছে ও ভয় পেয়ে গেছে।

হোমুনোলাস: ও আবার কোন রূপকথার রাজ্যে পুনর্জন্মের চেষ্টা করছে আবার ও জীবন লাভ করবে।

ফাউস্ট: (পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করে) কোথায় সে নারী?

হোমুনোলাস: আমরা তা বলতে পারি না। তবে তুমি তাকে শূন্য বাতাসে ভর করে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মাঝে খুঁজে বেড়াতে পার। যে একবার আদি মাতৃদেবীর সন্ধান পেয়েছে তাকে আর কোন কষ্টই ভোগ করতে হয় না।

মেফিস্টোফেলিস: আমিও এইভাবে বেড়াতে চাই। কিন্তু কোন ভাল পথ পাচ্ছি না। এই সব জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বাঞ্ছিত মনের মানুষকে খুঁজে বেড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। এখন এই ছোট্ট মানবপিণ্ডটাই আলোর দ্বারা পথ দেখাতে পারে।

হোমুনোলাস: (একটা কাচ দিয়ে) এই কাচের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে তোমাদের প্রচেষ্টা! যাও, অনেক আশ্চর্য বস্তুর সন্ধান পাবে।

ফাউস্ট: (একা) কোথায় সে? তবে আর কোন প্রশ্ন নয়। যদি এ মাটিতে কোনদিন সে পা না দেয়, যদি এখানকার কোন তরঙ্গ তার আগমনে উত্তাল হয়ে না ওঠে তাহলে এ বাতাসে অন্ততঃ তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। কি আশ্চর্য, মনে হচ্ছে আমি গ্রীসদেশে এসে পড়েছি। আমি তার মাটিতে দাঁড়িয়েছি, মনে হচ্ছে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠেছি; আমার শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে এক নূতন প্রাণচঞ্চলতা। আমার অনুভূতির মধ্যে আন্তেউস জেগে

উঠেছে। এখন আমাকে ঐ চক্রাকার আলোকশিখার ব্যাপারটা খোঁজ করে দেখতে হবে। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস : আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সব জলন্ত আগুনের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং আমি কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। উলঙ্গ অবস্থায় গ্রিফিন ও স্ফিংক্স জাতীয় একদল নির্লজ্জ নারী তার মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে কারো কারো দেহে জামা বা কিছু আবরণ আছে। তাদের আলুলায়িত কেশপাশ মাথার উপর ছড়ানো। বড় দৃষ্টিকটু। অবশ্য অশালীনতাই আজ আমাদের আদর্শ। আমরা বর্তমানের মন আর প্রচলিত রীতি দিয়ে সব জিনিসকে যাচাই করে দেখলেও অতীতের এই সব প্রাচীন নিদর্শন লুপ্ত হলেও তারা জীবন্ত এবং অতিবাস্তব। ওদের সঙ্গে আমায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখা করতে হবে। অতিথিসুলভ সৌজন্যসহকারে আমি তাদের অভ্যর্থনা জানাব। হে সুন্দরী ধূসরবদনা বয়োপ্রবীণারা, কেমন আছ ?

গ্রিফিনরা : বয়োপ্রবীণা ? ধূসর, প্রবীণ এসব কথা কেউ শুনতে চায় না। এসব কথা শুনে বিষাদ জাগে মনে। আমাদের লোকে গাল দেয়, সমালোচনা করে। আবার প্রশংসাও করে। কামিনী কাঞ্চন আর রাজমুকুট কে না চায়।

মেফিস্টোফেলিস : (স্ফিংক্সদের কাছে বসে) তোমাদের মাঝে বসে ভাল লাগছে। সহজ মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি তোমাদের সকলকে চিনি।

স্ফিংক্স : আমাদের প্রেতসুলভ অপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর তোমার সংস্পর্শে এসে স্বাভাবিক হলো। এখন নাম ও পরিচয় দাও।

মেফিস্টোফেলিস : মানুষ আমাকে অনেক নামে ডাকে। এখানে বৃটিশ জাতির লোক আছে কি ? তারা ত সারা পৃথিবী জুড়ে কত রণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়িয়েছে, কত ঐতিহাসিক জায়গায় গেছে। তাদের লেখা অনেক ভাল ভাল পুরনো নাটকে আমার নাম লেখা আছে।

স্ফিংক্স : কিভাবে তারা তোমাকে জানল ?

মেফিস্টোফেলিস : আমি তা জানি না।

স্ফিংক্স : তোমার কি জ্যোতিষবিদ্যা জানা আছে ? কালের প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান আছে ?

মেফিস্টোফেলিস : নক্ষত্রপুঞ্জের উপর নক্ষত্রপুঞ্জ কিরণ দান করছে। তার উপর উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। তোমাদের পাথুরে সিংহের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

নিজেকে একটু গরম করে নিচ্ছি। এখন এখান থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। এবার কিছু ধাঁধা বল।

স্ফিংক্স: নিজের কথা বল। সেটাই ধাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। এখন বল দেখি এমন কে আছে যে একই সঙ্গে পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার কাছে সমানভাবে দরকারী।

গ্রিফিনরা: আমরা তাকে পছন্দ করি না। ঐ নোংরা লোকটা আমাদের কেউ নয়।

মেফিস্টোফেলিস: তোমরা ভাবছ তোমাদের এই অতিথির নখ আছে, আর তাই দিয়ে আঁচড়ে দেবে। তোমাদের ঠোঁটগুলোও ত খুব তীক্ষ্ণ। তাহলে মিল খাবে না? দেখ না পরখ করে একবার?

স্ফিংক্স: যদি ভাল লাগে এখানে থাকতে পার। তবে এখানে তোমার এমনই খারাপ লাগবে যে তুমি চলে যাবে নিজের দেশে।

মেফিস্টোফেলিস: তোমাদের উপরের দিকটা খুব একটা সুন্দর না হলেও তার একটা আবেদন আছে। কিন্তু নিচের দিক পশুর মত এবং ভয়ের সঞ্চার করছে আমার মনে।

স্ফিংক্স: তুমি এক তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আমাদের পায়ের থাবাগুলো যেমন তীক্ষ্ণ তোমার পায়ের পাতাগুলো তেমনি ঘোড়ার ক্ষুরের মত শক্ত। তবু তুমি অস্বস্তি অনুভব করছ আমাদের মাঝে। (উপরে সাইরেন নামক একজাতীয় পাখির আবির্ভাব)

মেফিস্টোফেলিস: অদূরবর্তী ঐ নদীর ধারে পপলার গাছের মাথার উপর যে পাখির দল উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা কি পাখি?

স্ফিংক্স: ওরা সবচেয়ে ভাল জীব। ওরা প্রেম জাগায় মানুষের মনে।

সাইরেনরা: কুৎসিত লোকদের গায়ের কালো রং দেখলেই বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে যাও কেন? আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছি তোমাদের গান শোনাতে। আমাদের মিষ্টি গান প্রেমের গান শোন।

স্ফিংক্স: (সাইরেনদের সুরে সুর মিলিয়ে) ওই গাছের শাখায় ওদের নামতে বল। ওরা ওই শাখার আড়ালে ওদের পায়ের তীক্ষ্ণ নখগুলোকে লুকিয়ে রেখেছে। কেউ ওদের গান শুনলেই তাকে ওরা সে নখ দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেবে।

সাইরেনরা: ঘৃণা ও হিংসা দুটোই দূর করে দাও। আমরা দূর স্বর্গলোক

থেকে বিশুদ্ধ পরমাণু নিয়ে আসি। আমরা মধ্যভূমির সর্বত্র জলে স্থলে প্রান্তরে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াই। হে অচেনা পথিক, তোমাকে স্বাগত জানাই।

মেফিস্টোফেলিস: তোমাদের গানে কিন্তু নূতনত্ব আছে। তোমাদের কণ্ঠ ও বীণার তারের ঝঙ্কার এক হয়ে এক অপূর্ব সুরসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমার কানে ঢাকের আওয়াজ শুনছি আমি। অন্য আওয়াজ আমার অন্তরে প্রবেশ করছে না।

স্ফিংক্স: অন্তর বলো না। বলো চামড়ার এক কুঞ্চিত থলে। অন্তর কথাটা তোমার মুখের সঙ্গে খাপ খায় না।

ফাউস্ট: কি আশ্চর্য! ঐ ঘৃণ্য অতিবাস্তব জীবগুলোকে দেখতে আমার ভাল লাগছে। তবে এটাও বুঝছি ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের আভাস রয়েছে ওদের মধ্যে। ওদের ঐ বিষাদগম্ভীরতা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। (স্ফিংক্সের দিকে তাকিয়ে) একদিন ঈডিপাসও ওদের কাছে গিয়েছিল। ওদের শরণ নিয়েছিল। (সাইরেনদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে) একদিন ওরা ইউলিসেসকে বিভ্রান্ত করেছিল। (গ্রিফিনদের দেখিয়ে) এদের দেখলে মনে নূতন শক্তি পাই। এদের সুন্দর রূপের পানে তাকালে অনেক ভাল ভাল স্মৃতি জেগে ওঠে।

মেফিস্টোফেলিস: একদিন তুমি এই সব প্রাচীন জীবদের অভিশাপ দিতে। কিন্তু আজ তুমি ওদের দেখে আনন্দ পাচ্ছ। কোন মানুষ তার প্রিয়তমার খোঁজ করার সময় দৈত্যদানবদেরও খাতির করে।

ফাউস্ট: (স্ফিংক্সদের সম্বোধন করে) হে নারীমূর্তিধারণকারিণীরা, আমার কথা শোন। তোমাদের কেউ হেলেনাকে দেখেছ?

স্ফিংক্স: হেলেনার আগেই গ্রীসদেশে আমাদের বংশ ধ্বংস হয়। আমাদের শেষ বংশীয় নিহত হয় হার্কিউলেসের হাতে। তুমি শিরণকে জিজ্ঞাসা করতে পার। এই ভূতুড়ে রাত্রিতে আশা পূরণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

সাইরেনরা: ব্যর্থতা তোমার ভাগ্যে নেই। ইউলিসেস আমাদের পাশ দিয়ে সমুদ্রে যাবার সময় আমাদের অস্বীকার করেছিল। আমাদের কথা অনেক জেনে পরে সে বর্ণনা করে। সমুদ্রের নীল জলে ছড়ানো আমাদের রূপের মালার সন্ধান করো। সব জানতে পারবে।

স্ফিংক্স: ইউলিসেসের মত ওদের কথার ছলনায় এভাবে প্রতারিত হয়ো

না। সুপরামর্শের দ্বারা আমরা তোমাকে বরণ করে যাব। শিরণের দেখা যদি না পাও তাহলে কি করতে হবে আমরা বলে দেব। (ফাউস্টের প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস: (রাগের সঙ্গে) ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সারবন্দীভাবে ওরা কত দ্রুতবেগে উড়ে গেল। কোন শিকারী ওদের গান শেষ করতে পারবে না।

স্ফিংক্স: শীতের ঝড়ো হাওয়ার মত স্টিমফালিদের মত ওরা দ্রুতগামী, এ্যালসিদের শর ওদের নাগাল পায়না। ওদের পাগুলো রাজহাঁস আর ঠোঁটগুলো শকুনির মত। ওরা কখনো আমাদের কাছে আপন হয়ে আসতে চায় না।

মেফিস্টোফেলিস: আর একটা জানোয়ার কোথায় ফোঁস ফোঁস করছে।

স্ফিংক্স: ভয় পেও না। বল তোমার দুঃখের কারণ কি? কেন তুমি অশান্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছ? সামনে দেখবে লামিয়ার একদল সুন্দরী বারবনিতা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের অভিবাদন জানাবে।

মেফিস্টোফেলিস: কিন্তু তোমরা থাক এখানে যাতে দরকারের সময় পেতে পারি।

স্ফিংক্স: হ্যাঁ, তোমার পিছনে ওদের কাছে চলে যাও। হাজার বছর ধরে আমরা মিশর দেশে বাস করে আসছি। আমাদের প্রতি তোমার যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে তোমার ভাগ্য আমরা ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যাব গ্রহ-নক্ষত্রের বৈরিতা সত্বেও। যুগ-যুগান্তর ধরে অক্ষয় হয়ে পিরামিডের সামনে বসে মানব জাতির সকল কর্মাকর্মের সনাতন সাক্ষীরূপে তাদের বিচার করে চলি। কোন যুদ্ধ বন্যা বা বিপর্যয় কোন ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না আমাদের।

দ্বিতীয় রাত্রি

(উপনদীবাসিনী জলপরীদের দ্বারা পরিবৃত)

পেলেউস: হে নলখাগড়াগণ, আন্দোলিত হও। মৃদু মর্মরধ্বনিতে তীরবর্তী পপলার গাছগুলির সঙ্গে কথা বল চুপিসারে। তাদের স্বপ্নের ব্যাঘাত ঘটাও। ভয়ঙ্কর এক বিপদের আভাস পেয়ে জেগে উঠেছি আমি। এক গোপন ভয়ের শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে আমার বুকের শান্ত জল।

ফাউস্ট: (এগিয়ে এসে) আঙুর ক্ষেতের ধারে বনের মধ্যে মানুষের মত কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মনে হলো নদীর ঢেউগুলো খেলাচ্ছলে কথা

বলছে বাতাসের সঙ্গে।

জলপরীরা : নিরন্তর সন্ধানকার্যে অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি। তোমার বিশ্রাম দরকার। এখানে শুয়ে পড়ে তোমার তপ্তক্লান্ত দেহকে শীতল করো। তুমি যখন মধুর বিশ্রামের আস্বাদন গ্রহণ করবে আমরা তখন মৃদু মর্মরধ্বনির মত কথা বলব তোমার সঙ্গে।

ফাউস্ট : আমি এখন জেগে উঠেছি। আমার দেরি হয় হোক। ওরা কি স্বপ্নের মূর্তি? ঐসব অনিন্দ্যসুন্দরী মূর্তিরা আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাক। নদীবিধৌত ঐ শান্তশীতল ঝোপের ধারে আমি একটু আগে সত্যিই খুব শান্তিতে ছিলাম। চারদিক হতে অসংখ্য ঝর্ণা গান গেয়ে বয়ে যাচ্ছিল। ঐ সব সুন্দরীরা নগ্নদেহে যখন সাঁতার কাটছে নদীর স্বচ্ছ জলে তখন তাদের দেহগুলি প্রতিফলিত হচ্ছে নদীর জলে। তাদের জলকেলির এই দৃশ্যটি মধুর হলেও অদৃশ্য কামনার বস্তুটিকেও আমি ভুলিনি। পত্রাচ্ছন্ন এই বনভূমি ভেদ করে আমার সন্ধানী দৃষ্টি দূরে প্রসারিত হচ্ছে সেই সৌন্দর্যের পরীর সন্ধানে। নদীর বুকে শুভ্র তরঙ্গের মত বনহংসরা সাঁতার কাটছে। তারা মাঝে মাঝে পালক ঝারছে আর কপটদ্বন্দ্বে মেতে উঠছে নিজেদের মধ্যে। পুরুষ হাঁসরা তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়ে হাঁসদের।

জলপরীরা : হে ভগিনীগণ, নদীর ধারে ঘাসের উপর কান পেতে শোন, ঘোড়ার ক্ষুরের একটা চলমান শব্দ এগিয়ে আসছে। ভয়ে কাঁপুনি আসছে আমার। এই রাত্রিতে কে কার বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে কে জানে!

ফাউস্ট : দেখ দেখ, শক্তি ও তেজের দ্যোতকরূপী এক অশ্বারোহীর পদভরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পৃথিবীর মাটি। ওরই কাছে আছে আমার সৌভাগ্য। আমি কি লাভ করব আমার বাঞ্ছিত বস্তু? আমি তাকে না চিনলেও ফিলাইরার ঐ সুদর্শন পুত্রকে অভিবাদন জানাই। থাম শিরণ, আমার কথা শোন।

শিরণ : কি কথা?

ফাউস্ট : তোমার গতিবেগ সংবরণ করো।

শিরণ : আমার যাবার সময় নেই।

ফাউস্ট : তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও। আমার অনুরোধ রাখ।

শিরণ : তাহলে উঠে পড়। কোথায় যাবে? নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ

তুমি। আমি তোমাকে নদী পার করে দেব।

ফাউস্ট : (ঘোড়ায় উঠে) তুমি কোন দিকে যাবে? হে শক্তিমান পুরুষ, তুমি একটি বীর জাতিকে শিক্ষা দান করতে। গ্রীকজাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তোমার নাম। তোমার কার্যাবলী কবিদের মধ্যে ভাবের উদ্রেক করে।

শিরণ : এসব কথা আর বলতে চাই না। এখন নেস্টর ও প্যালাসকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, যেন তারা লেখাপড়া শেখেনি।

ফাউস্ট : যিনি আর্তকে উদ্ধার করেন, মানুষের দেহমনের ক্ষত সারিয়ে দেন, যাঁর কথা মানুষের অন্তরের মর্মমূলকে আলোকিত করে আমি তাঁকেই বরণ করে নিতে চাই।

শিরণ : যখন বীরেরা আমার কাছে আসত, পরামর্শ চাইত, আমি আমার জ্ঞান ও নীতি উপদেশের দ্বারা তাদের সাহায্য করতাম। কিন্তু আজকাল সে কাজ আমি যাজক আর বাচাল বুড়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

ফাউস্ট : তোমার কথা শুনে বেশ বোঝা যায় তুমি একজন প্রকৃত মহৎ লোক। যিনি নিজের প্রশংসার কথা শুনতে চান না, যিনি মনে করেন তাঁর চারপাশে আজও তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি অনেক আছে।

শিরণ : মনে হচ্ছে তুমি সাধারণ মানুষ ও রাজা রাজড়া সবাইকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করতে পার।

ফাউস্ট : তবে আশা করি একটা কথা তুমি আমায় বলবে। অতীত গৌরবের অনেক কিছু তুমি দেখেছ। এখন বল, সেকালের সব বীরদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে।

শিরণ : গ্রীকদের মধ্যে এক একজন বীর এক একদিকে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন ক্যাস্টর ও পোলাক্স দেহগত শক্তি ও বীরত্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল শাসকরূপে জেসন খ্যাতি লাভ করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ বীণাবাদকরূপে মানুষের মন জয় করেন অর্ফিয়াস। আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে দিনরাত জাহাজচালনায় সর্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিল লাইনেউস।

ফাউস্ট : কিন্তু হার্কিউলেসের নাম না করে তার প্রতি অন্যায় করেছ তুমি।

শিরণ : স্বর্গলোকে ফীবাস, এ্যারেস, হার্মিসের লীলা আমি দেখিনি। তবে মর্ত্যভূমিতে দেখেছি এক দেবতার লীলা। কী অপূর্ব তাঁর যৌবনসমৃদ্ধ রাজকীয়

রূপ। অবশ্য তিনি তাঁর অগ্রজ ও সুন্দরী রমণীদের কিছুটা বশীভূত ছিলেন। কোন গাথা তাঁর গুণগান ঠিকমত করতে পারে না, কোন মর্মরপ্রস্তর ঠিকমত তাঁর প্রতিরূপ নির্মাণ করতে পারে না।

ফাউস্ট: সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের কথা বললে। এবার সবচেয়ে সুন্দরী এক নারীর কথা বল।

শিরণ: নারীর সৌন্দর্যে কোন বস্তু আছে বলে মনে করিনা। আমি হচ্ছি গুণের উপাসক। দেহগত রূপলাবণ্য যখন গুণাবলীর সঙ্গে মিলিত হয় তখনি তা আকর্ষণ করে মুগ্ধ করে আমাদের। এ বিষয়ে আমি হেলেনাকে শ্রদ্ধা করি, যাকে আমি একদিন আমার পিঠে বহন করেছিলাম।

ফাউস্ট: তাকে বহন করেছিলে ?

শিরণ: আমার এই পিঠে।

ফাউস্ট: আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এ বিষয়ে আরও কিছু বল। এই হেলেনা হচ্ছে আমার কামনার ধন। একমাত্র উচ্চাশার বস্তু। কোথায় তাকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলে ?

শিরণ: ব্যাপারটা এমন কিছু কঠিন নয়। দস্যুদের হাত থেকে হেলেনার ভাই ডিসকুবীঁ যখন তাকে উদ্ধার করতে এসেছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। ডাকাতদের ভয়ে ভাই বোনে যখন পালাচ্ছিল তখন জলাভূমি তাদের গতিরোধ করে। তখন হেলেনা ডুবে যেতে যেতে আমার মাথার চুল ধরে। আমি তাকে আমার পিঠে করে বহন করে উদ্ধার করি। সে আমায় মিষ্ট কথায় ধন্যবাদ দেয়। কী অপূর্ব তার যৌবনসৌন্দর্য !

ফাউস্ট: তার বয়স কত ?

শিরণ: ভাষাতাত্ত্বিকরা নিজেদের যেমন প্রতারণা করে তেমনি তোমাকেও প্রতারিত করেছে। পৌরাণিক সুন্দরীদের কোন বয়স নেই। তাদের রূপ চিরন্তন। সকল যুগের কবিরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে স্মরণ করে। তাদের বয়স বাড়ে না। লাবণ্য ম্লান হয়না।

ফাউস্ট: তাহলে কালের বন্ধনে তাকে আবদ্ধ করো না। একদিন ফেবার দ্বীপপুঞ্জে একিলিস তাকে যেমন দেখেছিল আজও সে কালের সব বন্ধনকে অস্বীকার করে ঠিক তেমনিই আছে। অনন্ত রূপযৌবনা এই নারীর প্রেম লাভ করা এক পরম সৌভাগ্যের কথা। আমি কি আমার সারা জীবনের কামনায় নিবিড়তার দ্বারা তাকে লাভ করতে পারব না ? সেই অক্ষয় দেবীপ্রতিমাসম

মূর্তিকে তুমি দেখেছ স্বচক্ষে। আমি দেখেছি স্বপ্নে। আমার সমগ্র অন্তরাত্মা বাঁধা পড়ে গেছে তার রূপের বাঁধনে। তাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

শিরণ: হে অতিথি, তুমি মরণশীল মানুষ বলেই এত আবেগ অনুভব করছ। আমাদের মনে হচ্ছে তুমি উন্মাদ। তবু মনে হচ্ছে তোমার আশা পূরণ হতে পারে। বছরে একবার করে আমি ম্যাণ্টোর বাড়ি যাই তার বাবার চিকিৎসার জন্য। তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করতে পার তাহলে মনে হয় সে তার শক্তি দিয়ে তোমার মনের রোগ সারাতে পারবে। তার সে ক্ষমতা আছে।

ফাউস্ট: কিন্তু আমার এ রোগ সারবে না। আমার লক্ষ্য হচ্ছে বিরাট। আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না কখনো।

শিরণ: কিন্তু তার রোগনিরাময় ক্ষমতাকে অবহেলা করতে পার না। তাড়াতাড়ি নাম, এসে গেছি।

ফাউস্ট: উপলখণ্ডে আকীর্ণ এই নদীবক্ষের উপর দিয়ে এই রাত্রিতে কোথায় নিয়ে এলে?

শিরণ: এই সেই স্থান যেখানে একদিন গ্রীস আর রোম তাদের শক্তি পরীক্ষা করে। এখানে অলিম্পাস প্রাসাদের পদতল বিধৌত করে পেলেউস নদী বয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বালুকাবেলায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় এ দেশ। রাজা-রাজড়ারা সব কোথায় পালিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটি মন্দির, চাঁদের আলোয় চূড়াটি যার চকচক করছে।

ম্যাণ্টো: অশ্বক্ষুরধ্বনিতে কাঁপছে মন্দিরের সিঁড়িগুলো। নিশ্চয় কোন উপদেবতা আসছে।

শিরণ: ঠিক তাই। তোমার চোখ খুলে দেখ কে এসেছে।

ম্যাণ্টো: এস। তোমার কথা কখনো মিথ্যা হয় না।

শিরণ: তোমার মন্দির আজও তোমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ম্যাণ্টো: এখনো সমান গতিতে ছুটে চলেছ তুমি?

শিরণ: তুমি যখন শান্ত হয়ে বসে থাক আমি তখন চঞ্চল গতিতে ছুটে চলার মধ্যেই আনন্দ পাই।

ম্যাণ্টো: আমি বসে বসে প্রতীক্ষা করি আর আমার চারদিকে অশান্ত কালের চাকা আবর্তিত হয়। কিন্তু এ কে?

শিরণ: আজকের রাত্রির ঘূর্ণ্যাবর্তে ও তোমার কাছে এসে পড়েছে। ও

হেলেনার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। তাকে ও লাভ করবেই। কিন্তু কোথায় কিভাবে তাকে পাবে তা জানে না। তবে ও তার সত্যিই যোগ্য।

ম্যাণ্টো: যে অসম্ভবকে কামনা করে আমি তাকে ভালবাসি।

শিরণ: হে হঠকারী, এগিয়ে এস। ভবিষ্যতের এক সুখসত্তার প্রতীক্ষায় আছে তোমার জন্য। এই অন্ধকার পথ তোমাকে নিয়ে যাবে পার্সিফোনিতে। অলিম্পাস পাহাড়ের সানুদেশে সে প্রতীক্ষায় থাকবে। একবার অতীতে আমি অর্ফিয়াসকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে। সাহসের সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা করো। (অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে নামল)

তৃতীয় রাত্রি

পেলেউসের উত্তরাঞ্চল (আগের মত)

সাইরেনরা: পেলেউস নদীর শীতল তরঙ্গমালায় অবগাহন করো। জলকেলি করো। স্তোত্রগান হচ্ছে। কত হতভাগ্যদের উদ্ধার করি আমরা। জল ছাড়া জীবনের কোন অর্থ হয় না। নীল ইজিয়াস সাগরের ঢেউ-এ আরও আনন্দ আছে। আছে আরও উচ্ছ্বলতা। (ভূমিকম্প) একি, নদীর ঢেউগুলো উল্টোদিকে বইছে। নদীর বুক কাঁপছে প্রবলভাবে। পাথুরে কূলগুলো ফেটে যাচ্ছে, ভেঙ্গে যাচ্ছে। চল, পালিয়ে যাই আমরা, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। ভূমিকম্প ভয় দেখাচ্ছে আমাদের। আমরা সমুদ্রে গিয়ে অবাধে জলকেলি করব, সমুদ্রে স্নান করে রাত্রির স্নিগ্ধ শিশিরে সজীব হয়ে উঠব আমরা। আমরা যথাশক্তি প্রয়োগ করে উপরে ওঠার চেষ্টা করছি।

স্ফিংক্স: এ কি ভীষণ কম্পন! এক ভয়ঙ্কর কম্পনের প্রবলতায় সব কিছু কাঁপছে দুলছে। চারদিকে ভীতিবিহ্বল জীবরা ছোটাছুটি করছে। কিন্তু আমরা কোন স্থান পরিবর্তন করব না। আমরা এখানেই অধিষ্ঠিত থাকব। কি আশ্চর্য, একটা বিরাট প্রাসাদের চূড়া উপরে উঠছে। সেই প্রাচীন বৃদ্ধ যিনি এক গর্ভবতী নারীর জন্য সমুদ্রের মাঝখানে ডেলস দ্বীপের সৃষ্টি করেন তিনিই এ ভূমিকম্প সংঘটিত করেন। অসহিষ্ণু আটলাসের মত তিনি পৃথিবীর সবুজ আঁচলটাকে ওলটপালট করে দিচ্ছেন। নদীর কূল জল সব এক হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সম্মুখস্থ উপত্যকাও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যেন এক দৈত্য কাঁধে এক বিরাট বোঝা নিয়ে টলতে টলতে আসছে। কিন্তু আমাদের কাছে আর এগোতে পারবে না।

সীসমস: এ কাজ আমার একার। এর জন্য যা কিছু প্রশংসা সব আমার

প্রাপ্য। আমি যদি মাঝে মাঝে এভাবে পৃথিবীকে না কাঁপিয়ে তুলি তাহলে পৃথিবী কখনো এত সুন্দর থাকতে পারে না। আমি যদি অত চেষ্টা করে এই ভাবে না কাঁপাতাম তাহলে পাহাড়গুলো উঁচু মাথায় ছবির মত ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকত না। আমি অনেক সহ্য করে সমুদ্রের গভীর থেকে পাহাড়গুলোকে টেনে তুলেছি।

স্ফিংক্স: আমরা তার সাক্ষী আছি। এইভাবে টেনে না তুললে পাহাড়-গুলোকে পাহাড় বলে মনেই হত না। এক ঘন বন চারদিকে প্রসারিত হয়ে এই সব পাহাড়ের মুখগুলোকে ঢেকে রেখেছে। তার মাঝখানে আমরা স্ফিংক্স-বেশে নিরাপদেই বাস করছি। আমাদের আসন কেউ টলাতে পারবে না।

গ্রিফিনরা: চারদিকে সোনা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে অন্ধকারে। এমেটরা, তাড়াতাড়ি যাও। তা না হলে অন্যেরা দেখে ফেলবে।

এমেটদের কোরাস: থাক পাহাড়। পাহাড় ডিঙিয়ে ঝর্ণার ধারে গিয়ে চকচকে সোনাগুলোকে কুড়িয়ে আন। একটু কষ্ট করো।

গ্রিফিনরা: নাও নাও, তাড়াতাড়ি সোনা কুড়িয়ে জড়ো করো। যারা সবচেয়ে বেশী কর্মক্ষম তারাই সবচেয়ে বেশী সম্পদ লাভ করে সঞ্চয় করে।

পিগমিরা: আমরা কোথা হতে কেমন করে এসেছি তা বলতে পারব না। তবে আমরা এখানে ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মত খর্বকায় নরনারীদের ধরিত্রীমাতা পূবে পশ্চিমে সৃষ্টি করে আমাদের জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদেব সুখ ও সৌভাগ্য দান করেছেন।

পিগমিদের প্রধান: এখন আমাদের একমাত্র শত্রু হলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা ঐ সব বক ও সারস পাখিগুলো। তাড়াতাড়ি শক্তি সঞ্চয় করে তীর ধনুকসহ ঐ সব শত্রুদের সম্মুখীন হও। ওরা সংখ্যায় অগণ্য। ওদের তীরবিদ্ধ করো। ওদের পালক আমাদের শিরস্ত্রাণে শোভা পাবে।

সারস পাখিরা: কে আমাদের বাঁচাবে? কে আমাদের মুক্ত করবে পরাধীন-তার বন্ধন থেকে? নিষ্ঠুর পিগমিরা আমাদের সকলকে হত্যা করছে। আর্তের ভয়ার্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস মুখরিত। তাদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি।

মেফিস্টোফেলিস: আমরা সহজেই উত্তরে ডাইনিদের দমন করেছি। কিন্তু এই বিদেশে আমার কোন শক্তি নেই। জায়গাটার নাম ব্রকসবার্গ। জায়গাটা মন্দ নয়। এখানে এক সমতলবর্তী বনপথের উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ

একটা পাহাড় পেয়ে গেলাম। পাহাড়টা ওদিকের স্ফিংক্সটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের সানুদেশে চারদিকে আগুন জলছে আর ল্যামি নামে অদ্ভুত ধরনের মেয়েরা নাচগান ও হৈ হুল্লোড় করছে। ডাইনিদের রাজা হেনরি আর রাণী ইলস্ পাহাড়ের উপর পাথরের সিংহাসনে বসে আমাকে লক্ষ্য করছে। কোথাও কোনভাবে পালাবার উপায় নেই। আমি লুকিয়ে আড়াল থেকে ওদের নাচগান দেখে এক গোপন আস্বাদ পাচ্ছি।

ল্যামিরা: তাড়াতাড়ি ধর ওকে। কই হে পাপাত্মা যাদুকর, আমাদের পিছু পিছু এস। পা টেনে টেনে চলছে। আমাদের সঙ্গ নিতে পারছে না। আমাদের ধরতে পারছে না।

মেফিস্টোফেলিস: কী অভিশপ্ত আমাদের ভাগ্য! সেই আদি পিতা আজকের আমল থেকে এই নারীজাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছি আমরা। আমাদের যথেষ্ট বয়স বাড়লেও সে পরিমাণে জ্ঞান বাড়ে না। আমরা জানি ওদের মধ্যে কোন বস্তু নেই। তবু বারবার ঠকে যাই ওদের কাছে। ওদের অর্ধনগ্ন দেহ আর রংমাখা মুখ দেখে ভুলে যাই। ওরা স্বভাবতই দুর্বল, কোন অঙ্গের উপর নির্ভর করা যায় না। সব জেনেও ওদের প্রতিটি কণ্ঠ-ধ্বনিতে শুনি বাঁশির সুর আর তাতে নেচে উঠি আমরা।

ল্যামিরা: থাম থাম, ও ভাবছে। ওর গতি শ্লথ হয়েছে। পিছন ফিরে দেখ, তা না হলে পালিয়ে যাবে।

মেফিস্টোফেলিস: (লম্বা লম্বা পা ফেলে) এগিয়ে চল। যে সংশয় আমার শক্তিকে বিকল করে দিচ্ছে আমি তাকে প্রশ্রয় দেব না। শয়তান ডাইনিদের সহ্য করবে না ত করবে কাদের!

ল্যামিরা: আমাদের মধ্যে কাউকে ও ভালবাসার জন্য বেছে নিতে পারে।

মেফিস্টোফেলিস: ধিক, কৃত্রিম সাজগোজের মধ্যেও সুন্দরী দেখাচ্ছে তোমাদের।

এম্‌পুসা: (ল্যামিদের কাছে এগিয়ে এসে) আমাকেও তোমাদের দলে নাও। আমি তোমাদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য।

ল্যামিরা: ও আমাদের খেলার আনন্দ সব নষ্ট করে দেয়।

এম্‌পুসা: (মেফিস্টোফেলিসকে) তোমার পায়ে ঘোড়ার ক্ষুর আর আমার পায়ে গাধার ক্ষুর। তবু তোমাকে ভালই দেখাচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস : হে বিদেশিনী, আমি এটাই ভেবেছিলাম। আমি আমার আপনজন পেয়ে গেছি। হাংস থেকে হেলাস দ্বীপ পর্যন্ত ঘুরে এরকম অনেক আপনার লোক পেয়ে গেছি।

এম্‌লুসা : আমি অনেক রূপ পরিগ্রহ করতে পারি। তবু তোমার সম্মানার্থে বর্তমানে গাধার মাথা গ্রহণ করেছি।

মেফিস্টোফেলিস : আমি এখানে অনেক বড় ঘটনা আশা করছি। তবে যাই ঘটুক না কেন, আমি এই গাধার মাথাওয়ালা মেয়েটিকে ছাড়ব না।

ল্যামিরা : ওকে ছেড়ে দাও, মেয়েটা কুৎসিত। ওর মধ্যে কোন লালিত্য নেই। ও যেখানেই যায় সেখানকার সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু তোমাদেরও আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে তোমাদের গোলাপী গালের সৌন্দর্যের অন্তরালে কোন অসৌন্দর্য লুকিয়ে আছে।

ল্যামিরা : কিন্তু খুঁজে দেখ, আমরা সংখ্যায় অনেক আছি। তোমার পকেটে পয়সা থাকলে ভাল জিনিসই পাবে। আমরা এমন এক অদ্ভুত প্রেমিক চাই যে বিজ্ঞের মত বড় বড় কথা বলবে এবং আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেবে। পরে ধীরে ধীরে তার মুখোস খুলে যাবে আর স্বরূপটা বেরিয়ে পড়বে।

মেফিস্টোফেলিস : (একজনকে ধরে) সবচেয়ে সুন্দরীকে পেয়ে গেছি। ...কী অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাঁটা খেলাম। (অন্য একজনকে ধরে) কিন্তু এই মেয়েটা......না। কি কুৎসিত মুখ!

ল্যামিরা : নিজেকে এর থেকে সৌভাগ্যের উপযুক্ত বলে ভেবোনা কখনো।

মেফিস্টোফেলিস : ওই বেঁটে মেয়েটা আমার মনে ক্ষুধা জাগালেও টিক-টিকির মত আমার হাতের ফাঁক দিয়ে গলে গেল। ও এত ছোট। ওর এই মাথার চুলগুলো সাপের মত কিলবিল করছিল। আবার ঐ লম্বা মেয়েটাও দেখতে খারাপ। এর পর? ঐ মোটা মেয়েটাকে ধরব। হয়ত ওর মাঝেই আমি পাব আকাঙ্খিত আনন্দ। তুর্কীরাও ঐ রকম মোটা মেয়ে চায়। কিন্তু হায়, ফাঁপা বলের মত মেয়েটা ফেটে যাচ্ছে।

ল্যামিরা : চারদিকে ছড়িয়ে পড়, চক্রাকারে ঐ ডাইনির বেটাকে ঘিরে ধর। ও আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছে। নিঃশব্দে উড়ে বেড়িয়ে

ডানার ঝাপটা দাও। ও পালিয়ে যাচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস: আমি এখানে এসে বোকা বনে গেছি। উত্তরের থেকে এ জায়গাটা আরও খারাপ। আমি চেয়েছিলাম মুখোস নৃত্যের এক সুন্দর নিটোল অনুষ্ঠান। কিন্তু তার বদলে দেখছি যত ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে কাণ্ড। (পাহাড়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলল) আমি কোথায় আছি? কোথায় যাচ্ছি? সমতল পথের উপর দিয়ে আমি হাঁটছিলাম, হঠাৎ দেখি, সামনে পর্বতপুঞ্জ। বৃথাই আমি তাতে ওঠানামা করছি। পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সেই স্ফিংক্সই বা কোথায়? এই রাত্রিটা কাটে কি করে?

পার্বত্য দেবতা ওরিয়াজ: এস আমার কাছে। আমার এই পাহাড় বহু প্রাচীন। আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে একদিন পম্পে মৃত্যুবরণ করে। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ পাহাড় অদৃশ্য হয়ে যাবে কোথায়, কোন গহ্বরে নেমে যাবে খুঁজেই পাবে না।

মেফিস্টোফেলিস: ওক গাছের মালা গলায় দেওয়া হে প্রধান, তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই। স্বচ্ছ চাঁদের আলো পত্রাচ্ছন্ন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে পারে না। হঠাৎ আমি ঝোপের মধ্যে এক উজ্জ্বল আলো দেখছি। মনে হয় নিশ্চয় ও হচ্ছে হোমুনোলাস। কোথা হতে আসছ হে স্বপ্নালু প্রেমিকমশাই?

হোমুনোলাস: এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় অনেক ঘুরে বেরিয়েছি আমি অশান্ত চিত্তে। কিন্তু এতদিন ধরে কি পেলাম, কি দেখলাম। বস্তুর মধ্যে কোন সত্যকে খুঁজে পাচ্ছিনা। এই পথে আমি ছ'জন দার্শনিকের দেখা পাই। তারা 'প্রকৃতি' 'প্রকৃতি' বলে চিৎকার করছিল। আমি তাদের আঁকড়ে ধরে থাকব। তারা নিশ্চয় পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছে। সেই সত্যকে আমিও জেনে আমি আমার পথ খুঁজে নেব, উপযুক্ত যুক্তির সঙ্গে নীতি খাড়া করব।

মেফিস্টোফেলিস: তা যদি করতে চাও নিজের চেষ্টায় তা করো। এখানে নরক থেকে যে ভূতের দল আসে তার মধ্যে দার্শনিকদেরও পাবে। কিন্তু কোন ফল হবে না তাতে। নিজের চেষ্টায় সত্যকে খুঁজে পাবার জন্য কাজ শুরু করে দাও।

হোমুনোলাস: সৎ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে নেই।

মেফিস্টোফেলিস: তাহলে তোমার পথে তুমি চলে যাও। পরে দেখা হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

এ্যানাকজাগোরাস (থেলস্‌কে) : তোমার অনমনীয় মনকে নরম করা গেল না। তুমি বোঝার চেষ্টা করো।

থেলস্‌ : যে কোন বাতাসের কাছে বড় বড় ঢেউরা আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু পাহাড় থেকে তারা দূরে থাকে। পাহাড়ের কাছে নত হয় না তারা।

এ্যানাকজাগোরাস : উষ্ণ উত্তপ্ত বাষ্পরাশি থেকেই ঐ সব পাহাড়ের উৎপত্তি হয়।

থেলস্‌ : আর্দ্রতা বা জল থেকেই জৈব জীবনের উৎপত্তি হয়।

হোমুনোলাস : আমি কি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি ? আমি মানুষ হতে চাই।

এ্যানাকজাগোরাস : বল থেলস্‌, তুমি কি একরাতের মধ্যেই কর্দমাক্ত জল থেকে ঐ সব পাহাড়গুলোকে তুলে এনেছ ?

থেলস্‌ : প্রকৃতি ও তার চিরপ্রবহমান শক্তি কখনো দিনরাত্রি প্রভৃতি কোন কালখণ্ডের সীমা বা শাসন মেনে চলে না। প্রকৃতি আপন নিয়মে সব বস্তুকে সৃষ্টি করে চলে।

এ্যানাকজাগোরাস : কিন্তু পৃথিবীর গর্ভনিহিত বিরাট আগ্নেয় শক্তি বিস্ফো-রণে ফেটে পড়ে পৃথিবীর বুক ফাটিয়ে অগ্ন্যুদ্‌গারের সময় ঐ পাহাড়গুলোকে তুলে দেয়।

থেলস্‌ : কিন্তু তার ফলে কি হবে ? পাহাড়গুলো ত দাঁড়িয়েই থাকবে। এ বিবাদে শুধু অনর্থক সময় নষ্ট হয়।

এ্যানাকজাগোরাস : এই সব পার্বত্য অঞ্চলে মার্মিডন, পিগমি, এস্মেটেস, অঙ্গুলিপ্রমাণ ক্ষুদ্রকায় প্রভৃতি কর্মঠ প্রাণীরা বাস করে। তারা সব সময় কর্ম-ব্যস্ত থাকে। (হোমুনোলাসকে) তুমি কখনো বড় হতে চাওনি। আত্ম-প্রসাদের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছ। তুমি তোমার মনকে সংযত করতে পারলে আমি তোমাকে ঐ সব ক্ষুদ্রকায় কর্মঠ মানুষদের রাজা করে দেব।

হোমুনোলাস : কিন্তু থেলস্‌ কি বলেন ?

থেলস্‌ : আমি এ পরামর্শ দেব না। কারণ ছোট পথে ছোট কাজই হয়। বড় পথ ছোট মানুষকেও বড় করে তোলে। কারণ ওখানে গোলমাল লেগেই আছে। প্রথমে বড় বড় সারস পাখিরা ঠোঁট দিয়ে ছোট ছোট পিগমিদের ঠোকরাত, পা দিয়ে মাড়াত। তখন পিগমিরা প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে তীর ধনুক দিয়ে সারস পাখিদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। তাদের পালক

দিয়ে মাথার শিরস্ত্রাণ সাজায়। তখন সারস পাখিরা পালিয়ে যায়।

এ্যানাকজাগোরাস: (একটু থেমে) আমি পাতালবাসী কোন দেবতার শক্তিতে বিশ্বাসী নই। আমি চাই উর্ধ্বতম কোন দৈব শক্তির সাহায্য। ডায়েনা, লুপ ও হিকেট এই ত্রিনামধারিণী হে চন্দ্রদেবী, তুমি যেমন তোমার স্নিগ্ধ কিরণ-জাল ছড়িয়ে দাও, তেমনি সমস্ত মায়ার আবরণ ত্যাগ করে তোমার প্রাচীন শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করো। (একটু থেমে) আমার কথা কি দেবী শুনতে পেয়েছেন তাঁর কক্ষপথে? আমার আকুল আবেদন কি আকাশে গিয়ে পৌঁছেছে? ঐ দেখ চন্দ্রদেবীর গোলাকার সিংহাসনটা ক্রমশই বড় হয়ে এগিয়ে আসছে, কাছে আসছে। যেন এক বিশাল রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক। কিন্তু আর এগিয়ে এস না। তাহলে এ পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগ সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। থেসালীয় পাইথেলেসদের মত ধ্বংস হয়ে যাব আমরা। কিসের গর্জন শুনতে পাচ্ছি? বজ্র না মত্ত প্রভঞ্জন? তবে কি কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেছি? ক্ষমা করো দেবী।

থেলস্: এই লোকটি কত কি যে দেখতে পায় ও শুনতে পায়। কিন্তু কি ঘটল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সময়টা দুর্যোগঘন হলেও চাঁদ মেঘ-মুক্ত অবস্থায় শান্তভাবে কিরণ দিচ্ছে আগের মত।

হোমুনোলাস: ঐ দেখ, অদূরবর্তী ঐ গোলাকার সূঁচল মাথা পাহাড়টায় পলাতক পিগমিরা আশ্রয় নিয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম চাঁদ থেকে ঐ পাহাড়টা হঠাৎ পড়ে গেল। ঐ পাহাড়টার মধ্যে যারা ছিল সব নিষ্পেষিত হয়ে গেল।

থেলস্: চুপ করো। যাও, তুমি সমুদ্রে যাও, এখানে তোমার স্থান হবে না। তুমি পিগমিদের রাজা বা প্রশাসক হওনি ভালই হয়েছে।

(সকলের প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস: (পাহাড়ের উল্টোদিকে উঠে) ওক গাছে ঘেরা এই খাড়াই পাহাড়টায় আমাকে কি উঠতে হবে?

ড্রায়েদ: শান্ত হও। এখানেই ভাল থাকবে। অন্য কোথাও তুমি আর কোন চাতুর্য দেখাতে পারবে না। আর বাড়ি যেতে চেয়ো না। এখানে এই সব সুপ্রাচীন ওক গাছের মাঝে থেকে যাও। তাদের শ্রদ্ধা করো।

মেফিস্টোফেলিস: প্রয়োজনই কোন স্থানকে স্বর্গ করে তোলে। কিন্তু অদূরে ঐ গুহার মধ্যে কি এক অদ্ভুত আকারের বস্তু রয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

ভ্যায়েদ : ওরা হচ্ছে ফোর্কিয়াদরা। সাহস থাকে ত যাও তাদের কাছে। কথা বল ওদের সঙ্গে।

মেফিস্টোফেলিস : কেন যাব না ? অবশ্য স্বীকার করছি ওদের দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এমন কুৎসিত জীব আমি কখনো দেখিনি। নরকেও আশা করা যায় না। এই সুন্দর গ্রীসদেশে এমন জীব বেমানান। আমাকে দেখে বাদুড়ের মত ওরা কিচমিচ করছে। প্রাচীনতার জন্য তাদের খ্যাতি আছে এখনো।

ফোর্কিয়াদরা : কই আমাকে একটা চোখ দাও ত। দেখি কে আমাদের মন্দিরে এল।

মেফিস্টোফেলিস : হে ত্রিমূর্তিধারিণী দেবীরা, তোমরা তিনমুখে আমায় আশীর্বাদ করো। আমি দূর অজানা দেশ থেকে আসছি। আমি বহু দেব-দেবী দেখেছি ওপসরীয়া প্রভৃতি বহু জায়গায়। তোমাদের মত কোন দেব-দেবী কোথাও দেখিনি।

ফোর্কিয়াদরা : এই প্রেতটার বুদ্ধি আছে।

মেফিস্টোফেলিস : আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি কোন কবি তোমাদের গুণগান করেনি। করবেই বা কি করে ? তোমাদের রূপের কোন ছবি নেই, কোন প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়নি অন্যান্য দেবদেবীদের মত।

ফোর্কিয়াদরা : স্তব্ধনিবিড় নির্জনতায় ঢাকা এই অন্ধকার গুহায় যুগ যুগ ধরে পড়ে আছি আমরা। ও সব কিছু ভাবতেই পারি না।

মেফিস্টোফেলিস : তাহলে কি করে কি হবে ? এখানে তোমরা কাউকে দেখতে পাবে না। কেউ তোমাদের দেখতে পাবে না। তোমরা এমন কোথাও উঠে যাও যেখানে আছে শিল্প আর সমৃদ্ধি। সেখানে তোমাদের মূর্তি নির্মিত হবে।

ফোর্কিয়াদরা : থাম থাম। স্বপ্ন জাগিও না আমাদের মনে। কি লাভ তাতে ? আমরা অন্ধকারের জীব অন্ধকারেই থাকতে চাই চিরকাল। আমরা নিজেদেরই ভাল করে চিনি না। অপরকেও চিনতে চাই না।

মেফিস্টোফেলিস : তোমাদের আমি একটা চোখ আর একটা দাঁত দিতে পারি। তোমাদের তিনটে মাথা তা ভাগ করে নেবে।

ফোর্কিয়াদরা : তুমি একটা চোখ বন্ধ করো।

মেফিস্টোফেলিস : তাই করলাম। এবার আমাকে দেখ। ঝগড়া

বিশৃংখলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর একচক্ষু পুত্র আমি।

ফোর্কিয়াদরা: আর আমরা তার কন্যা। আমাদের তিনজনের একটামাত্র চোখ ছিল, এখন হয়েছে দুটো। দুটো দাঁত। কি সুন্দর লাগছে সব কিছু।

মেফিস্টোফেলিস: এ রূপ আর কাউকে দেখাব না। একেবারে নরকে গিয়ে শয়তানদের ভয় দেখাব। (প্রস্থান)

চতুর্থ রাত্রি

ঈজিয়ান সাগরের তীরবর্তী পার্বত্য গুহা

আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল

সাইরেনরা: এর আগে তাদের কুঞ্চকুটিল যাদুবিদ্যাদ্বারা বদমাস থেসালীয় বুড়ীরা অসৎ উদ্দেশ্যে তোমাকে নিচের দিকে টানতে থাকে। তার জন্য তুমি বেঁকে গেছ ধনুকের মত। তোমার বুকে কত কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে। কিন্তু হে সুন্দরী চাঁদ, আর ভয় নেই। এবার অবাধে বিচ্ছুরিত করো তোমার কিরণমালা।

নেরেইদরা ও ট্রিটনরা: আরো উচ্চরবে গান গেয়ে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের জীবদের ডাক। যখন প্রবলবেগে ঝড় বইতে থাকে তখন আমরা সমুদ্রের গভীরে চলে যাই। আমরা সেখানে গান গাই, মণি-মাণিক্য ও রত্নরাজির দ্বারা ভূষিত করি নিজেদের। এই রত্নরাজি হলো জলমগ্ন ভগ্ন জাহাজের ভেসে যাওয়া সম্পদ।

সাইরেনরা: সমুদ্রের শান্তশীতল জলতলে কত রকমের মাছ খেলা করে। কিন্তু তোমরা মাছের থেকে ভিন্ন এক প্রাণী।

নেরেইদরা ও ট্রিটনরা: এখানে আসার আগে আমরা এ ব্যাপারটা অনেক চিন্তা করেছি। ভেবেছি আমরা কারা। হে আমাদের প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আরো দূরে চল। দেখিয়ে দাও তোমরা মাছের থেকে ভিন্ন কোন জীব।

(প্রস্থান)

সাইরেনরা: ওরা পালিয়ে গেছে এখান থেকে সামোথে্রসে। অনুকূল বাতাস ওদের সাহায্য করেছে। ওরা সেখানে কি করবে কে জানে? আশ্চর্য দেবতা ওরা। ওরা নিজেদের বারবার নূতন করে গড়ে তোলে। কিন্তু নিজেদের দেহ ওরা দেখতে পায় না। হে চাঁদ, মধ্য আকাশে তুমি স্থির হয়ে কিরণ দিতে থাক। যেন এ রাত্রি এখন শেষ না হয়, যেন দিনের আলোর তীক্ষ্ণ তাড়না অনুভব না করি।

থেলস্ (হোমুনোলাসকে) আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে প্রাচীন নেরেউসের কাছে নিয়ে যাই। তার আস্তানা থেকে আমরা খুব দূরে নেই। সে বড় একগুঁয়ে। বদমেজাজই তার একমাত্র ঘৃণ্য রোগ। এই ধরনের লোকদের কেউ সন্তুষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে বলে লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে এবং অনেকে অনেক উপকারও পেয়েছে তার কাছ থেকে।

হোমুনোলাস: তাহলে আর দেরি বা দ্বিধা না করে তার কাছে চল। কাচের জারে আমার আগুন এখনো নিভে যায়নি।

নেরেউস: আমি আমার কানে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনছি না? সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ জাগছে আমার মধ্যে। ঐ সব মানুষগুলো ছোট হয়ে দেবতার মত আকাশচুম্বী উচ্চাশায় মত্ত হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে আমি সৎ ব্যক্তিদের কিছু উপকার করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু পরে দেখলাম আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

থেলস্: হে সমুদ্রসংলগ্ন প্রবীণতম ব্যক্তি, আমরা তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তুমি বিজ্ঞ, আমাদের নিরাশ করে তাড়িয়ে দিও না। মানুষের আকার ধারণকারী এই অগ্নিপুঞ্জকে দেখ। এ তোমার কাছে কিছু পরামর্শ চায়।

নেরেউস: কি পরামর্শ? মানুষ কখন সৎ পরামর্শকে শ্রদ্ধা করেছে? অমনোযোগীর কানে জ্ঞানের কথা বৃথাই ঝরে পড়ে। মানুষ আগের মতই স্বেচ্ছাধীন রয়ে গেছে। তারা যা খুশি তাই করে চলে। এক বিদেশী নারীর কামনায় মত্ত হয়ে ওঠার আগে প্যারিসকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। সে যখন গ্রীসদেশে পা দিয়েছিল তখন তাকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমি তখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম, অশেষ দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম অসংখ্য নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও ট্রয়নগরীর ধ্বংসের কথা যা শুনে হাজার বছর ভয়ে শিউরে উঠবে পৃথিবীর মানুষ। আমার কথা খেলাচ্ছলে উড়িয়ে দেয় সে। স্বাধিকারপ্রমত্ত প্যারিস নিজের কামনার দাস হয়ে ছুটে চলে তার পিছনে। ফলে পতন ঘটে ইলিয়াম নগরীর। পিণ্ডাসের ঈগলরা উল্লসিত হয়ে ওঠে নরমাংসের ভূরিভোজে। ইউলিসিসকেও আমি যাদুকরী ও ক্যালিপসোর কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি তার। অবশ্য পরে সে দেশে অতিকষ্টে প্রত্যাবর্তন করে।

থেলস্: এই ধরনের হঠকারী আচরণ বিজ্ঞ লোকের সত্যই বেদনার কারণ হয়ে ওঠে। তবু যারা সদাশয় ব্যক্তি তারা পরোপকার করে থাকেন। অমিত অকৃতজ্ঞতার মাঝে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাও তাদের সব শ্রমকে সার্থক করে

তোলে। আমরা যা জানতে চাইছি তা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। এই বালকটি পৃথিবীর মাটিতে জন্মলাভ করতে চায়।

নেরেউস: আমার মেজাজ খারাপ করে দিও না। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আমি সমুদ্রদেবতা ডোরিয়েদদের অনুরোধে অনুকূল তরঙ্গ ও বাতাসে ভর করে এখানে এসেছি। এখানে যে সব সুন্দরী জলদেবী অলিম্পাসে আছে তাদের দেখতে পাবে না। তাদের দেহগুলো এত হালকা আর সুন্দর যে তারা ঢেউএর ঘোড়ায় চেপে খেলা করে। শুভ্র ফেনপুঞ্জের উপর শোভা পায়। এদের রাণী হচ্ছে গ্রেটিয়া সবচেয়ে সুন্দরী। এখন তোমরা প্রোতিয়াসে চলে যাও। সেখানে এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বক্তা আছে তার কাছে যাও। (সমুদ্রের মাঝে চলে গেল)

থেলস্: এখানে কিছুই পেলাম না আমরা। প্রোতিয়াসে যিনি আছেন তিনি এমন সব কথা বলেন যার অর্থ কিছু বোঝা যায় না। যাই হোক, তোমার যখন পরামর্শ একান্তই দরকার তখন সেখানেই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

পাহাড়ের উপর থেকে সাইরেনরা

সমুদ্রের ঢেউএর উপর কারা নাচছে? তাদের দেখে মনে হচ্ছে অনুকূল বাতাসে সাদা পাল তুলে ভেসে যাওয়া জাহাজ। ওরা হচ্ছে সমুদ্রকন্যা। আমরা ওদের কাছে যাব। ওদের রূপ দেখব, ওদের কথা শুনব।

নেরেউসরা ও ট্রিটানরা: আমরা হাতে করে যে দৈত্যাকার জীবদের নিয়ে আসছি তারা হচ্ছে এক ধরনের দেবতা। তোমরা গান গেয়ে তাদের তুষ্ট করো। অনেক ভাল ফল পাবে।

সাইরেনরা: দেখতে আকারে ছোট, শক্তিতে বিরাট এই প্রাচীন দেবতারা সমুদ্রাঞ্চলে মানুষের উদ্ধারকর্তা।

নেরেউসরা: এদের বলে কাবিরি। আনন্দ করো। এদের কৃপা লাভ করলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র শান্ত ও অনুকূল হয়।

সাইরেনরা: আমরা মেনে নিলাম তোমার কথা। কোন জাহাজডুবি হলে তোমরা নাবিকদের উদ্ধার করো।

নেরেউসরা: তিনজন দেবতাকে আমরা এখানে এনেছি। আর একজন আসতে চাননি। অনেকে বলে তিনিই নাকি খাটি।

সাইরেনরা: দেবতায় দেবতায় ঝগড়া মারামারি চলে। আমরা কিন্তু সব দেবতাকেই সম্মান করে চলব। কারণ তাঁরা সব অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন

করেন।

নেরেউসরা : তাঁরা হলেন সংখ্যায় সাত।

সাইরেনরা : আর তিনজন কোথায়?

নেরেউসরা : একথা আমরা বলতে পারব না। অলিম্প্যাসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। এই সব অতুলনীয় অদম্য দেবতারাও ক্ষুধায় জ্বলছেন। তাঁরা আরও অনেক কিছু চান।

সাইরেনরা : আমাদের কাজ হলো সেই দেবতার উপাসনা করা যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

নেরেউস : এঁদের নিয়ে উৎসব করার মধ্যে আছে এক বিরাট গৌরব।

সাইরেনরা : অতীতের যত সব বীরেরা অনেক গৌরব যশ ও স্বর্ণসম্পদ লাভ করেছে। কিন্তু তারা কাবিরির মত লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করতে পারেনি।

হোমুনোলাস : এই সব বিকৃত চেহারার মেয়েগুলোর প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির পাত্র আছে। এদের পিছনে বৃথা ছুটে চলে কত বিজ্ঞ লোক মাথা ফাটিয়েছে।

থেলস্ : এটাই জগতের রীতি। টাকা যত পুরনো হয় ততই তার দাম বাড়ে। এইভাবেই মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

প্রোতিয়াস : (দুর্নীরিক্ষ্য অবস্থায়) অজানিত বস্তুই বেশী সম্মান পায়।

থেলস্ : কোথা তুমি প্রোতিয়াস?

প্রোতিয়াস : (কখনো কাছে কখনো দূরে) এই যে এখানে। এখানে।

থেলস্ : তুমি কোন মায়াময় স্থান থেকে কথা বলছ। এইভাবে বিভ্রান্তিকর কথা শুনে তোমার বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা ও প্রতারণা করো না।

প্রোতিয়াস : (দূর থেকে) বিদায়।

থেলস্ : (হোমুনোলাসকে) উনি কাছে এসে গেছেন। এবার তুমি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠ। উনি মাছের মত পিচ্ছিল। যে কোন আকারেই থাকুন আগুনের শিখা দেখলে এখানে এসে হাজির হবে।

হোমুনোলাস : আলোর প্লাবন বইয়ে দেব। কিন্তু খুব ধীরে। তা না হলে কাচ ফেটে যাবে।

প্রোতিয়াস : (বিরাটকায় কচ্ছপের বেশে) কিসের এত আলো জ্বলছে?

থেলস্ : (হোমুনোলাসকে ঢেকে রেখে) দয়া করে একটু কাছে এস। দেখ। দয়া করে মানুষের আকার ধারণ করে আমাদের কথা শোন।

প্রোতিয়াস : (ভাল মূর্তি ধারণ করে) তুমি কি ভাল কথা জ্ঞানের কথা বলতে ভুলে গেছ ?

থেলস্ : এখনো তুমি মানুষের আকার ধারণ করনি। (হোমুনোলাসকে বার করে)

প্রোতিয়াস : এক উজ্জ্বল বামন! এ মূর্তি কখনো দেখিনি।

থেলস্ : সে তোমার পরামর্শ চায়। সে মানুষ হয়ে জন্মাতে চায়। সে এখন অর্ধজাত মাত্র। মানবিক সব গুণ ও উপাদান তার আছে। কিন্তু সে গুণ সে উপাদান বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না। একমাত্র কাচের জারে ও আশ্রয় পেয়েছে। ওই তার আধার।

প্রোতিয়াস : তুমি হচ্ছ আসল কুমারীর পুত্রসন্তান। জন্মের আগেই তোমার মৃত্যু ঘটবে।

থেলস্ : (চুপি চুপি) আর একটা দিক দিয়ে বিপদ আছে। মনে হয় ও উভলিঙ্গ।

প্রোতিয়াস : তাহলে অচিরেই সাফল্য লাভ করবে। এখানে ওর জন্ম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা না করে ওকে এখনি মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে কাজ শুরু করতে বল। ধীরে ধীরে ও উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে।

হোমুনোলাস : এখানকার বাতাসটা বড় স্নিগ্ধ আর সুগন্ধি। আমার বড় ভাল লাগছে।

প্রোতিয়াস : যত দূরে যাবে ততই ভাল লাগবে আরও। ভাসতে ভাসতে আমার সঙ্গে এস দূর সমুদ্রে। ঢেউগুলো তোমার চারদিকে বয়ে যাবে। কিন্তু তোমার অগ্নিশিখা বা জ্যোতিকে ধ্বংস করতে পারবে না তারা।

থেলস্ : আমিও যাব।

হোমুনোলাস : কোন অপদেবতার সহায়তায় তিনগুণ শক্তিশালী।

পঞ্চম রাত্রি

রোডস্‌নিবাসী টেলশিনেরা

জল-অশ্ব ও ড্রাগনজাতীয় জলজন্তুদের কোরাস

প্রাচীন সমুদ্রদেবতার জন্য আমরা এক ত্রিশূল এনেছি যা দিয়ে জোভপ্রেরিত মেঘমালা বিদীর্ণকারী প্রমত্ত ঝঞ্ঝার প্রহারে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশিকে শান্ত করব। এখন সমুদ্রদেবতা বজ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। সমুদ্রের গর্ভ থেকে ঢেউ-এর পর

ঢেউ উঠছে। আমরা তবু স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছি। এই দ্বন্দ্বে সমুদ্রদেবতারই জয় হবে।

সাইরেনরা : তোমাদের এখন হেলিয়ম যেতে হবে। উজ্জ্বল দিন আসবে। চাঁদের উপাসনা সার্থক হবে।

টেলশিনেরা : হে সুন্দরী চন্দ্রদেবী, তোমার ভাই আকাশে উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। গ্রাম, নগর, পাহাড়, প্রান্তর, নদী, সমুদ্র সব আলোকিত হয়ে ওঠে সে আলোয়। সব দ্বীপপুঞ্জগুলি কুয়াশামুক্ত হয়। তখন ফীবাসের যৌবনোজ্জ্বল মূর্তি পরিদৃশ্য হয়। আমরাই প্রথম স্বর্গস্থ দেবতাদের মানুষের আকারে দেখার জন্য সাধনা শুরু করি।

প্রোতিয়াস : ওদের বড়াই করতে দাও, দেবতাদের গুণগান করতে দাও। সূর্যালোক থেকে সব প্রাণের উদ্ভব হয় স্বীকার করি। কিন্তু সারা জীবন ধরে মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে তা সব ক্ষণস্থায়ী। তা সব তুচ্ছতায় বিগলিত হয়ে যায়। এমন কি কঠিন ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তিও ভূমিকম্পে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। মানুষের সব শ্রমই পণ্ড হয় একদিন। একমাত্র এই সমুদ্রই তোমাকে দান করতে পারে এক উন্নত জীবন। (প্রোতিয়াস নিজেকে এক বিরাট রঙীন মাছে রূপান্তরিত করল) আমার পিঠের উপর চাপ। আমি তোমাকে প্রাচীন সমুদ্রদেবতার কাছে নিয়ে যাব।

থেলস্ : ওঁর কথা শোন। সেখানে যাও। অসংখ্য রূপের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে তুমি একদিন মানুষেব আকার ধারণ করবে। প্রথম মানুষ হিসাবে সৃষ্ট হবে। হোমুনোলাস প্রোতিয়াসের পিঠের উপর চাপল)

প্রোতিয়াস : বিদেহী আত্মারূপে তুমি অনন্ত জলরাশির সঙ্গে ছড়িয়ে থাকবে। তুমি হবে স্বাধীন অবাধ এবং চিরমুক্ত। এর বেশী কিছু চেও না। মানুষের আকার একবার পেলেই অসংখ্য বাধা আর অপরিপূর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়বে তুমি।

থেলস্ : তবু সবাই তাই চায়। মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে মহত্ত্ব লাভ করতে চায়।

প্রোতিয়াস : তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘদিন বাঁচে। যেমন তোমাকে দেখছি কয়েক শত বছর ধরে বাঁচতে।

সাইরেনরা : (পাহাড়ের উপর থেকে) দেখ দেখ। চাঁদকে ঘিরে কেমন ছোট ছোট মেঘখণ্ডগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা যেন প্রেমের তাড়নায় উড়ে

বেড়ানো লঘুপক্ষ কপোত। আমাদের উৎসবটা মুখর হয়ে উঠবে আনন্দে।

নেরেউস: তোমরা যাই ভাব, ওরা আসলে বনকপোতের দল। এক আশ্চর্য আবেগে ওরা আমার কন্যার রথের চারপাশে ভিড় জমায়।

পিল্লী ও মার্সি: (জলজ জন্তুর দল) সাইপ্রাসের উপকূলের কাছে গভীর সমুদ্রগর্ভে আমরা জলদেবী সাইপ্রিসের রথটিকে সযত্নে রক্ষা করে চলেছি। এবং রাত্রিকালে সেটিকে ঢেউএর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাই। ঈগল অথবা পাখাওয়ালা উড়ন্ত সিংহ অথবা কোন প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ভয় করি না আমরা।

সাইরেনরা: হে নেরেউস পরীরা, চক্রাকারে নাচতে নাচতে এসে আমাদের ঘিরে ফেল। ডোরাইদরাও এস, আদিমাতা গ্রেটিয়াকেও নিয়ে এস। তিনি হচ্ছেন মানবিক মাতার মতই স্নেহময়ী।

ডোরাইদরা: হে চন্দ্রদেবী, আমাদের আলো দাও, ছায়া দাও। আমাদের যৌবনসৌন্দর্যকে কুসুমিত করো। আমাদের প্রিয়তম সাথীদের আমরা নিয়ে এসেছি পিতৃপুরুষের কাছে প্রার্থনা করার জন্য। (নেরেউসের প্রতি) এই সব যুবকদের আমরা সমুদ্রতরঙ্গের ভয়ঙ্কর কবল হতে রক্ষা করেছি। যত সব জলজ আগাছা আর শ্যাওলার উপর তারা শুয়েছিল। আজ তারা জীবন ফিরে পেয়েছে। নিবিড় চুম্বনের দ্বারা তারা কৃতজ্ঞতা জানাবে আমাদের। হে দেবী, তুমি তাদেরও দয়া করো।

নেরেউস: তোমরা দুদিক থেকে লাভবান হলে। তোমাদের উপকারের প্রতিদান হিসাবে কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ দুই-ই পেলে।

নেরেউস: যা পেয়েছ তা দিয়ে আনন্দ করো। কিন্তু আমি তোমাদের কোন বর দিতে পারব না। তা সে বর একমাত্র দিতে পারেন জিয়াস। এই তরঙ্গায়িত সমুদ্রে কোন প্রেম কখনো দাঁড়াতে পারে না। ওদের প্রতি তোমাদের আসক্তি কমে গেলে ওদের স্থলভাগে পাঠিয়ে দাও।

ডোরাইদরা: হে সুন্দর যুবকগণ, তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে। তবু শপথ করে বলছি তোমাদের আমরা ভালবাসি। আমরা চিরন্তন সত্যকে চাই। কিন্তু দেবতারা আমাদের তা দেবেন না।

যুবকরা: আমরা এই মৎসজীবী যুবকরা তোমাদের প্রেমের প্রতিদান-স্বরূপ চিরদিন তোমাদের ভালবেসে যাব। আমরা নূতন জীবনের আস্বাদ পেয়েছি যা আগে কখনো পাইনি। (রথের উপর গ্রেটিয়ার আবির্ভাব)

নেরেউস : হে আমার প্রিয় কন্যা, এসেছ ?

গ্রেটিয়া : হে পিতা, আজ কী আনন্দ ! হে বর্ণালী মৎসকন্যারা থাম । নাচ ।

নেরেউস : তারা এইমাত্র চক্রাকারে নাচতে নাচতে চলে গেল । অন্তরের গভীরতম অনুভূতির কোন খবর রাখে না তারা । তারা একবার যদি আমাকে সেখানে নিয়ে যেত । আনন্দের বস্তু একবার দেখে আমি সারাজীবনের নীরস নিরানন্দ দিনগুলি ভুলতে পারতাম ।

থেলস্ : আমি বড় আনন্দ অনুভব করছি অন্তরে । আজ আমি সত্য ও সৌন্দর্যের পূর্ণ মিলন দেখছি স্বচক্ষে । জল থেকেই হয় এ বিশ্বের সৃষ্টি । জলই সবকিছু বাঁচিয়ে রাখে । হে সমুদ্রমাতা, যদি তুমি মেঘাকর্ষণ না করো তাহলে নদীগুলি জলপূর্ণ হবে না, তাহলে কোন কিছুই বাঁচবে না ।

নেরেউস : এখনো ঘুরে ঘুরে নাচছে তারা । তবে আর মুখোমুখি নেই তারা প্রেমিকদের সঙ্গে । গ্রেটিয়ার রথটা এখন দূরে নক্ষত্রের মত জলজল করছে । প্রকৃত ভক্তি ও ভালবাসা এমনি করে উজ্জল তারকার মত দূরে ও নিকটে জলজল করতে থাকে ।

হোমুনোলাস : এই জলজগতে যা কিছু দেখছি তাই সুন্দর দেখাচ্ছে ।

প্রোতিয়াস : এই আর্দ্র জলজগতেই তোমার জীবনদীপ থেকে সুন্দর ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে ।

নেরেউস : নৃত্যরত ঐ জনতার মধ্য হতে কি এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে ? রাণীর পায়ের কাছে কি এক অগ্নিশিখা জ্বলছে আর নিবছে । মনে হচ্ছে প্রেমের চপলমতি আবেগের দ্বারা দীপ্ত ঐ অগ্নিশিখা ।

থেলস্ : ও হচ্ছে হোমুনোলাস । প্রোতিয়াস ওকে ভুল পথে নিয়ে গেছে । ঐ প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা হলো ওর অন্তরের জলন্ত কামনার ব্যাকুলতা । রাণীর সিংহাসনের কাছে অধৈর্য হয়ে ও আবেদন জানাচ্ছে । কিন্তু ও চলে যাচ্ছে বলে আলোটা নিভে যাচ্ছে ।

সাইরেনরা : নৈশ সমুদ্রতরঙ্গের মাঝে আলোর কি চমৎকার খেলা । হে অনন্ত সমুদ্রের আলোক-পরিবৃত অগণ্য তরঙ্গমালা, হে অনন্ত জলরাশি, তোমরা আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করো । হে ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ নামধারী শক্তি-চতুষ্টয়, তোমাদের প্রণাম ।

তৃতীয় অঙ্ক

স্পার্টা। মেনেলাসের রাজপ্রাসাদ

বন্দিনী ট্রয়রমণীগণের কোরাসসহ হেলেনার প্রবেশ

হেলেনা: বহু প্রশংসিত ও বহু নিন্দিত আমি হেলেনা দূর বিদেশ হতে পসেডনের কৃপায় অসংখ্য সমুদ্রতরঙ্গে প্রবলভাবে দোলায়িত হবার পর অবশেষে আমাদের স্বদেশের উপকূলে এসে উঠেছি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন বীর যোদ্ধা রাজা মেনেলাস। হে উন্নত প্রাসাদ, তোমাকে একদিন আমার পিতা টিণ্ডারাস প্যালাসপর্বত হতে ফিরে এসে নির্মাণ করেন এবং তোমার মাঝেই আমি একদিন ভগিনীসম ক্লাইতেমেস্ত্রা, ক্যাস্টর ও পোলাক্সেব সঙ্গে খেলাধূলা করে দিনে দিনে বেড়ে উঠি। আজ আমাকে গ্রহণ করো। একদিন মেনেলাস এই প্রাসাদেই আমাকে বধূরূপে বেছে নেন। তারপর এক দস্যু সুদূর ফার্জিয়ায় অপহরণ করে নিয়ে যায় আমাকে। তার পর হতে যে সব অভিশপ্ত দুর্ঘটনা ঘটে যায় তা নিয়ে এক বিরাট রূপকথা গড়ে ওঠে।

কোরাস: হে সুন্দরী, যে অতুলনীয় সৌন্দর্যরূপসম্পদ তুমি লাভ করেছ তা অবহেলা করো না। কারণ সবচেয়ে বলদর্পিত বীরও এই সৌন্দর্যের কাছে নত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।

হেলেনা: যাক। এখন আমার স্বামী তাঁর নগরে নিয়ে যাবার আগে জাহাজে করে এখানে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি তা এখনো বুঝতে পারিনি আমি। আমি কি শুধু তাঁর স্ত্রী হয়েই থাকব না রাণী হব আবার? অথবা সমগ্র গ্রীকদেশ আবার সুদীর্ঘকাল ধরে যে দুঃখ বিপর্যয় ভোগ করে তার জন্য আমাকে বলি দেবেন? আমার জগৎজোড়া সৌন্দর্যের খ্যাতি ও আমার নিয়তিকে এক করে তার ভুল অর্থ করে আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন আমার স্বামী। স্বদেশে ফেরার পথে জাহাজে আমার সামনে বসে থেকেও একটা কথাও বলেননি আমার সঙ্গে। অবশেষে ইউরোতাসের উপকূলে জাহাজ থামলে তিনি আমাকে বললেন, আমি আমার যোদ্ধাদের নিয়ে এখানেই নেমে পড়ছি। এই জাহাজে করে তুমি ল্যাসিডিমনের সমভূমিতে অবস্থিত প্রাসাদে গিয়ে ওঠ। পরে আমি সেখানে যাব। সেখানে দাস-দাসীরা

আমার ও তোমার পিতার দেওয়া সঞ্চিত ধনসম্পদ রক্ষা করে রেখেছে। সেখানে সব কিছুই ভোগ করতে পাবে।

কোরাস: সেই সব সঞ্চিত ধনরাশি ভোগ করো এখন। তুমি প্রাসাদের অভ্যন্তরে গিয়ে দাসদাসীদের কাছে গিয়ে বল। অমূল্য রত্নরাজিতে মণ্ডিত হয়ে উঠুক তোমার দেহসৌন্দর্য।

হেলেনা: আমার স্বামী তারপর গম্ভীরভাবে নীরসভাবে আরও বলেন, 'সব ধনরত্ন দাসীদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে দেবপূজার জন্য নির্দিষ্ট পাত্রগুলি নিয়ে ঝর্ণা থেকে পবিত্র জল নিয়ে আসবে। শুকনো জ্বালানি কাঠ ও তীক্ষ্ণ একটি ছুরি ঠিক করে রাখবে।' কিন্তু তিনি পূজার বলির জন্য কোন পশুর কথা বললেন না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। সব দেবতার বিধানের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। দৈব বিধানে যা হবার হবে। আমাদের তা সহ্য করতেই হবে। অনেক সময় বলির উপর উদ্যত খড়্গও কোন শত্রু বা দেবতার হস্তক্ষেপে ব্যর্থ হয়ে যায়।

কোরাস: হে রাণী, কি হবে না হবে তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করবেন না। সাহস অবলম্বন করুন। আশীর্বাদ ও অভিশাপ অপ্রত্যাশিতভাবেই আসে মানুষের জীবনে। যুদ্ধ, ট্রয়নগরীর ধ্বংস, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রভৃতির কথা কিছুই জানতে চাইনা আমরা। আপনার মত একজন জগতের শ্রেষ্ঠ রূপবতী ও দয়াবতী রমণীর সাহচর্যে আমরা ধন্য। মুক্ত আকাশের তলে প্রদীপ্ত সূর্যালোকে উদ্দীপিত আপনার দেহসৌন্দর্য অবলোকন করে আমরা তৃপ্ত।

হেলেনা: যা ঘটে ঘটুক। অবিলম্বে আমি প্রাসাদে যাব। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কেন ভয় হচ্ছে আমার? শৈশবে যে সহজ নির্ভীকতার সঙ্গে আমি এখানে ওঠানামা করতাম আজ তা খুঁজে পাচ্ছি না কেন?

কোরাস: হে আমার প্রিয় বোনেরা, দুঃখিনী বন্দিনীরা, সব দুঃখ ঝেড়ে ফেল। তোমাদের যে রাণী হেলেনা দীর্ঘকাল পরে তাঁর পিতৃগৃহে প্রবেশ করছে তাঁর আনন্দে অংশ গ্রহণ করো। তোমাদের মুক্তিদাতা দেবতাদের ধন্যবাদ দাও। নিজেদের দুর্গপ্রাকারে যে বন্দিনী একদিন উদ্বাহু হয়ে মুক্তি কামনা করতেন আজ তিনি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে এসেছেন আনন্দে। আসলে এক দেবতাই তাঁকে ছিন্নমূল করে ধরে নিয়ে যায় এবং আজ তাঁকে এই প্রাচীন অথচ অধুনা অলঙ্কৃত পিতৃগৃহে এনে দিয়েছে। তাঁর যৌবনদিনের অকথ্য অশেষ দুঃখবেদনার অবসান ঘটেছে।

প্যানথালিস: (কোরাসনেত্রী) আনন্দপরিবৃত গানের পথ ত্যাগ করে দরজার দিকে তাকাও। কি দেখছ বোনেরা? আমাদের রাণী নয়? কিন্তু হে রাণী, কেন কম্পিত পায়ে প্রবেশ করছেন এ গৃহে? আপনার মুখচোখের উপর স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এক প্রবল বিতৃষ্ণা আর ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ।

হেলেনা: সাধারণ ভয় নয়, সুদূর অতীত রাত্রির ভয়ঙ্কর গর্ভ হতে যেন এক বিভীষিকা বাধা দিচ্ছে আমাকে প্রবেশপথে। তবু আমি পালিয়ে যাব না। হে অজানিত অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তি, তুমি যেই হও, উপযুক্ত পূজার অঞ্জলিদানে তুষ্ট করব তোমায়। তারপর গৃহ শুদ্ধ করে গৃহিণীরূপে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করব।

কোরাসনেত্রী: হে রাণী, তোমার দাসদাসীদের চিনে নাও।

হেলেনা: আমি যা দেখছি তোমরাও চোখ দিয়ে তাই দেখতে পাচ্ছ। আমি যখন নীরবে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কোন কর্মব্যস্ত দাসদাসী চোখে পড়েনি। কোন দাসীকে দেখিনি। স্থূলাঙ্গী প্রধানা দাসীকে পরে দেখতে পেয়ে আমি এক কাজের আদেশ দিলে সে হাত দিয়ে আমাকে চলে যেতে বলল। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি একরাশ ছাই জমে রয়েছে। আমি প্রধানা দাসীর কাছ থেকে ধনাগারে গিয়ে দেখি রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর চেহারার এক জীব আমাকে তেড়ে এল। আমার স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত এ বাড়ির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে পারব না। (দরজার কাছে ফোর্কিয়াদের আবির্ভাব)

কোরাস: আমার অভিজ্ঞতা অনেক। আমি দেখেছি অনেক বীরের শোক, ইলিয়ামনগরীর পতন। সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মাঝে আমি শুনেছি দেবতাদের কণ্ঠস্বর। বীর যোদ্ধাদের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সঙ্গে দেখেছি ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড। কিন্তু তোমাদের অদ্ভুত আকৃতি দেখে ভয় হচ্ছে আমার। তোমরা কারা, কে তোমাদের জন্মদাতা? তোমরা চলে যাও এখান থেকে। ফীবাস, যিনি কোন ছায়া বা অন্ধকার সহ্য করেন না তিনি তোমাদের কুৎসিত রূপ সহ্য করবেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সৌন্দর্যের উপাসক হয়েও তোমাদের মত ঘৃণ্য জীবদের দেখে চক্ষুকে পীড়া দিতে হচ্ছে। শোন, যদি তোমরা না যাও, নিয়তির অভিশাপ তোমাদের ভোগ করতে হবে।

ফোর্কিয়ারা: 'লজ্জা আর সৌন্দর্য পাশাপাশি চলতে পারে না'—এই প্রবাদবাক্যটা প্রাচীন হলেও সত্য। একে অন্যকে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। লজ্জা সব সময় গভীর বিষাদে মগ্ন আর বার্ধক্য-

জর্জরিত না হওয়া পর্যন্ত সৌন্দর্য মত্ত হয়ে থাকে অহংকারে। আজ দেখছি তোমরাও নির্লজ্জ অন্ধকারে মত্ত হয়ে একদল কলমুখর দুষ্ট সারস পাখির মত উড়ে এসেছ এখানে। কেন তোমরা ভয়ঙ্কর মিলাদদের মত এ প্রাসাদে এসে উঠলে? এখানকার প্রধানা দাসীকে আক্রমণ করলে? আমার মনে হয় তোমাদের দেখে একদল পঙ্গপাল আমাদের দেশের সবুজ মাঠের সব শস্য খেয়ে ফেলছে মানুষের। সব শ্রম পণ্ড করে দিচ্ছে।

হেলেনা: কোন অধিকারে দাসী হয়ে গৃহিণীর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বকে আক্রমণ করতে এসেছ? স্বীকার করছি আমরা যখন ছিলাম না, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বা জলপথে ব্যস্ত ছিলাম তখন তোমরা এ প্রাসাদ ভালভাবেই রক্ষণাবেক্ষণ করেছ। কিন্তু এ বাড়ির গৃহিণী যখন ফিরে এসেছে তখন তোমাদের আত্ম-সমর্পণ করা উচিত। একথা না শুনলে শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।

ফোর্কিয়ারা: বুঝেছি, বহুকাল পরে রাণীরূপে এ গৃহের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে চাও। রাজার কাছে সে অধিকার লাভ করেছ। ঠিক আছে তাই করো। ধনরত্ন যা আছে সব নাও। কিন্তু আমাকে রক্ষা করো। আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তোমার রূপের কাছে এদের সবাইকে হাঁসের মত মনে হচ্ছে।

কোরাসনেত্রী: সুন্দরের পাশে কুৎসিতকে বেশী কুৎসিত মনে হয়।

ফোর্কিয়ারা: বুদ্ধির পাশে নির্বুদ্ধিতাকে আরো বেশী খারাপ লাগে।

(কোরাসদল ও ফোর্কিয়াদের মধ্যে ঝগড়া ও কথাকাটাকাটি চলতে লাগল)

কোরাসদল: ভয়ঙ্কর নরমাংসভোজী জীব তোমরা।

ফোর্কিয়ারা: তোমরা হচ্ছ রক্তচোষা ভূত।

হেলেনা: আমি ক্রুদ্ধ হইনি। দুঃখের সঙ্গেই তোমাদের এই সব ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করতে বলছি। কোন গৃহকর্তা ঘরে ফিরে বিশ্বস্ত ভৃত্যদের ঝগড়া ঝাঁটি শুনতে চান না। তার উপর তোমাদের মালিক এমনিতেই বিব্রত। আমি দেখছি দাসীরা কাঁপছে। কিন্তু তুমি তাদের থেকে সবচেয়ে বড়। ভদ্র-ভাবে কথা বল।

ফোর্কিয়ারা: আজ তুমি দেবতাদের কৃপায় সৌভাগ্যের শিখরে আবার উন্নীত হয়েছ। কিন্তু অতীত জীবনে বহু কামনাবিধুর প্রেমার্থীর সঙ্গলাভ করতে হয়েছে। একবার কামনায় উত্তপ্ত হার্কিউলিসের মত শক্তিধর থিসিয়াস তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

হেলেনা: তার ঔরসে আমার গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়। যে থিসিয়াস

আমাকে এ্যাটিকায় বন্দী করে রাখে।

ফোর্কিয়ারা : তারপর ক্যাস্টর পোলাক্স তোমাকে মুক্ত করে প্রেম নিবেদন করে তোমায়।

হেলেনা : তবু স্বীকার করছি আমার গোপন আসক্তি ছিল প্যাট্রোক্লাসের প্রতি।

ফোর্কিয়ারা : পিতার ইচ্ছায় নৌযুদ্ধবিশারদ মেনেলাসকে বিবাহ করো।

হেলেনা : আমাদের এই বিবাহ থেকে হার্মিওনের জন্ম হয়।

ফোর্কিয়ারা : তবু মেনেলাস যখন ক্রীটদেশে যান দাবি জানাতে, তুমি যখন একা ছিলে প্রাসাদে তখন এক সুদর্শন অতিথি আসেন।

হেলেনা : আমার অতীত জীবনের সেই প্রায়বৈধব্যদশা ও তার আনুষঙ্গিক ধ্বংসাবলীর কথা কেন মনে পড়িয়ে দিচ্ছ ?

ফোর্কিয়ারা : সেখানে গিয়ে বন্দিনীরূপে দীর্ঘকাল দাসত্ব ভোগ করতে হয় তোমায় ? অথবা অফুরন্ত প্রেমের আনন্দ ভোগ করো ?

হেলেনা : সে আনন্দের কথা আর বলে না। অফুরন্ত দুঃখ এসে জমা হয় আমার বুকে।

ফোর্কিয়ারা : তবু লোকে বলে তোমাকে একই সঙ্গে ইলিয়াম ও ঈজিপ্টে দেখা যায়।

হেলেনা : আমার অভিভূত চেতনাকে আর বিব্রত করে তুলো না। এখন আমি বলতে পারব না আমি কে।

ফোর্কিয়ারা : আবার লোকে বলে একিলিসও তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। ভাগ্যের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে তোমাকে ভালবাসে।

হেলেনা : মনে মনে স্বপ্নের মাঝে তার সঙ্গে হয়েছিল আমার বিবাহ। আমি আর পারছি না। (মূর্ছিত হয়ে ঢলে পড়ল)

কোরাস : থাম থাম। ভেড়ার চামড়াঢাকা নেকড়ে কোথাকার! একটি-মাত্র দন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মুখগহ্বর থেকে এর থেকে ভাল কথা আর কি আশা করা যায় ? আবার কখন কোথায় হিংসার বিষ ছড়াবে ? অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের গর্ভ থেকে সব খারাপ কথা তুলে নিয়ে এস। থাম থাম, রাণী নড়ে উঠেছেন। (হেলেনা চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল।)

ফোর্কিয়ারা : ক্ষণকালের জন্য অচৈতন্যের অন্ধকার মেঘমালায় দিবা-জ্যোৎস্নার মত তোমার যে উজ্জ্বল দেহসৌন্দর্য আচ্ছন্ন হয়ে ছিল এতক্ষণ এখন,

তা আবার প্রকটিত হয়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সে সৌন্দর্য আমাদের কুৎসিৎ রূপকে নীরব ভাষায় ধিক্কার দিলেও আমি সৌন্দর্যের মর্ম বুঝি।

হেলেনা: মূর্ছা হতে চেতনা ফিরে পেলেও আমি বড় ক্লান্ত। ঠিক মত পা ফেলে চলতে পারছি না। তথাপি রাণী হিসাবে আমাকে সাহস অবলম্বন করতেই হবে।

ফোর্কিয়ারা: রাজকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুমি এবার আমাদের আদেশ করো কি করতে হবে।

হেলেনা: এতক্ষণ ঝগড়া করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে। রাজার আদেশ, দেবতাদের কাছে পূজার বলি দেবার ব্যবস্থা যথাশীঘ্র কর।

ফোর্কিয়ারা: সব কিছু প্রস্তুত—জল, পাত্র, ছুরি। কিন্তু বলির পশুর নাম বল।

হেলেনা: রাজা সে কথা কিছু বলেননি।

ফোর্কিয়ারা: বলেননি? কী দুঃখের কথা!

হেলেনা: কিসের দুঃখ বোধ করছ তুমি?

ফোর্কিয়ারা: হে রাণী, বলির বস্তু হচ্ছ তুমি।

হেলেনা: আমি?

ফোর্কিয়ারা: আর তোমার এই সব দাসীরা।

হেলেনা: হায়! কী ভয়ঙ্কর। অথচ এটা আমি আগেই আশঙ্কা করেছিলাম।

ফোর্কিয়ারা: কোন পরিত্রাণ নেই।

কোরাস: আমাদের কি হবে?

ফোর্কিয়ারা: হে প্রেতমূর্তিগণ, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছ। মানুষদের মত তোমরাও আলোকোজ্জ্বল পৃথিবী ছেড়ে যেতে ভয় পাও। (দরজার কাছে বামনাকৃতির কতকগুলি জীব দেখা দিল) এস তোমরা, এখানে যা পার ঝকঝকে করো। মূল্যবান কার্পেট পেতে দাও। তার উপর রাণী নতজানু হয়ে পূজার বলি হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করবেন। পাত্রগুলি জলপূর্ণ করো। কারণ বলির পর কালো রক্ত ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর রাণীর মৃতদেহকে উপযুক্ত মর্যাদাসহকারে সমাহিত করতে হবে।

কোরাসনেত্রী: চিন্তামগ্ন অবস্থায় রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাসীরা

উৎপাটিত তৃণগুল্মের মত ম্লান। এখন প্রধানা দাসীরূপে আমার কিছু কর্তব্য আছে। তুমি বয়োপ্রবীণা অভিজ্ঞতাসম্পন্না। তোমাকে না চিনে ওরা আক্রমণ করেছিল। এখন বল, সত্যই পরিত্রাণের কোন উপায় আছে কি না।

ফোর্কিয়াস্না: সেটা কিন্তু নির্ভর করছে একমাত্র রাণীর উপর। একমাত্র তিনিই নিজেকে ও তাঁর সহচরীদের রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যা কিছু করবে খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

হেলেনা: আমার দুঃখ হচ্ছে ঠিক, কিন্তু কোন ভয় নেই আমার। তবু যদি উদ্ধারের কোন উপায় থাকে ত বল। আমি তা গ্রহণ করব। তোমার মত বিজ্ঞ প্রবীণা অসম্ভবকেও সম্ভব করে তুলতে পার।

কোরাস: গলায় ফাঁসের নাম শুনেই আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছে। তুমি দয়া না করলে আমরা মরব।

ফোর্কিয়া: এত কথা শোনার ধৈর্য হবে কি তোমাদের?

কোরাস: শুনে যদি আমরা বেঁচে যাই তাহলে কেন শোনার ধৈর্য হবে না?

ফোর্কিয়া: যারা বাড়িতে থেকে ধনসম্পত্তি রক্ষা করে তারা সব সময়ই ভাল থাকে। কিন্তু যারা বাড়ি থেকে চলে যায় দীর্ঘকালের জন্য তারা ফিরে এসে দেখে সব ওলটপালট হয়ে গেছে।

হেলেনা: ও সব প্রচলিত কথা বলে লাভ নেই। তোমার কি গল্প বলার আছে তা বল।

ফোর্কিয়া: এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য, আমার তিরস্কারের কথা নয়। জলদস্যু মেনেলাস বিভিন্ন উপকূলভাগ হতে কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনে তার ইয়ত্তা নেই। দশ বছর ট্রয়যুদ্ধে কাটাবার পর দেশে ফেরার পথে আবার কত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে আনবে তা জানি না।

হেলেনা: মানুষের নিন্দা ছাড়া কি মুখ খুলতে পার না তুমি? পাগলামি করাটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

ফোর্কিয়া: স্পার্টার উত্তরদিকে ইউরোতাস নদীবিধৌত পার্বত্য উপত্যকাগুলি দীর্ঘকাল জনবসতিহীন ছিল। এখন সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা এক দুর্গম অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করেছে। ইচ্ছামত অত্যাচার চালায় তারা পার্শ্ববর্তী জনগণের উপর।

হেলেনা: এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে।

ফোর্কিয়া: তারা কুড়ি বছর সময় পায়। এই অবসরে এই সব কাজ করে।

হেলেনা : তারা কি দস্যু এবং তাদের একজন সর্দার আছে ?

ফোর্কিয়া : দস্যু তারা নয়। তবে তাদের একজন সর্দার আছে। সে একবার আমাকেও আক্রমণ করে। সে সব নিয়ে যেতে পারত লুণ্ঠন করে। কিন্তু আমি যা তাকে হাতে তুলে দিয়েছিলাম তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

হেলেনা : লোকটাকে দেখতে কেমন ?

ফোর্কিয়া : কোন দিক দিয়েই খারাপ নয়। আমার ত ভালই লেগেছিল। সাহসী বীর সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলের মত চেহারা। এমন ভদ্রজনোচিত ব্যবহার গ্রীকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ওদের যদি বর্বর বলা হয় তাহলে নরহত্যাকারী রক্তলোলুপ গ্রীক ও ট্রয়বীরেরা কি ? তাছাড়া ওদের দুর্গ তুমি যদি দেখ আশ্চর্য হয়ে যাবে। কী সুন্দরভাবে চারকোণা পাথরগুলো সাজানো। যেমন খাড়াই ও উচ্চতায় আকাশচুম্বী, তেমনি মসৃণ। সেই দুর্গের মধ্যে স্তম্ভ, অলিন্দ, প্রেক্ষাগৃহ সব আছে।

কোরাস : তারা কোন জাতি ?

ফোর্কিয়া : দুর্গের মধ্যে প্রশস্ত বড় বড় হলঘরগুলোতে কত রকম পশুপাখি দেবদেবীর চিত্র ও মূল্যবান ধাতু আছে তার ঠিক নেই। তাতে মাঝে মাঝে নাচের অনুষ্ঠানও হয়।

কোরাস : সেখানে নাচিয়ে আছে ?

ফোর্কিয়া : সোনালি চুলওয়ালা অনেক সুন্দর যুবক আছে।

হেলেনা : তোমার মূল বক্তব্য কি তা বল।

ফোর্কিয়া : তুমিই বল। একবার শুধু স্পষ্ট করে হ্যাঁ বল। আমি তাহলে তোমাকে সেই দুর্গের মাঝে নিয়ে যাব।

কোরাস : একটামাত্র ছোট কথা বলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা করো।

হেলেনা : আমি কি একথা মনে করতে পারি যে মেনেলাস এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমাকে আঘাত করবে ?

ফোর্কিয়া : তোমার মনে নেই ? প্যারিসের মৃত্যুর পর তার ভাই ডিফোবাস যখন তোমাকে গ্রহণ করে তখন মেনেলাস তার নাক কান কেটে দিয়েছিল।

হেলেনা : সেটা তিনি আমার জন্যই করেছিলেন।

ফোর্কিয়া : তোমাকেও তাই করবেন প্রতিহিংসার বশে। একটা জানবে

রূপসৌন্দর্য অবধ্য। যার রূপ আছে সে হত্যা করায়, তার জন্য মানুষ মানুষকে হত্যা করে, কিন্তু সে নিজে হত হয় না। (জয়ঢাকের শব্দ শোনা গেল) ঐ জয়ঢাকের শব্দ যেমন কর্ণ বিদীর্ণ করে দেয় তেমনি প্রতিহিংসাও প্রতিহত মানুষের বক্ষকে বিদীর্ণ করে দেয়।

কোরাস: শুনতে পাচ্ছ না রাণী ঢাকের শব্দ, দেখতে পাচ্ছ না সুতীক্ষ্ণ তরবারির উজ্জ্বলতা?

ফোর্কিয়া: আমাদের রাজা ও প্রভুকে স্বাগত জানাব আমরা। স্বেচ্ছায় বরণ করে নেব তাঁকে।

কোরাস: আমাদের কি হবে?

ফোর্কিয়া: তোমরা ভালই তা জান। রাণীর মৃত্যু নিজের চোখে দেখবে। কোন উপায় নেই।

হেলেনা: আমি কি করব ঠিক করে ফেলেছি। বুঝেছি তুমি এক শয়তানী বুড়ী সব ভালকে খারাপ করে তোল যাদুবলে। যাই হোক, প্রথমে আমি দুর্গে যাব তোমার সঙ্গে। পরে কি করব তা কাউকে বলব না। মনের মধ্যেই থাকবে আমার।

কোরাস: আমরা কত আনন্দে যাব সেখানে। মৃত্যু আমাদের পিছনে তাড়া করেও কিছু করতে পারবে না। দুর্গের বিরাট প্রাচীর চারদিক থেকে রক্ষা করে রাখবে আমাদের, ঠিক যেমন করে ট্রয়ে রেখেছিল। (হঠাৎ ঘন কুয়াশা এসে পিছনের দিকটা ঢেকে দিল) একি! দেখ দেখ, বোনেরা। একটু আগে দিনটা কত উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু হঠাৎ ইউরোতাস নদীর বুক থেকে উত্থিত বাষ্পরাশির দ্বারা নলখাগড়া গাছের মালাগলায় তটভূমি আচ্ছন্ন ও অবলুপ্ত হয়ে গেল কোথায়। জোড়ায় জোড়ায় ভেসে যাওয়া কলকণ্ঠমুখর হাঁসদের দেখছি না আর। তবে তাদের দূরাগত ভীতিবিহ্বল চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সে কণ্ঠে আছে ধ্বংস আর মৃত্যুর আভাস। মেঘ আর কুয়াশা আমাদের চারদিক এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে যে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের সামনে কি হার্মিসকে দেখছি? কিন্তু হাতে তাঁর উজ্জ্বল দৈব দণ্ডটি নেই ত? হার্মিস কি আমাদের প্রেতপরিপূর্ণ অন্ধকার নিরানন্দ নরকে নিয়ে যাচ্ছে? একি! হঠাৎ কুয়াশা কেটে যেতেই দেখি এক বিশাল কারাগার। চারদিকে প্রাচীর। আমরা কি সবাই বন্দী হয়ে গেলাম?

কোরাসদলের নেত্রী: হে নির্বোধ নারীর দল। তোমরা বড় অস্থিরমতি।

চঞ্চল বাতাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মতির পরিবর্তন হয়। সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্যে, আনন্দে বেদনায় বড় বিচলিত হয়ে ওঠ। প্রত্যেকের কথায় ও প্রতিবাদে নত হয়ে যাও। এখন চুপ করে রাণীর কথা শোন। দেখ তিনি তাঁর ও আমাদের জন্য কি পন্থা অবলম্বন করেন।

হেলেনা: কোথায় তুমি পাইথোনস। এই অন্ধকার কারাগার হতে তুমি এসে সেই বীর সর্দারের কাছে আমাকে নিয়ে যাও।

কোরাসনেত্রী: বৃথাই আবেদন নিবেদন জানাচ্ছ রাণী। কোন দিকে কোন পথ নেই। সেই বিকৃত চেহারার বুড়ীটাও নেই। একটা পা না ফেলেও কিভাবে আমরা এখানে এলাম তা বুঝতে পারছি না। গোলোকধাঁধার মত পথগুলো। কিন্তু ঐ দেখ কত লোক! গ্যালারী ও জানালায় কত লোক এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছে।

কোরাস: আমার অন্তরটা হাল্কা হলো। ঐ দেখ, কার আদেশে একদল সুদর্শন যুবক ছন্দায়িত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে এইদিকে। তারা সর্বাঙ্গসুন্দর। তাদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, সুন্দর গণ্ডদেশ, রেশমী পোষাক। কিসের প্রশংসা করব? কার্পেটের উপর দিয়ে তারা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সিংহাসনের দিকে। সে সিংহাসনে উপবিষ্ট আমাদের রাণীর মাথার উপর অসংখ্য পুষ্পমালা সাজিয়ে রেখেছে। (সিংহাসনের দুধারে যুবকরা ও অমাত্যরা আসন গ্রহণ করলে মধ্যযুগীয় নাইটের পোষাক পরে ফাউস্ট ধীরে ধীরে আবির্ভূত হলো)

কোরাসনেত্রী: (ফাউস্টকে মনোযোগসহ দেখে): জানি না এই আদর্শ মানুষটিকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন কি না। তবে বীরত্ব ও মর্যাদায় ইনি যেন উর্ধ্বলোকের মানুষ। এই ধরনের মানুষ সর্বত্র জয়লাভ করেন। ধীর সংযত পদক্ষেপে ও উদার গাম্ভীর্যে উনি সিংহাসন অভিমুখে এগিয়ে চলেছেন। হে রাণী, মুখ ফিরিয়ে তাকাও।

ফাউস্ট: (অগ্রসর হলো; তার পাশে ছিল শৃংখলাবদ্ধ একটি লোক) সাদর ও সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনার পরিবর্তে আমি এনেছি এক শৃখলাবদ্ধ লোক যে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে আমাকে প্রতারিত করেছে। নতজানু হয়ে এই শ্রদ্ধেয়া নারীর কাছে তোমার অপরাধের কথা ব্যক্ত করো। হে রাজরাজেশ্বরী, এই লোকটি প্রাসাদশীর্ষের প্রহরীরূপে নিযুক্ত হয়েছিল। এর কাজ ছিল প্রাসাদশীর্ষ হতে ভূপৃষ্ঠে, জলপথে ও আকাশপথে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা যাতে অকস্মাৎ কোন

সমুদ্রাগত জলোচ্ছ্বাস অথবা মানুষের জনতা এই দুর্গমধ্যে এসে না পড়ে। কিন্তু সে কর্তব্যে অবহেলা করে সে যার ফলে আপনারা এখানে অলক্ষিত অবস্থায় এসে পড়েন এবং এর জন্য আমরা উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে পারিনি। এখন এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না শাস্তি দান করবেন সেটা আপনার উপরেই নির্ভর করছে।

হেলেনা: রাণী ও বিচারকর্ত্রী হিসাবে আমাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দান করেছেন আপনি। এটা এক পরীক্ষাও বলা যেতে পারে। যাই হোক, এখন আমি বিচারকের কর্তব্য ও অধিকার অনুযায়ী আসামীর বক্তব্য শুনতে চাই। বল, তোমার কথা।

দুর্গপ্রহরী লিনসেউস: ঈশ্বরপ্রেরিত এই দৈব মানবীর ক্রীতদাসরূপে নতজানু হয়ে আমি তাঁকে অবলোকন করতে চাই। তাতে আমি বাঁচি বা মরি। যা হয় হোক। আমি যখন স্বাভাবিকভাবে পূর্ব দিকে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় ছিলাম তখন আমায় হতচকিত করে সহসা দক্ষিণ দিকে আবির্ভাব হলো সূর্যের। আকাশে বা দিগন্তে কোন আলো নেই, অথচ সূর্য উঠল। কেমন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে পড়লাম আমি। চারদিক বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন করে তার মাঝে এক দেবী আবির্ভূত হলেন। তাঁর অসামান্য অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের উন্মাদনায় অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। আমার দৃষ্টির তীক্ষ্নতা ও অন্তরের আনুগত্য সব কিছু বিলিয়ে দিলাম তাঁর পায়ে। আমি আমার প্রহরীর সব কর্তব্য ভুলে গেলাম। আমাকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছেন! রূপসৌন্দর্য সকলের সব ক্রোধকে মোহপাশে আবদ্ধ করে, সব ভয়কে মুক্ত করে।

হেলেনা: যে বিপত্তি আমি নিজে এনেছি তার জন্য কাউকে তিরস্কার করব না। ধিক আমাকে! কী দুর্ভাগ্য আমার! আমি যেখানেই যাই সেখানে নরপশুরা সব গুণ ভুলে গিয়ে আমার পিছু পিছু ছুটে চলে। দেবতা অপদেবতা, দানব মানব সবাই মারামারি করে আমার জন্য। আমি শুধু মানুষের দুঃখ তিন-চার গুণ বাড়িয়ে চলি। এই নির্দোষ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও। যাও, ঈশ্বরদত্ত কোন গুণের অপচয় করো না।

ফাউস্ট: সত্যিই আমি বিস্মিত হে রাণী। সুদক্ষ তীরন্দাজের মত তুমি যে ধনুকে অব্যর্থ শর সংযোজন করে তাকে ও আমাকে বিদ্ধ করলে তা দেখলাম। তার শরে আমিও আহত। এই রাজদরবারে অনেকেরই এই অবস্থা। এখন আমি আর আমি নেই। আমার বিশ্বস্ত অন্তরের সব আনুগত্যকে বিদ্রোহে

পরিণত করেছ তুমি। এখন আমার যা কিছু আছে তা সব অর্পণ করছি তোমার চরণে। হে রাণী, তুমি যেমন আসার সঙ্গে সঙ্গে অপরাজেয় শক্তিবলে এই পার্থিব সিংহাসন অধিকার করেছ তেমনি আমার অন্তরের সিংহাসনও অধিকার করো।

লিনসেউস (সিন্দুক নিয়ে): হে রাণী, আমি মুক্ত হয়ে ফিরে এসেছি। আমি রাজ-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়েও ভিক্ষুকের মত তোমার কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা চাইছি। আমি কি ছিলাম, এখন আমি কি? কি আমি চাই? আমি সব গুলিয়ে ফেলছি। পূর্ব থেকে আমরা পশ্চিমে এসেছি। অসংখ্য মানুষ আনাগোনা করছে। তার শেষ নেই সীমা নেই। প্রচুর ধনরত্ন একদিন অকাতরে লুণ্ঠন করেছি আমি। আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কারো কোন পকেটে বা সিন্দুকের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতাম আমি তার মধ্যে কি আছে। স্তূপাকৃত সোনা ও মণিমাণিক্য করায়ত্ত করি আমি। কিন্তু আমার রত্ন তোমাকে উপহার দিতে চাই। সবুজ পান্নার হার তোমার গলে ও বক্ষে শোভা পাক। কর্ণ কপোল ভূষিত হোক বিবিধ রত্নালঙ্কারে। শুধু কর্ণদেশ হতে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত তোমার গোলাপী গণ্ডদ্বয় মুক্ত থাক কোন অলঙ্কারের লাঞ্ছনা থেকে। তাই আমি সব এনেছি তোমার পায়ে অর্পণ করতে। তুমি সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সব জ্ঞান শক্তি সম্পদ সমর্পণ করেছি তোমায়। এতদিন ধরে যে ধনসম্পদ অর্জন করেছি আমি তা তুচ্ছ তৃণবৎ ত্যাগ করতে চাই আমি। তার বিনিময়ে শুধু চাই তোমার সুন্দর মুখের এক আয়ত উজ্জ্বল দৃষ্টি।

ফাউস্ট: শীঘ্রই সব সরিয়ে নিয়ে যাও। শাস্তি না পেলেও পুরস্কারও কিছু পাবে না। এই দুর্গ মধ্যে যা কিছু আছে সব ধনরত্নই তাঁর। সুতরাং বিশেষভাবে দান করার কিছু নেই। যেখানে যত ধনরত্ন আছে সব স্তূপাকৃত করে দাও তা প্রতিটি কক্ষে। অমিত ধনৈশ্বর্যের নিষ্প্রাণ সমারোহে এক নূতন স্বর্গ রচিত হোক। স্বর্গসুলভ বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক এই প্রাসাদদুর্গ। কুসুমাস্তীর্ণ কার্পেট বিস্তৃত হোক তার চলার পথে। রত্নমণ্ডিত এই সকল ঐশ্বর্যের অহঙ্কার লাঞ্ছিত হোক তাঁর পদ্মকোষতুল্য সুমেদুর পদাঘাতে।

লিনসেউস: একথা যথেষ্ট হলো না। এই গর্বোদ্ধত সৌন্দর্যের দ্বারা মানুষের জীবন সম্পদ অনুশাসিত হয়। এই সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতার কাছে সূর্যালোকও ম্লান হয়ে যায়। তাঁর মুখের পাশে সব মূল্যবান বস্তু তাদের সব মহিমা হারিয়ে ফেলে।

হেলেনা: (ফাউস্টকে) আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আমার পাশে এসে এই শূন্য আসন অধিকার করো। আমাকেও গ্রহণ করো।

ফাউস্ট: হে রাণী, নতজানু হয়ে অবনত মস্তকে তোমার এ দান গ্রহণ করতে দাও আমায়। তোমার যে হাত আমায় তোমার পাশে তুলে নিতে চায় সে হাতকে প্রথমে চুম্বন করতে দাও। এই অনন্ত ভূখণ্ডসমন্বিত তোমার রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করো আমাকে। আমি একাধারে তোমার রক্ষক, উপাসক ও দাস রয়ে যাব চিরদিন।

হেলেনা: অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখলাম ও শুনলাম। বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা। অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা করছে। তবে এখন একটা কথা বল, ঐ লোকটি এমন অদ্ভুতভাবে এত সুন্দর সুন্দর কথা কি করে বলল?

ফাউস্ট: আমাদের এখানকার লোকদের কথা যদি তোমার ভাল লেগে থাকে তাহলে আমাদের গান শুনে অভিভূত হয়ে যাবে তুমি। সে গান এখনই শুরু করা উচিত।

হেলেনা: তুমিও ঐভাবে ঐ সব কথা আমায় বলতে পার?

ফাউস্ট: এটা ত সহজ কথা। অন্তর কামনার ব্যাকুলতায় পূর্ণ হয়ে উঠলেই মানুষ চারদিকে তাকিয়ে দেখে—

হেলেনা: কে তার সে আবেগের অংশ নেবে।

ফাউস্ট: সেই আবেগের মুহূর্তে অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুই থাকে না। থাকে শুধু একমাত্র বর্তমান।

হেলেনা: বর্তমানেই থাকে তখন একমাত্র পরম সুখ।

ফাউস্ট: এই বর্তমানেই আছে আমার সকল সম্পদ ও সৌভাগ্য। আর আমি কি চাই?

হেলেনা: আমার হাত।

কোরাস: অবশেষে আমাদের রাণী এই দুর্গাধিপতির সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে প্রকাশ্যে আবদ্ধ হলেও আমরা অবশ্য ইলিয়ামের পতনের পর থেকেই যৌথভাবে বন্দিনী রয়ে গেছি। নারীরা চিরকালই পুরুষের প্রেমে অভ্যস্ত। এ ব্যাপারে তারা ঠিকমত বাছাই করতে পারে না। গ্রাম্য দেবী ফনও কোন এক সোনালি চুলওয়ালা রাখালের প্রেমে ধরা দিতে পারেন। ওঁরা খুব কাছাকাছি বসে রয়েছেন দুজনে। ওদের পরস্পরের কাঁধে কাঁধ ঠেকছে, হাঁটুতে

হাঁটু, হাতে হাত। নরম সিংহাসনের উপর আন্দোলিত হচ্ছে ওদের দেহ। সিংহাসনের রাজকীয় মহিমা ওঁদের অন্তরের আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারছে না।

হেলেনা : আমার মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে দূরে চলে এসেছি আমি। আবার মনে হচ্ছে খুব নিকটে এসেছি। তবু আমার বলতে ইচ্ছে করছে, আমি এখানেই আছি। আমি এখানে।

ফাউস্ট : আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিনা। বিকম্পিত হচ্ছে আমার দেহ। কথা বলতে পারছি না। স্থানকালহীন এক স্বপ্নের জগতে যেন আমি বাস করছি।

হেলেনা : আমার মনে হচ্ছে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে মিলেমিশে এক নবজীবন লাভ করেছি আমি যেন। এই মিলনের ফলে আমারই এক অজানিত সত্তা পরম সত্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে।

ফাউস্ট : কোথা হতে কি করে কি হলো তা জানতে চেও না। জীবন মানেই কর্তব্য হলেও এখন সে কর্তব্য দূরে থাক।

ফোর্কিয়া (অকস্মাৎ প্রবেশ করে) : প্রেমের মধুর আবেগ তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল। বিপদের আভাস পাওনি ? জয়ঢাকের শব্দ শোননি ? মৃত্যু এগিয়ে আসছে। মেনেলাস তার দলবল নিয়ে এ দুর্গ আক্রমণ করেছে। তোমাদের লোকজনদের যুদ্ধে ডাক। (ফাউস্টকে) আর তোমার অবস্থা হবে দিফোবাসের মত, কারণ তুমি এই নারীর শালীনতা নষ্ট করেছ। একে একে সব বধ হবে।

ফাউস্ট : হঠকারী বিপদ এইভাবেই আসে। দুঃসংবাদ সংবাদদাতাকে কুৎসিত করে ফেলে। আর তুমি দুঃসংবাদ দান করেই আনন্দ পাও বেশী। কিন্তু এখন তা হবে না। এখানে কোন বিপদ প্রবেশ করতে পারবে না। (বিস্ফোরণ, সশস্ত্র সৈন্যদলের প্রবেশ) একমাত্র সেই নারীর প্রসন্নতা লাভ করে যে বীরত্বের সঙ্গে বীরদের প্রতিহত করে।

শত্রুদলের নেতা : (এগিয়ে এসে) কখনো উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিমে আমরা অবিরাম এগিয়ে চলেছি। পাইলসে আমরা সমুদ্রপথ ছেড়েছি। আমাদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রীসের উপকূলে। এই দুর্গে আমাদের নেতা মেনেলাস বিলম্ব করবে না। তিনি আবার সমুদ্রে ফিরে গিয়ে জলদস্যুরূপে লুণ্ঠনকার্য চালাবেন। স্পার্টার রাণীর রাজত্বের অধীনে থেকে তোমরা এ রাজ্যের সব সম্পদ উপভোগ করবে। (ফাউস্ট

সিংহাসন থেকে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গ তাকে ঘিরে ধরল।)

কোরাস: যে লোক কোন সুন্দরীকে একান্তভাবে করায়ত্ত করতে চায় তাকে আগে দৃঢ়হাতে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। তোষামোদের দ্বারা কোন নারীকে কেউ লাভ করলেও রক্ষা করতে পারবে না। দস্যুরা অপহরণ করে নিয়ে যাবে। এজন্য আমাদের এই রাজাকে সকলের থেকে বড় মনে না করে পারছি না। কারণ উনি শক্তি ও ত্যাগের সমন্বয় ঘটিয়ে বিদেশী শত্রুসৈন্যদের বশীভূত করে রেখেছেন। আজ এমন ক্ষমতা কার আছে যে তাঁর কাছ থেকে রাণীকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? বাইরের শক্তিশালী শত্রুকে উপেক্ষা করে তিনি এই সুরক্ষিত দুর্গপ্রাচীরের মধ্যে তাকে রক্ষা করবেন।

ফাউস্ট: ওদের প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু ধনরত্ন দিয়ে দাও। আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব। ওরা তাহলে অন্যান্য শত্রুদের হাত থেকে তোমাদের সমুদ্রপাহাড় বেষ্টিত রাজ্যটিকে রক্ষা করবে। এ রাজ্যের প্রভূত সম্পদের কিছু কিছু অংশ প্রতিটি জাতিই পেতে পারে। এখানকার পর্বতমালা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছে তোমাদের। অতুলনীয় সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশের মাটিতেই লেডার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তোমাদের এই রাণী। এদেশের তুষারাবৃত পর্বতমালার মাঝে মাঝে গড়ে উঠেছে কত ঝর্ণাবিধৌত অরণ্যসমাচ্ছন্ন জনপদ, কত পশুচারণক্ষেত্র। এখানকার মানুষরা জন্মসুখী। এখানে দেবতারাও মাঝে মাঝে নেমে আসেন মানুষের জন্য। জিয়াসপুত্র এ্যাপোলোও এখানে একদিন নেমে এসেছিলেন রাখালের বেশে। (রাণীর পাশে বসে) ভূস্বর্গ আর্কিডিয়ার মত এদেশে চিরসুখ বিরাজ করে। অনন্ত যৌবন ও সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে তোমাদের জীবন। (রাজসভার দৃশ্যটি রূপান্তরিত হলো পার্বত্যপ্রদেশে। চারদিকে পাহাড় আর বন দেখা গেল। ফাউস্ট ও হেলেনা অন্তর্হিত। কোরাসদলের মেয়েরা ঘুমন্ত ও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এখানে সেখানে)

ফোর্কিয়া: এই সব মেয়েরা কতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছে তা আমি জানি না। তারা কি স্বপ্ন দেখছে। তাও জানি না। ওরা জেগে উঠে আশ্চর্য হয়ে যাবে। তবু ওদের জাগাতে হবে। কই জেগে ওঠ তোমরা। সব ঘুম ঝেড়ে ফেল।

কোরাস: বল আমাদের, কি করে কি ঘটল। অবিশ্বাস্য হলেও আমরা সব শুনব। এই সব পাহাড় দেখতে আমাদের আর ভাল লাগছে না।

ফোর্কিয়া: চোখ খুলতে না খুলতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছ তোমরা। শুনে

শোন। এই সব পাহাড় আর গুহার মধ্যেই তুই প্রেমিক প্রেমিকা আমাদের রাজারাণী আশ্রয় নিয়েছে।

কোরাস : সেকি! এর মধ্যে ?

ফোর্কিয়া : বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা এখানে আছে। আমাকে তারা ডেকেছে সেবা করার জন্য। আমি তাদের জন্য ফল মূল গাছের ছালের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। তারা এখন একা আছে।

কোরাস : এর মাঝে কি ঘরবাড়ি, নদী, প্রান্তর আছে ?

ফোর্কিয়া : তোমরা একেবারে অনভিজ্ঞা। এ হচ্ছে এক অনাবিষ্কৃত জগৎ। আমি যখন এর মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন সহসা হাসির শব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম প্রকৃতি দেবতার মত সরল সুদর্শন এক তরুণ বালক তার মার কোল থেকে পিতার কোলে আবার পিতার কোল থেকে মার কোলে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তার মা তাকে এক সময় বলল, তুমি লাফাতে পার যত খুশি, কিন্তু উপরে উঠবে না। তার পিতা বলল, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে পৃথিবীর মাটিটা ছুঁয়ে থাকবে, শক্তি পাবে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল লাফাতে লাফাতে বালকটি পাহাড়ের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেল। তার মাতা পিতা শোকে অধীর হয়ে উঠল। পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তারপর আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়ে অকস্মাৎ সে বালক হাতে একটি সোনার বীণা নিয়ে হাজির হলো আমাদের সামনে। মাথায় তার অপূর্ব জ্যোতি। অপূর্ব সুর তার কণ্ঠে। একদিন যে ছিল পৃথিবী মাতার সন্তান আজ সে হয়ে উঠেছে যেন সকল সৌন্দর্য ও চিরন্তন সুরমাধুর্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা। অননুভূতপূর্ব বিস্ময়ের সঙ্গে তাকে দেখবে তোমরা।

কোরাস : একে তুমি আশ্চর্যজনক বলছ ক্রেটাকন্যা? এর থেকে কত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে অতীতে। আওনিয়ার গান শোননি? হেলাসের রূপকথা শোননি? মাইয়ার পুত্রের গান শোননি? বর্তমানে যা ঘটে তা অতীত ঘটনারই প্রতিরূপ মাত্র। সেই সুন্দ দেবীর পরম শক্তিশালী পুত্র যখন দানবরূপ পরিগ্রহ করে সমুদ্রদেবতার কাছ থেকে ত্রিশূল, রণদেবতা এ্যারেসের কোষ থেকে তরবারি, ফীবাসের কাছ থেকে তীরধনুক, অগ্নিদেবতা হিফাস্টাসের কাছ থেকে চিমটে, এমন কি পরম পিতা জিয়াসের কাছ থেকে বজ্রও চুরি করে নেয়, কামদেবতা ইরসকে মল্লযুদ্ধে হারায় এবং দেবী সাইপ্রিস যখন তাকে আদর করে তখন তার বুক থেকে বেল্ট বা বক্ষবন্ধনীটিও চুরি করে নেয়। (নিকটবর্তী

একটি গুহা থেকে গানের সুর শোনা গেল)

ফোর্কিয়া : এবার শোন, বিশুদ্ধ গান কাকে বলে। রূপকথার কথা ভুলে যাও। অতীতে কখনো কোন দেবতা এ গান গায়নি। সে সব দিন চলে গেছে। এ গান অন্তর থেকে বেরিয়ে এসে অন্তরকে স্পর্শ করে। (পাহাড়ের ভিতর চলে গেল)

কোরাস : হে কিম্ভূতাকৃতি, সত্যই এ গান শুনে অন্তর আমাদের বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। চোখে জল আসছে। প্রভাতসূর্যের বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতায় পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছে আমাদের অন্তরাত্মা। এতদিন জগতে যা আমরা পাইনি তা সব আমরা পেয়েছি আমাদের অন্তরে।

বল্কল ও বৃক্ষপত্রপরিহিত অবস্থায় ফাউস্ট, হেলেনা ও ইউফোরিয়ন

ইউফোরিয়ন : গান শুনে তোমাদের অন্তরে জাগছে শিশুসুলভ উচ্ছলতা, এবার আমার নাচ দেখে তোমাদের অন্তর লাফিয়ে উঠুক।

হেলেনা : প্রেমের মাধুর্য সাধারণতঃ দুজনেই ভোগ করে। তবে তৃতীয় জন কাছে থাকলে আনন্দ বেশী হয়।

ফাউস্ট : আমরা যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। এখন আমি সর্বতো-ভাবে তোমার, তুমি আমার। জগতের আর কোন সম্পদ চাই না আমরা।

কোরাস : এখন দীর্ঘকাল ধরে ওরা মিলনের আনন্দ লাভ করবে। এ সঙ্গীত ওদের সে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবে।

ইউফোরিয়ন : এখন আমি বৃত্তাকারে লাফাব, ঝাঁপাব। আনন্দের আবেগে নাচব।

ফাউস্ট : কিন্তু ধীরে চল। শান্তভাবে যা করার করো বৎস। তা না হলে হঠকারিতার ফলে ধ্বংস হয়ে যেতে পার।

ইউফোরিয়ন : আমি আর এখানে চুপ করে স্থির হয়ে থাকব না।

হেলেনা : ভেবে দেখ বৎস। তোমার উপর আমাদের ও তোমার ভবিষ্যতের সব সুখ নির্ভর করছে।

কোরাস : শীঘ্রই হয়ত ওদের মধুর বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। আমার ভয় হচ্ছে।

হেলেনা ও ফাউস্ট : সংযত হও হে হতভাগ্য। আমাদের ইচ্ছার খাতিরে অন্তত উপরে উঠতে চেও না। সমতলভূমিতেই থাক। নাচ গানে উজ্জ্বল করে তোল মাতিয়ে তোল এই সমভূমি।

ইউফোরিয়ন : তোমরা যখন চাইছ তখন আমি সংযত হব। কোরাসদের টেনে নিয়ে নাচতে লাগল) সবাই আনন্দে নাচ। একেই কি বলে গান আর নাচ ?

হেলেনা : হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে নিয়ে নাচতে থাক।

ফাউস্ট : এত শীঘ্রই এ নাচ বন্ধ করতে হবে। চুরির ঘটনা দেখে কষ্ট হচ্ছে আমার।

কোরাস : হে সুন্দর বালক, তুমি যখন তোমার হাতগুলি তুলছ তখন তোমার সোনালি কুঞ্চিত কেশরাশি উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তোমার লঘুচপল পদভরে লাঞ্ছিত হচ্ছে পৃথিবীর মাটি। আমাদের সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে তোমার কাছে।

ইউফোরিয়ন : এখন থামবে না। কোন বিরতি নয়। আমি এখন শিকারী আর তোমরা লঘুপদ হরিণীর মত খেলা করো আমার চারদিকে।

কোরাস : এত তাড়াতাড়ি করো না। তোমার সুন্দর দেহটা জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে ইচ্ছা করছে।

ইউফোরিয়ন : পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে এতদিন যা পেয়েছি যা করেছি তাতে মন ভরে না আমার। আমি জোর করে যে কাজ করি তাতে আনন্দ পাই না।

হেলেনা ও ফাউস্ট : ও বড় বেয়াদব ও অসভ্য হয়ে উঠেছে। ওকে সংযত করার কোন উপায় নেই। হঠাৎ শিঙার শব্দ শুনছি। কিসের গোলমাল ?

কোরাসদলের একজন : আমাদের মধ্য থেকে একটি উদ্দামস্বভাব তরুণীকে নিয়ে হঠাৎ সে চলে গেল।

ইউফোরিয়ন (তরুণীসহ) : আমি একটি তরুণীকে এনেছি। জোর করে তাকে আলিঙ্গন করব। সে বাধা দিলেও তার দেহ পীড়ন এবং বক্ষমর্দন করব। তার মুখ চুম্বন করব। তবু বাধা দিলে আমার দুর্বার শক্তি ও কামনার পরিচয় দেব।

কুমারী তরুণী : আমাকে ছেড়ে দাও। আমার এ দেহে সাহস ও শক্তি দুই আছে। তোমার বাহুতে কত শক্তি আছে নির্বোধ ? তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ তা জান না। আমি তোমাকে পুড়িয়ে দেব। (এক অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে বাতাসে উড়ে গেল) এবার আমাকে অনুসরণ করো। তোমার লক্ষ্যবস্তুকে করায়ত্ত করো।

ইউফোরিয়ন : চারদিকে শুধু বন আর পাহাড়। এখানে কেন আমি

বন্দী হলাম ? ঝড় উঠছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে পাহাড়ে।
(পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল।)

হেলেনা : শ্যামরের মত তোমার উচ্চাশা বেড়ে উঠেছে। আমরা তোমার পতনের ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছি।

ইউফোরিয়ন : আমাকে আরো উপরে উঠতে হবে। এখন আমি কোথায় ? আমি দ্বীপপুঞ্জে চলে এসেছি। এসেছি পেলোপদের দেশে।

কোরাস : এই পাহাড় ঘেরা কুঞ্জবনে শান্তিতে বাস করো। তোমার জন্য আমরা আঙুর এনে দেব। শুকনো আঙুর। ডুমুর ও আপেল এনে দেব সোনালি রঙের। দেখ কত সুন্দর এই জায়গাটা।

ইউফোরিয়ন : শান্তির স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাক তুমি। যুদ্ধ আর জয়ের মধ্যেই আছে স্বর্গীয় গৌরব।

কোরাস : যুদ্ধের জন্য যারা শান্তি ও ঐক্যকে ঘৃণার চোখে দেখে তাদের সুদিন কখনো আসে না।

ইউফোরিয়ন : যাঁরা একদিন প্রভূত রক্ত দান করে বীরত্ব সহকারে এদেশ রক্ষা করেন তাঁরাই আমাকে জয়ের পথ আজ দেখিয়ে দিন !

কোরাস : দেখ দেখ ও যুদ্ধ চায়। তবু যুদ্ধ ও শান্তিতে ও আমাদের সমান প্রিয়।

ইউফোরিয়ন : বীরদের সামনে দুর্গপ্রাচীর কিছুই নয়। বীর যোদ্ধার বুক লোহার মত শক্ত। তার কাছে পাথরের গড়া দুর্গ কিছুই নয়। শান্ত গৃহকোণে বাস না করে অস্ত্র ধারণ করো তোমরা। তোমাদের স্বামী সন্তানরাও সকলে যোদ্ধা হয়ে উঠুক।

কোরাস : দেখ দেখ, উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ও কেমন আকাশে উঠছে। কত দূরে চলে যাচ্ছে ও। তবু বড় ভাল লাগছে।

ইউফোরিয়ন : আমি আর শিশু নেই। অস্ত্রধারী এক উদ্ধত যুবক। সে সাহসী বলবান। প্রতিজ্ঞায় অটল তার আত্মা। আমি যাচ্ছি, জয়ের দিগন্ত উন্মুক্ত আমার সামনে।

হেলেনা ও ফাউস্ট : তুমি এখনো সূর্যের আঁচ পাচ্ছ না। তুমি বুঝছ না তুমি যাচ্ছ অনন্ত যন্ত্রণার রাজ্যে। আমরা তোমার কেউ নই ? তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি স্বপ্নমাত্র ?

ইউফোরিয়ন : স্থলে জলে বজ্রের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছ ? ধূলিজালে

সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে রণভূমি। যুদ্ধের আহ্বান আসছে, অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড় যুদ্ধে।

হেলেনা, ফাউস্ট ও কোরাস: কি ভয়ের কথা! বড় পরিতাপের বিষয়। তুমি কি মৃত্যুর আহ্বান শুনতে পাচ্ছ?

ইউফোরিয়ন: আমি কি দূর থেকে দেখব ঐ সব বীরদের মৃত্যু? না তাতে অংশগ্রহণ করব? এই দেখ, এক জোড়া পাখা বার করে উড়ে যাচ্ছি আমি সেখানে। আমাকে উড়তে দাও। (উড়ে গেল)

কোরাস: আইকারাসের মত ও উড়ে গেল। কি দুঃখজনক দৃশ্য! (একটি সুন্দর যুবকের মৃতদেহ হেলেনা ও ফাউস্টের সামনে পড়ল। কিন্তু সে দেহ সহসা ধূমকেতুর মত আকাশে উড়ে গেল, শুধু পোষাক আর বীণাটা পড়ে রইল)

হেলেনা ও ফাউস্ট: উপভোগ করতে না করতেই সব আনন্দ পরিণত হলো নিরানন্দ শোকে।

ইউফোরিয়ন (ভিতর থেকে): হে মাতা, আমাকে এই অন্ধকার শূন্যতার মাঝে একা রেখো না।

কোরাস: না, একা থাকতে হবে না তোমায়। আমাদের সকলের অন্তরাত্মা তোমার কাছে গিয়ে গুণগান করবে তোমার। যে কোন বিপর্যয়ের ঝড় ও অগ্নিতাপের মাঝে অটুট ছিল তোমার সাহস আর শক্তি। প্রভূত পার্থিব ধনসম্পদ লাভ করেও তোমার উদ্দাম যৌবন সব প্রথার বন্ধন ছিন্ন করে উচ্চাশার অজানা আকাশে পাড়ি দেয়। তুমি এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও বিজয়গৌরব লাভ করতে। কিন্তু তোমাকে তা দেওয়া হয়নি। নিয়তি দেয়নি। তাহলে কাকে দেবে নিয়তি? দুঃখ করো না। মানুষের গানের মধ্যে অমর আত্মার মধ্যে বেঁচে থাকবে তুমি। যুগে যুগে নবজন্ম ঘটবে তোমার।

হেলেনা (ফাউস্টকে): একটা প্রাচীন প্রবাদবাক্য মনে পড়ল, সুখ আর সৌন্দর্য দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকে না। জীবন ও প্রেমের বন্ধন শীঘ্রই ছিঁড়ে যায়। সুতরাং বিদায়। হে পার্সিফোনে, আমাকে ও আমার সন্তানকে গ্রহণ করো তুমি। (ফাউস্টের কোলে হেলেনা হেলে পড়তেই হেলেনার দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তার পোষাক আর ওড়নাটা ফাউস্টের হাতে রয়ে গেল)

ফোর্কিয়া: ঐগুলো ভাল করে ধরে থাক। ছেড়ো না। দৈত্যরা এগুলো

নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ওগুলো তোমাকে পৃথিবীর মাটি হতে অনেক দূরে ধরে নিয়ে যাবে। তবে বাতাসে বেশী দিন ভাসতে পারবে না। পরে আমার সঙ্গে দেখা হবে। (হেলেনার পোষাক সহসা মেঘ হয়ে ফাউস্টকে ঘিরে তাকে বাতাসে তুলে নিয়ে গেল এবং ভাসতে ভাসতে চলে গেল)

কোর্কিয়া: সেই সুন্দর উজ্জ্বল প্রাণের অগ্নিশিখা উড়ে গেছে। পড়ে আছে শুধু এই পোষাক। কবিরা এই নিয়েই বেঁচে থাকবে। তাদের আমি প্রতিভা দান করতে না পারলেও অন্ততঃ পোষাকটা দিতে পারব।

প্যানথালিন: তাড়াতাড়ি করো। হে রাণীর সহচরীরা, এখন আমরা সমস্ত ইন্দ্রজালের প্রভাব থেকে মুক্ত। তোমাদের রাণী এখন ধীর পায়ে ধাপে ধাপে নরকে নেমে চলেছেন। বিষণ্ণ রাজার পাশে। তাঁর বিশ্বস্ত সহচরীরাও চল সেখানে।

কোরাস: রাণীরা সব জায়গাতেই সুখে থাকে। সব জায়গাতেই সম্মান পায়। নরকে গিয়েও নরকের দেবী পার্সিফোনের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে থাকবে রাণী। আর আমরা পড়ে থাকব ফলহীন গাছেঘেরা এক প্রান্তরে। বাদুড়ের মত শুধু কিচমিচ করব আমরা।

কোরাসনেত্রী: যারা নাম যশ চাওনা, বড় কাজ করতে চাও না তারা নিস্প্রাণ জড়বস্তুর মত। তারা চলে যাও। আমি রাণীর কাছে যাব। সেবা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেব। (প্রস্থান)

সকলে: উজ্জ্বল দিবালোকে মানুষের মত বেড়াতে না পারলেও আমরা নরকে কখনো যাব না। প্রকৃতি আমাদের বিদেহী প্রেত করেছে।

কোরাসদলের এক অংশ: আমরা বাতাসের মত এই সব গাছের শাখাদের সঙ্গে কথা বলব। দেখব তারা কেমন ফুলে ফলে ভরে ওঠে। গাছ থেকে ফল পড়লে কত লোক আসবে তা কুড়োতে। আমাদের পায়ের তলায় নত হবে।

দ্বিতীয় অংশ: আমরা এই সব পাহাড়ের ধারে থেকে পাখির গান শুনব।

তৃতীয়: আমরা এই সব নদীর সঙ্গে বন ও প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলে যাব।

চতুর্থ অংশ: আমরা এই সব আঙুরক্ষেতের চারদিকে থাকব। আঙুর-ক্ষেতের মালিকরা কত কষ্ট করে আঙুর চাষ করে আঙুর ফলিয়ে তার থেকে মদ তৈরি করে তা দেখব আমরা। (যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ফোর্কিয়া মুখোস খুলে মেফিস্টোফেলিসে পরিণত হল) ভাল জায়গাতেই অবস্থান করছেন সম্রাট।

চতুর্থ অঙ্ক

উচ্চ পর্বতমালা

একটি পর্বতশৃঙ্গের উপর মেঘ এসে জমল

ধীরে ধীরে ফাউস্টের প্রবেশ

ফাউস্ট : উপর থেকে এখানে এক গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে দেখে আমি এই পর্বতশৃঙ্গে নেমে পড়েছি। যে মেঘমালা আমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তা এখন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূবদিকে চলে গেছে। সেই ভাসমান তরঙ্গায়িত মেঘমালা সহসা জুনো, লেডা বা হেলেনার মত এক পরমা সুন্দরী নারীর আকার লাভ করল। কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল বাষ্পরাশির মধ্যে। পরে তা এক ধূসর পাহাড়ের মত দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে রইল। অতীতের অনপনেয় স্মৃতিপুঞ্জ মূর্ত হয়ে উঠল যেন বুকে। পার্থিব দেহসৌন্দর্য প্রহেলিকায় পরিণত হয়ে গেলেও আত্মিক সৌন্দর্যের একটি জ্যোতি আজ আমার মনে জেগে আছে এবং তা আমাকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করছে। আমার সত্তার শ্রেষ্ঠ অংশটিকে নিয়ে যাচ্ছে দূরে।
(মেফিস্টোফেলিস এগিয়ে এল)

মেফিস্টোফেলিস : এই নরকের রাজ্যে কেন তুমি লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছ তা তুমিই জান। এই নরকের ভিত্তিভূমিতে আমি তাদের দেখতে চাইনি।

ফাউস্ট : মিথ্যা মনগড়া রূপকথার কখনো অভাব হয় না তোমার। এই ধরনের এক রূপকথা হয়ত আবার বলতে চাও।

মেফিস্টোফেলিস : যখন ঈশ্বর আমাদের পাতালে পাঠিয়ে দেয় তখন আমরা সেখানে গিয়ে দেখি এক অনির্বাণ আগুনের শিখায় তপ্ত হয়ে উঠছি। তার উপর এক জায়গায় অনেক লোক থাকায় সেই গরমে সর্দি কাশি প্রভৃতি নানা রকম রোগ হতে লাগল। তখন পৃথিবীর সীমাটা বাড়াবার প্রয়োজন হলো। আর তা করতে গিয়ে সব ওলট পালট হয়ে গেল। নিচেকার লোক উপরে চলে এল আর উপরকার লোক নিচে চলে গেল। পৃথিবীতে যে সব আইন প্রণীত হয়েছে তার উদ্দেশ্যও হলো সমাজের উপরতলার লোককে নিচে আর নিচের তলার লোককে উপরে আনা। এ রহস্য পরে সবাই জানতে পারবে।

ফাউস্ট: আমি যখন পাহাড় দেখি তখন জানতে চাই না কোথা হতে কেমন করে এসব হলো। তবে আমার মনে হয় প্রকৃতি যখন নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণতা অর্জন করেছে তখন সে পৃথিবীকে গোলাকাররূপে সৃষ্টি করে। তারপর তার মধ্যে থরে থরে কত পাহাড় সাজিয়ে দেয়। পাহাড়ের তলায় উপত্যকা, গিরিপথ, তারপর সবুজ প্রান্তর ও বনভূমি—কত কি সাজিয়ে দেয়। প্রকৃতি পৃথিবীর যেখানে যা রেখেছে তাই যথেষ্ট। তার উপর কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সেটা হবে উন্মাদ বা হঠকারীর কাজ।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি তা বলবে। তুমি ভাবছ এটা দিবালোকের মত সহজ। কিন্তু যারা তা নিজের চোখে দেখেছে তারা বলবে অন্য কথা। আমি তখন সেখানে ছিলাম, যখন পৃথিবীর তলায় এই রকম ওলট পালট চলছিল, যখন গরম আগুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল আর মনকন হাতুরি দিয়ে পাহাড়গুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে স্থাপন করছিল পৃথিবীর বুকের উপর। শিক্ষিত লোকদের সব পাণ্ডিত্য ব্যর্থ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনে। সরলপ্রাণ বিশ্বাসসর্বস্ব সাধারণ মানুষ সহজভাবে মেনে নিয়েছে এ সত্যকে। আমার মত শয়তানের কৃতিত্ব এই যে আমি এক আশ্চর্য খঞ্জ পথিকের মত ক্রাচে ভর দিয়ে অনেক পাহাড় উপত্যকা পার হয়ে চলেছি অজানা রহস্যের সন্ধানে।

ফাউস্ট: শয়তানের প্রকৃতিটা কেমন তা এখন দেখা দরকার।

মেফিস্টোফেলিস: প্রকৃতির মধ্যেও শয়তান আছে। আমাদের মত শয়তানদের কাজ হলো বড় বড় পরিকল্পনা করা। অনেক হৈচৈ গোলমাল ও শক্তি অপচয় করেও অবশ্য কিছু হয় না পরিশেষে। তবু আমরা অনেক উপরে উঠেছি। আমার বাইরের আকার ও লক্ষণ দেখে কিছু বুঝতে পার না? এই অনতিক্রম্য বিরাট উচ্চতা থেকে যে রাজকীয় গৌরব ও শক্তির জৌলুস বিচ্ছুরিত করি তা দেখে তোমার শক্তির দম্ভলাভের জন্য লালসা জাগে না?

ফাউস্ট: হ্যাঁ জাগে। আমার মনে এক বিরাট পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। কিছু অনুমান করতে পারছ?

মেফিস্টোফেলিস: তা বুঝেছি। আমি একটা বড় নগর বা রাজধানী অধিকার করব। তাতে থাকবে একটা বিরাট বাজার। কত তরিতরকারি ও মালপত্রে ভরা সে বাজারে অনবরত থাকবে মানুষের ভিড়। তার কাছাকাছি বড় রাস্তার ধারে আমি আরামে ও অফুরন্ত অবসরে বাস করব। সামনে থাকবে প্রসারিত গ্রাম্য প্রান্তর। আমার বাড়ি থেকে পিঁপড়ের মত সারবন্দী কর্মব্যস্ত

মানুষের আনাগোনা দেখতে বড় ভাল লাগবে আমার। অসংখ্য মানুষ আমাকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে।

ফাউস্ট: না, আমি তাতে সন্তুষ্ট নই। কি হবে তাতে? কোন জনপদের মানুষ ভাল খেল, মাখল, লেখাপড়া শিখল, সংখ্যা বৃদ্ধি করল। কিন্তু শেষে দেখবে ক্ষোভ বাড়তে থাকবে দিনে দিনে। তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না কিছুতে।

মেফিস্টোফেলিস: তাহলে আমি আমার সচেতন শক্তি ও সুরুচির সাহায্যে কোন এক মনোরম স্থানে প্রাসাদোপম এক প্রমোদভবন নির্মাণ করব। পাহাড়, সবুজ মখমলের মত ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, সাজানো বাগান, ঝর্ণা সব থাকবে তার সীমানার মধ্যে। চিত্তবিনোদনের জন্য থাকবে অনেক সুন্দরী নারী। নারী শব্দটা আমি সবসময় বহুবচনেই প্রয়োগ করতে চাই। এইভাবে সেই নিভৃত নির্জন ভবনে অনন্ত উজ্জ্বল আরামঘন অবকাশ যাপন করব আমি।

ফাউস্ট: এও ভাল নয়।

মেফিস্টোফেলিস: তাহলে বুঝেছি তুমি কি চাও। সেটা কিন্তু খুবই সাহসের ব্যাপার। চাঁদের কাছাকাছি চলে গেছে তোমার উচ্চাভিলাষ। তোমার বাতিকগ্রস্ত মন কি চাঁদের রাজ্যটাকেও দখল করতে চায়?

ফাউস্ট: না, ঠিক তা নয়। এই পৃথিবীর মাটিতেই এখনো অনেক কিছু করার আছে। কত বিস্ময়কর পরিকল্পনা মাথায় আসছে। নূতন শক্তি ও কর্মোদ্যম অনুভব করছি আমি।

মেফিস্টোফেলিস: তুমি তাহলে বীরের মত গৌরব অর্জন করবেই? মনে হচ্ছে বীরাঙ্গনারা সঙ্গিনী হয়েছে তোমার।

ফাউস্ট: শক্তি ও সম্পদলাভের অভিলাষ পেয়ে বসেছে আমায়। তার জন্য কাজ করতে হবে। কাজই আসল কথা, গৌরব নয়।

মেফিস্টোফেলিস: কবিরা তার বিচার করবে। তোমার নির্বুদ্ধিতা থেকে নির্বুদ্ধিতাই বাড়বে। ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে তোমার গৌরব।

ফাউস্ট: তোমার যা নাগালের বাইরে তার বিষয় জানবে কি করে? হিংসাগ্রস্ত কণ্টকিত তোমার অন্তর মানুষের আশা আকাঙ্খার কথা জানতে পারে না।

মেফিস্টোফেলিস: তোমার ইচ্ছা অভিলাষ তোমার থাক। তবে তার কথা বিশ্বাস করে আমায় বলতে পার।

ফাউস্ট: উন্মুক্ত সমুদ্রের উপর চোখ পড়ে গেল আমার। দেখলাম অসংখ্য তরঙ্গমালা আপনা থেকে উত্তাল হয়ে উপকূলভাগকে আক্রমণ করার জন্য উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। মনে হলো, ও তরঙ্গ আমাদেরই উত্তেজিত রক্তের উদ্ধত তুফান সকলের সব অধিকার বোধকে গ্রাস করার জন্য ছুটে চলেছে স্বাধিকারপ্রমত্ত অবস্থায়। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলাম সে তরঙ্গমালা গর্জন করতে করতে ফিরে আসছে। করায়ত্ত লক্ষ্যবস্তুকে ছেড়ে দিয়ে চলে আসছে।

মেফিস্টোফেলিস: এটা এমন কিছু নূতন ব্যাপার নয়। শত সহস্র বছর ধরে এ ঘটনা দেখে আসছি আমি।

ফাউস্ট (আবেগের সঙ্গে): যে সমুদ্রতরঙ্গ কূল প্লাবিত করে ছুটে চলে তার জলরাশি কিন্তু সৃজনীশক্তিবিহীন। তা কোন ঊষর ভূমিকে উর্বর করতে পারে না। এই উদ্দেশ্যহীন প্রকৃতির নিস্ফল সমারোহ আমাকে হতাশ করে তোলে মাঝে মাঝে। তবু আমি প্রতিনিবৃত্ত হই না। আমি দেখেছি একমাত্র পাহাড়ই সমুদ্রকে দমন করতে পারে। উদ্ধত উদ্বেল তরঙ্গমালা অটল পাহাড়ের পদতলে শান্ত হরিণশিশুর মত খেলা করতে থাকে। আমিও তেমনি ঐ উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মতই মাথা তুলে উঠতে চাই। সমস্ত প্রতিকূলতার তরঙ্গমালাকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিতে চাই।

(দূর হতে সামরিক সঙ্গীতের শব্দ আসছিল)

মেফিস্টোফেলিস: কত সহজে কথাটা বললে! ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

ফাউস্ট: জ্ঞানী ব্যক্তিরা আসন্ন যুদ্ধের কথা শুনতে চায় না।

মেফিস্টোফেলিস: যুদ্ধ বা শান্তির কালে সুযোগ গ্রহণ করাই হলো জ্ঞানীর কাজ। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে কোন অবস্থা থেকেই কিছু না কিছু লাভ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা লক্ষ্য করে যান। এখন সুযোগ উপস্থিত। সে সুযোগ গ্রহণ করো ফাউস্ট।

ফাউস্ট: তোমার ওসব ঐন্দ্রজালিক ধনরত্নের মধ্যে আমি নেই। কি বলতে চাও ভাল করে বল।

মেফিস্টোফেলিস: আমি এটা বেশ বুঝতে পেরেছি সম্রাটের এখন বিরাট দুর্দিন সমাগত। তুমি জান আমরা সেখানে থাকাকালে অনেক মায়াময় ধন-সম্পদ তাকে দান করি। তার ফলে তাঁর লোভলালসা বেড়ে যায়। তার উপর বয়সে যুবক বলে সহজেই উচ্ছৃংখলতায় গা ঢেলে দেন। সততা এবং

কামনা, সুশাসন এবং ভোগবাসনা এই দুটো জিনিস কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না।

ফাউস্ট : এক বিরাট ভুল করেছেন তিনি। সুশাসক হতে হলে নিজের ইচ্ছা ও কামনা বাসনাকে বিশ্বস্ত প্রজাকুলের স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে চলতে হবে।

মেফিস্টোফেলিস : সে সুশাসন তিনি করতে পারেননি। তিনি ভোগ-বাসনায় গা ঢেলে দেন। ফলে সারা রাজ্যে দেখা দেয় নিদারুণ অরাজকতা। উচ্চ নীচ সকলে মারামারি করতে থাকে পরস্পরের সঙ্গে। ভাই ভাইকে হত্যা করে। এমন কি ধর্মস্থানেও নরহত্যা চলতে থাকে। ব্যবসায়ীরা অসহায় বোধ করতে থাকে। চারদিকে বইতে থাকে প্রতিহিংসার স্রোত। শাসনের অভাবে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার জন্য।

ফাউস্ট : তারা উঠছে আর পড়ছে। পড়ছে আর উঠছে।

মেফিস্টোফেলিস : এই ধরনের অবস্থা যখন চলছিল, যখন ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না, তখন একজন সমর্থ ব্যক্তি সাহস সঞ্চয় করে বলল, এই অশান্তির মাঝে যিনি আমাদের শান্তি দান করতে পারবেন তিনিই হবেন আমাদের সম্রাট। এখন তুমিই সম্রাট নির্বাচিত হও। দেশকে নূতন করে গড়ে তোল, শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো।

ফাউস্ট : পুরোহিতের মত কথা বলছ।

মেফিস্টোফেলিস : সম্রাট এখন শেষ যুদ্ধের জন্য এইদিকেই আসছেন।

ফাউস্ট : তাঁর জন্য আমার কষ্ট হয়। লোক হিসাবে তিনি বড় সরল প্রকৃতির ও ক্ষমাশীল ছিলেন।

মেফিস্টোফেলিস : চলে এস। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। ঐ সংকীর্ণ উপত্যকা হতে তাঁকে মুক্ত করতে হবে। দেখা যাক পাশার চাল কোন দিকে পড়ে। এখনো তাঁর হাতে সম্পদ আছে। চলে এস। (পাহাড়ের মাঝা-মাঝি উঠে সম্রাটের সেনাদল প্রত্যক্ষ করতে লাগল) আমরা তাঁর সঙ্গে যোগদান করব। জয় তাঁর অনিবার্য।

ফাউস্ট : তার পরে কি হবে জানতে চাই। প্রতারণা, বিভ্রান্তিকর মায়া! ইন্দ্রজাল!

মেফিস্টোফেলিস : না, প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে যুদ্ধজয়ের জন্য। তোমার মহান লক্ষ্যের কথা একবার ভেবে দেখ। যদি রাজার এ রাজ্য রক্ষা

করতে পার শত্রুর কবল থেকে তাহলে সে রাজ্য একদিন শ্রমের পারিতোষিক হিসাবে দাবি করতে পারবে।

ফাউস্ট: অনেক বিদ্যাতেই পারদর্শিতা দেখিয়েছ। এবার এক যুদ্ধ জয় করো।

মেফিস্টোফেলিস: না, তুমি জয় করবে। তোমাকে প্রধান সেনাপতি করা হবে।

ফাউস্ট: এক বিরাট মর্যাদা দান করছ। কিন্তু সেনাপতিত্বের আমি কিছু বুঝি না।

মেফিস্টোফেলিস: কাজের যা কিছু দোষ বা ত্রুটি তোমার অধীনস্থ লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে শুধু যশটুকু গ্রহণ করবে। আমি যুদ্ধের সময় অর্ধেক মানুষের শক্তি আর অর্ধেক পাহাড়ের বা প্রাকৃতিক শক্তির উপর নির্ভর করলাম।

ফাউস্ট: তুমি কি পার্বত্য জাতির লোকদেরও উত্তেজিত করেছ? ওরা অস্ত্র হাতে নিয়ে আসছে দেখছি।

মেফিস্টোফেলিস: না, তবে ওদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভাল দেখে কয়জনকে বেছে এনেছি।

তিনজন শক্তিশালী বীরের আবির্ভাব

মেফিস্টোফেলিস: আমার লোকরা এসে গেছে। তারা বিচিত্র পোষাক ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে। তারা বীরত্ব দেখিয়ে শিশুদের আনন্দ দান করবে, আবার শয়তানরূপে বিশ্বাসঘাতকরূপেও পালাতে পারবে।

বল্লী: (বিচিত্রবর্ণের পোষাকপরা হালকা অস্ত্র সহ এক তরুণ) আমার সামনে কেউ এলেই আমি ঘুঁষির পর ঘুঁষি মেরে আর চুলের মুঠি ধরে তাকে চিৎ করে ফেলে দেব।

হ্যাভকুইক: (মধ্যবয়সী ভাল পোষাক ও অস্ত্রে সজ্জিত) এই যুদ্ধের কোন অর্থ হয় না। এই সব বিবাদ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

হোল্ডপার্ট: (বয়োপ্রবীণ ও অস্ত্রসজ্জিত) যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে লাভ আমরা করি তা হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। জীবনের জোয়ার মানুষকে নিচের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বৃদ্ধলোকের কথা শুনে চললে ঠকতে হবে না।

(তারা পাহাড় থেকে নামতে লাগল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সম্রাটের শিবির সন্নিবেশ। নিচের থেকে রণবাদ্য শোনা যাচ্ছিল।

সম্রাট, প্রধান সেনাপতি ও দেহরক্ষীবৃন্দ

প্রধান সেনাপতি: এই উপত্যকার মাঝে অবস্থান করাই এখন আমাদের বিধেয়। এখানে সরে এসে আমরা ভালভাবেই সৈন্য সমাবেশ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের পরাজয় ঘটবে না।

সম্রাট: কি হবে শীঘ্রই তা বোঝা যাবে। তবে এই অর্ধ-আত্মসমর্পণ ও অর্ধাপসরণ নীতি আমি পছন্দ করি না।

প্রধান সেনাপতি: নিচে তাকিয়ে দেখুন মহারাজ, কোথায় আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ভূমি আমাদের দখলে। পাহাড়টা ঠিক খাড়াই না হলেও শত্রুদের অশ্বারোহী সেনাদল এগোতে পারছে না। আমাদের অর্ধেক শক্তি পাহাড়ে লুকোন আছে।

সম্রাট: আমার বলার শুধু একটা কথাই আছে, সাহস আর অস্ত্রের পরীক্ষার মাধ্যমেই গুণ বোঝা যায়।

প্রধান সেনাপতি: ঐ দেখুন ঐ প্রান্তরের মাঝখানে আপনার পদাতিক সৈন্যদল যুদ্ধে ব্যাপৃত। তাদের বিক্ষিপ্ত বর্শার ফলকগুলো কুহেলিঘেরা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। আপনার সেনাদল সংখ্যায় শত্রুদের থেকে অনেক বেশী।

সম্রাট: প্রথমে দৃশ্যটা আমায় দেখতে দাও। শক্তিতে দ্বিগুণ মনে হচ্ছে সেনাদলটাকে।

প্রধান সেনাপতি: বাঁ দিকের কথা বলার কিছু নেই। বীর যোদ্ধারা সৈন্যাবাস ও অস্ত্রাগার প্রহরা দিচ্ছে। বিনা রক্তক্ষয়ে কোন শত্রুসৈন্য প্রবেশ করতে পারবে না সেখানে।

সম্রাট: ওদিকে আমার প্রভুত্বকে অস্বীকার করে সিংহাসনের মর্যাদাকে লঙ্ঘন করে আমার বিদ্রোহী প্রজাগণ এগিয়ে আসছে আমারই বিরুদ্ধে। নিজেদের রাজ্য নিজেরাই বিধ্বস্ত করেছে। ওদের মতির কোন স্থিরতা নেই।

প্রধান সেনাপতি: কোন এক বিশ্বস্ত সৈনিক কোন খবর নিয়ে আসছে। হয়ত সুসংবাদ আছে।

প্রধান গুপ্তচর: সৌভাগ্যক্রমে আমরা জয়লাভ করেছি। আমাদের পক্ষের সাহস ও সমর কৌশল ফলবতী হয়েছে। তবে এখন অনেক প্রজা শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করছে রাজাকে।

সম্রাট: জনগণ স্বার্থপর, তারা শুধু আত্মরক্ষার কথাটাই ভাল করে বোঝে। কর্তব্যপরায়ণতা, সম্মান, কৃতজ্ঞতা কোন কিছুই বোঝে না। তারা এটা বোঝে না যে প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগালে তাদের নিজেদের ঘরও পুড়বে।

প্রধান সেনাপতি: আর একজন ক্লান্ত চর আসছে।

দ্বিতীয় গুপ্তচর: শত্রুপক্ষ যখন হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল এবং আমরাও কি করব তাই ভাবছিলাম তখন হঠাৎ আর একজন সম্রাটের আবির্ভাব হয়। আমাদের শত্রুরা তখন পালিয়ে যায়। অনেকে সেই সম্রাটের পতাকাতলে সমবেত হয়। তারা হচ্ছে ভেড়া।

সম্রাট: প্রতিদ্বন্দ্বী এক সম্রাটের দ্বারা লাভবান হব আমি। তবে আমি তরবারিনিয়ে একা সম্মুখীন হব তার। এতদিন যুদ্ধ ও বিপদকে ভয় পেতাম আমি। তার মুখোমুখি হতে চাইতাম না। আজ আগুনের মাঝে পড়ে আমি নিজেকে বুঝতে পেরেছি। ফাঁকি দিয়ে একদিন যে যশ ও বিজয়গৌরব লাভ করতে চেয়েছিলাম তার জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আজ। (জনৈক দূত গিয়ে বিদেশাগত সম্রাটকে একক সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করল)

তিনজন শক্তিশালী লোকসহ ফাউস্টের প্রবেশ

ফাউস্ট: আশা করি আমাদের এই আগমন তিরস্কৃত হবে না আপনার দ্বারা। আপনি জানেন এই পার্বত্য জাতির লোকেরা অন্ধকার গিরিগুহার মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে নীরবে গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা কিছু একটা আবিষ্কার করতে চায়। তারা নিরন্তর এক স্বচ্ছ সুতো কেটে চলেছে।

সম্রাট: আমি তা জানি। কিন্তু বল বীর, এতে আমার কি উপকার হবে?

ফাউস্ট: আপনার বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্য সেই যাদুকর এর উত্তর দান করেছে। সে একবার এমন অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে পড়ে যায় যেখান থেকে কোন দেবতা, মানব বা শয়তান তাকে উদ্ধার করতে পারত না। রোমের সম্রাট তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। সে এখন দূরে থাকলেও আপনার

কথা ভাবে এবং আপনার গ্রহনক্ষত্রের কথা বিচার করে সে আমাকে আপনার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছে। এই পার্বত্য জাতির লোকদের ক্ষমতা অপরিসীম। প্রকৃতির শক্তিতে এরা বলীয়ান।

সম্রাট : এই সংকটজনক মুহূর্তে সাহায্যের জন্য তুমি যে এগিয়ে এসেছ এজন্য হে বীর তোমাকে স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ দিই। কিন্তু হে বীর, তুমি অস্ত্রধারণ করবে না। আমার মুকুট ও সিংহাসন যে অবৈধভাবে দাবি করে সম্রাট সাজতে চাইছে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সম্মুখীন হতে চাই।

ফাউস্ট : আপনার মাথা যেমন করে হোক রক্ষা করতে হবে। কারণ সম্রাটের মাথাই শৃঙ্খলা বজায় রাখে সৈন্যদল ও প্রজাদের মধ্যে। আপনার সেই মাথায় যাতে কোন আঘাত না লাগে তার জন্য আমি বীরত্ব-সহকারে ঢাল দিয়ে রক্ষা করব এবং প্রয়োজনবোধে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করে আপনার জয়ের অংশ গ্রহণ করব।

সম্রাট : আমার এত রাগ হচ্ছে যে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তার দর্পিত মাথাটা আমার পায়ের তলায় রেখে তার উপর দাঁড়াব।

প্রহরী : (ফিরে এসে) আমরা কাছে গেলে তারা উপহাসের সঙ্গে বলল, তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হচ্ছে অলীক স্বপ্নের লোক।

ফাউস্ট : আমরা যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। ভালই হয়েছে। এখন আপনার প্রতি যারা অনুগত তারা আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। এখন শত্রু-সৈন্যরা এগিয়ে আসছে। আপনার সেনাদল আক্রমণের জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে।

সম্রাট : তবু সে আদেশ আমি দেব। (প্রধান সেনাপতিকে) এটা তোমার কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করো বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

প্রধান সেনাপতি : বাঁদিক থেকে শত্রুরা পাহাড়ে ওঠার চেষ্টা করছে। আমাদের ডান দিকের সেনাদলরা তাদের আক্রমণ করুক।

ফাউস্ট : আমি যে বীরদের সঙ্গে এনেছি তাদের মধ্যে এই একজন আপনার সেনাদলকে সাহায্য করুক। আপনি আদেশ করুন। (তিনজনের মধ্যে বুল্লীকে ইশারা করল)

বুল্লী : (এগিয়ে এসে) আমার সামনে কেউ এগিয়ে এলেই তার গায়ের হাড় ভেঙ্গে দেব। কারো পিঠ পেলে এক ঘুঁষিতে তা ভেঙ্গে দেব। শত্রুরা নিজেদের রক্তের গভীরে নিজেরাই ডুবে যাবে। (প্রস্থান)

প্রধান সেনাপতি : আমার প্রধান পদাতিক দল যারা কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে তারা ধীরে কাজ করবে। এখন ডান দিকের সেনাদলই সকলের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

ফাউস্ট : (মধ্যবয়সী হ্যাভকুইককে ডাকল) আপনি আদেশ করুন এখন এই লোকটিও কাজ শুরু করুক।

হ্যাভকুইক : সম্রাটের সেনাদলের সঙ্গে এবার যুক্ত হবে আমার বীরত্ব। বিপক্ষ দলের রাজার শিবির হবে আমাদের লক্ষ্য। তাকে আর সিংহাসনে বেশীদিন বসে থাকতে হবে না। (প্রস্থান)

প্রধান সেনাপতি : বাঁদিকের গিরিবর্ত্মের মুখে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের সেনারা প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে শত্রুসৈন্যদের। তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না গিরিপথে।

ফাউস্ট : (হোল্ডপাস্টকে ডাকল) আমার এই তৃতীয় লোকটিকেও যুদ্ধে যোগদানের আদেশ দিন মহারাজ। আপনার শক্তির আরও বৃদ্ধি হোক।

হোল্ডপাস্ট : আমি একবার যুদ্ধে নামলে জয় অনিবার্য। আমি একবার যা দখল করি বিদ্যুৎ বা বজ্রও তা ভাঙতে পারে না। (প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস : (উপর থেকে নেমে এসে) এখন দেখ, বিভিন্ন দিক থেকে কত শত্রুসৈন্য তরবারি ও বর্শা নিয়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমি চুপ করে বসে নেই। জানতে চেও না আমি কোথা থেকে আসছি। তবে আমি শত্রুদের অস্ত্রাগার থেকে সব অস্ত্র সরিয়ে নিয়েছি। ঐ দেখ, ওরা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করতে করতে যুদ্ধ করছে। (জোর গোলমাল, শত্রুসৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল)

ফাউস্ট : সামনের দিগন্তটা অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু তীক্ষ্ণ তরবারির উজ্জ্বলতায় পাহাড় বন সব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

মেফিস্টোফেলিস : ডানদিকের সেনাদল জোর যুদ্ধ করছে। কিন্তু তাদের সবার মাঝে বুল্লী একা দৈত্যের মত লড়াই করে শত্রুসেনাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।

সম্রাট : আচ্ছা আমি প্রথমে যেখানে দেখেছিলাম একটা হাত এখন সেখানে দেখছি এক ডজন হাত। এটা কেমন অস্বাভাবিক নয়?

ফাউস্ট : সিসিলির উপকূলে এক ধরনের বাষ্পরাশির কথা শুনেছেন? স্পষ্ট দিবালোকে দেখলে বাষ্পের মধ্য থেকে এক মূর্তির আবির্ভাব হয় যা শহরের সব বাড়ি বাগান ওলট পালট করে দেয়।

সম্রাট: আমাদের পদাতিক দলের বর্শাগুলোর উপরে আমি একটা লোহার ফলক লাগানো বর্শাকে চকচক করতে দেখলাম। সঙ্গে দেখলাম সেই একটা বর্শা যেন অনেকগুলো হয়ে উঠল।

ফাউস্ট: ক্ষমা করুন মহারাজ, ওগুলো হচ্ছে পোলাস ও ক্যাস্টরের উজ্জ্বল প্রেতাত্মা। বিপদাপন্ন নাবিকরা ওদের স্মরণ করে। ওরা এসেছে আপনাকে সাহায্য করতে।

সম্রাট: তাহলে বল আমরা কার কাছে ঋণী? প্রকৃতিই কি ঐন্দ্রজালিক শক্তির সহায়তায় আমাদের পরিকল্পনাকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে?

মেফিস্টোফেলিস: কার কাছে আবার? এক বৃদ্ধ রোমকের প্রেতাত্মাই নিজেকে বিপন্ন করে প্রবল শত্রুসৈন্যদের ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে আপনাকে।

সম্রাট: আমার অভিযানকালে যাজকরা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছিল। কিন্তু আমি তাদের পানে তাকাইনি। আমার এই নবলব্ধ শক্তির উৎস কি তারাই?

ফাউস্ট: এবার তাকিয়ে দেখুন, শত্রুরা আর নেই। আমার মনে হয় সেই আত্মা এক সুলক্ষণ পাঠাবে।

সম্রাট: আকাশে একটা ঈগল ডিগবাজি খাচ্ছে। তারপর একটা গ্রিফিন পাখি আসছে।

ফাউস্ট: ভাল করে দেখুন। অনুকূল লক্ষণ মনে হচ্ছে। গ্রিফিন রূপকথার পাখি। সাহস করে এক ঈগলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে।

সম্রাট: একবার একটা পাক খেয়ে ওরা পরস্পরকে আক্রমণ করল। মনে হচ্ছে ওদের ঘাড় দেহ দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

ফাউস্ট: দেখুন গ্রিফিনটা এবার শান্ত হলো। নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শত্রুকে জয় করল ওর। তারপর সিংহের মত ওর দেহটাকে নত করে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

সম্রাট: এবার আমি লক্ষণটার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

মেফিস্টোফেলিস: শত্রুসৈন্যরা বাঁদিক থেকে ডান দিকে সরে যাচ্ছে। সেখানেও প্রবল বাধা পাচ্ছে আমাদের সেনাদলের কাছ থেকে। এ যুদ্ধে আমরা একরকম জয়লাভ করে ফেলেছি।

সম্রাট: দেখ দেখ, আমাদের জয়ে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। নিয়তি যেন

হঠাৎ মতি পরিবর্তন করেছে। শত্রুরা যখন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে এসে গিরিপথ দখল করে ফেলছে তখন তাদের উপর একটা ঢেলাও ছুঁড়ছে না। পরিশেষে আমাদের সব স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। তোমার সব কৌশল মিথ্যা মায়ায় পর্যবসিত হলো।

মেফিস্টোফেলিস : দাঁড়কাকের শব্দে কুলক্ষণের আভাস পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে আমাদের অবস্থা খারাপ।

সম্রাট : এই সব ভয়ঙ্কর পাখিগুলো কালো পাখা বিস্তার করে এখানে এসে বসল কেন ?

ফাউস্ট : আপনি পায়রাদের ডাকবহনের কথা শুনেছেন। দূর দূরান্ত থেকে তারা খবরাখবর আনত। কিন্তু শান্তির সময়ে সেটা সম্ভব হত। যুদ্ধের সময় দরকার দাঁড়কাকের দৌত্য।

মেফিস্টোফেলিস : পাখিরা আমাদের বিপদের কথা ঘোষণা করছে। অদূরে শত্রুসৈন্যরা পর্বতপ্রাচীরের দিকে এগিয়ে আসছে। গিরিপথ একবার দখল করে নিলে আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

সম্রাট : আমার ভাগ্যে আছে পরাজয় আর প্রতারণা। তোমরাই আমাকে এই অবস্থার মধ্যে টেনে আনলে। তারা আমাকে শৃংখলিত করবে একথা ভাবলেও কম্পন আসছে আমার।

মেফিস্টোফেলিস : সাহস অবলম্বন করুন। এখনো জয়-পরাজয়ের পাশা চূড়ান্তভাবে পড়েনি। ধৈর্য ধারণ করুন। আমাকে সৈন্য পরিচালনা করার আদেশ দিন।

প্রধান সেনাপতি : আপনি যখন যেচে এদের নেতৃত্ব মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন তখন থেকেই আমাদের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাহুর দ্বারা কোন সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। যুদ্ধে পরাজিত আমরা। যুদ্ধ ওরা শুরু করেছে, ওরাই শেষ করুক। আমার পদ আমি ত্যাগ করছি। এতে আমার আর করার কিছু নেই।

সম্রাট : কার্যভার ত্যাগ করো না এখন। সুদিনের অপেক্ষা করো। (মেফিস্টোফেলিসকে) তুমি এই কার্যভার গ্রহণ করো না। যদিও তুমি একাজের যোগ্য নও, তবু দেখ যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে আনতে পার কি না। যা হবার হোক। (প্রধান সেনাপতিসহ সম্রাটের প্রস্থান)

মেফিস্টোফেলিস : আমাদের এ পক্ষের কোন সুবিধা হবে না।

ফাউস্ট : এখন কি করতে হবে ?

মেফিস্টোফেলিস : যা হবার হয়ে গেছে। এখন হে আমার দাঁড়কাক ভাইরা, তোমরা পাহাড়ে উড়ে যাও। সেখানে পার্বত্য হ্রদের ধারে বসে জলে নিজের দেহের ছায়া দেখে সত্য মিথ্যার ব্যবধান বুঝতে শেখ। আসল থেকে নকলকে পৃথক করতে শেখ।

ফাউস্ট : আমাদের দাঁড়কাক বন্ধুরা পাহাড়ে গিয়ে দেখবে অসংখ্য জল-প্রপাত আর ঝর্ণা পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে।

মেফিস্টোফেলিস : এ দৃশ্য দেখতে ওরা অভ্যস্ত নয়। সবচেয়ে সাহসী পর্বতারোহণকারীরাও এতে ভয় পায়।

ফাউস্ট : জলস্রোতের পর জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে সুউচ্চ পাহাড় থেকে। তারপর সে জলস্রোত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকের উপত্যকা ও মাল-ভূমিতে। ফেনায়িত সেই পতনশীল ও প্রসারণশীল জলতরঙ্গের গতিরোধ করার সাধ্য আমাদের নেই।

মেফিস্টোফেলিস : আমি কিন্তু জলের দৃশ্যে কোন ভয় পাই না; বরং আনন্দ পাই। ঐ দাঁড়কাকগুলো ঐ জলের উপর উড়ছে, স্নান করছে। (দাঁড়কাকগুলো ফিরে এলে) উপরকার মালিকের কাছে তোমাদের কাজের প্রশংসা করব। তোমরা এখন বাতাসে ভাসতে ভাসতে এক বামনের দেশে যাবে। সেখানে বামনরা হাপরে লোহা পিটছে মেরনে। সেখানে তাদের আগুন আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে পারে, কক্ষচ্যুত উল্কা পড়তে পারে। কিন্তু জানবে অরণ্যবৃক্ষের কঠিন শাখা প্রশাখায় বিদ্যুৎ বা বজ্রের আগুন আটকে যায়। উল্কাও কোন ক্ষতি করতে পারে না। অনুনয়ের কথা না শুনলে তাদের কড়া আদেশ দেবে। (দাঁড়কাকদের প্রস্থান) এবার শত্রুদের উপর পড়ছে রাত্রির কালো যবনিকা। তারা আর এগোতে পারছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তারা চিৎকার করছে ভয়ে।

ফাউস্ট : যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে তারা গোলাবর্ষণ করছে।

মেফিস্টোফেলিস : অতীতে ইতালিতে গুয়েল্‌ফ ও গিবেলাইন দলের মধ্যে এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল যুদ্ধবিবাদ। তেমনি শয়তানসুলভ পারস্পরিক আক্রমণ প্রতি-আক্রমণে পার্বত্য উপত্যকাগুলো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। (সামরিক সঙ্গীত শোনা গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটের শিবির

সিংহাসন : রাজকীয় পরিবেশ

হ্যাভকুইক ও স্পীডবুটি

স্পীডবুটি : আমরাই তাহলে প্রথমে এখানে এসে উপস্থিত হলাম।

হ্যাভকুইক : আমাদের মত এত তাড়াতাড়ি কোন দাঁড়কাকও উড়তে পারে না।

স্পীডবুটি : কত ধনরত্ন ছড়িয়ে রয়েছে স্তূপাকৃত হয়ে। কোথা থেকে শুরু করে কোথায় শেষ করব ?

হ্যাভকুইক : গোটা জায়গাটাই ধনরত্নে পরিপূর্ণ। কত কি নেব বুঝতে পারছি না।

স্পীডবুটি : এই নরম গালিচাটা আমার দরকার। আমার শোবার বিছানাটা শক্ত লাগে বড়।

হ্যাভকুইক : (একটা অস্ত্র নিয়ে) এই অস্ত্রের একটা ঘায়েই একটা লোককে মারা যায়। এসব থাক। ঐ বাক্সটা নাও। ওতে খাঁটি সোনা ভরা আছে। এর থেকে সৈন্যদের সব বেতন দেওয়া হবে।

স্পীডবুটি : বাক্সটা কী ভীষণ ভারী। তুলতে পারছি না।

হ্যাভকুইক : নাও তাড়াতাড়ি। ওটা তোমার শক্ত পিঠে চাপিয়ে দেব।

স্পীডবুটি : হায় হায়, ওটা পড়ে গেল, আমার পিঠ ভেঙ্গে গেল। (বাক্সটা খুলে গেল) সব সোনা ছড়িয়ে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি যত পার কুড়িয়ে নাও।

স্পীডবুটি : আমার আঁচল ভরে যাক সোনায়।

হ্যাভকুইক : নাও, যাও। একি তোমার আঁচল ফুটো। যেখানে যাচ্ছ সেখানেই পড়ে যাচ্ছে।

সম্রাটের রক্ষীদল : কি খুঁজছ তোমরা এখানে ?

হ্যাভকুইক : আমরা আমাদের বেতন পাইনি। তাই বিরোধী পক্ষের শিবিরে এসেছি। আমরা সৈনিক।

রক্ষীদল : সৈনিক হয়ে চুরি করতে এসেছ ? সম্রাটের সেবা করতে হলে সৎ হতে হয়।

হ্যাভকুইক : সে সেবা পেতে হলে কিছু দিতে হয়। আমাদের মত অবস্থায় পড়লে তোমরাও তাই করতে। চল কেটে পড়। এখানে সুবিধে হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম রক্ষী : লোকটার মুখে প্রথমে একটা ঘুঁষি মারতে পারলে না ?

দ্বিতীয় রক্ষী : এদের দেখতে ভূতের মত মনে হচ্ছিল যার ফলে মারার মত শক্তি খুঁজে পেলাম না।

তৃতীয় রক্ষী : আমার চোখের সামনে হঠাৎ আলোর একটা ঝলকানি খেলে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

চতুর্থ রক্ষী : আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। সারাদিন গুমোট গরম গেছে। তার উপর কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। তারই মাঝে যুদ্ধ করেছি।

রাজন্যবর্গসহ সম্রাটের প্রবেশ

সম্রাট : আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। শত্রুরা গরুর পালের মত যেন পালিয়ে গেছে সমভূমির উপর দিয়ে। এই শূন্য সিংহাসনের উপর আজ আমি প্রতিষ্ঠিত। রক্ষীরা প্রহরা দিচ্ছে। চারদিক হতে অনুগত প্রজাদের দূত আসছে। যদিও প্রথম দিকে যাদুবিদ্যার সাহায্য নিই। শেষের দিকে আমরা নিজেদের শক্তিতে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধকালে অবশ্য অলৌকিক ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটলে ভালই হয়। যেমন আকাশ থেকে পড়া পাথরখণ্ড, শত্রুদের মাথায় রক্তবৃষ্টি, পর্বতগুহা হতে আগত অদ্ভুত ধ্বনি। যাই হোক ; বিজেতারা স্বভাবতই ঈশ্বরে বেশী বিশ্বাস করে। তাই শেষের দিকে আমরা ঈশ্বরকে বলছিলাম, 'হে ঈশ্বর, আমরা তোমার গুণগান করি।' এখন রাজন্য চতুষ্টয়, সমর্থনের প্রত্যাশায় তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ করেছি আমি। এখন তোমাদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। (প্রথম রাজন্যকে) তোমাকে প্রধান সেনানী নিযুক্ত করলাম। এই নাও তরবারি। যুদ্ধোত্তর কালের সমগ্র পরিস্থিতি পরিদর্শন করে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে কাজ শুরু করো।

প্রধান সেনানী : আপনার সিংহাসন এখন সুরক্ষিত। এখন রাজ্যের সীমান্তকে সুরক্ষিত করতে হবে। আপনার সমর্থনে আমার এই তরবারি চিরদিন নিয়োজিত হবে। আপনাকে সতত রক্ষা করে যাবে।

সম্রাট : (দ্বিতীয় রাজন্যকে) তোমার উপর ভার দিলাম প্রাসাদের দাস-দাসীদের পরিচালনা করার। অনেক সময় ওরা নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদ করে অনেক কাজ পণ্ড করে দেয়। তুমি লক্ষ্য রাখবে ওরা যাতে রাজন্যবর্গের

যথাযথভাবে সেবা করে এবং প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলে।

প্রধান ভৃত্যপরিচালক : আপনার প্রীতি বর্ধনের জন্য আমি নিরন্তর কাজ করে যাব। এখন আমার একমাত্র কর্তব্য আপনার অভিষেক ও বিজয় উৎসবের আয়োজন করা। আপনি চলুন, আমি সোনার গামলা ও আপনার আংটি নিয়ে যাচ্ছি।

সম্রাট : (তৃতীয় রাজন্যকে) তোমাকে নিযুক্ত করছি প্রধান পরিচারক। তুমি রন্ধনগৃহ ও পাচকদের তদারক করে আমার ভোজনের ব্যবস্থা করবে।

প্রধান পরিচারক : প্রতিদিন আপনাকে সুখাদ্য পরিবেশন না করা পর্যন্ত আমি জলস্পর্শ করব না। নিত্যনূতন সুখাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য তৎপর থাকব আমি। কারণ প্রতিদিন এক খাদ্য ভাল হলেও তার আস্বাদ পাওয়া যায় না।

সম্রাট : (চতুর্থকে) যেহেতু আমরা এক উৎসবের আয়োজন করেছি তোমার কাজ হবে উত্তম পানের ব্যবস্থা করা। তুমি দেখবে যেন মদের পাত্র সব সময় পূর্ণ থাকে। উৎসবের উন্মাদনায় নিজে যেন বেশী পান করে বসো না।

মদ্য অধিকর্তা : হে মহারাজ, আমি বয়সে নবীন হলেও এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। আমি মদ পরিবেশনের জন্য সোনা রূপো প্রভৃতি বিভিন্ন ধাতুর পানপাত্রের ব্যবস্থা করব। আপনার হাতে তুলে দেব সবচেয়ে ভাল ও সুদৃশ্য পানপাত্রটি। সবচেয়ে ভাল মদ আপনাকে দেব যে মদে নেশা হবে না। আপনার সংযত স্বভাবই আপনাকে রক্ষা করে যাবে সকল বিপদ হতে।

সম্রাট : তোমাদের যা বলার বলেছি। সম্রাটের মুখের কথাই যথেষ্ট। যাকে যা দেবার তাও একবার বলা হলে অবশ্যই দেওয়া হবে। স্বাক্ষর দরকার। উপযুক্ত স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে ঠিকমত তার প্রয়োগ হয় তাও দেখতে হবে।

প্রধান যাজক ও প্রধান প্রশাসকের প্রবেশ

সম্রাট : তোমরা চারজন রাজন্যকে দেখলে। আমি তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি কিভাবে রাজপ্রাসাদ ও রাজদরবার পরিচালিত করতে হবে। তোমরা সকলে যেমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার সেবা করে যাবে তেমনি তার প্রতিদান-স্বরূপ তোমাদের এক একটি রাজ্য দান করব। পরে সে রাজ্য তোমরা বাড়াতেও পারবে বিভিন্নভাবে। সেখানে তোমাদের বিচারের উপর কোন আদালতে

আবেদন চলবে না। সব করের টাকা তোমরা পাবে। শুধু খনিজদ্রব্য আর মুদ্রা থাকবে আমার অধিকারে। কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে এইভাবে তোমাদের পদোন্নতি করলাম।

প্রধান যাজক: আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গভীর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আপনি আমাদের নিরাপত্তা দান করে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সম্রাট: আমি আপনাদের উচ্চতর মর্যাদা দান করব। আপনারা আমাকে এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে অধিষ্ঠিত করুন। এতদিনের যুদ্ধ-বিবাদ সব অনাবিল শান্তিতে পরিণত হোক।

প্রধান প্রশাসক: আপনিই হচ্ছেন প্রথম নরপতি যাঁর সামনে বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করলাম আমরা। যতদিন আমাদের শিরায় শিরায় বিশ্বস্ততার রক্ত প্রবাহিত হবে ততদিন কখনো অবাধ্য হব না আপনার।

সম্রাট: কয়েকটি শর্তে যে অধিকার ও সম্পত্তি তোমাদের দান করলাম তা দলিলে লিপিবদ্ধ হোক। এই সব সম্পত্তির আয় উপসত্ব স্বাধীনভাবে ভোগ করবে তোমরা।

প্রধান প্রশাসক: আমি কাগজে তা লিপিবদ্ধ করব। পরে স্বাক্ষর সংযুক্ত হবে তাতে।

সম্রাট: এখনকার মত সভা ভঙ্গ করলাম। উৎসবের বিষয় নিয়ে আলোচনা করো নিজেদের মধ্যে।

প্রধান যাজক: প্রশাসক চলে গেলেও যাজক রয়ে গেল একটা বিষয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেবার জন্য। আমার পিতৃসুলভ হৃদয়টা আপনার জন্য ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সম্রাট: এই সুখের সময়ে কিসের ভয় অনুভব করছ তুমি?

যাজক: এই সুখের সময়ে এই কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি যে আপনি সিংহাসনে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও আপনার মাথায় শয়তান বাস করছে। আমাদের ধর্মগুরু জানতে পারবেন আপনি সেই পুরুষ ডাইনটাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আপনাকে শাস্তি দান করবেন।

সম্রাট: এই পাপের জন্য আমি গভীর ভয় অনুভব করছি। তোমার শক্তিতে তুমি এই পাপটা অনেক লঘু করে দেবার চেষ্টা করবে।

প্রধান যাজক: যে রাজ্যে পাপ প্রবেশ করেছিল সে রাজ্যকে পাপমুক্ত

করতে হলে ব্যাপকভাবে ধর্মাচরণ করতে হবে। সকালে উঠেই ঈশ্বরের স্তোত্র-গান করতে হবে। দিকে দিকে ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়াতে হবে জনগণের মধ্যে। রাজ্য থেকে নাচগানের উৎসব উচ্ছেদ করতে হবে। পাপীর হৃদয়কে অনুতাপে ভরিয়ে তুলতে হবে।

সম্রাট: আমার অনুতাপ বোধ এবং ঈশ্বরের গুণগানের ব্যবস্থাই হবে আমার প্রথম কাজ।

যাজক: এবার চার্চের সঙ্গে রাজার সন্ধি স্থাপন করতে হবে।

সম্রাট: আগের নথিপত্রে দেখছি চার্চ রাজকীয় প্রভাব থেকে মুক্তি চাইছিল। তোমাদের আবেদন আন। আমি স্বাক্ষর করে দেব।

প্রধান যাজক: (যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে) এ মুহূর্তে কাজ শুরু করে দিন। চার্চের উন্নতির জন্য রাজ্যের সমস্ত আদায় করা কর ব্যয় করুন। আমাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য অনেক কিছু দরকার। আপনার কোষাগার হতে কিছু সোনাও দান করবেন। এছাড়া যে সব নিত্য ব্যবহার্য বস্তু আমাদের দরকার জনগণ আমাদের নীতি উপদেশ সম্বলিত বক্তৃতা শুনে তা দান করবে। যে ব্যক্তি চার্চের জন্য ব্যয় করবে তাকে চার্চ অবশ্যই আশীর্বাদ করবে। (প্রস্থান)

সম্রাট: পাপের পরিমাণ সত্যিই বিরাট। যাদুকরেরা অনেক ক্ষতি করে গেছে। অনুতাপে ভারাক্রান্ত আমার হৃদয়।

প্রধান যাজক: (ঘরে এসে) ক্ষমা করবেন মহারাজ, উপকূলভাগের যে রাজ্যটা সেই কুখ্যাত যাদুকরকে দান করেছেন, আপনার পাপ স্খালন না হওয়া পর্যন্ত তারও কর ও রাজস্ব আমরা পাব। সেও বাদ যাবে না।

সম্রাট: সে রাজ্যের অস্তিত্ব এখন আর নেই। তা এখন সমুদ্রে ঢুকে গেছে।

প্রধান যাজক: যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও ধৈর্যশীল তার সুদিন আসবেই। (প্রস্থান)

সম্রাট: আমার গোটা সাম্রাজ্যটা তোমাদের দান করলে ভাল হত।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উন্মুক্ত গ্রামাঞ্চল

পথিক : হ্যাঁ, এখানেই আছে সেই বৃদ্ধ দম্পতি। দীর্ঘ তীর্থযাত্রার পর তাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে আবার। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এখানে এইখানে এই কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লাভ করেছি আমি। বৃদ্ধ হলেও তারা ধার্মিক। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার দেখতে পাব তাদের।

রসিস : (জনৈক বৃদ্ধা) ধীরে পথিক। আমার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। দীর্ঘ নিদ্রার দ্বারা তিনি ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে শক্তি ফিরে পেতে চান।

পথিক : বল মাতা, তুমিই কি রসিস যিনি আমাকে একদিন সেবা শুশ্রূষার দ্বারা নবজীবন দান করেন, যাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এখানে এসেছি আমি। (স্বামী এগিয়ে এসে) তুমিই ত ফিলোমন, আগ্রাসী সমুদ্রতরঙ্গের কবল থেকে আমার ধনরত্ন রক্ষা করেছিলে। আমার দুর্ভাগ্য তোমারই জন্য পরিণত হয়েছিল সৌভাগ্যে। একবার সেই অনন্ত সমুদ্রকে দেখতে দাও।

ফিলোমন : (রসিসকে) নাও, তাড়াতাড়ি করে ঐ বাগানে গাছের ছায়ায় আমাদের খাবার দাও। (পথিককে) সমুদ্রের যেখানে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-মালার কবলে পড়েছিলে তুমি সেইখানে বহুদিন আগে ছিল বাঁধে ঘেরা স্বর্গোদ্যানের মতই এক বাগান। এখন হয়ত দেখতে পাচ্ছ না সেখানে গড়ে উঠেছিল এক সবুজ জনপদ। যাই হোক, চলে এস, খাবার প্রস্তুত। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জাহাজগুলো বন্দরের অভিমুখে চলেছে রাত্রির জন্য আশ্রয় নেবার জন্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোট বাগানবাড়ি

খাবারের টেবিলে তিনজন

রসিস : (পথিককে) তুমি খাচ্ছ না কেন? কত জিনিস এনেছি তোমার জন্য।

ফিলোমন : সে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা জানতে পারবে। ওকে সব বল।

রসিস : সত্যিই ব্যাপারটা অলৌকিক। ভাবতেও কেমন যেন লাগে। মনে হয় এটা যেন কোন অশুভ ভূতুড়ে শক্তির কাজ।

ফিলোমন : এখানকার এই রাজ্যটা তাকে দান করে সম্রাট কি দুঃখে অনুতাপে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন? এই নিম্ন উপকূলভাগে সেই লোকটা হঠাৎ এসে তাঁবু খাটিয়ে সবুজ মাঠের উপরে এ প্রাসাদ গড়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে দিল।

রসিস : দিনরাত কাজ হতে লাগল। রাতেও আগুন জ্বেলে অনেক লোক কাজ করত। অনেক খাল কেটে সেগুলো সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিল। আমাদের চাষের জমিগুলোও সে দখল করে নেবে। সে আমাদের রাজা আর আমরা তার প্রজা।

ফিলোমন : ক্ষতিপূরণস্বরূপ চাইছে আরও ভাল জমি।

রসিস : সে জমি জলে ভেসে যাবে, তার চেয়ে পাহাড়ের উপর বসতি স্থাপনের চেষ্টা করো।

ফিলোমন : এখন চল গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করি। স্তোত্রগান গাই। সূর্যের শেষ রশ্মিও মুছে গেছে। চল নতজানু হয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রাচীন বিশ্বাসকে মুখরিত করে তুলি স্তোত্র গানে।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রশস্ত প্রমোদ উদ্যান। পাশ দিয়ে চওড়া খাল, রাস্তা চলে গেছে।

বৃদ্ধ ফাউস্ট চিন্তান্বিত অবস্থায় পায়চারি করছিল।

লিনসেউস (প্রহরী) : এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। এর পরে এই খালে প্রবেশ করবে জাহাজগুলো। সমুদ্র নাবিকরা আশীর্বাদ করবে তোমায়। (ছোট এক ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল নিচের থেকে)

ফাউস্ট : ঐ অভিশপ্ত ঘণ্টার ধ্বনি যেন আমাকে উপহাস করছে। আমার রাজ্য সামনের দিকে অনন্ত প্রসারিত। শুধু পিছনে দুষ্ট বাধার জন্য আমার

সুন্দর পরিকল্পনাটা সার্থক হতে পারছে না। বাদামী রঙের ঐ কুঁড়েটা আর ভগ্নপ্রায় গীর্জাটা আমার দখলে নেই। ঐ ঘণ্টাধ্বনি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাকে। পূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারছি না আমি। বিরক্তিকর পুরনো কাঁটার মত এই চিন্তাটা বিঁধছে আমার মনে। মনে হচ্ছে দূরে চলে যাই।

প্রহরী : একটা একতলা জাহাজ মালপত্র নিয়ে এখানে ভিড়ল। তাতে সিন্দুক, বাক্স, বস্তা কত কি রয়েছে।

মেফিস্টোফেলিস ও তিনজন শক্তিশালী লোক

কোরাস : পাল নামাও। এখানেই আমরা নামব। আমাদের মালিককে নমস্কার। (তারা নেমে মালপত্র নামাল)

মেফিস্টোফেলিস : আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছি। আমাদের প্রভু আমাদের কাজের প্রশংসা করলে আমরা খুশি হব। আমরা মাত্র দুটি জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলাম সমুদ্রে। ফিরে এসেছি বিশটা জাহাজ নিয়ে। তার সঙ্গে এনেছি প্রচুর মালপত্র। অনন্ত সমুদ্রে মানুষের মন থাকে উদার উন্মুক্ত। কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। সেখানে শক্তি মানেই অধিকার। তাই দিয়ে সহজেই সেখানে তুমি মাছ ও জাহাজ ধরতে পার। আমি মনে করি যুদ্ধ ব্যবস্থা আর জলদস্যুতা—দুটোই এক। একে অন্য থেকে আলাদা করা যায় না।

তিনজন শক্তিশালী ব্যক্তি : কোন ধন্যবাদ পেতে পারি না আমরা? তাঁর মুখে দেখছি বিরক্তির চিহ্ন। আমাদের মনে হচ্ছে রাজার ধন দেখে উনি বিরক্তি বোধ করছেন।

মেফিস্টোফেলিস : তোমরা তোমাদের অংশ ত নিয়ে গেছ। আর বেতন হিসাবে কিছু চেও না।

শক্তিশালী ব্যক্তিরা : আমরা স্ফূর্তি করার জন্য সামান্য কিছু নিয়েছিলাম। আমরা সমান অংশ দাবি করি।

মেফিস্টোফেলিস : প্রথমে মালপত্রগুলো সাজিয়ে দাও পরপর। এত ধন-রত্ন লাভ করার পর তিনি কখনই কার্পণ্য করতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রাপ্য দিয়ে দেবেন এবং ভোজও দান করবেন। কাল এস, আমিও থাকব। (তারা চলে যেতে ফাউস্টের প্রতি) মুখ ভার করে কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে বসে আছ। তোমার এই সৌভাগ্যের কথা শুনেও শুনছ না। আজ

দেখ সমুদ্রকে তোমার এই কূলে নিয়ে এসেছি। আজ তুমি হাত বাড়িয়ে বলতে পার সারা পৃথিবীটাকে তুমি হাতের মুঠোর মধ্যে ধরবে। একদিন তোমার এইখানেই যে পরিকল্পনা খাড়া করা হয়েছিল সেই পরিকল্পনা আমরা কিভাবে সার্থক করেছি তা দেখ। তোমার সেবকরা জলভাগ ও স্থলভাগ থেকে কত সম্পদ এনেছে তা দেখ।

ফাউস্ট : এখনো ঐ অভিশপ্ত ঘরটা রয়েছে ওখানে। অন্তরে কে যেন হুল ফোটাচ্ছে। সহ্য করতে পারছি না আর। একথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে আমার। চূণ সুরকীর ঐ কুঁড়েটার নিঃশ্বাস যেন ঐ ঘণ্টাধ্বনি ও সমস্ত বাতাসটাকে দূষিত করে দিচ্ছে।

মেফিস্টোফেলিস : এই ঘৃণাটা তোমার জীবনটাকে স্বাভাবিকভাবেই তিক্ত করে তুলছে। এই অভিশপ্ত ঘণ্টাধ্বনি এই সন্ধ্যার আকাশকে যেন আরও অন্ধকার করে দিয়ে বলছে জীবনটা স্বপ্নমাত্র।

ফাউস্ট : ঐ অভিশপ্ত ঘণ্টার একটানা একগুঁয়ে শব্দটা আমার পাওয়া সব ধনরত্নের উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিচ্ছে। আমি বিরক্তি অনুভব করছি।

মেফিস্টোফেলিস : এখন স্ফূর্তি করো। তুমি ত আগেই ওগুলোকে তোমার উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারতে।

ফাউস্ট : এখন তাহলে ওগুলো সরাবার ব্যবস্থা করো। তবে ঐ বৃদ্ধদের থাকার জায়গা আমি বেছে রেখেছি।

মেফিস্টোফেলিস : ওদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দান করব। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই দেখবে আবার তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে জোর দেখাতে এলে কিছুই পাবে না। (বাঁশি বাজাল এবং তিনজন শক্তিশালী লোক এল) তোমাদের প্রভু যা বলে শোন। আগামীকাল ভোজ-সভা বসবে জাহাজে।

তিনজন : আমাদের মালিক আমাদের ভাল করে অভ্যর্থনা জানাননি। আমাদের ভোজটা যেন আনন্দের হয়।

মেফিস্টোফেলিস : (দর্শকদের পানে তাকিয়ে) অতীতে যেমন হয়েছে এবারও তাই হবে।

চতুর্থ দৃশ্য

নিশীথ রাত্রি

প্রহরী লিসেউস (প্রাসাদশীর্ষে গান গাইতে গাইতে)

এই প্রাসাদশীর্ষেই আমার বাসস্থান। এখান থেকে চারদিকে দেখাই আমার কাজ। এখান থেকে সারা পৃথিবীর পানে তাকিয়ে দেখি আমি। দূরে নিকটে আকাশে মাটিতে বনে প্রান্তরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে সব কিছু দেখি। সব কিছুই সুন্দর মনে হয়। সব কিছুতেই দেখি ঈশ্বরের মহিমা। (একটু থেমে) তবে শুধু আনন্দজনক বস্তুই দেখি না। অনেক সময় অনেক বিভীষিকাময় বস্তুও দেখি। নিচের পানে তাকিয়ে অন্ধকারে কি দেখছি আমি। লিণ্ডেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বলছে। বাতাসে সে আগুন বেড়ে যাচ্ছে। ওখানে যে কুঁড়ে ঘরে বুড়ো বুড়ী থাকে সেটা পুড়ে যাচ্ছে। ওধারে গীর্জাটাও ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওদের কি উদ্ধার করা হয়েছে জ্বলন্ত ঘর থেকে? এ ধরনের বিপর্যয়ের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার থেকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলা ভাল। ভোরের লাল মেঘের মত দিগন্তটাকে আচ্ছন্ন করে আছে ঐ আগুনটা।

ফাউস্ট: উপরে কার বিলাপের ধ্বনি শুনছি? আমার প্রহরী কাঁদছে। এই হঠকারী কাজের জন্য এখন বিরক্তিবোধ করছি অন্তরে। তবে ঐ কুঁড়েগুলো উচ্ছেদ করার ফলে এবার চারদিক উন্মুক্ত হলো। আর কিছুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হবে না আমার অনন্ত প্রসারিত দৃষ্টি। ঐ বৃদ্ধ দম্পতির জন্য আমি অবশ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেব যাতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো ওরা উপভোগ করতে পারে ভালভাবে।

মেফিস্টোফেলিস ও তিনজন শক্তিশালী লোক: ক্ষমা করবে। ব্যাপারটা খুব সুখের হলো না। আমরা ওদের বদ্ধ কুঁড়েতে গিয়ে কড়া নাড়লাম। কত ডাকাডাকি করলাম। কেউ খুলল না। তখন দরজা ভেঙ্গে আমরা ঢুকলাম। বুড়ো-বুড়ী ছাড়া একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছিল। ওরা বাধা দিল। জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়ে আমাদের মারতে গিয়ে সেঅঙ্গার খড়ে পড়ায় আগুন ধরে গেল। ওরা তিনজনেই মারা গেল। ঐ আগুনের চিতায় তিনজনেই ভস্মীভূত হয়েছে।

ফাউস্ট: আমার কথা তোমরা শোননি। আমি বলেছিলাম ঘরের বদলে ওদের ঘর দেবে, দস্যুতা করবে না। বর্বরের মত আঘাত হেনেছ

ওদের উপর। এ পাপ তোমাদের বহন করতে হবে।

কোরাস: প্রাচীন প্রবাদবাক্যে বলে বলবানের কাছে যদি মাথা নত না করো তাহলে বাড়ি ঘর ও তোমার জীবন সব যাবে। (প্রস্থান)

ফাউস্ট: আকাশের তারাগুলো যেন মুখ লুকিয়েছে। ওদিকে আগুনটাও স্তিমিত হয়ে এসেছে। স্যাঁতসেঁতে হাওয়ায় মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে আগুনটা। ধোঁয়াটা এদিকে আসছে। আমার আদেশটা খুব তাড়াতাড়ি পালিত হয়েছে। কিন্তু ছায়ার মত কি একটা আসছে এদিকে?

পঞ্চম দৃশ্য

নিশীথ রাত্রি

চারজন ছায়ামূর্তির (নারী) আবির্ভাব

অভাব: আমার নাম হচ্ছে অভাব।

পাপ: আমার নাম হচ্ছে পাপ।

নিষ্ঠা: আমার নাম নিষ্ঠা।

প্রয়োজন: আমার নাম প্রয়োজন।

তিনজন একত্রে: দরজায় খিল দেওয়া রয়েছে। আমরা প্রবেশ করতে পারছি না। বাড়ির মালিক ধনী।

অভাব: আমি ছায়ায় পরিণত হয়ে যাচ্ছি।

পাপ: আমি কিন্তু ছায়া হব না।

প্রয়োজন: আমার কাছে যারা প্রশ্রয় পায় তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

নিষ্ঠা: তোমরা ঢুকতে পারবে না বা সাহস করবে না। কিন্তু দরজায় যে ছিদ্র আছে তাতে আমি ঢুকে পড়ছি। (প্রস্থান)

অভাব: তোমরা চলে যাও এখান থেকে।

পাপ: আমি তোমার পাশে পাশেই থাকব।

প্রয়োজন: প্রয়োজন তপ্ত নিঃশ্বাসে অভাবের কাছে কাছেই থাকে।

তিনজন একত্রে: ভাসমান মেঘমালায় চাঁদ ঢেকে যাচ্ছে। দূরে আমাদের পিছনে আমাদের ভাই মৃত্যু ধেয়ে আসছে।

ফাউস্ট: (প্রাসাদে) আমি চারটি ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখলাম। কিন্তু তিনজনকে যেতে দেখলাম। তারা কি বলল তা বুঝতে পারলাম না।

তবে দুটো কথা বুঝতে পারলাম, প্রয়োজন আর মৃত্যু। কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম আমি। এখনো সে ভয় থেকে মুক্ত করতে পারিনি নিজেকে। প্রাচ্যের সেই জ্ঞানী লোক অর্থাৎ ম্যাজীদের গুপ্তবিদ্যা যদি আমি শিখে নিতে পারতাম তাহলে হে প্রকৃতি আমি একা মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারতাম তোমার মাঝে। জীবনের মানে বুঝতে না পেরে জগৎকে কত অভিশাপ দিয়েছি আমি। এখন বাতাসে এত প্রেতের আনাগোনা হচ্ছে যে পরিত্রাণের পথ দেখতে পাচ্ছি না। অতীতে একদিন যখন যৌবন ছিল তখন এই রাত্রিতে কত স্বপ্নজাল রচনা করেছি। কিন্তু তারপর দুর্ভাগ্য শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে গেলাম আমি। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একা দাঁড়িয়ে আছি আমি। দরজাটা খুলে গেল, অথচ কেউ প্রবেশ করল না। বাইরে কে ?

নিষ্ঠা : আমি আছি।

ফাউস্ট : কে তুমি ?

নিষ্ঠা : আমি আছি।

ফাউস্ট : দূর হয়ে যাও।

নিষ্ঠা : আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব।

ফাউস্ট : সাবধান, কোন যাদুর কথা বলবে না।

নিষ্ঠা : একমাত্র বিপন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমার কথা শুনতে চায় না। জলে স্থলে সর্বত্রই সব সময় আমাকে পাওয়া গেলেও কেউ আমাকে চায় না। কোন মানুষ আমাকে মূর্ত দেখতে চায় না। তুমি নিষ্ঠাকে চেন না ?

ফাউস্ট : ক্ষুধা আর কামনার তাড়নায় সারা জগৎ ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। যা আমার ভাল লাগেনি আমি তা ছেড়ে দিয়েছি। একটি কামনা তৃপ্ত বা একটি ক্ষুধা নিবৃত্ত হলে আর এক কাম্যবস্তুর জন্য ছুটে চলেছি। জগতের আসল রূপটা আমার দেখা হয়ে গেছে। এই জগতের পরপারে কি আছে তা আমি দেখতে চাই না। অমরত্বের কোন প্রয়োজন নেই। এই জীবনের অর্থ ও চূড়ান্ত মূল্য এই জগতের মাঝেই খুঁজে পেতে হবে। সুখদুঃখের ফুল ও কাঁটাছড়ানো পথে নিরন্তর এগিয়ে যেতে হবে মানুষকে চির অতৃপ্ত মন নিয়ে।

নিষ্ঠা : আমি যাকে একবার ধরি সে জীবনে কোনদিন সুখ পায় না। সব পেয়েও কিছুই পায় না সে।

ফাউস্ট : থাম। তুমি আমাকে কোনদিন ধরতে পারবে না। চলে

যাও। তোমার কথা শোনার কোন প্রবৃত্তি নেই আমার। তুমি জ্ঞানী লোক-দেরও বোকা বানিয়ে দাও।

নিষ্ঠা : সে যাবে না আসবে? সে কি করবে? নিষ্ঠা ছাড়া সে কিছুই করতে পারবে না। মাঝপথে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। না শুরু, না শেষ, না বন্ধন, না মুক্তি—তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মত সে শুধু ঝিমোবে। নরকই তার একমাত্র উপযুক্ত স্থান।

ফাউস্ট : হে ছায়ামূর্তি, তুমি আমার মধ্যে যতই ভয়ের সঞ্চার করো না আমি তোমাকে স্বীকার করব না। আমি দানব বা অপদেবতাদের ভয় করলেও তোমাকে করব না।

নিষ্ঠা : এইবার আমার অভিশাপ ভোগ করো। আমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমগ্র সত্তা সমগ্র অস্তিত্ব অন্ধকার হয়ে যায়। তোমারও তাই হবে ফাউস্ট।

ফাউস্ট : রাত্রির অন্ধকার আমার চারদিকে বেশী করে ঘন হয়ে উঠছে। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রচুর আলো রয়েছে। আমার পরিকল্পনার সবটুকু সার্থক না হওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না আমি। নাও, সবাই এই মুহূর্তে যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে কাজে লেগে পড়। এ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এর জন্য সবচেয়ে ভাল পুরস্কার পাবে। এই বিরাট কাজ শেষ হলে সবাই বুঝবে একটা মন হাজারটা হাতের সমান।

প্রাসাদসংলগ্ন রাজসভা। মশাল

মেফিস্টোফেলিস : (তদারক হিসাবে) কই এদিকে এস, লিমিওর।

লিমিওর : অবিলম্বে আমরা কাজে লেগে গেছি। জায়গা মাপের ফিতেও এনেছি। কিন্তু আমাদের সাহায্য কেন চাওয়া হলো বুঝলাম না।

মেফিস্টোফেলিস : কোন কারুকার্যের প্রয়োজন নেই। আগেকার কালের মত কোন রকমে কাজটা শেষ করলেই হবে। এক বিরাট আয়ত ক্ষেত্রাকার জায়গা খুঁজতে হবে।

লিমিওর : যৌবনে কত আশা করে প্রেম করেছিলাম। কিন্তু এখন

বার্ধক্যে জর্জরিত আমি। আসতে আসতে এক কবরে পড়ে গিয়েছিলাম আমি।

ফাউস্ট: তোমাদের যন্ত্রপাতির শব্দ শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার। আমার জন্য জনগণ কঠোর পরিশ্রম করছে। উদ্ধত সমুদ্রতরঙ্গমালাকে প্রতিহত করার জন্য সমুদ্রকে শৃংখলাবদ্ধ করার জন্য কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে রাত্রির পৃথিবী। শ্রম ও সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ পৃথিবীকে নূতন রূপ দান করবে।

মেফিস্টোফেলিস: বাঁধ নির্মাণ করার জন্য তুমি আমাদের বৃথাই খাটাচ্ছ। সমুদ্রদেবতার সঙ্গে তুমি লড়াই করছ। সমুদ্রের শয়তানরা তোমাকে ঘিরে ফেলবে। তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

ফাউস্ট: তুমি একজন কর্মপরিদর্শক মাত্র।

মেফিস্টোফেলিস: হ্যাঁ আমি তাই।

ফাউস্ট: শক্তিশালী বহু লোক সংগ্রহ করো যে কোন ভাবে। পুরস্কারের লোভ দেখাও। অথবা আসতে বাধ্য করো পীড়ন দ্বারা। এই পরিখা খননের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন আমাকে খবর দেবে কতটা কাজ হলো।

মেফিস্টোফেলিস: এ কাজ শেষ হলে পরিখা হবে না, হবে তোমার কবর।

ফাউস্ট: ঐ পাহাড়টার পাদদেশে একটা বদ্ধ জলাশয় আছে। ওটা আমার এক দুশ্চিন্তার কারণ। খাল কেটে এই জলটাকে প্রবহমান করে দিতে চাই আমি। সেই জলে লক্ষ লক্ষ লোক চাষ আবাদের সুযোগ পাবে। কত জমি উর্বরতা প্রাপ্ত হয়ে সবুজ ফসলে ভরে উঠবে। চারদিকে পাহাড়ঘেরা এক সুরক্ষিত জায়গায় এক নূতন সুজলা সুফলা পৃথিবী গড়ে উঠবে। সেই ভূ-স্বর্গের পাশে অসংখ্য সমুদ্রতরঙ্গ কূল অতিক্রম করার জন্য গর্জন করবে। কিন্তু অসংখ্য মানুষের সমবেত চেষ্টায় তা পারবে না। আমি এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নিত্য নূতন বাধা জয় করার মধ্যে দিয়েই মানুষ তার সত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। এখানেই থাকবে আমার সারা জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের স্বাক্ষর আর সার্থকতা। এইখানেই অতিবাহিত হবে আমার জীবনের শেষ দিন। এক স্বাধীন চিরসমৃদ্ধ ও চিরসুন্দর দেশের উপর গড়ে উঠবে এক স্বাধীন জাতি। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার এই পার্থিব দেহ ক্ষয় হয়ে যাবে একদিন। তবু এই মুহূর্তে এক চরম সার্থকতায় সমৃদ্ধ এক পরম সুখের ভাবসমুন্নতি অনুভব করছি আমি। (ফাউস্ট পড়ে গেল মাটিতে। লিমিওর তাকে শুইয়ে দিল)

মেফিস্টোফেলিস : সুখ কোন আনন্দ বা তৃপ্তি দান করতে পারত না তার মা'কে। ক্ষণবিলীন কতকগুলো অলীক ছায়ামূর্তিকে সুখ ভেবে জড়িয়ে ধরত তাদের। এই নিঃস্ব রিক্ত মুহূর্তটাকে এক পরম প্রাপ্তি হিসাবে চিরকালের মত জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু যে কাল সব কিছু গ্রাস করে সেই অমোঘ অপরিহার্য কালগ্রাসে পতিত হয়ে মাটিতে ঢলে পড়ল ও। বন্ধ হয়ে গেল ঘড়ির কাঁটা। আমাকে ও সব সময় বাধা দিয়ে চলত।

কোরাস : বন্ধ হয়ে গেল। নেমে এল নিশীথ রাত্রির স্তব্ধতা।

মেফিস্টোফেলিস : এখন সব শেষ।

কোরাস : সব কিছুর শেষ হয়ে গেল।

মেফিস্টোফেলিস : কিন্তু কেন? যা কিছু আমরা সৃষ্টি করি তা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এ সৃষ্টির মূল্য কোথায়? 'শেষ হয়ে গেল' কথাটা এমনভাবে বললে যাতে মনে হলো কোনদিন ছিল না এর আগে। তা ত নয়। সত্তার একটা চিরন্তন অবিনশ্বর অংশ থেকে যায় মৃত্যু বা সর্বগ্রাসী কাল যাকে শূন্যতায় পর্যবসিত করতে পারে না।

সমাধি

লিমিওর ও কোরাস : হে হতভাগ্য অতিথি, এই ঘরটা খোন্তা কোদাল দিয়ে কোনরকমে তৈরি করা হয়েছে তোমার জন্য।

মেফিস্টোফেলিস : দেহটা ওর এখন শায়িত, আত্মাটা উড়ে গেছে। আমি ভালভাবে লক্ষ্য রেখে চলেছি ওর আত্মা এখনও ওর দেহরূপ আবাস ছেড়ে চলে যায়নি। মৃত্যু এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি এ দেহে। (অদ্ভুত মন্ত্র পাঠ করতে করতে) এস, এস হে নারকীয় জীবরা। এস তোমাদের উন্মুক্ত করাল মুখগহ্বর প্রসারিত করে। হ্যাঁ ঠিক আছে। নরকের দ্বার উন্মুক্ত দেখছি আর সেই দ্বারপথে দেখছি প্রজ্জ্বলিত নারকীয় অগ্নির শিখা। পাপীর আত্মা পসীডনের ভয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে তোমাদের চোখে ধূলো দিয়ে। কিন্তু তাকে ধরে ফেলবে। (স্থূলদেহী শয়তানদের প্রতি) আত্মার পাখা আছে। সেই পাখাগুলোকে আগে ছিঁড়ে দাও। তাহলেই সে আত্মা পরিণত হবে অসহায় অন্ধ পোকায়। তোমরা তোমাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করো, দেখ আত্মাটা যেন পালিয়ে না যায়। (কৃশকায় শয়তানদের প্রতি) নির্বাপিতদীপ জীবনের অন্ধকার পিঞ্জরে ওর আত্মাটা বিষণ্ণ হয়ে এখনো বসে আছে। পালিয়ে গেলেই তোমাদের তীক্ষ্ণ

চক্ষু দিয়ে সেটাকে ধরে ফেলবে।

দেবদূত : চলে এস আমাদের সঙ্গে। তোমার পাপ ক্ষমা করে দেব।

মেফিস্টোফেলিস : কিসের গোলমাল শুনছি। ওই শুভ্রোজ্জ্বল দেবদূত-গুলোই আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। ওরা জানে মানুষের ধ্বংসে ও নরকপ্রাপ্তিতে আমরা আনন্দ পাই। আমরা তাই চাই। ওই সব ভণ্ডের দল এসে আমাদের সামনে আমাদের শিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এবার কিন্তু তোমরা সজাগ থাক শয়তানের দল। তোমরা কবরে ছুটে যাও। এবার এ শিকার হাতছাড়া হয়ে গেলে লজ্জার পরিসীমা থাকবে না। আসলে ঐ দেবদূতগুলোও ছদ্মবেশী শয়তান। আমাদের প্রতারিত করে শুধু।

দেবদূতদের কোরাস : হে গোলাপ, ধীরে ধীরে কুসুমিত হয়ে ওঠ। বায়ু-বিকম্পিত পাপড়ি দিয়ে মধুর গন্ধ ছড়াও। নবজীবনের বসন্ত তোমাদের ডাকছে। স্নিগ্ধ নিদ্রায় অভিভূত ওই আত্মাকে স্বর্গে বহন করে নিয়ে যাব আমরা।

মেফিস্টোফেলিস : (শয়তানদের) তোমরা বিচলিত হচ্ছ কেন? ওরা ভেবেছে বরফ ছড়িয়ে শয়তানদের তপ্ত উত্তাপ শীতল করে দেবে। তোমাদের জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে ওদের সব গোলাপ শুকিয়ে যাবে। একি! তোমাদের সব শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সাহস শেষ হয়ে যাচ্ছে!

দেবদূতরা : কৃতজ্ঞতা, দয়া, মায়া, প্রেম, সত্য সর্বত্র দেবদূতদের জন্য বাতাসকে মুক্ত রাখে, দিবালোককে উজ্জ্বল করে রাখে।

মেফিস্টোফেলিস : ওঃ কী লজ্জার কথা। সব শয়তানগুলো ডিগবাজি খেতে খেতে নরকে পালিয়ে গেল। যাক। আমি একা এখানে থাকব। শুকিয়ে দেব, ব্যর্থ করে দেব ওদের নবজীবনের সব গোলাপগুলোকে। চলে যাও হে গোলাপ, তোমরা মিথ্যা মায়া, তোমাদের সৌন্দর্য দেখতে উজ্জ্বল মনে হলেও হাতে ধরার সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিত ও ম্লান হয়ে ওঠ। তবে কেন তোমাদের তোষামোদ করব? আলকাতরা আর গন্ধকের মত আমার ঘাড়ে এসে পড়ছে চুলগুলো।

দেবদূতরা : কেন এমন করছ? অন্তরে তোমার দুঃখ কিসের? ভালকে ভালবাস। অন্ধকার হতে আলোর পথে এগিয়ে যাও।

মেফিস্টোফেলিস : নরকাগ্নির থেকে তীক্ষ্ণতর এক অগ্নিশিখায় দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। আমার মাথাটা কেন ঘুরছে? একদিন তাদের সঙ্গে

শত্রুতা করেছি, তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে আমার নাসিকা। কিন্তু এখন কোন শক্তির বশবর্তী হয়ে তাদের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠছি আমি। তাদের অভিশাপ দেওয়ার সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। অথচ মনে হচ্ছে তাদের এই ছলনায় আমি প্রতারিত হলে আমার মত নির্বোধ পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। এখন কত ভাল কত মনোমুগ্ধকর মনে হচ্ছে তাদের। এস, কাছে এস হে সৌন্দর্যের সন্তানগণ, বল, তোমরা কি লুসিফারের বংশধর নও? তোমরা এত সুন্দর যে তোমাদের চুম্বন করতে ইচ্ছা করছে। তোমাদের পানে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মত সুচতুর কামনারা চুপিসারে প্রবেশ করছে আমার প্রতিটি শিরায়। শিহরণ জাগাচ্ছে দেহে। তবু কাছে এস, একবার দেখি তোমাদের।

দেবদূতরা: আমরা এসেছি। অস্বস্তিতে কুঁচকে উঠছ কেন?

(কাছে এল)

মেফিস্টোফেলিস: দেবদূত হলেও তোমরা অভিশপ্ত। তোমরা নর-নারীকে মোহমুগ্ধ করে ভুল পথে নিয়ে যাও। একেই বলে ভালবাসা? তোমাদের সংস্পর্শে আমি অনুভব করি এক অসহ্য অগ্নির দীপ্তিহীন প্রদাহ। তবু তোমরা একবার হাস। সেই হাসি দেখে আমিও অনুভব করব এক গভীর আনন্দের আবেগ। তোমার দেহ সুসজ্জিত। তোমাদের দেহ উলঙ্গ থাকতে পারত।

দেবদূতরা: সত্যই সব অভিশাপ দূর করে, প্রেমের আলোই সব কিছুকে পরিস্কার করে তোলে। আত্মশুদ্ধির পর বুকে তাদের টেনে নাও।

মেফিস্টোফেলিস: একি হলো? আমার সারা গায়ে ফোড়া হচ্ছে কেন? আমার সত্তার শয়তানী অংশটা চলে গেছে। প্রেমের আক্রমণে আমার গা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তবু আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমাদের।

দেবদূতরা: জ্যোতির্ময় গৌরবের আলোয় তুমিও গৌরবান্বিত হও। তুমিও তোমার লক্ষ্যে উপনীত হও। এই বিশুদ্ধ বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নাও।

(তারা ফাউস্টের অমর আত্মাটা নিয়ে গেল)

মেফিস্টোফেলিস: যে আত্মাটা আমার লক্ষ্যবস্তু ছিল ওরা তা নিয়ে গেল। আমাকে বোকা বানিয়ে আমার প্রাপ্য কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল স্বর্গে। কার কাছে আমি ন্যায়বিচারের দাবি জানাব? আমার কষ্টার্জিত অধিকার কে আমায় ফিরিয়ে দেবে? এই নারকীয় ঘৃণা ও অপমান আমার প্রাপ্য। আমি

অন্যায় করেছি। হীন কামনার দাস হয়ে আমি শয়তানের মত কুপথে গিয়েছি। কিন্তু কি পেলাম তাতে ?

সপ্তম দৃশ্য

গিরিগুহা ও বনভূমি

দেবদূতদের কোরাস : চারদিকে পাহাড় আর বন। ওদিকে একের পর এক সমুদ্রতরঙ্গ আঘাত হানছে। কিন্তু আমরা যেখানেই যাই সেখানেই প্রেমের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

পেটার এসটেটিকাস : অসংখ্য অগ্নিশলাকা আমায় বিদ্ধ করছে। যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে পার্থিব জীবনের যত সব মিথ্যা আর মায়া।

পেটার প্রোকাণ্ডিস : আমার চারদিকে গভীর শূন্য খাদ। তাদের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের অনন্ত শক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে উঠছে আমার অন্তরাত্মা। হে ঈশ্বর, আমার অন্তরকে আলোকিত করো।

পেটার সেপারিটিকাস : যেন এক মেঘমালা পাইন গাছগুলোকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

স্বর্গীয় বালকদলের কোরাস : হে ঈশ্বর বল, আমরা কে, কোথায় আছি ? আমরা যে সুখে বাস করছি সে সুখ যেন সকলেই পায়।

পেটার সেপারিটিকাস : হে বালকদল, তোমাদের পিতামাতারা তোমাদের অকালে হারালে দেবদূতরা তোমাদের নিয়ে আসে। এস আমার কাছে। এখানকার এই মনোহর দৃশ্য দেখ। গাছগুলোর তলা দিয়ে কেমন এক সুন্দর নদী বয়ে যাচ্ছে।

বালকদল : কিন্তু এ দৃশ্য অন্ধকার ও অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে আমাদের। হে পরম পিতা, এখান থেকে নিয়ে চল আমাদের।

পেটার সেপারিটিকাস : আরও উপরে ওঠ। যত ঈশ্বরের কাছে যাবে ততই অনন্ত শান্তি অনুভব করবে। দেখতে পাবে পরম প্রেমের আলো।

বালকদলের কোরাস : (সর্বোচ্চ শিখরে উঠে) হাত ধরাধরি করে গান করো সকলে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে। এক পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে আমাদের অন্তর।

দেবদূতরা : (ফাউস্টের অমর আত্মাকে নিয়ে এসে) হে মহান আত্মা,

এখন তুমি চিরমুক্ত। আর কোন পাপপ্রবৃত্তি আচ্ছন্ন করতে পারবে না তোমায়। যারা অক্লান্তভাবে উন্নতি চায় উর্ধ্বগতি চায় তারা কখনো ব্যর্থ হয় না। তারা একদিন অবশ্যই পায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

কোরাস মিস্টিকাস: এই বিশ্বের প্রতিটি ক্ষণভঙ্গুর বস্তু প্রতীক হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অপূর্ণতার জন্য অসংখ্য ঘটনা ঘটে সেখানে। হে দেবদূতের আত্মারা, আমাদের বিশ্বাতীত উর্ধ্বলোকে নিয়ে চল।

তরুণ দেবদূতগণ: গোলাপরাই আমাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আমাদের জয়লাভে সহায়তা করে। আমরা ফাউস্টের মহান আত্মাটাকে লাভ করি। শয়তান ও অশুভ শক্তিগুলো পালিয়ে যায়। এমন কি শয়তানদের গুরুটাও পালায়। সেও প্রেমের বেদনা অনুভব করে। এখন আমাদের কাজ শেষ। আনন্দ করার সময় এখন।

বয়স্ক দেবদূতগণ: মানুষের মন কোন বস্তু একবার লাভ করলে তা ছাড়তে পারে না। কেউ ছাড়াতে পারে না। একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরপ্রেম সে মনকে মুক্ত করতে পারে সব আসক্তি থেকে।

তরুণ দেবদূতগণ: অনেক উঁচুতে মেঘ আর কুয়াশার মত পার্থিব দুঃখ বিষাদ থেকে মুক্ত একদল স্বর্গীয় বালক আসছে। তারাই স্বর্গীয় বসন্তের সব সুষমাটুকু উপভোগ করে। তারা ফাউস্টের আত্মাকে নিয়ে যাক।

স্বর্গীয় বালকদল: হ্যাঁ, আমরা বরণ করে নিচ্ছি তাকে। তার থেকে পার্থিব সত্তাটা খসে গেছে। এখন সে দিব্যজীবন লাভ করেছে।

ডাক্তার মিরিয়ানাম: আমার মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি একদল নারীমূর্তি উর্ধে উড়ে যাচ্ছে আর তাদের রাণী হলেন স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁকে আমি চিনি। (আবেগের সঙ্গে) হে জগদীশ্বরী, আমাকে স্বর্গলোকে নিয়ে চল। সুমতি ও সুচিন্তা দাও আমার মনে। যাতে তোমার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি তার জন্য সাহসের সঙ্গে তোমার সব আদেশ পালন করে চলি। হে জগন্মাতা, সর্বদেববন্দিতা, তোমার চারদিকে লঘু মেঘমালা ভেসে যাচ্ছে। অনুতপ্ত নারীদের আত্মা নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে তোমার কাছে। তোমার প্রতি বিশ্বাস যাদের অগাধ তারা তোমার কৃপালাভ করে। কিন্তু মন যাদের হিংসায় ভরা তাদের ক্ষমা করা কঠিন। তাঁকে কেউ কখনো প্রতারিত করতে পারে না কোনভাবে।

অনুতাপগ্রস্ত নারীদের কোরাস: হে দয়াবতী কৃপাময়ী দেবী, স্বর্গরাজ্যে

ফিরে যাবার পথে আমাদের আকুল আবেদনে সাড়া দাও।

ম্যাগনা পেকাট্রিক্স : হে দেবী, স্বর্গের অধীশ্বরী, তোমার পুত্রের দেবোপম মূর্তির কাছে নতজানু হয়ে চোখের জলে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের নরম কেশরাশির দ্বারা পা ধুইয়ে দেব তাঁর।

মুলিয়ের সামারিতানা : যে কূপের পাশে আব্রাহাম একদিন মেষ চরাত, যে পাত্র একদিন আমাদের ত্রাণকর্তার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছিল, পুণ্যতোয়া যে প্রস্রবণের পবিত্র জলরাশির দ্বারা ধরিত্রী সুজলা সুফলা হয় আমরা তার নামে শপথ করছি।

মেরিয়া এজিপটিয়াকা : যে স্থানে ঈশ্বরের অক্ষয় অমর দেহটি স্নাত হয়, ঈশ্বরের যে স্থূল দেহ একদিন আমাকে দ্বারপথ হতে ফিরিয়ে দেয়, জনহীন পরিত্যক্ত দেশে চব্বিশ বছর ধরে যে অনুতাপ আমি ভোগ করে আসছি, শেষ বিদায়ের যে বাণী আমি সেখানে বালুকারাশির উপর লিখে আসি—সেই সব কিছুর নামে শপথ করছি আমরা।

তিনজন একসঙ্গে : হে দেবী ক্ষমা করো। আমরা পাপাত্মা হলেও অনুতপ্তা, তোমার মহান উপস্থিতি হতে আমাদের বিমুখ করো না। আমরা না বুঝে যে ভুল যে পাপ করে ফেলেছি তা ক্ষমা করো। আমাদের আশীর্বাদ করো।

উনা পেনিটেনটাম : (পূর্বে মার্গারেট নামে অভিহিত) হে দয়াবতী, তোমার চিরনির্মল হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ করে আমাকে পরম সুখের প্রতিশ্রুতি দান করো। তোমার কৃপায় যেন আমার প্রেমাস্পদ তার পাপ স্খালন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে স্বর্গালোকে এসে মিলিত হয়।

স্বর্গীয় বালকরা : আমাদের জীবন পরিণতি লাভ না করতেই আমরা জীবন হারাই তবু ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, তিনিই আমাদের যাবতীয় শিক্ষা দান করেন। তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে বাড়িয়ে দেয়।

মার্গারেট : (ফাউস্টকে দেখে) এখানে স্তোত্রগান শুনে সে ধীরে ধীরে নবজন্ম লাভ করছে। তার পার্থিব সত্তা অপগত হচ্ছে। অনন্ত যৌবনশক্তি ফিরে পাচ্ছে সে। স্বর্গীয় দিব্যজীবন লাভ করার আগে তাকে কি কি করতে হবে তা শিখিয়ে দেব আমি।

মেটার গ্লোরিওসা : ওকে আরও ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যাও পথ দেখিয়ে। ও

তোমার কথা শুনবে। তোমার মনের কথা বুঝবে।

ডাক্তার মেরিয়ানাস: হে অনুতাপিনীর দল, মুখ তুলে তাকাও। উনি ওঁর মুখমণ্ডল হতে এক স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে তোমাদের মুক্তি দান করছেন। তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হয়ে নবজন্ম লাভ করো। আমাদের সকলের আত্মা আমাদের কুমারী মাতা স্বর্গলোকের অধীশ্বরী মেরীর প্রতি উৎসর্গীকৃত হোক।

উইলেম মেস্তার

নাটকটা ভাঙ্গতে দেরী হচ্ছিল। সাজঘরের জানালা দিয়ে মঞ্চের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল বারবারা। আজ তার মালিক সুন্দরী মেরিয়ানা এক ছোকরা অফিসারের অভিনয় করে প্রচুর আনন্দ দান করেছে দর্শকদের। কিন্তু মেরিয়ানার জন্য বারবারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে অন্য কারণে। মেরিয়ানার গুণে মুগ্ধ ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র নর্বার্গ একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে ডাকে।

প্যাকেটটা খুলে দেখেছে বারবারা। মেরিয়ানার পুরনো পরিচারিকা হিসেবে এ অধিকার তার আছে। দেখেছে তাতে আছে মসলিনের কাপড়, ক্যালিবোর ছিট আর কিছু ভাল নূতন ধরনের ফিতে আর কিছু টাকা। নর্বার্গকে নিয়ে চিন্তার অন্ত নেই বারবাবার। কি করে মেরিয়ানার চোখে নর্বার্গকে ভাল লাগানো যায়, কি করে তার মনে নর্বার্গের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জাগানো যায় এই চিন্তায় সব সময় কাতর সে।

খৃস্টোৎসবের উপহারের মত নর্বার্গের সব উপহার টেবিলের উপর থরে থরে সাজিয়ে রাখল বারবারা। তারপর উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল মেরিয়ানার পদধ্বনির। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড সে একবার ফিরেও তাকাল না এই সব উপহারের পানে। মেরিয়ানা ঘরে ঢুকে আপনার মনে চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। কোন দিকে তাকাল না। বারবারার দিকেও না। বারবারা একবার জিজ্ঞাসা করল, কি হলো বাছা তোমার? শরীর খারাপ করেনি ত? একবার চেয়ে দেখ, নর্বার্গ কি পাঠিয়েছে। এতে তোমার ভাল নাইটগাউন হবে।

মেরিয়ানা বলল, নর্বার্গ যখন আসবে তখন তোমরা যা বলবে করব। কিন্তু এখন আমাকে জ্বালিও না। এখন আমি শুধু একমাত্র তাকে ভালবাসি, সে আমাকে ভালবাসে।

প্রতিবাদে ফেটে পড়তে চাইছিল বারবারা। কিন্তু মেরিয়ানা আদরের ভঙ্গিতে তার বুকটা জড়িয়ে ধরতেই হেসে ফেলল ফোকলা দাঁতে। বলল, এখন পুরুষের পোষাকটা ছেড়ে ফেল ত বাছা। ও পোষাকে তোমাকে মোটেই মানায় না।

এই বলে বারবারা মেরিয়ানার গায়ে হাত রাখতেই হাতটা সরিয়ে দিল মেরিয়ানা। বলল, এখন নয়, এখন আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি।

বারবারা বলল, কেউ আসবে? ছোকরা মেস্তার? সেই ব্যবসায়ীর বকাটে নিঃস্ব ছেলেটা? উদারতার একটা আবেগ পেয়ে বসেছে তোমায়। যত সব নিঃস্ব অপদার্থ ছোঁড়াদের সঙ্গে তোমার কারবার বেশী। অবশ্য পরের উপকার করে নাম কেনার মধ্যে একটা মোহ আছে।

সেকথায় কান না দিয়ে মেরিয়ানা বলল, আমি তাকে ভালবাসি। দারুণ ভালবাসি। আমি যদি তার গলাটা এই মুহূর্তে জড়িয়ে ধরতে পারতাম! আমি যদি তাকে সারাজীবন জড়িয়ে ধরে রেখে দিতে পারতাম!

বারবারা শান্তভাবে বলল, সংযত করো নিজেকে। একপক্ষকালের মধ্যে নর্বার্গ এসে পড়বে। তার আগে আজ একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে সে।

একপক্ষকাল অনেক দেরী। তার আগে অনেক কিছু ঘটতে পারে।

এমন সময় উইলেম মেস্তার মেরিয়ানার ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে বারবারা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে অন্তরে চাপা বিক্ষোভ নিয়ে।

পরের দিন সকালে মার সঙ্গে দেখা হতে উইলেমকে তার মা বলল, তার এত ঘনঘন থিয়েটারে যাওয়ার জন্য তার বাবা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছেন তার উপর। অবশ্য আমি নিজেও মাঝে মাঝে যাই। তবু আমি থিয়েটারের ব্যাপারটাকে ঘৃণা করি। এতে আমাদের গৃহকোণের শান্তি অনেকখানি নষ্ট হচ্ছে।

উইলেম বলল, বাবা আমাকে একথা অনেক আগেই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ মা, যে কাজ সঙ্গে সঙ্গে টাকা পয়সা এনে দেয় সে কাজ ছাড়া জীবনে কি কিছুই করার নেই আমাদের? অপ্রয়োজনীয় কোন বস্তুতে যদি কোন আনন্দ না থাকে তাহলে বাবা কেন এই নতুন বাড়িটা করে ঘরগুলো এমন করে সাজিয়েছেন? আমাদের পুরনো বাড়িটাতে ত বেশ চলে যাচ্ছিল। প্রতি বছর বাবা কি তাঁর ঘরগুলো অলঙ্করণের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করেন না? এসবও থিয়েটারে যাওয়ার মত অপ্রয়োজনীয়। তার থেকে থিয়েটারে দেখবে একই সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার উপকরণ অনেক পাওয়া যায়।

মা বললেন, থিয়েটারে যাও ক্ষতি নেই, তবে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবা মনে করেন এতে তোমার মনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর তার জন্য দোষ পেতে হচ্ছে আমাকে। আজ হতে বারো বছর আগে যখন একবার আমি তোমাকে পুতুলনাচ দেখাই তখন তার জন্য আমাকে অনেক কথা

শুনতে হয়।

উইলেম তাড়াতাড়ি বলল, বেচারা পুতুলগুলোকে দোষ দিও না মা। ফাঁকা ফাঁকা বাড়িটার মধ্যে সেই পুতুলনাচ দেখে তখন প্রচুর আনন্দ পাই আমি। গোলিয়াথ নামে একটা বিরাট রাক্ষস সারা রাজ্যটাকে জ্বালিয়ে খাচ্ছিল। তখন ডেভিড এসে রাজাকে বলল, সে যুদ্ধ করে হারাবে রাক্ষসকে। এর পরেই যবনিকা পতন হলো। আমাদের কৌতূহল আর ধরে না। পরে যখন এই ডেভিড রাক্ষসটাকে মেরে তার মাথাটা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল আর তার মাংসগুলো মাঠে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি আমরা। তার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ সুন্দরী রাজকন্যাকে লাভ করে ডেভিড। তবে তার চেহারাটা খুবই বেঁটে দেখে একটু হতাশ হয়েছিলাম আমি।

মা বললেন, আমি জানি, এটা তোমার মনে একেবারে গেঁথে গিয়েছিল। পরে তুমি কতবার মোম দিয়ে ডেভিড আর গোলিয়াথের মূর্তি বানিয়ে আলপিন ফুটিয়ে গোলিয়াথকে মারতে। তবে তার জন্য আমাকে অশান্তি ভোগ করতে হয়।

উইলেম বলল, এর জন্য অনুশোচনা করো না মা। এই পুতুলনাচের কথা ভাবতেও আমার ভাল লাগে। এই কথা বলেই চাবি এনে আলমারি খুলে কাপড়ের পুতুলগুলোকে বার করল উইলেম। তার মনটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল সেই সুদূর শৈশবে, অনাবিল সুখশান্তি আর সৌন্দর্যে ভরা এক কল্পলোকে।

স্বভাবতঃ বড় কল্পনাপ্রবণ উইলেম। কোন বস্তুকে তার ভাল লাগলেই কল্পনার রং রস দিয়ে তাকে আরো বেশী সুন্দর করে তুলত মনে মনে। প্রথম আলাপেই ভালবেসে ফেলে সে থিয়েটারের পেশাদার অভিনেত্রী মেরিয়ানাকে। তার স্বাভাবিক নাট্যপ্রীতি নৈশ রঙ্গশালার উজ্জ্বলতা ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিলে মিশে এই ভালবাসাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য এর সঙ্গে তার প্রতি মেরিয়ানার আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ আর আগ্রহের নিবিড়তাও একটা মিষ্টি গভীরতা এনে দেয় তার ভালবাসার মধ্যে। মেরিয়ানা সত্যিই তাকে যেন একটু বেশী খাতির ও আদরযত্ন করত। উইলেমের ভালবাসার প্রতিদান একটু বেশী করেই দিত মেরিয়ানা। তাকে কাছে পেলে ছাড়তে চাইত না, অধীর আগ্রহে তার জন্য প্রতীক্ষা করত। তবে উইলেম হয়ত লক্ষ্য করেনি মেরিয়ানার চিন্তায় ও আচরণে একটা গভীর উদ্বেগ উঁকি মারত মাঝে মাঝে। প্রায়ই ভয় হত মেরিয়ানার তার প্রকৃত অবস্থার কথাটা হয়ত একদিন জেনে

ফেলবে উইলেম।

পূর্বরাগের উচ্ছ্বাসটা উইলেমের মনে কিছুটা থিতিয়ে গেল ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখল সে। কিন্তু তাতে তার ইচ্ছাটা হয়ে উঠল আরও তীব্র আর সঙ্কল্পটা হয়ে উঠল আরও অটল। মেরিয়ানার কাছে নিয়মিত যাবার এক পরিকল্পনাও খাড়া করল উইলেম। ঠিক করল সারাদিন কাজকর্ম সারার পর সন্ধ্যার পর বাড়িতে খাওয়ার টেবিলে যথারীতি উপস্থিত থাকবে। বাড়ির সকলের সঙ্গে বসে খাবে। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে খামারবাড়ি দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে যাবে রাতে। সোজা চলে যাবে মেরিয়ানার কাছে।

একদিন মেরিয়ানার বাসায় কতকগুলো পুতুল নিয়ে গেল উইলেম। প্রথমে পুতুলগুলোকে নিয়ে নিজেই খেলা করতে লাগল মেরিয়ানা। তাদের প্রেমের কথা শেখাতে লাগল। পরে তার আদর গিয়ে পড়ল পুতুলের মালিকের উপর। এমন সময় রাস্তায় গোলমালের শব্দ শোনা গেল। বারবারা বলল, একদল লোক হোটেল থেকে বেরিয়ে মদের নেশায় মাতলামি করছে।

মদের কথা শুনে উইলেম কিছু পয়সা দিয়ে বারবারাকে বলল, আ জন্যও কিছু মদ নিয়ে এস। আমাদের সঙ্গে তুমিও খাবে।

খাবার সময় বারবারা পুতুলনাচের কথাটা তুলল উইলেমের কাছে। উইলেম তার সেই ছোটবেলাকার পুতুলনাচের কথাটা নূতন করে শোনাতে লাগল। সেইসঙ্গে তার বাবার অনুশাসনের কথাটাও বলল। বলল, বাবা এসব মোটেই পছন্দ করতেন না। একবার পুতুলনাচের একটা অনুষ্ঠানের সময় বাবা সব পুতুল-গুলো কেড়ে নেন। আমি মাকে তা বলায় মা চেষ্টা করেও বাবার মন ঘোরাতে পারেননি। বেশী আনন্দ বা ফূর্তি ভাল নয়। সব আনন্দানুষ্ঠানই ভাল নয়। ছেলেরা ত দূরের কথা ভাল মন্দ জ্ঞান বুড়োদেরও নেই।

আমাদের নূতন বাড়িটা হবার সময় একজন এঞ্জিনীয়ার বাবাকে বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁর সঙ্গে বাবার বন্ধুত্বও ছিল। তিনি একবার জোর করে আমাদের বাড়ির ছাদে একটা পুতুলনাচের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাবা মত দিতে বাধ্য হন। পাড়ার ছেলেদের সব নিমন্ত্রণ করা হয়। অনেক দিন পর আবার পুতুলনাচ দেখলাম। পুতুলনাচ দেখতে আমার বড় ভাল লাগত। যদিও আড়াল থেকে মানুষেরা পুতুলগুলোকে নাড়ত, নিজেরাই কথা বলত, তবু অনুষ্ঠান আরম্ভ হলে আমার মনে হত পুতুলগুলো সব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরা নিজেরা চলাফেরা ও অঙ্গভঙ্গি করে অভিনয় করছে, কথা বলছে,

হাসছে, কাঁদছে মানুষদের মত। সে এক বিপুল আনন্দমেশানো বিস্ময়। যে বিস্ময়ে শিহরণ লেগেছিল আমার সর্বাঙ্গে।

এইভাবে একে একে মেরিয়ানাকে ছেলেবেলাকার প্রধান প্রধান সব ঘটনা, সব ভাল লাগা মন্দ লাগার কথা একের পর এক করে বোঝাতে লাগল উইলেম। শোনাতে শোনাতে রাত বাড়তে লাগল। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে এল মেরিয়ানার। তবু সেদিকে কোন খেয়াল নেই উইলেমের। শুনতে শুনতে ঘুমভিজে চোখে মেরিয়ানা যখন তার উপর ঢলে পড়ল তখন শুধু তাকে আরো টেনে নিল বুকের কাছে।

তার পুতুলনাচের প্রতি আগ্রহ ও নাট্যপ্রীতির কথা বলতে গিয়ে নাট্যতত্বের মধ্যে চলে গেল উইলেম। বলল, ট্রাজেডী আমাদের ভাল লাগত না। ট্রাজেডীর থেকে ভাল কমেডী লেখা অনেক কঠিন। কিন্তু হে আমার প্রিয়তমা, কোন নাটক, কোন কবিতা যত ভালই হোক না কেন, আমাকে সেই সৌন্দর্যের জগতে নিয়ে যেতে পারবে না। কোন কবিতার যাদু নয়, তোমার এই নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে যে উত্তপ্ত প্রাণস্পন্দন অনুভব করছি সেই প্রাণস্পন্দনই আমাকে নিয়ে যাবে মায়াময় এক চিরসৌন্দর্যের রাজ্যে।

এই বলে মেরিয়ানাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরল উইলেম। তার বাহুর চাপ আর কণ্ঠস্বরের আবেগসিক্ত তীব্রতায় জেগে উঠল মেরিয়ানা, জেগে উঠেই নিজের ভুল বুঝতে পারল সে। আর তা সংশোধনের জন্য আদর করতে লাগল উইলেমকে।

এইভাবে মেরিয়ানার নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে রাতের পর রাত কেটে যেতে লাগল উইলেমের। মেরিয়ানাকে যখন প্রথম পায় উইলেম তখন পাওয়ার আনন্দের সঙ্গে আশঙ্কা ছিল। অন্তত সংশয় আর আশঙ্কা ছিল। মনে হত হয়ত বা এ মিলন স্থায়ী হবে না। কিন্তু এইভাবে দিনের পর দিন নির্বিঘ্নে কেটে যাওয়ায় মনে সাহস বেড়েছে উইলেমের। মেরিয়ানার প্রতি তার যে ভালবাসার ধারণাটা ভাসা ভাসা ছিল, আশা আকাঙ্খার আলো-ছায়ায় চঞ্চলভাবে কাঁপত অনুক্ষণ আজ তা বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

উইলেমকে পেয়ে মেরিয়ানাও খুবই সুখী। উইলেমকে কাছে পেলে ছাড়তে মন চায় না তাকে। সে যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ কখনো তার বাহুলগ্ন হয়ে কখনো বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে কখনো তার গলা জড়িয়ে কোমলভাবে

কাটিয়ে দেয় সময়টা। কিন্তু উইলেমের মত মেরিয়ানার এই সুখ, মিলনের এই আনন্দ অনাবিল নয়। উইলেম তার কাছ থেকে চলে গেলেই তীব্র অনুশোচনা জাগে মনে। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে থাকে। ভাবে সে প্রতারণা করছে উইলেমের সঙ্গে আর উইলেমের ভালবাসা পাওয়া মানেই প্রতারণার কাজে সফল হওয়া। এমন কি উইলেম যখন কাছে থাকে তখনও বুকে মুখ গুঁজে থেকে বা তার বাহুলগ্ন হয়েও এই আত্মধিক্কার, অনুশোচনার দংশন হতে রক্ষা পায় না মেরিয়ানা। সে যখনই নিজের অন্তরের পানে তাকিয়ে দেখে তখনই মনে হয় সেটা যেন একফালি শূন্য পতিত জমি। সেখানে দেবার মত কিছুই নেই তার। মনে হয় একথা যখনি জানতে পারবে উইলেম তখনি সে ছেড়ে চলে যাবে তাকে। কিন্তু এই সংশয় আর শঙ্কার দুঃখ যতই প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যে ততই সে আরও নিবিড়ভাবে সমস্ত অন্তর দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চায় উইলেমকে। তার ভালবাসার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায় নিজেকে।

সেদিন তার নিজের ঘরে কিছু বই ও কাগজপত্র ঘাঁটছিল, এমন সময় তার বন্ধু ওয়ার্ণার এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলল, আবার ঐসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ? তুমি ত শুধু একটা কিছু লিখতে শুরু করবে, তার কিছু পরেই সেটা ফেলে রাখবে। কোন একটা লেখা বা কাজ তুমি কখনো একেবারে শেষ করো না। এটা তোমার বড় দোষ।

উইলেম বলল, পরীক্ষা নীরিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ কোন কাজে সফলতা লাভ করে, পূর্ণতা লাভ করে।

এই বলে উইলেম একটা নাটক বার করে দিল তার কাগজের স্তূপ থেকে। ওয়ার্ণার সেটা দেখেই বলল, ওটা ফেলে দাও, আগুনে পুড়িয়ে দাও। ও লেখাটা আমার বা তোমার বাবার কারোরই ভাল লাগেনি। লেখার ছন্দটা ভাল হয়েছে, কিন্তু আসলে বক্তব্যটা বাজে। এতে তুমি যে আদর্শ ব্যবসায়ীর চরিত্র এঁকেছ তা একেবারে অচল।

উইলেম ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, তোমাদের মত ব্যবসাদারেরা শুধু জীবনের পথটাকেই বড় করে দেখে, কিন্তু জীবনেব চূড়ান্ত অর্থের কথাটা তলিয়ে দেখে না।

ওয়ার্ণার বলল, আমার মনে হয় তুমিও আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কাজ-কর্ম ও ভাবধারার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নও। যদি হতে তাহলে বুঝতে ব্যবসাগত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের কত বড় বড় গুণ ও অন্তরবৃত্তি

বিকাশলাভ করে।

উইলেম বলল, অবশ্য আমি যে দেশভ্রমণ করতে চলেছি তাতে আরো কিছু শিক্ষা হবে আমার। আরো অনেক কিছু দেখতে পাব। বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ওয়ার্ণার বলল, নিশ্চয়। তুমি যে কোন দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বাজারে গিয়ে দেখবে ব্যবসায়ীরা আসলে কি চায়। নদী, সমুদ্র, আকাশ, মাটির বেশীর ভাগই ত পৃথিবীর রাজা রাজড়ারা অধিকার করে রেখে দিয়েছে। আমরা ব্যবসায়ীরা কিছু পণ্যদ্রব্য নিয়ে কেনাবেচা করে জীবনধারণের কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে চাই। পণ্যদ্রব্যের ক্রমাগত হাত বদল [illegible] আর তার মধ্য দিয়েই ব্যবসায়ীরা কিছু লাভ করছে। তুমি কোন শহরে গিয়ে দেখবে সব মানুষই কিছু না কিছু করছে। অসংখ্য কর্মব্যস্ত মানুষ নিরন্তর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যাচ্ছে। প্রত্যেকেরই একটা করে উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে। কর্মব্যস্ত সেই মানুষের ভিড়ের মধ্যে তুমিও নিজেকে মিশিয়ে দিতে পার। দেখবে তার মধ্যে সত্যিই আনন্দ আছে, দেখবে প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের প্রচলনগতিই মানুষের জীবনকে গতি দান করছে। অর্থ দান করছে।

একথার কোন প্রতিবাদ করল না উইলেম। বাধা দিল না কোনরূপ। বুদ্ধিমান ওয়ার্ণার বাধা না পেয়ে বলে যেতে লাগল, যারা পরিশ্রমী, কর্মঠ, বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী, ভাগ্যদেবী তাদেরই মাথার উপর জয়ের মুকুট পরিয়ে দেন। জানবে প্রতিটি পণ্যের মূল্য বুঝে সময় বুঝে তাকে চালনা করা বড কঠিন কাজ এবং এর জন্য প্রচুর বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতার দরকার। তুমি তোমার কল্পনাশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কাব্যপ্রতিভাকে যদি এইদিকে চালাতে পারতে তাহলে তুমিও অনেক কিছু করতে পারতে। যখন কোন পণ্যবাহী জাহাজ বন্দরে নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী জাহাজ থেকে মাটিতে পা দেয়, তার জীবন ও পণ্যসম্পর্কিত অনিশ্চয়তা আর খেয়ালী সমুদ্রের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিত মাটির জগতে ফিরে আসে তখন যেন সে নবজীবনের আনন্দে হয়ে ওঠে আত্মহারা, তখন তার সেই আনন্দ দেখে যে কোন সাধারণ মানুষও আনন্দ লাভ না করে পারে না। তবে অবশ্য ব্যবসার ব্যাপারে এটাও ঠিক যে সব সময় অঙ্কের হিসাবে কাজ হয় না। অঙ্কের হিসাব যতই নির্ভুল হোক, ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন না হলে ব্যবসাতে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করা যায় না।

দুজনের স্বভাবের মধ্যে কিছু অমিল থাকলেও উইলেম ও ওয়ার্ণারের মধ্যে

যেমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তেমনি তাদের বাবাদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব। ব্যবসাগত প্রবৃত্তির দিক থেকে উইলেমের বাবা বৃদ্ধ মেস্তার আর ওয়ার্ণারের বাবা বৃদ্ধ ওয়ার্ণার দুজনেই সমান। তবে বৃদ্ধ মেস্তার বেশ কৃপণ প্রকৃতির। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব হিসেব করে চলেন। বাড়িতে বড় একটা কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান না। বৃদ্ধ ওয়ার্ণার কিন্তু এক পাকা ব্যবসায়ী হলেও খাওয়ার ব্যাপারে অনেক উদার। আমোদ প্রমোদের দিকেও তার নজর আছে। জীবনকে কিভাবে ভোগ করতে হয় তা তিনি জানেন। দুজনেই একই কারবারের শরীক।

সেদিন বৃদ্ধ মেস্তার ও বৃদ্ধ ওয়ার্ণার এক জায়গায় বসে কারবার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। মেস্তার তাঁর ছেলে উইলেম সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। বৃদ্ধ ওয়ার্ণার পরামর্শ দিলেন, তোমার ছেলেকে একবার বাইরে পাঠিয়ে দাও। কাজকর্ম শিখুক। অনেক জায়গায় অনেক কোম্পানিতে আমাদের কারবারের অনেক টাকা পড়ে আছে। সেই টাকাগুলো ও গিয়ে আদায় করুক, তাহলে তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসাগত সম্পর্কগুলোও নূতন করে গড়ে উঠবে।

বৃদ্ধ মেস্তার তাতে রাজী হলেন সঙ্গে সঙ্গে। ঘোড়ার জন্য আটকাচ্ছিল। কিন্তু মেস্তার ঠিক করলেন আগামী পরশু দিন সোমবারই উইলেম চলে যাক।

উইলেমকে ডেকে পাঠানো হলো। তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো সিদ্ধান্তের কথা। একথা শুনে খুশি হলো উইলেম। একটানা একঘেঁয়ে জীবনযাত্রা থেকে মুক্ত নূতন জায়গায় নূতন জীবন শুরু করার সুযোগ আপনা হতে এসে গেল তার। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতার আভাস পেল। তবে একবার মেরিয়ানার সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাত্রির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল উইলেম।

মেরিয়ানার বাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল মেরিয়ানা। তাদের আসন্ন বিচ্ছেদের কথা সব খুলে বলল উইলেম। বলল, আমি যেখানে ব্যবসার কাজে যাচ্ছি সেখানে ঘর পেলেই তোমাকে নিয়ে যাব। আশা করি বিয়েতে তোমার কোন আপত্তি হবে না।

মেরিয়ানা এ কথার কোন উত্তর দিল না। তার চোখের জল চেপে রেখে শুধু নীরবে চুম্বন করতে লাগল উইলেমকে। তাকে বুকের উপর চেপে ধরল আরো জোরে। এর পর বিদায় নেবার আগে একবার উইলেম জিজ্ঞাসা করল সে পিতা হতে চলেছে কি না। তারও কোন স্পষ্ট উত্তর দিল না।

মেরিয়ানা। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে একটা চুম্বন করল।

পরের দিন সকালে বুকে এক গভীর হতাশা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল মেরিয়ানা। নিঃসঙ্গতার এক দুর্বিসহ বেদনায় ভারী হয়ে উঠল তার অন্তরটা। যাকে সে মনেপ্রাণে ভালবাসে তার সেই ভালবাসার মানুষ দূরে চলে যাচ্ছে আর যাকে সে ভালবাসে না অথচ যে জোর করে তাকে পেতে চায় সেই অবাঞ্ছিত মানুষটা কাছে আসার ভয় দেখাচ্ছে। চোখ দিয়ে জলের ধারা নীরবে বয়ে যেতে লাগল মেরিয়ানার।

বারবারা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, চুপ করো, শান্ত হও, কেঁদে কেঁদে সুন্দর চোখগুলো নষ্ট করো না বাছা। দুজন প্রেমিককে সহ্য করা কি একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়? একজনকে যদি ভালবাসতে নাই পার তাহলে তার ভালবাসার প্রতিদানস্বরূপ তাকে অন্ততঃ কিছু ধন্যবাদ দিতে পার। তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে পার।

সেকথায় কান না দিয়ে মেরিয়ানা বলল, হায়, আমার হতভাগ্য উইলেম একদিন রাতে আমার কাছে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে গেছে। স্বপ্নে দেখেছে সে যখন এক দূর পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা একা তখন হঠাৎ আমাকে একটা পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখতে পায়। কিন্তু আমাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই আমি সেই চূড়া থেকে কোথায় নেমে যাই। এইভাবে আমাদের বিচ্ছেদের আভাস আগেই পেয়েছিল সে। সে সেই স্বপ্নে আরও দেখেছিল অন্য একটা লোক কোথা হতে এসে আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমায়।

বারবারা এবার অধৈর্য হয়ে বলল, তুমি ত জান, আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি। এখন বল, কি চাও, কি পেলে খুশি হবে তুমি।

মেরিয়ানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কি আর চাইব আমি? যে উইলেম আমাকে ভালবাসে, যাকে আমি ভালবাসি সে ব্যবসার কাজে আটকে পড়ে থাকবে বিদেশে।

বারবারা বলল, হ্যাঁ ওরা এমনই প্রেমিক যারা শুধু হৃদয় ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে আনে না। হৃদয় আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না তাদের প্রেমিকাদের।

মেরিয়ানা বিরক্ত হয়ে বলল, এখন ঠাট্টা রাখ। কাজের কথা ভাব। সে

আমাকে বিয়ে করতে চায়।

বারবারাও বিরক্ত হয়ে বলল, অমন নিঃস্ব অবস্থায় বিয়ে করার লোক আমাদের অনেক আছে।

মেরিয়ানা বলল, আমাকে দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতেই হবে। তবে আমার গর্ভে যে সন্তান বেড়ে উঠছে তার খাতিরে উইলেমকে আমাকে পেতেই হবে। এখন ঠিক করে ফেল আমি কি করব।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বারবারা বলল, যৌবনে মানুষ বড় চরমপন্থী হয়ে ওঠে। দুটোর একটাকে কেন বাছতে হবে? একই সঙ্গে দুজনের কাছ থেকে লাভ আর আনন্দ পেতে দোষ কি? একজনকে তুমি ভালবাসবে আর একজন তার দাম দেবে। তবে একটা কাজ আমাদের করতে হবে। দুজন প্রেমিক যেন কেউ কাউকে দেখতে না পায়।

মেরিয়ানা বলল, যা করার করো। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

উইলেমকে প্রথমে এক জায়গায় যেতে হলো ঘোড়ার জন্য। বৃদ্ধ ওয়ার্নার একটা চিঠি দিয়েছিলেন সঙ্গে। চিঠিটা দেখালেই মালিক পত্রবাহককে ঘোড়াটা দিয়ে দেবে। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে উইলেম দেখল বাড়ির মালিক নেই। তার স্ত্রীরও মনমেজাজ খারাপ। উইলেম চিঠিটা দেখাতেই গিন্নী বলল, তাদের সৎ মেয়ে হঠাৎ একটা ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে। তাই তার বাবা মেয়ের খোঁজে ব্যস্ত।

উইলেম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাড়ির মালিক এসে গেল। উইলেমের চিঠি দেখে বিশেষ খাতির করল উইলেমকে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াটা দিয়ে দিল। তবে রাত্রিটার মত উইলেমকে তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে বলল।

রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে এবং লোকটাকে তার মেয়ের জন্য কিছু সান্ত্বনা দিয়ে পরের দিন সকালেই ঘোড়ায় চেপে তার আসল গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলো উইলেম। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই এক অশ্বারোহী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী দেখে থমকে দাঁড়াল। শুনল, মেয়েটি তার প্রেমিকসমেত ধরা পড়েছে।

একটা গাড়িতে খড়ের উপর তাদের বসিয়ে রাখা হয়েছে। ওদের দুজনকে দেখে মায়া হলো উইলেমের। মেয়েটিকে দেখে সাবালিকা মনে হলো। মনে হলো ওর বাবা জোর করে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিতে চায় মেয়েটিকে। দুজন

তদন্তকারী অফিসার মেয়েটাকে জেরা করতে লাগল। মেয়েটি নির্ভীকভাবে বলতে লাগল, আমার বয়স কত জানতে চাইছেন? আমি আপনার বড় ছেলের সমবয়সী। আমার সৎ মা বাড়িতে আমায় এমন জ্বালাতন করতেন যে সে বাড়িতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না আমার পক্ষে। তাছাড়া আমি যার সঙ্গে এসেছি তাকে ভালবাসি। তাকে আমি অনেক আগে থেকেই সাথী হিসাবে বরণ করে নিয়েছি।

একজন অফিসার বলল, তা ত হবে না। তোমার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হবে, তার বিচার হবে। আর তোমাকে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মেয়েটি দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, আমার প্রেমিকের দোষ নেই। ও ত আমাকে জোর করে আনেনি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি ওর সঙ্গে। আমি কোন অপরাধ করিনি। তবু আমাকে লজ্জাজনক অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। অথচ কোন উচ্চ আদালতে আমাদের নিয়ে গেলে আমরা মুক্তি পাব।

আর্লম্যান নামে একজন বয়োপ্রবীণ তদন্তকারী অফিসারকে উইলেম অনুরোধ করল ওদের কথা বিবেচনা করার জন্য। অফিসার মেয়েটির লম্বা বক্তৃতা শুনেও বেশ কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল। তিনি কি করবেন তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না।

অফিসার যাই করুক ওদের দেখতে বড় ভাল লাগছিল উইলেমের। ওদের প্রতি এক সকরুণ সহানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কবিসুলভ এক ভাবানুভূতি জেগে উঠল তার মনে। তার মনে হলো, প্রেমের দুটি রূপ আছে—একটি সলজ্জ, অন্যটি সোচ্চার। একটির রূপ প্রচ্ছন্ন, ললিতকোমল ও শান্ত, অন্যটি প্রকাশ্য, দৃপ্ত এবং সংগ্রামশীল। উইলেম এতদিন প্রেমের যে রূপ দেখে এসেছে সে প্রেম ভীরু, দুর্বল, আত্মগোপনকারী। কিন্তু আজ মেয়েটির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে প্রেমের একটি অদৃষ্টপূর্ব রূপ দেখে ধন্য হলো উইলেম। যে প্রেম গোপন গৃহকোণ থেকে প্রকাশের স্বচ্ছ আলোয় নিজেকে টেনে এনে রাজপথের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা অকপটে ঘোষণা করতে পারে, সব বাধাকে অস্বীকার করে সমাজ ও সংসারে আপন প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানাতে পারে সে প্রেমের মধ্যে অবশ্যই এক বিরল গৌরব আছে। সে গৌরব দেখে নিজেকে ধন্য মনে করল উইলেম।

অফিসার আর্লম্যানের কাছে ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুমতি চাইল।

উইলেম। আর্লম্যান সহজেই সে অনুমতি দান করল। উইলেম সোজা মেলিনার প্রেমিকের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি দেখব একটা মিটমাট করতে পারি কি না। মেয়েটির বাবা আমাদের কাজ-কারবারের সঙ্গে জড়িত। কিছু লেনদেনও আছে। মনে হয় সফল হতেও পারি।

দুঃখে মূহ্যমান যুবকটি কিছুটা ভরসা পেল। সে আগে থিয়েটারে অভিনয় করত। এবার সে উইলেমের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে লাগল। উইলেম ভেবেছিল বন্দী ব্যাঙ যেমন মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি যুবকটি মুক্তি পেলেই দুজনেই অভিনয়ের জগতে চলে যাবে। উইলেম বলল, সুযোগ্য অভিনেতার জন্য যা যা দরকার অর্থাৎ সুন্দর চেহারা, মধুর কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণ অনুভবশক্তি—তা সবই আছে তোমার।

কিন্তু যুবকটি বলল, তা আছে। তবে আমি আর মঞ্চে ফিরে যাব না ভবিষ্যতে।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল উইলেম। কিন্তু তার প্রেমিকের কথা সমর্থন করে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। আমরা আর অভিনয় করব না। অন্য কিছু কাজ কারবারের কথা ভাবছি।

উইলেম বলল, অভিনেতার জীবনে কত সুযোগ আছে। তার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল। তাছাড়া যার যা পেশা তাই নিয়েই থাকতে হয়। তাতেই উন্নতি হয়। যখন তখন এক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরতে নেই।

মেলিনা বলল, আপনি কখনো অভিনয়ের কাজ করেননি, তাই একথা বলছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষা, ম্যানেজারদের পক্ষপাতিত্ব, দর্শকদের নিয়ত পরিবর্তনশীল রুচি প্রভৃতি পদে পদে কত বাধা, কত অসুবিধা ভোগ করতে হয় অভিনেতাদের তার ঠিক নেই।

যুবকটি বলল, যাই হোক, আপনি মিটমাটের চেষ্টা করুন। আমার প্রেমিকার বাবাকে বলবেন কেরাণী, কর আদায়কারীর যে কোন পদে আমি চাকরি করতে রাজী আছি। যে কোন একটা চাকরি পেলেই তাতে আমার চলে যাবে।

উইলেম কথা দিল, পরের দিন সকালেই সে মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

হোটেলে রাতটা কাটিয়েই সকালে বেরিয়ে পড়ল উইলেম। উইলেম গিয়ে দেখল মেয়েটির বাবা বাড়িতেই আছে। তাকে সব কথা বিজ্ঞতার সঙ্গে বুঝিয়ে বলল। লোকটিও সব কথা ধৈর্য ধরে শুনল। শুনে যা বলল তাতে উইলেম

একরকম সাফল্যই লাভ করল। লোকটি বলল, তার মেয়ে যুবকটিকে বিয়ে করতে পারে। সে মামলা তুলে নেবে। তাদের কোন শাস্তিও দেবে না। কিন্তু বিয়ের পণ হিসাবে কোন যৌতুক পাবে না। তাছাড়া তার মেয়ে তার মাসীর যে সম্পত্তি পেয়েছিল তা তার বাবার কাছে বছর কতকের জন্য রাখতে হবে। অর্থাৎ তার বাবাই তার আয় উপসত্ব ভোগ করবে। উইলেম তার মেয়ে জামাইকে ঘরে রাখার জন্য অনুরোধ করল লোকটিকে। কারণ এখন ওদের কোন সংস্থান নেই। লোকটি তার উত্তরে বলল, তার মেয়েকে ঘরে জায়গা দিতে তার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ছোকরাটাকে নিয়ে। ওই ছোঁড়াটার উপর তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরও লোভ ছিল। কিন্তু যুবকটির দৃষ্টি ছিল তার মেয়ের উপর। তাই তারা পালিয়ে যায়।

কথাটা শুনে লজ্জায় পড়ে গেল উইলেম। এই গোপন কথাটা জানলে সে এ অনুরোধ করত না।

যাই হোক, মিটমাটের ব্যবস্থা শেষ করে মনটাকে স্থির করে মেরিয়ানাকে একখানা চিঠি লিখল উইলেম। কয়েকদিন ধরে তার কথা মনে হচ্ছিল। রাত্রি বেলায় খাওয়ার পর কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ল। লিখল,

যে মধুর রাত্রি তার নীল আবরণ দিয়ে আমাদের ঢেকে রাখত, আমাদের মিলনের নিবিড়তাকে মধুর করে রাখত, সেই রাত্রিরই শান্ত নীরব আকাশে তোমাকে চিঠি লিখছি মেরিয়ানা। এখন আমি এক নববিবাহিত যুবকের কাছে আছি যার সামনে জীবনের এক নূতন দিগন্ত খুলে গেছে, যে একটু পরেই তার নববধূর বুকের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের প্রেম স্বভাবতই তোমার কথা, আমাদের ভালবাসাবাসির কথা মনে পড়িয়ে দিল নূতন করে, আরো তীব্র করে।

আমার ফিরতে আরো কিছুদিন দেরি হবে। তা হোক। কারণ একথা ভাবতে খুবই ভাল লাগছে যে এই বিচ্ছেদের পর আগের থেকে আরও মধুর হয়ে উঠবে আমাদের মিলন। পুনর্মিলনের সেই মধুর নিরবচ্ছিন্নতা এই বিচ্ছেদের সব বেদনা সব যন্ত্রণাকে ভাসিয়ে দেবে। আমি আমাদের সন্তানের জন্য কিছু ভাবি না। আমাদের মিলনের সুখস্মৃতিরূপেই সে সন্তান আনন্দ বর্ধন করে যাবে আমাদের। একটা কথা প্রায়ই মনে হয় আমার প্রিয়তমা। বক্তৃতামঞ্চ থেকে নাট্যমঞ্চ কোন অংশে কম নয়। ঈশ্বর এবং প্রকৃতি আমাদের যে শক্তি, যে যোগ্যতা দান করেছেন তার বিকাশ সাধনের জন্য আমি মঞ্চে অবতীর্ণ হব।

যে কথা দর্শকরা যুগ যুগ ধরে শুনতে চাইছে তোমাতে আমাতে দুজনে এক সুন্দর জোট বেঁধে সেকথা তাদের প্রাণভরে শোনাব। এত সব কথা মুখে বলে জানানো সম্ভব নয় বলেই চিঠি লিখে জানালাম। এখন এখানেই ইতি। বিদায় প্রিয়তমা, আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। বন্ধ হয়ে আসছে। এখন রাত্রি নিশীথ।

প্রথম কিস্তির কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেল উইলেম। আবার তাকে যেতে হবে আর এক জায়গায়। আবার বার হতে হবে। কিন্তু তার প্রস্তুতির জন্য দিনকতক লাগবে। তাই বাড়ি ফিরেই পরদিন বিকালের দিকে মেরিয়ানার সঙ্গে দেখা করতে গেল উইলেম। চিঠিখানা ডাকে ফেলেনি। সঙ্গে করে নিয়ে গেল। ভাবল হাতেই দেবে। বিকালে বা সন্ধ্যায় এর আগে কখনো যায়নি সে মেরিয়ানার কাছে। সাধারণতঃ সে যায় গভীর রাত্রিতে। কিন্তু আজ ঠিক করল, সন্ধ্যে হতেই সে চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে আসবে। পরে রাত্রি গভীর হলে গিয়ে তার উত্তর চাইবে।

মেরিয়ানাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করছে আর একটা কারণে। বাইরে থেকে সে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধু ওয়ার্ণার এসেছিল তার প্রেম সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে। মেরিয়ানার প্রতি তার গোপন প্রেম, তার বাড়িতে গভীর রাত্রিতে নিয়মিত যাওয়া এসব কথা সব জেনেছে ওয়ার্ণার। শুধু তাই নয়, সে মেরিয়ানা সম্বন্ধেও অনেক খবর সংগ্রহ করেছে। ওয়ার্ণার তাকে সাবধান করে দিয়েছে, মেরিয়ানা ভাল মেয়ে নয়। মেরিয়ানা তাকে উপরে ভালবাসার ভান করলেও আসলে আর একটা লোকের কাছে সাহায্য নেয়। আর একটা লোকের সঙ্গে তার আছে এক গোপন সম্পর্ক।

ওয়ার্ণারের কথা শুনে মনটা কিছু খারাপ হলেও মেরিয়ানার প্রতি কিছু-মাত্র বিশ্বাস হারায়নি উইলেম। মেরিয়ানার মত সুন্দরী মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে, সে কখনো বিশ্বাস করতে পারে না একথা। তার ভালবাসা কখনো মিথ্যা হতে পারে না এ বিশ্বাস এখনো অটুট আছে তার।

এই অটুট বিশ্বাসে বুক বেঁধে মেরিয়ানার বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল উইলেম। ঘরে ঢুকেই ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেরিয়ানার বুকে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। কিন্তু আবেগের প্রবলতায় একটা জিনিস লক্ষ্য করেনি উইলেম। মেরিয়ানার আদর অভ্যর্থনার ও আচরণে আগের মত আন্ত-রিকতা নেই, আবেগের সেই উষ্ণ নিবিড়তা নেই।

সেটা যে নেই মেরিয়ানা নিজেও সচেতন সে বিষয়ে। তাই তার কারণ হিসাবে একটা যুক্তি দেখাল। বলল, আজ তার শরীর খারাপ। উইলেম বলল, এখন এসেছে এমনি দেখা করতে, আজ রাতে আবার আসবে সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে মেরিয়ানা বলল, আজ না, অন্যদিন এসো। আজ শরীরটা বড় খারাপ।

কোন কিছু সন্দেহ না করে সরল বিশ্বাসে মেরিয়ানার সব কথা মেনে নিল উইলেম। এ নিয়ে সে আর পীড়াপীড়ি করল না। তবে অনেক আশা অনেক উৎসাহ নিয়ে যে চিঠিটা তুলে দিতে এসেছিল মেরিয়ানার হাতে সে চিঠিটা বার করল না। পকেটেই তা রয়ে গেল। মেরিয়ানার এই নিরুত্তাপ ভাব দেখে সে চিঠি তার হাতে দেবার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না উইলেম।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে। মেরিয়ানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেল উইলেম। কয়েক দিনের বিচ্ছেদের পর নিবিড়তর মিলনের আশায় সম্ভাব্য যে আনন্দের আবেগ ও উত্তেজনার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল বুকে সে ঢেউ আপনা হতেই অসময়ে ফেটে মিলিয়ে গেল। মনে মনে মুষড়ে পড়ল উইলেম। বাড়িতে থাকতে ভাল লাগল না কিছুতেই। তাই পোষাক পরে আবার বেরিয়ে পড়ল পথে।

পথে বার হতেই এক অচেনা পথিকের সঙ্গে দেখা হলো। পথিক তাকে কোন এক ভাল হোটেলের সন্ধান দিতে বলল। কথা বলতে বলতে তাকে সঙ্গে করে নিকটবর্তী একটা হোটেলে নিয়ে গেল উইলেম। হোটেলে পৌঁছে পথিকটি উইলেমকে এক কাপ চা খেয়ে যাবার অনুরোধ করল। হাতে কোন কাজ না থাকায় উইলেম বসে পড়ল ভদ্রলোকের কাছে। উইলেমের পরিচয় জানতে পেরে পথিকটি বলল, সে নাকি তার পিতামহকে চিনত। তার পিতামহের কেনা যে ছবিগুলো তার বাবা বিক্রি করে দেন সে ছবিগুলো সে নাকি কিনে নেয়। যাই হোক, একথা সেকথার পর ভদ্রলোক উইলেমকে বলল, তুমি ভাগ্যে বিশ্বাস করো? তুমি কি বিশ্বাস করো অদৃশ্য কোন এক শক্তি উপর থেকে আমাদের জীবনকে চালনা করছে?

উইলেম, তোমার মত এক যুবকের পক্ষে একথা সাজে না।

ভদ্রলোক তখন বলল, মনে করো তুমি একটি বড় কাজ করতে চলেছ অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু মাঝপথে অকস্মাৎ কোন বাধা এসে গেল। তুমি তা করতে পারলে না। এখানেও কি তুমি নিয়তির বিধানে বিশ্বাস করবে না?

উইলেম বলল, একথার উত্তর এত তাড়াতাড়ি এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

চা খেয়ে হোটেল থেকে পথে বেরিয়ে পড়ল উইলেম। পথে কোথায় একজন লোক একটা মিষ্টি গানের সুর বাজাচ্ছিল বাদ্যযন্ত্রে। সেই সুর শুনতে শুনতে হঠাৎ মেরিয়ানার কথা মনে পড়ল তার। ইচ্ছা না থাকলেও ধীরে ধীরে মেরিয়ানার বাড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলো। তখন বেশ রাত হয়েছে। সদর দরজা বন্ধ। তবু তার সামনে রোয়াকটায় একটু বসল উইলেম। দরজার কাঠগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখল। এই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কতদিন মেরিয়ানা তার জন্য অপেক্ষা করেছে কত উষ্ণনিবিড় আগ্রহে। দরজার চৌকাঠ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু সে দিন কি আর ফিরবে না? আজ কেন তাকে যেতে নিষেধ করল মেরিয়ানা? কিন্তু এসব কথা এখানে বসে ভেবে কোন ফল হবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতে আবার বাড়ির পথে রওনা হলো উইলেম। কিন্তু কয়েক পা যেতেই হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল আধো অন্ধকারে কোন এক পুরুষের ছায়ামূর্তি মেরিয়ানার বাড়ির সদর দরজা থেকে নিঃশব্দে বার হয়ে কোথায় চলে গেল। এক অদম্য কৌতূহলের বশে পথের উল্টো দিকে এগিয়ে চলল উইলেম লোকটাকে অনুসরণ করার জন্য। সে স্পষ্ট দেখল লোকটা মেরিয়ানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পথ ধরে চলে গেল। কিন্তু উইলেম কিছুটা এগিয়ে যেতেই আর তাকে দেখা গেল না। হয়ত কোন পাশের গলিপথে ঢুকে পড়েছে।

বাড়ি ফিরে এ বিষয়ে সব সন্দেহ সব সংশয় মন থেকে মুছে ফেলল উইলেম। সেই চিঠিটা বার করে তার শেষে কয়েকটা কথা জুড়ে দিল। লিখল, হে আমার প্রিয়তমা, গত রাতে কি তোমার হয়েছিল? কেন তুমি যেতে নিষেধ করলে আমায়। তোমার হয়ত ওখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। কিন্তু ধৈর্য ধরো, সময় মত আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করব। ওই কালো গাউনটা পরেছিলে কেন? আমি ত তোমাকে একটা সাদা নাইটগাউন পাঠিয়েছি। সেটা পরলে তোমাকে বড় সুন্দর দেখাবে। চিঠি পাঠাবে বুড়ি সিবিলের মাধ্যমে। শয়তান নিজে তাকে দূত আইরিস হিসাবে বেছে নিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন অনেক রোগ আছে যা বলবান লোকদের ধরলে বেশী দুর্বল করে দেয়, বেশী করে কায়দা করে। উইলেমের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো। মেরিয়ানার সঙ্গে তার ব্যর্থ প্রেমসম্পর্কটা একটা দুষ্ট রোগের মত অত্যধিক আবেগে স্ফীত উইলেমের অন্তরটাকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেল একেবারে। তবু একেবারে আশা ছাড়ল না উইলেম। তার ধারণা আবার মিলন ঘটবে তাদের। সব সংশয়, আর ভুল বোঝাবুঝির মেঘ কেটে যাবে নিঃশেষে।

কিন্তু তার বন্ধু ওয়ার্ণার মেরিয়ানার জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে যে-ভাবে তার মুখোস খুলে দিয়েছে তাতে তার প্রতি মেরিয়ানার প্রতারণার বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অবশেষে উইলেম যখন দেখল মেরিয়ানাকে ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয় তার পক্ষে তখন তার অভাবটাকে তার জীবনের এক চরম ক্ষতি বলেই ধরে নিল। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখল এ ক্ষতি সহজভাবে সহ্য করা অসম্ভব তার পক্ষে। নিজের অন্তরকে ঘৃণা করতে লাগল উইলেম। নীরব অশ্রু আর অবদমিত শোকা-বেগকেই একমাত্র ওষুধ বা প্রতিকার বলে ভাবতে লাগল।

বর্তমানের দুঃখটাকে ভোলার জন্য অতীতের হারিয়ে যাওয়া সুখের ও মিলনের দিনগুলোকে কল্পনার রং রস দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করে নূতন করে। কিন্তু তারা বাঁচে না। উইলেম শুধু একবার অতীতের গভীর অন্ধকার খাদটার মধ্যে নিবিড় হতাশার সঙ্গে তাকায়। তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মধ্যে। এইভাবে বর্তমানের জীবনযন্ত্রণাকে ভুলতে গিয়ে স্বেচ্ছায় আর এক যন্ত্রণার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে উইলেম। যৌবনের স্বাভাবিক উন্মাদনার বশে তার বর্তমানের ক্ষতিটাকে অপূরণীয় ভেবে এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করে।

প্রথম প্রেমে এক তিক্ত ব্যর্থতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট রূপান্তর এল উইলেমের জীবনে। প্রেমের ক্ষেত্রে তার আকাঙ্খিত বস্তুকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসাধনার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা জাগল তার মনে। কবিতা লেখা ও অভিনয় করার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। তার মনে হলো, কবিতা কতকগুলো শব্দের ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থন যার মধ্যে গাঁথা থাকে কতকগুলো বাঁধাধরা নীরস চিন্তা আর আবেগ। আবার তার চেহারা, আবেগানুভূতির স্বচ্ছন্দ ও

সংযত প্রকাশ, তার বাক্‌ভঙ্গিমা, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি সব মিলিয়ে তার যে সহজাত অভিনয়প্রতিভা ছিল এবং যার নিয়মিত চর্চা করলে সে একজন উচ্চস্তরের অভিনেতা হতে পারত সে প্রতিভাও বিস্বাদ ঠেকল তার কাছে।

এখন কাব্যসাধনা ও অভিনয়চর্চা দুইই ছেড়ে ব্যবসার কাজে মন দিল উইলেম। কখনো এক্সচেঞ্জে, কখনো কাউন্টিং হাউসে, কখনো বিক্রয়কেন্দ্রে, স্টোরে, কখনো অফিসঘরে বা প্রচারকেন্দ্রে সব সময় ঘুরে বেড়াত উইলেম অক্লান্তভাবে। তার উপর যখন যে কাজের ভার দেওয়া হত সে তাই প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে করত। তার এই নূতন কর্মতৎপরতা দেখে তার বন্ধুরা বিস্মিত হলো, তার বাবা খুশি হলেন।

মন থেকে সব প্রেম ও কাব্যসাধনার স্মৃতি চিরতরে মুছে দেবার জন্য একদিন সন্ধ্যের সময় নিজের ঘরে আগুন দিয়ে সব চিঠিপত্র ও লেখা কবিতা পোড়াতে লাগল উইলেম। তার এতদিনের প্রিয়বস্তুগুলো তারই চোখের সামনে দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এমন সময় ওয়ার্নার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই উইলেমের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। তার বুঝতে দেরি হলো না উইলেম কি করছে। উইলেম নিজে থেকেই বলল, যে কাজে আমার কোন সহজাত প্রতিভা বা যোগ্যতা নেই তা যে সত্য সত্যই আমি ছেড়েছি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার জন্যই আমি এ কাজ করছি।

ওয়ার্নার তাকে বাধা দিয়ে বলল, কোন কোন কবিতা সৃষ্টি হিসাবে সার্থক বা পূর্ণতা অর্জন করতে না পারলেও তা পুড়িয়ে ফেলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

উইলেম বলল, কবিতা হয় রসোত্তীর্ণ হবে অথবা তার অস্তিত্ব থাকবে না। যার কাব্যসৃষ্টির কোন জন্মগত প্রতিভা নেই তার একাজে হাত দেওয়া মোটেই উচিত নয়। যদি তা সে করে তাহলে বলব সে বিষয়ে সে প্রতারণা করছে সকলের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে। সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু অনুকরণপ্রবৃত্তি আছে। সে ভাবে প্রকৃতিজগতে ও মানবজগতে কোন বস্তু বা ঘটনা দেখলেই তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এ বিষয়ে তার ক্ষমতা আছে।

ওয়ার্নার বলল, তোমার অন্তরের অনুভূত সত্যগুলোকে এভাবে জোর করে নির্বাসিত করা উচিত নয়। এই সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে মানিয়ে

চলাই ভাল। কারণ এগুলোকে অস্বীকার করলে নিজের আত্মাকেই অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া এটা এক নির্দোষ আনন্দের ব্যাপার। এ আনন্দ ত্যাগ করার কোন অর্থই হয় না।

উইলেম বলল, বলব কি কারণে আমি এসব পুড়িয়ে ফেলেছি। তার কারণ হলো এই যে, এই সব কাগজপত্রগুলোর মধ্যে আমার অতীতের কামনা বাসনা-গুলো সব লেখা আছে। বর্তমানে আমি যতই এই সব কিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবনের কোন বৃহত্তর অর্থ চাই ততই এই সব লেখাগুলো আমাকে সেই সব ব্যর্থ কামনা বাসনাদের কথা জোর করে মনে পড়িয়ে দেয়। আমার তা মোটেই ভাল লাগে না। মোটেই না।

এই বলে আরও দুটো কাগজের প্যাকেট পুড়িয়ে ফেলল উইলেম। আর তার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বিব্রত ওয়ার্নার। তার করার বা বলার আর কিছুই ছিল না। এর আগে সে উইলেমকে দু তিনবার বাধা দিতে গিয়েও পারেনি।

এমনি করে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাব্যসাধনা ও শিল্পসাধনায় জলাঞ্জলি দিয়ে কাজ-কারবার ও পৈত্রিক ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে খুব বেশী করে মন দিল উইলেম। ব্যবসার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা, লেখা চিঠিতে কিছু কিছু কাব্যিক আবেগের সংমিশ্রণতায় সাফল্যের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়ে দিতে লাগল। ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল উইলেম। তখন তার বাবা আবার বাইরে পাঠাবার মনস্থ করলেন তাকে। বললেন, বাইরে যে সব পাওনা টাকাগুলো পড়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে সেগুলো আদায় করে আসুক।

এবার উইলেমকে পাঠানো হলো পার্বত্য অঞ্চলে। ঘোড়ায় চেপেই রওনা হয়ে পড়ল উইলেম। পার্বত্য এলাকায় এই তার প্রথম যাওয়া। পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ, শ্যাওলাধরা বড় বড় পাথর, গভীর খাদ প্রভৃতি দেখতে খুব ভাল লাগছিল তার। আপনা থেকে মুখ দিয়ে গান বেরিয়ে এল উইলেমের। তার সঙ্গে নিজের লেখা কিছু গানও।

এমন সময় কয়েকজন লোকের কাছে শুনল হকডর্ফ নামে এক জায়গায় এক নাটকের অনুষ্ঠান হবে।

অবাক হয়ে গেল উইলেম কথাটা শুনে। এই পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে আবার থিয়েটার! তা যদি হয় তাহলে আমি অবশ্যই তা দেখতে যাব।

লোকগুলো বলল, থিয়েটার হবে এক কারখানায়। কারখানার মালিক তার কর্মচারিদের দিয়ে এক নাটক মঞ্চস্থ করছে। এখানে ত আর কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই। তার মালিক মাঝে মাঝে ওই থিয়েটারের আয়োজন করে।

উইলেম সেখানে গিয়ে দেখল কারখানার মালিক তাদের কারবারের একজন খরিদ্দার। তার কাছে তাদের কোম্পানি কিছু টাকাও পাবে। তার কাছে দেনাদারদের যে তালিকা আছে তাতে তারও নাম আছে। যাই হোক, উইলেমকে দেখে খুশি হলো সেই কারখানার মালিক। সব টাকা মিটিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। তার থাকা খাওয়ারও ব্যবস্থা করল। তার স্ত্রী বলল, উইলেমকে দেখতে ঠিক তার বাবার মত।

রাত্রে নাটক দেখে বিশ্রাম করে পরের দিন সকালে আবার হোটেলে চলে গেল উইলেম। কিন্তু টাকা আদায়ের ব্যাপারে এই পার্বত্য এলাকায় বিশেষ সুবিধা করতে পারল না সে। আইনগত বিষয়ে পরামর্শদাতারও একান্ত অভাব এখানে। এজন্য দু চার দিন এই পাহাড় জঙ্গলের রাজ্য ছেড়ে সমতল-ভূমির দিকে রওনা হলো উইলেম।

উঁচু-নিচু বন্ধুর পার্বত্য পথ, ছায়াঘন জঙ্গল, তার উপর মেঘ বৃষ্টি কুয়াশা প্রভৃতির অবাঞ্ছিত অনভ্যস্ত অভিজ্ঞতার পর সমতলে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল উইলেম। উর্বর ঘাসেঢাকা সবুজ উপত্যকা, অবারিত সুন্দর প্রান্তর, আর তার বুক চিরে বয়ে যাওয়া কত মন্থরগতি নদী দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল তার। এমনি এক নদীর ধারে ছোট্ট এক সাজানো সুন্দর শহর পেয়ে গেল উইলেম।

শহরের মধ্যে খোঁজ করে এক ভাল পান্থশালায় উঠল উইলেম। দেখল তার সামনে ভিড়। কোথা হতে এক দড়ির খেলা দেখানো নাট্যদল এসেছে। আজ রাত্রি থেকে দু-তিন দিন ধরে তাদের খেলা দেখানো চলবে।

কিছুক্ষণ পরেই এক ফুলওয়ালী মেয়ে ফুল বেচতে এল। উইলেম তার থেকে কিছু ফুল কিনল। তার কিছু পরে তার ঘরের উল্টো দিকে এক ঘরের জানালায় তার হঠাৎ চোখ পড়ল, এক সুন্দরী যুবতী চুল আঁচড়াচ্ছে। হঠাৎ একটি ছেলে এসে বলল, আপনি যে ফুল কিনেছেন তার থেকে কিছু ঐ ভদ্র-মহিলা চাইছেন। সানন্দে তা দিল উইলেম।

এর কিছু পরে লার্তেস নামে এক ভদ্রলোক এসে আলাপ করল উইলেমের সঙ্গে। আলাপ পরিচয়ের পর লার্তেস উইলেমকে সঙ্গে করে সেই সুন্দরী যবতীর

ঘরে নিয়ে গেল। লার্তেসই আলাপ করিয়ে দিল। যুবতীটি প্রথমেই তার ফুলের জন্য ধন্যবাদ জানাল উইলেমকে। উইলেম দেখল মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী —তার চোখ মুখ চুল সব মিলিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে তার দেহের লাবণ্যকে। লার্তেস বলল, আমি আর ফিলিনা এক নাট্যদলের অংশীদার। আমরা জাহাজে করে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় যেতে যেতে নেমে পড়েছি এখানে। জায়গাটা খুব ভাল লাগায় দু-চার দিন থেকে যেতে চাই।

উইলেমকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ফিলিনা। সে তখন একটা কালো পোষাক পরেছিল। পোষাকটা একটু ছোট হলেও তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। উইলেমের একটা হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল তার শোবার ঘরে। ফিলিনার একটা হাতে ছিল উইলেমের দেওয়া সেই গোলাপ ফুলটা।

লার্তেস দোকান থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এল উইলেমের জন্য। এসেই ফিলিনার কোলের উপর কিছু চিনির রসে পাক দেওয়া বাদাম ছুঁড়ে দিল। তা দেখে ফিলিনা উইলেমকে লক্ষ্য করে বলল, দেখছেন, এই বীরপুরুষটি আমাকে কত শিশু ভাবছে। অথচ উনিই এই সব জিনিস খেতে বেশী ভালবাসেন।

উইলেম হেসে ফেলল কথাটা শুনে। লার্তেস প্রস্তাব করল, আজকের দিনের আবহাওয়াটা বড় চমৎকার। চল বাইরে কোন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বেড়িয়ে আসি। ওখানেই খাওয়াটা সেরে নেবে।

ফিলিনা উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে ত খুব ভাল হয়। তাহলে আমাদের এই নবপরিচিত বন্ধুটিও বেশ কিছুটা আনন্দ পান।

উইলেম বলল, আমি আমার ঘর থেকে মুখ হাত ধুয়ে চুলটা আঁচড়ে আসছি।

ফেলিনা বলল, আপনি এটা এখানেই সারতে পারেন। এই বলে সাবান পাউডার প্রভৃতি সব প্রসাধনদ্রব্যের ব্যবস্থা করে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

সকলে তৈরি হয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। ফিলিনার মনটা বড় নরম। যাবার পথে ভিখিরি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু না কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছিল সে। অবশেষে মিল নামে একটা পান্থশালায় এসে পৌছল ওরা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে খাবার জন্য তৈরি হলো তারা। এমন সময় ওরা দেখল অদূরে স্থানীয় খনি শ্রমিকরা এক নাচগানের অনুষ্ঠান করছে। অনুষ্ঠানটা একই সঙ্গে গীতি ও নৃত্যনাট্য ধরনের। তাতে দেখা গেল মঞ্চের উপর এক খনিশ্রমিক গাঁইতি নিয়ে কয়লা কাটছে আর গান গাইছে। এমন সময় এক কৃষক এসে তাকে

শানের মধ্য দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন সে মাটি কাটছে। কেন সে তার জমিটাকে ক্ষতবিক্ষত করছে। খনিশ্রমিক তার উত্তরে বলল, এইভাবেই মাটির ভিতর থেকে সব খনিজ সম্পদ বার করে আনতে হয়। তাতে অসংখ্য মানুষের মঙ্গল হয়। এইভাবে দেখা গেল প্রথমে কৃষকটি রেগে গেলেও পরে খনি-শ্রমিকের কথায় শান্ত হয়ে চলে গেল।

অনুষ্ঠানটা শেষ হলে ওরা অন্যত্র চলে গেল। কথাবার্তা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। ফিলিনা গান শুরু করল। তার গলাটা বড় মিষ্টি। গান শুনতে শুনতে ওরা আবার সেই শহরের হোটেলে ফিরে গেল। সন্ধ্যায় হবে হোটেলের সামনে দড়ি নাচের খেলা। ফিলিনা বলল, তোমাদের ঘরের চেয়ে আমার ঘরটা এ বিষয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক। তোমরা দুজনেই আমার ঘর থেকে অনুষ্ঠান দেখবে।

অনুষ্ঠানের প্রথমে কিছু অপটু ছেলেমেয়ে ও কিছু আনাড়ী লোক খেলা দেখিয়ে হাসাল দর্শকদের। অবশেষে এল এ খেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দুজন বড় খেলোয়াড় নার্সিস আর লান্ড্রিনেত্তে।

অনুষ্ঠানশেষে খেলোয়াড়দের তাঁবুর বাইরে অদ্ভুতদর্শনা একটি মেয়েকে দেখে তাকে ডাকল উইলেম। মেয়েটি ওদের কাছে আসতে উইলেম জিজ্ঞাসা করল তার বয়স কত।

মেয়েটি বলল, তা সে জানে না। তাদের দলের কেউ জানে না।

উইলেম আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবার নাম কি ?

মেয়েটি বলল, সে শয়তানটা মারা গেছে।

উইলেমের মনে হলো, মেয়েটির বয়স বারো তের হবে। তার মুখ চোখ ভাল। বয়স অনুপাতে তার স্বাস্থ্য খুবই উন্নত। কিন্তু সেই অনুপাতে তার হাত পাগুলো পুষ্ট হয়নি। তাকে দেখতে সত্যিই ভাল লাগছিল উইলেমের। ফিলিনা তাকে কিছু মিষ্টি দিতেই সে চলে গেল।

লার্তেস আবার একটা প্রস্তাব আনল। আগামী কাল জাগারহানস্ শহরে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারবে। জাগারহানস্ হচ্ছে এক বিরাট বনাঞ্চল। খুব নিস্তব্ধ আর মনোরম। বেড়াবার জায়গা হিসাবে চমৎকার। ওরা তিনজনেই যাবে।

আনন্দের মিষ্টি উত্তেজনায় সারারাত ভাল করে ঘুম হলো না উইলেমের। সকাল হতেই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় জামা পরে ফিলিনার ঘরে গিয়ে দেখে

ফিলিনা নেই। বেশ কিছুটা হতাশ হয়ে লার্তেসের ঘরে গেল উইলেম। লার্তেস শান্ত কণ্ঠে বলল, ফিলিনা যেখানে যায় যাক। তারা দুজনে যাবে।

রওনা হবার আগে কিছুক্ষণ মেয়েদের সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। উইলেম লক্ষ্য করল মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উৎসাহ নেই লার্তেসের। এক সময় লার্তেস বলল, ফিলিনা কখনো কাউকে ঠকায় না। অবশ্য সাময়িকভাবে নিরাশ করতে পারে। সে মেয়ে হিসাবে আদিমাতা ঈভের সুযোগ্যা বংশধর। সে এমনই এক জাতের মেয়ে যে দেওয়া নেওয়ার মাত্রা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। তাকে যতটুকু দেবে, ঠিক ততটুকুই পাবে তার কাছ থেকে।

সহসা মেরিয়ানার কথাটা মনে পড়ে গেল উইলেমের। জাগারহানসের জঙ্গলে গিয়ে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ঘুরতেই একটা পাথরের ধারে ফিলিনাকে একা একা বসে থাকতে দেখল ওরা। লার্তেস তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল তার সঙ্গীরা কোথায়। ফিলিনা উত্তরে বলল, সে আগেই তাদের বিদায় দিয়েছে। ফিলিনা বলল, লোকগুলো ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির। হোটেলে খেতে গিয়ে বার বার প্রতিটি জিনিসের দাম জিজ্ঞাসা করছে আর এ ওর মুখপানে তাকাচ্ছে। আমি ওদের ভাবগতিক বুঝতে পেরে ওয়েটারকে এমন এক ডিনারের অর্ডার দিলাম যার বেশীর ভাগ উপকরণ হোটেলে নেই। অগত্যা ওরা বাইরে চলে এল। ওরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আমিও ওদের বিদায় দিয়ে মুক্তি দিলাম। আর ওরা এ দিকে মুখ করবে না।

একথা সেকথার পর হঠাৎ এক সময় ফিলিনা বলল, তোমরা দুজনে কিছু ফুল নিয়ে এস। বেশী করে আনবে।

ওরা দুজনে ফুল আনলে সেই ফুল দিয়ে একটা মালা গেঁথে নিজের গলায় পরল ফিলিনা। তারপরেও অনেক ফুল অবশিষ্ট থাকায় আর একটা মালা গেঁথে উইলেমের গলায় গম্ভীরভাবে পরিয়ে দিল। তখন লার্তেস হেসে বলল, আমাকে তাহলে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে?

ফিলিনা তখন নিজের গলা হতে মালাটা খুলে লার্তেসের গলায় পরিয়ে দিল। বলল, শূন্য হাতে কাউকে ফিরতে হবে না।

লার্তেস তবু বলল, এখন থেকে আমরা দুজনেই যদি তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী হই?

ফিলিনা তখন নীরবে লার্তেসের মুখের কাছে তার মুখটা বাড়িয়ে দিল যাতে লার্তেস চুম্বন করতে পারে। তার পরমুহূর্তেই দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন

করল উইলেমকে। তারপর বলল, পুরুষ নারীর কাছে সাধারণতঃ যা চায় তা আমি তোমাদের দুজনকেই দিলাম। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন কারণ নেই।

ফিলিনা বলল, এখন সবেমাত্র বিকাল। চল ওদের খেলা আরম্ভ হবার আগেই আমি কিছুক্ষণের জন্য নাচব। আমাদের ঘরে চল।

ঘরে গিয়ে ফিলিনার সঙ্গে লার্তেসও নাচতে লাগল। কিন্তু উইলেম ভাল নাচতে জানে না। তার অভ্যাস নেই। তখন লার্তেস ও ফিলিনা দুজনেই উইলেমের হাত ধরে তাকে নাচ শেখাতে লাগল।

ওদের দড়িনাচের খেলা আরম্ভ হবার আগে হঠাৎ আসরের সামনে একটা গোলমাল শুনে ছুটে গেল উইলেম। দেখল মিগনন নামে সেই অদ্ভুতদর্শনা মেয়েটিকে দলের ম্যানেজার নির্মমভাবে মারছে। মিগনন নাকি ডিমের নাচ দেখাতে রাজী হয়নি।

মিগননের চিৎকারে লোক জড়ো হয়েছিল। তার প্রতি করুণাও অনেকের জেগেছিল। কিন্তু ম্যানেজারের শাসনের কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি। উইলেম ছুটে গিয়ে ম্যানেজারের গলার জামার কলারটা চেপে ধরল। তার হাতের চাপে মিগননকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ম্যানেজার। আর ছাড়া পেয়ে মিগনন তীর বেগে কোথায় ছুটে পালিয়ে গেল। লোকটা তখন আস্ফালন করে বলতে লাগল, কোথায় পালাবি, আমি তোকে খুন করব। তুই ডিমের নাচ দেখাব বলে দর্শকদের দেখাসনি।

উইলেম বলল, তার আগে এই শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে তোমাকে বলতে হবে ওকে কোথা থেকে তুমি চুরি করে এনেছ? আমি তোমাকে সহজে ছাড়ব না। এর জন্য যেখানে যেতে হয় যাব।

ম্যানেজার তখন বলল, আমি ওর পিছনে যা খরচ করেছি সেই খরচটা আমাকে দিয়ে দিন। তারপর ওকে নিয়ে যা খুশি করুন। আমার দেখার দরকার নেই।

উইলেম বলল, ঠিক আছে। খেলা ভেঙ্গে যাক। আমি তোমার দাবি মিটিয়ে দেব।

অনুষ্ঠান শেষে ম্যানেজারকে একশো ডুকেট দিয়ে মিগননকে মুক্ত করল উইলেম। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। উইলেমের ভয় হতে লাগল ভয়ে ও মনের দুঃখে কোন পুকুরে ঝাঁপ দেয়নি ত বেচারী?

পরের দিন সকালেই নাচের দল তাঁবু গুটিয়ে চলে গেল। আর তার কিছু পরেই কোথা হতে মিগনন এসে হাজির হলো উইলেমের সামনে। উইলেম তখন বাইরের ঘরে লার্তেসের সঙ্গে বসেছিল। লার্তেস বলল, কোথায় ছিলি! এখন থেকে তুই মুক্ত। তোকে আমরা কিনে নিয়েছি লোকটার কাছ থেকে।

মিগনন খুশি হয়ে বলল, কত দাম দিতে হয়েছে?

লার্তেস বলল, একশো ডুকেট।

আর কোন কথা না বলেই ওদের ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল মিগনন।

হঠাৎ রাস্তায় গোলমাল শুনে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উইলেম দেখল, একটা চতুর্দোলায় নার্সিস আর নাদ্রিনেত্তাকে বসিয়ে বাহকরা শহর পরিক্রমা করছে। খেলোয়াড়ের জনপ্রিয়তার কথা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই তাদের যাবার সময় তাদের একবার দেখার জন্য বিরাট ভিড় জমে যায় পথের দুধারে আর দুপাশের বাড়িগুলোর বারান্দা ও ছাদে। সমগ্র দল তাদের জন্য গর্বিত। তাই তাদের নিয়ে সারা শহর পরিক্রমার ব্যবস্থা করেছে দলের কর্তৃপক্ষ। নার্সিস ও নাদ্রিনেত্তার খাতির ও জনপ্রিয়তা দেখে সমগ্রভাবে নাট্য-শিল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধা জাগল উইলেমের মনে। লার্তেস ও ফিলিনাকে বলল উইলেম, জনগণের কাছ থেকে এই বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভকরা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? সত্যিকারের প্রতিভাশালী অভিনেতার মর্যাদা দিতে মানুষ জানে।

উইলেমের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারল না লার্তেস। লার্তেস ও ফিলিনা দুজনেই তাই চুপ করে রইল।

ফিলিনা আর মিগনন দুজনেই বেশ একটা গভীর ছাপ ফেলেছিল উইলেমের মনে। ওদের দুজনের কাউকে ছেড়ে যেতে মন সরছিল না তার। তাই যাই যাই বা উঠি উঠি করেও যেতে পারছিল না। তাই কাজের অজুহাত দেখিয়ে আরো কিছুদিন রয়ে গেল হোটেলটায়। লার্তেস ও ফিলিনার সাহচর্যে দিনগুলো তার কোন দিকে কেটে যাচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ একদিন মেলিনা আর তার নবপরিণীতা স্ত্রী এসে হাজির হলো সেই হোটেলটায়। মেয়েটির বাবাকে বলে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা উইলেমই করে দেয়। বিয়ের পর ওদের ঘরে জায়গা দিতে রাজী হয়নি মেয়ের বাপ। তাই তারা কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। মেলিনা ভাল অভিনেতা বলে ভাল থিয়েটারের দলের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। কার

কাছে এই ধরনের এক থিয়েটারের দলের সন্ধান পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে ওরা।

উইলেম লার্তেস ও ফিলিনার সঙ্গে মেলিনাদের পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, ওরা দুজনেই সুযোগ্য অভিনেতা। কিন্তু ওদের তেমন পছন্দ করল না লার্তেস ও ফিলিনা। বরং ওদের মনে হলো ওদের তিনজনের মিলিত সাহচর্যে কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। তার মাঝে কোথা হতে হঠাৎ একটা বাধা এসে জুটল।

মেলিনা কিন্তু যে কাজের জন্য সে এখানে এসেছে তার কথা একবারও ভুলে যায়নি। সে শুনেছে এখানে একটা থিয়েটারের দল ছিল। সে দলের পোষাকগুলো এখনো আছে। শুধু কিছু টাকা হলেই একটা দল নূতন করে খোলা যায়।

একদিন উইলেমকে সঙ্গে করে পোষাকগুলো দেখতে গেল মেলিনা। একটা ভাল থিয়েটার দলে যা যা পোষাক দরকার তা সব আছে। পোষাকগুলো একটা ঘরের মধ্যে দেখে নূতন করে তার অবদমিত নাট্যপ্রীতি হঠাৎ জেগে উঠল উইলেমের মনে। মেলিনা বলল, এই সব দামী পোষাক পাওয়া ভাগ্যের কথা। শুধু দুশো ক্রাউন হলেই দলটা চালু করা যায়। মেলিনা লার্তেস ও ফিলিনাকেও দলে নিতে চাইল। তারপর উইলেমের কাছ থেকে টাকা চাইল। মেলিনা প্রস্তাব দিল উইলেম টাকাটা দিয়ে দলের মালিক হতে পারে। ওরা অভিনেতা হিসাবে তার অধীনেই কাজ করবে।

উইলেম বলল, সে বাড়ি ফিরে গিয়ে কথাটা ভেবে দেখবে। বাড়ি না গিয়ে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু মেলিনা বারবার টাকার জন্য চাপ দিতে থাকায় সে তার বন্ধু ওয়ার্নারকে সব কথা জানিয়ে একটা চিঠি দিল।

এদিকে মিগননের প্রতি দিনে দিনে মায়াটা বেড়ে যাচ্ছিল উইলেমের। মেয়েটা অদ্ভূত ছটফটে আর চঞ্চল। কিন্তু খুব ভোরে ওঠে। সব কাজ ঠিকমত করে। রাত্রে একটা ঘরে মেঝের উপর শোয়। কিন্তু কোন বিছানা নেয় না। অনেক করে বলা সত্বেও নেয় না।

সেদিন হোটেলের বসার ঘরে ওরা তিনজনে বসেছিল এমন সময় একজন বৃদ্ধ দুটি তরুণীকে নিয়ে হোটেলে এসে উঠলেন। হোটেলে কে কখন নূতন লোক আসছে সেদিকে ফিলিনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সব সময়। একটু সুযোগ পেলেই লোকের পিছনে লাগতে ছাড়ত না। আবার এক মুহূর্তে মানুষকে আপন করে নিতেও পারত।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পোষাক-আশাকের মধ্যে কিছু দৈন্যের ছাপ ছিল। অথচ তাঁকে দেখে বেশ বিদগ্ধজন বলেও মনে হচ্ছিল। তাঁকে দেখে উইলেম কিন্তু এক নজরেই চিনে ফেলল। সে তাদের শহরে অতীতে অনেকবার মঞ্চে মেরিয়ানার সঙ্গে অভিনয় করতে দেখেছে ভদ্রলোককে। তিনি মেরিয়ানাকে অভিনয় করতেও শেখান। বহুদিন পর ভদ্রলোককে দেখে মেরিয়ানার ভুলে যাওয়া কথাগুলো আবার মনে পড়ল উইলেমের!

ফিলিনা তার বালকভৃত্যকে ডেকে বলল, আমাদের খাবার টেবিল সাজাও, এঁদের নিয়ে আমরা একসঙ্গে খাব। কিন্তু ফ্রেডারিক রেগে গিয়ে বলল, আমি শুধু আপনার কাজ করার জন্যই নিযুক্ত। আর পাঁচজনের জন্য আমি খাটতে পারব না।

ফিলিনা তখন রেগে গিয়ে বলল, তাহলে তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। তুমি যেতে পার।

ফ্রেডারিক তৎক্ষণাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল। উইলেম সঙ্গে সঙ্গে মিগননকে ডেকে বলল, এই ভদ্রমহিলা যা যা বলবেন সব শুনবে।

খাবার সময় উইলেম কিন্তু বেশী কথা বলল না। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পানে। সে শুধু ভাবছিল একটুখানি সুযোগের কথা। একটু সুযোগ পেলেই বৃদ্ধকে কোথাও আড়ালে নির্জনে নিয়ে গিয়ে মেরিয়ানার কথা জিজ্ঞাসা করবে। মেরিয়ানা এখন কোথায় কি করছে তা জানতে ইচ্ছা করছে তার। এ ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল আর অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে তার মনে।

খাওয়ার পর বৃদ্ধকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে বার হলো উইলেম। একথা সেকথার পর মেরিয়ানার কথাটা তুলল সে। সে এখন কি করছে কোথায় আছে তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন কি না এই সব প্রশ্ন একের পর তুলে ধরল সে বৃদ্ধের কাছে।

প্রশ্ন শুনে বিরক্তির সঙ্গে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন বৃদ্ধ। বললেন, ঐ ঘৃণ্য মেয়েটার কথা আর তুলবেন না মশাই। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমি ওর কথা আর কখনো ভাবব না।

উইলেম একবার ভাবল এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দেবে। কিন্তু বৃদ্ধ অত সহজে থামবেন না। তাঁর আবেগ উথলে উঠেছে অন্তরে। তিনি তাঁর সব কথা বলবেন। তিনি বললেন, তার সঙ্গে একদিন আমার একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এটা ভাবতেও এখন লজ্জাবোধ হয় আমার। আপনি যদি কে চেনেন

তাহলে কেন একথা বলছি তার মানেটা বুঝতে পারবেন। প্রথমে ত মেয়েটাকে ভালই লেগেছিল। দেখতে সুন্দরী, স্বভাবও নম্র বিনয়ী, তার আচরণ ভাল। কিন্তু ওসব উপরকার ব্যাপার। তখন বুঝতেই পারিনি মেয়েটা এতদূর অবিবেচক এবং অকৃতজ্ঞ হতে পারে।

হঠাৎ বৃদ্ধের চোখে জল এল। তা দেখে ব্যস্ত ও বিব্রত হয়ে পড়ল উইলেম। তবে কি কোন খারাপ খবর আছে? খবর যাই হোক সব জানতে চায় উইলেম। সে জিজ্ঞাসা করল, কি হলো? আপনি সব কিছু বলে যান। আমি শুনতে চাই। কিছুই লুকোবেন না।

বৃদ্ধ বললেন, বলার আর কীই বা আছে। আমি তার জন্য যে মনোবেদনা লাভ করেছি তা ক্ষমার অতীত। অথচ একদিন মেয়েটা আমাকে বিশ্বাস করত। আমার কথা মান্য করে চলত। আমার স্ত্রী তখন বেঁচে ছিল। আমি তাকে আপন মেয়ের মত স্নেহ করতাম। আমি তাকে আমার নিজের বাড়িতে নিজের মেয়ের মত রাখার এক পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রী হঠাৎ মারা যেতেই সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

আজ হতে বছর তিনেক আগে যখন আমি আপনাদের শহর ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করি তখন এক বিষাদময় ভাবান্তর লক্ষ্য করি মেরিয়ানার মধ্যে। লক্ষ্য করি সে সন্তানসম্ভবা। সে নিজেও তা স্বীকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের ম্যানেজার তাকে অভিনয়ের কাজ থেকে বরখাস্ত করবে এই ভেবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। পরে দেখা যায় ম্যানেজার কোনভাবে কথাটা জানতে পেরে সত্যি সত্যিই তাকে বরখাস্ত করে। তারপর আমি শহর ছেড়ে চলে আসি।

বৃদ্ধের প্রতি মেরিয়ানা কি অন্যায় করেছে এবং তার প্রকৃত দোষ কোথায় বৃদ্ধ তা বললেন না। তাঁর বলা এত কথার মাঝে কোথাও তা পাওয়া গেল না। উল্টে তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে শত দোষারোপ এবং কটূক্তি সত্ত্বেও মেরিয়ানার প্রতি তাঁর স্নেহশীল আসক্তি আর অনুকম্পার ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধের সব কথা শুনে মেরিয়ানার সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্কের প্রসঙ্গটা আবার উঠে এল তার মনের উপর। বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজখবর নেবার এক অদম্য আগ্রহ জাগল সঙ্গে সঙ্গে। গভীর রাত্রিতে শোবার ঘরে ঢুকে উইলেম স্পষ্ট বুঝতে পারল আজ রাত্রে ঘুম আসবে না তার চোখে। এমন সময় হঠাৎ মিগনন এসে একটা প্রার্থনা জানাল তার কাছে। এখন মিগননই তার একমাত্র সান্ত্বনা। মিগননের আনুগত্য আর সরলতার তুলনা হয় না।

মেয়েটাকে দারুণ ভাল লাগে তার। তার প্রতি অন্তহীন মমতা জাগে অন্তরে।

মিগনন বলল, আজ সে সেই ডিমের নাচ দেখাবে তাকে যে নাচ না দেখাবার জন্য ম্যানেজার তাকে একদিন নির্মমভাবে প্রহার করে এবং দল ছাড়তে হয় তাকে। তবে এ ঘরে আর কেউ থাকবে না।

খুশির সঙ্গে রাজী হলো উইলেম। একটানা ভাবনা চিন্তা হতে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবে, পাবে এক মিষ্টি বৈচিত্র্যের আস্বাদ। প্রথমে বাইরে থেকে একটা কার্পেট বয়ে আনল মিগনন। তারপরে সেটা ঘরের মেঝের উপর পেতে দিল। তার চার কোণে চারটা বাতি জ্বেলে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর একজন বেহালাদারকে ডেকে এনে ঘরের এক কোণে বসিয়ে দিল। এর পর আনল এক ঝুরি ডিম। ডিমগুলো বার করে সারা কার্পেটের সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে রাখল যাতে একটি ডিম থেকে আর একটি ডিমের মাঝে ফাঁক থাকে এবং একটি পা রা‍া যায়। ডিম সাজিয়ে রাখার পর কাপড় দিয়ে চোখ দুটো বেঁধে দিল মিগনন।

সব প্রস্তুতিশেষে নাচ শুরু করল মিগনন। সে এক আশ্চর্য নাচ। বেহালার ঝঙ্কারের তালে তালে মিগনন যখন পা ফেলে ফেলে নেচে চলেছিল তখন প্রতি মুহূর্তে উইলেমের মনে হচ্ছিল এই বুঝি বা ডিমের গায়ে তার পা লেগে যাবে অথচ একটা ডিমের সঙ্গে অন্য ডিমের ঠোকাঠুকি হবে। কিন্তু একটি ডিমের গায়ে একটিবারের জন্য তার পা লাগল না। চোখ বাঁধা থাকলেও এমনভাবে পা ফেলছিল মিগনন আর সেই সতর্কিত প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে ভয়ঙ্কর অথচ মধুর একটা ছন্দ ছিল যা না দেখলে বা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বেহালার সুরঝঙ্কার মিগননের পায়ের সেই অবিশ্বাস্য ও একাধারে ভীষণ সুন্দর ছন্দটাকে মূর্ত করে তুলছিল।

নাচের শেষের দিকে পায়ে করে একে একে সব ডিমগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে রাখল মিগনন অভ্রান্তভাবে। তারপর নিজের হাতে চোখের বাঁধনটা খুলে দিয়ে প্রথাগত ভঙ্গিতে মাথাটা নত করল উইলেমের সামনে। অবশেষে আবার ডিমের ঝুরি আর কার্পেটটা গুটিয়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য তৈরি হলো। উইলেম খুশি হয়ে বলল, আমি তোমার নাচ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি মিগনন। আমি তোমাকে একটা পোষাক করিয়ে দেব।

মিগনন তখন বলল, পোষাকটা যেন আপনার হ্যাটের রঙের মত হয়। এখন আপনার কিছু দরকার আছে?

উইলেম বলল, না, তুমি শোওগে।

বেহালাবাদক উইলেমের কাছে এসে বলল, ও অনেকদিন ধরে আমাকে এই বাজনার কথা বলছে। আমার পারিশ্রমিকও দিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি নিইনি। আমি প্রথমে এ নাচের বাজনা জানতাম না। ওই আমাকে এর সুর শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে।

উইলেম বলল, এ নাচের কথা সেদিন প্রথমে শোনার পর থেকে দেখার ইচ্ছা হচ্ছিল। আজ তা দেখে প্রচুর আনন্দ পেলাম।

যাই হোক, রাতটা কেটে গেল উইলেমের। দু-একবার মেরিয়ানার কথাটা মনে এলেও মোটের উপর ঘুম হয়েছিল। সকাল হতেই মিগননের ডাকে ঘুম ভাঙল। দর্জিকে সঙ্গে করে ডেকে এনেছে মিগনন। তার পোষাকের কাপড়ও পছন্দ করে এনেছে দর্জির মারফৎ। আকাশী-নীল রংটা খুব পছন্দ মিগননের। অথচ প্রেমের ব্যাপারে ঘা খাবার পর থেকে একমাত্র ধূসর রং ছাড়া আর কোন রং পছন্দ হয় না উইলেমের।

কিছুটা বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিনা ও লার্তেস দুজনে মিলে আবার এক নূতন জায়গায় বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করল। এবার ওরা নৌকোয় করে যাবে। এক একদিন এক এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে সেখানে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে সবাই মিলে খাওয়ার মধ্যে সত্যিই এক আনন্দ আছে যা ঘরের মধ্যে পাওয়া যায় না।

সানন্দে রাজী হয়ে গেল উইলেম। ওদের সঙ্গে সেই বৃদ্ধ আর মেলিনা-দম্পতিও আছে। আজ ওরা নদীপথে নৌকোয় করে বেশ কিছুটা যাবার পর নদীর ধারে কোন এক মনোমত জায়গায় নেমে বসবে ও খাবে।

মোটামুটি ওরা সবাই অভিনেতা। লার্তেস ও ফিলিনা, মেলিনা, বৃদ্ধ—এরা সবাই পেশাদার অভিনেতা। উইলেম পেশাদার অভিনেতা না হলেও নাট্যকার এবং অভিনয় বোঝে। ফিলিনা নৌকোতে উঠেই একটা প্রস্তাব করল, ওরা মুখে মুখে এই নৌকোয় একটা নাটকের অভিনয় করবে। এমন সময় নদীর এক ঘাট থেকে এক যাজক এসে ওদের নৌকোয় উঠল। তাকেও ওরা দলে টেনে নিল। সব মিলিয়ে দৈনন্দিন কতকগুলো বাস্তব ঘটনা নিয়ে নাটক বেশই জমে উঠল। কারণ ওরা প্রত্যেকেই অভিনেতা। ওদের সহজাত অভিনয় প্রতিভার জোরে একজনের সংলাপ শেষ হতে না হতে আপনা থেকে সংলাপের কথা এসে যাচ্ছিল ওদের মুখে।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে মাঝি নদীর কূলে এক জায়গায় নৌকো ভেড়াল। ওরা নেমে খাওয়া সেরে নিল সেখানে। তারপর কিছুক্ষণ এখানে সেখানে বেড়াল। উইলেম সেই যাজকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কিন্তু ফিরে যাবার জন্য রওনা হবার সময় সেই যাজককে আর কোথাও পাওয়া গেল না। মেলিনার স্ত্রী বলল, এটা অভদ্রতা। যাবার সময় আমাদের কাছ থেকে ভদ্রভাবে বিদায় নিতে পারত।

দুটো ঘোড়ার গাড়িতে করে ওরা রওনা হলো। ফেরার পথে আর নৌকায় করে গেল না। ফিলিনা ও মেলিনার স্ত্রী উইলেমের উল্টো দিকে বসল। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল ফিলিনা। গান গেয়ে সারা পথটা কাটাল সে।

মেরিয়ানার সঙ্গে তার প্রেমসম্পর্কটা ছিন্ন হওয়ার পর উইলেম নারীদের প্রতি খুব সতর্ক হয়ে উঠেছিল মনে মনে। প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোন নারীর বাহু-বন্ধনে ধরা দেবে না। তার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে নারীমাত্র চটুল প্রেমাভিনয়ে সিদ্ধ এক একটি ছলনাময়ী। তাই যাতে কোন ছলনাময়ীর বিলাসকলার কবলে না পড়ে তার জন্য সদাজাগ্রত থাকত সব সময়। কোন নারীর প্রতি কখনো কোন কামনা জাগলেও সে কামনাকে ব্যক্ত করত না কখনো বাইরে। বুকে চাবি দিয়ে ভরে রাখত সেই অব্যক্ত কামনাকে।

এমন সময় ফিলিনা এল তার জীবনে। গানে গল্পে, অভিনয়ে হাসিতে হুল্লোড়ে সব সময় ভরে দিতে লাগল তার মনটাকে। পান্থশালার এক অচেনা মেয়ে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে তার মনটাকে একথা কখনো ভাবতে পারেনি উইলেম। মেরিয়ানার আঘাত, তার অভাব ও বিচ্ছেদ যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল তার মনে সে শূন্যতার অনেকখানি আপনা থেকে পূরণ করে দিল ফিলিনা। অথচ প্রতিদানে কিছুই চাইল না তার কাছ থেকে। এখানে আসার প্রথম দিনে ফিলিনা তার ঘরে তাকে যে সব প্রসাধনদ্রব্য দিয়েছিল ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে তার জন্য তাকে একটা উপহার দেবে বলেছিল উইলেম। কিন্তু সে উপহার আজও দেওয়া হয়নি।

হোটেলে ফিরে এসে সবাই উঠল উইলেমের ঘরে। কারণ তার ঘরটাই বেশ গোছাল অবস্থায় ছিল। বৃদ্ধের কাছে একটা নাটকের বই ছিল। ওরা এসেই সেই নাটক থেকে অভিনয় করতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠেই উইলেম শুনল গতকাল লার্তেস তার যে ধার করা

ঘোড়াটা করে বেড়ানোর জায়গা থেকে আসছিল সেটা পথে পড়ে যায়। লার্তেস ঘোড়ায় চড়তে বা চালাতে ভাল জানে না। ফলে পড়ে গিয়ে ঘোড়াটা এমন আঘাত পায় যে তার সেরে উঠতে অনেক সময় লাগবে। ঘোড়াটা হোটেলের মালিকের কাছ থেকে ধার করা। উইলেম ঘোড়ার মালিককে জানিয়ে দিল তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সে দেবে।

হোটেলের মালিক তার ঘর থেকে চলে যেতেই ফিলিনার ঘরের দিকে তার চোখ পড়ল। দেখল জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ফিলিনা তাকে নমস্কার করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই প্রতিশ্রুত উপহারের কথাটা মনে পড়ে গেল।

একটু পরে দোকানে গিয়ে উপহার কিনে আনে উইলেম। আনে দুটো কানের দুল, একটা টুপী, একটা নেকটাই আর কিছু প্রসাধনদ্রব্য। এই উপহারগুলো যখন ফিলিনার হাতে তুলে দেয় উইলেম তখন তা মাদাম মেলিনা দেখে। দেখে ঈর্ষাবোধ করে। ভাবে ফিলিনার প্রতি দুর্বলতা আছে উইলেমের। সে কথা মাদাম মেলিনা ঠাট্টার ছলে প্রকাশ করলে উইলেম বলল, যে মেয়ের সব কিছু আমি জানি, যার জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার সব জানা তার প্রতি কোন ভালবাসাই অনুভব করি না। আসলে ফিলিনাকে দেওয়া আমার এই উপহার বন্ধুত্ব আর সৌজন্যের পরিচায়ক। তবু কিন্তু এ যুক্তিতে সন্তুষ্ট হলো না মাদাম মেলিনা।

হোটেলের মালিক একজন অচেনা বৃদ্ধ গায়ককে নিয়ে এল। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি একজন ভাল গায়ক। আপনাদের কাজে লাগবে। এর গান শুনে দেখতে পারেন।

মেলিনা বলল, উনি যেতে পারেন। আমাদের এত সময় নেই।

কিন্তু ফিলিনা জেদ ধরল, ওরা গান শুনবেই।

প্রথমে বীণা বাজনা শুরু করল বৃদ্ধ। অপূর্ব তার সুরঝঙ্কার। মুগ্ধ হয়ে গেল উপস্থিত সকলে। তখন বৃদ্ধকে উইলেম অনুরোধ করল, আপনি এই বাজনার সঙ্গে একটা গান করুন। বাণীহীন সুর আকাশপথে উড্ডীয়মান অধরা পাখির মত। কিন্তু বাণীময় সঙ্গীতের সুর শুনে মনে হয় আকাশগামী অধরা পাখিটা হাতে এসে ধরা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার মধ্যেও আকাশপিপাসা জাগিয়ে আমাকেও কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি বড় গান গাইল বৃদ্ধ। বেশ ভরাট মিষ্টি গলা। সে গানের বিষয়বস্তু ছিল মানবতা, ভালবাসা, দেশপ্রেম প্রভৃতি কতক-

গুলি গুণের জয়গান। তার গলাটা এমনি মিষ্টি ও ভরাট যে সে যাই গাইছিল সকলের শুনতে ভাল লাগছিল। তার গান থামলে ফিলিনা বলল, আপনি সেই 'রাখাল তাকে সাজাও' এই গানের সুরটা বাজাতে পারবেন? তাহলে আমি গানটা গাইব।

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বীণাটা তুলে বাজাতে লাগল। তার তালে তালে গান গাইতে লাগল ফিলিনা। ফিলিনা ভালই গাইল। তার গান শেষ হলে বৃদ্ধকে মদ দিয়ে আপ্যায়িত করা হলো। উইলেম উঠে গিয়ে বৃদ্ধের হাতে একটা মুদ্রা দিল তার পারিশ্রমিক হিসাবে। বলল, সন্ধ্যায় আবার আপনার গান শোনা যাবে। তার দেখাদেখি অন্যান্য সকলেও কিছু কিছু দিল। তবে উইলেমই দিল সবচেয়ে বেশী।

উইলেম যাবার আগে ফিলিনাকে বলল, তোমার গানটা কাব্যিক বা নীতি-বাগীশ না হলেও মঞ্চে এইভাবে গাইলে প্রচুর প্রশংসা পাবে দর্শকদের কাছ থেকে। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাজনার হাত ও গানের গলা অনেক শিল্পীকেই হার মানিয়ে দেবে। হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে ওর গানের মধ্যে অনেক নাট্য-উপাদান আছে। যেগুলো গীতিনাট্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মেলিনা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, আমাদের মত শিল্পীকে উনি লজ্জা দিতে পারবেন কি না জানি না। তবে একটা বিষয়ে সত্যিই উনি আমাদের হারিয়ে দেবেন। সেটা হচ্ছে নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার বা স্বার্থপূরণের কৌশল। তুদিন পরে কি করে আমাদের খাবার জুটবে বলে আমরা যখন ভাবছি তখন উনি আমাদের খাবারে ভাগ বসাচ্ছেন। যে পয়সা দিয়ে আমরা চাকরির খোঁজ করে বেড়াবো উনি কৌশলে তাতেও তার ভাগ নিচ্ছেন।

কথাটা শুনে খুবই তুঃখিত হলো উইলেম। মনে হলো এটা যেন তাকেই লক্ষ্য করে বলা। কারণ সে আর ফিলিনাই বৃদ্ধের প্রতি বেশী শ্রদ্ধাশীল। এর পর উইলেমকে সরাসরি আক্রমণ করল মেলিনা। বলল, আজ একপক্ষকাল হয়ে গেল। থিয়েটারের পোষাক বাছাই করে বন্ধক দেওয়া আছে, আমরাও এখানে আশা করে বসে আছি অথচ আপনি টাকা দিলেন না। অথচ টাকার জন্য বাড়িও যাই যাই করে গেলেন না। আপনি টাকা দিলে এতদিন আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারতাম। অথচ আপনি বাজে খরচ ঠিকই করে যাচ্ছেন।

এবার রেগে গেল উইলেম। বলল, সে এই ধরনের অকৃতজ্ঞ এবং হৃদয়হীন

লোকদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না।

হোটেলের বাইরের ঘরে একা বসেছিল উইলেম। এমন সময় ফিলিনা গান করতে করতে এসে তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে আবদারের ভঙ্গিতে বলল, মেলিনার জন্য আমরা এ হোটেলে আর থাকব না। কাছাকাছি অন্য এক হোটেলে উঠে যাব। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। তাছাড়া তোমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে না।

উইলেম বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ ফিলিনা ? আমার এখানে থাকা চলবে না। আমাকে এবার বাড়ি যেতেই হবে। আমাকে ছেড়ে দাও।

ফিলিনা তাকে আরও জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে করতে বলল, তাহলে ত কিছুতেই ছাড়ব না।

উইলেম বলল, কি করছ ? লোক রয়েছে যে।

সত্যিই তাদের কাণ্ড দেখে রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দু চারজন লোক জড়ো হয়ে দেখছিল। ফিলিনা তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বকে উঠতেই তারা চলে গেল। লজ্জার ভয়ে আর জোর করার চেষ্টা না করে নীরবে শান্তশিষ্ট স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে লাগল উইলেম। ফিলিনা বলল, আগে কথা দাও এখন চলে যাবে না, তবে ছাড়ব।

অবশেষে প্রতিশ্রুতি দিল উইলেম। সে আগামী বা তার পরের দিন বা তার পরের দিন বাড়ি যাবে না।

কথা পেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিলিনা। দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, আমি একবার আমার ঘরে যাচ্ছি, আমার দরকার। ফিরে এসে যেন আমি তোমাকে এখানেই দেখি।

ফিলিনা চলে গেল। উইলেম কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল। কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যেতে লাগল ফিলিনার ঘরের দিকে। এক রহস্যময় দুর্বোধ্য প্রবৃত্তির তাড়নায় সে যেন না গিয়ে পারল না। কিন্তু ফিলিনার ঘরের কাছে যেতেই সে এসে ক্ষমা চাইল তার কাছে। বলল, রাগের মাথায় যা তা বলে ফেলেছি, কিছু মনে করবেন না। আমার হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে, নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণের ক্ষমতা নেই। তার উপর সন্তান আসছে। তাই কোন আনন্দের আসর বা উৎসব আমার ভাল লাগে না, সব সময় চাকরি বা কাজ কারবারের কথা ভাবি। প্রাণ খুলে হাসতে বা আনন্দ উপভোগ করতে পারি না আপনাদের মত। আমাকে ক্ষমা করবেন।

ফিলিনার কথা শুনে শান্ত হলো উইলেম। বলল, ঠিক আছে আজই রাত্রে না হয় কাল সকালে তোমাকে টাকা দেব আমি।

হঠাৎ ফিলিনার সেই বালকভৃত্য ফ্রেডারিককে ফিরে আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে নিজের ঘরে চলে এল উইলেম। এসে দেখল মিগনন কি লিখছে। মন ভাল থাকলে তার লেখাটা নিয়ে দেখত, তার বিচার করত। কিন্তু আজ কিছু না বলে বিশ্রামের জন্য পোষাকটা খুলতে লাগল। এমন সময় হোটেলের সদর দরজার কাছে চোখ পড়তেই দেখল ঘোড়ায় চেপে কে একজন গণ্যমান্য আগন্তুক এসে হাজির হলো। আর হোটেলের মালিক ব্যস্তভাবে তার দিকে ছুটে গেল।

কৌতূহলের বশে উইলেম তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হোটেল-মালিক বলল, হের স্টলমেস্তার, অবশেষে আমাদের মনে পড়ল ?

আগন্তুক ঘোড়া থেকে না নেমেই বলল, কাউণ্ট তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসছেন। প্রিন্স ভনের সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে দিনকতক থাকবেন তাঁরা।

হোটেল-মালিক বলল, আপনিও থাকলে ভাল হত। ঘর আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

হঠাৎ মনটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল উইলেমের। সে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ বীণাবাদক ও গায়কের সন্ধানে চলে গেল। শুনল সে নাকি একটা অখ্যাত পল্লীতে চলে গেছে। খুঁজে খুঁজে একটা বাড়িতে তার বাজনা শুনতে পেল উইলেম। উইলেমকে দেখে খুশি হয়ে একটি গান স্পষ্ট ভাষায় গাইতে লাগল বৃদ্ধ। গানটার মানে হলো এই যে, যে কোনদিন দুঃখ ভোগ করেনি, যে কোনদিন চোখের জল ফেলেনি সে ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন।

ঈশ্বরই আমাদের পৃথিবীতে নিয়ে আসেন, আমাদের পাপের পথে নিয়ে যান আবার তিনিই অনুতাপের মোচড় দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেন আমাদের অন্তরকে।

প্রথমে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর বৃদ্ধের কাছে সরে গেল উইলেম। গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। চোখে জল আসছিল। রোধ করতে পারছিল না। যে বেদনা হিম হয়ে জমে ছিল এতদিন অন্তরে এই সকরুণ সুরের আঘাতে উত্তাপে তা গলে জল হয়ে বেরিয়ে এল চোখ থেকে।

গান থামলে উইলেমকে বৃদ্ধ বলল, আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার জন্য ওখানে অপেক্ষা করেছিলাম। আপনাকে গান শোনাতে চেয়েছিলাম কিন্তু দেখতে না পেয়ে এখানে চলে আসি।

উইলেম দেখল মেঝের উপর ছোট একটি বিছানায় বসে আছে বৃদ্ধ। এছাড়া আর কোন আসবাব নেই। উইলেমও সেখানে বসে বলল, গান শোনাবার এটাই হলো উপযুক্ত জায়গা। যেখানে অন্য কোন মানুষ নেই সেখানেই আপনার আত্মা ধরা দেবে আপনার কাছে। যে গান আমাকে শোনাতে চেয়েছিলে সেই গান আমাকে শোনাও বন্ধু।

গান শুনে হোটেলে ফিরে এসে উইলেম দেখল মেলিনা একজন উকিল সঙ্গে করে টাকা ধার করতে এসেছে তার কাছে। উইলেম তাকে তিনশো ক্রাউন দিল। মেলিনা তার বিনিময়ে থিয়েটারের মালপত্র সব বন্ধক রাখল তার কাছে। বলল, কাল সকালে সেগুলো তার কাছে নিয়ে আসবে। মেলিনা চলে গেলে হঠাৎ ফ্রেডারিকের চিৎকার শুনে বাইরে গিয়ে দেখল তার সামনে মিগনন অবাক হয়ে দেখছে ফ্রেডারিককে। ফ্রেডারিক পাগলের মত চেঁচাচ্ছে। আসল ঘটনাটা জানতে পারল হোটেলের মালিকের কাছ থেকে। আসল কথা হলো স্টলমেস্তার প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিনার প্রেমে পড়ে গেছে। ফিলিনার কাছে একসঙ্গে খেতে চায়। ফিলিনা ফ্রেডারিককে খাবার টেবিল সাজাতে বলে। ফ্রেডারিক স্টলমেস্তারকে দেখেই রেগে যায়। তার উপর খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে যখন দেখে স্টলমেস্তার ফিলিনার গা ঘেঁষে বসে রয়েছে তখন সে খাবার সমেত একটা প্লেট স্টলমেস্তারের গায়ে ফেলে দেয় আর অসতর্কতার ভান করে। তাতে সে প্রতিশোধের আনন্দে নিজেই হেসে ওঠে আর স্টলমেস্তার তাকে একটা লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দেয়। তাই বাইরে এসে ফ্রেডারিক পাগলের মত শাসাচ্ছে সে দেখে নেবে স্টলমেস্তারকে।

কথাটা শুনে উইলেমের মনেও ঈর্ষা জাগল। জাগল লার্তেসের মনেও। তারা ভাবতেই পারেনি এত সহজে একজন বয়োপ্রবীণ আগন্তুকের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবে ফিলিনা।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলল উইলেম, সে কালই বাড়ি চলে যাবে। আর এখানে একটা দিনও থাকবে না। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে আপন মনে বলে উঠল, আমি চলে যাব। তার বিষাদ দেখে মিগনন কাছে এসে বলল, কি হয়েছে মালিক?

উইলেম বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি রে।

মিগননের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, আমি তাহলে কোথায় যাব মালিক? আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যাবে?

হঠাৎ উইলেমের মনে হলো মিগনন হয়ত পড়ে যাবে। মূর্ছিত হয়ে পড়বে। সে তাকে ধরে নিল। জড়িয়ে ধরল। বারবার বলতে লাগল, আমি তোকে ছাড়ব না। চিরদিন আমার কাছেই রেখে দেব বাছা। আমার মেয়ের মত থাকবি।

হঠাৎ চোখ মেলে মিগনন বলল, তুমি আবার বাবা। আমি তোমার সন্তান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালে উঠে মিগননকে প্রথমে দেখতে পেল না উইলেম। কিছুক্ষণ পরেই একটা যন্ত্র হাতে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ ঘরে ঢুকল মিগনন। সে গানের বাণী বড় চমৎকার। যেখানে আছে থোকা থোকা ফোটা ফুলে ভর্তি লেমন গাছ, আছে লম্বা লরেল আর ঘনসন্নিবিষ্ট মার্টেল, যেখানে ঘনকৃষ্ণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনার বরণ কমলালেবু দোল খায় আর অদূরের নীল সমুদ্র থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দুরন্ত বাতাস এসে খেলা করে এই সব গাছদের সবুজ সংসারে, জান কি সে জায়গা কোথায়? জান কি সে দেশ কোন দিকে? হে পিতা, হে আমার পিতা আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই দেশে।

গানের বাণীটা ভাল লাগায় কাগজে টুকে নিল উইলেম।

এদিকে গান শেষ হতেই মেলিনা ডাক দিল দরজার বাইরে। একটু আগে সে টাকা মিটিয়ে দিয়ে থিয়েটারের পোষাকগুলো নিয়ে এসেছে। এবার সে হাতের কাছে যে সব অভিনেতা অভিনেত্রী রয়েছে তাদের দিয়ে চমৎকার একটা দল গড়তে পারে। উইলেমকে জানাবার মত কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না মেলিনা। সে বলল, আপনি আমাকে এই বিপদে সাহায্য করে যে মমতাপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আমি। আমি এবার এখানে আমার যে সব বেকার অভিনেতা বন্ধুরা রয়েছেন তাদের কাজ দিতে পারব। আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন থিয়েটার ও অভিনয়ের প্রতি আমার গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর এ ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছি আমি। আমার স্ত্রী আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেও অভিনয় করবে এবং এর দ্বারা জীবনের চরম আনন্দ আর জনগণের প্রশংসা দুটোই অর্জন করবে। আমিও এখন এটাকে পেশা হিসাবেই নিতে চাই।

মেলিনার কথাগুলো শুনে খুশি হলো উইলেম। দেখল মেলিনার স্বভাবটা বদলে গেছে একেবারে। এখন সে সকলের প্রতি প্রতিটি আচরণে ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উইলেমের কাছ থেকে বেরিয়ে মেলিনা প্রতিটি অভিনেতার সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করতে লাগল। তার দলের যারা আসরে অভিনয় করবে তার সর্তাবলী সব জানিয়ে দিল তাদের। আপাততঃ অবশ্য তাদের বেশী বেতন দিতে পারবে না। কিন্তু দল একবার দাঁড়িয়ে গেলে তারা লাভবান হবে সকলে।

এই সব কথাবার্তা চলতে থাকাকালেই কাউন্ট এসে হাজির। আগের দিন স্টলমেস্তার যে কাউন্টের আগমন ঘোষণা করেছিল সেই কাউন্ট এক গাড়ি মাল আর তার পত্নীকে সঙ্গে করে হোটেলে এসে উঠল। হোটেলে নূতন যারাই আসে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করে ফিলিনা। তার স্বভাবটাই এইরকম। সব সময় হাসিখুশিতে ভরা থাকে যেমন তার মুখটা তেমনি মনেও কোন মান অপমান বোধ নেই। ফিলিনা সোজা কাউন্টপত্নীর কাছে চলে গেল।

কাউন্টপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, কে তুমি ?

কাউন্টপত্নীর গাউনের আঁচলটাকে চুম্বন করে ফিলিনা। সরলভাবে হাসি মুখে বলল, সামান্য এক অভিনেত্রী, আপনার সেবায় সতত প্রস্তুত।

এদিকে কাউন্টের চারদিকেও অন্যান্য অভিনেতারা ভিড় করেছে। এতগুলি অভিনেতাকে একটি হোটেলের মধ্যে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কাউন্ট। স্ত্রীকে বললেন, এরা যদি ফরাসী হত তাহলে এদের দিয়ে রাজপ্রাসাদে একটা নাটক করিয়ে রাজাকে প্রীত করতাম।

কাউন্টপত্নী বললেন, হলেই বা এরা জার্মাণ, এদের দিয়েও করানো যেতে পারে। এদের দলে যখন এত লোক রয়েছে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া ব্যারণ এদের সাহায্য করতে পারেন।

এর পর কাউন্ট একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন এই দলের ম্যানেজার কে, কত জন অভিনেতা আছে। মেলিনা এগিয়ে এসে ম্যানেজার হিসাবে পরিচয় দিল। কাউন্ট তখন তাকে সব অভিনেতাদের জড়ো করতে বললেন এক জায়গায়। তিনি একজন নাট্যসমালোচকও বটেন। তিনি নিজে সবাইকে দেখে অভিনেতাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা আঁচ করে নেবেন। সবশেষে বললেন, তোমরা কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে চাও তা জানাবে।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের সকলকে দেখার পর কাউন্ট সবচেয়ে খুশি হলেন

সেই বৃদ্ধ অভিনেতাকে দেখে যে দুটি মেয়ে নিয়ে একদিন এসে ওঠে এই হোটেলে এবং যে একদিন মেরিয়ানার সঙ্গে উইলেমদের শহরে এক মঞ্চে অভিনয় করত। অথচ মেলিনা তাকে কাউন্টের সামনে হাজির করেনি। সে ঘরের এক কোণে বসেছিল। কাউন্ট বললেন, এ যে কোন অভিনয় করতে পারবে।

বৃদ্ধ আধ ময়লা আধ ছেঁড়া পোষাক পরে মাথা নত করে কাউণ্টের সামনে এসে দাঁড়াল। কাউন্ট বললেন, হাস্যরসের ভূমিকা ত বটেই তাছাড়া যে কোন ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্যতা এর আছে। আমরা চোখ মুখ দেখলেই বুঝতে পারি।

ফিলিনা এদিকে উইলেমকে তার উপরকার ঘর থেকে জোর করে নিয়ে এল কাউন্টপত্নীর কাছে। তাঁর কথা কাউন্টপত্নীর কাছে আগেই বলেছিল ফিলিনা। বলেছিল, আর একজন শিক্ষিত ও সুন্দর যুবক আছে আমাদের দলে। সে নাটক ও কবিতা লিখতে পারে।

কাউন্টপত্নীকে নমস্কার করে দাঁড়াল উইলেম। তার পানে গভীর আগ্রহ ভরে তাকিয়ে লজ্জায় মাথাটা নত করলেন কাউন্টপত্নী। কাউন্টপত্নীকে দেখে ভাল লাগল উইলেমের। কাউন্টপত্নী বয়সে যুবতী এবং সুন্দরী। তাঁর চোখে মুখে চমৎকার একটা মার্জিত ভাব।

এমন সময় কাউন্ট ফিরে এলে উইলেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কাউন্ট তার প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কাউন্টপত্নী উইলেমের পানে তাকিয়ে বললেন, আবার আমাদের দেখা হবে। এখন চলি।

তারপর ফিলিনাকে কাউন্টপত্নী বললেন, তুমি কিন্তু আবার আমার কাছে আসবে মেয়ে। তবে পোষাকটা একটু ভাল পরবে।

ফিলিনা বলল, আমার এর থেকে ভাল পোষাক নেই।

কাউন্টপত্নী তখন সঙ্গে তাঁর প্রতীক্ষমানা এক সহচরীকে একটা সিল্কের গলবন্ধনী আর একটা টুপী আনতে বললেন। তারপর নিজের হাতে তা ফিলিনাকে পরিয়ে দিলেন।

কাউন্টের কথায় রাজপ্রাসাদে এক নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য এক ব্যারণ বা সামন্ত এসে কথা বলতে লাগল মেলিনার সঙ্গে। মেলিনা এইটার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল। তার প্রত্যাশা অনেক এ বিষয়ে। রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠান করার জন্য বায়না হলেই তার দল জাতে উঠে

যাবে। প্রথম কথা ওই অনুষ্ঠানের জন্য যে টাকা সে পাবে তাতে উইলেমের ঋণ অর্ধেক শোধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, শহরে তাদের দলের নামটা ছড়িয়ে যাবে এর ফলে।

যাই হোক, প্রথম কথা হলো নাটক বাছাই। তারপর অভিনেতাদের মধ্যে অভিনয়ের ভূমিকা বিতরণ। ব্যারণ আসার সঙ্গে সঙ্গে মেলিনা বলল, আমাদের দলের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী উইলেম খুব ভাল কাব্যনাটক লিখতে পারেন। ব্যারণ তা দেখতে চাইলেন। উইলেমের লেখা মোটামুটি পছন্দ হলো ব্যারণের। ব্যারণ উইলেমকে প্রাসাদে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে গেলে কাউন্ট-পত্নীর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে মনে মনে উল্লসিত হলো উইলেম। মেলিনারও গর্বে ভরে গেল বুকটা।

লার্তেসকে দেওয়া হলো প্রেমিকার ভূমিকা। ফিলিনাকে দেওয়া হলো প্রেমিকার দাসীর ভূমিকা। বৃদ্ধকে দেওয়া হলো হাস্যরসের এক ভূমিকা, তাঁর মেয়েদের দেওয়া হলো প্রেমিকার ভূমিকা। মেলিনা নিজে নিল বীরত্বব্যঞ্জক এক ভূমিকা। উইলেম কিছুই নিল না। মেলিনা বারবার তাকে কোন না ভূমিকা গ্রহণের জন্য জ্বালাতন করতে লাগল। উইলেম কোন ভূমিকা নিল না। তা না নিয়ে সে নাটকের দিকে মন দিল। এরপর প্রস্তুতির পালা। রীতিমতভাবে রিহার্সাল দিতে হবে। দিনের পর দিন চলতে লাগল রিহার্সাল।

অবশেষে একদিন প্রাসাদে যাবার খবর এল। গোটা দলটাকে রাজপ্রাসাদে গিয়ে দিনকতক থাকতে হবে। ওরা সেখানে গেলে প্রাসাদের সীমানার ভেতরেই কোন এক সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হবে। ব্যারণ কথা দিলেন সেখানে কাউন্ট ও কাউন্টপত্নী আছেন। ওরা গেলে থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিন্তু যাবার দিন সকাল থেকে বৃষ্টি নামল। তবু দলের সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। দু' তিনটে ঘোড়ার গাড়িতে সব মালপত্র তুলে দেওয়া হলে ওরা সবাই চেপে বসল। হোটেলের মালিকও গেল ওদের সঙ্গে। বিকালের দিকে গাড়ি ছাড়ল। বন উপত্যকা ও গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল গাড়িগুলো বৃষ্টির জল আর কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে। সন্ধ্যে হতেই একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে যেতে যেতে প্রাসাদের আলো দেখা গেল দূর থেকে। যাত্রীরা আশ্বস্ত হলো। সকলেই ভাবতে লাগল ঐ প্রাসাদের আলোকোজ্জ্বল এক একটি

প্রশস্ত কক্ষে তারা পাবে আরামঘন আশ্রয়।

কিন্তু প্রাসাদের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াতেই কেউ কোন খোঁজ খবর নিতে এল না। ওরা গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নামিয়ে বৃষ্টিতে এক রকম ভিজতে লাগল। অনেকক্ষণ পর স্টলমেস্তার আলো নিয়ে এসে মেলিনাকে নিয়ে গেল ভিতরে। তার অনেক পরে একজন লোক আলো হাতে এসে ওদের জন্য একটা ঘর খুলে দিল। সকলেই বাক্স পেটরা নিয়ে সেই ঘরে ঢুকল। পাশাপাশি দুটো বড় ঘর। কিন্তু কোন আসবাব বা বিছানাপত্র নেই। কোন খাবারেরও ব্যবস্থা নেই।

অনেকে অধৈর্য হয়ে উঠল। চেঁচামেচি করতে লাগল। কাউন্টপত্নীর একজন দাসী এসে উইলেমকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু উইলেম রাজী হলো না তাতে। এতগুলি লোককে অসুবিধায় রেখে সে একা সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

অবশেষে প্রায় গভীর রাতে সকলের জন্য খাদ্য পানীয় ও প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র এল। মেয়েরা সবাই একটা ঘরে আলাদা রইল। পুরুষরা রইল অন্য একটা ঘরে। ঠাণ্ডায় ওরা একটা ঘরে আগুন জ্বালাল। কিন্তু ঘরের চিমনিটার মুখ ব্যবহারের অভাবে বন্ধ থাকায় ধোঁয়া বার হলো না। ফলে সব ধোঁয়া ঘরের মধ্যেই ঘুরপাক খেতে লাগল। তাতে ঠাণ্ডার থেকে বেশী কষ্ট হতে লাগল সকলের।

যাই হোক, সকলে খাওয়ার পর মধ্য রাত্রিতে শুয়ে পড়ল। কিন্তু পাশাপাশি শোয়ার জন্য একে অন্যের গায়ে খোঁচা দিয়ে বারবার রসিকতা করতে লাগল। তাতে সকলেরই ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। তবু ভাল। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবটাকে রসিকতার আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাইল। পরদিন কাউন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে একবাক্যে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ তুলল। অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে গেলেন কাউন্ট। কারণ তিনি প্রাসাদের স্টিউয়ার্ডকে তাদের দেখাশোনার সব ভার দিয়ে গিয়েছেন। তাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য থাকা খাওয়ার যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। কিন্তু তারা যথা কর্তব্য পালন না করায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ডেকে ভর্ৎসনা করলেন কাউন্ট। কাউন্টের সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণও এলেন। তিনি গতকাল ঘোড়া থেকে কোথায় পড়ে গিয়েছিলেন বলে পায়ে চোট লেগেছে। তাই খোঁড়াচ্ছিলেন।

কাউন্ট মেলিনাকে সঙ্গে করে এক জায়গায় নিয়ে গেলেন। নাটক মঞ্চস্থ করার জায়গাটা নির্বাচিত হলো। মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

এদিকে দলের ম্যানেজার হিসাবে মেলিনা এক আদেশ জারি করে হাতে লিখে তা টাঙিয়ে দিল ঘরের দেওয়ালে ও দরজার সামনে। তাতে স্পষ্ট লেখা ছিল দলের প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রীদের থেকে পৃথক ভাবে অবস্থান করবে। তারা কোন অবস্থাতেই কারো সঙ্গে অশোভন আচরণ করবে না। যদি কেউ এই নির্দেশ অমান্য করে তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে।

দলের লোক যাই করুক, প্রাসাদের অফিসার বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রায়ই এই নির্দেশ ভঙ্গ করতে লাগল। তারা যখন তখন ঘরে এসে অভিনেত্রীদের সঙ্গে রসিকতা করতে লাগল।

এক সময় ব্যারণ এসে উইলেমকে কাউন্টপত্নীর কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলল। ব্যারণ বলল, আপনার যে যে লেখা কবিতা ভাল লাগে তার কিছু নিয়ে যাবেন কাউন্টপত্নীর কাছে। তাঁকে শোনাবেন। তিনি বড় সমঝদার।

উইলেম রাত্রিতে অনেক ঘেটে কিছু পুরনো লেখা থেকে বাছল। আবার কিছু লিখল নূতন। তারপর ভাল করে নির্বাচন করে পকেটে রেখে দিল। সত্যি সত্যিই এক সময় ডাক পড়ল তার।

অন্দর মহলের একটি ঘরে গিয়ে উইলেম দেখল কাউন্টপত্নীর কাছে ব্যারণ-পত্নী বসে রয়েছে। তার উপর ফিলিনা বসে রয়েছে কাউন্টপত্নীর পায়ের কাছে। ফিলিনা খুব চালাক। সে কাউন্টপত্নীর কাছে কাছেই প্রায় সব সময় থাকে। তাঁকে গান শুনিয়ে হাসির কথা বলে আনন্দ দেয় আর নানারকমের উপহার আদায় করে।

কাউন্টপত্নী উইলেমের দিকে আগ্রহভরে তাকালেন। দু একটা কথা বললেন কিন্তু তার লেখার কথা কিছু বললেন না। উইলেমও তা বার করতে সাহস করল না। করত যদি অনবরত নানা ধরনের লোক আসা যাওয়া না করত। অবশেষে ঘণ্টাখানেক বৃথা অপেক্ষা করার পর চলে গেল উইলেম। কিন্তু কাউন্টপত্নী তার কবিতা না শুনলেও যথাসময়ে তিনি তাঁর দাসকে দিয়ে দুটো উপহার পাঠিয়ে দিলেন উইলেমকে। একটা ছোট পকেট বই ইংল্যাণ্ডের আমদানি, আর একটা ফুলগোঁজা দামী ওয়েস্টকোট। বিরক্তির সঙ্গে সঙ্গে একটু কৃতজ্ঞতা অনুভব না করে পারল না উইলেম।

এদিকে কি ধরনের নাটক মঞ্চস্থ হবে, কিসে খুশি হবেন যুবরাজ তা নিয়ে

বাগ বিতণ্ডা চালাতে লাগলেন কাউণ্ট। যুবরাজের আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই। কাউণ্ট উইলেমকে একটা ভূমিকা লিখতে বললেন প্রথমে। নাটক শুরু হবার আগে একটা দীর্ঘ ভূমিকা থাকবে যা শুনে যুবরাজ যেন খুশি হন। উইলেম কথা বলে বুঝল আসল জীবনের ঘটনার থেকে প্রতীক আর রূপক বেশী ভালবাসেন কাউণ্ট। ব্যারণ এক সময় উইলেমকে বলল, কাউণ্ট যা বলে বলুক। তুমি যে নাটক পছন্দ করো তার গল্পটা একবার কাউণ্টপত্নীকে শুনিয়ে তাঁর মত নিয়ে আসবে। তাহলে আর কিছু ভাবতে হবে না।

ব্যারণপত্নী কাউণ্টপত্নীর সঙ্গে উইলেমের এক গোপন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিল। পিছনের দরজা দিয়ে নিয়ে গেল তাকে। কাউণ্টপত্নীর কাছে তখন মাত্র তাঁর এক বান্ধবী বসে ছিল। তার সামনেই তার নাটকের মূল পরি-কল্পনার কথাটা বলল উইলেম। সুন্দর করে আবেগের সঙ্গে বুঝিয়ে দিল তার আবেদনের কথাটা।

কাহিনী হলো এই যে পাড়াগাঁয়ের এক শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে একদল কৃষক বালক-বালিকা নাচছিল। নাচের শেষে তারা একটা গান গাইল সমবেত কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের এক বৃদ্ধ বীণাবাদক মিগননকে অর্থাৎ এক বালিকাকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করবে। বীণাবাদক বীণা বাজিয়ে শান্তি ও আনন্দের গান গাইবে আর বালিকাটি ডিম সহযোগে এক নাচ দেখাবে। এমন সময় সহসা সামরিক সঙ্গীত শুনে চমকে উঠবে তারা। হঠাৎ একদল সৈনিক এসে হাজির। তারা বালিকাটিকে ধরতে যাবে। বৃদ্ধ গায়ক বাধা দিতে গিয়ে বন্দী হবে। বালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে তারা। এমন সময় আবির্ভাব ঘটবে সামরিক নেতার। এই নেতাই হবে নাটকের নায়ক। সে হবে একই সঙ্গে সামরিক অধিনায়ক এবং কাহিনীর নায়ক। সে এসে সকলের সব অভিযোগের প্রতিকার করবে। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করবে। তার সম্মানার্থে সারা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে এক বিরাট আনন্দোৎসব।

নাটকের কাহিনী শুনে খুশি হলেন কাউণ্টপত্নী। তবে শুধু বললেন, কাউণ্টকে খুশি করার জন্য কিছু রূপক ঢুকিয়ে দেবেন। ব্যারণ পরামর্শ দিল ঐ সামরিক অধিনায়ককে প্রতিহিংসা ও যুদ্ধবিবাদের এক অপদেবতারূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এর পর শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভা এসে তাকে বশীভূত করবে। হঠাৎ উইলেমের মনে পড়ে গেল কাউণ্টের কথাটা। কাউণ্টও এক সময় তাকে বলেছিলেন মিনার্ভাকে নাটকের কোথাও ঢুকিয়ে

দিতে অর্থাৎ তার সম্পর্কে কোন এক প্রাসাদের অবতারণা করতে। যাই হোক ঠিক হলো লার্তেস করবে ঐ সেনাপতি ও নায়কের ভূমিকা। এর পর অন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভূমিকা বুঝিয়ে দিল। কিন্তু সকলে একবাক্যে উইলেমকে কোন একটা ভূমিকা গ্রহণ করতে বলল। অবশেষে সকলের অনুরোধ উপেক্ষা না করে রাজী হলো উইলেম। সে ঠিক করল এক কৃষক নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে সে এবং কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করবে সেই সুযোগে।

কাউণ্টপত্নী মুস্কিলে পড়লেন তাঁর স্বামীকে নিয়ে। কাউণ্ট যে ধরনের নাটক চেয়েছিলেন এ নাটক তা হবে না। তবে তাঁর পছন্দমত কিছু কিছু ঘটনা এবং চরিত্র থাকবে। তখন ব্যারণপত্নী ও জার্ণো নামে এক কর্মচারী বলল, রিহার্সালের সময় বিভিন্ন কাজে ও কথায় এমনভাবে তারা ভুলিয়ে রাখবে কাউণ্টকে যে তিনি ভাল করে পুরো নাটকটার রিহার্সাল দেখতেই পাবেন না।

এ দিকে উইলেমও এক বিপদে পড়ল। মিগনন ডিমের নাচ নাচতে রাজী হচ্ছে না। আসলে সে চায় না উইলেম এইভাবে নাটক নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকুক। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, না বাবা, আমি মঞ্চে নাচতে পারব না। আর তুমিও ওসব ছেড়ে দাও।

অবশেষে যুবরাজ এসে গেলেন। তিনি শুধু দেশের রাষ্ট্রনেতা নন, একজন সদাশয় ব্যক্তি। প্রাসাদদ্বারে এক বিরাট অভ্যর্থনা জানানো হলো তাঁকে। কাউণ্ট এক হুকুম জারি করে বললেন কোন অভিনেতা যেন এককভাবে যুবরাজের সামনে না যায়। তারা সমবেতভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হবে এবং অভিনয় শেষে পরিচিত হবে তাঁর সঙ্গে।

প্রথমে উইলেমের লেখা প্রশস্তি পাঠ করা হলো। খুশি হলেন যুবরাজ। তারপর সন্ধ্যে হতেই আলোকমালায় সুসজ্জিত এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যাওয়া হলো যুবরাজকে। নাটক শুরু হলো। সকলেই আপন আপন সাধ্যমত অভিনয় করল। নাটক শেষে যুবরাজ প্রীত হলেন। তিনি সব অভিনেতাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। বিশেষ করে নাট্যকার উইলেমের সঙ্গে কিছু কথা বললেন।

এরপর রোজ সন্ধ্যের সময় সেই প্রাসাদ-অন্তর্গত প্রেক্ষাগৃহে সেই একই নাটক মঞ্চস্থ করে চলল ওরা। নাটক দেখার জন্য দূর গ্রাম গ্রামান্তর হতে প্রচুর লোক আসতে লাগল। প্রাসাদের অনেক অতিথিও আসতে লাগল। ব্যারণ, কাউণ্ট প্রভৃতির আত্মীয়-স্বজনরা আসতে লাগল বিভিন্ন জায়গা থেকে।

কিন্তু উইলেমের কেবলি মনে হতে লাগল সাধারণ মানুষের ভাল লাগলেও তাদের নাটক বিদগ্ধজনের তেমন ভাল লাগেনি। যুবরাজ একবার করে এসে বসলেও বেশীক্ষণ থাকেন না। তাছাড়া কোন উচ্চশিক্ষিত রসিকজন তাদের নাটক আগ্রহভরে শোনেন না।

তবে উইলেমের একটা ব্যাপার খুব ভাল লাগল। সে লক্ষ্য করল সে যখন মঞ্চে অভিনয় করে বা কবিতা আবৃত্তি করে তখন কাউন্টপত্নী একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না উইলেমের। সে নিজেও যখন অভিনয় করে মঞ্চে কাউন্টপত্নীর মুখপানেই তাকিয়ে থাকে। কাউন্টপত্নীর প্রতি এক আবেগঘন আগ্রহ ও আসক্তি বেড়ে যেতে থাকে উইলেমের। তীক্ষ্ণ গভীর দুটি দৃষ্টির পথ ধরে তাদের দুজনের অন্তর যেন জন্ম সমাজ ও পরিবেশের অনেক দুস্তর ব্যবধান পার হয়ে কাছে এসে পড়ে পরস্পরের।

এদিকে লার্তেসের প্রতি বেশ কিছুটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ব্যারণপত্নী। লার্তেসও ব্যারণপত্নীর প্রতি আসক্ত হয়ে উঠল রীতিমত। একদিন না বুঝে ভুল করে ব্যারণের কাছে তাঁর পত্নীর প্রশংসা করতে থাকে লার্তেস। ব্যারণপত্নী নারীজাতির মধ্যে এক অমূল্য রত্ন, সর্বগুণে ভূষিতা—এই ধরনের কিছু কথা বলল লার্তেস। ভেবেছিল স্ত্রীর প্রশংসা শুনে খুশি হবেন ব্যারণ। কিন্তু তার ফল হলো উল্টো।

লার্তেসের গুণগান শুনে ব্যারণ মৃদু হেসে বললেন, অপরিচিত ব্যক্তিরা যারা ওর সংস্পর্শে আসে তারাই একথা বলে। কত প্রৌঢ় কত যুবক ওর একটুখানি কৃপা পাবার জন্য কত সেবা করে।

কাউন্ট প্রতিদিন সকালে দলের অনেককে ডেকে পাঠাতেন। তাদের অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। তাদের সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। এক একদিন রাত্রিবেলায় খাবার পরও ভোজসভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনেই তাদের ডাকা হত। এতে দলের লোকেরা খুশি হত। তাদের গুরুত্ব বেড়ে গেল।

কাউন্ট উইলেমকে আলাদাভাবে ডেকে একটা কথা বারবার বললেন। বললেন, ফরাসী নাট্যকার রেসিনের লেখা পড়। বই না থাকলে আমি দেব। আমার কাছ থেকে নেবে। আমাদের যুবরাজ নিজে রেসিনের ভক্ত। তাহলে তাঁর অনুগ্রহ পেতে তোমার দেরি হবে না।

কাউণ্টের কথা শুনে রেসিন পড়ল উইলেম। তাঁর নাটকে অভিজাত সমাজের কথাই বেশী। যেন ভিন্ন এক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে। পড়তে সত্যিই ভাল লাগল তার।

কাউণ্ট ও যুবরাজ উভয়েরই প্রিয়পাত্র জার্নো একদিন উইলেমকে বলল ভিন্ন এক কথা। শেকসপীয়ার পড়েছেন?

উইলেম বলল, না, কারণ যখন শেকসপীয়ার জার্মাণিতে খ্যাতি লাভ করে তখন নাট্যজগতের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। আমরা তখন ছোট। তবে শেকসপীয়ার সম্বন্ধে আমি যেটুকু শুনেছি তাতে তো তাঁর নাটক পড়ার কোন উৎসাহ পাইনি। কোন আগ্রহ জাগেনি আমার মনে।

জার্নো বলল, আমি তোমাকে কিন্তু অনুরোধ করব একবার চেষ্টা করে জোর করে শেকসপীয়ারের নাটক পড়তে। দেখবে অদ্ভুত এক রস পাবে তাতে।

এদিকে ব্যারণ দলের লোকদের কাছে আচরণের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করতে লাগলেন। তিনি সেই বৃদ্ধ অভিনেতাকে বেশী পছন্দ করতেন। একদিন তাকে ডেকে একটা কোট উপহার দেন। তাতে দলের অন্যরা ঈর্ষাবোধ করে।

খাওয়া থাকা ও মাইনের সুযোগ সুবিধা নিয়ে দলের লোকেরা ক্রমশই সোচ্চার দাবি জানাতে থাকে। সব ব্যাপারেই একটু বেশী সুবিধা চায় তারা। উইলেম কিন্তু কোন ব্যাপারেই চোখ কান দেয় না। সে একটা ঘরে দিনরাত শেকসপীয়ারের নাটক নিয়ে পড়াশুনা করে। একমাত্র সেই বৃদ্ধ বীণাবাদক ও মিগনন ছাড়া সে ঘরে ঢোকার আর কারো অনুমতি ছিল না। যখন নাটকের অনুষ্ঠান ও রিহার্সাল হত তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসত উইলেম।

একদিন রাত্রিবেলায় চেঁচামেচি শুনে ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল উইলেম। এসে দেখল ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে ভিড় জমে গেছে। তাকে দেখে মারার ব্যবস্থা হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানল সেই বৃদ্ধ হাস্যরসিক অভিনেতা সন্ধ্যের পর যখন ব্যারণের সঙ্গে দেখা করে অন্দরমহল থেকে নিচের তলায় নেমে আসছিল তখন এই চোর ছেলেটা বাইরের থেকে লুকিয়ে প্রাসাদে ঢুকে উপরে আসছিল। ওর কাছে ধাক্কা খেয়ে বৃদ্ধ পড়ে যায়। তার চিৎকারে লোক ছুটে এসে ধরে ফেলে ছেলেটাকে। তারপর কাউণ্টকে খবর দেওয়া হয়। ব্যারণ ও স্টলমেস্তার ছুটে আসে।

উইলেম দেখল, ছেলেটা ফ্রেডারিক। হোটেল থেকে সেদিন স্টলমেস্তারের কাছ থেকে লাথি খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আবার হঠাৎ আজ কোথা থেকে এসে হাজির। ফ্রেডারিককে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এসে ঘটনাটা কি তা জিজ্ঞাসা করল উইলেম। ফ্রেডারিক বলল, সে খোঁজ খবর নিয়ে ফিলিনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বুড়োটার গায়ে ধাক্কা লেগে যায়। তার কোন দোষ নেই। উইলেম স্টলমেস্তার ও কাউন্টকে অনুরোধ করে, ওকে ছেড়ে দিন। আমি চিনি ছেলেটাকে। ফিলিনার কাছে যাচ্ছিল সেকথা গোপন করে গেল উইলেম। ওরা ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। উইলেম তাকে ডাকল।

ফ্রেডারিক সোজা উইলেমের ঘরে চলে গেল।

ফিলিনা আর ব্যারণপত্নী দুজনে মিলে একটা ষড়যন্ত্র খাড়া করল। তারা কিছুদিন ধরে চাইছিল কাউন্টপত্নী আর উইলেম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠুক পরস্পরের সঙ্গে। তারা তাই ঠিক করল একদিন নির্জন ঘরে দুজনের মিলন ঘটাতে হবে।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ পেয়ে গেল ওরা। কাউন্ট শিকারে চলে গেলেন। বললেন, আজ কাল দুদিন আসবেন না। ব্যারণপত্নী সোজা উইলেমের কাছে এসে তাকে অনেক করে বলে রাজী করালেন।

কাউন্টপত্নীর প্রতি উইলেমের আসক্তির কথাটা তিনি জানতেন। ঠিক হলো উইলেম কাউন্টের পোষাক পরে তাঁর শোবার ঘরে বসে থাকবে। তখন হঠাৎ তারা কাউন্টপত্নীকে পাঠিয়ে দেবে সে ঘরে। প্রথমে বুঝতে না পেরে স্বামী ভেবে কাঁধে হাত রেখে আদর করবেন। কি মজা হবে। উইলেম ভয় পেয়ে গেল। যদি পরে রেগে যান কাউন্টপত্নী। এই প্রতারণা যদি পছন্দ না করেন?

ব্যারণপত্নী বললেন, সে ভার আমার। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ব্যারণপত্নী জানতেন উইলেমের প্রতি কাউন্টপত্নীরও একটা দুর্বলতা আছে। একটা গোপন আসক্তি আছে। তাই উপরে যাই বলুন খুশি হবেন মনে মনে।

যে কথা সেই কাজ। উইলেমকে অন্য পথে কাউন্টের ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে দিলেন ব্যারণপত্নী। তাকে কাউন্টের টুপী, কোট প্রভৃতি প্রিয় পোষাকে সাজিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রেখে কাউন্টপত্নীকে ডাকতে গেলেন।

চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভূত দেখে যেন চমকে উঠল উইলেম।

ঘরের একদিকের দরজা খুলে কাউণ্ট ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে তাকে একবার চকিতে দেখেই দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। শিকার থেকে অকস্মাৎ কাউণ্ট ফিরে এসেছেন জানতে পেরে ভয়ে আঁতকে উঠল উইলেম। সে বুঝে উঠতে পারল না কাউণ্ট তাকে এই জঘন্য অপরাধের জন্য কি শাস্তি দেবেন।

কথা৩া ব্যারণপত্নীও জানতে পেরে ছুটে এলেন উইলেমকে বাঁচাবার জন্য। তিনি তাড়াতাড়ি উইলেমকে বার করে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পোষাক খুলে দিলেন। তাকে ছেড়ে কাউণ্টকে সামলাবার জন্য চলে গেলেন।

কাউণ্ট কিন্তু মোটেই রাগলেন না। শুধু কিছুটা গম্ভীর হয়ে রইলেন। শিকার থেকে হঠাৎ ফিরে এসে একটু বিশ্রাম করেই উইলেমকে ডেকে পাঠালেন। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল উইলেম। ভাবল হয়ত কাউণ্ট তার বিচার করবেন। শাস্তি দেবেন।

কিন্তু যা ভেবেছিল উইলেম তার কিছুই হলো না। কাউণ্ট তাকে শুধু কতকগুলি নির্বাচিত কবিতা ও নাট্যাংশ পড়ে যেতে বললেন। উইলেম যতদূর সম্ভব ভাল করে পড়ে যেতে লাগল। পড়া শেষ হলে তিনি প্রশংসা করলেন তার আবৃত্তির। তারপর ভালভাবেই বিদায় দিলেন।

ব্যারণপত্নী তাঁর প্রিয়পাত্র জার্নোকে কথাটা সব বললে জার্নো বলল, কাউণ্ট নিশ্চয় মনে ভেবেছেন ওটা ওঁর প্রেতাত্মা। তাই ভয়ে কোন কথা বলেননি। এর একমাত্র প্রতিকার হলো নানারকম ভূত প্রেতের কথা বলে কাউণ্টের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। তাঁর মনটাকে দুর্বল করে দিতে হবে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাসটাকে গাঢ় করে তুলতে হবে। হলোও ঠিক তাই। কাছে পেলে বা সুযোগ হলেই ব্যারণপত্নী ও জার্নো দুজনে মিলে যত সব ভৌতিক ঘটনার কথা বলতে লাগল। কাউণ্টও তাই বিশ্বাস করতে লাগলেন। তাঁর মুখের হাসিখুশি আনন্দময় ভাবটা পাল্টে গেল দিনে দিনে। তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

আবার একদিন হঠাৎ জার্নোর সঙ্গে দেখা হলো উইলেমের। তখন তার শেকস্‌পীয়ারের অনেক ভাল ভাল নাটক পড়া হয়ে গেছে। এক নূতন জগৎ আর এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান পেয়েছে সে নাটকের মধ্যে। তার জন্য সে ঋণী জার্নোর কাছে। সে ঋণ অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করল উইলেম। বলল, শেকসপীয়ারের প্রতিটি চরিত্র কেমন জীবন্ত, কেমন স্বাভাবিক। অথচ তারা প্রত্যেকেই মানব জীবনের এক একটা সমস্যাকে তুলে ধরেছে। তারা প্রত্যেকেই

দেখাচ্ছে সব জীবনের মধ্যেই যেন একটা রহস্য আছে।

জার্নো খুশি হয়ে বলল, দেখ তোমাকে দেখে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। তোমার বংশপরিচয় ও সাংসারিক অবস্থার কথা কিছুই জানি না। তবু আমি বলব তুমি এই ভাবে আর থেকো না। কি হবে এ দলে থেকে? এই লোকগুলোর দ্বারা কিছু হবে না, কোন ক্ষমতা নেই তাদের। শুধু শুধু কি হবে এ দলে থেকে? তার থেকে তুমি আমাদের মাঝে চলে আসতে পার। যুবরাজের সেবা করতে পার কাজের মধ্য দিয়ে।

কথাটা কিন্তু মনঃপুত হলো না উইলেমের। মনে মনে বলল, জার্নো যাই বলুক, সে তার দল বা মিগননকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। ওরা যত অপদার্থই হোক ওদের মধ্যে প্রাণ আছে।

অবশেষে একদিন যুবরাজের যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। কাউণ্ট ঠিক করল ঐ দিন তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হবে। উইলেম তার জন্য একটি নূতন কবিতা রচনা করে তা আবৃত্তি করল। সভায় কাউণ্টপত্নী তার পানে সমানে তাকিয়ে থেকে সে কবিতা উপভোগ করলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

সভাশেষে কাউণ্টপত্নী ব্যারণপত্নীর সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই উইলেমের ডাক পড়ল। কবিতার খাতা নিয়ে তাকে এই মুহূর্তে যেতে হবে কাউণ্টপত্নীর ঘরে।

যে কবিতা দেখাতে গিয়ে আবৃত্তি করল উইলেম তা কবিতা হিসাবে সত্যিই ভাল। কিন্তু উইলেম মোটেই ভালভাবে তা আবৃত্তি করতে পারল না। তার দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ ছিল সুসজ্জিতা কাউণ্টপত্নীর উপর। কবি হিসাবে যে অঙ্গের অলঙ্কারকে এতদিন অর্থহীন বাহুল্য ও অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য বলে গণ্য করে এসেছে আজ স্বচক্ষে দেখেন সেই অলঙ্কার আর বেশভূষার জৌলুস শত গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে কাউণ্টপত্নীর অঙ্গলাবণ্যকে। সে আরও দেখল কাউণ্টপত্নীও ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু কাউণ্টপত্নীর এমন দৃষ্টি কোনদিন দেখেনি। এক সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যাচ্ছিল যেন সে দৃষ্টির মধ্যে আর তার আঘাতে শিহরিত হয়ে উঠছিল উইলেমের সারা দেহ। তার সমগ্র অস্তিত্বের মর্মমূল পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছিল যেন সে আঘাতে।

উইলেম দেখল এর মাঝে ফিলিনা এসে কাউণ্টপত্নীর তোষামোদ শুরু করে দিয়েছে। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাউণ্টপত্নীর রূপের প্রশংসা করে বলতে

লাগল এমন বাহু না হলে এ ব্রেসলেট মানায় না, এমন গলা বা বুক না হলে এ হার মানায় না।

কাউন্টপত্নী কপট রাগের সঙ্গে বললেন, চুপ কর ফিলিনা। তোর এইসব ন্যাকামি সব সময় আর ভাল লাগে না।

ফিলিনা সে কথায় কান না দিয়ে উইলেমকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজ এই শিল্পীকেও চমৎকার মানিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় আজ ও কোন গোপন স্থানে আপনার সঙ্গে মিলিত হলে ভাল হত।

কপট রাগের সঙ্গে কাউটপত্নী বললেন, আমার কাছে আদর পেয়ে পেয়ে তোর স্পর্ধা বড় বেড়ে গেছে ফিলিনা। এ ধরনের কথা আর কখনো বলিসনি।

পড়া শেষ করে উইলেম বসেছিল একটি চেয়ারে। এমন সময় কাউন্টপত্নী একটা কৌটো থেকে একটা হীরের আংটি বার করে সেটি উইলেমের দিকে তুলে ধরে বললেন, আমার এই সামান্য উপহারটি গ্রহণ করবেন। আমি আপনার এমনই এক বান্ধবী যে শুধু আপনার উন্নতি ও মঙ্গল চায়।

উইলেম তার কবিতা লেখা একটি কাগজে নাম সই করে কাউন্টপত্নীকে দিয়ে বলল, এটা আমার নামের স্বাক্ষর। কিন্তু আপনার নামের স্বাক্ষর আমার অন্তরে মুদ্রিত হয়ে আছে। তা কখনো মুছে যাবে না। আপনার একগাছি চুল দেবেন? এই আংটির সঙ্গে জড়িয়ে রাখব?

ফিলিনা কাউন্টপত্নীর বাঁ হাতখানি ধরে ছিল। উইলেম আবেগের বশে কাউন্টপত্নীর ডান হাতখানি তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে। এমন সময় ফিলিনা ও ব্যারণপত্নী বেরিয়ে গেল ঘর হতে। বুঝতে পারল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। নতজানু হয়ে কাউন্টপত্নীর পাশে বসল উইলেম। তাঁর ডান হাতখানি তখনো ছিল তার হাতের মধ্যে। এবার উইলেম কাউন্টপত্নীর হাতখানি চুম্বন করে বলল, এখন আমি যাই।

উঠতে যাচ্ছিল উইলেম হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। কি করে কি হলো তা জানে না। হঠাৎ উইলেম দেখল কাউন্টপত্নী দুহাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁট দুটো তার মুখের কাছে তুলে দিয়েছে। কাউন্টপত্নীর মুখে মুখ দিয়ে তাঁর দেহটাকেও বুকের কাছে টেনে নিল উইলেম। এইভাবে নিবিড়তম এক আলিঙ্গন ও চুম্বনের বন্ধনে দুজনে কতক্ষণ আবদ্ধ ছিল তা জানে না, হঠাৎ চমকে উঠল উইলেম, কাউন্টপত্নী যেন হঠাৎ ভয়ে চমকে উঠে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। অথচ কেউ আসেনি ঘরের দরজার বাইরে।

তবে কি এক কাল্পনিক শঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন কাউন্টপত্নী ? এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন উইলেমের পানে। সে দৃষ্টির অর্থ সে বুঝতে পারল না। কাউন্টপত্নী বললেন, তুমি চলে যাও এই মুহূর্তে। আমাকে যদি ভালবাস তাহলে চলে যাও। আর দেরি করো না।

অবশেষে একদিন কাউন্ট ও কাউন্টপত্নী প্রাসাদ ছেড়ে চড়ে গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সৈন্যদের শিবির উঠে গেছে। যুবরাজ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে চলে গেছেন। প্রাসাদের চারপাশের মাঠগুলোতে সৈন্যদের যে ছাউনি গড়ে উঠেছিল সে ছাউনি আর নেই। মাঠগুলো আবার ফাঁকা হয়ে উঠেছে। একদিন সকালে লার্তেস প্রাসাদের একটি ঘরের জানালা থেকে মাঠের দিকে তাকিয়ে এই সব দেখছিল আর ভাবছিল। এমন সময় ফিলিনা এসে মাদাম মেলিনার কথা তুলল। মাদাম মেলিনার পেটটা বড় হয়ে উঠেছে। অথচ তা ঢাকার চেষ্টা করছে না। ঐভাবেই সব কাজ করে যাচ্ছে। ফিলিনা বলল, এমন নির্লজ্জ মেয়ে কখনো দেখিনি আমি।

ওরা যখন এই সব কথাবার্তা বলছিল তখন ব্যারণ এসে উইলেমকে ডাকলেন। ব্যারণ বললেন, কাউন্ট আপনাকে সামান্য কিছু উপহার পাঠিয়েছেন। যদিও আপনার বুদ্ধি ও প্রতিভার সঠিক মূল্য দান করা সম্ভব নয়, তথাপি আপনার অমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয়ের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সামান্য কিছু দান করেছেন। এইটা গ্রহণ করুন। আপনি তাঁর জন্য অনেক খেটেছেন। অনেক কিছু করেছেন।

এই বলে ব্যারণ একটা থলি বার করে উইলেমের হাতে দিতে গেলেন। কিন্তু উইলেম বলল, দেখুন, এটা আমি নিতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন। আমার মনে হচ্ছে এটা যদি আমি গ্রহণ করি তাহলে আমি যা কিছু তাঁর জন্য করেছি তা সব পণ্ড হয়ে যাবে। তাহলে তাঁদের মধুর স্মৃতি কেমন যেন কলুষিত হয়ে যাবে আমার কাছে। আর তা হয়ে যাবে আমারই স্বার্থপরতার জন্য। যেখানে টাকার ব্যাপার সেখানে কোন প্রীতি বা শ্রদ্ধাসিক্ত কোন স্মৃতি বেঁচে থাকতে পারে না।

তবু ছাড়লেন না ব্যারণ। বললেন, তাহলে কি বলতে চান কাউন্ট আপনার

কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন চিরদিন ? আপনি যদি তাঁর এ দান, এ উপহার গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি ভাববেন আপনি এতে সন্তুষ্ট নন। তাহলে আমি কোন মুখে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব ?

উইলেম শান্ত কণ্ঠে বলল, যদি বিবেকের নির্দেশ মানতে হয় তাহলে এ দান গ্রহণ করা আমার উচিত নয়। তবু এ দান আমি গ্রহণ করব বর্তমান প্রয়োজনের খাতিরে। বর্তমানে এই দলকে চালাতে হলে টাকার দরকার এবং মহামান্য কাউন্টের এই সদয় দান সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে আমাদের। দলের সকলেই উপকৃত হবে এতে।

ব্যারণ বললেন, সত্যিই এটা এক আশ্চর্যের কথা যে মানুষ মানুষের কাছ থেকে আর সব উপহার খুশির সঙ্গে গ্রহণ করে, কিন্তু একমাত্র টাকা নিতে চায় না। ভাবে টাকা নিলে ছোট হয়ে যাবে।

ব্যারণ চলে গেলে নিজের ঘরের ভিতর গিয়ে থলেটা খুলে উইলেম দেখল সব স্বর্ণমুদ্রা। গণনা করে দেখল যেদিন সে প্রথম হোটেলে এসে ওঠে এবং ফিলিনার সঙ্গে ফুল নিয়ে আলাপ হয় সেদিন তার কাছে যে পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা ছিল কাউন্ট তাকে আজ সেই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রাই দান করেছেন। অনেকখানি আশ্বস্ত হলো উইলেম। কাগজ কলম টেনে নিয়ে বাড়িতে একটা চিঠি লিখতে বসল। চিঠিতে আশ্বাস দিল বাড়ির সকলকে। লিখল সে শুধু বাজে কাজে সময় ও অর্থ ব্যয় করছে না। তাতে কিছু লাভও হচ্ছে।

হঠাৎ স্টলমেস্তার এসে হাজির। সে বলল, তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও। কাউন্ট ঘোড়া পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ঘোড়ার অভাব হবে না। দিন কতকের জন্য তোমাদের বাইরে যেতে হবে। সব মালপত্র গুছিয়ে নাও।

উইলেম দেখল তার একটি বাক্স মাদাম মেলিনা নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে। উইলেম মিগননকে বলল, থাকগে। না দিক। অন্য বাক্স নিয়ে কাজ চালাও।

মেলিনা এসে বলল, আমরা বাইরে যাচ্ছি। এখানে যা হয় হোক। বাইরে যাবার সময় এবার একটু ভদ্রভাবে যেতে হবে আমাদের। তার জন্য মিগননকে মেয়ের পোষাক পরতে হবে। আর বীণাবাদককে দাড়ি কামাতে হবে।

কথাটা শুনে মিগনন আর বৃদ্ধ বীণাবাদক দুজনেই ক্ষেপে গেল। মিগনন উইলেমকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি বেটাছেলে, মেয়েছেলের পোষাক পরব না। বৃদ্ধ গায়কও বলল, দাড়ি কামানো হবে না। তার জন্য তাকে দল ছাড়তে হলেও তার কোন ক্ষতি নেই।

ফিলিনা বলল, কাউন্ট কিন্তু এই সব ভালবাসেন। তাঁর মতে নাটকে মানুষ যে পোষাক পরে সে পোষাক যথাসম্ভব দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেও ব্যবহার করা উচিত। যে দাড়ি গায়ককে রাত্রিবেলায় মঞ্চে পরতে হয় সে দাড়ি দিনের বেলাতেও পরা ভাল। তার মানে এই যে অভিনয় জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনের ব্যবধানটা যত চলে যাবে ততই অভিনয়ও সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

কথাটা শুনে অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা হাসতে লাগল। বৃদ্ধ গায়ক উইলেমকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে যেতে দিন। আমি আর এখানে থাকব না।

উইলেম বুঝল মেলিনার কথায় বৃদ্ধের রাগ হয়েছে। উইলেম বলল, আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ আপনার চুল দাড়িতে হাত দেবে না। এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি। আমি থাকতে কেউ আপনার কিছু করতে পারবে না।

বৃদ্ধ বলল, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার চারপাশে যারা রয়েছে তারা সবাই ভাল নয়। আমার কিছু গোপন কথা আছে, আমার জীবনের একটা গোপন অংশ আছে। সেটা ওরা নির্মমভাবে টেনে বার করতে চায়। কিন্তু আমি তা পারব না। তাই আমি আমার সেই গোপন কথার সম্পদ, জীবনের সেই অনাবিষ্কৃত দিকটি নিয়ে বিদায় নিই।

উইলেম কিন্তু ছাড়ল না। বলল, আমি আপনার গোপন কথার কিছুই জানতে চাই না। আপনার ভাগ্যকে আমার হাতে সঁপে দিতে পারেন।

যাই হোক উইলেমের কথায় রয়ে গেল বৃদ্ধ।

আগে যে রাজপ্রাসাদে ছিল তার থেকে কিছু দূরে একটা ছোট্ট শহরে তার দল নিয়ে থেকে যেতে চাইল মেলিনা। উইলেমও বাড়ি যাব যাব করে গেল না। এই দল ছেড়ে কোথাও যেতে মন সরছিল না তার। তার পোষাকটাও পথিকের মত হালকা ও সাদাসিদে করে নিল। একটা হালকা ওয়েস্ট কোট, ঢিলে প্যাণ্ট, ফিতেওয়ালা বুট জুতো, মাথায় গোল টুপী আর সিল্কের নেকটাই। ফিলিনা তার পোষাকের দারুণ প্রশংসা করল।

অবসর সময়ে দলের সবাই একটা আনন্দ উপভোগ করত। তা হলো হঠাৎ ওরা সবাই মিলে একটা নাটক করত মুখে মুখে। আর সেই নাটকে কিছুদিন আগে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিল তাদের এক একজনকে চরিত্র হিসাবে খাড়া করে হাসাহাসি করত। বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তাদের উপস্থাপিত

করে তারা মজা পেত।

উইলেম একদিন তার প্রতিবাদ করে বলল, ওসব করা উচিত নয়। তাদের জন্মের জন্য তারা দায়ী নয়। ছোট থেকে যারা পার্থিব ঐশ্বর্যের দ্বারা পরিবৃত থাকে সব সময় তারা অন্তরের ঐশ্বর্যের কোন দাম দিতে জানে না। এ জন্য তাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়।

এর পর উইলেম প্রস্তাব করল, আমাদের অভিনয় প্রতিভাকে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। নিয়মিত অভ্যাস দরকার। তোমরা যদি অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পার তাহলে বসে বসে কাজের জন্য ভাবতে হবে না।

ওরা সবাই তখন প্রস্তাব করল দলের পরিচালনার জন্য একজনকে সাময়িক ভাবে প্রধান করে একটা সিনেট গঠন করা হবে। প্রধানকে সকলের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে।

মেলিনা তাতে রাজী হলো। ওরা সবাই মিলে ভোট দিয়ে প্রথমে উইলেমকে ম্যানেজার নির্বাচিত করল। তারপর তাকে সর্ব বিষয়ে সাহায্য করার জন্য একটা সিনেট গঠন করা হলো। মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে তার সদস্য নির্বাচন করা হলো।

লার্তেসের একটা দোষ। মেয়েদের সে দেখতে পারে না। কোন মেয়েকেই সে ভালবাসার চোখে দেখতে পারে না। একটা জায়গায় দুই একদিনের জন্য থাকতে হয়েছিল। স্থানীয় একটি মেয়ে লার্তেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল। কিন্তু লার্তেস তার প্রতি এমন নীরস ঔদাসীন্য দেখায় যে মেয়েটা চলে যেতে পথ পায় না।

কথাটা উঠতে ফিলিনা হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল। লার্তেসের পূর্ব জীবনের একটি গোপন কথা বলে দিল সকলের কাছে। তখন লার্তেসের বয়স মাত্র আঠারো। কোন এক নাটকের দলে সে কোন এক বৃদ্ধ অভিনেতার চোদ্দ বছরের একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। কাজ শেষে যখন বৃদ্ধ তার মেয়েকে নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন লার্তেস তাকে অনুনয় বিনয় করে। সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। অবশেষে অনেক করে বৃদ্ধ রাজী হয়। লার্তেস মেয়েটিকে বিয়ে করে। বিয়ের পর লার্তেস তার নূতন বউকে নিয়ে একটি ঘরে থাকত। সে একদিন রিহার্সালে যায় সন্ধ্যের সময়। রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরে দেখে তার ঘরে তার নূতন বউ-এর কাছে রয়েছে তার আগেকার প্রেমিক। এরপর

সে মেয়ের আগেকার প্রেমিক লার্তেসকে ডুয়েলে আহ্বান করে। ডুয়েল লড়তে গিয়ে আঘাত পায় লার্তেস। সেই থেকে ও মেয়েদের ঘৃণা করে। তাদের সততায় বিশ্বাস করতে পারে না।

এবার ওদের যাত্রা শুরু হবে। মেলিনা এসে বলল, সব ঠিক। এবার রওনা হতে হবে। কাউণ্টের নির্দেশমত ওরা যাবে এক শহরে। সেখানে ওদের থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা এসে উপস্থিত হলো। স্থানীয় দু একজন বলল যে পথে তারা যাবে এবং যেটা সোজা পথ সে পথ ভাল নয়। এখন যুদ্ধের সময়। প্রায়ই দস্যু দেখা যায় সে পথে। সব কেড়ে নেয়। জীবনও সংশয় হয়ে ওঠে। হয় যাত্রা স্থগিত করতে হবে না হয় ঘুর-পথে যেতে হবে অনেক কষ্ট করে।

উইলেম বলল, যুদ্ধের সময় এরকম গুজব প্রায়ই রটে। সুতরাং গুজবে কান না দিয়ে সোজা পথেই যাত্রা শুরু করা যাক। সবাই সমর্থন করল তাকে। লার্তেস বলল সে যাবেই ঐ পথে। বৃদ্ধও তাই বলল। আসন্ন সন্তান-সম্ভবা মাদাম মেলিনাও বেশ মনের জোর দেখাল। দুটো কোচে ওরা মালপত্র নিয়ে উঠে বসল। দ্বিতীয় দিনে পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে গাড়ি যাবার সময় গাড়ির চালকরা বলল, শহরটা এখনও অনেক দূরে, গাছপালায় ঘেরা ঐ পাহাড়টায় বিশ্রাম করে নিন আপনারা।

সকলেই রাজী। ছোট পাহাড়টার মাথায় উঠতে হলে একটা ঘন জঙ্গল পার হতে হয়। সতর্কতার জন্য কিছু অস্ত্রও ছিল ওদের হাতে। উইলেমের কাছে ছিল দুটো রিভলবার আর লার্তেসের ছিল একটা বন্দুক। ফ্রেডারিক সেই বন্দুকটা কাঁধে করে নিল। ওরা পাহাড়ের উপর উঠে চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। চারদিকে শুধু পাহাড় আর বন। কোথাও কোন জনমানব বা কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই। চারদিক ভীষণভাবে নিস্তব্ধ। উইলেমের মনে হলো জীবনে এত আনন্দ আর কখনো পায়নি। এমন পরিবেশ, এমন আনন্দঘন মুহূর্ত জীবনে তার কখনো আসেনি। দলের অন্য সকলেও খুব খুশি। মেয়েরা গুন গুন করে গান করতে লাগল। খাবার জন্য কিছু আলু সিদ্ধ করতে লাগল। মালপত্র সব গাড়িতেই রইল। ঘোড়াগুলো জোয়ালমুক্ত করে গাছে বেঁধে দিল চালকরা।

হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। তারপর একদল সশস্ত্র দস্যু বনভূমি পার হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের একজন গাড়িতে

উঠে মালপত্র নামাতে শুরু করে দিল। লার্তেস তার বন্দুকটা নিয়ে গুলি করল। গাড়ির ওপর থেকে পড়ে গেল লোকটা। উইলেমও এগিয়ে গিয়ে অস্ত্র নিয়ে বাধা দিল। কিন্তু সংখ্যায় দস্যুরা বেশী থাকায় পেরে উঠল না ওরা। লার্তেস আর উইলেমকে আহত করে মালপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল দস্যুরা। একমাত্র ফিলিনা তাদের সর্দারকে অনেক করে বলে তার বাক্সটা রক্ষা করল।

আঘাতটা উইলেমেরই বেশী লেগেছিল। কতক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই জানে না। চেতনা ফিরলে দেখল সেই পাহাড়ের উপরেই সে আছে। তার মাথাটা ফিলিনার কোলে রয়েছে। পায়ের কাছে বসে তার আছে মিগনন। আর কেউ নেই। সেই স্তব্ধ নির্জন বনভূমিতে শুধু তারা তিনজন।

ফিলিনার কাছ থেকে জানল দলের অন্যরা সব কিছু হারিয়ে রাগে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে। তারা নিকটবর্তী একটা গাঁয়ের এক পান্থশালায় গিয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ গায়ক গেছে তার জন্য ডাক্তার ডাকতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এসে উইলেমের ক্ষতস্থানগুলো ব্যাণ্ডেজ করে দিল। ক্ষত দিয়ে প্রচুর রক্ত বার হওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে উইলেম। উত্থান-শক্তি রহিত। এমন সময়, একদল অশ্বারোহীকে তাদের দিকে আসতে দেখে আবার ভয় পেয়ে গেল ওরা। কিন্তু পরে দেখল তারা তাদের সাহায্য করতে এসেছে। তাদের পুরোভাগে এক নারী অশ্বারোহী। অদ্ভুত পোষাক আর টুপীর জন্য তাকে চেনা যাচ্ছিল না। অশ্বারোহীদল তারই নির্দেশে চলছিল। সেই নারী নেমে এসে তার গায়ের কোটটা খুলে উইলেমের গায়ে চাপিয়ে দিল। তারপর একজন গ্রাম্য সর্দারকে নির্দেশ দিল উইলেমকে বয়ে নিয়ে যেন পাশের গাঁয়ে তার ঘরে গিয়ে রাখে।

সেই সর্দার আরো লোকজন এনে উইলেমকে বয়ে নিয়ে গেল বাঁশের মাচায় করে। পাশের গাঁয়েই তার বাড়ি। সেই গাঁয়ের পান্থশালাতেই দলের সব লোকরা উঠেছে। সর্দার উইলেমকে প্রথমে সেখানেই তুলল। পরে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে। সর্দার প্রস্তুতির জন্য বাড়ি গেলে তার দলের লোকেরা দুর্ঘটনার জন্য উইলেমকে দায়ী করে গালাগালি করতে লাগল। তারা একবাক্যে সর্দার ও ফিলিনাকে বলল, ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। ওরই জন্য আমরা সব হারিয়েছি। ওই জোর করে আমাদের এই পথে আনল।

মেলিনা এতদিন যা সঞ্চয় করেছিল সব গেছে। তার স্ত্রী একটি মরা ছেলে প্রসব করে।

বার বার ওদের এক কথা শুনে কথা বলার ক্ষমতা না থাকলেও উঠে বসে উইলেম। বলল, আমি কি তোমাদের জন্য কিছু করিনি? আমি প্রস্তাব করেছিলাম মাত্র। তোমরা সবাই তখন আমাকে সমর্থন করেছিলে এ পথে আসার জন্য। তবে কেন আমাকে দোষ দিচ্ছ?

মেলিনাকে .বলল, তোমাকে যে টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছি সে ঋণ থেকে মুক্তি দিলাম তোমায়। তোমরা সব ভুলে আমার পাশে এসে দাঁড়াও। আমি তোমাদের দুঃখ বুঝতে পারছি। আমি কথা দিচ্ছি তোমরা যে যা হারিয়েছ তার দ্বিগুণ তিনগুণ আমি দেব তোমাদের।

তবু তারা শান্ত হলো না। বিশ্বাস করল না উইলেমের কথায়। এদিকে সর্দার এসে উইলেমকে নিয়ে গেল। উইলেম বুঝতে পারল উত্তেজনার জন্য তার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে।

ফিলিনা ও মিগনন উইলেমের সঙ্গে এল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে শুনল সেই নারী আবার তাকে দেখতে এসেছিল। উইলেমের মনে হলো নারী না, কোন দেবদূত স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তার কোটটা গায়ে দিয়ে কেবল সে কোটের গন্ধ শুঁকতে ইচ্ছা করছিল তার। কারণ সে কোটে সেই নারীর স্পর্শ আছে। ডাক্তার এসে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিয়ে গেল। উইলেম ফিলিনাকে বলল, তুমি এবার যেখানে খুশি যেতে পার ফিলিনা। তোমার বাক্সে আমার যা কিছু সম্পদ রক্ষা করেছ এজন্য ধন্যবাদ। তার জন্য আমার সোনার হাতঘড়িটা আমি তোমাকে দেব।

ফিলিনা বলল, আমি কোথাও যাব না।

মিগননের মত বৃদ্ধ বীণাবাদকও সঙ্গী হয়ে উঠল উইলেমের। একটু সুস্থ হয়েই লার্তেস দেখা করতে এল তার সঙ্গে। সে বলল, হোটেলে যখন দলের লোকেরা তাকে অপমান করে তখন সে অন্য ঘরে অসুস্থ ছিল। তা না হলে সে কখনই চুপ করে থাকত না। উইলেমের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন আজও অটুট আছে।

লার্তেস বলল, সার্নোর অধীনে ওরা আবার একত্র হয়ে একটা নতুন দল গড়তে চায়। যাবার সময় তোমার কাছে ওরা পাথেয় খরচ চাইবে। মনে হয় এত দিন দল চালিয়ে ফিলিনা কিছু টাকা করেছিল। কিন্তু সব গেছে।

ফিলিনা বলল, ওদের টাকা দেবার কি আছে? সর্দার ওদের প্রত্যেককে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে।

তবু ওরা যখন উইলেমের কাছে এল উইলেম তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু দিল।

একদিন সকালবেলায় হঠাৎ ঘুম ভাঙতে উইলেম দেখল তার বিছানার এক ধারে ঘুমিয়ে আছে ফিলিনা। রাত্রিতে হয়ত বই পড়তে পড়তে তার ঘুম এসে যায়। বইখানা পাশে পড়ে রয়েছে। মাথার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এই অগোছালো ভাবের মধ্যে ফিলিনাকে খুব ভাল লাগছিল উইলেমের। এই ভাল লাগার মধ্যে মিশে ছিল তার প্রতি তার অন্তরের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। তাকে যখন দলের সবাই ত্যাগ করে যায় তখন একমাত্র ফিলিনাই তার পাশে থেকে দিনরাত সেবা করে তাকে সুস্থ করে তোলে। মিগননও করে। কিন্তু মিগননের সে একদিন উপকার করেছে। কিন্তু ফিলিনার জন্য সে এমন কিছু করেনি যার জন্য ফিলিনা এই বিপদের দিনে এতখানি করতে পারে তার জন্য। সুতরাং ফিলিনার ঋণ সে জীবনে শোধ করতে পারবে না। এখন ফিলিনার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে আবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। উইলেম তাকে বলল, তুমিও দলের অন্যান্যদের সঙ্গে চলে যাও। সার্লোর অধীনে গিয়ে কাজ করো।

এই ফিলিনা দলের লোকদের পাথেয় খরচ হিসাবে টাকা দেওয়ার জন্য ঝগড়া করে তার সঙ্গে। ফিলিনা কথাটার জের টেনে বলল, তুমি যদি আমাকে তাড়াতে চাও, আমি চলে যাব। ফ্রেডারিকটা আমার কাছে থাকলে আমি ভাবতাম না। তোমাদের কাউকে আমার দরকার হত না। কিন্তু ডাকাতপড়ার পর থেকে ছেলেটা কোথায় যে চলে গেল তার ঠিক নেই।

উইলেম চুপ করে রইল। তার কষ্ট হচ্ছিল মনে। ফিলিনার সেবার অভাবটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে সে। তবু কোন কথা বলল না দেখে ফিলিনা সত্যি সত্যি চলে গেল।

উইলেম এবার সুস্থ হয়ে উঠেছে। এবার সে হাঁটতে পারে। এখানে এক জন গ্রাম্য যাজক আসেন। তাকে প্রায়ই সান্ত্বনা আর পরামর্শ দেন। ফিলিনা চলে গেলে এবং দেহে কিছুটা বল পেলে সেই অজ্ঞাতনামা নারীর খোঁজ করতে লাগল উইলেম। চকিতে সে একবারে যতটুকু দেখেছে তার আহত আবিল চৈতন্যের মধ্যে তাকে দেখেছে, কাউন্টপত্নীর সঙ্গে তার অনেকটা মিল আছে। যার জন্য সে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসতে পেরেছে, যার জন্য নবজীবন লাভ করেছে তাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাতেও পারেনি। কিন্তু সর্দার বা যাজক শত

অনুরোধ সত্ত্বেও কোন সন্ধান দিতে পারল না সেই সুন্দরী অশ্বারোহিণীর। হঠাৎ কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটি চিঠি পেল উইলেম। এই কোট তার সেই সুন্দরী উদ্ধারকারিণীরই দেওয়া। এ চিঠি তারই হাতে লেখা তারই কোন আত্মীয়কে। উইলেমের কাছে কাউন্টপত্নীর হাতে লেখা একটি গান ছিল। মিলিয়ে দেখল দুজনের হাতের লেখার মধ্যে অদ্ভুত মিল আছে।

পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভের জন্য আরো দিনকতক থাকতে হত উইলেমকে। কিন্তু মনে চিন্তা নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারল না। কিছু না কিছু সে করতে চায়। অজ্ঞাতনাম্নী সেই সুন্দরীর কোন খোঁজ না পেয়ে একদিন মিগনন আর বৃদ্ধ বীণাবাদককে সঙ্গে নিয়ে সার্লোর বাড়ির পথে রওনা হলো উইলেম। সার্লো তার নাট্যজগতের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেকসপীয়ার নিয়ে কত আলোচনা হয়েছে তার সঙ্গে।

সার্লোকে আগেই একটা চিঠি দিয়েছিল উইলেম। তাই উইলেম তার বাড়িতে পা দিতেই দু হাত বাড়িয়ে ছুটে এল সার্লো। সাদর অভ্যর্থনার পর উইলেমকে কাছে বসিয়ে সার্লো বলল, তোমার দলের লোকদের কিছুই হবে না। যত সব অপদার্থের দল।

উইলেম কোন কথা বলল না। ওদের প্রতি এখনো সমান মমতা আছে তার। অপদার্থ হলেও ওদের নিয়ে কিছু করা হবে এ বিষয়ে একটা গোপন বিশ্বাস মনটাকে দোলা দেয় তার। কথায় কথায় উইলেম শেকসপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের কথাটা তুলল।

সার্লো বলল, পলিনিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করার আমার বড় ইচ্ছা। আমার বোন অরেলিয়াও ওফেলিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে যদি যুবরাজ হ্যামলেটের ভূমিকার জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়।

অরেলিয়ার সঙ্গে আলাপ করল উইলেম। ওফেলিয়ার চরিত্রটাকে ভালভাবে জানতে চাইল অরেলিয়া। উইলেম গোটা হ্যামলেট নাটকটা নিয়েই আলোচনা করতে লাগল। সে বলল, যে বিরাট কাজের ভার হ্যামলেটের উপর দেওয়া হয়েছিল তার অপরিণত অপটু অশক্ত অন্তরাত্মা সে ভার সহ্য করতে পারেনি। একটা ওক গাছের চারাকে একটা ছোট্ট কাচের জারে বসালে যেমন হয়, তার শেকরগুলো বড় হলে জারটায় যেমন ফাট ধরে হ্যামলেটেরও ঠিক তাই হয়েছিল। হ্যামলেটের ট্রাজেডী এইখানে। নায়ক শুধু ভেবেছে খলনায়কের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে কিছুই করেনি। কিন্তু নাটকটা এমনভাবে

সাজানো যে খলনায়ক নিজেকে নিরঙ্কুশ করার জন্য নায়কের জন্য যে মৃত্যুফাঁদ পাতে সে ফাঁদে নায়কের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও পড়ে যায়।

পরদিন অরেলিয়া ব্যক্তিগত কারণে তার ঘরে উইলেমকে ডাকল। উইলেম ঘরে ঢুকে দেখল, সোফার উপর বসে আছে অরেলিয়া। কিন্তু কোন বিশেষ কথা হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে সার্লো আর ফিলিনা ঘরে ঢুকল। এরপর সার্লো আর অরেলিয়া দুজনেই বেরিয়ে যেতে ফিলিনা রয়ে গেল।

প্রথমে সারা ঘরময় শিশুর মত অবুঝ আনন্দে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ফিলিনা। তারপর মেঝের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। প্রথমে ফিলিনাকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল উইলেম। তার সেই বিস্ময়কে উপহাস করে ফিলিনা বলল, তোমার আগেই আমি এখানে চলে এসেছি। দেখলে ত ? আমি কিন্তু সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। এবার এখানকার কথা শোন। এখানে আসার পর থেকে আমার মন্দ লাগছে না। কিন্তু এদের সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা উচিত তোমার। থিয়েটারের দল করে কিছু পয়সা করবে সার্লো। সে এখন আমাদের নূতন দলের ম্যানেজার। এই দলে একটা নাচিয়ে মেয়ে আছে। তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে সালো। আবার এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি। তার উপর শহরে আরো অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে। তার বোন অরেলিয়ার স্বামী মারা গেছে। এই দলেরই এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিয়ে হয় তার! তার মৃত্যুর পর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভালবাসা হয়। কিন্তু তাকে ফেলে সে পালায়। এই বাড়িতে তিন বছরের একটা ফুটফুটে ছেলে আছে। দেখে মনে হয় ওর বাপ খুব সুন্দর ছিল। ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। অরেলিয়া কিন্তু সেই লোকটার জন্য এখনো হাহুতাশ করে। তার ভাই সার্লো আবার তার প্রেমিকাদের তালিকায় আমার নামটাও লিখে নিয়েছে। আমার প্রতিও তার একটা দুর্বলতা গড়ে উঠেছে। আমার কথা শোন, তুমি অরেলিয়াকে ভালবাস। তাহলে ভালবাসাবাসির খেলাটা বেশ জমে উঠবে। তুমি অরেলিয়াকে ভালবাসবে, অরেলিয়া ভালবাসবে সেই পলাতক ভণ্ড প্রেমিকটাকে। আমি তোমাকে ভালবাসব আর আমাকে ভালবাসবে সার্লো। একজন যার পিছনে ছুটে চলবে সে ছুটে চলবে আর একজনের পিছনে। তা না হলে ভালবাসার খেলা!

এরপর একদিন অরেলিয়া সত্যি সত্যিই তার জীবনের কথা সব খুলে বলল

উইলেমকে। বলল, আমার মা আমার খুব ছেলেবেলায় মারা যান। আমি মানুষ হই আমার পিসির কাছে। তাঁর নীতিজ্ঞান মোটেই তীক্ষ্ণ ছিল না। আমি আমার প্রথম যৌবনে একজনকে না বুঝে না ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। সে আমার দাদার অধীনে অভিনয় করত। কিছুদিন পর সে মারা যায়। আমাদের কোন সন্তান হয়নি। তারপর এক ভদ্রলোক আসেন এখানে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে। ভদ্রলোক প্রথমে আমার কাছে প্রতিটি কাজে ও কথা-বার্তায় নিঃস্বার্থ প্রেমের ভান করেন যাতে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। জীবনে প্রথম ভালবাসা জাগে আমার হৃদয়ে। তাকে খুশি করার জন্যই যেন দিনে দিনে ভাল অভিনয় করতে শিখি। সে আমার অভিনয় দেখে খুব প্রশংসা করত আমার। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি থেকে এক চিঠি পেয়ে সেই যে চলে গেল আর এল না। এখন কিভাবে এক পরিত্যক্ত অনাথা বিধবা দিন কাটাচ্ছে নিবিড় হতাশার মধ্যে তা দেখ নিজের চোখে।

অরেলিয়া বড় আবেগপ্রবণ। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই কেঁদে ফেলে। হঠাৎ সার্লো ঘরে এসে তার চোখে জল দেখে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ছুরি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অরেলিয়া ঝড়ের বেগে সোফা থেকে উঠে গিয়ে সেটা কাড়ার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগল। অবশেষে সেটা কেড়ে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সার্লো বলল, একটা অভিনেত্রী কখনো ছোরা-ছুরি নিয়ে বাস করে না।

অরেলিয়া বলল, ছোরাটা দেখতে ধারাল এবং ভয়ঙ্কর বলেই যে খারাপ হবে তার কোন মানে নেই।

সার্লো চলে গেলে অরেলিয়া উইলেমকে বলল, এখানে আমার মোটেই ভাল লাগে না। যে দলটা এসেছে তাদের কাউকে আমার ভাল লাগে না। আমার দাদার কাছে থাকতেও আর আমার ভাল লাগে না।

ওদিকে সার্লো ক্রমাগত তার দলের লোকদের অযোগ্যতার কথা বলতে থাকায় উইলেম নূতন করে তাদের অভিনয় শেখাতে লাগল। তবু এত কিছু সত্ত্বেও ওদের মন পেল না উইলেম। মেলিনা সহ দলের প্রায় সবাই তখনও ক্ষুব্ধ তার প্রতি। একমাত্র লার্তেস ও ফিলিনা তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

আর একদিন সার্লোর খোঁজে এসে উইলেম অরেলিয়ার সঙ্গে দেখা করল তার ঘরে গিয়ে। উইলেম একটা সোফার উপর বসল। অরেলিয়া বলল, কাল সন্ধ্যায় নাটক আর আজ সকালে আমি আমার ভূমিকা বুঝে নিলাম।

উইলেম বলল, তোমার প্রতিভা আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার যৌবনসমৃদ্ধ সুন্দর চেহারা ও প্রতিভা আছে। তুমি একদিন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবে জীবনে। অতীতের জন্য কিছু ভেবো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অরেলিয়া বলল, আমরা নারীরা এমনই দুর্বল প্রকৃতির যে আমরা কাউকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যৌবন সৌন্দর্য জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি সব তোমাদের মত পুরুষদের পায়ে বিলিয়ে দিই। কাণ্ডজ্ঞান-হীন ভাবে সব সমর্পণ করি।

এই বলে ঘরের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল অরেলিয়া। এক সময় বলল, বুঝি বন্ধু, সব বুঝি। কিন্তু অতীতের চিন্তা ভাবনা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যে কত কঠিন কাজ তা কি করে বোঝাব? আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না লোকটা আমাকে ত্যাগ করলেও কেন আমি তাকে ভালবাসব না? কোন যুক্তিতে আমি তাকে ভালবেসে যাব না আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে যায়। হ্যাঁ, তবু আমি ভালবেসে যাব তাকে। যতদিন বাঁচব ভালবাসব।

অরেলিয়ার একটা হাত ধরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল উইলেম। তাকে মেরিয়ানার কথাটা বলল। মেরিয়ানাও ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। তবু সে নূতন উদ্যমে বুক বেঁধে কাজ করে চলেছে। একদিন সেও এমনি করে ভেঙ্গে পড়েছিল প্রথম প্রেমে ঘা খেয়ে। কিন্তু আজ আর সেকথা ভাবে না। অরেলিয়া বলল, তুমি কখনো কোন মেয়েকে মিথ্যা কথা বলে ঠকাওনি একথা জোর গলায় বলতে পার?

উইলেম শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, পারি। সে কথা বলার কোন প্রয়োজন হয়নি। যে মেয়েকে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারব না তাকে আমি কোনমতেই ভালবাসা জানাব না। সে আমার ভালবাসা পাবে না।

অরেলিয়া বলল, তাহলে হাজার মিথ্যাবাদী পুরুষের মাঝে তুমি একটা। তবে তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে ত?

উইলেম তার একটা হাত ধরেই বলল, হ্যাঁ আছে।

অরেলিয়া বলল, ঠিক আছে। আমি মেনে নিচ্ছি তোমার কথা।

এই বলে ডান হাত দিয়ে তার পকেট থেকে ছুরিটা বের করে উইলেমের একটা হাতের চাটু চিরে দিল সেই ছুরির ডগাটা দিয়ে। তারপর তার

রুমাল দিয়ে তার হাতটা বেঁধে দিল। তখনো রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল উইলেমের হাত থেকে। উইলেম আশ্চর্য হয়ে বলল, একি করলে অরেলিয়া, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে আঘাত করলে?

চুপ! তার একটা হাত দিয়ে উইলেমের মুখটা চেপে ধরল। তারপর ড্রয়ার থেকে ওষুধ এনে লাগিয়ে দিল। বলল, আমার মত অর্ধপাগল এক নারীকে ক্ষমা করো। মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্তের জন্য দুঃখ করো না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক'দিন ধরে অরেলিয়ার মাথাটা যেন বেশী খারাপ হয়ে পড়ে। সে সব সময় হাহুতাশ করতে থাকে। তখন তাকে একটা নির্জন বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া সে একা একা থাকতেই ভালবাসে। তার তিন বছরের ছেলে ফেলিক্স এ বাড়িতেই রয়ে গেল। মিগননের সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। মিগনন তার দেখাশোনা করতে লাগল। মিগননের কাছে সে ভালই থাকে।

সার্লো একটু গানের ভক্ত। সমস্ত দলের মধ্যে তাই দুজনকে বেশী পছন্দ করত। তারা হলো বৃদ্ধ বীণাবাদক আর মিগনন। লার্তেসও কিছু গল্প জানত বলে তাকেও ভালবাসত।

একদিন হঠাৎ উইলেম বাড়ি থেকে ওয়ার্নারের লেখা একটা চিঠি পেল। চিঠি খুলে দেখল তার বাবা মারা গেছে। হঠাৎ মাত্র কয়েক দিনের অসুখে অকালে মারা গেছেন তার বাবা। ওয়ার্নার লিখেছে সে তার বোনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এবং এখন তাদের বাড়িতেই আছে। সুবিধাবাদী ধান্দাবাজ লোকেদের আনাগোনা চলেছে অনবরত। সুযোগ পেলেই যা পাবে চুরি করে নিয়ে যাবে এটা ওটা।

ওয়ার্নার আরও লিখেছে সে স্থায়ীভাবে তাদের পৈতৃক বাড়িতে বাস করতে আসেনি। তার বোনের সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে গেলেই তারা তার বাড়িতে চলে আসবে। তার মাও তাদের বাড়িতেই এসে থাকবেন। তখন তাদের বাড়িটা মোটা টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট খামারবাড়ি কিনবে। তাদের ইচ্ছা তখন অর্থাৎ আজ হতে মাস ছয়েক পরে উইলেমই সে খামারবাড়ি দেখাশোনা করবে।

তার উত্তরে উইলেম লিখল ওয়ার্নারকে, তোমার চিঠিখানি সুলিখিত। এতে তুমি যথোচিত বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছ। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারলাম না। আমি যদি প্রভাবশালী কোন সামন্তবংশের সন্তান হতাম তাহলে আমি ঘরে থেকেই আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারতাম। আমার প্রতিভার সম্যক বিকাশ সাধন করতে পারতাম। কারণ সমাজের সর্বস্তরে রাজাদের মত সামন্তদেরও প্রভাব প্রসারিত। কিন্তু আমি একজন সাধারণ ঘরের ছেলে। আমাকে অনেক অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে আমার প্রতিভার বিকাশের জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আমার জন্মগত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে অবলম্বন করেই আমার ব্যক্তিসত্তার চরম উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে চাই। আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত আমি কাজ করে যাব। আমার সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ আমি এই বিদেশে খুঁজে নিয়েছি। তোমার চিঠি পাবার আগেই আমি আমার জীবনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেছি। আমি জানি আমার যা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে তা যোগ্য লোকের হাতেই আছে। শুধু মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে তোমার কাছ থেকে কিছু চাইব। তবে যতদূর মনে হয় আমার নিজের খরচ আমি এখন থেকে নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।

চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েই সার্লোর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ল উইলেম। শার্লো অনেক আগে থেকেই তাকে চাপ দিচ্ছিল, এভাবে অনিশ্চিত অবস্থায় না থেকে চুক্তিবদ্ধভাবে কিছু করা ভাল। উইলেম বলল, সার্লোই ম্যানেজার থাকবে। সার্লোর দলে থেকে সে অভিনয় করে যাবে এবং নাটকও লিখবে। উইলেমের এই চুক্তির ফলে সবাই কাজ পেল। কিন্তু একমাত্র লার্তেস ছাড়া কেউ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল না। অথচ তারা এই চুক্তির জন্য কত প্রত্যাশা করেছে। তারা বলল, ফিলিনা উইলেমকে প্রভাবিত করে এই কাজ করিয়েছে।

যাই হোক, চুক্তিপত্রে সই করতে গিয়ে হঠাৎ উইলেমের মনে পড়ল সেই সুন্দরী অশ্বারোহিণীর কথা যার মুখ চকিতে একবার সেই বনভূমিতে শায়িত অবস্থায় আবিষ্ট চেতনার মধ্য দিয়ে দেখেছিল, যার মুখখানা দেখতে অনেকটা কাউন্টপত্নীর মত। ভাবতে ভাবতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল উইলেম। সই করার পরেও কলমটা তার হাতে আটকে পড়েছিল যেন। যেন পাথরের মত জমে গেছে তার হাতটা। পাশে থেকে মিগনন তাকে নাড়া না দিলে সে

ওইভাবেই থাকত।

ঠিক হলো ওরা হ্যামলেট মঞ্চস্থ করবে। হ্যামলেটটা ইংরাজি ভাষা থেকে জার্মাণ ভাষায় নাটকের আকারে অনুবাদ করবে উইলেম। তবে সার্লোর মতে কিছু বাদ দিয়ে এখানকার দর্শকদের উপযোগী করে তুলতে হবে। অর্থাৎ বলতে পার গম পেষাই করে আটা বের করে ভুঁষিটাকে বাদ দিতে হবে।

উইলেম প্রথমে রাজী হতে পারল না। বলল, নাটকের ব্যাপারে গমের উদাহরণ খাটে না। বরং বলতে পার গাছ। সব মিলিয়ে একটা গোটা গাছ; তার থেকে শাখা প্রশাখা, পাতা, কাণ্ড কিছুই বাদ দিতে পার না।

সার্লো প্রতিবাদ করে বলল, একটা আস্ত গোটা গাছ ত আর টেবিলের উপর উপস্থাপিত করতে পার না দর্শকদের জন্য। কিছু কাটছাঁট করতেই হবে।

উইলেম বলল, নাটকটা অনুবাদ ও সম্পাদনা কিসের ভিত্তিতে করব তা ভেবে ঠিক করে রেখেছি আমি। দুটো বিষয়ে আমাকে লক্ষ্য রেখে চলতে হবে। এক হলো চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক আর অন্যটা হলো বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে চরিত্রদের সম্পর্ক। এই সব ঘটনার মধ্যে লার্তেসের ফ্রান্সযাত্রা, তার প্রত্যাবর্তন, হ্যামলেটকে ইংল্যাণ্ড পাঠানো, ফোর্টিনব্রাসের পোল্যাণ্ড অভিযান প্রভৃতি। আরো অসংখ্য ঘটনা আছে। কিন্তু এই সব ঘটনা এমনভাবে গ্রথিত হবে যাতে কেন্দ্রগত ঐক্য ব্যাহত না হয়, বিশেষ করে নায়কের অনুপস্থিতিতে নাটকের কোন ঘটনা বিশেষ নাট্য তাৎপর্য লাভ করতে না পারে। তবে আমি ঠিক করেছি ঘটনাগুলোকে এইভাবে সাজাব। হ্যামলেট হোরেশিওকে তার কাকার গোপন অপরাধের কথা খুলে বলতেই হোরেশিও তাকে পরামর্শ দিল তার সঙ্গে নরওয়ে গিয়ে সেখানে হ্যামলেট সৈন্য সংগ্রহ করুক। তখন এক বিরাট সেনাদল নিয়ে ডেনমার্ক ফিরে এসে তার কাকার উপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। হ্যামলেটও ধীরে ধীরে তার কাকা ও মার উপর অস্বাভাবিকভাবে বিরূপ হয়ে উঠল। তখন রাজা হ্যামলেটকে যুদ্ধজাহাজে করে নরওয়ে পাঠানো স্থির করল। দুজন গুপ্তচর রোজেনক্রান্তস্ ও গিল্ডারস্টার্ণ তার উপর কড়া নজর রাখবে। হ্যামলেটের প্রতিদ্বন্দ্বী লার্তেস ফ্রান্স থেকে ফিরে এলে তাকেও পাঠানো হবে তার পিছনে। এর পর সমাধিক্ষেত্রে ওফেলিয়ার সমাধির কাছে লার্তেসের সঙ্গে দেখা হলো উইলেমের। রাজা তখন দেখল আর বেশী দূর এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না। হ্যামলেটকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দেওয়া হোক পৃথিবী থেকে। তারপরেই শুরু হলো সেই ভয়ঙ্কর ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা লার্তেস আর

হ্যামলেটের মধ্যে। তারপর চার চারটে মৃতদেহের ছড়াছড়ি। দেখাতেই হবে। কোন উপায় নেই।

সার্লো উৎসাহিত হয়ে বলল, ঠিক আছে। শেষ করে ফেল।

উইলেমের অনুবাদের কাজ শেষ হয়ে যেতেই ভূমিকা বিতরণ শুরু হয়ে গেল। উইলেম নিজে করবে হ্যামলেটের অভিনয়। তার অনেকদিনের ইচ্ছা। সার্লো করবে পলোনিয়াসের চরিত্রে অভিনয়। তারও এটা অনেকদিনের ইচ্ছা। অরেলিয়া নিল ওফেলিয়ার ভূমিকা। উইলেমকে এবিষয়ে আগেই কথা দিয়েছিল সে। ফিলিনা করবে হ্যামলেটের মা অর্থাৎ রাণীর ভূমিকা। মুস্কিল হলো রাজা ক্লডিয়াস আর হ্যামলেটের বাবা মৃত রাজার প্রেতের ভূমিকা নিয়ে। সার্লো বলল, হাস্যরসিক বৃদ্ধ অভিনেতাকে দেওয়া হোক এই ভূমিকা। কিন্তু উইলেম প্রতিবাদ করল। লার্তেসকে দেওয়া হলো লার্তসের ভূমিকা। এক নবাগত যুবককে দেওয়া হলো হোরেশিওর ভূমিকা।

সার্লো একবার বলল, রোজেনক্রান্তস আর গিল্ডারস্টার্ণ চরিত্র দুটো বাদ দাও অথবা একটার মধ্য দিয়ে সেরে দাও।

কিন্তু উইলেম বলল, এই সব ছোটখাটো চরিত্রের মধ্য দিয়ে শেকসপীয়ার মানব চরিত্রের অনেক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। তাদের মত ভীরু, তোষামোদকারী, মাথামোটা অথচ সাবধানী চরিত্র সমাজে খুব বেশী ঘোরাফেরা করে। এই ধরনের আরো দু একটা চরিত্র থাকলে ভাল হত।

ফিলিনা রাণীর ভূমিকা পেয়ে খুব খুশি। সে বলল, প্রথম স্বামীকে খুব ভালবাসা সত্ত্বেও দ্বিতীয় একজনকে বিয়ে করা, এই ত? আমি এমনভাবে অভিনয় করব যাতে মনে হবে দরকার হলে তৃতীয় একজনকেও বিয়ে করতে পারি।

কথাটা শুনে রেগে গেল অরেলিয়া। সে আজকাল ফিলিনাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। সার্লো এক সময় বলল, এটা দুঃখের বিষয় রাণীর দুটো নাচ নেই। প্রথম স্বামী ও দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে দুটো নাচ দিতে হত।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিনা বলল, আমি যা সুন্দর নাচতাম না! আমার পায়ের পাতাগুলো দেখনি ত?

এই বলে পা দুটো ফিলিনা টেবিলের তলা থেকে বার করতেই সার্লো তার চটির প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল, এ চটি কাউন্টপত্নী তাকে দিয়েছে। সকলের সামনেই আদর করে ফিলিনাকে জড়িয়ে ধরল সার্লো। অরেলিয়া রাগ

করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অন্য একদিন উইলেমের একটা কথায় রেগে গেল অরেলিয়া। উইলেম সেদিন সার্লোকে বলছিল, এখন যত হ্যামলেট পড়ছি ততই মনে হচ্ছে আমার চেহারার সঙ্গে হ্যামলেটের কোন মিল নেই। ওরা নর্ম্যান, ডেনমার্কের লোক। ওদের চুল হবে কোঁকরা।

সার্লো বলল, চেহারা যাই হোক, অভিনেতার কাজ হলো অভিনেয় চরিত্রকে যথাযথভাবে রূপ দান করা, ফুটিয়ে তোলা।

অরেলিয়াও তাই বলল। তাছাড়া দর্শকদের মনোভাবেরও একটা মূল্য আছে নাট্যরস আস্বাদনের ব্যাপারে। আমাদের যদি অভিনেতাকে দেখে মনে হয় অভিনেয় চরিত্রের সঙ্গে এ খাপ খেয়ে গেছে তাহলে সেটাই যথেষ্ট। সুতরাং অমতের কোন কারণ থাকতে পারে না।

সার্লো বলল, আমাদের প্রম্পটার খুব ভাল নাটক পড়তে পারে। খুব ভালভাবে প্রম্পট্ করতে পারে। একবার আমি আমার সংলাপ সব ভুলে গিয়েছিলাম মঞ্চের উপর। কিন্তু ও আমার মুখে সব কথা যুগিয়ে দিয়েছিল চমৎকারভাবে।

অরেলিয়া বলল, একবার ও কিন্তু প্রম্পট্ করতে গিয়ে আমার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল, তার কারণ ও আমার সংলাপ পড়তে গিয়ে আবেগে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। তাই ঠিকমত পড়তে বা কথা যোগাতে পারেনি আমায়।

সার্লো বলল, অভিনয় সম্বন্ধে ওর কিন্তু পুরো জ্ঞান আছে। সংলাপগুলো পড়ার সময় তোমার কণ্ঠের ওঠানামা কেমন হবে তা ও সব জানে। ওর পড়াটা এত ভাল যে অভিনেতারা তার থেকে অনেক সাহায্য পায়।

উইলেম বলল, উনি ত তাহলে নিজেও অভিনয় করতে পারেন। উনি মঞ্চে নামেন না কেন?

সার্লো বলল, ওর গলার স্বরটা ভারী মোটা আর চেহারাটাও ভাল নয়।

উইলেম বলল, কিন্তু রাজা ক্লডিয়াসের ভূমিকাটা ত ওঁকে দেওয়া যেতে পারে।

সার্লো সঙ্গে সঙ্গে কথাটা লুফে নিল। বলল, হ্যাঁ, এ-ই হচ্ছে উপযুক্ত লোক। তবে ভ্রাম্যমান নাট্যদলের নাটকাভিনয়ের সেই দৃশ্যটা বাদ দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ সেই নাটকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে রাজার যে সংলাপ আছে সেটা

কঠিন হবে ওর পক্ষে।

উইলেম বলল, এই ভ্রাম্যমান নাট্যদলের নাটকাভিনয়ের উপস্থাপনার পিছনে শেকসপীয়ারের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। কারণ এই নাটকের অভিনয় এক দিকে যেমন হ্যামলেটের বিবেককে এক তীব্র খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেয় তাকে, অন্য দিকে তেমনি রাজাকেও সচেতন করে দিল তার গোপন অপরাধ সম্বন্ধে। তাঁর বিবেককে আঘাত দিল। আমরা ওকে এ বিষয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ভাল করে মেজে ঘষে নেব।

সার্লো বলল, তা না হয় হলো। কিন্তু প্রেতের ভূমিকাটা কাকে দেবে? ও বৃদ্ধের দ্বারা হবে না।

উইলেম বলল, বাইরের দু একজন লোক প্রায়ই আসছে অভিনয় করার জন্য। তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিলেই হবে।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা মজার ব্যাপার ঘটল। কি করে কি হলো তা কেউ বুঝতে পারল না। উইলেম তার ঘরে ঢুকেই হঠাৎ একটা খামের চিঠি পেল। তাতে লেখা আছে, আপনারা হ্যামলেট মঞ্চস্থ করার জন্য শ্রম ও নিষ্ঠা-সহকারে যেভাবে কাজ করে চলেছেন তাতে আমরা খুব খুশি। প্রেতের ভূমিকায় অভিনয় নিয়ে কোন চিন্তা করার নেই। যথাসময়ে প্রেত আবির্ভূত হবে।

চিঠি যে কে লিখে পাঠিয়েছে তা কেউ বুঝতে পারল না। উইলেম সার্লোকে দেখাল। সার্লো অনেকক্ষণ দেখে এবং অনেক ভেবে বলল, আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা একথার উপর ঠিক নির্ভর করতে পারব কি না।

সার্লো চলে গেলে অরেলিয়া উইলেমকে বলল, এ নিশ্চয় সার্লোর কাজ।

সেদিন সকালে প্রথম স্টেজ রিহার্সালে নেমে একটা কথা মনে পড়ে গেল উইলেমের। অতীতে এমনি কোন এক সকালে তাদের শহরে এমনি এক রিহার্সালের সময় এই একই গ্রাম্য দৃশ্যপট সাজানো ছিল মঞ্চে। সে দৃশ্যেও ছিল চাষীদের ছোট ছোট কুঁড়ে। সেদিনকার রিহার্সালের নায়িকা ছিল মেরিয়ানা। সেই সকালে মেরিয়ানা সর্বপ্রথম প্রেম নিবেদন করে তাকে। মঞ্চের ফাঁক দিয়ে উজ্জল এক ফালি সূর্যের রশ্মি এসে মেরিয়ানার বুক আর কটিদেশটাকে আলোকিত করে তুলেছিল। উইলেমের কেবলি মনে হতে লাগল একটু পরেই যেন মেরিয়ানা এসে হাজির হবে মঞ্চে। পুরনো স্মৃতির ব্যথাভারে এমনি এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল উইলেম যে সে তার অভিনয়ের কথা ভুলে

গেল একেবারে। দুজন বাইরের সৌখীন অভিনেতার ডাকে চমক ভাঙল উইলেমের।

এই দুজন সৌখীন অভিনেতা হলেন স্থানীয় দুজন যুবক। এরা তাদের দলের বেতনভুক্ত অভিনেতা নয়। তবে প্রায়ই আসে, তাদের রিহার্সাল দেখতে। তারা কিন্তু ভাল সমঝদার। তাদের রুচিবোধ ও রসবোধ আছে। তারা তাদের অভিনয় ও মঞ্চ পরিচালনা দেখে দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করে তা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। তার থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করে সার্লো এবং উইলেম দুজনেই। এই যুবক দুজনের একজন নিছক নাট্যপ্রীতির খাতিরেই আসে তাদের কাছে। আর একজন মাদাম মেলিনার প্রতি আসক্ত।

যাই হোক, ওরা মোটের উপর দলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। রিহার্সালের সময় ওদের উপস্থিতি খুবই উপকারে লাগে। বিদগ্ধ দর্শকের মত ওরা সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে, মুক্ত কণ্ঠে সমালোচনা করে। যেমন ওরা সেদিন বলল, কোন বিয়োগান্ত নাটকে কোন অভিনেতা হাত বেশী দোলাবে না। মেয়েরা তাদের হাত পোষাকের ভাঁজের ভিতরে ঢোকাবে না। এটা ঠিক নয়। ওদের দ্বারা আর একটা উপকার হল। যেহেতু হ্যামলেটে অনেক তরোয়াল খেলা ও সামরিক দৃশ্য আছে, ওরা সেই সব অভিনেতাদের শেখাত। লার্তেস ও উইলেম দুজনেই ভাল করে তলোয়ার খেলাটা শিখে নেয়। বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে ওরা আর একটা জিনিসের উপর জোর দিল। ওরা সব অভিনেতাকে বলল, কথাগুলো জোরে বলবে, মঞ্চ থেকে যাতে শ্রোতারা সব শুনতে পায়। সব কথা শুনতে না পেলে অভিনয় ভাল হলেও শ্রোতাদের ভাল লাগে না। এইভাবে যুবক দুজন উইলেমের মন জয় করে। উইলেম তাদের এক কোণে বসতে বলে।

অভিনয়ের যাবতীয় পোষাক আর দৃশ্যসজ্জার কাজ এগিয়ে চলতে লাগল। কোন দৃশ্যে কি কি থাকবে, কিভাবে দৃশ্য সাজানো হবে তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হলো সার্লো আর উইলেমের মধ্যে।

হঠাৎ একসময় সার্লো একটা অদ্ভুত কথা বলল উইলেমকে। তুমি কি শেষ দৃশ্যে সত্যি সত্যিই হ্যামলেটকে মৃত দেখতে চাও?

উইলেম বলল, তা না দেখিয়ে উপায় কি? নাটকের মূল পরিকল্পনাই ত এইভাবে হয়েছে।

সার্লো বলল, কিন্তু দর্শকরা তা চায় না।

উইলেম বলল, সাধারণ দর্শকদের মতে সবসময় চলতে হবে এমন কোন কথা

নেই। তারা কি চায় না চায় সেটাকে সব সময় প্রাধান্য দিলে ভাল নাটক দেখাতে পারবে না। তারা অনেক সময় বাজে মিথ্যা আবেগে আপ্লুত হয়ে আনন্দ পেতে চায়।

সার্লো তবু থামল না। বলল, যারা টাকা দেয় তাদের ভাল লাগা মন্দ লাগাটাও দেখতে হবে বৈকি।

উইলেম বলল, ফেরিওয়ালারা যখন মিষ্টি ফেরি করে তখন তাদের ডাকে শিশুরাই ক্রেতা হিসাবে ছুটে যায় তাদের কাছে। বড় মানুষরা তাদের কথায় ভোলে না। তুমি যদি ভাল জিনিস তোমার নাটকের মধ্যে পরিবেশন করো তাহলে দর্শকের মনে ধীরে ধীরে তাদের রুচিবোধ উন্নত হবে। তখন তুমি যে টাকা আজ তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছ তার দ্বিগুণ তারা দেবে।

প্রধান রিহার্সাল হয়ে গেল। চলল অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু কয়েকটা দৃশ্য ভাল জমল না। কারণ হ্যামলেটের বাবা মৃত রাজার ছবি সামনে না রাখায় অথবা প্রেত না আসায় হ্যামলেট ও তার মার যৌথ অভিনয়ে কেউ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। সার্লো আর বিশ্বাস করতে পারল না। একটা উড়ো চিঠির উপর আর নির্ভর করে থাকা যায় না। প্রেতের ভূমিকা কাউকে বিলি করে দেওয়া হোক।

উইলেম বলল, আমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নিশ্চয় একথা লিখেছে। তার কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

তখন ঘরের মধ্যে দলের অনেকেই ছিল। ফিলিনা বলল, তোমরা শেকস-পীয়ারের উপর অনেক খবরদারি করেছ। নাটকটাকে কাটছাঁট করেছ।

সার্লো আর উইলেম জানতে চাইল কোন জায়গাটা বাদ দেওয়া হয়েছে যার জন্য খারাপ লাগছে তার।

ফিলিনা তা স্পষ্ট করে বলল না। তা না বলে ও একটা গান করতে লাগল আপন মনে। কথা বলতে বলতে তখন রাত হয়ে গেছে অনেক। সবাই উঠে পড়ল। শুধু অরেলিয়া আর উইলেম বসে রইল। অরেলিয়া বলল, আমি ঐ মেয়েটাকে মোটেই সহ্য করতে পারি না। ওকে দেখলেই আমার ঘৃণা হয়। ওর মাথার চুলগুলো কোঁকরানো বলে আমার দাদার একটা দুর্বলতা আছে ওর উপর। আর তোমাকে দেখেও কেমন যেন নরম মনে হয় ওর প্রতি। তুমিও ওকে বেশ একটু খাতির করে চল যে খাতির পাবার কোন যোগ্যতা নেই ওর।

উইলেম বলল, আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা ঋণী ওর কাছে। আমি কৃতজ্ঞ

ওর কাছে। আসলে দোষ হচ্ছে যে পরিবেশে ও মানুষ হয়েছে সেই পরিবেশের। ওর স্বভাবগত চরিত্রটা খারাপ নয়।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রাগে আগুন হয়ে উঠল অরেলিয়া। বলল, তোমরা সব পুরুষই এক। নারীদের গুণাগুণ বিচার করার কোন ক্ষমতাই নেই তোমাদের।

উইলেম বলল, তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো? আমি যতক্ষণ ওর কাছে থাকি তার পূর্ণ বিবরণ দান করতে পারি।

অরেলিয়া অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, নাও নাও, খুব হয়েছে। এখন দেবী হয়েছে। স্বর্গলোকের উজ্জ্বল পাখি আমার! যাও যাও খুব হয়েছে।

অরেলিয়া আর দাঁড়াল না। অরেলিয়া চলে গেলে কেমন ভারী হয়ে উঠল উইলেমের মনটা। তার মনের কথাটা ঠিক বোঝাতে পারল না অরেলিয়াকে।

পোষাক খুলে শুতে যাবার জন্য শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল উইলেম। কিন্তু ঘরের চৌকাঠের কাছে মেয়েমানুষের একজোড়া চটি দেখে থমকে দাঁড়াল। উইলেম বুঝতে পারল এ চটি ফিলিনার। ঘরের পর্দাটা উড়ছে। উইলেমের মনে হলো ফিলিনা তার শোবার ঘরে ঢুকে তার বিছানায় হয়ত শুয়ে আছে। এক নির্লজ্জ রসিকতায় মেতে উঠেছে যেন। উইলেম কড়া গলায় ডাকল, বেরিয়ে এস ফিলিনা, আমি এসব বাজে রসিকতা ভালবাসি না।

কোন সাড়া না পেয়ে পর্দাটা সরাতেই দেখল ভিতরে কেউ নেই। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল উইলেম। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। রাত্রে মোটেই ঘুম হলো না তার। চারদিক খুঁজেও ফিলিনার দেখা পেল না। কিন্তু বুঝতেও পারল না কে এই নারী।

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল উইলেম। অনেক বেলায় সার্লো এসে ডাকাডাকি করতে লাগল। বলল, কত কাজ আজ। আজ রাত্রেই নাটকাভিনয়।

সন্ধ্যার সময় নাটক শুরু হবার আগে উইলেম দেখল বেশ লোক হয়েছে। শ্রোতাদের বেশ ভিড় হয়েছে। ভয়ে ভয়ে নাটক শুরু করলেও কিছুক্ষণ পরেই প্রেত এসে হাজির হলো। কিন্তু তার মুখ ও সারা দেহ কাপড়ে ঢাকা থাকায় কেউ তাকে চিনতে পারল না। কেউ বুঝতে পারল না কে এইভাবে প্রেত সেজে তার পূর্বপ্রদত্ত পত্রগত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এসেছে।

হোরেশিও দেখিয়ে দিলে তার কথামত প্রেতের দিকে কিছুটা এগিয়ে এল

হ্যামলেটবেশী উইলেম। প্রেতকে ঠিক না চেনায় এক অতিপ্রাকৃত রহস্যময় অনুভূতি গাঢ় হয়ে উঠল উইলেমের মনে। তার উপর সম্প্রতি তার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সেই অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হলো তার আপন হৃদয়ের অকৃত্রিম শোকানুভূতি। সব মিলিয়ে অপূর্ব হয়ে উঠল হ্যামলেটের অভিনয়। প্রেতও তার দীর্ঘ সংলাপটি ভালভাবেই ব্যক্ত করল। স্বল্প ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘেরা শুভ্র বস্ত্রাবৃত প্রেতমূর্তি ও তার রহস্যময় সংলাপ এক চমৎকার অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করল মঞ্চের উপর। অতিপ্রাকৃত হলেও বাস্তব সত্যের প্রতীতী জন্মাল দর্শকদের মনে। অভিভূত হয়ে গেল দর্শকরা। এই দৃশ্য শেষে হ্যামলেট যখন মঞ্চ ত্যাগ করে প্রস্থান করল তখন ঘন ঘন হাততালি দিতে লাগল দর্শকরা। এর পর সব অভিনেতাই উৎসাহ পেয়ে ভাল অভিনয় করল। সব মিলিয়ে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করল নাটকাভিনয়।

অভিনয় শেষে অভিনেতারা ঠিক করল তারা আপন আপন নাটকীয় পোষাক পরেই একসঙ্গে বসে নৈশভোজন করবে। খাওয়ার পর ওরা সবাই আনন্দ করতে লাগল। মেয়েরা গান করতে শুরু করল। সেই উন্নাসিক বৃদ্ধও বীণাবাদকের বীণায় একটা সুর বাজাতে লাগল। মাদাম মেলিনা এতদিন পর উইলেমের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাসিক্ত আসক্তি দেখাতে লাগল। লার্তেস শিস দিতে লাগল মুখে। সার্লো মুখে বাজী ছোঁড়ার শব্দের অনুকরণ করতে লাগল। সমস্ত দলটার মধ্যে একমাত্র অরেলিয়াই চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপর একসময় বলল, এবার ওঠা যাক।

ক্লান্ত হয়ে উইলেম তার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল তাড়াতাড়ি। ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসছিল তার। কিন্তু হঠাৎ কিসের এক মৃদু শব্দ হলো বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বোঝার আগেই এক অদৃশ্য নারীর নরম হাত জড়িয়ে ধরল তার দেহটাকে। তার মুখে তার ঠোঁট দুটো চেপে ধরল এমন জোরে যে উইলেম তা ঠেলে প্রথমে সরিয়ে দিতে পারল না।

কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে পোষাকটা পরতে গিয়ে সে দেখল ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল এবং দরজাটা খোলা। ঘরের আলো জেলে দেখে বিছানায় বা ঘরে কেউ নেই। তবে কে এই নারী! আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল উইলেম। প্রথমে তার সন্দেহ হলো এ নিশ্চয় ফিলিনার কাজ। কিন্তু পরে দেখল সে নয়। এদিক সেদিক তাকাতে বিছানার উপর

দেখল একটা ওড়না পড়ে রয়েছে। তার মনে হলো এই ওড়নাটা যেন প্রেতমূর্তির গায়ে জড়ানো ছিল। তার আঁচলের কাছে সেলাইকরা একটা লেখা, 'এই প্রথম এবং শেষবারের মত বলে দিচ্ছি, পালিয়ে যাও যুবক, পালিয়ে যাও।'

এই লেখাটাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

পরদিন সকালবেলায় ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল এর পর কোন নাটকের রিহার্সাল শুরু করবে আজ সন্ধ্যে থেকে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, হ্যামলেটই অভিনীত হবে আবার। উইলেম তখন সতর্কবাণী খোদিত সেই রহস্যময় ওড়নার কথাটা বলল। তখন ঠিক হলো প্রেতের ভূমিকা দলের কাউকেই দেওয়া হবে। বাইরের কোন লোককে প্রেতের ভূমিকা দেওয়া হবে না। এলেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সার্লো বলল, আমাদের দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে এইভাবে ভয় দেখানো বরদাস্ত করব না আমরা।

প্রাথমিক আলোচনা ও কথাবার্তার পর সভা ভঙ্গ হতে আপন আপন ঘরে সবাই চলে গেল। হঠাৎ মিগনন ছুটে এসে উইলেমের ঘরে ঢুকে বলল, মালিক, মালিক, আগুন লেগেছে। শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন। অরেলিয়া একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার ছেলে ফেলিক্সকে উইলেমের হাতে তুলে দিল। মিগননও তাকে বলল, আপনি ছেলেটাকে দেখুন। আমি অন্য সবাইকে দেখছি। এই বলে মিগনন ছুটে অন্যত্র চলে গেল।

উইলেম প্রথমে অতটা গুরুত্ব দেয়নি। সে দেখল বীণাবাদক উপরতলা থেকে তার বীণা হাতে বেরিয়ে আসছে। ফেলিক্সকে বীণাবাদকের হাতে তুলে দিয়ে উইলেম আগুনের উৎসটা কোথায় তা দেখার জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগল। পরে দেখল আগুনের উৎস এ বাড়িতে নেই। ধোঁয়াটা আসছে বাগানবাড়ির ওধার থেকে। কিন্তু উৎস যেখানেই থাক, আগুনটা ক্রমশই জোর হতে লাগল। তিন চারটে বাড়ির কাঠের জিনিসপত্র অনেক কিছু পুড়ে গেল। উইলেম পাড়ার লোকদের সাহায্যে অনেক কষ্টে আগুন নেভাল। এমন সময় মিগনন এসে উইলেমকে ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি করতে লাগল, মালিক, তাড়াতাড়ি এস, ফেলিক্সকে বুড়োটা মেরে ফেলবে। ও হঠাৎ পাগলা হয়ে গেছে।

মিগননের সঙ্গে বাগানবাড়িতে ছুটে গিয়ে উইলেম দেখল শুকনো কাঠ আর খড়ের গাদায় আগুন জ্বলছে। আর তার পাশে ফেলিক্সকে শুইয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বীণাবাদক তার বীণাটা ধরে রয়েছে। উইলেম গিয়ে বৃদ্ধকে বলল, এসব

কি হচ্ছে ?

মিগনন তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ছেলেটা তখন চিৎকার করে কাঁদছিল। বৃদ্ধ উইলেমের কথার কোন উত্তর দিল না। তাকে আর কিছু না বলে তাদের বাড়িটায় চলে এল সে। তার ট্রাঙ্কটা কোনরকমে রক্ষা পেয়েছে। তবে কাপড় জামা অনেক পুড়ে গেছে। গোটা বাড়িটার ঘরগুলো থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছিল।

মিগনন উইলেমকে দেখতে পেয়ে বলল, মালিক, আজ একটা বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি আমরা। মৃত্যুর কবল থেকে কোনরকমে বেঁচে গেছে ফেলিক্স। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আসল ব্যাপারটা জানতে পারল অবশেষে। মিগননের হাত থেকে লণ্ঠনের আলো দিয়ে খড়ের গাদায় বুড়ো বীণা বাজিয়েটাই আগুন লাগায়। তারপর ছেলেটাকে পাশে ফেলে তার গলাটা ছুরি বার করে কাটতে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ছেলেটাকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছে সে। এমন সময় মিগনন তা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে লোক ডাকে। ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে অন্যত্র সরিয়ে রেখে উইলেমকে ডেকে আনে।

কিন্তু আগুনের জন্য তখন এ বিষয়ে আর মন দিতে পারল না উইলেম। সারাটা রাত কেটে গেল আগুন নেভাতে গিয়ে। তখন সকাল হয়ে গেছে। কনকনে শীতে কাঁপছিল সবাই। আগুন নিভে গেলেও ঘরগুলো গরম ছিল। জিনিসপত্র বেশ কিছু পুড়ে গেলেও মানুষজনের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে ঘরগুলোর কিছু কিছু ক্ষতি হওয়ায় উইলেম আপাততঃ বাগানের মধ্যে যে বাড়িটা খালি ছিল সেখানে গিয়ে উঠল। বৃদ্ধ বীণাবাদককে আর দেখা গেল না। কেউ তার খোঁজও করল না।

সেই দিনই বেলা দশটার সময় সার্লো দলের সবাইকে ডাকল। বলল, রিহার্সাল হবে হ্যামলেটের। আজ রাত্রেই আবার অভিনয় হবে। বিশেষ করে যে সব দৃশ্যে নূতন লোক ভূমিকা গ্রহণ করছে।

আজকের রাত্রিতে নাটকের অভিনয় নিয়ে নগর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু বাদানুবাদ হয় সার্লোর। নগর কর্তৃপক্ষ ও জেলাশাসক বললেন, এত বড় অগ্নিকাণ্ডের পর নাট্যানুষ্ঠান দিনকতক বন্ধ থাক।

সার্লো বলল, প্রথম কথা, আমাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। নাটক করে তা পূরণ করতে হবে। দ্বিতীয় কথা, এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে দলের লোকের মনমেজাজ খুব খারাপ। নাটকের অভিনয় আবার সেই মনকে খুব তাড়াতাড়ি

আনন্দ দান করে গরম করে তুলতে পারে।

অবশেষে অনুমতি পায় সার্লো। নাটকের ঘোষণা শুনে দর্শকদেরও বেশ ভিড় হয়। প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে যায়। তবে আজকের দর্শকরা প্রায় সব নূতন। তাই তারা গতকালকার অভিনয়ের সঙ্গে আজকের অভিনয়ের গুণগত মানের কোন বিচার করে দেখতে পারল না। মোটের উপর নির্বিঘ্নেই কেটে গেল নাটকের অভিনয়।

অভিনয় শেষে ফিলিনা তাকে একটু ধাক্কা দিয়ে কি বলল বুঝতে পারল না উইলেম। হঠাৎ সেদিনকার রাত্রির কথাটা মনে পড়ে গেল তার। ফিলিনার সেই চটিজোড়াটা যেটা সরিয়ে রেখেছিল সে তা পুড়ে গেছে। তার ঘরের সেই দরজাটাও পুড়ে গেছে। যাই হোক, বাগানবাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল উইলেম। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল বাগানে। মৃদু মন্দ বাতাস বইছিল। ফিলিনা যা বলল তাতে মনে হলো ও রাত্রিতে তার কাছে আসবে। কিন্তু উইলেমের মনে হলো ও না এলেই ভাল হয়। তবে তার কাছ থেকে কয়েকটা কথা জানতে চায় সে।

বাগানবাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ বীণাবাদকের গলার স্বর ভেসে আসতেই থমকে দাঁড়াল উইলেম। বাড়ির সদর দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। তার চাবি তার কাছে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার বীণাবাদক তার হাতের বীণাটা নিয়ে ভেতর থেকে দরজার কাছে এসে দরজা বন্ধ দেখে পাঁচিল টপকাতে যাচ্ছে। উইলেম বাইরে থেকে বাধা দিল। নিজের হাতে দরজাটা খুলে বাড়ির ভিতরে ও বৃদ্ধকেও জোর করে ঢুকিয়ে দিল। বৃদ্ধ বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি চিরদিনের মত চলে যাব এখান থেকে।

উইলেম বলল, তুমি এই বাগানবাড়ি থেকে চলে যেতে পার কিন্তু শহর থেকে পালাতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সব জেনে গেছে। তোমাকে খুঁজছে অনেকে।

বাড়ির ভেতরে জোর করে বৃদ্ধকে নিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

উইলেম বুঝতে পারল মস্তিষ্কের বিকৃতির জন্য এই জঘন্য কাজ করে ফেলেছে বৃদ্ধ বীণাবাদক। তাই ভাবতে লাগল কি করা যায় ওকে নিয়ে। এমন সময় লার্তেস এসে তাকে একটা খবর দিল। লার্তেস বলল, আমি কিছুক্ষণ আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে জানলাম তারও বিষাদের অত্যধিক চাপ

থেকে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল। কিন্তু এক গ্রাম্য যাজক তা সারিয়ে দিয়েছে।

সেই যাজকের খোঁজ নিয়ে বৃদ্ধকে সেখানেই পাঠিয়ে দিল উইলেম। তার আগের বীণাটা পুড়ে যাওয়ায় আবার তাকে একটা বীণা কিনে দেওয়া হয়। সেই বীণাটা তার সঙ্গেই দেওয়া হলো।

এদিকে ফিলিনার হাবভাবটা কেমন যেন হয়ে উঠছিল দিনে দিনে। সমগ্র-ভাবে দল ও দলের লোকজনদের প্রতি তার একটা অনাসক্তি গড়ে উঠেছিল যেন দিনে দিনে। ফিলিনা অন্য একটা ঘর ভাড়া করে উঠে গিয়েছিল। সে থাকত এলমিরা নামে একটি লোকের সঙ্গে। সে সার্লোর কাছে খুব কম আসত। এতে অরেলিয়া বিশেষ খুশি হয়। কিন্তু সার্লো মাঝে মাঝে তার কাছে যেত। তার প্রতি একটা দুর্বলতা তখনো ছিল। একদিন সার্লো উইলেমকে নিয়ে ফিলিনার বাড়ি গেল তার সঙ্গে দেখা করতে।

ওরা গিয়ে দেখল, ফিলিনা একজন যুবক অফিসারের সঙ্গে বসে রয়েছে ভিতরকার ঘরে। বাইরের ঘরে সার্লো আর উইলেম বসতে ফিলিনা একবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সার্লো এবং উইলেম দুজনেই বলল, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ, আমরা একটু আলাপ করতে চাই।

ফিলিনা বলল, আসলে উনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। বিশেষ কারণে উনি আমার কাছে পুরুষ সেজে আছেন।

উইলেম বলল, আমি একবার দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে। ওঁর নাম কি ?

ফিলিনা বলল, তা বলব না। আমি প্রথম ওকে জানাব। ওঁর মত হলে আমি তোমাদের খবর দেব। তখন এসে আলাপ করবে।

উইলেমের একবার মনে হলো, মেয়েটি হয়ত তার মেরিয়ানা। অনেকটা তার মত দেখতে। তবে মেরিয়ানার থেকে একটু লম্বা মনে হলো।

কিন্তু দুই একদিনের মধ্যেই দল ছেড়ে জায়গাটা ছেড়ে চলে গেল ফিলিনা। তার বাড়িওয়ালার কাছে শুনল, সেই যুবক অফিসারের সঙ্গে ফিলিনা তার সব ভাড়া ও দেনা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। আর আসবে না। কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

ফিলিনার এই আকস্মিক অন্তর্ধান দলের লোকদের মধ্যে এমন কোন আলো-ড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। সার্লোও ব্যাপারটা সহজভাবে মেনে নিল। তার জায়গায় অভিনয়ের জন্য অন্য মেয়ের ব্যবস্থা করল।

ফিলিনা ছিল দলের মধ্যে এক সংযোগসূত্র। দলের বিভিন্ন লোকের মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকত হাসিখুশি দিয়ে তা ভরিয়ে তুলত ফিলিনা। ফিলিনা চলে যেতে কেমন যেন শিথিল হয়ে উঠল পারস্পরিক যোগসূত্র। ফিলিনা উইলেম আর সার্লো দুজনকেই খুশি রাখত। অরেলিয়ার সব বিতৃষ্ণা ও বিরক্তি নীরবে সহ্য করত। কেউ কোন বিষয়ে রেগে গেলে বা মতান্তর দেখা দিলে তাকে বোঝাত। তাই প্রথম প্রথম ফিলিনার অভাবটা বোঝা না গেলেও ক্রমে তা সবাই অনুভব করতে লাগল।

ফিলিনা চলে যাবার পর অরেলিয়ার জ্বর হতে লাগল, মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠল। একদিন উইলেম তার কাছে ফরাসী ভাষায় একটা লেখা পাঠ করতে গিয়ে বেশ বকুনি খেল। অরেলিয়া বলল, যে লোকটা আমাকে ঠকিয়ে চলে যায় সে ফরাসী ভাষায় কথা বলত। সেই থেকে ফরাসী ভাষা শুনলেই লোকটাকে মনে পড়ে। আমার মাথায় নূতন করে আগুন জ্বলে যায়।

উইলেম হঠাৎ একদিন এর মাঝে বীণাবাদকের খবর নিতে গেল সেই গ্রামে। যাজকের কাছে যেতেই উইলেম দেখল বৃদ্ধ বীণাবাদক একটা ছেলেকে বীণা বাজানো শেখাচ্ছে। যাজক বললেন, মানুষের বিক্ষিপ্ত ব্যথাহত বা হতাশাগ্রস্ত মনকে যদি কোন সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করতে পারা যায় এইভাবে তা হলে সে কখনই উন্মাদ হতে পারে না। আবার অনেক উন্মাদ ব্যক্তিকেও এই ভাবে সারিয়ে তোলা যায়।

কথা বলতে বলতেই ডাক্তার এলেন। উইলেম আলাপ করল তাঁর সঙ্গে। ডাক্তার কথা প্রসঙ্গে বললেন, আরো দুটি কেস আমি পেয়েছি। এই দুটো কেসেই দেখা যায় এক গভীর হতাশা আর বিষাদ থেকে এই উন্মাদ ভাব গড়ে উঠেছে। এঁরা দুজনেই কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বামী স্ত্রী। এক কাউন্ট ও তাঁর স্ত্রী। তাঁদের কোন সন্তানাদি নেই। এদের বয়স কম। একবার এই কাউন্ট শিকারের ব্যাপারে দু একদিনের জন্য বাইরে যান। তখন বাড়ির লোকজনেরা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে এক যুবককে কাউন্টের পোষাক পরিয়ে তাঁর শোবার ঘরে বসিয়ে রাখে। তারা ভাবে কাউন্টপত্নীকে এইভাবে ঠকিয়ে বেশ মজা করবে। কিন্তু আসলে আমার মনে হয় তাদের উদ্দেশ্য ছিল কাউন্ট ও কাউন্টপত্নীকে হেয় প্রতিপন্ন করে পরিবারের উপর কলঙ্ক আরোপ করা। কাউন্ট ঐ সময় হঠাৎ ফিরে এসে তাঁর শোবার ঘরে তাঁর বেশে এক যুবককে বসে থাকতে দেখে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অন্য ঘরে চলে যান। তাঁর ধারণা হয় তিনি

নিজেরই প্রেতাত্মাকে দেখেছেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আর বেশী দিন বাকি নেই। এখন কাউন্ট ভদ্রলোক তাঁর বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় পরিজন কারো সঙ্গে মেশেন না।

উইলেম রুদ্ধশ্বাসে সব শুনে বলল, আর তাঁর স্ত্রী?

ডাক্তার বললেন, স্ত্রীর মানসিক অবস্থা আরো খারাপ। তিনি আরো বেশী পরিমাণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঐ যুবকটি প্রাসাদ থেকে চলে যাবার সময় তাঁর কাছে যখন বিদায় নিতে যায় তখন তাঁর প্রতি তার গোপন আসক্তির কথাটা প্রকাশ করে ফেলেন কাউন্টপত্নী। তখন যুবকটি সাহস পেয়ে কাউন্ট-পত্নীকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে। কাউন্টপত্নীর বুকের কাছে তাঁর স্বামীর একটা ফটো ছিল। আবেগের বশে যুবকটি কাউন্টপত্নীর বুকের উপর চাপ দিতে গিয়ে ফটোটি ভেঙ্গে ফেলে। তাতে তার বুকের কাছটা সামান্য একটু হয়ত ছিঁড়ে যায়। আসলে আমি ডাক্তার হিসাবে বলছি তাতে তাঁর দেহের কোন ক্ষতি হয়নি। তবু তাঁর ধারণা সেই ক্ষতটা বেড়ে উঠছে দিনে দিনে এবং শীঘ্রই সেটা এক দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে পরিণত হয়ে তাঁর যৌবনসৌন্দর্যকে চিরতরে নষ্ট করে দেবে।

আর শুনতে পারল না উইলেম। চোখ মুখে হাত দিয়ে এক সকরুণ অসহনীয়তাকে প্রকাশ করে অকস্মাৎ চলে গেল সে। অবাক হয়ে তার পথ-পানে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার। উইলেম ভাবতে লাগল এই পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য সে-ই হচ্ছে একমাত্র দায়ী। তারই জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে এক সুখী দম্পত্তির সুন্দর জীবন।

ফিরে এসে উইলেম দেখল অরেলিয়ার অসুখটা বেড়ে উঠেছে। তার ইচ্ছা ছিল অরেলিয়াকে সেই মনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে দেখাতে। কিন্তু দেখল আর তা সম্ভব নয়। তাছাড়া অরেলিয়া যাবে না। তার জ্বর বেড়ে গেছে। মেজাজটা আরো খিটখিটে হয়ে উঠেছে। আজকাল সার্লো আর বেশী খোঁজখবর নেয় না তার। ফিলিনা চলে যাওয়ার পর হাস্যরসিক বৃদ্ধ অভিনেতার দুই কন্যার একজন এলমিরার উপর অত্যধিক আসক্ত হয়ে উঠেছে সে। এলমিরা শেষের দিকে ফিলিনার কাছেই থাকত।

এদিকে উইলেমের অনুপস্থিতিতে মেলিনা এক চক্রান্ত করে বসেছে। সে অনেক বুঝিয়ে সার্লোকে হাত করে। সে বলে এই থিয়েটার ছেড়ে এক নূতন অপেরার দল গড়ে তোলা যাক। উইলেমের হাত থেকে পুরো কর্তৃত্বভার

সার্লো নিয়ে নিক। তাতে লাভ বেশী হবে আর জনপ্রিয়তাও তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে।

একদিন সেই অপেরায় খুব প্রাণ দিয়ে অভিনয় করল অরেলিয়া। ভূমিকাটা খাপ খেয়ে গিয়েছিল তার ব্যথাহত ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে। আবেগটা একটু বেশী প্রকাশ করে ফেলল সে। তবু তা দর্শকদের ভাল লাগল। স্বাভাবিক মনে হলো। ফলে প্রচুর হাততালি পেল। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় এত পরিশ্রম তার সইল না। অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল তার অভিনয় শেষ হবার পর থেকেই।

অরেলিয়া উইলেমকে ডেকে পাঠাল। ফেলিক্স তার কাছেই বরাবর আছে। মিগনন তাকে খুব ভালবাসে। অরেলিয়া উইলেমের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল আমার অবিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে এটা পৌছে দেবে। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে সে এলে ওকে আমি শেষবারের মত আলিঙ্গন করব। আর আমি তার আগেই মরে গেলে তাকে তুমি সান্ত্বনা দেবে। বলবে আমি তাকে ক্ষমা করেছি। আমি তার মঙ্গল কামনা করেছি।

হঠাৎ মেজাজটা অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে উঠল অরেলিয়ার। এতটুকু বিরক্তি বা অসহিষ্ণুতার ভাব নেই। কোন রোগযন্ত্রণা বা দুর্বলতার চিহ্নও নেই।

পরদিন নিয়মিত খবর নিতে গিয়ে উইলেম দেখল অরেলিয়া আর নেই। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেই তার অবিশ্বস্ত বন্ধুর উদ্দেশ্যে আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে রওনা হলো উইলেম। অরেলিয়া তার মনের কথা আত্মজীবনীমূলক একটি রচনায় সব লিখে যায়। সেটা উইলেম পড়ে দেখে। লেখাটা ভালই হয়েছে। উইলেম ঠিক করল লোকটার দেখা পেলে সে প্রচুর ভর্ৎসনা করবে তাকে। আসলে তার হৃদয়হীনতাই অরেলিয়ার অকালমৃত্যুর কারণ হলো। ফেলিক্সকে মিগননের কাছে রেখে একদিন সকালে তার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল উইলেম। ●

অরেলিয়ার স্বীকারোক্তি

আট বছর পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্যটা ভালই ছিল। কিন্তু এই সময় একবার নয় মাস কাল শয্যাগত হয়ে থাকতে হয় আমাকে এক কঠিন রোগে। এই দীর্ঘ রোগভোগ কালেই আমার আজকের এই মানসিকতার ভিত্তি রচিত হয়।

তার পর থেকেই শরীরটা আবার ভেঙে পড়ে। জ্বর সর্দি প্রায়ই হত।

যতক্ষণ দেহে আমার রোগ থাকত আমি চুপ করে নীরবে শুয়ে থাকতাম বিছানায়। আমার সহ্যশক্তি বেড়ে গিয়েছিল দিনে দিনে। কিন্তু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি পাগলের মত জীবনকে উপভোগ করতে চাইতাম। হাতের কাছে যা কিছু আনন্দের উপকরণ হিসাবে পেতাম তাই অপরিসীম আগ্রহে ও আকুলতায় জড়িয়ে ধরতাম। বাবা আমাকে অনেক পুতুল ও ছবির বই এনে দিতেন। তিনি নিজে অবসর সময়ে বাইবেলের কাহিনী শোনাতেন। তবে আর একটু বড় হলে পুতুল ও ছবিগুলো প্রাণহীন মনে হল আমার কাছে। আমার দৃষ্টি পড়ল তখন পোষা কুকুর পাখি প্রভৃতির উপব যাদের ভালবাসলে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া যায়।

বছরখানেক পর সেরে উঠলাম আমি। আমার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম। কিন্তু বালসুলভ এক উচ্ছলতা উবে গেল আমার প্রকৃতি থেকে। বয়স অনুপাতে কেমন যেন বেশী গম্ভীর হয়ে উঠলাম। এরপর কিছু বইপত্রও পড়লাম। তাদের মধ্যে ছিল ক্রিশ্চান জার্মাণ হার্কিউলেস, দি রোমান অক্টেভিয়া প্রভৃতি আরও কত কি। পড়ার সঙ্গে রান্নাও শিখতাম মার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শিখতে লাগলাম ফরাসী ভাষা, চিত্রশিল্প আর নৃত্য। আমাকে ফরাসী ভাষা শেখাবার জন্য একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর শেখাবার কৌশলটা ছিল বড় চমৎকার। বড় হৃদয়গ্রাহী। তিনি যতক্ষণ থাকতেন বড় ভাল লাগত আমার। আবার কখন আসবেন তার জন্য মুহূর্ত গণনা করতাম আমি।

একবার এক নাচের আসরে দুটি সুদর্শন যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তখন আমার বয়স মাত্র তের কি চোদ্দ। ছেলে দুটি ছিল ভাই। একজন আমার সমবয়সী আর একজন আমার থেকে দু বছরের বড়। তারা দুজনেই দেখতে ছিল ভারী সুন্দর। তাদের আমার খুব ভাল লাগত। আমি তাদের সঙ্গে নাচতে ভালবাসতাম। তাদের সঙ্গে নাচবার জন্য আমি যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করতাম। একবার বড় ভাইএর অসুখ করে। আমাকে তারা বাড়িতে ডেকে পাঠায়। আমাকে দেখে অসুস্থ ছেলেটি যেন নূতন করে প্রাণ ফিরে পায়। আমার প্রতি তার এই ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। তখন থেকে তাদের দুজনের মধ্যে তাকেই ভালবাসতে থাকি আমি। তার শরীরটা রোগা এবং প্রায়ই সে ভুগত বলে তার জন্য প্রার্থনা জানাতাম আমি ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু তাতে ছোট ভাই রেগে যেত।

ঠিক এই সময় একদিন বাবা তাঁর এক পরিচিত যুবককে বাড়িতে নিয়ে এলেন। যুবকটি ভাল চাকরি করত বৈদেশিক বিভাগে। এক সান্ধ্য আড্ডায় তার সঙ্গে রোজ দেখা হত বাবার। সেইখানেই আলাপ। তার কথাবার্তা ও আচরণ বেশ মিষ্টি লাগল আমার। বাবাও তার প্রায়ই প্রশংসা করতেন। একদিনকার এক ঘটনায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা দুজনে। যুবকটির নাম ছিল নার্সিস।

একদিন কোন এক বাড়িতে এক সান্ধ্য ভোজসভায় আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। এই ধরনের ভোজসভায় আমার যেতে মোটেই মন সরত না। আমাদের সমাজের লোকদের মোটেই ভাল লাগত না আমার। কারণ তাদের মধ্যে কোন সংস্কৃতিবোধ ছিল না। বিজ্ঞান বা কলাবিদ্যা কোনটার প্রতিই ঝোঁক ছিল না তাদের। তারা শুধু পশুর মত খেতে আর ফুর্তি করতে জানত। হৈ হুল্লোড় আর আমোদ আহ্লাদের প্রতি তাদের প্রবণতা ছিল সবচেয়ে বেশী। আমার নিজের সমাজের প্রতি অনীহার জন্য যে ফাঁক বা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আমার মনে নার্সিস তা পূরণ করে দিয়েছিল।

আমার বোনরা গেলেও সেই সান্ধ্য ভোজের আসরে আমি গেলাম না। কিন্তু যখন শুনলাম নার্সিসও সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছে এবং যাবে তখন না গিয়ে পারলাম না। গিয়ে দেখি সবাই খুব মদপান করেছে। 'ফরফিট' খেলা চলছে। ওই খেলায় হারলেই তাকে জরিমানা দিতে হয়। নার্সিস হারলে তার জরিমানাস্বরূপ একটা শাস্তি দেওয়া হয় তাকে। সে উপস্থিত প্রত্যেকের কানে কানে একটা করে মিষ্টি কথা বলে বেড়াবে। নার্সিস তাই করতে শুরু করে দিল। কোন এক ক্যাপ্টেনের এক সুন্দরী স্ত্রী ছিল। সেই মহিলার কানে মিষ্টি কথা বলতে গিয়ে অনেকক্ষণ তার গা ঘেঁষে কানে মুখটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নার্সিস। এতে তার স্বামী ক্যাপ্টেন খুব রেগে গেল। রেগে গিয়ে এক ঘুঁষি মেরে দিল নার্সিসকে। তারপর দুজনেই তরবারি বার করল খাপ থেকে। কিন্তু নার্সিস তা বার করার আগেই ক্যাপ্টের তার পিঠে, মাথায় ও হাতে তরবারির ঘা বসিয়ে দিল। নার্সিসের গা থেকে রক্ত পড়তে লাগল। তাকে নিয়ে আমি সেই বাড়িরই একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ক্যাপ্টেনকে ওরা শান্ত করল। তারপর ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ করে দিল নার্সিসকে। কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্য ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল সে। তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। আঘাতের জন্য জর এসে গেল।

কথাটা শুনে আমার বাবা খুব রেগে গেলেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তাকে আহত করলেন। এদিকে নার্সিসের সেরে উঠতে মাস দুই লাগল। সেরে উঠেই আমাদের বাড়ি এসে প্রথমে আমাকে ধন্যবাদ জানাল যেন আমিই তার একমাত্র উদ্ধারকারিণী।

এরপর থেকে প্রায়ই সে আমাকে তার প্রেমের কিছু কিছু নিদর্শন পাঠাত। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হত। তবে আমাদের মেলামেশার মধ্যে কোন উত্তাপ বা উচ্ছ্বাস ছিল না। আমি আমার মনের কথা কারো কাছে বলতে পারতাম না। স্বভাবতই এই সময় প্রায়ই ঈশ্বরের কথা ভাবতাম। আমার স্বাস্থ্য ও দেহগত শান্তি ফিরে পাওয়ার জন্য প্রায়ই ধন্যবাদ জানাতাম তাঁকে।

বসন্তকাল আসতেই একদিন খবর না দিয়ে হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হলো নার্সিস। আমি তখন আমার ঘরে একা ছিলাম। সে এল এবার পূর্ণ প্রেমিকের বেশে। আমাদের ভালবাসাবাসির ব্যাপারে সে খোলাখুলিভাবে আমার মত চাইল।

তার প্রতি আমার কিছুটা শ্রদ্ধা ও আসক্তি থাকলেও তাকে আমার সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হল না। তবু আমি সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান না করে আমার বাবা মার মত নিতে বললাম। সে বাবাকে বুঝিয়ে বলল। বাবা আমার মত চাইলেন। আমি চুপ করে রইলাম।

যাই হোক, এইভাবে আমাদের প্রেম পারিবারিক সমর্থন লাভ করল। কিন্তু আমার অমতে বিয়েটা হলো না। নার্সিসকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম। আমার বেশভূষার সকল পারিপাট্য আমার নৃত্যের সমস্ত ছন্দ তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। আমি তাকে খুশি করার জন্য এসব করতাম। কোন ভোজসভায় সে না গেলে আমিও যেতাম না। তবু দেহ মনের ব্যবধানটা আমাদের মাঝে সমানেই রয়ে গেল। এতে নার্সিসের অমত ছিল। তা থাকাই স্বাভাবিক। তবু আমার জেদ। দেহসংসর্গহীন কামবন্ধহীন এক মহৎ প্রেমের বায়বীয় ভাবাদর্শে মত্ত হয়ে উঠেছিলাম আমি যেন মনে মনে।

আমি বই পড়তে ভালবাসতাম। বেশীর ভাগ সময় একা একা থাকতে চাইতাম। নার্সিস প্রায়ই আমার জন্য বিভিন্ন রকমের বই নিয়ে আসত। নানা বিষয় আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করত। আমি কিন্তু আমার মনের কথা বেশী প্রকাশ করতাম না। এই সময় আমাদের পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবার এসে

বাস করতে থাকে। কোন কাউণ্টের পরিবার। উঁচু মহলে তাদের যোগাযোগ। ক্রমে আমি তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম।

সরকারী বিভাগে এক সময় কিছু ভাল পদ খালি হলো। তাতে নার্সিস ঢোকার জন্ত অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু পরে দেখা গেল তার থেকে অযোগ্য ব্যক্তিরা সে পদ পেয়ে গেল। তার সঙ্গে আমিও কিছুটা হতাশ হলাম। তবু তাকে সান্ত্বনা দিলাম।

আমাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে শহরের চারদিকে কথা উঠতে লাগল। আমার সুনাম জড়িয়ে আছে এ কথার মধ্যে। আমি আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলার জন্ত চাপ দিলাম নার্সিসের উপর।

কিন্তু নার্সিস স্পষ্ট জানিয়ে দিল সে ভাল চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। তবে চাকরি পেলেই বিয়ে করবে। আমি বাড়িতে জানিয়ে দিলাম আমাদের বিয়ের ব্যাপারে সব ঠিক হয়ে আছে। তার জন্ত ভাবতে হবে না। মাস খানেকের মধ্যে নার্সিস চাকরি পেয়ে গেল। এবার নার্সিস এসে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। কিন্তু সেই প্রস্তাবের সঙ্গে এমন এক শর্ত জুড়ে দিল যা মানা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে। নার্সিস বলল, তার স্ত্রী হিসাবে আমার কোন গোঁড়া মতবাদ পোষণ করা চলবে না। অর্থাৎ তার মতে চলতে হবে। আমার নিজের মত সব ব্যাপারে জাহির করা চলবে না। আমি তাকে ধন্তবাদ দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। নার্সিস তখন বিদায় নিল আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্ত। পরে বিয়ে হয় ওর। সুখে ঘর সংসার করতে থাকে। আমার কাছেও বিয়ের জন্ত অনেক ভাল প্রস্তাব আসতে লাগল। কিন্তু আমি কিছু ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

তবে নার্সিসকে হারিয়ে আমি যেন এই মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলাম। মহৎ প্রেমের বায়বীর ভাবাদর্শটা কেমন উবে গেল মুহূর্তে। আমি আমার বেশভূষা ও পোষাক আশাকের দিকে মন দিলাম। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলাম।

এই সময় আমাদের বাড়িতে আমার এক খুড়তুতো ভাই যাতায়াত শুরু করলেন। তিনি আমাদের বাড়ি আগে বিশেষ আসতেন না। বহুদিন তাঁকে দেখিনি। তিনি তাঁর মার একমাত্র সন্তান। ভবিষ্যতে সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন তিনি। বর্তমানেও তাঁকে কোন চাকরি করতে হয় না। কিন্তু আমার বাবাকে চাকরির মাইনেটার উপর নির্ভর করতে হয়।

কাকাকে আসা যাওয়া করতে দেখে আমাদের বাড়ির কেউ কেউ মনে করল, তিনি আর বিয়ে থা করবেন না। তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান মারা যায়। তার পর থেকে তিনি আর বিয়ে করেন নি। তাই সবাই ভাবল আর যদি কাকা বিয়ে না করেন তাহলে তাঁর মোটা বিষয়-সম্পত্তি সব আমাদের দান করে যাবেন।

কিন্তু কাকা এবার তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা বললেন। তিনি বললেন, আমার ছোট্ট বোনটাকে তিনি তাঁর ঠিক করা এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। পাত্রটি ভাল। ভবিষ্যতে তিনিই তাদের দেখাশোনা করবেন। আর পাশের গ্রামে একটা চার্চে আমার একটা চাকরি ঠিক করেছেন। যা হোক কিছু করে নিয়মিত মাইনে পেয়ে যাব।

কাকার পছন্দ করা পাত্রকে আমার ছোট বোনের ঠিক পছন্দ না হলেও কাকার মুখের উপর কথা বলতে পারল না। সুতরাং বিয়ে হলো। আমিও চাকরি করতে লাগলাম। কিন্তু আমার শরীরে সহ্য হলো না। অসময়ে খাওয়া দাওয়া, অত্যধিক হাঁটাহাঁটি এ সব সহ্য হলো না আমার শরীরে। আমি ক্রমশই ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম। আমার শরীর ভেঙ্গে গেল।

বিপদের উপর বিপদ। আমার মা এক দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। পাঁচ বছর পর মারা গেলেন। আমার বাবাও সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই পারিবারিক অশান্তির জন্য আমার মন মেজাজ দারুণ খারাপ হয়ে উঠল।

অন্ধকারের মাঝে আবার এক আলোকরশ্মি দেখতে পেলাম আমি। কতখানি নির্ভরযোগ্য সে আলো তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না। তবু সে আলোকে গ্রহণ না করে পারলাম না। এই সময় ফিলো নামে এক মধ্যবয়সী বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাদের পাড়াতে কিছু সম্পত্তি কিনে বাস করতে লাগলেন। আমরা পরিচিত হয়ে উঠলাম পরস্পরের সঙ্গে। তিনি আমার উপর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। নার্সিসের সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও ফিলো তার থেকে আরো প্রাণখোলা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন।

যদিও আমি ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতাম তথাপি রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে একমাত্র মৃত্যুর পর ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সম্ভব নয়। মাটির পৃথিবীতে থাকতে হলে রক্তমাংসের মানুষ চাই। নার্সিসকে ভালবেসে যে ভুল করেছিলাম আবার সেই ভুল করে বসলাম আমি।

আমি ফিলোকেও ভালবেসে ফেললাম। দিনে দিনে সে ভালবাসা বেড়ে যেতে লাগল। আমি আমার এ-ভালবাসার অনুভূতিটাকে নিজেই ঘৃণা করতে লাগলাম। তবু সে অনুভূতিটাকে দূর করতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম মানবজীবনের এক শাশ্বত দুর্বলতার ফাঁকে ধরা পড়ে গেছি আমি। এর থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। আমার রুগ্ন বাবাকে রোজ দেখতে আসত ফিলো। কাকাও তাকে ভালবাসতেন।

কাকা এবার আমার ছোট বোনের বিয়ের দিন ঠিক করলেন। বিরাট জাঁকজমকের ব্যবস্থা করলেন। বিয়ের সময় আমি ফিলোর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ফিলো আমাকে চুপি চুপি বলল, কোন বিয়ের সময় বরকনের হাতে হাত দেখলেই আমার সর্বাঙ্গে যেন আগুনের এক ঢেউ খেলে যায়।

কাকা আমাদের বিয়ে উপলক্ষে সবাইকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাদের কাকার বাড়িতে দিনকতক থেকে গেলাম বিয়ে উপলক্ষে। আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেল। সেখানে এক ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হলো আমাদের। কাকার প্রাসাদোপম বাড়িতে কিছু ভাল ছবি ছিল। আমি তা ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

কাকা আমার যে বোনের বিয়ে দিলেন তাকে একটা গ্রাম্য এষ্টেট দিয়েছিলেন। জমিজমা ঘরবাড়ি সব ছিল তাতে। বিয়ের পর আমার বোন সেখানে চলে গেল।

এর পরেই শুরু হলো দুঃখের পালা। আমার অসুখ বেড়ে গেল। আমার এক বোনের বিয়ে হলেও আর এক অবিবাহিত বোন ছিল বাড়িতে। তার স্বাস্থ্য ছিল ভাল। আমি যখন রুগ্ন বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম, আমার বোন সংসারের কাজকর্ম করত। হঠাৎ তার হৃদরোগ দেখা দিল। তিন সপ্তা ভোগার পর মারা গেল সে। শোকে দুঃখে বাবার রোগ যেন আরো বেড়ে গেল।

আমার বিবাহিত বোন সন্তানসম্ভবা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার প্রসবব্যথা দেখা দিল। বাবা অসুস্থ শরীরেই বোনকে দেখতে গেল আমাকে নিয়ে। তিনি বললেন, হয়ত শেষ বয়সে আমাকে সব সন্তানই হারাতে হবে।

যাই হোক, আমার বোন ভাল হয়ে উঠল। নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হলো। তবে যাবতীয় সেবা শুশ্রূষার কাজ আমাকেই করতে হলো। আমাকে তাদের

ঘরে থেকে যেতে হলো কিছুদিন। বোনের স্বামীর সঙ্গে আমার বোনের সম্পর্কটা ভাল যাচ্ছিল না। তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত। অনেক সময় তাদের ঝগড়া মেটাতে হত আমাকে। আমি অনেক করে আমার ভগ্নিপতিকে বোঝাতাম।

আমার বোন আবার সন্তানসম্ভবা হলো কিছুকাল পরে। প্রসবব্যথা উঠলে আবার তাকে দেখতে গেলেন বাবা। আর এক পুত্রসন্তান প্রসব করল সে। ছেলের মুখ দেখে খুশি হলেন বাবা। কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে আর বেশীদিন বাবা রইলেন না এ জগতে।

বাবার মৃত্যু এক অদ্ভুত পরিবর্তন নিয়ে এল আমার জীবনে। বাবা বেঁচে থাকতে সব সময় কাজ নিয়ে থাকতাম। ঘর সংসারের কাজ, সেবা শুশ্রূষার কাজ, কত রকমের কাজ। সময়ের কত অভাব। একটু ইচ্ছেমত পড়াশুনো করতে পারতাম না। সব সময় বাঁধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়ে চলতে হত। কিন্তু এখন আমার হাতে অফুরন্ত সময়। আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম এই সময়। কোন প্রিয়বস্তুর পিছনে ছুটে চলা বা কোন প্রিয় কাজ করে যাওয়ার মধ্যে মানুষের প্রকৃত সুখ নেই। মানুষ যে পথ ন্যায়ের পথ, ধর্মের পথ বা মহৎ পথ বলে মনে করে সেই পথে অবাধে চলতে পারার মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ। সে পথ চলায় দুঃখ থাকলেও তাতে পাওয়া যায় অপার সুখ।

আমি সবাইকে ছেড়ে একা একা সেই পথেই চলা শুরু করেছিলাম। আমি তাতেই সুখ পেতাম। আমার সে সুখের অর্থ কেউ বুঝতে পারত না। এই সময় আমার মনটা এতই সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল যে আমি আমার দেহটাকে বাইরের এক জড়বস্তু বলে মনে করতাম। আমার মনে হত দেহ আর আত্মা দুটো পৃথক বস্তু। মনে হত আমার দেহের সঙ্গে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।

আমার কাকার বাড়িতে যে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই প্রকৃতি-বাদী ডাক্তার একবার বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়িতে। দিনকতক তাঁর সঙ্গে কথা বলে বেশ কাটল। তিনিও আমাকে বলতেন দেহটাকে বাইরের প্রকৃতি জগতেরই এক অঙ্গ বলে মনে করবেন। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে প্রকৃতি জগতের সব বস্তুর মধ্যেই সেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন। দেখবেন তাতে আনন্দ পাবেন। বুঝবেন সেই ঈশ্বরই প্রতিটি বস্তুর স্বরূপ। আসল সত্তা।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি ঠিক তাই দেখতাম।

এদিকে আমার সেই বিবাহিত বোনকে নিয়ে আবার বিপদে পড়লাম।

প্রায় প্রতি বছরই তার সন্তান হতে লাগল একটি করে। কিন্তু কন্যা সন্তান হতে লাগল বেশী। এতে তার স্বামী বিরক্তিবোধ করতে লাগল। তার চাই পুত্র সন্তান। আমার বোন সন্তান সম্ভবা হলেই সে আশা করত পুত্র সন্তান। কিন্তু কন্যা হলেই হতাশ হত। তার মুখ ভার হত। তার একটা কারণও ছিল। যে বিরাট ভূসম্পত্তির সে মালিক হয়েছিল আমার কাকার দৌলতে, তা দেখা শোনার জন্য লোক দরকার। আজ পুত্র সন্তান হলে ভবিষ্যতে তারা এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে, তাদের বাবাকে সাহায্য করতে পারবে।

এবার আমার বোনের চতুর্থবার। এবারও তার স্বামী অন্য বারের মত পুত্র সন্তান আশা করেছিল। নিবিড় প্রত্যাশায় দিন গণনা করছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না। হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেল। এদিকে আমার বোন পর পর দুবার দুটি কন্যা সন্তান প্রসব করার পর এবার সত্যিই একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। দুঃখের বিষয় তার স্বামী এত আশা করেও তা দেখে যেতে পারল না।

প্রসবের পর আমার বোনও আর রইল না পৃথিবীতে। তিন চারটি সন্তানের বোঝা আমার ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে অকালে মারা গেল হঠাৎ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার বসন্ত এল। রঙে রসে পত্রপল্লবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিকের প্রকৃতি। আকাশে মেঘ বৃষ্টি নেই, সমুদ্রে ঝড় নেই, পাহাড়ে কুয়াশা নেই। যেদিকেই তাকানো যায় শুধু আলো আর রং। নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল উইলেম ঘোড়ায় চেপে। একটা পাহাড়ের কাছে একটা লোককে দেখতে পেয়ে তাকে কাউণ্ট লোথারিওর বাড়িটা কোথায় তা জিজ্ঞাসা করল। লোকটি বলল, ঐ পাহাড়টার ওধারে। এই কাউণ্ট লোথারিওর সঙ্গে দেখা করে তাকে অরেলিয়ার দেওয়া চিঠি আর পাণ্ডুলিপিটা দিতে হবে।

লোথারিওর প্রাসাদে যেতেই এক মোটা ভদ্রলোক তার সামনে এগিয়ে এল। বলল, কাউণ্টের সঙ্গে এখন দেখা হবে না। অনেক লোক আগে থেকেই তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে বসে আছে। উইলেমের অনেক অনুনয় বিনয়ে লোকটি তাকে কাউণ্টের কাছে নিয়ে গেল।

কাউন্টের চেহারাটা দেখতে ভাল। তিনি তখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। উইলেমকে দেখেই বললেন, আপনাকে বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। একটা অদ্ভুত সংবাদ পেয়ে আমি ব্যস্ত ও বিব্রত আছি। আপনি আজ রাত্রিটা এখানে থেকে যান।

এরপর বিশপ আব্বেকে ডেকে বলে দিলেন, দেখবেন এর যেন কোন অসুবিধা না হয়। উইলেম অরেলিয়ার কাগজপত্র সব দিয়ে দিল।

শোবার সময় পোষাক ছাড়তে গিয়ে দেখল তার পুটলির কাপড়চোপড়ের সঙ্গে সেই ওড়নাটা ভরে দিয়েছে মিগনন ; সেটার এক প্রান্তে লেখা ছিল, পালাও যুবক, পালাও। লেখাটা পড়ে উইলেমের মনে হলো কোথায় কার কাছে পালাবে সে। তার মনে হলো একথা না বলে বলা উচিৎ ছিল, নিজের কাছে ফিরে যাও।

রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখল উইলেম। সে স্বপ্নে মেরিয়ানা আর অরেলিয়া দুজনকেই দেখল।

সকালে উঠতেই উইলেম শুনল কাউন্ট লোথারিও ঘোড়ায় চেপে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। বিশপ আব্বের সঙ্গে কথা হচ্ছিল উইলেমের। এমন সময় একজন বিক্ষুব্ধ মহিলা ঘরে ঢুকে আব্বেকে বিক্ষোভের সঙ্গে বলল, তাকে তোমরা কোথায় পাঠালে? এটা তোমাদের চক্রান্ত।

আব্বে শান্তভাবে বললেন, আপনি শান্ত হোন, তিনি এখনি এসে পড়বেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কোচ এসে থামল প্রাসাদের সামনে। আহত কাউন্টকে ধরাধরি করে নামানো হলো। ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বলতে লাগল, ও আহত হয়েছে। হা ভগবান কি হবে।

হঠাৎ উইলেম কাউন্টের দলের মধ্যে জার্ণোকে দেখতে পেল। জার্ণোর সঙ্গে তার আগে থেকেই পরিচয় ছিল। জার্ণোর সঙ্গে উইলেমের পরিচয় হয় এর আগে। ওরা দল বেঁধে নাটক করার জন্য সেই সময় কাউন্টের প্রাসাদে বাস করত। জার্ণো ঠাট্টা করে উইলেমকে বলল, যেখানেই নাটক সেখানেই তুমি। এখানেও এখন এক নাটক জমে উঠেছে।

জার্ণো অন্যত্র চলে গেলে আব্বে উইলেমকে বললেন, কিছুদিন আগে আমাদের কাউন্ট লিডিয়া নামে এক মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। মহিলাটি এই প্রাসাদেরই একজন হিসাবে বাস করতে থাকেন। পরে কাউন্ট কিছুটা অনাসক্ত হয়ে পড়েন তাঁর প্রতি। এতে লিডিয়া চলে যান। কথাটা

তাঁর পূর্ববর্তী স্বামী জানতে পেরে কাউন্টকে এক ডুয়েলে আহ্বান জানায়। আজ সেই ডুয়েলে কাউন্ট ও লিভিয়ার স্বামী দুজনেই আহত হল। এইজন্য লিভিয়া এত বিক্ষুব্ধ। এখন তিনি কাউন্টের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন।

উইলেম আশ্চর্য হয়ে দেখল কাউন্টের চিকিৎসার জন্য যে সার্জেন এল সেই সার্জেনই একদিন সে পথের ধারে জঙ্গলে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা করে। জার্ণো ও সার্জেনকে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল উইলেম। আগেকার সেই রহস্যটা ঘনীভূত হয়ে উঠল আরও।

আব্বে উইলেমকে বললেন, কাউন্ট চান আপনি দিনকতকের জন্য এখানে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করুন। তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনার বাড়িতে চিঠি দেবার প্রয়োজন হলে দিন। আমরা যথাশীঘ্র পাঠিয়ে দেব।

ডাক্তার এসে জার্ণোকে খবর দিল, ভয়ের কোন কারণ নেই। কাউন্ট শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। উইলেম তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ডাক্তার চলে গেল। উইলেম একসময় জার্ণোকে বলল, আপনি ত অনেক কিছু জানেন। আচ্ছা বলতে পারেন কি এই কাউন্ট পরিবারের সঙ্গে আগেকার সেই আমাদের পরিচিত কাউন্ট পরিবারের কোন সম্পর্ক আছে কি না?

জার্ণো বলল, যে কাউন্টের ভূত হয়ে তাঁকে তুমি ভয় দেখিয়েছিলে তিনি এই কাউন্ট লোথারিওর ভগ্নিপতি। যে কাউন্টপত্নী তোমার জন্য আজ পাগল হতে বসেছে সেই কাউন্টপত্নী লোথারিওর আপন বোন। লোথারিওর কোন সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর সব বিষয় সম্পত্তি গরীব দুঃখীদের অর্থাৎ তথাকথিত এক নিম্নশ্রেণীর লোকদের দান করে যাবেন।

উইলেম ভয়ে ভয়ে বলল, লোথারিও আমার সম্পর্কে সব ব্যাপার জানেন?

জার্ণো বলল, সব জানেন।

উইলেম বলল, তাহলে আমি চলে যাই এখান থেকে। আমি তাহলে কেমন করে কোন মুখে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব?

জার্ণো উত্তর করল, কিন্তু এখন ত আগের মত অত সহজে পালিয়ে যেতে পারবে না বন্ধু। এখন আমার অফুরন্ত অবসর। আমার বন্ধু, পরম উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যুবরাজের মৃত্যু ঘটায় এখন আমি নিঃসঙ্গ কর্মহীন। এখন তোমার সেই বেদের দলের খবর কি? তাদের নিয়ে আবার কি নাটক করলে?

উইলেম বিরক্তির সঙ্গে বলল, খুব শাস্তি পেয়েছি। তাদের কথা আর বলো

না। ওরা একেবারে অপদার্থ। এতটুকু চিন্তাশক্তি ওদের কারো নেই। নিজেদের প্রকৃত যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই ওদের। ওরা সবাই মনে করে ওরা এক একজন মহান অতুলনীয় অভিনেতা। বিন্দুমাত্র কেউ ওদের সমালোচনা করলেই ক্ষেপে যায়। ওরা চির অভাবী। কিন্তু যুক্তি ও সুরুচিকে ওরা সব চেয়ে বেশী ভয় পায়।

উইলেম একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি সব জান। একবার আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার না?

জার্ণো বলল, ধীরে ধীরে সব হবে। ধৈর্য ধরো।

জার্ণো একবার সেই মানসিক রোগের ডাক্তারকে ডেকে পাঠাল প্রাসাদে যাঁর আশ্রমে বৃদ্ধ বীণাবাদককে ভর্তি করে দিয়েছে উইলেম এবং যাঁর সঙ্গে একদিন তার আলাপও হয়। এই ডাক্তারই বর্তমানে তার পরিচিত কাউণ্ট-দম্পতির চিকিৎসা করছেন।

উইলেম কৌতূহলের সঙ্গে বৃদ্ধ বীণাবাদকের কথা জিজ্ঞাসা করল। ডাক্তার বললেন, মনে হয়, ভাল হয়ে যাবে। কোন এক আত্মীয়ার সঙ্গে ওর ভালবাসা হয়, একটা সন্তানও হয়। তাদের মৃত্যু হবার পর হতাশা ও বিষাদের আতিশয্যে ও এই রকম হয়ে পড়ে। ওর সমগ্র অস্তিত্ব হয়ে ওঠে এক অন্তহীন অন্ধকার শূন্যতা। ওর একটা ধারণা হয়, কোন এক বালকের দ্বারা ওর মৃত্যু হবে। প্রথমে ও মিগননের পোষাকের জন্য তাকে বালক ভেবেছিল। পরে ওর রাগটা পড়ে ফেলিক্সের উপর। বেটাছেলেদের সব পুড়িয়ে মারার জন্যই হয়ত ও বাড়িতে আগুন লাগায়।

ডাক্তার চলে গেলেন। কাউণ্টদম্পতির কথা আর জিজ্ঞাসা করা হলো না। এদিকে জার্ণো একটা বড় কাজের ভার দিল উইলেমের উপরে। জার্ণো বলল, ডাক্তার এইমাত্র বলেছে লিভিয়াকে দু একদিনের জন্য বাইরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। ও দিনরাত কাউণ্টের কাছে বসে আছে। ওর অত্যাধিক প্রেমানুরাগ আর আদরযত্নের আতিশয্য কাউণ্টের আরোগ্যলাভের পথে প্রচুর বাধা সৃষ্টি করছে। কিন্তু ওকে এমনি কোথাও যেতে বললে কাউণ্টকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। তাই আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি। আমরা ওকে বলব আমাদের এই পরিবারের উকিলের বাড়িতে একবার ওকে যেতে হবে। তাঁর প্রণয়িনী ফ্রলিন থেরেসা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে এইমাত্র আমরা খবর পেয়েছি। লিভিয়া গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেবে। তিনি বলবেন থেরেসা হয়ত

কাছাকাছি কোথাও আছে। লিভিয়া তখন বলবে আমরা তাকে খুঁজে নিয়ে আসছি। তারপর যে ঘোড়ার গাড়িতে করে তোমরা যাবে তাতে করেই এখানে সেখানে খোঁজ করে বেড়াবে। লিভিয়া ফিরতে চাইলে সরাসরি তাকে বাধা দেবে না। কিন্তু তখন রাত্রি হয়ে যাবে। তার কোচম্যানকে বলা থাকবে সে ঘুরপথে এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটিয়ে দেবে।

উইলেম বলল, এভাবে কাউকে আমি প্রতারণা কখনো করিনি, যদিও অবশ্য এ প্রতারণা একজনের ভালর জন্য।

উইলেমের যেতে মন সরছিল না দেখে জার্নো বলল, ওখানে গেলে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। থেরেসা সাধারণ মেয়ে নয়। ওখান থেকেই তুমি তোমার কাউন্টপত্নীর খোঁজ পেয়ে যাবে।

আর কোন প্রতিবাদ করল না উইলেম। গাড়ি এসে নিচের তলায় গাড়ি বারান্দার কাছে দাঁড়াল। লিভিয়ার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ঝি চাকরদের বলল, রাত্রির আগেই চলে আসব।

গাড়িতে উঠে লিভিয়া উইলেমকে বলল, থেরেসার সঙ্গে একসময় লোথারিওর ভালবাসা ছিল। সে অনেক পুরুষকেই ঠকিয়েছে।

নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াতেই উকিল ভদ্রলোক এসে ওদের অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বললেন, থেরেসা চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। কাছাকাছি কোন শহরেই আছে।

উইলেমরা বলল, আমরা তাঁকে খুঁজে এনে দেব।

আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। কয়েকটা গাঁ ঘুরে বেড়াতে হলো। কিন্তু তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। লিভিয়া কোচম্যানকে ফিরে যেতে বলল। তখন রাত্রি হয়ে গেছে। কোচম্যান বলল, পথ হারিয়ে ফেলেছি। সকাল না হলে উপায় নেই।

এইভাবে সারারাত পথেই কেটে গেল। চোখে পাতায় করল না লিভিয়া। কিছু বেলার পর কোন এক গাঁয়ের এক বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই এক যুবতী এসে গাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে কিছুক্ষণ তার পানে তাকিয়ে উইলেমের কোলের উপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল লিভিয়া।

উইলেমকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। থেরেসার সঙ্গে পরিচয় হলো তার। থেরেসা নিজের মুখেই তার পরিচয় দিল। এক মুহূর্তেই তাকে বন্ধু করে নিল। তাকে লিভিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, লিভিয়া খুব রেগে গেছে।

তাকে যারা ভুলিয়ে ঘর থেকে বার করে এনেছে তাদের দলে তোমাকেও টেনেছে। সে বলেছে তোমার মুখ সে আর দেখবে না।

কাউন্ট লোথারিওর খুব প্রশংসা করতে লাগল উইলেম। থেরেসা বলল, আমার মনের কথাটাই আপনি বলে দিলেন। আমিও সত্যিই খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখি লোথারিওকে।

উইলেম বলল, তাঁর মত উদারহৃদয় আর সরল প্রকৃতির লোক আমি খুব কম দেখেছি। কিন্তু তিনি যাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন তারা সবাই ভাল নয়। সেইটাই দুঃখের বিষয়।

এইভাবে থেরেসার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল উইলেম। তাকে বিশ্রাম করতে বলে ঘরের কাজে অন্যত্র উঠে গেল থেরেসা। বর্তমানে তার কোন ঝি চাকর বা রাঁধুনী নেই। আগে ছিল। তাই ঘরের সব কাজ তাকেই করতে হয়।

সারা দুপুর ও বিকেলটা একা একা কাটাল উইলেম। সন্ধ্যের একটু আগে তার ঘরের দরজা খুলে হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবক ঢুকল। ঢুকেই বলল, বেড়াতে যাবেন?

উইলেম ভাল করে তাকিয়ে দেখল থেরেসাই পুরুষের পোষাক পরে এসেছে। যাই হোক, দুজনেই বেড়াতে বের হলো। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা মাঠ পার হয়ে ওরা একটা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। তারপর একটা বসার জায়গা খুঁজে নিয়ে বসে পড়ল দুজনে। থেরেসা বলতে আরম্ভ করল তার নিজের জীবনের ইতিহাস।

আমার বাবা ছিলেন এই অঞ্চলের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন সদানন্দময়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মিতব্যয়ী এক মানুষ; নির্ভরযোগ্য বন্ধু, স্নেহশীল পিতা। বাবার চরিত্রে আমি শুধু একটা দোষই দেখেছি। সেটা হলো অযোগ্য স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক অসংগত সহনশীলতা। আমার মা ছিলেন বাবার ঠিক উল্টো প্রকৃতির। নারীসুলভ বোধ মার চরিত্রে খুঁজে পেতাম না আমি। তাঁর মন সব সময় বাইরে পড়ে থাকত। থিয়েটার, যাত্রা, নাটক, লোকজন নিয়ে বাইরের জীবনেই থাকতেন তিনি। স্নেহ ভালবাসায় কোন আন্তরিকতা কোনদিন ছিল না তাঁর মধ্যে। তিনি কখনো আমাকে আদর করেছেন বা ভালবেসে কিছু তুলে দিয়েছেন হাতে—একথা আমার মনে পড়ে না। বরং বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে প্রায়ই তিরস্কার করতেন। যতক্ষণ মা বাড়িতে

থাকতেন না, ততক্ষণ আমরা অর্থাৎ আমি ও বাবা বেশ ভাল থাকতাম। বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। মাঠে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতাম। হাসিখুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠত আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। কিন্তু মার কাছে বাবার সেই আনন্দোজ্জ্বল মূর্তিটি কেমন ম্লান হয়ে যেত এক বিমর্ষতায়। কথায় কথায় রাগারাগি করতেন মা। মার সামনে কোন কথা বলতে পারতেন না বাবা। তাঁর কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও পারতেন না। মার কাছে বাবাকে কেমন যেন নিষ্প্রভ দেখাত সব সময়।

এক সময় মা দূর গ্রামাঞ্চলের এক এস্টেটে চলে গেল। সংসারে তখন আমি আর বাবা। আমরা তখন হাতে স্বর্গসুখ পেলাম। মার অবর্তমানে প্রতিটি মুহূর্তে অবাধ স্বর্গসুখ অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু সে স্বর্গসুখ বেশী দিন সইল না। হঠাৎ বাবার ডান অঙ্গটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেল। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন বাবা। সব সময় তাঁকে দেখে মনে হত তিনি যেন কি বলতে চাইছেন। বাবা বলতে বা লিখতে পারতেন না। অন্য সময় এর আগে বাবার চোখগুলো আয়নার মত ঝকঝক করত। কিন্তু এখন সে চোখ এমনই ঘোলাটে হয়ে উঠল যে তাতে কোন ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারত না।

অবশেষে সব কষ্ট থেকে মুক্তি পেলেন বাবা। বাবা মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর মার কাছে লিখলাম। তাঁর কাছে লিভিয়া তখন থাকত। আমার সমবয়সী লিভিয়া তাঁর দেখাশোনা করত। কিন্তু মা আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। আমাকে কোনমতেই তিনি সহ্য করতে পারবেন না। আমি নিজের জন্যেই ভাবছিলাম। এমন সময় একদিন লিভিয়া এসে হাজির হলো আমার কাছে। মা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আমাদের পাড়ায় এক ধনী সম্পত্তিশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি তাঁকে বললাম আমি তাঁর ঘরসংসার দেখাশোনা করব। ভদ্রমহিলা রাজী হলেন। আমি তাঁর ঘরেই থাকতাম। কিন্তু লিভিয়া আসাতে লিভিয়াকেই তিনি রাখলেন ঘরের কাজকর্ম করার জন্য। অবশ্য তিনি আমাকেও তাঁর সম্পত্তি দেখাশোনার কাজ দিলেন। তাঁর অনেক বন ছিল। আমি সেই বনাঞ্চল থেকে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করলাম। লিভিয়া যে বাড়িতে থাকত সেই বাড়িতে কাউন্ট লোথারিও মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। তিনি ছিলেন ঐ মহিলার আত্মীয়। সেই সূত্রে লিভিয়া ও আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ

পরিচয় হয়। একবার আমি পুরুষের পোষাক পরে বন্দুক কাঁধে করে শিকার করতে যাই। লিডিয়া দেখতে খারাপ না হলেও সমাজের নিচু স্তর থেকে আসা এক মেয়ে সে। তার আচার আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে কোন মার্জিত ভাব বা সূক্ষ্মতা ছিল না। আমার মধ্যে এই ভাবটা থাকায় লোথারিও আমাকেই পছন্দ করত বেশী।

একদিন সেই ভদ্রমহিলা আমাকে জানিয়ে দিলেন লোথারিও আমার পাণি গ্রহণ করতে চেয়েছে। আমার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে একথা শুনে এক অপার আনন্দ অনুভব করলাম আমি। এর পর লোথারিও যেদিন এল সেই বাড়িতে সেদিন দুহাত বাড়িয়ে লোথারিও জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমিও খুশি হয়ে আলিঙ্গন করলাম তাকে। তারপর আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল।

একদিন লোথারিও এলে আমি তার একটা ফটো চাইলাম। তার ফটোটা সযত্নে রাখার জন্য আমি আমার গয়নার কৌটোটা এনে খুলে ফেললাম। হঠাৎ তার মধ্যে আমার মার ফটোটা দেখে ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিল লোথারিও। ভাল করে দেখে বলল, কে এই মহিলা? সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবার সময় তার সঙ্গে আলাপ হয় আমার। সাময়িকভাবে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল।

আমি বললাম, উনি আমার মা। এখন ফ্রান্সে থাকেন। মার ছবিখানা নিয়ে কি একবার ভাবল লোথারিও। তারপর হাতে মুখটা ঢেকে বেদনার্ত অস্ফুট স্বরে বলল, আমার মত হতভাগ্য লোক আর পৃথিবীতে নেই।

এই বলে আমাকে কোন কথা না বলে বেরিয়ে চলে গেল সে। বাইরে ঘোড়ায় চেপে আমার পানে তাকিয়ে হাতটা নাড়িয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিল।

পরে আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় মার সঙ্গে এক অবৈধ সংসর্গ হয় লোথারিওর। সেই জন্য সে আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমিও আর এ নিয়ে তাকে কোন পীড়াপীড়ি করিনি। আমি তাকে সহজেই মুক্তি দিই। এই সুযোগে লিডিয়া ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল লোথারিওর সঙ্গে।

কথাগুলো বলতে বলতে কণ্ঠটা ভারী হয়ে উঠল থেরেসার। সে একটা হাত আবেগের সঙ্গে বাড়িয়ে দিল উইলেমের দিকে। উইলেম সে হাতটা নিয়ে চুম্বন করল। তারপর বলল, চল, যাওয়া যাক।

ওরা থেরেসার বাড়ি ফিরে দেখল দরজার সামনে বিষণ্ণ মুখে বসে রয়েছে লিডিয়া। লিডিয়া উইলেমকে বলল, আমি ওদের চক্রান্ত বুঝতে পেরেছি।

আমাকে সরিয়ে দিয়ে ওরা সব লুটেপুটে খাবে। তোমাকেও ওরা ওদের স্বার্থ চরিতার্থ করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায়।

সন্ধ্যের সময় দুটো ছোট ছেলে এল থেরেসার কাছে পড়তে। থেরেসা বলল, আমি সন্ধ্যেয় গ্রামের কিছু গরীব ছেলেমেয়েকে পড়াই। লোথারিওর বোনও মাঝে মাঝে আসে। এই মহীয়সী নারীর সঙ্গে তুমি যদি পরিচিত হও তাহলে তার সৌন্দর্যে, ঔদার্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

উইলেম এই কথা স্বীকার করতে পারল না যে এই নারীর সঙ্গে ঘটনাক্রমে অনেক আগেই সে পরিচিত হয় এবং সেই পরিচয় অনেক দুঃখ নিয়ে আসে তার জীবনে। যাই হোক, থেরেসা প্রসঙ্গ পাল্টে দেওয়ায় পুরনো স্মৃতির অপ্রীতিকর এক পীড়নের বোঝা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল উইলেম।

পরদিন কাউন্ট লোথারিওর প্রাসাদে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হলো উইলেম। লিডিয়ার সঙ্গে দেখা করে এসে বলল, কাউন্ট আমাকে ভীষণ ভালবাসে এবং শীঘ্রই আবার দেখা হবে আমাদের সঙ্গে। দিনকতকের মধ্যেই আমি যাচ্ছি। ওদের সব চক্রান্ত ভেঙ্গে দেব আমি।

প্রাসাদে একা একা ফিরে এল উইলেম। দেখল আবে ও ডাক্তার নেই। কাউন্টের কাছে রয়েছে শুধু জার্নো। কাউন্ট এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। জার্নো বলল, আজ তাহলে আপনার ভ্রমণটা বেশ আনন্দদায়ক হয়েছে।

কাউন্ট বললেন, তা ঠিক বলতে পার। বেশ কিছুদিন পর আমি ঘোড়ায় চেপে নদী পার হয়ে মাঠের ওপারে গ্রামে চলে গেলাম পুরনো অভ্যাসের বশে। ঠিক সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে ঘোড়ার বেগটা কমিয়ে দিলাম।

জার্নো বলল, আপনি এক চাষীর মেয়েকে ভালবাসতেন। আপনি হয়ত তাদের বাড়িতেই চলে গিয়েছিলেন।

কাউন্ট বললেন, হ্যাঁ, ঠিক তাই। সে মেয়েটির দূরে কোথায় বিয়ে হয়েছে। সে এখন ছয়টি সন্তানের জননী। তবে শুনেছি সে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে তার বাবার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তাদের বাড়ির সামনে ক'জন ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। আমি যেতেই একটি মেয়ে একটি ছেলেকে আমার ঘোড়ার কাছ থেকে নিয়ে গেল। আমি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটা দূরে এক জায়গায় বেঁধে রেখে তাদের বাড়িতে গেলাম। তাকে দেখে ঠিকই চিনতে পারলাম। সে আগের থেকে বেশ মোটা হয়েছে। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সেও আমায় চিনতে পেরে হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার মুখে আর লজ্জারুণ ভাব

নেই। অন্তরের কোন গোপন আলোড়ন মুখে চোখে রঙীন চাঞ্চল্যে ফেটে পড়ল না। তবু তাকে আমার ভাল লাগল। তার কোলে ছেলে ছিল। আগেকার দিনের তার সেই তারুণ্যের যত সব চঞ্চলতা যৌবনের যত উত্তাল আর উদ্দামতা মাতৃত্বের এক শান্ত শীতল যৌবনের মধ্যে কেমন গাঢ় ও স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। সে গাঢ়তা সে স্তব্ধতার মধ্যেও কম মনোহারিতা নেই।

আমি বললাম, দীর্ঘ দশ বছর পর তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।

সে হাসিমুখে বলল, আমারও যে কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে তা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমি তার স্বামীর কথা তুললাম। সে তার ছেলেমেয়েদের সবাইকে ডাকল। বড় মেয়েটির মুখখানা তার মতই হয়ে উঠেছে। আমার মনে হলো আমি যেন এক কমলালেবুর বনে এসেছি। আমার চারদিকে শুধু ফল আর ফুলের এক অদ্ভুত সোনালি সংসার।

কাউন্টের কথা শেষ হয়ে গেলে উইলেম ফেলিক্সের কথা তুলল। কাউন্ট অশান্ত হয়ে বলল, আপনি কার কথা বলছেন?

উইলেম বলল, অরেলিয়ার গর্ভে আপনার ঔরসে যে সন্তানের জন্ম হয় তার কথা বলছি।

লোথারিও বললেন, অরেলিয়ার গর্ভে আমার কোন সন্তানের জন্ম হয় নি। তার কোন সন্তান হয় নি। সে নিজের মুখে আপনাকে একথা বলেছিল?

উইলেম বলল, না স্পষ্ট করে বলে নি। তবে অনেকে তাই মনে করেন।

কাউন্ট বললেন, যাই হোক, আপনি ওদের নিয়ে আসুন এখানে। আপনি মিগনন নামে যে মেয়েটির কথা বলছেন সে থাকবে থেরেসার কাছে। খুব ভাল থাকবে। আর ফেলিক্স আপাততঃ আপনার কাছেই থাকবে।

জার্নো বলল, তবে তোমায় থিয়েটার ছাড়তে হবে। ও তোমার হবে না।

উইলেম বলল, আগে ওদের নিয়ে আসি ত। তারপর সেকথা ভেবে দেখা যাবে।

একটা বিষয়ে নিশ্চিত হলো উইলেম। সে কাউন্টের কাছে জানতে পারল, ফেলিক্স অরেলিয়ার সন্তান নয়। এক বৃদ্ধার কাছ থেকে পাওয়া একটি ছেলে যাকে সে মানুষ করত এবং যাকে অনেকে তার ছেলে বলে মনে করত।

অবশেষে সেই শহরে তার বাগানবাড়িতে পৌছে দেখল সব ঠিক আছে। একটি ঘরে সে ফেলিক্স ও মিগননকে এক বৃদ্ধার কাছে বসে থাকতে দেখল।

এদের দুজনকেই সে নিয়ে যাবে থেরেসার কাছে। তার কাছে ওরা সুখে থাকবে। আর তাতে সে নিজে হয়ে উঠবে নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ যেন ভূত দেখে চমকে উঠল উইলেম। এই বৃদ্ধা আর কেউ নয়, বারবারা, মেরিয়ানার গৃহকর্ত্রী। প্রথমটায় চিনতে পারেনি। উইলেম কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমিই কি ফেলিক্সকে অরেলিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিলে?

এদিকে ছেলেরা উইলেমকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। বারবারা চুপ করে থাকায় উইলেম আবার জিজ্ঞাসা করল, মেরিয়ানা এখন কোথায়?

এবার বারবারা ভারী গলায় বলল, সে আর ইহলোকে নেই।

উইলেম ব্যস্ত হয়ে বলল, আর ফেলিক্স—

ফেলিক্স হচ্ছে মেরিয়ানারই হতভাগ্য সন্তান। যে রত্ন আজ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি সে আমাদের একদিন অনেক দুঃখ দিয়ে আজ তোমাকে প্রচুর সুখ দান করবে।

বারবারা উঠে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে উইলেম বলল, কোন কাগজপত্র আছে?

বারবারা উঠে গিয়ে মেরিয়ানার একটা চিঠি এনে দিল। সত্যিই মেরিয়ানার হাতের লেখা। উইলেম চিনতে পারল। মেরিয়ানা লিখেছে, 'জানি না এ চিঠি তোমার কাছে পৌঁছবে কি না। যদি তোমার হাতে যায় তাহলে তোমার হতভাগ্য সেই বান্ধবীর জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলো। মনে রাখবে তোমার প্রেমই তার মৃত্যু ঘটায়। কয়েকদিন প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করার পর একটি পুত্র প্রসব করে মারা যাচ্ছি আমি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি। বারবারার কথা শুনবে।'

বারবারা বলল, তবু ভাল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তোমার প্রেমাস্পদকে হারালেও তোমার সন্তানকে পেয়েছ। তুমি যদি শোন সে তোমার জন্য কতখানি কষ্ট করেছে, কতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কতদূর বিশ্বস্ত ছিল তোমার প্রতি তাহলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না তোমার মনে।

মিগনন উইলেমকে বলল, হ্যাঁ মালিক, ফেলিক্স তোমারই ছেলে।

উইলেম বারবারাকে বলল, হ্যাঁ আমাকে শুনতে হবে। মেরিয়ানার সব কথা, শেষ কথা আমাকে শুনতে হবে।

বারবারা উইলেমের ঘরে এল গভীর রাতে। এল মেরিয়ানার কথা শোনাতে। তিন গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে এসে নিজে এক গ্লাস খেয়ে উইলেমকে এক গ্লাস দিয়ে এক গ্লাস রেখে দিল মেরিয়ানার আত্মার জন্য। বলল, মেরিয়া-নার কাছে রাত্রিতে যখন তুমি আসতে তখন আমি এমনি করে তিন গ্লাস শ্যাম্পেন আনতাম।

বারবারা বলল, মেরিয়ানার সঙ্গে তোমার যেদিন শেষ দেখা হয় সেদিন তুমি তার ঘরের মেঝের উপর একখানি চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছিলে এবং তা নিয়ে গিয়েছিলে। তা মনে আছে? তাতে কি লেখা ছিল?

উইলেম বলল, হ্যাঁ সব মনে আছে। সে চিঠি কোন এক বিক্ষুব্ধ প্রেমিকের লেখা যার সঙ্গে আগের দিন সন্ধ্যায় তার প্রেমিকা ভাল ব্যবহার করেনি এবং যে সেদিন সন্ধ্যাতেও আসে ভাল ব্যবহারের প্রত্যাশায়। সে প্রেমিক সেদিন রাতেও এসেছিল তোমাদের ঘরে। তাকে আমি অন্ধকারে বেরিয়ে যেতে দেখেছি তোমাদের বাড়ি থেকে।

উইলেমের কথায় বেশ কিছুটা ক্ষোভ ছিল। বারবারা বলল, তুমি তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে, কিন্তু সে রাত্রে মেরিয়ানা কত কষ্টে কাটায়, কত দুঃখ পায় তার খবর তুমি কিছু জান না। তুমি জান না সেই ক্রুদ্ধ প্রেমিকের সঙ্গে দুটি দিনের মধ্যে একদিনও কোন কথা বলেনি মেরিয়ানা। আমি শুধু তাকে মিথ্যা অজুহাত আর মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে পাঠিয়ে দিই। আসল কথা তুমি আসার পর থেকে এক বিরাট পরিবর্তন আসে মেরিয়ানার জীবনে। তার আগে নর্বার্গ নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ছেলেটি তাকে মনেপ্রাণে ভালবাসে। আমিও বারবার তাকে নর্বার্গের নিবেদিত প্রেমকে বরণ করে নেবার জন্য অনুরোধ করি। মাঝে মাঝে তাকে কত ভাল ভাল উপহার পাঠাত নর্বার্গ। মেরিয়ানার মন কুণ্ঠা ও দ্বিধার দোলায় দুলতে থাকে সব সময়। তুমি তার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব কুণ্ঠা দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তোমাকেই গ্রহণ করে বসে সে। আমার এতে ইচ্ছা না থাকলেও বাধা দিতে পারিনি কারণ তার সুখই হল আমার সুখ। আমার কথার অবাধ্য হলেও আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতে পারতাম না তার কাছ থেকে। মেয়েটা ছিল শিশুর মত সরল এবং সৎ। তার সরলতা ও সততার সুযোগ নিয়েছে অনেকে অনেকবার। তুমি রাগ করে চলে গেলে আর এলে না। অথচ দিনের পর দিন সে পথ চেয়ে বসে থেকেছে। তোমার কথা ভেবে ভেবে দিন

কাটিয়েছে। তার সেই প্রতিটি দুঃসহ মুহূর্তের সকল দুঃখবেদনার নীরব সাক্ষী হয়ে আছি আমি। তোমার মনে যাই থাক একবার দেখা করে সব কথা বলতে পারতে। কিন্তু তুমি আর একবারও এলে না। তার মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী একমাত্র তুমিই। পালা করে আমরা দিনের পর দিন জানালার ধারে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতাম। যদি তুমি রাস্তা দিয়ে চলে যাও। সে জানালা থেকে একবার সরে গেলেই আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হত। বিরক্তি সত্ত্বেও তারই জন্য একাজ করতে হত আমায়।

উইলেম অধৈর্য হয়ে বলল, খুব হয়েছে বারবারা। অনেক কিছু করেছ, এবার একটা কাজ করো। আমার মেরিয়ানাকে বার করে দাও। তুমি নিশ্চয় তাকে লুকিয়ে রেখেছ কোথাও।

বারবারা বলল, সে আর ইহজগতে নেই। তার কবরের কাছে ফেলিক্সকে নিয়ে যাও। বলবে তোমার মাকে প্রণাম করো।

কিন্তু বারবারার এত কথাতেও উইলেম ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না ফেলিক্স তার ঔরসজাত সন্তান কি না। এ বিষয়ে সন্দেহাতীত কোন সত্যে পৌছতে পারছিল না সে। কেবলি মনে হচ্ছিল বারবারা তার সঙ্গে খেলছে। পরের ছেলের সব দায়িত্বভার তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে কৌশলে।

মাদাম মেলিনা তার এই সন্দেহ বাড়িয়ে দিল। বলল, ফেলিক্স অরেলিয়ার ছেলে। ও তোমার ছেলে নয়।

লার্তেস সার্লো বা দলের অন্য সবাই উইলেমের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতে লাগল। উইলেম বলল, সে অভিনয় আর করবে না। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে একমাত্র মাদাম মেলিনা ছাড়া আর তাকে এ বিষয়ে ভেবে দেখার জন্য কোন অনুরোধ করল না। মাদাম মেলিনা বারবার তাকে বলল, আপনি আবার ফিরে আসুন। আমরা আপনার কাছে অনেক ঋণী।

উইলেম বলল, সে কথা ত কেউ স্বীকার করে না।

স্থানীয় নাট্যামোদী লোকেরা উইলেমের অভিনয়ের প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল। তাকে নাট্যজগতে আবার ফিরে আসার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল। কিন্তু উইলেম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে ওয়ার্ণারকে একটা চিঠিতে লিখে দিল, আমি অভিনয় ছেড়ে দিয়ে তোমার কথামত চলতে চাই। আমি আবার আমার আত্মীয় বন্ধুদের মাঝে ফিরে যেতে চাই।

একবার ঠিক করল উইলেম বারবারা, ফেলিক্স, মিগনন এই তিনজনকেই থেরেসার কাছে পাঠিয়ে দেবে। সেইখানে ওরা থাকবে। মাঝে মাঝে ও গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসবে। কিন্তু পরে ঠিক করল বারবারাকে একটা মাসিক বৃত্তি দিয়ে বিদায় করে দেবে। শুধু মিগনন আর ফেলিক্সকে পাঠাবে থেরেসার কাছে।

মনে মনে উইলেম যতই ভাবতে লাগল ফেলিক্স থেরেসার কাছে থাকবে, থেরেসা তাকে মার মত স্নেহ করবে, তাকে কোলে করবে, ততই থেরেসা আরও প্রিয় হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। ফেলিক্সকে কোলে করা অবস্থায় থেরেসার এক কাল্পনিক মূর্তি খাড়া করে বড় আনন্দ পাচ্ছিল সে মনে মনে।

মিগনন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছিল না। অনেক করে তাকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিল থেরেসার কাছে। তারই জন্য ফেলিক্সকেও তার সঙ্গে পাঠাতে হলো। ফেলিক্সকে সে ভালবাসে এবং তার টানে টানে সেও যাবে। ওদের পাঠিয়ে দেবার পর কাজকর্ম ও কথাবার্তা সব সেরে সে রওনা হলো কাউন্ট লোথারিওর প্রাসাদের অভিমুখে। প্রাসাদে গিয়ে দেখল শুধু জার্ণো ছাড়া আর কেউ তখন প্রাসাদে নেই। জার্ণো ডাক্তার আব্বে বাইরে গেছে। কাউন্ট নিজেও নেই। তবে তিনি আমাদের সকলকে একটা কাজের ভার দিয়ে গেছেন। এই অঞ্চলে একটা বড় ভূসম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে। তিনি সেটা কেনার ভার আমাদের সকলের উপর দিয়ে গেছেন। দরদাম সব কিছু ঠিক করতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে আব্বে এসে গেল। আব্বে ফেলিক্সকে এর মধ্যেই দেখে ফেলেছেন থেরেসার বাড়িতে। একথা সেকথা বলার পর ফেলিক্সের কথা তুলে উইলেম তার মনের আসল সন্দেহের কথাটা বলল আব্বেকে। আব্বে অকুণ্ঠভাবে বললেন, ফেলিক্স তোমারই সন্তান। তার মাও গুণবতী রমণী ছিলেন। আমি বলছি। এতে কোন সন্দেহ করো না।

এমন সময় ফেলিক্স একজনের সঙ্গে এসে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাকে বুকের উপর চেপে ধরল উইলেম। তার সকল সন্দেহ সকল জ্বালা দূর হয়ে গেল নিমেষে।

প্রাসাদের মধ্যে হঠাৎ ওয়ার্নারকে দেখে অবাক হয়ে গেল উইলেম। পরে জানল কাউন্ট লোথারিও যে ভূসম্পত্তি কিনতে যাচ্ছেন সেটি আসলে তাদের। ওয়ার্নার তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চয় কথাবার্তা বলছে। ওয়ার্নার তার শেষ চিঠিটা পেয়েছিল যথাসময়ে।

ওয়ার্নার বলল, আমার মনে হয় এই নূতন পরিবেশে কাউণ্টের মত এই সব ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে তোমার উন্নতি হয়েছে। এখন তোমার চেহারা ও পোশাক-আশাকের উন্নতি হয়েছে।

উইলেম বলল, বাড়ির মেয়েদের খবর কি ?

ওয়ার্নার বলল, সব ভালো আছে। আমার ছেলে হয়েছে দুটি। তোমার মা বোন ভাল আছে। জমিজমার ব্যবস্থা সব ঠিক হয়ে গেলে তুমি যাবে। তোমার কাজ আছে।

ফেলিক্সের কথাটা ওয়ার্নারের কাছে তুলল না উইলেম। ওয়ার্নার কিভাবে সেটা নেবে বুঝতে পারল না। অথচ ফেলিক্স তার কাছে সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওয়ার্নারও তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি।

হঠাৎ উইলেমের একটা কথা মনে হলো। মনে হলো সে ফেলিক্স ও মিগননের প্রতি ঠিকমত নজর দেয়নি। মিগননের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে পারত। ফেলিক্সের মত সোনার চাঁদ ছেলের জন্য আরো আদর যত্নের ব্যবস্থা করতে পারত।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে থেরেসাকে একখানা চিঠি লিখল উইলেম। থেরেসার মত সেবাপরায়ণা মেয়ের উপরেই সে তার নিজের ও ছেলেদের ভবিষ্যৎকে অকুণ্ঠভাবে ছেড়ে দিতে পারে। সে তাই সংক্ষেপে চিঠিখানিতে থেরেসার কুশল জিজ্ঞাসা করে তাকে তার অন্তরের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা ভালবাসা ও একই সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও জানিয়েছিল।

চিঠিখানা থেরেসার কাছে সবেমাত্র পৌছতে কাউণ্ট লোথারিও ফিরে এলেন প্রাসাদে। ব্যস্তভাবে বললেন, আমার বোন তোমাকে অবিলম্বে তার বাড়িতে তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। এদিকে মিগননের অবস্থা খারাপ। তোমার সেখানে অবিলম্বে যাওয়া একান্ত দরকার।

হঠাৎ উইলেমের মনে হলো থেরেসাকে চিঠিটা লিখে ভুল করেছে। এ চিঠি লেখা উচিত হয়নি তাকে। এই কাউণ্ট লোথারিওই ছিলেন একদিন থেরেসার প্রেমিক এবং মনোনীত স্বামী—এ কথাটা কোনদিন ভুলে যেতে পারবে সে ?

কাউণ্ট তাঁর বোনের লেখা এক টুকরো কাগজ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে লেখাটা কাউণ্টপত্নীর কি না তা বুঝতে পারল না। কাউণ্ট লোথারিওর দুই বোন আছে। একজন হচ্ছে সেই কাউণ্টপত্নী যার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে

ব্যারণপত্নীর মাধ্যমে আর একজনের নাম নাটালিয়া যে সেই জঙ্গলে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হলে তার আরোগ্যলাভের ব্যবস্থা করে অশেষ উপকার সাধন করে। অনিন্দ্যসুন্দর বীরাঙ্গনা মূর্তিটি তার অন্তরের অনেকখানি শ্রদ্ধা ও আসক্তি কেড়ে নেয়।

লোথারিও তার বোনের বাড়ি থেকে যে ঘোড়ার গাড়িতে করে এসেছিলেন সেই গাড়িতে করেই পরদিন রাত্রিশেষে ফেলিক্সকে নিয়ে রওনা হলো উইলেম। দুই বোনের মধ্যে কোন বোন তাকে ডেকেছে তা নিশ্চিতভাবে জানতে না পারায় যেতে মন সরছিল না তার। গাড়িতে অনবরত সেই কথাই ভাবছিল।

শহরের মধ্যে একটি বড় বাড়ির গাড়ি বারান্দার নীচে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। বাড়ির চাকর এসে দরজা খুলে দিল। আর একজন চাকর এসে বলল, আপনাব জন্য অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলাম। তাকে সঙ্গে করে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেল। ফেলিক্সকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল উইলেম। উইলেম চাকরের মুখে ব্যারণপত্নী আছে শুনে ভেবেছিল কাউন্টপত্নীই তাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার ঘরে যে এসে হঠাৎ ঢুকল সে হচ্ছে লোথারিওর অন্য বোন নাটালিয়া। উইলেম নতজানু হয়ে নাটালিয়ার বাড়িয়ে দেওয়া একটি হাত চুম্বন করল। নাটালিয়া তার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর মিগননের কথা তুলল। বলল, আপনি ফেলিক্সকে তার কাছে রাখার ব্যবস্থা করলে সে ভাল থাকবে। এখন সে মেয়েছেলের পোষাক পরে। আমি তাকে ভাল পোষাক দিয়েছি।

পরদিন সকালে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল উইলেম। চাকর এসে প্রাতঃরাশের জন্য ডেকে নিয়ে গেল। উইলেম গিয়ে দেখল, নাটালিয়া তার জন্য অপেক্ষা করছে। কথায় কথায় নাটালিয়ার কাছ থেকে জানতে পারল উইলেম তাদের আর এক ভাই আছে। তিনি প্রায় হাসিখুশির সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। তাঁর নাম ফ্রেডারিক। আব্বে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উইলেম জানল আব্বে হচ্ছেন নাটালিয়াদের গৃহ শিক্ষক। বর্তমানে তার দাদার কাছেই থাকেন। তবে ওঁর জীবনের একমাত্র আদর্শ হলো, কাজ করে যাওয়া। তবে তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ ইচ্ছামত কোন মহৎ কাজ করতে পারে না। মানুষ আপন জন্মগত কর্মপ্রবৃত্তি আর প্রেরণার বশেই কাজ করে যায়। ইচ্ছা করলেই কেউ কবি হতে পারে না। আবার ইচ্ছা করলেই কোন কবি ভাল ছবি আঁকতে পারে না।

এমন সময় ডাক্তার ঘরে ঢোকায় আলোচনাটা থেমে গেল। ডাক্তারকে মিগননের কথা জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার বললেন, সে অনেক কথা। বলছি।

নাটালিয়া ফেলিক্সকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বলে গেল, ছেলেটাকে আগে হতে দেখলে সে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠবে আপনাকে দেখার জন্য।

নাটালিয়া চলে গেলে ডাক্তার অবাধে ও অকুণ্ঠভাবে বলতে লাগলেন, মিগননের ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। আপনি শুনলে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। ওর বিভিন্ন কথা, গান প্রভৃতি থেকে আমরা জেনেছি ওর বাড়ি ইতালির মিলান শহরের কোথাও। ওর শৈশবে দড়ির খেলা দেখানোর একটি দল ওকে চুরি করে নিয়ে আসে। তাই ও আর বাড়ি ফিরে যেতে পারেনি। তারপর ও একদিন অদ্ভুত এক স্বীকারোক্তি করে বসে। আপনার নিশ্চয় সেই আশ্চর্য এক রাত্রির কথা মনে আছে যে রাতে এক অদৃশ্য নারী জড়িয়ে ধরে আপনাকে, অথচ আলো জেলে আর দেখতে পাননি তাকে। সেই রাতে আপনি হ্যামলেটের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

উইলেম শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় কোনরকমে বলল, আমার ভয় হচ্ছে। সে মেয়ে মিগনন নয় নিশ্চয় ?

ডাক্তার বললেন, সে মেয়ে মিগনন কি না জানি না, তবে ও কিন্তু সে রাতে আপনার বিছানার ভিতরে লুকিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। এই কামনা সে রাতে প্রবল হয়ে উঠেছিল ওর মনে। কিন্তু সাদা পোষাকপরা অন্য এক মেয়েকে দেখে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে ও পালিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ বীণাবাদকের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির প্রতি অদম্য সঙ্গলিপ্সার সঙ্গে অজানা প্রতিদ্বন্দ্বিনীর প্রতি এক প্রবল ঈর্ষা মিলেমিশে সে রাতে ভয়ঙ্করভাবে বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল করে তুলেছিল ওর অনুভূতিকে।

উইলেম বিব্রত হয়ে ডাক্তারকে বলল, কিন্তু তার কাছে আমি গিয়ে কি করব। বরং আমার উপস্থিতি অহেতুক উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে তার মধ্যে। তাতে কোন ফল হবে না।

ডাক্তার বললেন, যেখানে আমি রোগ নিরাময় করতে পারি না সেখানে সে রোগকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারি। প্রেমের বস্তুর উপস্থিতি প্রেমিক প্রেমিকার মন থেকে ধ্বংসাত্মক চিন্তাগুলোকে সরিয়ে দিতে পারে। তার অনেক প্রমাণ আমি পেয়েছি। তবে তুমি গিয়ে তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। তার ফল কি হয় সেটা আমরা লক্ষ্য করব।

নাটালিয়া এসে উইলেমকে সঙ্গে করে মিগননের কাছে নিয়ে গেল। উইলেম গিয়ে দেখল মিগনন শান্তভাবে শুয়ে আছে আর তার বুকের উপর ফেলিক্স খেলা করছে। ফেলিক্সকে পেয়ে ও অনেকখানি শান্ত হয়ে উঠেছে। উইলেম যা ভেবেছিল তা কিন্তু হলো না। তাকে দেখে কোন উত্তেজনা প্রকাশ করল না মিগনন। শুধু বোঝা গেল সে খুশি হয়েছে মনে মনে উইলেমকে দেখে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল মিগনন। অবশ্য দুর্বলতা তখনো ছিল তার দেহে। রোজ একবার করে উইলেম তাকে নিয়ে বেড়াত। তার জীবনের উদ্ধারকর্তাকে প্রেমিক হিসাবে কল্পনা করেছিল মিগনন তার অপরিণত মনে। উইলেম যখন কাছে না থাকত তখন ফেলিক্স থাকত তার কাছে।

নাটালিয়া বলল, থেরেসার সঙ্গে আপনার বিয়েব কথা ঠিক হওয়ার কথা গ জানতে পারলে খুব রেগে যাবে।

উইলেমও বিয়ের কথাটা মিগননকে জানাতে সাহস পেল না।

অবশেষে থেরেসার বহু প্রতীক্ষিত চিঠিটা এসে গেল। নাটালিয়া নিজে তার বান্ধবীর চিঠিটা উইলেমের হাতে তুলে দিল। বলল, এখন খুশি ত? থেরেসা আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল। আমার মতামত চেয়েছিল। আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উইলেম গম্ভীর মুখে চিঠিটা খুলল। তাতে লেখা আছে, 'আমি তোমার, তুমি আমার। আমরা যেহেতু কোন আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হইনি, আমাদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা, উৎফুল্লতা ও যুক্তিবোধের দ্বারা আমাদের বিবাহবন্ধনকে সার্থক করে তুলব। আমি তোমার ফেলিক্সকে বুকে চেপে ধরে অনেক শান্তি পাব। তাকে মার মত মানুষ করব। আমি ভাবব, সে আমারই সন্তান। তুমি আমার বাড়িতে চলে এলেই আমরা হয়ে উঠবো একচ্ছত্র অধিপতি। আমরা শুরু করব আমাদের সুখের জীবন।

নাটালিয়া তার ভাই লোথারিওকে একটা চিঠি লিখল। এমন সময় হঠাৎ জার্নো এসে হাজির। জার্নো এসে বলল, আমি জানি না আমার বন্ধু কি মনে করবে। তার নিয়তি ঘটনার গতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে।

উইলেম বলল, আজ আমি সত্যই খুশি। আজ আমার সারা জীবনের সকল আশা সকল আকাঙ্খা সফল হতে চলেছে এই মিলনের মধ্যে।

জার্নোর কাছ থেকে উইলেম যখন শুনল থেরেসা তার মার নিজের সন্তান

নয় বলে কাউন্ট লোথারিও তাঁর মত পাল্টেছেন এবং থেরেসাকে গ্রহণের পথে অন্য কোন বাধা নেই, তখন উইলেম বলল, তিনি আমার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি তাঁরই জন্য তাঁকে প্রীত করার জন্যই থেরেসার পাণিগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম আবার তাঁরই খাতিরে থেরেসাকে ত্যাগ করে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারব। একথা কাউন্টকে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে যাও।

জার্নো ঘোড়ায় করে চলে গেল।

কাউন্ট লোথারিও সত্যি সত্যিই তাঁর মত পাল্টেছেন। তিনি এখন নিশ্চিত ভাবে জানতে পেরেছেন সুইজারল্যাণ্ডে থাকাকালে থেরেসার যে কুপথগামিনী ব্যভিচারিণী মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় থেরেসা তার সন্তান নয়। থেরেসার মা অন্য নারী যিনি ইহজগতে নেই। এবার থেরেসাকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

উইলেম প্রথমে ভেবেছিল এটা বুঝি জার্নোর চক্রান্ত। কিন্তু লোথারিওর একখানি চিঠি তাদের সব সন্দেহ ভঞ্জন করে দিল। নাটালিয়াকে লোথারিও লিখেছেন, তোমার উপর এখন গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে নাটালিয়া। আর তোমারই উপর নির্ভর করছে তোমার এই ভাইএর ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি। একদিকে থেরেসাকে বোঝাতে হবে তোমাকেই। আবার আমার বন্ধুও যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। তাকে কোন মতেই তুমি ছাড়বে না। আশা করি শীঘ্রই মন ঠিক হয়ে যাবে।

নাটালিয়া চিঠি পড়ে শান্ত কণ্ঠে উইলেমকে বলল, কথা দাও, তুমি আমার অমতে কোনদিন আমার এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে না।

উইলেম তার হাত বাড়িয়ে বলল, কথা দিচ্ছি, এবার হতে তোমার মতেই চলব এ ব্যাপারে। তোমার অমতে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব না।

বাগানে গিয়ে কিছু ফুল তুলল নাটালিয়া। বিভিন্ন রঙের বিচিত্র ধরনের ফুল। নাটালিয়া বলল, তোমাকে নিয়ে আমার কাকার কাছে যাব। আমার জীবনের সব আনন্দ সকল শান্তি এখন তোমার হাতেই নির্ভর করছে।

ফুল তোলার পর কথা বলতে বলতে প্রাসাদের এমন একটি দিকে যেতে লাগল যেখানে সচরাচর কেউ যায় না। নাটালিয়া বলল, এ দিকটায় আমার কাকা থাকতেন। এ ফুল তাঁরই জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

হলঘরে ঢুকতেই মর্মরপ্রস্তরের এক মূর্তি দেখতে পেল উইলেম। জানল ইনিই ছিলেন নাটালিয়ার কাকা। এ এক অদ্ভুত জগৎ। চারদিকে শুধু নানা

ধরনের ভাল ভাল ছবি। কত অপরূপ ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সার্থক নিদর্শন। দেখতে দেখতে দু চোখ জুড়িয়ে গেল উইলেমের। এই নির্জন পরিত্যক্ত অঞ্চলে আপাতদৃষ্টিতে কোন প্রাণচঞ্চলতা দেখতে না পেলেও এই শিল্পসৃষ্টির মধ্যে স্তব্ধ জীবনের এমন এক চিরন্তন রূপ দেখতে পেল উইলেম যে রূপ অবিচ্ছিন্ন কাল-প্রবাহে চিরপ্রবহমান। মৃত্যুশীতল এক অতীতাশ্রয়ী স্তব্ধতার সঙ্গে কালজয়ী প্রাণচঞ্চলতার এক প্রচ্ছন্ন তাপপ্রবাহ মিলেমিশে এক অদ্ভুত জীবন রসায়নে পরিণত হয়ে উঠেছে যেন।

কথা বলতে বলতে ওরা হল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় ছেলেরা ছোটাছুটি করতে করতে এগিয়ে এল তাদের দিকে। ফেলিক্স বলল, আমি আগে এসেছি। মিগনন বলল, আমি। আসলে হঠাৎ থেরেসা আসায় ওরা খবর দিতে এসেছে ছুটে। মিগনন হাঁপাচ্ছিল। নাটালিয়া তাকে ধরে বলল, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার, আমি তোকে বলেছি না, মোটেই ছুটবি না। বুকটা লাফাচ্ছে।

থেরেসা এগিয়ে এসে আবেগের সঙ্গে উইলেমকে বলল, কেমন আছ হে আমার বন্ধু। ওদের দ্বারা তুমি তাহলে এখনো প্রতারিত হওনি ?

উইলেম এগিয়ে যেতেই ছুটে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল থেরেসা। বলল, হে আমার মনের মানুষ, আমার স্বামী। তুমি আমার চিরদিনের। বলতে বলতে পাগলের মত চুম্বন করতে লাগল উইলেমকে। ফেলিক্স তার গাউনটা ধরে টানতে টানতে বলল, মা, আমিও এখানে রয়েছি।

হঠাৎ মিগনন দাঁড়িয়ে এসব দেখতে দেখতে নাটালিয়ার পায়ের কাছে পড়ে গেল। উইলেম তাকে দু হাতে তুলে ধরে ঘরে নিয়ে গেল। তাকে মৃত ভেবে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল। তাকে থেরেসা সরিয়ে নিয়ে গেল অন্য ঘরে। কিন্তু কারো কোন সান্ত্বনায় কান দিল না উইলেম। বলতে লাগল, আমারই হৃদয়হীনতার জন্য ওর মৃত্যু ঘটেছে। ও আমার কত উপকার করেছে। নিজে আহত হয়েও রক্তাক্ত দেহে আমার সেবা করে আমাকে বাঁচিয়েছে।

ডাক্তার ও সার্জেন এসে বললেন, একেবারে আশা ত্যাগ করবেন না। দেখি কি করতে পারি।

উইলেম লক্ষ্য করল এই সার্জেনই নাটালিয়ার নির্দেশে সেই বনে গিয়ে তার চিকিৎসা করে।

ঠিক এই সময় কাউণ্ট লোথারিও, আব্বে ও জার্ণো এসে হাজির হলো

প্রাসাদে। জার্ণো উইলেমকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু তার কোন কথা ভাল লাগল না উইলেমের। কুষ্টির কথা, তার ভবিষ্যতের কথা, কোন কিছুই আকৃষ্ট করতে পারল না তাকে। বিশেষ করে এই শোকদুঃখের সময়ে জার্ণো তার বিয়ের কথাটা তোলায় তার রাগ হলো জার্ণোর উপর। জার্ণো বলল, ঐ আব্বে এসে গেছেন। সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে সব কথা ওকে বল। সাক্ষাৎ নিয়তির মত উনি সব ঠিক করে দেবেন। উনি অনেকের মধ্যে অনেক মিলন অপ্রত্যাশিত-ভাবে ঘটিয়ে থাকেন।

এক জায়গায় সবাই যখন বসে গল্প করছিল একজন দূত এসে একটি চিঠি দিয়ে গেল কাউণ্ট লোথারিওর হাতে। কাউণ্ট বললেন, তোমার মালিক কখন আসবেন ?

কিন্তু দূত তা বলতে পারল না। এই অতিথি কে হতে পারে এই নিয়ে সবাই যখন জল্পনা কল্পনা করছিল তখন ফ্রেডারিক এসে হাজির হলো সবাইকে অবাক করে দিয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো উইলেম যখন সে নিজের চোখে দেখল কাউণ্ট লোথারিও ও নাটালিয়ার ভাই হচ্ছে তার অতিপরিচিত ফিলিনার বালকভৃত্য ফ্রেডারিক।

এদিকে উইলেমকে তাদের প্রাসাদে দেখে খুব খুশি হলো ফ্রেডারিক। বলল, ইনি যখন অভিনয় করতেন তখন আমি এঁদের সাজাতাম। ইনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন। একবার ঘুঁষিবৃষ্টি হতেও আমাকে রক্ষা করেন।

ফ্রেডারিককে দেখে পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ল উইলেমের। একটু সরে গিয়ে ফ্রেডারিক তাকে বলল, ফিলিনার জন্য আমি তোমাকে ঈর্ষা করতাম। একদিন রাত্রে ফিলিনাই সাদা পোষাক পরে তোমার ঘরে যায়। এতে আমার ঈর্ষা আরো বেড়ে যায়। ছোকরা অফিসারের বেশে আমিই শেষের দিকটায় তার ঘরে ছিলাম। আমার সঙ্গে সে তোমাদের দল ছেড়ে চলে আসে এবং এখন একটা নির্জন প্রাসাদে আমার সঙ্গেই থাকে। গ্রামাঞ্চলের সেই প্রাসাদে আমরা বেশ সুখেই আছি।

ফ্রেডারিক চলে গেলে জার্ণো এল উইলেমের কাছে। উইলেম বলল, এখানকার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন দেখছি আমার থেরেসার প্রতি আর সে আসক্তি নেই।

সেদিন নাটালিয়ার পাশে উইলেম আর জার্ণো বসেছিল। নাটালিয়া এক সময় জার্ণোকে বলল, কয়েকদিন ধরে দেখছি তুমি যেন কি ভাবছ সবসময়।

জার্ণো বলল, হ্যাঁ সত্যিই তাই। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি ভাবছি। অবশ্য ব্যাপারটা আমাদের বন্ধু উইলেমের উপর অনেকটা নির্ভর করছে। শোন বন্ধু, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি আমার সঙ্গে আমেরিকা যাচ্ছ।

আকাশ থেকে পড়ল যেন উইলেম। 'আমেরিকা যাব!' আমি একথা কখনো ভাবিওনি।

জার্ণো বলল, আজ সারা পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকা দ্রুত সমৃদ্ধি ও উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশের লোক তাই সেখানে গিয়ে গড়ে তুলছে নূতন নূতন উপনিবেশ। গড়ে উঠছে কত রকমের কাজ কারবার। তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। অবশ্য দুটো বিষয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে পার। হয় তুমি জার্মাণিতে থেকে কাউণ্ট লোথারিওকে সাহায্য করতে পার অথবা আমার সঙ্গে আমেরিকা যেতে পার।

উইলেম বলল, তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারব না।

ফ্রেডারিক সব সময় বেশী কথা বলে। বাজে কথা বলে। সে এই কথা শুনে ভ্রমণের গুণাগুণ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করে দিল। তার পর শেষকালে বলল, লিভিয়াকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। ব্যর্থ প্রেমের সব দুঃখ অন্তত সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিতে পারবে। আমাদের বন্ধু উইলেম ত পরিত্যক্ত রমণীকে ভালবেসে গ্রহণ করতে ওস্তাদ। না হয় ত আমিই লিভিয়াকে গ্রহণ করে আমেরিকা পাড়ি দিতে পারি।

জার্ণো বলল, বড় দেরি হয়ে গেছে, আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি।

নাটালিয়া বলল, ব্যর্থ প্রেমের আঘাতে আহত নারীকে এ প্রস্তাব দান করা এক জঘন্য কাজ।

নাটালিয়া আরো কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় আব্বে এসে আর একটা প্রস্তাব উত্থাপন করল উইলেমের কাছে। বলল, কাউণ্টের কাকার বন্ধু এক ইতালীয় ভদ্রলোক আসছেন এখানে। উনি সমগ্র জার্মাণ পরিভ্রমণ করবেন। উনি সঙ্গে এমন একজন জার্মাণ যুবক চান যে ভাল জার্মাণ ভাষা জানে এবং যে সামাজিক মেলামেশায় সক্ষম। আমরা তাই তোমাকেই ঠিক করেছি।

উইলেম বলল, আপনি বললেই যে মানতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমাকে ভেবে দেখতে হবে ব্যাপারটা। তাছাড়া আমি গেলে আমার ছেলে ফেলিক্সকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

আৰ্বে বললো, তা কি সম্ভব হবে?

একমাত্র নাটালিয়ার উপস্থিতি ছাড়া ,আর কারো উপস্থিতি ভাল লাগছিল না উইলেমের। তবে নাটালিয়া কাছে থাকলেও ওদের যে কোন প্রস্তাব বিষদৃশ ঠেকছিল উইলেমের কাছে। মনে হচ্ছিল এক একটা প্রস্তাব হলো তাকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে ফেলার এক একটা হীন চক্রান্ত। মনে হচ্ছিল বিয়ে বা নিবিড় পারিবারিক সুখশান্তি তার ভাগ্যে আর নাই। মেরিয়ানাকে সে প্রথমে ভালবেসেছিল, কিন্তু পায়নি। তারপর ফিলিনার প্রতি তার প্রেমাসক্তি জাগে, কিন্তু তাকেও কাছে পায়নি। তারপর অরেলিয়ার অকাল-মৃত্যু তার প্রতি তার আসক্তিকে ঘন হতে দেয়নি। পরিশেষে তার বারবার প্রতিহত ও ব্যর্থ প্রেমের নদীটি ক্লান্ত থেরেসার বুকে চিরতরে ঢলে পড়তে চায় ক্লান্ত হয়ে, কিন্তু এরা তাও হতে দিল না। এখন শুধু বাকি আছে নাটালিয়া।

ফেলিক্সকে কোলে করে বুকে চেপে ধরে কিছুটা শান্তি পেল উইলেম। সেই ইতালীয় ভদ্রলোক হঠাৎ এসে পড়লেন। সকলের সঙ্গে আলাপ করার পর উইলেমের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হল। ইতালির লম্বার্ডি অঞ্চলের লোক। বয়স অল্প।

ইতালীয় ভদ্রলোক তাঁর পরিচয়ের যে পূর্ণ বিবরণ লিখে এনেছিলেন তাতে অনেক আশ্চর্য নূতন কথা জানা গেল। অনেক জটিলতার জট খুলল। তাতে জানা গেল, বৃদ্ধ বীণাবাদক তাঁর অর্ধোন্মাদ ভাই অগাস্টিন এবং মিগনন তাঁর স্পেরাবা নামে এক বোনের বিকলাঙ্গ মেয়ে সমুদ্রতীরের একটি বাড়িতে তাকে রাখা হয়েছিল। স্পেরাবা থাকত কনভেন্টে। সেখান থেকে সে চুরি হয়ে যায়। তার টুপীটা সমুদ্রের এক খারির জলে ভাসতে দেখা যায়। লোকে ভাবে সে জলে ডুবে গেছে। মিগনন তাঁর ভাইঝি। ভাইঝির মৃত্যুসংবাদে মার্শেজী কাতর হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাইঝির ত্রাণকর্তা উইলেমের প্রতি জানালেন অকৃত্রিম মমতা।

উইলেমকে মার্শেজী বললেন, আপনি ফেলিক্সকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। দেখবেন মিগননের জন্মস্থান তার বাল্যের লীলাভূমি। আপনি তাকে স্নেহ করতেন।

এমন সময় সহসা কাউন্টপত্নী এসে হাজির হলেন। উইলেমের হাতটা ধরে একটু চাপ দিয়ে তার মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে একবার তাকালেন। তারপর তাঁর বোন নাটালিয়ার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

আগে মার্শেজীর হাতে লেখা বিস্তৃত বিবরণটি সকলের সামনে পড়ে

শোনালেন। হতভাগ্য মিগনন ও বৃদ্ধ বীণাবাদকের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে দুঃখে ভারী হয়ে উঠল সকলের হৃদয়। ভাগ্য বিড়ম্বনার এই সব সকরুণ কাহিনী শুনে অনেকে চোখের জল মুছতে লাগলেন।

একমাত্র মিগননের কথা ভেবেই ফেলিক্সকে সঙ্গে নিয়ে মার্শেজীর সঙ্গে প্রথমে জার্মাণি ও পরে ইতালি যেতে চাইল উইলেম। তার ভাইঝি মিগননের প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহপ্রীতির জন্য উইলেমকে মোটা রকমের সম্পত্তি দান করতে চান মার্শেজী। ওর ছেলের বাড়িতে গেলে উনি উইলেমকে তা দেবেন। আপাততঃ কিছু মূল্যবান ধাতু ও রত্ন উপহার দিলেন।

উইলেম ডাক্তারের কাছে লোক পাঠাল বীণাবাদকের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। সে ভাল হয়ে উঠলে তাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে করে।

উইলেম এদিকে লক্ষ্য করল থেরেসা ক্রমশঃই কাউন্ট লোথারিওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তারা হয়ত চাইছে সে এখান থেকে চলে গেলেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে তারা।

ডাক্তার লোক মারফৎ কোন খবর না পাঠিয়ে নিজে এলেন। এসে অদ্ভুত খবর দিলেন। বললেন বীণাবাদক এখন দাড়ি গোঁফ কামিয়ে নূতন মানুষ হয়ে উঠেছে। ডাক্তারকে এবার তার আসল পরিচয়ের কথা বলা হলো। বলা হলো তার আসল নাম অগাস্টিন। খ্যাতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক।

অগাস্টিনকে প্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু তার আসল পরিচয় তাকে বলা হলো না। মার্শেজীকেও বলা হলো না। ওরা সকলে ভাবল বীণাবাদক-রূপী অগাস্টিন সত্যিই ভাল হয়ে গেছে। কিন্তু অগাস্টিন সকলের সঙ্গে ভাল ভাবে কথাবার্তা বললেও ফেলিক্সকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কটমট করে তাকাচ্ছিল তার দিকে। ওরা কেউ বুঝতে পারল না তার ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিটা তখনো অবদমিত হয়নি একেবারে।

একদিন সকলে বসে গল্প করছিল। উইলেমরা কবে রওনা হবে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল এমন সময় ব্যস্তভাবে অগাস্টিন উন্মাদের মত ঘরে ঢুকল। তার মধ্যে হঠাৎ উন্মত্ততা জেগে উঠেছে দেখে সকলে তাকে ধরে ফেলল। সে তখন স্বাভাবিক মানুষের মত বলে উঠল, আমাকে নয়, ছেলেটাকে পার ত বাঁচাও গে! আমি তাকে বিষ খাইয়েছি।

সকলে ছুটে গেল ফেলিক্সের কাছে। দেখল একটা টেবিলের সামনে ফেলিক্স বসে রয়েছে। তার সামনে টেবিলে রয়েছে একটি গ্লাস ও একটি বোতল।

গ্লাসের জলে মাত্রাতিরিক্ত আফিম মিশিয়ে দিয়েছিল অগাস্টিন। ফেলিক্সকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে বলল, গ্লাসের জল খেয়েছি। তখন হতাশ হয়ে উইলেম মাথা চাপড়াতে লাগল। ভাবল ফেলিক্সকে আর বাঁচানো যাবে না।

ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তার বললেন, চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। নাটালিয়া ফেলিক্সকে কোলে করে বসে রইল। তার পা দুটো রইল উইলেমের কোলে। ভীড় দেখে কাঁদছিলো ফেলিক্স। সারারাত এইভাবে কাটল। নাটালিয়া সামনে বসে রইল। নাটালিয়ার হাতে প্রায়ই হাত ঠেকছিল উইলেমের। নাটালিয়া তার পানে তাকাচ্ছিল শান্ত অথচ গভীর দৃষ্টিতে।

এদিকে অগাস্টিনকে কোথাও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন সকাল হতেই একজন এসে খবর দিল অগাস্টিন উপরতলার একটি ঘরে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে। পাশে একটা ধারাল ক্ষুর। সেই ক্ষুর দিয়ে নিজের গলার শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছে অগাস্টিন।

ডাক্তার গিয়ে অতিকষ্টে রক্ত বন্ধ করে গলায় ব্যাণ্ডেজ করে দিল। কিন্তু কিছু পরে অগাস্টিন বলল, আমি মার্শেজীর লেখাটা একজায়গায় পড়ে থাকতে দেখে সব জানতে পারি। তখন দেখি এত কাণ্ডের পর আর আমার বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। তাই আত্মহত্যা করলাম।

পরে ফাঁক পেয়ে নিজের হাতের ব্যাণ্ডেজ সরিয়ে দিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা গেল অগাস্টিন।

এদিকে ফেলিক্সের অবস্থা আগের মতই রইল। ডাক্তার নাড়ী টিপে দেখল কোন বিকার নেই। বিষক্রিয়ার কোন কুফল দেখা গেল না। অনেকে নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু একা উইলেম বলল, এখনো বিপদ কাটেনি। ফেলিক্স বলেছে ও গ্লাসের জল খেয়েছে।

কিছু পরে নাটালিয়া ফেলিক্সকে কোলে করে অন্যত্র নির্জনে নিয়ে গেল। সেখানে নাটালিয়ার প্রশ্নের উত্তরে ফেলিক্স শান্তভাবে বলল সে গ্লাসের জল খেয়েছে। সে কথা নাটালিয়া এসে সকলকে জানাতে নিশ্চিন্ত হলো। সংশয় মুক্ত হলো উইলেম।

এবার যাবার দিন হয়ে গেল। আব্বেও যাবেন। রওনা হতে আর দুদিন বাকি। কাউণ্টপত্নী সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় নাটালিয়াকে গোপনে কি বলে গেলেন।

ফ্রেডারিক এসে হঠাৎ একটা খবর দিল সকলের সামনে। উইলেমকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, আমি সব শুনেছি। নাটালিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক। একটি রুদ্ধদ্বার ঘরে আব্বেকে তার মনের কথা বলছিল নাটালিয়া। সে কথা আমি শুনেছি। ফেলিক্সের অসুখের সময় সেই অতন্দ্র রাত্রিতে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে উইলেমকেই বিয়ে করবে।

এদিকে কাউন্ট লোথারিও উইলেমকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমার বিয়ে না হলে আমার বিয়েও হবে না। থেরেসার সঙ্গে নাটালিয়ার এক চুক্তি হয়েছে। থেরেসার ইচ্ছা দুটি দম্পতি একসঙ্গে উপস্থিত থাকবে বিবাহের বেদীতে। লোথারিও উইলেমকে জড়িয়ে ধরে নাটালিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন। ওদিক থেকে থেরেসা সঙ্গে করে নিয়ে এল নাটালিয়াকে।

ফ্রেডারিক ঠাট্টা করে বলল, আজ আমার যত সব পুরনো কথা মনে পড়ছে। লজ্জার কিছু নেই। আজ তোমার সুখ দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে কিশোর পুত্র মলের কথা যে তার বাবার গাধা খুঁজতে গিয়ে এক রাজ্য পেয়ে যায়।

উইলেম বলল, রাজ্য লাভ করেছি কিনা জানি না। তবে একটা জিনিস বলতে পারি। আজ যে সুখ আমি লাভ করলাম তার আমি যোগ্য নই এবং এ সুখের বিনিময়ে অন্য কোন কিছু গ্রহণ করতে পারব না সারা জীবনের মধ্যে।

কাইণ্ডার্ড বাই চয়েস

প্রথম পরিচ্ছেদ

এডওয়ার্ড হচ্ছে জনৈক ব্যারণ বা সামন্ত যুবকের নাম। এপ্রিলের কোন এক বিকেলে সে তার ফুলবাগানে কাজ করছিল একা একা। তার কাজ শেষ হয়ে যেতেই বাগানের মালী তার কাছে এল। তাকে দেখে এডওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী এখন কোথায়, তাঁকে দেখেছ?

মালী বলল, ওই ওখানে, নতুন বাড়ির মাঠে। প্রাসাদের উল্টোদিকে যে বাড়িটা তিনি করেছিলেন তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। বাড়িটা সত্যিই আপনার ভাল লাগবে। কাছেই গাঁ, ওপর থেকে দেখতে পারেন। একটু ডান দিকে চার্চ। উল্টোদিকে এই প্রাসাদ আর বাগান।

এডওয়ার্ড বলল, হ্যাঁ, আমি লোকজনদের কাজ করতে দেখেছি।

মালী উৎসাহিত হয়ে বলল, বাড়িটার ডানদিকে একটা ছায়াঘেরা প্রান্তর উপত্যকায় গিয়ে মিশে গেছে। পাহাড়ে যাবার পথটা বড় চমৎকারভাবে নির্মাণ করা। গিন্নীমার সত্যিই বড় সূক্ষ্ম রুচিবোধ আছে।

এডওয়ার্ড বলল, এখন তাঁকে গিয়ে বল, নতুন বাড়িটা আমি নিজে গিয়ে দেখতে চাই।

মালী ব্যস্ত হয়ে চলে গেল। মালী চলে গেলে এডওয়ার্ড একাই বাগান থেকে পুরনো প্রাসাদটাকে ফেলে রেখে নতুন বাড়িটাতে চলে গেল। তার স্ত্রী শার্লোতে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। শার্লোতে তাকে সঙ্গে করে উপরতলার এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেল যেখান থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য সব দেখা যাবে।

সেখান থেকে চারদিকে খুঁটিয়ে দেখে সত্যিই খুশি হলো এডওয়ার্ড। বলল, সত্যি চমৎকার। তবে একটা ত্রুটি আছে। বাড়ির আয়তনটা ছোট হয়ে গেছে।

শার্লোতে বলল, কিন্তু আমরা ত মাত্র দুজন প্রাণী। বেশী জায়গার দরকার কি? তাছাড়া এখানে দুজন ছাড়া আরও বেশী কিছু লোক ধরবে।

এডওয়ার্ড শান্ত কণ্ঠে বলল, দেখ, একটা কথা তোমাকে ক'দিন থেকে বলব ভাবছি, কিন্তু বলতে পারিনি। কিন্তু আজকের ডাকে একটা চিঠি পেয়ে আর

না বলে পারছি না।

শার্লোতে বলল, আমিও এই রকম একটা কিছু লক্ষ্য করছি। কিন্তু কথাটা কি?

এডওয়ার্ড বলল, কথাটা আমাদের বন্ধু সেই ক্যাপ্টেনকে নিয়ে। তার এখন সত্যিই বড় দুরবস্থা। তার মত প্রতিভাবান কৃতিত্বসম্পন্ন লোকের এইরকম অকর্মণ্য হয়ে পড়াটা সত্যিই বড় দুঃখজনক। আমার কথা হলো এই যে ওকে আমরা এই বাড়িতে কিছুদিন রাখতে চাই।

শার্লোতে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, এ ব্যাপারটা কিন্তু একাধিক দিক থেকে ভেবে দেখতে হবে।

এডওয়ার্ড বলল, তার শেষ চিঠিখানিতে একটা চাপা অসন্তোষ ছিল। তার যে কোন কিছুর অভাব আছে তা নয়। আমার কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতেও সে অরাজী নয়। তা হবার কথা নয়। কারণ আমাদের দু বন্ধুর জীবন এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে দেনাপাওনার হিসেব করা ভার। কে কার থেকে কত পাবে কেউ বলতে পারবে না। তার আসল কথাটা হলো এই যে তার করার কিছু নেই। চুপচাপ কোলের উপর হাত গুটিয়ে বসে থাকা অথবা বই পড়া। এই কর্মহীন একাকীত্বে তার বেদনাটা তিনগুণ হয়ে যায়।

শার্লোতে বলল, তার পক্ষ থেকে আমি অনেক বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি লিখেছিলাম। তাদের অনেকে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

এডওয়ার্ড বলল, তা ঠিক। কিন্তু এই সব সাহায্যের প্রতিশ্রুতিই তাকে নূতন করে বেদনা দেয়। তারা যদি কোন কাজ দেয় তাহলে তা গ্রহণ করলে ক্যাপ্টেনকে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে। আত্মবিক্রীত হতে হবে। আমি তার অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছি।

শার্লোতে বলল, বন্ধুর দুঃখে সমবেদনা জানানো খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমাদের নিজেদের দিকটাও ভেবে দেখতে হবে।

এডওয়ার্ড বলল, আমি তা দেখেছি। খরচের কথা বলব না কারণ সে এখানে থাকলে অতি সামান্যই খরচ হবে। সে থাকলে আমাদের কোন অসুবিধাই হবে না। বরং সুবিধা হবে। বাড়িটার ডানদিকে সে থাকতে পারবে। সে আমাদের বিষয় সম্পত্তির কাজ দেখাশোনা করতে পারবে। তার অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। গ্রামের লোকের অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি নেই। তথ্য পরিবেশনে কোন যাথার্থ্য নেই। আবার শহরে থেকে যারা পড়াশুনা করেছে.

তাদের চিন্তাশক্তি থাকলেও তাদের অভিজ্ঞতা নেই জমিজমা সম্বন্ধে। কিন্তু আমার বন্ধুর দুই-ই আছে। প্রাসাদের ব্রিজের সময়টা পার হয়ে গেলে তোমার কাজ আরো বেড়ে যাবে। তখন ও আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবে।

শার্লোতে বলল, ভাল কথা। মানুষ বর্তমানটাকেই বড় করে দেখে। পুরুষরা কাজের লোক বলে এইরকম দেখাটাই স্বাভাবিক তাদের পক্ষে। কিন্তু মেয়েরা সব সময় সারা জীবনের কথা ভাবে। আমাদের অতীতটা একবার ভেবে দেখ। প্রথম যৌবনে আমরা ভালবাসতাম পরস্পরকে। কিন্তু তোমার বাবা টাকা চাইলেন বলে একটা মোটা সম্পত্তির লোভে একটা বুড়ো মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন। আমারও এমন একজনের সঙ্গে বিয়ে হয় যাকে আমি ভালবাসতে পারিনি। এইভাবে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু তোমার স্ত্রী আর আমার স্বামী মারা যাওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে আমরা মিলিত হই আবার। আকাঙ্ক্ষিত যে সুখ, অনাবিল অব্যাহত মিলনের যে আনন্দ একদিন আমরা পাইনি সে সুখ সে আনন্দ আজ আমরা পূর্ণমাত্রায় পেতে চাই। তুমিও জীবনে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করেছ ; আজ বিশ্রাম চাও। এর জন্য তোমারই কথায় আমার মেয়েকে বোর্ডিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ভাইঝিকেও অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছি।

এডওয়ার্ড বলল, আমি তোমার সব কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপস্থিতি আমাদের এ মিলনকে কোনভাবে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

শার্লোতে তবু তর্কের ভঙ্গিতে বলল, আমি জানি অনেক মানুষের জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব নানাভাবে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

এডওয়ার্ড বলল, তা ঘটিয়েছে এমন লোকদের জীবনে যাদের বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা কিছুই নেই। যারা অন্ধের মত চলে, নিজস্ব বিচারবুদ্ধি নেই তাদের ক্ষেত্রেই একথা খাটে।

শার্লোতে বলল, তবু আমি বিপদের অশুভ আভাস পাচ্ছি মনে।

এডওয়ার্ড বলল, ও সব অর্থহীন চিন্তা।

শার্লোতে বলল, এই সব আভাস মানুষের কর্মফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাপ্রসূত এক একটা প্রাককল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাই হোক, আমাকে এ বিষয়ে ভাবার জন্য দিনকয়েক সময় দাও। হঠকারিতার সঙ্গে কিছু করো না।

এডওয়ার্ড বলল, কিন্তু যা কিছু করার এখনি করতে হবে। যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি তার চিঠির উত্তর দিতে যাচ্ছি।

শার্লোতে বলল, এখন তাকে সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানিয়ে দুকথা লিখে দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শার্লোতের কথায় বন্ধুর প্রতি সহানুভূতির উদ্দাম আবেগটা সত্যিই শান্ত ও প্রশমিত হলো এডওয়ার্ডের। তার কথার গুরুত্বটা ধীরে ধীরে বুঝল এডওয়ার্ড। তাছাড়া মনে তার কতকগুলো স্মৃতি জেগে উঠল শার্লোতের কথায়। যে প্রেম বিচ্ছেদে বিরহে মরে যায়নি, বরং ইন্দ্রিয়সংসর্গ ছাড়াই যা তীব্র হয়ে ওঠে দিনে দিনে, অমর ইন্দ্রিয়াতীত সে প্রেমের আশ্চর্য মধুর এক সুবাস অতীত জীবনের ভাঁজ থেকে আজ তার কাছে যেন উঠে আসে সহসা।

এডওয়ার্ড ঠিক করে ফেলে শার্লোতের কথামতই সে এখন চিঠির উত্তর লিখবে তার বন্ধুকে। এখন তাকে আসতে লিখবে না। কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে ক্যাপ্টেনের খোলা চিঠিটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর প্রতি সেই সকরুণ সহানুভূতির এক অদম্য প্রবলতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন শার্লোতের কথা-গুলোকে।

আজ একটা জিনিস অনুভব করল এডওয়ার্ড। আজ তার জীবনে তার ইচ্ছা এক প্রত্যক্ষ বিরোধিতা লাভ করল। তার স্ত্রী শার্লোতে আজ প্রত্যক্ষভাবে তার ইচ্ছার গতিরোধ করে দাঁড়িয়েছে। জীবনে এর আগে এমনভাবে তার ইচ্ছার গতিবেগ কেউ প্রতিহত করেনি। সে বাবা-মার একমাত্র প্রিয় সন্তানরূপে যা চেয়েছে তাই একরকম পেয়েছে বিনা বাধায়। যৌবনে বাবা মা একরকম তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিলেও এই বিরোধিতার মাশুল সে সুদে আসলে পেয়ে গেছে। তার প্রথমা স্ত্রী মারা যাবার পর সে অনেক সম্পত্তি লাভ করেছে এবং তার ফলে তার ইচ্ছার স্বাধীনতা আরো অনেক বেড়ে গেছে। সে ইচ্ছামত ঘুরে বেড়িয়েছে অনেক জায়গায়। ইচ্ছামত তার প্রথম প্রেমের নায়িকা শার্লোতেকে দীর্ঘ দিন পর স্ত্রী হিসাবে ঘরে এনেছে। তবু আজ শার্লোতের কথাটা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলেও সে কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না এডওয়ার্ড।

বন্ধুর চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে তাই তাকে আসতে বলতে পারল না। কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে শুধু লিখল অনেক দিন চিঠি দিতে না পারার জন্য সে দুঃখিত। অল্প দিনের মধ্যেই সন্তোষজনক আর একখানি চিঠি সে পাঠাচ্ছে।

পরদিন সকালেই আবার কথাটা তুলল শার্লোতে। আজ এডওয়ার্ডের মনটা খুব ভাল ছিল। তার প্রতিটি কথার ঔদার্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল

শার্লোতে নতুন করে। এক সময় সে বলল, তুমি আমাকে সত্যিই বাধিত করলে এডওয়ার্ড। গতকাল যা আমি আমার স্বামীকে দিতে পারিনি আজ তা আমার প্রেমিককে না দিয়ে পারছি না। আজ না বলে পারছি না যে তোমার অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতির নিবিড়তা আমাকেও বিচলিত করে তুলেছে। আমার মধ্যেও জাগিয়ে তুলেছে অনুরূপ ভাব। তুমি যেমন ক্যাপ্টেনের কথা ভাবছ আমিও তেমনি ভাবছি ওতিলের কথা। আমি আমার মেয়ে লুসিয়ানের কথা ভাবছি না। সে ভালই আছে। পড়াশুনো করছে। কিন্তু ওতিলে যে বোর্ডিং হাউসে থাকে তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বেচারীর জন্য বড় দুঃখ হয়। তাই বলছিলাম কি তুমি যেমন ক্যাপ্টেনকে এখানে রাখতে চাও, আমিও তেমনি ওতিলেকে এখানে এনে রাখতে চাই। এতদিন কিন্তু কথাটা বলতে পারিনি কারণ যে কারণে আমি তোমাকে বাধা দিচ্ছিলাম সেই কারণে আমি নিজের বন্ধুরও বিরোধিতা করেছিলাম। নিজেকে বাধা দিয়েছিলাম নিজে।

এডওয়ার্ড বলল, এ কিন্তু পুরোপুরি স্বার্থপরতা। আমি ক্যাপ্টেনকে আনতে চাই। তুমি চাও ওতিলেকে। একে যদি স্বার্থপরতা না বলো ত আর কাকে বলবে।

শার্লোতে সে কথায় কান না দিয়ে বলল, কিন্তু এ বিষয়ে একটা কথা আছে। তুমি কি মনে করো এক বাড়িতে ক্যাপ্টেনের কাছাকাছি ওতিলেকে রাখা ঠিক হবে? ক্যাপ্টেনের বয়স প্রায় তোমারই মতই আর ওতিলেও সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছে। তাছাড়া ওতিলে দেখতে ভাল।

এডওয়ার্ড বলল, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না ওতিলের রূপটাকে কেন তুমি এত বড় করে দেখছ এবং সেটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ। তার মাকে তুমি ভালবাসতে বলে তাকে তুমি স্নেহ করো। তা করো তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। সে সুন্দরী, তাব চোখগুলোও ভাল ঠিক। ক্যাপ্টেন তার প্রতি একবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল দেশভ্রমণ থেকে আমি ফিরে আসার পর। কিন্তু সে আমার মনে মোটেই কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

শার্লোতে হেসে বলল, এইজন্যই তো তোমাকে এত ভাল লাগে। তুমি তার কচি সৌন্দর্য ফেলে আমার মত পুরনো বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট হলে।

কথা বলতে বলতে ওরা যখন নূতন বাড়ির বাগান থেকে পুরনো প্রাসাদে ফিরছিল তখন একটি চাকর এসে খবর দিল ঘোড়ায় চেপে মিস্টার মিটলার এসেছে। চাকর মারফৎ জিজ্ঞাসা করেছে তাকে তাদের প্রয়োজন আছে কি না।

মিটলারের নাম শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল এডওয়ার্ড। বলল, গিয়ে এখনি তাঁকে আদর আপ্যায়ন করো। তাঁকে এনে বসার ঘরে বসাও। জলখাবার খেতে দাও। আমরা যাচ্ছি।

এডওয়ার্ডকে দেখে মিটলার বলল, আশা করি আমাকে আজ তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাকে যদি সত্যি সত্যিই কোন প্রয়োজন থাকে, তাহলে আমি আজ তোমাদের এখানে লাঞ্চ খাবো। তা না হলে চলে যাব। আমার অনেক কাজ আছে।

শার্লোতে বলল, সত্যিই দরকার আছে। আমাদের বিয়ের পর আজ প্রথম একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে দুজনের মধ্যে। আমরা সেটার সমাধান করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

মিটলার বলল, কিন্তু তোমাদের দেখে ত তা মনে হচ্ছে না। ঠিক আছে, যদি তাই হয় তাহলে পরে তা দেখা যাবে। আজ আমার কাজ আছে।

ওরা কথা বলতে বলতে হলের মধ্যে গেল। চাকরে প্রাতঃরাশ দিয়ে গেল। এই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মিটলার আগে ধর্ম দপ্তরের মন্ত্রী ছিলো। মন্ত্রী হিসাবে প্রচুর নাম করেছিল মিটলার। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত যে কোন ঝগড়া মেটানোর কাজে সিদ্ধহস্ত ছিল মিটলার। সে মন্ত্রী থাকাকালে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারত না কেউ। কারো কোন দাম্পত্য জীবনে সমস্যা বা মন কষাকষি দেখা দিলে সে তা মিটিয়ে দিত। এমন কি অনেক মামলা মোকদ্দমাও শুরু হতে না হতেই মিটিয়ে দিত সে। এই সব কাজে আইনজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আছে দেখে সে অল্পকালের মধ্যেই আইনবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে। তখন তার কর্মক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। তখন রাজধানীতে ডাক পড়ে তার। বর্তমানে এখন একটা এস্টেট কিনে খামার করেছে মিটলার অবসর নেবার পর। আর একটা অদ্ভুত কাজ সে করে বেড়ায়। সে মাঝে মাঝে এমনি বিভিন্ন গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কারো বাড়িতে বসে না বা খায় না যদি না সে বাড়ির কোন উপকার সে করে। আজও আগের মতই ঝগড়া মিটিয়ে বেড়ায় মিটলার।

খাবারের সঙ্গে মিষ্টি দেওয়া হলো। এদিকে কথায় কথায় তাদের দুজনের দাম্পত্য সমস্যাটার কথাও বলে ফেলল এডওয়ার্ড। কিন্তু সব শুনে মিটলার বলল, আজ এসব কথা বলে কোন লাভ হবে না। আমার অন্যত্র কাজ আছে। আজ আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।

মিটলার সত্যি সত্যিই উঠে পড়ল। চাকরকে তার ঘোড়া তৈরি করতে বলল। সে তখন এডওয়ার্ডকে বলল, তোমাদের এটা মোটেই সমস্যা নয়। তোমরা জান প্রথমে আমি কাউকে উপদেশ দিই না। সমস্যা বুঝলে আগে তোমরা নিজেরাই একটা উপদেশ খাড়া করো। তাতে কাজ হলে আনন্দ করো, নিজেদের বুদ্ধিকে বাহবা দাও। আর তাতে কাজ না হলে আমাকে ডাকবে। যে যাকে আনতে চাইছ নিয়ে এস বাড়িতে। রেখে দাও। পরে সমস্যা দেখা দিলে আমাকে ডাকবে। ভয়ের কিছু নেই। তখন অবশ্যই সাহায্য পাবে আমার কাছ থেকে। আজ চলি। বিদায়।

এই বলে কফি না খেয়েই ঘোড়ার উপর চেপে চলে গেল মিটলার।

শার্লোতে বলল, এইজন্যেই বলছিলাম দুজন অন্তরঙ্গ মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে অমিল হলে তৃতীয় পক্ষকে ডাকতে নেই। এখন যেমন একথা ওকে বলে কোন লাভ ত হলোই না, বরং আগের থেকে কেমন যেন জটিল আর গোলমেলে লাগছে ব্যাপারটা।

ব্যাপারটার এখানেই শেষ করে ওরা চলে যাচ্ছিল অন্যত্র, এমন সময় চাকর এসে একটি চিঠি দিল এডওয়ার্ডের হাতে। চিঠিখানা ক্যাপ্টেনের। ক্যাপ্টেন লিখেছে অবশেষে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা কাজ সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কাজটা হলো কোন ধনীর বাড়িতে থেকে তাকে সঙ্গ দান করা ও তাকে খুশি করা।

এডওয়ার্ড চিঠিখানা শার্লোতেকে দেখিয়ে বলল, দেখছ আমার বন্ধু কি রকম দারুণ দুরবস্থায় পড়েছে ? এর পরেও তুমি চুপ করে থাকতে পার শার্লোতে।

শার্লোতে বলল, মিটলার ঠিকই বলেছে এসব ব্যাপারে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। ভাল ব্যবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়, আর খারাপ ব্যবস্থাও ভাল ফল লাভ করে। সুতরাং অনেক সময় আমাদের অন্ধকারে লাফ দিতেই হবে। আজ তোমাকে বাধা দেবার কোন শক্তি বা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না আমি। তুমি ওঁকে আসতে লিখে দাও। তবে এখানে যেন খুব বেশী দিন উনি না থাকেন। অবশ্য আমিও ওর পক্ষ থেকে একটা সন্তোষজনক ভাল কাজের জন্য চেষ্টা করব।

এ বিষয়ে আনন্দের সঙ্গে একমত হয়ে এডওয়ার্ড চিঠি লিখতে শুরু করল তার বন্ধুকে। তার লেখা শেষ হলে সেই চিঠিতে নিচের দিকে শার্লোতে দু কলম লিখে দিল। সৌজন্যের খাতিরে আসতে আহ্বান জানাল স্বামীর বন্ধুকে।

এডওয়ার্ড চিঠিটা বন্ধুকে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সঙ্গে সঙ্গে

শার্লোতেকে অনুরোধ করল ওতিলেকে আনার জন্য। সন্ধ্যে হতেই সেদিন ওদের দ্বৈত গান বাজনার আসর বসল। শার্লোতে পিয়ানো বাজাতে লাগল আর এডওয়ার্ড বাজাতে লাগল বাঁশি। মাঝে মাঝে বাঁশি বাজায় এডওয়ার্ড। কিন্তু তার স্বাভাবিক চঞ্চলতার জন্য ভালভাবে শিখতে পারেনি। তবু তার সঙ্গে তাল রেখে একমাত্র শার্লোতেই পিয়ানো বাজিয়ে চলে ধৈর্য ধরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবশেষে যার জন্য এত কাণ্ড সেই ক্যাপ্টেন এসে গেল। আসার আগে একটা চিঠি দিয়েছিল এডওয়ার্ডকে। চিঠিখানি এমনই চিন্তাপূর্ণ এবং সুলিখিত যে তা দেখে আশ্বস্ত হয় শার্লোতে। সে চিঠিতে একদিকে ক্যাপ্টেন নিজের অবস্থার কথাটা আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে ব্যক্ত করে তেমনি বন্ধুদের প্রতি তার মনোভাবটাও চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে।

দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুতে প্রচুর কথাবার্তা হলো। বেশ কিছুদিন পর দেখা হলো। সুতরাং কথাবার্তায় কিছু উচ্ছ্বাস থাকবেই। সন্ধ্যের দিকে শার্লোতে বেড়াবার ব্যবস্থা করল। নূতন বাড়ির বাগানে বেড়াতে যাবে ওরা। জায়গাটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে খুব পছন্দ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। এ বাগানের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি জায়গা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

নূতন বাড়িতে পৌঁছে ক্যাপ্টেন দেখল ফুলের মালা দিয়ে বাড়িটাকে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছে। শার্লোতে বলল, আজ একদিনে দুটো উৎসব। এডওয়ার্ডের জন্মদিন আর আমাদের বন্ধুর শুভাগমন। এডওয়ার্ড অবশ্য চায় না ওর জন্মদিন পালিত হোক। নামকরণের দিনটাও পালন করে না ও।

এডওয়ার্ড বলল, নামকরণের কথা বলতে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমরা দু বন্ধুতে ছোট থেকেই এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, খেলা করেছি।

এডওয়ার্ড এক সময় শার্লোতেকে বলল, আমরা এখন তিনজন। আর একজনের অবশ্যই জায়গা হবে প্রাসাদে।

এবার ওরা পাহাড়ের চূড়াটায় যাবার জন্য রাস্তা ধরল। এডওয়ার্ড বলল, বন্ধুকে পাহাড়টার উপর নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসি আমাদের সম্পত্তির সীমানা কতদূর, তা না হলে মনে হবে এই ছোট উপত্যকাটার মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে

আমাদের বাড়ির চৌহদ্দী।

শার্লোতে বলল, তাহলে এই সোজা পথে এস।

ঝোপঝাড়ে ভরা বেশ কিছু চড়াই পার হয়ে ওরা পাহাড়ের মাথাটায় গিয়ে উঠল। সেখান থেকে প্রাসাদটাকে দেখা গেল না। সেখানে ওরা দেখতে পেল শুধু একটা প্রকাণ্ড লেক আর তার ওপারে আর একটা পাহাড় দিগন্তটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড় থেকে একটা নদী বার হয়ে সামনের লেকে এসে পড়েছে। লেকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পপলার গাছের সারি। এডওয়ার্ড বলল, ঐ গাছগুলো আমি বসিয়েছি।

খুশি হয়ে পাহাড় থেকে নেমে এল ওরা। ক্যাপ্টেনের থাকার জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হলো। ক্যাপ্টেন থাকবে প্রাসাদের ডানদিকে বারান্দাওয়ালা একটি প্রশস্ত ঘরে। সেখানে তার বইপত্র ও কাগজ সব গুছিয়ে রাখল। কিন্তু এডওয়ার্ড তাকে বেশ কয়েকদিন শান্তিতে থাকতে দিল না। ক্রমাগত চার পাশের জায়গাগুলো ঘোড়ায় চাপিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সে।

অবশেষে একদিন তার মনের গোপন কথাটা বলে ফেলল ক্যাপ্টেনকে। বলল, আমার যাবতীয় ভূসম্পত্তি কোথায় কি আছে তা তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। এবার এর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি সম্পর্কে তোমার মতামত ও সাহায্য চাই। এটা আমার অনেক দিনের বাসনা।

ক্যাপ্টেন বলল, এই জেলাতে কোনখানে তোমার কত জমি আছে তা আগে জরিপ করে মেপে দেখতে হবে।

জমি মাপার সাজসরঞ্জাম তার সঙ্গেই ছিল। বলার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই মাপার কাজ শুরু করে দিল ক্যাপ্টেন। তারপর বাড়ি গিয়ে নক্সা করে এক বিরাট কাগজের উপর রং দিয়ে চিহ্নিত করে এডওয়ার্ডের কোথায় কত জমি আছে তা দেখিয়ে দিল। তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল এডওয়ার্ড। জীবনে আজ সে যেন প্রথম ভালভাবে তার ভৌম অধিকারের সীমানাটা যথাযথ বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার স্ত্রীকেও দেখাই।

ক্যাপ্টেন বলল, কি দরকার? সবাই সব বিষয়ে একমত নাও হতে পারে।

এডওয়ার্ড বলল, কিন্তু তার বাগান সাজানোর কাজটা সমর্থন করবে না তুমি? সেটা দেখেছ ত?

ক্যাপ্টেন বলল, আমি দেখেছি। কিন্তু তারিফ করতে পারছি না। উনি

যে পথ নির্মাণ করেছেন তাতে দুজনে পাশাপাশি চলতে পারবে না। আর ঐ পথটাকে সোজা করতে হলে ঐ পাহাড়ের একটা অংশ ভাঙতে হবে।

এর পর সে তার নিজের পরিকল্পনার কথাটা বলল। নূতন বাড়ির বাগান থেকে বেরিয়ে পথটা কিভাবে সোজা পাহাড়ের উঁচু চূড়াটায় চলে যাবে। আর তাতে পয়সাও তেমন খরচ হবে না।

ক্যাপ্টেনের সমালোচনা ও পরিকল্পনা দুটোই ভাল লাগল এডওয়ার্ডের। সে এইটাই গ্রহণ করল। তারপর একদিন যখন দেখল শার্লোতে তার আগেকার সেই ভুল পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু করে দিয়েছে তখন তাকে কথাটা খুলে বলল।

শার্লোতে বুদ্ধিমতী। ক্যাপ্টেনের পরিকল্পনাটা যে ঠিক তা সে বুঝতে পারল সহজেই। তবু নিজের পরিকল্পনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। এ পরিকল্পনা একদিন সে অনেক কষ্ট করে গড়ে তোলে। এ কাজে তার অনেক সময় কেটে যেত। তাই সে সব জেনেও তর্ক করতে লাগল এডওয়ার্ডের সঙ্গে। তারপর হেরে গিয়ে নিজেই চুপ করল।

ক্যাপ্টেন আসার পর থেকে দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় এডওয়ার্ড তার বন্ধুর কাছেই থাকে। নানারকমের কথাবার্তা বলে। তার উপর আছে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে যাওয়া আর শিকার করা। শার্লোতের সঙ্গে আজকাল বিশেষ কোন কথাই বলে না এডওয়ার্ড। এর উপর হাতের কাজটা চলে যাওয়ায় খুব বেশী নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগল শার্লোতে।

এমন সময় শার্লোতে একটা কাজ পেল। বোর্ডিং থেকে ওতিলে সম্পর্কে চিঠি পেল। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস জানিয়েছে, ওতিলে অন্য সব মেয়েদের মত ঠিক পড়াশুনো আয়ত্ত করতে পারছে না। সে ভাল করে তৃপ্তির সঙ্গে খায় না। মাঝে মাঝে মাথা ধরে তার। বাঁ দিকের কপালটায় যন্ত্রণা করে। তবু আমরা আশা ছাড়িনি। বিশেষ আগ্রহ সহকারে ওর অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ওর নিরানন্দ জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারব।

শার্লোতে আশ্বস্ত হলো। ওতিলের প্রতি প্রধান শিক্ষিকার স্নেহ ও আগ্রহ দেখে খুশি হলো সে। অবহেলা আর ঔদাসীন্যে ভরা এই জগতে যখন কেউ কারো প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় ও স্নেহ প্রীতি দান করে তখন সত্যিই সেটা দেখার বিষয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এডওয়ার্ডের যাবতীয় স্থাবর ভূসম্পত্তির একটা প্রাথমিক নক্সা তৈরি হয়ে গেল। এবার ক্যাপ্টেন বন্ধুকে বলল, এরপর তোমার ভূসম্পত্তির সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তারপর প্রজাদের ব্যাপারটা ঠিক করা হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই এডওয়ার্ড বুঝতে পারল ক্যাপ্টেন কত পরিশ্রমী। যে কাজ হাতে নেয় ক্যাপ্টেন তা কত নিখুঁতভাবে করে। শুধু তাই নয়, ক্যাপ্টেন আবার তার বন্ধুকে খানিক উপদেশও দিয়ে দিল। বলল, কাজ চায় নিষ্ঠা আর একাগ্রতা মানুষের কাছ থেকে। কিন্তু জীবন চায় আনন্দ আর ভোগ উপভোগ। তুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

ক্যাপ্টেনের কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন কেরাণী নিযুক্ত করা হলো। সে লোকটিও খুব পরিশ্রমী। সারাদিন সমানে কাজ করেও রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকত।

তবে ক্যাপ্টেন সন্ধ্যের দিকে কাজ থেকে নিজেকে কিছুক্ষণ ছিনিয়ে নিত। সন্ধ্যের সময়টা সে বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাত। যেদিন কোন প্রতিবেশী বেড়াতে আসত না শার্লোতের কাছে, যেদিন সে একা থাকত সেদিন সন্ধ্যায় ওরা তুই বন্ধুতেই শার্লোতের কাছে বসে গল্প করত।

ক্যাপ্টেন আসার পর তার স্বামীর মন কিছুটা সরে গেলেও একটা দিকে লাভ হয়েছে শার্লোতের। সংসারের কতকগুলো নূতন জরুরী ব্যবস্থা কিছুতেই দীর্ঘদিন ধরে সম্পন্ন করে উঠতে পারছিল না শার্লোতে। সেগুলো ক্যাপ্টেন এসে সহজেই করে ফেলল। আগে বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ভাঁড়ারটা ছিল নামমাত্র। ক্যাপ্টেন এসে সেটা বাড়াল। অনেক নূতন নূতন ওষুধ আনাল। বিশেষ করে আনাল জলে ডোবার ব্যাপারে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অনেক ওষুধ। তার দরকারও ছিল। এ অঞ্চলে লেক নদী আর খাল বিলের সংখ্যা অনেক। তাছাড়া মাঝে মাঝে বাঁধ প্রকল্পের কাজও হয়। এ জন্য জলে ডোবার ঘটনা খুব একটা বিরল নয়। তবে জলে ডোবার একটা ঘটনা ক্যাপ্টেনের জীবনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে ছিল। এটা এডওয়ার্ড শার্লোতেকে একদিন বলেছিল। তারা তুজনেই জানত। আর জানত বলেই এ কথা নূতন করে তোলেনি ক্যাপ্টেনের কাছে।

ক্যাপ্টেন একদিন বলল, এত ওষুধপত্র ত আনালাম। কিন্তু এ অঞ্চলে

প্রাথমিক চিকিৎসা দেবার ও কাটাছেঁড়ার ব্যাপারে আরোগ্য করার জন্য একজন সার্জেন দরকার। আর এই ধরনের একজন লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনাও আছে। তবে তাকে অবশ্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।

অবশেষে সেই সার্জেন ভদ্রলোককে ক্যাপ্টেনের কথামত আসতে লিখে দেওয়া হলো। এডওয়ার্ড সস্ত্রীক টাকাপয়সার হিসেব করে দেখল এই বাড়তি খরচের জন্য টাকার অভাব হবে না।

এতদিনে ক্যাপ্টেনের আসার ব্যাপারে আগেকার সব ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর হয়ে গেল শার্লোতের মন থেকে। আজকাল ক্যাপ্টেনকে দিয়ে ঘর সংসারের অনেক কাজ সে করিয়ে নেয়। আজ সে বুঝল ক্যাপ্টেনের মত একজন অভিজ্ঞ ও শক্ত লোকের আসার দরকার ছিল তাদের সংসারে।

এক একদিন সন্ধ্যের সময় এডওয়ার্ড কোন বই আবৃত্তি করে পড়ে শোনাত ওদের। তার কণ্ঠটা গম্ভীর আর মিষ্টি ছিল। সে একসময় ভাল কবিতা আবৃত্তি করত। তবে তার একটা দোষ ছিল সে যখন কিছু মন দিয়ে পড়ত, বা আবৃত্তি করত তখন শ্রোতাদের মধ্যে কেউ অন্য কোন দিকে তাকালে বা অন্যমনস্ক হয়ে উঠলে সে কোন মতেই সহ্য করতে পারত না। একদিন সন্ধ্যের সময় সে কি একটা বই থেকে পড়ছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল শার্লোতে তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ তার পড়ার কথা শুনছে না। এডওয়ার্ড তখন রেগে গিয়ে বলল, কথাগুলো ছাপা থাকলেও একথার সঙ্গে আমার অন্তরের আবেগ ও অনুভূতি মিশিয়ে আমি এগুলো তোমাদের অন্তরে সঞ্চার করে দিতে চাইছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার বুকের মাঝে যে একটা জানালা আছে তাই দিয়ে সেই কথাগুলো পালিয়ে গেছে। তোমার অন্তরে ঢুকতে পারেনি।

যে কোন অপ্রীতিকর প্রশ্নের উত্তর দেবার বা নীরস আলোচনাকে সরস করে তোলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল শার্লোতের। এডওয়ার্ডের কথায় সে বিমূঢ় না হয়ে সহজভাবে বলল, তোমার পড়ার মধ্যে আত্মীয়তার কথা ছিল। হঠাৎ আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। তাই ক্ষণিকের জন্য আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি ও বই-এর মাঝে তাকিয়ে খুঁজতে থাকি তুমি কোথায় পড়ছ।

এডওয়ার্ড বলল, আসল কথা সব মানুষ নার্সিসাসের মত সব বস্তুর মাঝে নিজের প্রতিফলন খুঁজে চলেছে।

শার্লোতে ক্যাপ্টেনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আত্মীয়তা বলতে আপনি কি বোঝেন ?

ক্যাপ্টেন বলল, আমি অবশ্য দশ বছর আগে এ বিষয়ে যা পড়েছিলাম তার কথাই বলব। এখন অবশ্য আপনাদের একথা ভাল লাগবে কিনা জানি না।

এডওয়ার্ড বলল, এমন কোন জ্ঞান নেই যা মানুষের সারা জীবন ভোর প্রযোজ্য হতে পারে। প্রাচীনকালের জ্ঞানী বৃদ্ধরা বলতেন, এটা আমরা যৌবনে শিখেছি, কিন্তু এখন খাটে না একথা। আজ আমরা প্রতি পাঁচ বছরেই নূতন নূতন কথা শিখছি। আজকের জ্ঞান ও সত্য কাল অচল হয়ে যাচ্ছে, জগৎটা এমনই পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে।

শার্লোতে বলল, আমরা মেয়েরা অল্পতেই সন্তুষ্ট। অতশত চাই না। আমি শুধু জানতে চাই শব্দটা কি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এই শব্দের কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে কিনা। আমি তর্ক করতে চাই না এ নিয়ে। সেটা পণ্ডিতদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

ক্যাপ্টেন বলল, প্রথমে আমরা দেখতে পাই সব জীবন্ত প্রাণীই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বাঁচতে চায়। কিছু না কিছু জানতে চায়। তবে তারা যে কিছু জেনেছে এবিষয়ে নিশ্চিত না হলে তারা অজ্ঞাত বিষয়কে জানতে যায় না।

ক্যাপ্টেন একটু থেমে আবার বলল, সব বস্তুরই একটা তরল অবস্থা আছে আর সেই তরল অবস্থাতেই সে অন্য বস্তুর তরল অবস্থার সঙ্গে মিশতে চায়। কিন্তু সেই তরল অবস্থাটা একটু শক্ত হলেই তা গোলাকার রূপ ধারণ করে নিজেকে আর সব থেকে পৃথক করে রাখতে চায় একটা বৃত্তসীমার মাঝে।

এডওয়ার্ড মাঝখানে বলল, কিন্তু সব তরল বস্তু আবার মিশতে চায়না পরস্পরের সঙ্গে, যেমন তেল আর জল। তাদের মেশাতে হলে রসায়নবিদের সাহায্য নিতে হয়। এ্যালকালাইন দিলেই তবে ওরা মিশে যায়। আবার অনেক সময় গবেষণাগারে দেখা যায় ভিন্নধর্মীয় বস্তুও পরস্পরে মিলে মিশে তৃতীয় এক বস্তুর সৃষ্টি করছে।

শার্লোতে বাধা দিয়ে বলল, রসায়নবিদের গবেষণাগারে লাইমস্টোন, সালফুরিক এ্যাসিড, এ্যালকালাইন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের মেলামেশার ফলে যে যাদু সৃষ্টি হয় মানুষের জীবনে তা খাটে না। আমি দেখেছি মানুষ এই সব রাসায়নিক উপাদানের অনেক উর্ধে। মানুষ অনেক পছন্দ করে

যে আত্মীয়তা, যে বন্ধুত্ব বেছে নেয়, পরে দেখা যায় তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে তাদের সে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বে ফাটল ধরে।

এডওয়ার্ড রসিকতা করে বলল, সে ক্ষেত্রে কেমিস্ট চতুর্থ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে সমস্যার সমাধান ঘটাবে। কাউকে শুধু হাতে ফিরতে হবে না।

শার্লোতে বলল, এসব কথা আমাদের জীবনে খাটুক বা না খাটুক, একটা বিষয়ে আমি আজ একমত হলাম।

এডওয়ার্ডের পানে তাকিয়ে শার্লোতে বলল, তুমি এবার থেকে সব জিনিস জোরে পড়বে। আমরা তা শুনে যাব। আমি দাঁড়িয়ে তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে বইএর কোনখানে পড়ছ তা দেখার চেষ্টা করব না। ওতিলের কথা মনে করে আমি তা সহ্য করব। কারণ তাকেও আনতে হবে।

এই বলে একটা চিঠি এডওয়ার্ডের হাতে দিল শার্লোতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হেডমিস্ট্রেসের পত্র

মাদামের চিঠি যথাসময়ে পাওয়া সত্ত্বেও উত্তর দিতে দেরি হলো, কারণ অনেক ছাত্রীরই অভিভাবকের পত্রের উত্তর দিতে হয় আমাকে। এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আজ বেশী কথা লিখতেও পারব না, কারণ পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবকদের জানাতে হবে। আপনার মেয়ে সব বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। অনেক পারিতোষিক লাভ করেছে। এত ভাল মেয়ে এখানে রেখে দেওয়ার কোন যুক্তি দেখি না। ওতিলের কথা আমার সহকারিণীর চিঠিতে জানতে পারবেন।

সহকারিণীর পত্র

আমাদের মাননীয়া প্রধানা শিক্ষিকা আমাকে এমন একটা কথা জানাতে দিয়েছেন যা তিনি নিজে জানাতে চান না। অবশ্য ওতিলের মধ্যে কি আছে, তার প্রকৃত অবস্থা কি তা আমিই সবচেয়ে ভাল জানি। আমি তাকে বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য মোটেই ভালভাবে প্রস্তুত করে তুলতে পারিনি শত চেষ্টা সত্ত্বেও। তার পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে যে উদ্বেগ পোষণ করতাম মনে মনে তাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অঙ্কে তার বুদ্ধি নেই তা নয়, তবু প্রায় সব অঙ্কই ভুল করছে। ইতিহাসে সন তারিখ মনে রাখে না। ভুগোলে রাষ্ট্রীয় বিভাগ-

দেখাতে পারে না। অঙ্কনকার্যে তার হাত ভাল। কিন্তু এত বড় কাজ ফেঁদে বসেছিল যে সময়ে শেষ করতে পারে নি সে। খাতা দেখার পর পরীক্ষকরা আমাদের অর্থাৎ যে সব শিক্ষিকারা ক্লাসে পড়াই তাদের মতামত জানতে চান। আমি ওতিলের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও গুণাগুণ সম্পর্কে সব কথা বলি। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক তখন বললেন, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে তার সামর্থ্য আছে, কিন্তু সে সামথ্য কর্মসম্পাদনের মধ্যে বাস্তব রূপ পায়নি।

সব মেয়ে যখন কোন না কোন প্রাইজ পেয়ে আনন্দে লাফাচ্ছিল ওতিলে তখন ঘরের এক কোণে একটা জানালার ধারে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল বাইরে শূন্য মনে তাকিয়ে। আমাদের প্রধানা শিক্ষিকা যাঁর প্রতিটি ছাত্রীর প্রতিই অসীম মমতা, তিনি ওতিলের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবানের নামে বল, এত-খানি মূর্খতার পরিচয় তুমি কেন দিলে যখন সত্যি সত্যিই তুমি এতটা মূর্খ নও?

ওতিলে তখন ম্লান মুখে উত্তর দিল, ক্ষমা করবেন মা, আমার মাথা ধরেছিল পরীক্ষার সময়, যেমন আজ আবার ধরেছে। অন্য দিনকার মত বেশী ধরেছে।

অথচ কি আশ্চর্য! পরীক্ষার সময় লক্ষ্য করে দেখেছি ওতিলে একবারও তার কপালে হাত দেয়নি। যন্ত্রণার জন্য একবারও মুখটা বিকৃত করেনি। ওতিলেকে নিয়ে শিক্ষিকাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আমি তার সে আলোচনার ফল বা সিদ্ধান্তটুকু শুধু জানিয়ে দিচ্ছি। আমরা চাই ওতিলেকে আপনি আপনার কাছে নিয়ে গিয়ে কিছুদিন রাখুন। আপনারা ওখান থেকে যদি অন্য কোথাও চলে যান তখন আবার ওতিলে ফিরে আসবে সাদরে আমাদের কাছে। আর একটা কথা, ওতিলে কখনো কিছু বলতে চায় না। কোন কিছুর দাবি জানায় না। আবার কেউ কিছু তার কাছ থেকে চাইলেও সে প্রত্যাখ্যান করে না। এটাই তার স্বভাব।

চিঠি দুটো পড়ে সবাইকে শোনাল এডওয়ার্ড। তারপর বলল, ঠিক আছে। ওতিলেকে আনা হোক। সব ব্যবস্থা করে ফেল। ওতিলে এলে আমি প্রাসাদের ডান দিকে ক্যাপ্টেনের ঘরের কাছে একটা ঘরে চলে আসব। রাত পর্যন্ত পড়ে ও খুব সকালে ওঠে। দুজনে কাজ করা সহজ হবে তাহলে। আর ওতিলে থাকবে তোমার ঘরের পাশে। ওর আবার মাথা ধরার রোগ আছে। আমারও তাই। ওর বাঁদিকের কপালটা ধরে, আমার ডানদিকটা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একদিন প্রাসাদের সামনে একখানি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। তার থেকে নামল ওতিলে। শার্লোতে গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ওতিলে বসে পড়ে তার হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল। শার্লোতে ব্যস্তভাবে বলল, একি করছিস, নিজেকে এত ছোট ভাবছিস কেন ?

ওতিলে বলল, না আমি সত্যি সত্যিই তোমার এই হাঁটুর উপরে উঠতে পারিনি। তোমার কাছ থেকে এত স্নেহভালবাসা পেয়েও আমি কোন বিষয়ে কোন উন্নতিই করতে পারিনি।

ওতিলেকে দেখে খুশি হলো এডওয়ার্ড। ওতিলের চেহারা সত্যিই সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার বুদ্ধির উৎকর্ষ তেমন না হলেও তার দেহসৌষ্ঠবের মধ্যে কোন অপূর্ণতা নেই। তাছাড়া সাংসারিক কাজকর্মেও বেশ পটু ওতিলে। বাড়িতে আসার পর থেকেই সব বিষয়ে শার্লোতেকে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। কোন কাজের কথা তাকে বলতে হয় না। সে নিজে থেকেই যখন-কার যে কাজ সব ঠিক করে রাখে। সে যেন সবার সব মনের কথা বুঝতে পারে।

তার পড়াশুনোর ব্যাপারে শার্লোতে কোন জোর করত না। সেটা তার উপরে ছেড়ে দিয়েছিল। শার্লোতে দেখল ওতিলের হাতের লেখা ভাল। সে ফরাসী ভাষায় কথাও বলতে পারে। শার্লোতে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে প্রায়ই ফরাসী ভাষায় কথা বলত।

একদিন তার সম্পর্কে স্কুলের কাগজপত্রগুলো সব ভাল করে দেখল শার্লোতে। দেখল স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকার অফিস থেকে তার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা হুবহু সত্যি। খাওয়া পরা সম্বন্ধে ওতিলের সত্যিই কোন আগ্রহ নেই। তবে শার্লোতে যে মুহূর্তে তাকে ভাল পোষাক পরতে বলল এবং তার ব্যবস্থা করে দিল সেই মুহূর্ত থেকে সে ভাল পোষাক পরতে শুরু করল। উজ্জ্বল পোষাক পরার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহসৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। বিশেষ করে পুরুষমানুষের দৃষ্টি। তবে মানুষের রূপসৌন্দর্য মানুষের বহিরেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় উভয়ের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেহসৌন্দর্যের পানে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনে কোন পাপ বা অশুভচিন্তা প্রবেশ করতে পারে না।

ওতিলে আসার পর বাড়িতে পুরুষদের দৈনন্দিন আচরণের অনেক উন্নতি হলো। আগে এডওয়ার্ড ও ক্যাপ্টেন দু বন্ধুতে যখন কাজে বা কথাবার্তায় মত্ত হয়ে উঠত তখন খাওয়া বা বেড়াবার কথা ভুলেই যেত একরকম। ফলে অনেক সময় শার্লোত্তেকে বসে থাকতে হত তাদের জন্য। আজকাল সকলে খাবার টেবিলে যথাসময়ে এসে হাজির হয়। খাওয়া শেষ করেও গল্প করে। বেড়াতে যাবার সময় বার হতে দেরি করে না মোটেই।

শার্লোতের মনে হলো দুটো মানুষই যেন হঠাৎ পাল্টে গেছে একেবারে। শুধু ওতিলের প্রতি নয় তারা আজকাল শার্লোতের প্রতিও আগের থেকে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছে। কোন আলোচনা বা পাঠের সময় তার মতামতের উপরেও গুরুত্ব দেয় তারা। অবশ্য তারা ওতিলের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর সব বিষয়েই বেশী গুরুত্ব দান করত। দিনে দিনে এ গুরুত্ব বেড়ে যেতে লাগল। এবং ওতিলে এটা ভালভাবেই লক্ষ্য করল। প্রত্যেকের প্রতিটি কথা, প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের অর্থ তার বুঝতে কিছু বাকি থাকল না। অথচ কোন চপলতা দেখা দিল না তার আচরণের মধ্যে। তার কথাবার্তার মধ্যে তেমন কোন উচ্ছ্বাস নেই। তার কর্মতৎপরতার মধ্যে কোন চঞ্চলতা নেই, তেমনি তার পদক্ষেপের মধ্যেও কোন শব্দ নেই। সব মিলিয়ে তার সমগ্র জীবন-ভঙ্গিমার ও জীবনযাত্রার মধ্যে এক সহজ ও শান্ত নিরুচ্চার সৌন্দর্য ছিল যা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত সকলে। বিশেষ করে খুব খুশী হত শার্লোতে। ওতিলের আসার কথা সে-ই ভুলেছিল প্রথমে।

একদিন শার্লোতে একটা শিক্ষা দিল ওতিলেকে। বলল, ছোট বড় যে কোন লোকের হাত থেকে কোন জিনিস মাটিতে পড়ে গেলে তা কুড়িয়ে দিতে হয়। এতে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও নম্রতা প্রকাশ পায় আর ছোটদের প্রতি মানবিক মমতা ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া হয়।

ওতিলে বলল, এটা কিন্তু আমার ভাল লাগে না। ইতিহাসে কিন্তু এ শিক্ষার কোন সায় পাই না আমরা। ইতিহাসের একটা ঘটনার কথা মনে আছে আমার। ইংল্যাণ্ডের পরাজিত রাজা প্রথম চার্লসের যখন বিচার হচ্ছিল, যখন তিনি তাঁর তথাকথিত বিচারকদের সামনে তাঁর রাজদণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন তাঁর হাতের দণ্ডটা থেকে সোনার বলটা পড়ে যায়। তিনি ভেবেছিলেন বিচার-সভায় উপস্থিত কেউ না কেউ সেটা তুলে দেবে আগের মত। কিন্তু সেদিন কেউ এ উপকারটুকু করেনি তাঁর। তখন তিনি নিজেই নত হয়ে সেটা

কুড়িয়ে নেন।

এদিকে এডওয়ার্ড ও ক্যাপ্টেনের কাজ কমার পরিবর্তে বেড়েই যেতে লাগল দিনে দিনে। মাঝে মাঝে দুই বন্ধুকে বাইরে যেতে হয়। বিভিন্ন এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলো ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে হয়।

একদিন দুজনে যখন বেড়াচ্ছিল, ক্যাপ্টেন তখন বলল, দেখ, কোন কোন গাঁ কত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, আবার কোন কোন গাঁ কত অপরিচ্ছন্ন। এখানকার রাস্তাগুলোও ভাল নয়। বড় আঁকাবাঁকা, খাল ডোবায় ভর্তি। আমি তোমার এস্টেটের উন্নতির জন্য সুইজারল্যাণ্ডের কায়দায় একটা পার্কের চারদিকে একটা আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে চাই।

এডওয়ার্ডও তখন সমর্থনের সুরে বলল, তাহলে ত খুব ভালই হয়। আমাদের প্রাসাদের কাছে যে গ্রাম রয়েছে সেটা নদীর ওপারে অর্ধবৃত্তাকারে স্থাপিত। সেখানে যাবার পথটা খুবই খারাপ। সে পথ কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও জলের তলা দিয়ে গেছে। তার উপর নদীতে যখন বর্ষার সময় বান আসে তখন গাঁয়ের লোকরা সকলেই স্বার্থপরের মত নিজের ঘর বাঁচাবার চেষ্টা করে পথের জল আটকাতে চায়। কিন্তু পরের কথা ভাবে না। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা করে, যদি মিলে মিশে সকলেই হাত লাগায় তাহলে এই রাস্তাটাকে অনেক উঁচু করা যায়। তাহলে রাস্তাটাও অনেক উন্নত হবে আর সেটা বাঁধের মত কাজ করবে, বানের কবল থেকেও গাঁটা রক্ষা পাবে।

ক্যাপ্টেন বলল, জনগণ ও ব্যবসাদারদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা কোন ভাল কাজে পাবে না তুমি। তাদের আশায় থাকলে কোন কাজই হবে না। তাদের হুকুম করে করাতে হবে। কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব ছাড়া এ সব বিষয়ে কোন কাজ হবে না।

এডওয়ার্ড বলল, তার কারণ সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা একেবারে ভাবে না। দৈনন্দিন জীবনের উর্ধ্বে কোন কিছুই তারা দেখতে পায় না। তুমি ঠিকই বলেছ এ সব কাজে অবাধ জোর খাটাতে হবে।

দুই বন্ধুতে এই ভাবে একমত হয়ে গেল। ঠিক হলো, ক্যাপ্টেন একটা নক্সা আঁকবে। দরকারমত জায়গাগুলো মেপে নেবে।

নক্সা হয়ে যাবার পর পরিকল্পনাটা দেখল এডওয়ার্ড। রাস্তাটা উঁচু করতে ও নদীর গায়ে ফেলতে অনেক পাথর লাগবে। তার জন্য ক্যাপ্টেন প্রাসাদ থেকে

পাহাড়ের চূড়ায় যাবার জন্য একটা পথের পরিকল্পনা করেছে। সেই চূড়ার উপর একটা বিশ্রামাগার হবে। বাইরের লোক এসে থাকতে পারবে। প্রাসাদের ঘরের জানালা থেকে তা দেখা যাবে। এই কাজের জন্য পাহাড় থেকে অনেক পাথর কাটতে হবে আর সেই পাথর দিয়ে রাস্তাটাকে উঁচু করা যাবে, আর নদীর গায়ে তা ফেলে তার ক্ষয় রোধ করা যাবে।

একটা ভিখিরী জ্বালাতন করছিল এডওয়ার্ডকে। তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে যেতে বললেও সে যাচ্ছিল না।

ক্যাপ্টেন বলল, এভাবে মানুষের ঘরে ঘরে বা পথে ভিক্ষা চাওয়া বা দেওয়া ঠিক নয়। মানুষের বদান্যতা ও দানশীলতার একটা সুনিয়ন্ত্রিত সীমা থাকবে। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মানুষ যা কিছু দান করার দান করবে আর ভিখিরীরা সেখান থেকেই পাবে।

ক্যাপ্টেন আরও বলল, এই গাঁয়ে ঢোকবার দুপ্রান্তে দু জায়গায় দুটো কেন্দ্র খোলা যেতে পারে ভিখিরীদের দানের জন্য। একদিকে একটা আছে পান্থশালা। আর একদিকে আছে এক বৃদ্ধ দম্পতি। আমাদের পক্ষ থেকে যা দেবার ওখানেই দিয়ে রাখব। সেখান থেকেই ভিখিরীরা এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সাহায্য মাঝে মাঝে পাবে।

এডওয়ার্ড ক্যাপ্টেনের সঙ্গে গিয়ে জায়গা দুটো দেখে এল এবং তার পছন্দ হলো। আসার পথে এডওয়ার্ড এক সময় ক্যাপ্টেনকে বলল, মানুষ তার ইচ্ছার দৃঢ়তার দ্বারা ও ব্যক্তিত্বের জোরে কাজ করতে পারে। অনেক পরিকল্পনা রূপায়িত করতে পারে বাস্তবে। যেমন ধরো, নতুন বাড়ির বাগানের যে পথগুলো ভুল করে বানিয়েছিল শার্লোতে সেগুলো আরো অনেক চওড়া ও ভাল করে নির্মাণ করছি আমরা।

ক্যাপ্টেন বলল, এতে শার্লোতে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা হলে তাতে যোগদান করে না। এড়িয়ে যায়। ও বেশীর ভাগ সময় ওতিলের কাছে থাকে।

এডওয়ার্ড বলল, আমরা আমাদের কাজ করে যাব সঠিক পথে। তাতে কে কি ভাবল বা কতটা ক্ষুণ্ন হলো তা আমাদের দেখে দরকার নেই।

নূতন বাড়ির বাগান থেকে যে পথটা চওড়া হয়ে পাহাড়ের চূড়াটায় উঠে যাবে, নদীর ধার বরাবর গাঁয়ের রাস্তাটা উঁচু করে নির্মিত হয়ে বাঁধ হিসাবে কাজ করবে আর পাহাড়ের চূড়ার উপর এক বিশ্রামাগার গড়ে উঠবে। কিন্তু এই [illegible] কার্য রূপায়িত করতে অনেক টাকার দরকার। পাহাড় কেটে

পাথর এনে রাস্তায় ফেলে রাস্তাটা উঁচু করতে হবে। টাকা আছে শার্লোতের কাছে। তাকে শুধু কিসে কোন খাতে কত টাকা লাগবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ক্যাপ্টেন একদিন শার্লোতেকে নিয়ে পরিকল্পনার খাতাপত্র বুঝিয়ে দিল। অনেক কষ্ট করে সে পুরো পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় নক্সা আর খাতাপত্র সব তৈরি করেছে। অবশেষে ওদের তিনজনের মধ্যে ঠিক হলো, এবার হতে শার্লোতে ক্যাপ্টেনের ঘরে বসে পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতে ধার্য টাকাকড়ির হিসাব বুঝে নেবে ও দরকারমত টাকা বরাদ্দ করবে কাজ চালাবার জন্য।

সেই কথামতই কাজ করে যেতে লাগল শার্লোতে। ক্যাপ্টেন মানুষটা আজ অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে তার কাছে। আজ সে মোটেই অসহনীয় নয় তার কাছে। বরং তার ভাল গুণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে। অথচ না জেনে এই ক্যাপ্টেনের আসার ব্যাপারে কত বিরোধিতা করেছিল একদিন। এই ক্যাপ্টেন আসার সঙ্গে সঙ্গে কত দিন ধরে গড়ে তোলা তার কত সাধের এক পরিকল্পনার উপর আপন ইচ্ছার রথচক্র চাপিয়ে নস্যাৎ করে দেওয়া সত্ত্বেও আজ তার কাছে বসে কাজ করতে বা তাকে সহ্য করে যেতে একটুও কষ্ট হয় না শার্লোতের। বরং ভালভাবেই কেটে যায় তার।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শার্লোতে আজকাল ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কাজে ব্যাস্ত থাকায় এডওয়ার্ডকে সময় কাটাতে হয় ওতিলের কাছে। আজকাল ওতিলের প্রতি এক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গড়ে ওঠায় তার সাহচর্যে ভালই থাকে এডওয়ার্ড। আর ওতিলেও যতক্ষণ এডওয়ার্ড তার কাছে থাকে নানারকমের কথা বলে তাকে প্রীত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া এডওয়ার্ড যা যা ভালবাসে তাই সে করে। সে যা খেতে ভালবাসে তাই সে করে দেয়। এডওয়ার্ডের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান আগ্রহের পরিচয় দিতে থাকে সে এইভাবে।

এডওয়ার্ডের প্রতি তার এই আগ্রহ বৃদ্ধির একটা কারণও ছিল। এডওয়ার্ডের দেহের বয়সটা আগের থেকে বাড়লেও তার মধ্যে একটা শিশুসুলভ সরলতার ভাব ছিল। সে ভাব তার কথায় ও আচরণে প্রায়ই প্রকাশ পেত। আর তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত ওতিলে।

এদিকে দুই বন্ধুতে কয়েকদিন ধরে দেখা না হওয়ায় অনেক কাজকর্ম করা

হয়ে ওঠেনি। ক্যাপ্টেনের কেরাণীও কাজের অভাবে প্রায় বসে আছে। একদিন এডওয়ার্ড ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করে দিল। কেরাণীকেও প্রচুর কাজ দিল।

সেদিন কাজের ফাঁকে একবার এডওয়ার্ড ক্যাপ্টেনকে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু ক্যাপ্টেন আশ্চর্য হয়ে দেখল ঘড়িতে সময়ে দম দেওয়া না হওয়ায় ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে। ক্যাপ্টেনের এ ধরনের ভুল কখনো হয় না। শার্লোতে কাছে থাকায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলতে গিয়ে ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গিয়েছে ক্যাপ্টেন। তাই হয়। কোন বিশেষ এক গৃহপরিবেশের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন মানুষের কাজকর্ম করতে করতে হঠাৎ যদি নূতন মানুষের আবির্ভাব ঘটে সেখানে তাহলে স্বভাবতই মনের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং সেই নূতন আগন্তুকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। ক্যাপ্টেন ও এডওয়ার্ড দুজনেরই তাই হয়েছিল। তাদের সময়টা কোন দিকে কেটে গেল তা খেয়াল থাকল না।

দুই বন্ধুতে এক গোপন অলিখিত ও অজ্ঞাত চুক্তিতে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এডওয়ার্ড যেমন ওতিলেকে পেয়ে খুশি তেমনি শার্লোতেকে কাছে পেয়ে ক্যাপ্টেনও খুশি। অথচ তারা কেউ কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও ঈর্ষান্বিত নয়।

যে যার সঙ্গে সারাদিন কাটায় বাইরে বেড়াতে যাবার সময়েও সে তারই সঙ্গে যায়। ওরা যখন একসঙ্গে চারজনে বেড়াতে যায় হয় তখন এডওয়ার্ড ওতিলেকে নিয়ে এগিয়ে যায় আর ক্যাপ্টেন শার্লোতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীর গতিতে চলতে থাকে।

সেদিন ওরা পুরনো প্রাসাদ থেকে বনের মধ্যে অবস্থিত ওদের মিল দিয়ে বেড়াতে গেল। প্রথমে একটা পথ ধরে ওরা সবাই এগিয়ে গেল। এডওয়ার্ড ওতিলের সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল। ক্যাপ্টেন পথের পাশের জায়গাগুলো দেখাচ্ছিল শার্লোতেকে। কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল পথটা বনের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। সারা বনভূমি জুড়ে বড় বড় ছায়াশীতল গাছ। এখানে নদীটা থেমে এসেছে। নদীটা খুব শীর্ণ এবং অগভীর। পাথরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে। এখানে কোন সেতু বা সাঁকো না থাকায় নদীটা পার হতে ওদের কষ্ট হলো। একটা পাথর হতে আর একটা পাথরে পা দিয়ে পরে ওতিলের হাত ধরে তাকে পার করাল এডওয়ার্ড। এইভাবে নদীটা পার হয়ে ওরা বনভূমিতে গিয়ে একটু বসল। এডওয়ার্ড ওতিলেকে বলল, তোমার বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ফটো

দেখছি, ওটা হয়ত তোমার বাবার। ওটা ঘরের মধ্যে যত্ন করে রাখবে, সব সময় কাছে নিয়ে এভাবে বেড়াতে নেই। যে কোন সময়ে কোথাও পড়ে যেতে পারে অথবা কারো লালসাকলুষ স্পর্শে ওটার পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে।

ওতিলে কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে ফটোটা বার করে এডওয়ার্ডের হাতে দিয়ে বলল, আপনার এই পরামর্শের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এটা এখন আপনি রেখে দিন। বাড়িতে গিয়ে আমি নেব।

ওরা মিলে গিয়ে আবার চারজনে একসঙ্গে হলো। মিলের পরিচালক ওদের খাতির করে বসিয়ে দুধ এনে দিল। বাড়ি ফেরার একটা ভাল পথ ধরিয়ে দিল। বাড়িতে ফিরে ওরা সবাই স্বীকার করল, মিলে যাওয়ার পথটা খারাপ ; মিলের কাছে একটা সেতু করে দিলে এবং পথটা সোজা করলে তিন চার ঘণ্টার পথটা হয়ে উঠবে এক ঘণ্টার।

এডওয়ার্ড ও ক্যাপ্টেন দুজনেই এর প্রয়োজনীয়তা একবাক্যে স্বীকার করল। কিন্তু শার্লোতে পাকা গৃহিণীর মত টাকার কথা তুলল। বলল, তোমরা ত পরিকল্পনা করেই খালাস। কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা হতে?

এডওয়ার্ড তখন নূতন যুক্তি খাড়া করে বলল, সারা বছর বাদে অনেক হিসাবপত্র করে মিলটা থেকে যা পাই তা খুবই সামান্য। তার থেকে মিলটা যদি বিক্রি করে দিই তাহলে সেই টাকাটা আমরা এই কাজে লাগাতে পারি। তাহলে আমাদের বড় পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত হয়।

ওতিলে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এডওয়ার্ড তার সামনে বড় নক্সাটা ধরে বলল, ওতিলে, তোমার মতামত বল। কোন কুণ্ঠা না করে তোমার মত ব্যক্ত করো।

ওতিলে ভাল করে নক্সাটা দেখে পাহাড়ের উপর যেখানে গ্রীষ্মাবাস বা বিশ্রামাগার করার কথা ছিল সেখানে হাত দিয়ে বলল, আমার মনে হয় গ্রীষ্মাবাস এখানে না করে একটু দূরে একেবারে বনের মাঝে করা উচিত। তাহলে বাইরের জগৎ থেকে ওটা হয়ে পড়বে একেবারে অপরিদৃশ্য। ওখান থেকে আমাদের এই পুরনো প্রাসাদ বা গ্রাম কোন কিছুই দেখা যাবে না।

ওতিলের কথায় এডওয়ার্ড মনে মনে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও পরে স্বীকার করল, কথাটা মন্দ নয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্যাপ্টেন আর একবার সবাইকে জায়গাগুলোতে নিয়ে গিয়ে সকলের মতামত নিল। মাপজোপ করে নক্সা তৈরি করল এবং তার সঙ্গে ব্যয়ের তালিকাও দিল। তার পর একদিন এডওয়ার্ডের কাছে প্রস্তাব করল, শার্লোতের আসন্ন জন্মদিনে এই পরিকল্পনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলে ভাল হয়।

জন্মদিন পালন করার কোন ইচ্ছা ছিল না এডওয়ার্ডের। সে বলল, এরপর ওতিলের জন্মদিন আসছে। তাহলে সেটাও পালন করতে হবে।

অবশেষে এডওয়ার্ড মত দিল এবং সেইমত কাজ শুরু হলো। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে একটি উন্নত প্রশস্ত পাকা রাস্তা গ্রাম ও প্রাসাদকে যুক্ত করবে এবং এক জায়গায় এই রাস্তাটা আর একটি পথের সঙ্গে মিলিত হবে যে পথটি প্রাসাদের বাগান থেকে চলে গেছে পাহাড়ের উপর।

এডওয়ার্ড একটা জিনিস লক্ষ্য করল ওতিলে ঘরের মধ্যে সাংসারিক কাজকর্ম নিয়ে থাকতেই ভালবাসে। বাইরে বেড়াতে গিয়েও সে বিভিন্ন কাজের অজুহাতে ঘরে ফেরার চেষ্টা করে।

তবে সারা দিন যে কাজই করুক না, সন্ধ্যের সময় তারা রোজ এক জায়গায় মিলিত হয়। একসঙ্গে বসে কথা বলে। আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ করে।

অনেক দিন কবিতা ও গান বাজনার আসর বসেনি। তাই সেদিন সন্ধ্যায় এডওয়ার্ড কতকগুলো প্রেমের কবিতা পড়তে লাগল আবৃত্তি করে। ওতিলে তার ডান দিকে একটা চেয়ারে বসেছিল। সে চেয়ারটা কাছে টেনে এনে এডওয়ার্ডের ঘাড়ের উপর ঝুঁকে তার কোলের উপর রাখা বইটা অনুসরণ করতে লাগল। এডওয়ার্ডও আস্তে আস্তে পড়তে লাগল যাতে ওতিলে ঠিকমত অনুসরণ করতে পারে তাকে। ওদের রকম দেখে শার্লোতে ও ক্যাপ্টেন পরস্পরের দিকে তাকাল। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল তাদের মুখে।

তারা আরো বিস্মিত হলো আর একটি ঘটনায়।

একদিন সন্ধ্যের পর এডওয়ার্ড সকলকে বলল, আজ একটু বেশী সময় বসে যাও। আমি বাঁশি বাজাব। ওতিলে, আজ তুমি আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজাবে।

ওতিলে ভালভাবেই পিয়ানো বাজিয়ে যেতে লাগল। শার্লোতে একটা

জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেল সে যেমন পিয়ানো বাজাবার সময় এডওয়ার্ডকে তাল রাখার সুযোগ দিল ওতিলেও ঠিক তাই দিল।

এবার শার্লোতে ও ক্যাপ্টেন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল যে এডওয়ার্ডের প্রতি ওতিলের আগ্রহ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা ভেবে ওতিলের এ আগ্রহ যেমন সমর্থন করতে পারে না শার্লোতে তেমনি তার জন্য প্রকাশ্যে তিরস্কারও করতে পারে না।

এদিকে ক্যাপ্টেনও অনুভব করল বাস্তব অবস্থা তাকে শার্লোতের অনেক কাছে এনে ফেলেছে। অথচ সে এটা চায় না। চায় না বলেই সকালে রোজ শার্লোতে যখন বাগানে বেড়াতে যায় ইচ্ছা করে সেই সময়টা এড়িয়ে যায় ক্যাপ্টেন। পরে তা বুঝতে পেরে শার্লোতেও কিছু বলে না। শুধু ক্যাপ্টেনের প্রতি তার শ্রদ্ধাটা বেড়ে যায়। শার্লোতের সঙ্গে একা থাকতে চায় না ক্যাপ্টেন। কিন্তু তা না চাইলেও কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে শার্লোতের প্রতি তার আগ্রহ বেশই ফুটে উঠতে থাকে। শার্লোতের জন্মদিন উপলক্ষে ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কাজের ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগে যায় সে। ওদিকে পাহাড়ের ধারে পাথর ভাঙ্গার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় এডওয়ার্ড হঠাৎ হুকুম করল ক্যাপ্টেনকে, তোমার বেহালাটা নিয়ে এস। আজ শার্লোতে পিয়ানো বাজাবে।

সত্যিই চমৎকার বাজাল ওরা দুজনে। বিশেষ দরদ দিয়ে বাজাল। ওদের বাজনা শুনে এডওয়ার্ড ঠাট্টা করে ওতিলেকে বলল, আমাদের থেকে ওরা আরো ভাল বাজিয়েছে। তা বাজাক। তবু আমরা যেমন বাজাচ্ছি তেমনিই বাজিয়ে যাব দুজনে।

নবম পরিচ্ছেদ

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর কর্মতৎপরতার পর শার্লোতের জন্মদিন এসে গেল। দুটো রাস্তা আর পাহাড়ের উপর সেই গ্রীষ্মাবাসের কাজ অনেক কষ্টে অনেক তাড়াহুড়ো করে শেষ হলো ক্যাপ্টেনের চেষ্টায়। একটি রাস্তা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে চার্চের পাশ দিয়ে পাহাড়ের মাথায় চলে গেছে। আর একটি পথ নদীর উঁচু বাঁধ হিসাবে গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এই রাস্তা বাঁধের মতই নদীর জলোচ্ছ্বাস হতে রক্ষা করবে গ্রামবাসীদের।

জন্মদিনে ওরা প্রথমে চার্চে গেল। সেখান থেকে অতিথিদের সঙ্গে যাবে পাহাড়ের উপর নূতন বাড়িতে। গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা সব লোকই প্রায় ঘর ছেড়ে নূতন পথে নেমে পড়েছিল। তাদের খুশি আর ধরে না। সবাই নূতন পথে হাঁটছিল। কারণে অকারণে হেঁটে চলেছিল। গাঁয়ের লোক ছাড়াও কিছু নিমন্ত্রিত অতিথি ছিল। তাঁরা এ অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তি।

বাড়ির সকলের মধ্যে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল আজ শার্লোতে। এক সময় সে এই খুশির আবেগে ক্যাপ্টেনের হাতে চাপ দিল। এবার পাহাড়ের চূড়ার উপর বাড়িটা তৈরির জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। একজন রাজমিস্ত্রী এক হাতে একটা হাতুড়ি আর এক হাতে একটা কন্নিক নিয়ে দাঁড়িয়েছন্দোবদ্ধ একটা ছড়া আবৃত্তি করল। তার অর্থ হলো এই : বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনটে জিনিস দরকার। প্রথমে চাই ভাল জায়গা অর্থাৎ যেখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যেখানে তার ভিত্তি গাঁথা হবে সে জায়গাটা শক্ত হওয়া চাই। তারপর তার ভিত্তিটা খুব ভাল করে গাঁথা চাই। তারপর তার নির্মাণকার্য ভাল হওয়া চাই। প্রথমটির জন্য দায়ী হচ্ছেন বাড়ির মালিক কারণ যে জায়গায় বাড়ি নির্মিত হবে সে জায়গাটা তিনিই যোগাড় করবেন। দ্বিতীয়টার জন্য দায়ী স্থপতিরা কারণ কিভাবে ভিত্তি নির্মিত হবে সে নির্দেশ তাঁরাই দেবেন। তবে তৃতীয়টির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হলো রাজমিস্ত্রীরা, কারণ বাড়ি নির্মাণের যাবতীয় কাজ তাদের হাতেই।

প্রধান রাজমিস্ত্রী এই ছড়ার মাধ্যমে উপরোক্ত কথাটি বলার পর বলল, আর কথা না বাড়িয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হোক। যে ইটটি এখন স্থাপন করা হবে সব ইটগুলি হবে তার মত একই রকমের। স্বভাবের দিক থেকে অনেক মানুষ এক হলেও আইনের দ্বারা তাদের সম্পর্ক যেমন ঘনীভূত হয় তেমনি এই ইটগুলি আকার প্রকারে এক হলেও সিমেণ্টের শক্তি এদের ঐক্যবদ্ধ করবে এবং এই শক্তির দ্বারা তাদের সম্পর্ক আরো ঘনীভূত হয়ে উঠবে।

এই বলে রাজমিস্ত্রী প্রথমে কন্নিক ও পরে হাতুরীটা শার্লোতের হাতে দিল। শার্লোতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে। শার্লোতে প্রথমে একটি পাথর বসিয়ে দিল সিমেণ্ট দেওয়া এক নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর হাতুরী দিয়ে তিনবার ঠুকল পাথরটার উপর।

ভিত্তিপ্রস্তর বাড়িটার এক কোণে স্থাপিত হবার পর রাজমিস্ত্রী আবার বলতে লাগল, আমরা যারা মিস্ত্রী তারা বাড়িটা নির্মাণ করলেও লোকে ইট কাটিয়ে-

দের ও স্থপতিদের কাজটাকেই বড় করে দেখে। বাড়ি তৈরি হবার সময় ইট-কাটিয়েরা যখন ইট কাটে তখন তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর যখন বাড়িটা শেষ হয়ে যায় তখন তার স্থাপত্যমূলক কারুকার্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলের। কিন্তু আজকের এই বাড়িটা যাতে অতীতের বহু সাক্ষ্য বহন করতে পারে তার জন্য আজকের দিনের বেশ কিছু নিদর্শনসম্বলিত ঢাকনাঢাকা এক বাক্স এই বাড়ির গর্ভে প্রোথিত করব আজ আমরা। এতে আছে এ কালের বহু জ্ঞাতব্য তথ্যলেখা, কিছু প্রস্তরখণ্ড। এর সঙ্গে আছে ভাল বোতলে ভরা কিছু ভাল মদ আর আছে এ বছরের ছাপা আরও কিছু মুদ্রা যা বাড়ির মালিক দান করেছেন। এই বাক্সে আরো স্থান আছে। যদি কোন অতিথি এ যুগের কিছু নিদর্শন ভাবীকালের লোকের জন্য দান করতে চান তাহলে তা দিতে পারেন।

একথা শুনে অতিথিরা বিস্মিত হয়ে গেল। তারপর একজন যুবক অফিসার এগিয়ে এসে বলল, আমার কোটের কয়েকটি বোতাম ছিঁড়ে আমি দিতে চাই।

তার দেখাদেখি মেয়েরাও চিরুণী, স্মেলিং সল্টের সৌখিন শিশি প্রভৃতি অনেক সৌখীন জিনিস বাক্সের মধ্যে ফেলে দিল। ওতিলেও কিছু দেবার কথা ভাবছিল। কিন্তু ঠিক করে উঠতে পারছিল না। এডওয়ার্ড তা বুঝতে পেরে সম্মতি দেওয়ায় সে তার গলা থেকে সোনার চেনটা খুলে বাক্সে ফেলে দিল। এই চেনেই একদিন তার বাবার ফটোটা ঝোলানো থাকত।

এবার রাজমিস্ত্রী বলল, আমরা তাহলে বাক্সটি চিরকালের জন্য প্রোথিত করছি এই বাড়ির গর্ভে। আমরা চাই এই বাড়ির বর্তমান ও ভবিষ্যতের মালিকরা এই পাথরের বাক্সের মতই অক্ষয় সুখের অধিকারী হোক। তবে এটাও ঠিক যে যেহেতু মানবজীবনের সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী এই অক্ষয় পাথরের বাক্স একদিন না একদিন এই মাটির গর্ভ থেকে উত্তোলিত হবেই। যে বাড়ি আমরা নির্মাণ করব তা যখন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হবে তখন এ বাক্সটি তোলা হবেই।

এরপর বাক্সটি বসানো হলে একটি সুন্দর পানপাত্র হতে মদ খেয়ে রাজমিস্ত্রী গ্লাসটি সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল। সেখানে আরো মিস্ত্রী ও শ্রমিক দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছিল। গ্লাসটি মাটিতে পড়ল না। তাদের মধ্যেই একজন লুফে নিয়ে পাশের লোকদের তা দেখাতে লাগল।

এদিকে ভিত্তিপ্রস্তরের কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী ও শ্রমিকরা কাজ শুরু করে দিল একযোগে। অতিথিরা তখন পাহাড়ের উপর থেকে চার

দিকের দৃশ্য দেখতে লাগল। সামনের দিকে কয়েকটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে রূপালী সুতোর মত এক নদী। দূরে রাজধানীর বড় বড় প্রাসাদের চূড়াগুলিও দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির পিছনের দিকে ছিল শুধু অরণ্যাচ্ছাদিত পাহাড়। সেই সব পাহাড় আর বনের ভিতর থেকে এক বিশাল পর্বতমালার কয়েকটি নীল শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল দিগন্তকে আড়াল করে।

অতিথিরা অবাক বিস্ময়ে চারদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগল আশ মিটিয়ে। তাদের মধ্যে একজন পরামর্শ দিল, সামনে যে তিনটি পৃথক জলাশয় দেখা যাচ্ছে সেগুলি কেটে পরস্পরকে যুক্ত করে দিলে একটি বিরাট হ্রদে পরিণত হবে ওই জলাশয়গুলি।

ক্যাপ্টেন বলল, হ্যাঁ তা করা যায়।

কিন্তু এডওয়ার্ড বলল, করতে পার, তবে মধ্য জলাশয়টির ধারে যে সব গাছ আছে সেগুলিকে বাঁচিয়ে করতে হবে। ঐ গাছগুলি আমি নিজের হাতে একদিন বসিয়েছি।

এই বলে ওতিলেকে এডওয়ার্ড তা ভাল করে দেখাল। ওতিলে জিজ্ঞাসা করল, গাছগুলো কত দিন আগে বসানো হয়েছে?

এডওয়ার্ড বলল, তুমি যখন দোলনায় দোল খেতে তখন আমি ঐ গাছ বসাই।

এবার সকলে প্রাসাদে ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়ার পর বসার ঘরে চারজনে বসল। গাঁয়ের অনেক লোক তাদের বাড়ির উঠোনে জমায়েত হয়েছিল। ক্যাপ্টেন তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে গ্রামকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন তাদের নিজেদের হাতে কাজ করতে হবে।

গ্রামের লোকেরা সব চলে গেলে ওরা চারজনে বসে আবার ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ চাকরে একখানি চিঠি নিয়ে এল। চিঠি পড়ে এডওয়ার্ড শার্লোতেকে বলল, কাউণ্ট আগামী কাল আসছেন।

শার্লোতে বলল, তাহলে কাউণ্টপত্নীও আসছে নিশ্চয়?

এডওয়ার্ড বলল, হ্যাঁ, উনি আসবেন অন্য দিক থেকে। কাউণ্ট আগামী কাল আমাদের এখানে থাকতে চেয়েছেন। ওঁরা এখানে রাতটা কাটিয়ে পরদিন আবার অন্য জায়গায় বেড়াতে যাবেন একসঙ্গে।

শার্লোতে বল, তাহলে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে।

ওতিলে সঙ্গে সঙ্গে বলল, কি কি করতে হবে আমাকে বল।

শার্লোতে ওতিলেকে কি বলায় সে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন জানতে চাইল ওদের দাম্পত্য সম্পর্ক বর্তমানে কি অবস্থায় আছে। কেননা ওদের কথা ও আগেই কিছু শুনেছিল। এডওয়ার্ড তখন বলল, কাউণ্ট ও কাউণ্টপত্নী ওদের বিয়ের পর দুজনেই প্রেমে পড়ে। জড়িয়ে পড়ে এক অবৈধ প্রেমসংসর্গের জালে। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়-হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো না।

কাউণ্ট এডওয়ার্ডের থেকে বয়সে কিছু বড় হলেও ওদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের এবং ওদের সম্পর্ক বরাবর ভালই আছে।

শার্লোতের ইচ্ছা ছিল না কাউণ্টরা ওদের বাড়িতে আসুক। ওতিলে ওদের কথা জানতে পারুক। এডওয়ার্ড বলল, আর দিনকতক পরে আসতে পারত। কারখানা বিক্রির ব্যাপারটা চুকে গেলে ভাল হত। এখনও সব দলিল হয়নি।

পরদিন সকালে ওরা প্রাসাদের ছাদ থেকে অতিথিদের আসার পথে তাকিয়ে রইল। এডওয়ার্ড বলল, কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ক্যাপ্টেন বলল, কাউণ্ট আসছে।

এডওয়ার্ড বলল, না মিটলার।

সত্যি সত্যিই মিটলার এসে হাজির হলো ওদের প্রাসাদে। এডওয়ার্ড বলল, গতকাল এলেন না কেন? উৎসবের দিন ছিল।

মিটলার বলল, ওসব উৎসবের হৈচৈ ও গোলমাল আমার ভালো লাগে না। আজ শান্ত পরিবেশে আমি আমার বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে এসেছি।

এডওয়ার্ড হাসিমুখে বলল, কিন্তু সময়টা ত আর পিছিয়ে দিতে পারবে না।

মিটলার বলল, আসল কথা আসতে মন হলো চলে এলাম। গতকাল একটা বাড়িতে অনেক দিন পর রাত কাটাই। তাদের বাড়িতে শান্তি স্থাপন করি। পরে ভাবলাম শুধু ঝগড়ার সময় নয়, শান্তির সময়েও বন্ধুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাওয়া উচিত। এই কথা আপন মনে ভেবেই চলে এলাম।

এডওয়ার্ড বলল, গতকাল বাড়িতে কত লোক ছিল। আর আজ কেউ নেই।

শার্লোতে বলল, আজ আর একটু পরে কাউণ্ট ও কাউণ্টপত্নীকে দেখতে পাবেন।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল মিটলার। তার টুপী আর ঘোড়ার চাবুকটা খুঁজতে লাগল। বলল, এক অশুভ নক্ষত্র সব সময় আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যখনই কোথাও গিয়ে একটু বিশ্রাম

করতে চাই তখনি একটা না একটা বাধা আসবেই।

মিটলারকে ওদের সকলের ভাল লাগত। এই অদ্ভুত লোকটির সঙ্গ ও সংস্পর্শ মাঝে মাঝে কামনা করত ওরা। কিন্তু ওকে কাছে পেত না। পেলেও আবার পরক্ষণেই চলে যেত।

মিটলার বলল, যারা বিয়ের পবিত্রতা বা দাম্পত্যসম্পর্কের শুচিতা রক্ষা করতে জানে না, বিয়ের গুরুত্বকে স্বীকার করতে চায় না তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তাদের মুখদর্শন করতে চাই না। বিয়ে হচ্ছে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই বিয়ে মানুষের পাশবিক কামপ্রবৃত্তির দুর্বার আবেগকে সামাজিক অনুশাসন ও পবিত্র প্রেমসম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করে তার সঠিক উত্তরণ ঘটায়। মানুষের বিবাহিত জীবনে দুঃখ নেই তা বলছি না। কিন্তু তার সঙ্গে আনন্দও কম নেই। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে আনন্দ ও বেদনা দুই-ই পায়। কে কার কাছ থেকে কতখানি ঋণী, কে কার কাছ থেকে কতখানি ভালবাসার আনন্দ ও বেদনা লাভ করেছে তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ তা অনন্ত। তাছাড়া আমাদের সবচেয়ে যে আপনার, আমাদের অন্তরশায়ী বিবেক, একদিক দিয়ে আমাদের জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে আমরা বিবাহিত। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মতই বিবেকের সঙ্গে আমাদের মিলে মিশে চলা দরকার। কিন্তু সেই বিবেকের নির্দেশ আমরা সব সময় মেনে চলতে পারি না। স্বামী স্ত্রীর মত সেই বিবেকের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে।

মিটলারের কথা শেষ হতে না হতেই একটা ঘোড়ার গাড়ি হতে কোচম্যান একটা শিঙা বাজিয়ে কাউন্টের আগমন ঘোষণা করল। বাড়ির সব লোক কাউন্টের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। এদিকে মিটলার তার ঘোড়ায় উঠে চড়ে মুহূর্তের মধ্যে সরেও পড়ল সবার অলক্ষ্যে।

দশম পরিচ্ছেদ

অতিথিদের যথাযোগ্য সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে তোলা হলো। এ বাড়িতে বহুদিন পর আবার পদার্পণ করলেন কাউন্ট। যৌবনে কতবার এ বাড়িতে বন্ধু এডওয়ার্ডের সঙ্গে কাটিয়ে গেছেন তিনি। এ বাড়ির সব কিছুই তাঁর চেনা। আজ কাউন্ট বা কাউন্টপত্নীর দুজনেরই চেহারার কিছু পরিবর্তন

ঘটলেও এবং তাঁদের সেই যৌবন না থাকলেও প্রৌঢ়ত্বসুলভ এক গাম্ভীর্য তাঁদের চেহারাকে দান করেছে এক আকর্ষণীয় মর্যাদা। যৌবনসুলভ চঞ্চলতার পরিবর্তে ধৈর্য স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাসে কেমন যেন প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে তাঁদের ব্যক্তিসত্তা। তাঁদের আচার আচরণ আগের থেকে হয়ে উঠেছে অনেক বেশী মার্জিত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

বহুদিন পর তাঁদের কাছে পেয়ে খুব ভাল লাগল এডওয়ার্ড ও শার্লোতের। অতীত দিনের কথা মনে পড়ায় কাউণ্টেরও ভাল লাগছিল ওদের সাহচর্য। ওরা লক্ষ্য করল, কাউণ্টের ব্যবহার আগের থেকে হয়ে উঠেছে অনেক বেশী অন্তরঙ্গ ও মমতামধুর।

প্রথমদিকে ওরা দুদলে বিভক্ত হয়ে গেল। মেয়েরা এক জায়গায় গিয়ে পোষাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান নিয়ে গল্প জুড়ে দিল। কিছু গোপন মেয়েলি কথাবার্তা বলল। অন্যদিকে পুরুষরা অন্য এক জায়গায় বসে ঘোড়া ও ঘোড়া বদলের গল্প করতে লাগল।

যাই হোক, খাবার সময় ওরা আবার জড়ো হলো সকলে এক জায়গায়। কাউণ্ট ফরাসী ভাষায় কথা বলতে লাগলেন যাতে চাকরেরা তাঁদের কোন কথা বুঝতে না পারে।

কিন্তু ওদের সমস্ত আলোচনা শুধু একটা বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। বিষয়টা এতদূর গড়াবে শার্লোতে প্রথমে তা বুঝতে পারে নি। সে হঠাৎ কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিল তার এক পুরনো বান্ধবীর কথা। কাউণ্ট উত্তরে বলেছিলেন ভদ্রমহিলা বিবাহবিচ্ছেদ করেছেন।

শার্লোতে তখন বলেছিল, তার বান্ধবী এভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়ে ভাল করে নি। তার বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন করতে পারেনি শার্লোতে।

কিন্তু কাউণ্ট বললেন অন্য কথা। তিনি বললেন, আমরা সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্পর্কটাকে অক্ষয় ও অচ্ছেদ্য বলে মনে করি। মিলনান্ত নাটক দেখে আমাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। এই সব নাটকে দেখানো হয় বিয়েটাই যেন তাদের প্রেমের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নায়ক নায়িকার মিলন একমাত্র শুভ পরিণয়ে পরিণত হলেই যবনিকা পাত হয়। কিন্তু জীবনটা নাটক নয়। সেখানে বিবাহিত জীবনের যবনিকার অন্তরালে অনেক দৃশ্যই সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে যবনিকা উঠলে

দেখি সে প্রেমের আর কোন কিছু অবশিষ্ট নেই।

শার্লোতে প্রতিবাদের সুরে বলল, সব ক্ষেত্রেই এটা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহের রঙ্গমঞ্চে দৈত ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে অনেকে মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েও পরে আবার ফিরে এসে সেই একই ভূমিকায় অভিনয় করেছে।

কাউন্ট বললেন, তা হয়ত করেছে। কিন্তু আপনি দেখবেন জগতে যখন সব কিছুই পরিবর্তনশীল তখন সেই ব্যাপক পরিবর্তনশীলতার মাঝে বিয়েটা যদি অক্ষয় অপরিবর্তনীয় একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে সেটাকে অবশ্যই আমাদের বেখাপ্পা লাগবে মাঝে মাঝে।

এবার কাউন্ট এডওয়ার্ডকে লক্ষ্য করে বলল, তবে অবশ্য আমি তোমাদের বিয়ের কথা বলছি না। তোমাদের এই পুনর্মিলনে আজ আমি খুশি হয়েছি, তেমনি যখন তোমাদের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়, তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় পরস্পর থেকে তখন আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাই মনে। তোমরা যখন নাচের আসরে নাচতে দুজনে তখন তোমাদের খুব ভাল লাগত, তোমাদের জুটি ছিল চমৎকার। এডওয়ার্ডের বাবা যখন জোর করে ওর অন্যত্র বিয়ে দেয় তখন আমি এডওয়ার্ডকেই দোষ দিয়েছিলাম। আমি ওকে আরো শক্ত হতে বলেছিলাম।

কাউন্টপত্নী বলল, এ বিষয়ে আমি শার্লোতেকেও দোষ না দিয়ে পারছি না। কারণ আমি বেশ তখন লক্ষ্য করেছি ও এডওয়ার্ডকে ভালবাসলেও মাঝে মাঝে ওর নজর অন্যদিকে ঘোরাফেরা করত যার জন্য এডওয়ার্ডকে বেশ কিছুদিন দেশভ্রমণে ঘুরে বেড়াতে হয়। অবশ্য ওর ভালবাসায় নিষ্ঠার অভাব খুব একটা ছিল না।

কাউন্ট বললেন, আসল কথা কি জান, মেয়েরা যাকে একবার ভালবাসে তার প্রতি তাদের আসক্তির অনুভূতিটা বিচ্ছেদের দ্বারা বিকৃত বা বিলুপ্ত হয় না। তা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে তাদের মনে।

কাউন্টপত্নী বলল, এতে তোমরাও কম যাও না।

কাউন্ট এডওয়ার্ডকে আবার বললেন, শার্লোতের প্রথম স্বামীর মৃত্যু আর তোমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের এই বিবাহ তোমাদের অমর প্রেমের বিজয়পতাকাকে উড্ডীন করেছে নূতন করে। তবে অবশ্য সব বিবাহই ভাল নয়। অনেকে বিয়ের পর দেখবে একজন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। বিয়েটাকে ব্যভিচারের ছাড়পত্র হিসাবে গণ্য করে। মানুষ তার প্রতিশ্রুতির কথা রাখবার চেষ্টা করে,

কিন্তু পরিবর্তনশীল জগৎ উদাসীন জগৎ মানুষের কোন কথা রাখতে চায় না। সব ধুয়ে মুছে ভেঙ্গে চুড়ে দিতে চায়।

শার্লোতে ওতিলের সামনে তাদের বিবাহ সম্পর্কে এই সব কথা আলোচনা করতে চাইছিল না। এর আগে একবার কৌশলে সে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কাউণ্টও তার ইচ্ছার কথাটা ঠিক ধরতে পারেননি। শার্লোতে এবার প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে বলল, দেখুন, অতীতের কথা ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কোন লাভ নেই। বিয়ের ব্যাপারে কে কি করে কে কতটা বিশ্বস্ত তা আমাদের দেখার দরকার নেই। তবে আমরা যতদূর সম্ভব আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের শুচিতা রক্ষা করে চলার চেষ্টা করি। আমাদের কথা রাখার চেষ্টা করে চলি। এইটুকুই শুধু বলতে পারি। অতীতে যে যা করেছি তা ত আর ফিরবে না। এখন ওকথা বাদ দিন।

এবার কাউণ্ট বুঝতে পেরে চুপ করল। এরপর ঠিক হলো ক্যাপ্টেন আসার পর থেকে ওরা যে সব নূতন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে এ অঞ্চলের পথ-ঘাটের উন্নতির জন্য তা অতিথিদের দেখানো হবে। ওদের প্রাসাদের চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো অতিথিরা ঘুরে দেখবেন।

ওতিলে ঘরে রইল। তার দোষ নেই। সে এডওয়ার্ডের সেই দেওয়া কাজ একমনে শেষ করছিল। কারখানা বিক্রির কাগজপত্র এখনো সব তৈরি হয় নি। ও তাই করছিল।

ক্যাপ্টেন ওদের সঙ্গে গেল। ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে সোজা পাহাড়ের উপর যে বাড়ি তৈরি হচ্ছিল সেখান পর্যন্ত গেল। সত্যিই জায়গাটা চমৎকার লাগল ওদের। এডওয়ার্ড ওদের চারদিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল। পাথর ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়া শীর্ণ নদী, জলাশয়ের স্বচ্ছ জল, প্রাসাদসংলগ্ন পপলার আর পাইন গাছের সাজানো বাগান আর এদিকে পাহাড়সংলগ্ন ঘন বন সব মিলিয়ে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় মনোরম।

ক্যাপ্টেন নক্সাটা আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে প্রাসাদে ফিরে গেল। এতক্ষণ সে মুখেই কাউণ্টকে বোঝাচ্ছিল পরিকল্পনাটা। ক্যাপ্টেন চলে যেতে কাউণ্ট শার্লোতের সঙ্গে এবং এডওয়ার্ড কাউণ্টপত্নীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কথায় কথায় কাউণ্ট এক সময় শার্লোতেকে বললেন, ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক সত্যিই খুব কাজের লোক, গুণী লোক। এখানে বেচারা শুধু শুধু পড়ে আছে। আমি ওকে ভাল জায়গায় কাজের ব্যবস্থা করে দেব। এখনি ওর কাজের ব্যবস্থা

করে চিঠি লিখে লোক পাঠাব এক জায়গায়।

কথা নয়, যেন শেল বিঁধল শার্লোতের কানে। ক্যাপ্টেন এত তাড়াতাড়ি তাদের বাড়ি থেকে চলে যাক এটা সে চায়নি। কোন বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও ক্যাপ্টেনের প্রতি তার তরল আসক্তিটা এবার শক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তার প্রতি ভাললাগার আলতো অস্পষ্ট ভাবটা এবার ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তরুণী ওতিলের অনিবারণীয় আকর্ষণে এডওয়ার্ড ক্রমাগত যেভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার মনে এডওয়ার্ডের আসনটা শূন্য হয়ে পড়েছে স্বাভাবিকভাবে। কর্মপাগল ভাবভোলা ক্যাপ্টেনের নিরাসক্ত ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে তার মোহপ্রসারী আবেদনের ছটা বিস্তার করে শার্লোতের মনের সব শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলেছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে শান্তি পেত শার্লোতে। কিন্তু ক্যাপ্টেন এবার চলে যাবে। বাড়িটা আবার শূন্য হয়ে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পতিত জমিটাও।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সুচতুরা কাউন্টপত্নী সরলপ্রকৃতির এডওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা নূতন জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল। সে জিনিস হলো ওতিলের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান আসক্তি। কাউন্টপত্নী বাড়িতে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছিল কথায় কথায় এডওয়ার্ড ওতিলের নাম উল্লেখ করছিল এবং তাকে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব দান করছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী।

কাউন্টপত্নী কৌশলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে এমন সব কথা বলছিল যাতে ওতিলের প্রতি এডওয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একবার খাবার টেবিলে সবার সামনে ওদের বাড়ি সামনের শরৎকালে বেড়াতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করল এডওয়ার্ডকে। বলল, শার্লোতেকে নিয়ে বর্ষার সময় অবশ্যই যাবেন।

এডওয়ার্ড তখন সকলের সামনেই কাউন্টপত্নীকে জিজ্ঞাসা করল, ওতিলে তাদের সঙ্গে যেতে পারে কি না? কাউন্টপত্নী বলল, সেটা আপনার ইচ্ছা, আপনি আর কাকে সঙ্গে নেবেন না নেবেন আমি তার কি জানি?

সেদিন রাত্রিতে নৈশভোজনের পর এডওয়ার্ড কাউন্টের ঘরে গিয়ে তাদের যৌবনকালের গল্প করছিল। কাউন্ট একবার বললেন, তোমার মনে আছে,

যৌবনে শার্লোতের পা দুটো কত সুন্দর ছিল ?

এডওয়ার্ড আবেগের সঙ্গে বলল, অতীতে কেন, আজও ওর পা সত্যিই সুন্দর এবং ওর পা কেন আমি ওর পায়ের জুতোও চুম্বন করতে পারি।

কাউণ্ট তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠলেন আনন্দে।

হাসি থামিয়ে একসময় কাউণ্ট একটা অনুরোধ করলেন এডওয়ার্ডকে। বললেন, এখন কাউণ্টপত্নী কোথায় আছে ?

এডওয়ার্ড বলল, এখন মেয়েরা সব এক জায়গায় আছে। কিছুক্ষণ পর আপন আপন ঘরে শুতে যাবে।

কাউণ্ট বললেন, কাউণ্টপত্নীর ঘরে আমাকে একবার নিয়ে যাবে ? সকাল থেকে আমরা নিরিবিলিতে একবারও দুজনে কোন কথা বলতে পারিনি।

এডওয়ার্ড একটা জ্বলন্ত বাতি হাতে করে কাউণ্টকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। বাড়ির মধ্যে কত ঘর। কত গোপন দরজা। সে ঘর দরজা একমাত্র এডওয়ার্ডের পক্ষেই নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব। কাউণ্টপত্নীর নির্জন ঘরে কাউণ্টকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে অন্ধকারে ঘরের বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এডওয়ার্ড।

তারপর তার নিজের ঘরে ফেরার পথে ওতিলের ঘরটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল। দেখল, ওতিলে তখনো তারই দেওয়া কাজ করে চলেছে। এডওয়ার্ডের প্রথম ইচ্ছা হচ্ছিল ওতিলে একবার তার ঘর থেকে নির্জন বারান্দার অন্ধকারে এলেই তাকে জড়িয়ে ধরবে নিবিড়ভাবে।

কিন্তু ওতিলে এল না। ওতিলেকে না পেয়ে শার্লোতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল এডওয়ার্ড। দেখল তার ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার উপরে মৃদু করাঘাত করল। এদিকে শার্লোতে তা শুনতে পেয়ে বিশ্বাস করতে পারল না তার স্বামী এসে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘরের বাইরে। কারণ আজকাল এডওয়ার্ড তার ঘরে মোটেই আসে না।

শার্লোতে একবার ভাবল ক্যাপ্টেন গোপনে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সে ধরনের মানুষ নয়। তার কথা ভেবে বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল গোটা অন্তরটা। তারপর ভাবল হয়ত কাউণ্টপত্নী বা ওতিলে কোন দরকারে কিছু চাইতে এসেছে। যাই হোক, এটা সেটা ভাবার পর দরজা খুলে দিল। এডওয়ার্ডকে অকস্মাৎ তার ঘরের সামনে দেখে আশ্চর্য হলো। পোষাক খুলে শুতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল শার্লোতে। খালি গা, জাঙিয়াটা শুধু পরণে ছিল। এডওয়ার্ডকে ঘরে ঢুকতে দেখে খাটের কাছে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল।

এডওয়ার্ড হঠাৎ নতজানু হয়ে বলল, আজ আমি বন্ধুর কাছে শপথ করেছি শার্লোতে, তোমার পায়ের জুতো ও পা আমি চুম্বন করব।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যিই এডওয়ার্ড তা করল। শার্লোতে বাধা দিয়েও তাকে নিবৃত্ত করতে পারল না। শার্লোতে ভেবেছিল সাময়িক আবেগের একটা উচ্ছ্বাসের বশে তার ঘরে এসে পড়েছে এডওয়ার্ড এবং একটু পরেই সে চলে যাবে। কিন্তু এডওয়ার্ড গেল না। উল্টে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তার হাত ধরে বিছানার উপর উঠে গেল। দুজনে দুজনকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। পরস্পরের বাহুবন্ধনে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে ধরা দিলেও অন্ধকারে কেমন যেন সব একাকার হয়ে গেল।

যতক্ষণ ঘরে আলো জ্বালা ছিল ওরা দুজনে বেশ জানত ওদের সামনে কে রয়েছে, ওদের মনের মধ্যে যাই থাক। ওদের মনের গোপন কোণে অবৈধ কামনার যে কুটিল সাপটা লুকিয়ে ছিল তা অন্ততঃ বাইরে আসার সাহস পায়নি। কিন্তু আলোটা নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের সব বন্ধন আর তার জলজ্যান্ত পার্থিবতাটা উবে গেল মুহূর্তে। সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন গর্ত থেকে কামনার সেই কুটিল সাপটা বেরিয়ে এল স্বচ্ছন্দে। জড়িয়ে ধরল ওদের দুজনকেই। শার্লোতের মনে হলো তার পাশে এডওয়ার্ড শুয়ে নেই, তার বদলে শুয়ে আছে তারই আকাঙ্ক্ষিত নায়ক ক্যাপ্টেন আর এডওয়ার্ডের মনে হলো সে শার্লোতের মধ্য দিয়ে ওতিলেকেই আলিঙ্গন করছে, আসলে তারই কাম্য নায়িকার দেহকে ভোগ করছে।

এইভাবে একদিকে বাস্তব ও কল্পনার সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল ওদের দাম্পত্যশয্যায়। একদিকে রক্তমাংসের বাস্তব মানুষ আর একদিকে আবেগ ও অনুভূতির রসে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত এক কল্পনা।

প্রাতঃরাশের টেবিলে দেখা গেল কাউন্ট ও কাউন্টপত্নী নববিবাহিত দম্পতির মতই কেমন বেশ হাসিখুশিতে সজীব। অথচ এডওয়ার্ড ও শার্লোতের মুখ দুটো কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছিল। ওদের দুজনেরই মনে হচ্ছিল ওরা যেন গতকাল রাতে গোপনে এক অপরাধ করে ফেলেছে। সেই গোপন অপরাধচেতনার নিম্নচাপে মুষড়ে পড়েছিল ওরা অস্বাভাবিকভাবে। বিশেষ করে এডওয়ার্ড যখন ওতিলের দিকে আর শার্লোতে যখন ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাচ্ছিল তখন ওদের অবদমিত সেই অপরাধ চেতনাটা প্রকট হয়ে উঠছিল ওদের শুকনো মুখে।

অবশেষে অতিথিদের যাবার সময় হলো। ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন অতিথিরা চলে গেলে দুপুরে খাওয়ার সময় তাদের সমালোচনা করতে লাগল এডওয়ার্ড। শার্লোতে তাতে কিন্তু যোগ দিল না। চুপচাপ গম্ভীরভাবে খেয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ এডওয়ার্ড বলল, আজ একটা নৌকো ভাড়া করেছি বেশী টাকা দিয়ে। বিকালে লেকে বেড়াতে যাব। তৈরি হয়ে নাও।

ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল যথাসময়ে। ওতিলে কাজ নিয়ে বাড়িতেই রইল। লেকের ধারে গিয়ে পপলার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ড বলল, এইখানে একটা বসার জায়গা করতে হবে। যারা বেড়াতে আসবে লেকে তারা যাতে ভালভাবে বসতে বা বিশ্রাম করতে পারে তার জন্য শান বাঁধানো একটা বড় বেদীর মত জায়গা করে দিতে হবে।

নৌকোর উপর শার্লোতে ও ক্যাপ্টেন উঠে বসল। এডওয়ার্ড সব শেষে উঠে দাঁড় ধরল। কিন্তু হঠাৎ কি মনে হতে সে ব্যস্ত হয়ে ক্যাপ্টেনের হাতে দাঁড়টা দিয়ে নেমে পড়ল। বলল, বাড়িতে একটা জিনিস ভুলে এসেছি। আমি বাড়ি যাচ্ছি। তোমরা যাও।

বাড়িতে এসে এডওয়ার্ড দেখল ওতিলে তখনো কাজ করছে। ওতিলেকে তার ঘরে খবর দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল এডওয়ার্ড। এই হচ্ছে প্রশস্ত সময়। বাড়িতে কেউ নেই। অবশেষে ওতিলে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ওতিলেকে। ওতিলেও যেন এই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষায় ছিল। সেও দুহাতে এডওয়ার্ডের গলাটা জড়িয়ে ধরল। এরপর দুজনে মুখোমুখি বসে নির্বিঘ্নে গল্প করতে লাগল।

এদিকে এডওয়ার্ড নৌকো থেকে নেমে গেলে ক্যাপ্টেন নৌকো ছেড়ে দিল। নিজেই দাঁড় বেয়ে নিয়ে চলল। ক্যাপ্টেনের কাছেই বসে ছিল শার্লোতে। কোন কথা বলছিল না সে। ক্যাপ্টেন তাকে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা শুধু বোঝাচ্ছিল আর সে তা অন্যমনস্কভাবে শুনে চলেছিল।

হঠাৎ এক সময় শার্লোতে বলল, নৌকো ফেরান। বাড়ি ফেরা যাক। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

সত্যিই তখন সূর্য ডুবে গেছে সারবন্দী পপলার আর পাইন গাছের ওপারে। গোধূলির ধূসর ছায়ায় আরো কালো হয়ে উঠেছে লেকের শান্ত জল। ক্যাপ্টেন

দেখল ওরা অনেকটা চলে এসেছে। নৌকোটা ঘুরিয়ে কূলের দিকে নিয়ে গিয়ে যেখান থেকে ছেড়েছিল সেইখানে ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জায়গাটা ঠিক করতে পারল না। অবশেষে সন্ধ্যে হয়ে যেতে শার্লোতে থামবার কথা বলতে এক জায়গায় থামাল নৌকোটা। কিন্তু সেখানে জল। জলে নেমে তারপর কাদার মধ্য দিয়ে পারে যেতে হবে। ক্যাপ্টেন বলল, দাঁড়ান আমি আগে নামি। তারপর আপনাকে তুলে পার করে দেব।

ক্যাপ্টেন আগে নিজে নামল জলকাদার মধ্যে। তারপর দুহাত বাড়িয়ে শার্লোতেকে তুলে নিল। শার্লোতেও তার গলাটা জড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে। শার্লোতের ভাল লাগছিল। ক্যাপ্টেন তাকে এইভাবে অনেকটা নিয়ে গিয়ে তবে খানিকটা শক্ত মাটি পেল। তাদের অব্যক্ত প্রেম এই দেহগত স্পর্শের নিবিড়তার মধ্যে এক ভাষাহীন নীরবতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠল। উত্তাল হয়ে উঠল রোমাঞ্চ ও শিহরণের মধ্যে।

শার্লোতেকে নামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনও সামলাতে পারল না নিজেকে। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করল তাকে। এইভাবে আলিঙ্গন ও চুম্বনে অবাধে বেশ কিছুক্ষণ আবদ্ধ হয়ে রইল ওরা দুজনে। তারপর ক্যাপ্টেন হঠাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নতজানু হয়ে শার্লোতের একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, ক্ষমা করো শার্লোতে। আবেগের বশে ভুল করে ফেলেছি।

শার্লোতে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল স্থির হয়ে। শার্লোতে শান্তভাবে বলল, আমাদের ভালবাসার ক্ষেত্রে আজকের এই ঘটনার যেন কোন গুরুত্ব না থাকে। কাউন্ট তোমার কাজের চেষ্টা করছে। শীগগির তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ। এতে আমি একই সঙ্গে আনন্দ আর বেদনা অনুভব করছি। তুমি কাছে থাকলে আমার ক্ষতি হত। নিজেকে সংযত করা কঠিন হত ক্রমশঃ। আবার তুমি দূরে চলে গেলেও ব্যথা পাব মনে। যাই হোক, এখানেই সব কিছুর শেষ হোক। এখন বাড়ি চল।

বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন ক্ষমা চাইল এডওয়ার্ডের কাছে। কিন্তু এডওয়ার্ডের মনে হলো ওরা খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন লেক থেকে বেরিয়ে এসে রাতে শুতে যাবার সময় মনে মনে বেশ হালকা বোধ করছিল শার্লোতে। তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সংযত হৃদয়সমুদ্রে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার সাময়িক সামান্য এই দেহগত স্পর্শের ব্যাপারটা কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারল না। তার শোবার ঘরে ঢুকেই তার মনে হলো সে মনেপ্রাণে এডওয়ার্ডের স্ত্রী। গতকাল তার এই ঘরেই তার স্বামী রাত কাটিয়ে গেছে। শান্ত মনে শুয়ে পড়ল শার্লোতে।

এদিকে এডওয়ার্ডের ঘুম এল না কিছুতেই। আজ বিকালে ওতিলের আলিঙ্গনে ও চুম্বনের মাধ্যমে তার দেহগত স্পর্শের যে মাধুর্য লাভ করেছে তাতে মাতাল হয়ে উঠেছে তার দেহমন। আকাশে চাঁদ উঠতেই সে উপর থেকে নেমে নিচে গেল। ওতিলের ঘরের জানালার নিচে একটা বেঞ্চের উপর বসে বসে ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল এডওয়ার্ড।

খুব সকালেই ঘুম ভাঙ্গল তার। ঘুম ভাঙ্গতেই দেখল শ্রমিকরা আসতে শুরু করেছে। লোক আসতেই তাদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ দেখাশোনা করতে লাগল। তখনো বাড়ির কেউ ওঠেনি।

এডওয়ার্ড ভাবতে লাগল এই পথের কাজ শেষ হলে ওতিলে এই পথ দিয়ে কত যাওয়া আসা করবে। পথের ধারে সিমেন্টের আসনে বসে বিশ্রাম করবে। পাহাড়ের উপর গ্রীষ্মাবাসটার কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখানেও মাঝে মাঝে থাকবে ওতিলে। একমাত্র ওতিলেকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্তভাবে আবর্তিত হচ্ছে যেন তার সকল কর্মতৎপরতা। ওতিলের জন্যই কাজগুলো যথাশীঘ্র শেষ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল এডওয়ার্ড। শার্লোতে ও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করে আরো বেশী লোক লাগালো; যদিও সে বুঝতে পারল নিজে যে বেশী তাড়াতাড়ি করতে গেলে কাজ খারাপ হবে।

ওতিলের প্রতি এডওয়ার্ডের আসক্তি এবং তাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় মনে মনে চিন্তিত হয়ে উঠল শার্লোতে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এ নিয়ে কিছু আলোচনাও করল বিশেষ সংযতভাবে। তারপর ওতিলের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করল। এমন ব্যবস্থা করল যাতে সে একা একা না থাকতে পারে, যাতে তাকে নিয়ে মানুষের কাছে কাছে থাকতে হয়।

ওতিলেকে দূরে পাঠাতে হবে। কাছাকাছি দুজনে থাকলে ওরা

কিছুতেই সংযত করতে পারবে না নিজেদের। তাই তার জন্য একটা পরিকল্পনাও খাড়া করে ফেলল শার্লোতে। ও ঠিক করল ওর মেয়ে ন্যাসিয়ানেকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে আসবে এবং তার জায়গায় পাঠাবে ওতিলেকে। এ দিকে তখন ক্যাপ্টেনও তার নূতন কাজের জায়গায় চলে যাবে। এইভাবে সে আগের মতই তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাবে। এই সাময়িক যত সব পারিবারিক অশান্তির অবসান ঘটবে নিঃশেষে।

এদিকে ওতিলের অদর্শন অসহ্য হয়ে উঠল এডওয়ার্ডের কাছে। সে দেখল কোন সময়েই ওতিলেকে একা পাওয়া বা তার সঙ্গে কথা বলা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। একদিন সে চিঠি লিখে ওতিলেকে কোনরকমে পৌঁছে দিল। ওতিলেও সে চিঠির জবাব দিল। অসাবধানতাবশতঃ চিঠিটা পড়ে গেল তার হাত থেকে এবং সেটা শার্লোতের হাতে পড়ল। ওতিলের হাতের লেখাটা এডওয়ার্ডের মত বলে সে সেটা এডওয়ার্ডের চিঠি ভেবে তার হাতেই দিল।

ক্রমশই এডওয়ার্ডের মেজাজটা খিটখিটে হয়ে উঠল। একদিন ওতিলের কাছে স্পষ্ট শার্লোতের উপর তার অযথা ক্রোধ প্রকাশ করল। ওতিলেও অন্যায়ভাবে ক্যাপ্টেনের নিন্দা করতে লাগল। এডওয়ার্ড মিথ্যা করে বলল, শার্লোতে ক্যাপ্টেনের প্রতি আসক্ত এবং সে নিজেই বিবাহবিচ্ছেদ চায়। ওতিলে বলল ক্যাপ্টেনও লোক ভাল নয়। সে এডওয়ার্ডের বাঁশি বাজানোর নিন্দা করে প্রকাশ্যে। ওতিলে চায় শার্লোতের সঙ্গে এডওয়ার্ডের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই তার স্ত্রীর শূন্য আসনে বসবে সে। তার সুখের পথে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে সব বাধা অপসারিত হয়ে যাবে।

এডওয়ার্ড যাই ভাবুক, শার্লোতে কিন্তু তার প্রতিজ্ঞায় অটল। ক্যাপ্টেনের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান প্রেমাসক্তির কথা ভেবেই ওতিলের প্রতি ক্রমশই কঠোর হয়ে উঠেছিল সে। সে তাই ভেবেছিল তার মত আত্মসংযম ওতিলের নেই। সে বয়সে তরুণী। এই প্রেমাসক্তিকে বেশী বাড়তে দিলে তার পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ। সে তাই যথারীতি ওতিলেকে এডওয়ার্ডের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখতে লাগল।

ক্যাপ্টেনের নিয়োগপত্র এসে গেল। দুখানি চিঠি একটি খামের ভিতর ছিল। একটিতে ক্যাপ্টেনকে যে সব পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হবে তার সব ছক লেখা ছিল। আর একখানি চিঠিতে ছিল ক্যাপ্টেনকে যে বেতন ও সুবিধা সুযোগ দেওয়া হবে তার পূর্ণ বিবরণ।

ক্যাপ্টেন কিন্তু একথা বাইরে প্রকাশ করল না কারো কাছে। সে আগের মতই তার কাজকর্ম যথারীতি করে যেতে লাগল। এদিকে ওতিলের জন্মদিন এগিয়ে আসায় তার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। এডওয়ার্ডের ইচ্ছা পাহাড়ের উপর যে গ্রীষ্মাবাস নির্মিত হচ্ছে তার কাজ ঐ দিনের আগেই শেষ হওয়া চাই। তাতে যত বেশী লোক দরকার নিয়োগ করা হোক।

ক্যাপ্টেন একটা পরামর্শ দিল এডওয়ার্ডকে। তিনটে জলাশয় এক করে একটা হ্রদে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা যেন গ্রহণ করা না হয়। এর বদলে ছোট জলাশয়টার কিছু উন্নতিবিধান করা উচিত আর মাঝের জলাশয়টা একেবারে বুজিয়ে ফেলা উচিত। তবে এ পরামর্শ মানা না মানা নির্ভর করে এডওয়ার্ডের মর্জির উপর।

এডওয়ার্ড এখন ওতিলের জন্মদিনে তাকে কি কি উপহার দেবে তাই নিয়ে ব্যস্ত। এ বিষয়ে সে শার্লোতের উপর মোটেই নির্ভর করতে পারবে না। কারণ শার্লোতে তাকে যে সব জিনিস কিনতে বলেছে তা খুবই হীন। তাই এ ব্যাপারে তার এক বিশ্বস্ত চাকরের উপর ভার দিয়েছে। সে চাকর শহরের বড় পোষাকের দোকানে অনেক নূতন ফ্যাশানের পোষাকের অর্ডার দিয়েছে। এই চাকরই আবার এডওয়ার্ডকে পরামর্শ দিয়েছে ঐ দিন জলাশয়ের ধারে সন্ধ্যের সময় বাজী পোড়াবার ব্যবস্থা করতে। নানা রকমের রং বেরঙের বাজী ছাড়া হবে জলাশয়ের এধার থেকে আর ওধার থেকে সমবেত দর্শকরা দেখবে আর সেই সব জলন্ত বাজীর প্রতিফলন পড়বে জলাশয়ের জলে।

পরামর্শটা সানন্দে গ্রহণ করল এডওয়ার্ড। সেই মত ব্যবস্থাও সব হয়ে গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে এডওয়ার্ডের সেই বহু প্রতিক্ষীত দিনটি এসে গেল। সকাল থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আসা শুরু হয়ে গেল। বিশেষ করে যারা শার্লোতের জন্মদিনে বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর উৎসবে যোগ দিতে পারেনি তারা সব এল।

তাছাড়া চারদিকের গ্রামাঞ্চল হতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল গ্রামের লোক। অনেক ভিখিরীও আসতে লাগল। এডওয়ার্ড এসব আগেই ভেবে রেখেছিল। যাতে কোন দিকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আগেই সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

সমস্ত প্রাসাদটাকে সবুজ পাতা আর ফুল দিয়ে সাজানো হলো। সারাদিন আনন্দে উৎসবে কেটে গেল। দিনের আলো নিবে যেতেই বাড়ির বিশিষ্ট অতিথিরা সবাই জলাশয়ের ধারে ঘাসের উপর গাছের তলায় সাদা আসনে গিয়ে বসল। সেখানেই তাদের জলখাবার দেওয়া হলো। সেখান থেকেই তারা সন্ধ্যের সময় বাজী পোড়ানো দেখবে।

সব কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটায় হর্ষের মাঝে বিষাদ নেমে এল। যে নূতন বাঁধের উপর এক বিরাট জনতা সমবেত হয়েছিল বাজী পোড়ানো দেখার জন্য সেই বাঁধের নরম মাটি মানুষের পায়ের চাপে ধসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার এক অংশ হুড়মুড় করে পড়ে গেল জলাশয়ের জলে। এক প্রবল চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। ক্যাপ্টেন একদল সাহসী লোক নিয়ে উদ্ধারের জন্য ছুটে গেল। বাঁধের উপর থেকে অবাঞ্ছিত লোকদের সরিয়ে দিল উদ্ধারের কাজের সুবিধার জন্য। জলে যারা পড়ে গিয়েছিল সকলকেই অল্প সময়ের মধ্যে উদ্ধার করে উপরে তোলা হলো। কিন্তু একটি ছেলে অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। সে একটা হাত উপরে তুলে ডুবছিল আর একবার উঠছিল জলের উপর। তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন পোষাক খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের উপর। ডুব সাঁতার দিয়ে তীর বেগে ছেলেটার কাছে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে নৌকোটাকে কাছে আনার জন্য ইশারা করল। কৌতূহলী জনতা তার দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটাকে এনে মাটির উপর তুলতেই সার্জেন এসে তার চিকিৎসা শুরু করে দিল। ছেলেটা জল খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ায় তাকে মড়ার মত দেখাচ্ছিল।

এদিকে শার্লোতে এসে এডওয়ার্ডকে বলল, এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাজী পোড়ানোর উৎসব বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এডওয়ার্ড তাতে রাজী হলো না। বলল, সার্জেন ছেলেটার চিকিৎসার ভার নিয়েছে। আমাদের এ বিষয়ে করার কিছু নেই। সুতরাং উৎসব বন্ধ করার কোন যুক্তি নেই।

শার্লোতে ওতিলেকে ইশারায় বাড়ি ফিরতে বলল। ওতিলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এডওয়ার্ড তাঁর হাত ধরে আটকাল। শার্লোতে আর কোন কথা না বলে চলে গেল। অতিথিরাও সকলে প্রাসাদে চলে গেল। অবশেষে এডওয়ার্ড দেখল জলের ধারে তারা মাত্র দুজনেই বসে আছে। এমন সময় তার সেই বিশ্বস্ত চাকর এসে জিজ্ঞাসা করল বাজী পোড়ানো শুরু হবে কিনা। এডওয়ার্ড বলল, নিশ্চয় হবে। শুরু করে দাও।

ওতিলে প্রাসাদে ফিরে যাবার জন্য অনুনয় বিনয় করছিল। কিন্তু এডওয়ার্ড বলল, না, তোমার এখন যাওয়া হবে না ওতিলে। তোমার জন্যই এত সব বাজী আমি আনিয়েছি। এ বাজীর আলোকোচ্ছ্বাস তোমাকে দেখতেই হবে। আমি তোমার পাশে বসে থাকব। আজ আমার কত আনন্দ! এইসব গাছ আমি যে বছর বসাই সেই বছরেই তোমার জন্ম হয়। তখনো ছিল এমনি এক দিন আর ঠিক এমনি আবহাওয়া।

বাজী পোড়ানো শুরু হলো। কোনটা কামানের গর্জন, কোনটা বজ্রের গর্জনের সঙ্গে আকাশে চকিত আলোর পশরা মেলে আকাশে উঠতে লাগল বাজীগুলো আর তা দেখে এডওয়ার্ডের গা ঘেঁষে আরো ঘন হয়ে উঠতে লাগল ওতিলে। সঙ্গে সঙ্গে এডওয়ার্ডও সেই রং মশালের আলোর উত্তাপ অনুভব করতে লাগল তার বুকের ভিতরে। তার চোখ মুখ এক গোপন আশার অদম্য উজ্জ্বলতায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল।

এদিকে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে শার্লোতে দেখল সার্জেনের চেষ্টায় ছেলেটির চৈতন্য ফিরে এসেছে। সে খুশি হলো। ক্যাপ্টেন নিরাপদে একটি জীবনকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছে। এতে খুশি হয়ে ধন্যবাদ দিল ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেনও একা পেয়ে তার যাবার কথাটা জানিয়ে দিল। বলল, পরদিন সকালেই সে চলে যাবে। তার উন্নতির সব কথা এবার প্রকাশ করল শার্লোতের কাছে। শার্লোতেও এটা জানত আগে থেকে। তাই কিছুমাত্র বিস্মিত বা ব্যথিত না হয়ে সে সহজভাবে অভিনন্দন জানাল ক্যাপ্টেনকে তার ভাগ্যোন্নতিতে।

পরে কথাটা এডওয়ার্ডকেও জানানো হলো। কিন্তু এডওয়ার্ডের সমস্ত মন জুড়ে তখনো জেগে ছিল শুধু উৎসবের রং আর ওতিলের চিন্তা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই ক্যাপ্টেন চলে গেল বাড়ি থেকে। যাবার সময় একটা চিঠিতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল এডওয়ার্ডের প্রতি। ক্যাপ্টেনের প্রতি এক গোপন আসক্তির প্রবলতা সত্ত্বেও তার স্বভাবসুলভ আত্মসংযমের দ্বারা অতি সহজেই বিচ্ছেদের সব ব্যথা দমন করে ফেলল শার্লোতে। সে জানত আর কোনদিন দেখা হবে না তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তবু কোনরূপ বিচলিত না হয়ে

বিদায় দিল আকাঙ্খিত প্রেমিককে।

শার্লোতে চাইছিল তার মত এই আত্মসংযম, এই মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় সকল প্রেমিকেরই দেওয়া উচিত। জীবনে যা শ্রেয় আর জীবনে যা প্রেয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে চলতে শেখা উচিত। এবার শার্লোতে ঠিক করে এডওয়ার্ডকে খোলাখুলি সব কথা বলে তাকে সাবধান করে দেবে। তাকে পরিস্কার বুঝিয়ে দেবে তার এই অবৈধ আত্মঘাতী প্রেমের খেলা কোথায় কোন অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছে তাকে।

এডওয়ার্ডকে একা এক জায়গায় বসিয়ে শার্লোতে তাকে বলল, ক্যাপ্টেন চলে গেছে। এবার ওতিলেরও যাবার ব্যবস্থা করা হোক। আমার মেয়েকে বোর্ডিং হাউস থেকে এনে তার জায়গায় ওতিলেকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আবার দুজনে দুজনের খুব কাছে আসতে পারব এডওয়ার্ড।

এডওয়ার্ড আমতা আমতা করে বলল, তুমি ওতিলেকে পাঠাতে চাও, ঠিক আছে পাঠাবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন। আরো কিছুদিন পরে পাঠালেই ত চলবে।

শার্লোতে বুঝতে পারল এডওয়ার্ডের এই কুণ্ঠার পিছনে ওতিলের প্রতি তার আসক্তির তীব্রতাই ফুটে বার হয়ে পড়ছে। প্রকট হয়ে পড়ছে এক নগ্ন নির্লজ্জতায়। শান্তভাবে শার্লোতে বলল, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না এডওয়ার্ড। এখন তোমার বোঝার সময় হয়েছে। এখনো সময় আছে। ওতিলেকে তুমি ভালবাস কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ভালবাসাকে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়। এবার সাবধান হও। নিজেকে সংযত করো।

এডওয়ার্ডকে চুপ করে থাকতে দেখে শার্লোতে বলল, একবার ভেবে দেখ এডওয়ার্ড, একবার তোমাকে হারিয়ে কত কষ্টে তোমাকে ফিরে পেয়েছি। আমার এই বহুকষ্টার্জিত সুখ, আমার স্বামীকে এভাবে আবার হারিয়ে যেতে দিও না। ওতিলে যদি এভাবে আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয় তাহলে সে কি জীবনে সুখী হবে ভেবেছ? কখনই নয়।

এডওয়ার্ড বলল, তুমি এই চরম কথাটা কেন ভাবছ এখন?

শার্লোতে শান্তভাবে বলল, মানুষের অসংযত উত্তাল প্রেমাবেগ সব সময় তাকে চরম অবস্থা, চরম ঘটনার দিকেই নিয়ে যায় এডওয়ার্ড। কোন শুভবুদ্ধির কথা সে শোনে না। তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি আগে হতে।

এডওয়ার্ড বলল, ঠিক আছে তুমি যা করতে চাও করো, আমি বাধা দেব না।

শার্লোতে দেখল এই স্বর্ণ সুযোগ। এডওয়ার্ডের মত যখন একবার হয়েছে তখন সব ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে পাকা করে নেওয়া উচিত। সেইমত সে ওতিলের যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলল।

এডওয়ার্ড তাকে আর কোন বাধা দিল না। শুধু একটা অনুরোধ করল। বলল, আমাকে দিন কতক বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে দাও। তাতে আমার মনটা ভাল হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শার্লোতে তাতে রাজী হয়ে তার যাবার ব্যবস্থা করে দিল। ঠিক হলো পরদিন অর্থাৎ একই দিনে দুজনেই বিদায় নেবে ঘর থেকে। এডওয়ার্ডের ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব নিজের হাতে গুছিয়ে দিল শার্লোতে।

যাবার সময় শার্লোতেকে একটা চিঠি লিখে খামের মধ্যে এঁটে রেখে গেল এডওয়ার্ড। লিখল যে বিপদের কবলে আমরা পড়েছি প্রিয়তমা তার থেকে উদ্ধার পাব কিনা জানি না। তবে আমার মনে হয় একটা কাজ করলে সব দিক রক্ষা পাবে। আমি এখন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। অবস্থা অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরব না। এ প্রাসাদের সব ভার এখন তোমার। তবে তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ বলতে পার। যে কারণে ওতিলেকে দূরে পাঠাতে চাইছিলে তার কারণ যখন দূরীভূত তখন তুমি এবার হতে তাকে নিশ্চিন্তে প্রাসাদের মধ্যেই রাখবে। আমি চাই না সে অন্য কোথাও অন্য কোন পরিবেশে গিয়ে থাক। সে বরং তোমার কাছে তোমার স্নেহচ্ছায়ায় থাক। তাতে আমি সুখী হব। আশা করি, তুমি তাকে যথারীতি স্নেহদানে ধন্য করবে। তার প্রতি যত্ন নেবে। আমার প্রেম, আমার ইচ্ছা বা কামনা বাসনা ও আমার দুঃখের প্রতি তোমার যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহলে আমার এ অনুরোধ তুমি রক্ষা করবে। বলা যায় না তাহলে হয়ত একদিন আমার মনের সব ক্ষত সেরেও যেতে পারে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ওতিলে জানালা দিয়ে দেখতে পেল এডওয়ার্ড ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছে কোথায়। যেতে পারে, কিন্তু তার বড় বিস্ময় ও বেদনাবোধ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে আজ সকালে যাবার আগে সে একটা কথাও বলেনি তার সঙ্গে। একথা যতই ভাবতে লাগল ততই অশান্ত হয়ে উঠল তার মন।

শার্লোতে সব বুঝতে পেরে ওতিলেকে ঘর থেকে বাইরে বাগানে নিয়ে গেল বেড়াতে। একথা সেকথা বলে তার মনটা শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। দুপুরে খাবার সময় ওতিলে দেখল শার্লোতে নিজেই টেবিল সাজিয়ে দুজনের খাবার আনল। ক্যাপ্টেন ও এডওয়ার্ডের চলে যাবার পর বাড়িতে খাবার টেবিলে তারা মাত্র দুটি প্রাণী। ওতিলে ভাবল শার্লোতে যখন নিজেই একাজ করছে তখন তাকে এ বাড়ি থেকে নিশ্চয় অন্যত্র পাঠিয়ে দেবে সে। এ বাড়িতে আর তাকে থাকতে দেবে না।

খাবার সময় শার্লোতে ক্যাপ্টেনের কথাটা একবার তুলল। বলল, ক্যাপ্টেন অন্য জায়গায় আরো ভাল কাজ পেয়েছে। তার উন্নতি হয়েছে। এবার সে বিয়ে করবে। আপাততঃ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোন উপায় নেই। এদিকে ওতিলে শুধু ভাবতে লাগল এডওয়ার্ডের কথা। কোথায় গেল সে? তার থেকে এডওয়ার্ডকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যই কি শার্লোতে তাকে কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে? এডওয়ার্ড কি এখন মোটেই আসবে না।

হঠাৎ ওতিলে দেখল এডওয়ার্ডের খাস চাকর তার ঘোড়ার গাড়িটা নিয়ে ফিরে এসেছে। শার্লোতে তার কারণ জানতে চাওয়ায় চাকর বলল, তার মালিকের গোটাকতক ফেলে যাওয়া জিনিস নেবার জন্য সে এসেছে। শার্লোতে বলল যা দেওয়া হয়েছে তাতেই চলে যাবে। অন্য কিছুর দরকার হবে না। আসলে এডওয়ার্ড তার বিশ্বাসী খাস চাকরকে পাঠিয়েছিল ওতিলের সঙ্গে দেখা করে তাকে একটা কথা জানাবার জন্য। কিন্তু সর্বক্ষণ শার্লোতে উপস্থিত থাকায় সে কথা বলার কোন অবকাশ পেল না এডওয়ার্ডের খাস ভৃত্য।

ওতিলের অবরুদ্ধ দুঃখের আবেগ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। জীবনে আত্মসংযম কাকে বলে তা সে জানে না। আর তা না জানার জন্য সে আবেগ সংযত করা বা অবদমিত করে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। এমন সময় শার্লোতে তাকে একবার এক জায়গায় বসিয়ে কৌশলে নানারকম গল্পের

মাধ্যমে ধৈর্য ও সংযম শিক্ষা দিতে লাগল। ওতিলে মাঝখানে একবার বলল, আচ্ছা পিসী, মদ খেলে সব মানুষই কেমন যেন সংযম হারিয়ে ফেলে। যে মানুষ কম কথা বলে, যুক্তিবাদী, সৌজন্যপূর্ণ, সমদর্শী, আমি দেখেছি মদ খাওয়ার পর সে মানুষ কেমন পাল্টে যায় একেবারে। তার স্বাভাবিক বোধ, যুক্তি নীতি কোথায় উবে যায় সব।

শার্লোতে এ ব্যাপারে ওতিলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলো। সেও একবার ক্যাপ্টেনের বিয়ের কথাটা তুলল। তার ধারণা ছিল ক্যাপ্টেন বিয়ে করবে না জীবনে। এডওয়ার্ড একথা একদিন জোর দিয়ে বলেছিল তাকে। শার্লোতে ওতিলেকে এই কথাই বোঝাতে চাইল যে পুরুষমানুষরা সব সময় ধৈর্য ও সংযমসহকারে চলতে পারে না। তারা সব সময় তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মেনে চলে না। হয়ত এটা অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলও হতে পারে।

বাগানে, পথে ও পাহাড়ে যে সব উন্নতিমূলক কাজ হচ্ছিল তা যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগল শার্লোতে। বাড়ির সংসার খরচ আগের থেকে অনেক কমিয়ে দিয়ে অর্থ সঞ্চয় বাড়িয়ে দিল।

শার্লোতে দেখল বেশ কিছু কাজ হয়ে গেছে। যেমন লেকটা চওড়া হয়ে গেছে। তার চারপাশের পারগুলোও ঘাসে ঢাকা মনোরম বেড়াবার জায়গায় পরিণত হয়েছে। বাগানের পথটাও তৈরি হয়ে গেছে। আগের থেকে বেশ চওড়া হয়েছে। পাহাড়ের উপর গ্রীষ্মাবাসের কাজও মোটামুটি শেষ। তবে ওতিলে বাড়ির স্থপতির কাজের খুব একটা প্রশংসা করতে পারল না। এবার কাজের গতি শ্লথ করে দিল শার্লোতে ইচ্ছা করে। কারণ সে চায় এডওয়ার্ড বাড়ি ফিরে যেন কিছু কাজ নিজে করার সুযোগ পায়। গোড়ার দিকের কঠিন কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে গেলে শেষের কাজটুকু সম্পন্ন করা অনেক সহজ ও আনন্দদায়ক হবে তার পক্ষে।

তবে আর একটা বড় কাজ করল শার্লোতে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের উন্নতির জন্য সে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য গড়ে তোলা পার্ক ও গ্রাম কিকরে পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় তাও শেখাল। গ্রামের একদল ছেলেকে এক রঙের পোষাক করিয়ে দিল। তা পরে তারা পার্ক ও গ্রামের পথঘাট সব নিজেরা পরিষ্কার করবে। গাঁয়ের মেয়েদের সেলাই বোনা ও সুতো কাটার কাজ শিখিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিল শার্লোতে। তাকে এ ব্যাপারে ওতিলেও সাহায্য করল অনেকখানি। একাজ

করতে গিয়ে ওতিলে ন্যান্সি নামে গাঁয়ের একটি ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। মেয়েটি এরপর থেকে তার কাছে কাছেই থাকত সব সময়। ওতিলে আর একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলল। সে হলো বাগানের মালী। এর একটা কারণ ছিল, মালী কথায় কথায় শুধু এডওয়ার্ডের নাম করত। সে কখন ফিরবে জিজ্ঞাসা করত ওতিলেকে। ওতিলেরও ত শুধু এক চিন্তা এডওয়ার্ডকে কেন্দ্র করেই দিনরাত আবর্তিত হয়। সব কাজের মধ্যে সব বস্তুর মধ্যে সে শুধু এডওয়ার্ডকেই দেখে। এডওয়ার্ড কি ভালবাসত না বাসত, সে কখন ফিরে কোন কাজটাকে পছন্দ করবে না করবে সে শুধু তাই ভাবত। আর তার সেই নীরব নিরুচ্চার ভাবনাটাকেই বাইরে প্রকাশ করে দিত বাগানের মালী।

ক্যাপ্টেন চলে যাওয়ার পর শার্লোতে যদি ওতিলেকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারত তাহলে তারা আগের মতই নির্বিঘ্ন নিরাপদ দাম্পত্য জীবন সুখে শান্তিতে কাটাতে পারত। অবশ্য তাহলে ওতিলে সব কিছু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেত। কিন্তু ওতিলে ত আজও নিঃস্ব এবং রিক্ত হয়ে গেছে মনে প্রাণে। আজ তার মনের বায়বীয় শূন্যতা এতদূর বেড়ে গেছে যে তার চাপ তার স্বাভাবিক সংযমের বাঁধটাকে কাটিয়ে দিতে চাইছে এক ভয়ঙ্কর প্রবলতায়। সারা দিন এটা সেটা কাজ করে ভুলে থাকার চেষ্টা করে ওতিলে। কিন্তু রাত্রিতে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই তীব্রতর হয়ে ওঠে তার শূন্য অন্তরের জ্বালা আর অশান্ত বেদনাবোধ। সে তখন সিন্দুক খুলে তার জন্মদিনে এডওয়ার্ডের দেওয়া উপহারগুলো বার করে দেখে সে জ্বালার কিছুটা মেটাবার চেষ্টা করে। সে উপহারের কিছুই সে ব্যবহার করেনি আজও।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে এডওয়ার্ডদের বাড়ির মনকষাকষির কথাটা মিটলারের কানে গিয়ে উঠল। অবশ্য এই মনকষাকষির ব্যাপারে নীরব নিঃশব্দ এই দাম্পত্য কলহের অবসানের জন্য কেউ তার সাহায্য চায়নি। তবু মিটলার ভাবল পরিবারের পুরনো বন্ধু হিসাবে তার একটা কর্তব্য আছে। তাই মিটলার একদিন নিজেই এডওয়ার্ডের নূতন ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে চলে গেল।

বর্তমানে এডওয়ার্ড যেখানে থাকে সে জায়গাটা বড় মনোরম। জায়গা

মানে প্রকৃতির লীলাভূমির মাঝে এক খামারবাড়ি। সাজানো বাগান দিয়ে ঘেরা। ঢালু উপত্যকাসংলগ্ন এক প্রান্তরের মাঝখানে শান্তভাবে বয়ে চলেছে এক নদীর স্রোত। কাছেই পাহাড়। গ্রামগুলো ছাড়া ছাড়া, একটু দূরে দূরে।

মিটলারের কথা মাঝে মাঝে ভাবত এডওয়ার্ড। তাই তাকে দূর থেকে আসতে দেখে খুশি হল। মনে মনে ঠিক করে ফেলল যদি তাকে শার্লোতে পাঠায় তাহলে তার কথাগুলোকে এড়িয়ে যাবে আজে বাজে উত্তর দিয়ে। আর যদি ওত্তিলে পাঠায় তাহলে সব কথা মন দিয়ে শুনবে। এডওয়ার্ডের ইচ্ছা এই মনোরম পরিবেশে সে একদিন ওত্তিলেকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করবে। আর তা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তাহলে সে এই খামারবাড়ি তাকে দান করে যাবে যাতে অন্য কাউকে বিয়ে করে ভবিষ্যতে এখানেই বসবাস করতে পারে ওত্তিলে।

মিটলার প্রথমে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে কিছুই জানে না। এডওয়ার্ড যখন জানতে পারল মিটলার নিজের থেকে এসেছে, সে তাদের বাড়ির কোন খবর জানে না বা কেউ তাকে পাঠায়নি তখন কিছুটা রেগে গেল মনে মনে। মিটলার তাকে এই নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের জন্য বন্ধুভাবে তিরস্কার করল। তখন এডওয়ার্ডও কোন লুকোচুরি না করে তার মনের আসল ভাব আসল আবেগের কথা বলে ফেলল অকুণ্ঠভাবে। সে বলল, আমি এখানে একা একা আছি বটে কিন্তু আসলে আমি সব সময় মনে মনে যুক্ত আছি, মিলিত আছি ওত্তিলের সঙ্গে। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি শার্লোতেকে আমি তার কাছে যাব না। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলতে চাই। তবু আমি চিঠি লিখি তাকে মাঝে মাঝে। কিন্তু সে তার উত্তর দেয় না। তবে কি শার্লোতে নিষ্ঠুরভাবে তার কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে যার জন্য সে আমাকে কোন চিঠি লেখে না বা কোন খবর দেয় না? তবে ওত্তিলে যদি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালবাসে তাহলে কেন তবে সে সব বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে এসে ধরা দিচ্ছে না আমার বাহুপাশে? আমার মনে হয় সে তা পারে। রাত্রিতে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরের স্বল্প আলোয় ওত্তিলের মূর্তি দেখি আমি। অবশ্য আমার স্বপ্নে দেখা তার মূর্তিই হয়ত ছায়ামূর্তি পরিগ্রহ করে আলোআঁধারি নৈশ পরিবেশে। আগে যখন আমরা এক বাড়িতে থাকতাম, রোজ দেখা হোত আমাদের সঙ্গে তখন রাত্রিতে স্বপ্নে কখনো দেখতাম না তাকে। কিন্তু

আজকাল প্রায়ই তাকে স্বপ্নে দেখি। তার রূপ আরো উজ্জ্বল, আরো সুন্দর হয়ে ওঠে স্বপ্নের মাঝে। স্বপ্ন শেষে তার সেই মূর্তি মিলিয়ে যায়। আমি প্রতারিত হই ঠিক। কিন্তু এ প্রতারণা বড় মধুর লাগে। বড় ভাল লাগে।

এডওয়ার্ডের কথা শুনে মিটলার হাসছিল। তার মুখে মৃদু হাসি দেখে এডওয়ার্ড রেগে গেল, তুমি হাসছ? তুমি আমাকে বোকা ভাবতে পার, কিন্তু আমি আমার এই প্রেমাসক্তিতে মোটেই লজ্জিত নই। আমার কেবলি মনে হচ্ছে জীবনে আজ আমি প্রথম ভালবাসছি। আগে প্রথম যৌবনে ভালবাসার ব্যাপারটা আমার কাছে ছিল একটা খেলার মত। আমোদপ্রমোদের একটা উপকরণ মাত্র। আগে আমি ভালবাসা কি তা বুঝিনি। আজ এমন কেউ নেই যে আমাকে এই ভালবাসার ব্যাপারে হার মানাতে পারবে।

জানি আমার এই ভালবাসা অবৈধ, হয়ত অপরাধ। তবু এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক অনুভূতি যা আমি কোন কিছুর বিনিময়ে ত্যাগ করতে পারব না।

এই কথা বলতে বলতে আবেগের প্রবলতাটাকে সংযত করতে না পেরে শিশুর মত কেঁদে ফেলল এডওয়ার্ড।

আবেগ বা ভাবালুতাহীন বাস্তববাদী মিটলার এবার তার তীক্ষ্ণ যুক্তির হাতিয়ার প্রয়োগ না করে পারল না। কারণ সে যে জন্য এখানে এসেছে সেই মূল উদ্দেশ্য হতেই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে ক্রমশঃ। এডওয়ার্ড তার ভাবালুতার দ্বারা তার কঠিন যুক্তি ও নীতিবোধকে বিগলিত করে দেবার চেষ্টা করছে। তাই সে গম্ভীরভাবে এডওয়ার্ডকে বলল, যারা মহান ব্যক্তি তারা বিপদে কখনো আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দেয় না। তারা অবিচল ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সব বিপদের মাঝে। সব বেদনাকে দুঃখকে তারা বৃত্তের মাঝে কঠোরভাবে চেপে রাখে, বাইরে প্রকাশ করে না।

এডওয়ার্ড কিন্তু মোটেই শান্ত হলো না এ কথায়। বলল, যারা দুঃখে পড়ে নি, যারা সুখে শান্তিতে বাস করছে তারা বিপন্ন বিব্রত মানুষকে ধৈর্য ধারণ করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু জানে না আসলে তা কত কঠিন। প্রাচীনকালে বড় বড় গ্রীকবীরেরাও দুঃখের সময় কেঁদে ফেলতেন। অশ্রুর মাধ্যমে সহজভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর দুঃখ বা শোকের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। এই জন্যই বলে, যারা সহজে কাঁদে না তারা ভাল মানুষ নয়। সেই সব কঠিন হৃদয় মানুষ দুঃখে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, বীর গ্যাব্রিয়েটারের মত সকলের সামনে বীরত্ব সহকারে মরতে পারে, কিন্তু তারা মানুষ হিসাবে মোটেই ভাল নয়। তাই বলি

বন্ধু, তুমি আমার বাগানটা বরং ঘুরে দেখে এখন চলে যাও। পরে আমি যখন ধৈর্য ধারণ করতে পারব তখন এ বিষয়ে কথা হবে আবার।

একথা বলার পর আর থাকা চলে না। মিটলার চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু এডওয়ার্ডই তাকে বসাল। তার কথাটা টেনে নিয়ে আবার বলল, কোন কথা মনে চেপে রেখে অথবা কারো কাছে প্রকাশ করে কোন লাভ হয় না। কাজের কথা ভাবতে হয়। আমিও আমার করণীয় কি তা ভেবে রেখেছি। আমি ওতিলেকে পেতে চাই। তুমি আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করো। শার্লোতের কাছে গিয়ে তাব সম্মতি আদায় করো এ বিষয়ে। এইভাবে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ করো। আমাদের সুখী করো।

মিটলার কোন কথা বলতে পারল না। এডওয়ার্ড বলে চলল, আমার ও ওতিলের ভাগ্য এক হয়ে জড়িয়ে পড়েছে। নিয়তির কোন বিধান অথবা কোন প্রতিকূল অবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না আমাদের সম্পর্ককে।

মিটলার আপন মনে চিৎকার করে উঠল, হা ভগবান! এ আমি কি শুনছি। ভাগ্যে বিশ্বাস একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে বিপদ আরো ঘোরাল হয়ে ওঠে।

এডওয়ার্ড শান্তভাবে বলল, মানুষের কোন বিপন্ন অন্তর যখন কোন পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখাবার কেউ থাকে না তখন তাকে অনুকূল গ্রহনক্ষত্রের প্রত্যাশায় থাকতে দাও।

মিটলার বলল, নিয়তির উপর বিশ্বাসের মধ্যে যদি একটা সংগতি থাকত তাহলে আমি সে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব অনুকূল হলেই তাতে বিশ্বাস করে আর প্রতিকূল হলেই তাতে অবিশ্বাস করে, এই জন্যই আমি এসব বিশ্বাস করি না।

মিটলার দেখল এ অবস্থায় আপাততঃ কিছু করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই সে এডওয়ার্ডের অনুরোধটা রক্ষা করার জন্য শার্লোতের কাছে যেতে সম্মত হলো। বিবাহবিচ্ছেদের কথাটা না তুলুক তার কাছে গেলে অন্ততঃ ওদের মনের ভাবটা বোঝা যাবে। তাতে ওর কাজের সুবিধা হবে।

শার্লোতের কাছে মিটলার গিয়ে দেখল, আগের মতই আত্মস্থ আছে শার্লোতে। তার স্বভাবসুলভ আত্মসংযম বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ বা বিচলিত হয়নি। মিটলারের কাছ থেকে সব কথা শুনে শার্লোতে বলল, আমি আশা করি, বিশ্বাস

করি ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে। এডওয়ার্ড আবার ফিরে আসবে আমার কাছে।

শার্লোতের এই দুর্মর আশার কথা শুনে খুশি হলো মিটলার। সে বলল, এই দৃঢ় প্রত্যাশা হাজার কথা বা পরামর্শের থেকেও বড়। আমিও তাই বিশ্বাস করি, এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই জীবনে আমি অনেক বিবাহ সংঘটিত করেছি, অনেক ঝগড়া মিটিয়ে দিয়েছি, অনেক বিচ্ছিন্নপ্রায় দাম্পত্য সম্পর্ককে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি।

শার্লোতে মিটলারের হাত দিয়ে এডওয়ার্ডকে একটা চিঠি দিতে চাইল। কিন্তু মিটলার বলল, এ চিঠি অন্য কোন পত্রবাহককে দিয়ে পাঠাতে পার। এটা আমার কাজ নয়। আমি যাচ্ছি। আবার আসব সুখবর নিয়ে।

শার্লোতের পত্রবাহক যথাসময়ে এসে এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করল। ভয়ে ভয়ে চিঠি খুলে দেখল এডওয়ার্ড। শার্লোতে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের অতীত মিলনের কথা। সেই সব নিবিড়তম মিলনের কথা যখন এডওয়ার্ড তাকে পরম আগ্রহভরে প্রেমের নায়ক হিসাবে জড়িয়ে ধরত অতীতে।

এসব অতীতের কথা পড়তে কিছুটা ভাল লাগল এডওয়ার্ডের। দুঃখের সময় অতীতচারণা মনের শূন্যতাকে কিছুটা ভরিয়ে দেয়। এডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে যত কষ্টই হোক তার সে আর প্রাসাদে যাবে না। তার প্রিয়-জনের দুঃখের বা চিন্তার কারণ হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ক্যাপ্টেন যাবার আগে বাড়ি নির্মাণের জন্য একজন স্থপতি নিয়োগ করেছিল। বয়সে যুবক হলেও স্থপতি সুদক্ষ এবং সে ছবি আঁকতেও পারে। বলিষ্ঠ লম্বা চেহারা। বলিষ্ঠ অথচ ছিপছিপে। বিভিন্ন জায়গায় যে সব কাজকর্ম চলছিল স্থপতিই তার দেখাশোনা করত। বিভিন্ন কাজের জন্য প্রায়ই বাড়ির ভিতরে আসতে হত তাকে। মাঝে মাঝে সে শার্লোতে ও ওতিলের সঙ্গে কথাবার্তায় যোগদান করত। এক একদিন সন্ধ্যেবেলায় সে তাদের সঙ্গে গল্পগুজবও করত।

একদিন এক স্থানীয় আইনজীবী এসে দেখা করল শার্লোতের সঙ্গে। জনৈক স্থানীয় জমিদার তাকে পাঠিয়েছে। উকীলটিও বয়সে যুবক, বিশেষ উৎসাহের

সঙ্গে তার বক্তব্য তুলে ধরল। তার বক্তব্য হলো চার্চে যাবার পথের দুধারের যে সব পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মৃতিফলকগুলি ভেঙ্গে চার্চের ভিতর এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছে সেগুলির পুনর্বিন্যাস করতে হবে। চার্চে যাবার পথটা খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় সে পথকে চওড়া করার জন্য এ কাজ করতে হয়েছে।

শার্লোতে উকীলের কথা শুনে বলল, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। মৃত্যুর পর সব মানুষ এক সঙ্গে উঁচু নীচু নির্বিশেষে মিশিয়ে যাবে মাটিতে, কারো কোন নাম সে মাটির উপর স্মারক হিসাবে থাকবে না এইটাই স্বাভাবিক। আপনার বক্তব্যের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। আপনি বলতে চান মৃত্যুর পর সে কোথায় শুয়ে আছে, সেইটা জানাবার জন্য স্মৃতিফলকের দরকার আছে। এটা কিন্তু নিছক ভাবালুতার কথা।

স্থপতি বলল, আমরা একটা কাজ করতে পারি। আমরা যাদের স্মৃতি ফলক আছে তাদের একটা করে ছবি এঁকে চার্চের একটা ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখতে পারি। এতে সব দিক বজায় থাকবে। ছবির মত অল্প জায়গায় আরো ভাল ভাবে বেঁচে থাকতে পারবে মৃতেরা।

শার্লোতের এতে কোন অমত নেই। পরদিন ওরা চার্চে গিয়ে দেখল চার্চের গায়ে এক জায়গায় খানিকটা জায়গা খালি পড়ে রয়েছে। সেখানে একটা ঘর করা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। সেই ঘরে ছবিগুলো রাখা হবে। কিভাবে ছবিগুলো আঁকা হবে অতীত পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে তার নিদর্শন দেখাল স্থপতি। এজন্য রোজ সন্ধ্যেবেলায় সে নূতন নূতন ডিজাইন নিয়ে দেখাতে আসত শার্লোতে ও ওতিলেকে।

চ্যাপেলের ঘরটার নির্মাণকার্য তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসতে লাগল। এই ঘরের চারদিকের দেয়ালে স্থপতি স্বর্গের আকাশনীল পটভূমিকায় দেবদূতদের বর্ণাঢ্য ছবি আঁকবে। ঘরখানির সৌন্দর্য তাতে অনেক বেড়ে যাবে। কাজ শেষ করে স্থপতি একদিন শার্লোতেও ওতিলেকে বলল, আপনারা সাত দিন ওখানে যাবেন না। তারপর যাবেন।

এর আগে কাজের সময় ওতিলে রোজ গিয়ে স্থপতির ছবি আঁকার কাজ দেখত। তাকে পরামর্শ দিত বিভিন্ন বিষয়ে। ছবির প্রতি ওতিলের আগ্রহ দেখে বিশেষ আশ্বস্ত হলো শার্লোতে। এডওয়ার্ডের চিন্তা থেকে তার মনটা যত মুক্ত হয় ততই ভাল তার পক্ষে।

ওতিলেকে একা প্রথমে পাঠিয়ে দিল শার্লোতে। বলল, তুমি গিয়ে আগে

দেখে এস। তারপর আমি যাব।

ওতিলে গিয়ে সত্যিই মুগ্ধ হলো স্থপতির কাজ দেখে।

শার্লোতের চিঠির জবাব যথাসময়েই দিয়েছিল এডওয়ার্ড। কিন্তু তারপর অনেকদিন আর কোন খবর পায়নি তার। তারপর একদিন খবরের কাগজে শার্লোতে এডওয়ার্ডের নাম দেখল। জানল এডওয়ার্ড যুদ্ধে যোগদান করেছে।

কথাটা জেনে মোটেই আশ্বস্ত হতে পারল না শার্লোতে। কারণ তার কেবলি মনে হতে লাগল যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আরো ভোগবাদী ও জেদী হয়ে উঠবে এডওয়ার্ড। তখন সে তার কামনার বস্তুকে ছেড়ে দেবার মত কোন উদারতাই দেখাতে পারবে না।

এদিকে এডওয়ার্ডের যুদ্ধে যোগদানের খবরটা শুনে রীতিমত দুঃখ পেল ওতিলে। স্থপতির আঁকা চিত্রশিল্পের উপর তার নবজাগ্রত আগ্রহ ও অনুরাগ সত্ত্বেও এডওয়ার্ডের অভাবটা নূতন করে অনুভব করল সে।

তবু বাড়িতে একা একা থেকে এই বিচ্ছেদের সব ব্যথা বেদনাকে সহ্য করে যাচ্ছিল ওতিলে। নির্জনতা যেমন কোন ব্যথাকে লালন করে তেমনি তার ক্ষতের উপর শান্ত প্রলেপের কাজও করে। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনার আঘাতে ওতিলের সব নির্জনতা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

শার্লোতের মেয়ে লুসিয়ানে বোর্ডিং স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় সঙ্গে অনেক লোকজন আনছে। বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন আসছে। একটি ধনী সম্রান্ত ঘরের ছেলে, যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক সে লুসিয়ানেকে বিয়ে করতে চায়। সেও তার আত্মীয়স্বজন নিয়ে একই সঙ্গে আসছে।

সুতরাং বাড়িতে একসঙ্গে অনেকগুলি অতিথি ও আত্মীয় এসে হাজির হলো। ওতিলের অস্বস্তি তাতে বেড়ে গেল অনেক। বাড়ির ঝি চাকরেরা অতিথিদের দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ভীষণভাবে।

লুসিয়ানে বড় চঞ্চল প্রকৃতির। সে একবারও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। অথচ যে ছেলেটি তাকে বিয়ে করতে চায় সে তার থেকে শান্ত। সে এসেছে শান্ত পরিবেশে তার ভাবী শাশুড়ীর সঙ্গে পরিচিত হতে। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে বিয়ের আগেই।

লুসিয়ানে সবচেয়ে আনন্দ পায় ঘোড়ায় চড়ে। তার ভাবী স্বামীর অনেক ভাল ভাল ঘোড়া আছে। সে তাই যখন তখন যে কোন দিন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যায়। ঝড় বৃষ্টি রোদ বা ভালমন্দ আবহাওয়ার কোন বাছবিচার করে না।

লুসিয়ানে বড় হঠকারী। যখন যেটা চাইবে তা তার চাই। যখন যেখানে যাবে বলবে যে কোন অবস্থাতেই সেখানে চলে যাবে সে। যেখানে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া যায় না, সেখানে ঘোড়া থামিয়ে হেঁটে যাবে। অবস্থা বা পোষাক পরিচ্ছদের কথা সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। তার ফাই ফরমাশ খাটতে হিমসি খেয়ে যেতে লাগল বাড়ির ঝিরা।

লুসিয়ানেকে দেখে মনে হতে লাগল সে যেন বিরাট পুচ্ছবিশিষ্ট এক জলন্ত ধূমকেতু। সে যেখানেই যায় তার দলবলও যায় তার সঙ্গে। এদিকে শার্লোতেও এত বড় ঘরে ও ভাল বরে মেয়ের বিয়ে দেবার গৌরবে গৌরববোধ না করে পারল না। সে তাই তার ভাবী কুটুম্বদের যথাসাধ্য আপ্যায়িত করে তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে লাগল। শিকার, মাছধরা, বাগানের কাজকর্ম দেখা-শোনা করা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে তাদের প্রীত করার ব্যবস্থা হলো।

লুসিয়ানে ঘরের ভিতর বসে থাকতে ভালবাসে না। সে বেড়াতে যেতে ভালবাসে। শুধু প্রকৃতি ও জীবন্ত মানুষদের সে ভালবাসে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চায়। তাই স্থানীয় প্রতিবেশীদের বাড়ি শেষ করে দূর অঞ্চলে সে কখনো ঘোড়ায় চেপে, কখনো বা গাড়িতে করে সদলবলে বেড়াতে যেতে শুরু করল। ফলে যাদের বাড়ি যেতে লাগল তারাও প্রতিদানে বেড়াতে আসতে লাগল। এইভাবে বাড়িতে অতিথিদের আসা যাওয়ার ধূম পড়ে গেল।

ওতিলে কিন্তু কোথাও যায় না। সে সব সময় শার্লোতের পাশে থেকে ঘর সংসারের কাজে তাকে সাহায্য করে যায়।

লুসিয়ানের একটা ঝোঁক ছিল সমাজের অভিজাত লোকদের প্রতি। তার সঙ্গে যারা এসেছিল তারা সকলেই অভিজাত সামন্তশ্রেণীর। তাদের জন্মদিন পালন করে ও তাদের সম্মানার্থে নানা প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করে তাদের প্রীত করার চেষ্টা করছিল সে। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কোন পরামর্শ সে গ্রহণ করত না।

এমন সময় হঠাৎ একদিন স্থপতির উপর চোখ পড়ল খেয়ালী লুসিয়ানের। স্থপতির সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, কালো চুল, স্বচ্ছ দৃষ্টি, সপ্রতিভ চোখ মুখ এবং স্বল্পভাষিতা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। যা কিছু প্রশ্ন করা হয় স্থপতিকে সে চটপট তার চমৎকার উত্তর দেয়।

লুসিয়ানের অনেক অদ্ভুত খেয়ালের মধ্যে একটা হলো পোষাক বদলানো। দিনের মধ্যে সে চার বার পোষাক বদলায়। সে ভাল অভিনয় করতেও পারে।

বিভিন্ন ছদ্মবেশও ধারণ করতে পারে। মাঝে মাঝে কখনো জেলে বা চাষী মেয়ের পোষাক পরে লোককে অবাক করে দেয়। কখনো বা বৃদ্ধার পোষাক পরে। অথচ তাতে তার মুখের উজ্জ্বল তারুণ্য আরো ভালো করে ফুটে ওঠে।

লুসিয়ানের সাঙ্গপাঙ্গ ও ফাই ফরমাস খাটার লোকের অভাব ছিল না। সে যখন বাড়িতে গান করত বা অভিনয় করে অতিথিদের আনন্দ দিত তখন একটি যুবক তার সঙ্গে পিয়ানো বাজাত। সে ভালই বাজাতে পারত। কারণ সে লুসিয়ানের নাচ গান বা অভিনয়ের গতি প্রকৃতি ভালই জানত। হঠাৎ একদিন তাদের বাড়ির স্থপতি যে একজন গুণী শিল্পী তা আবিষ্কার করে বসল।

একদিন তার পিয়ানো বাদককে ডেকে শবযাত্রার করুণ সুর বাজাতে বলল আর নিজে এক বিধবা রাণীর বেশ ধারণ করে শবযাত্রার আগে আগে ধীর গতিতে যাবার ভূমিকাটা সুন্দরভাবে দেখাল। তাকে ঠিক বিধবা রাণীর মতই মানাচ্ছিল।

হঠাৎ লুসিয়ানে তার এক সঙ্গীকে স্থপতিকে ডেকে আনার কথা বলল। বাড়ির সবাই তার অভিনয় দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল। শুধু স্থপতি আসেনি।

স্থপতি আসার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ানে তার সামনের এক ব্ল্যাকবোর্ডে একটা সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভের ছবি আঁকার জন্য অনুরোধ করল। প্রথমে বেশ কিছুটা কুণ্ঠা-বোধ করছিল স্থপতি। পরে তার অনুরোধ আর জেদের বশবর্তী হয়ে সে ঘরের মাঝখানে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কতকগুলো রেখার আঁচড় কাটতে কাটতে একটা সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ এঁকে ফেলল। সবাই তা দেখে প্রশংসা করতে লাগল।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত দর্শকদের সপ্রশংস মুগ্ধ দৃষ্টি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল দেখতে লাগল বিধবা রাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণা লুসিয়ানেকে আর একদল দেখতে লাগল কৃতিশিল্পী স্থপতিকে।

অনুষ্ঠান শেষে লুসিয়ানের প্রেমিক ও ভাবী স্বামী ব্যারণ যুবকটি আলাপ করল স্থপতির সঙ্গে। বলল, আপনি তাড়াতাড়ি এঁকেছেন, তবু আপনার হাত ভাল। আমি আপনার এই ছবি একটা রেখে দেব। আপনি আমাকে এঁকে দেবেন।

স্থপতি বলল, আমার আরো ছবি আছে যেগুলো যত্ন করে আঁকা।

ওতিলেও পাশে দাঁড়িয়েছিল। ওতিলে বলল, হ্যাঁ উনি চার্চের নতুন বাড়িতে সব ছবি ও সাজসজ্জার কাজ করেছেন।

ওদের কথার মধ্যে হঠাৎ লুসিয়ানে এসে হাজির হলো।

লুসিয়ানে হুকুম করল স্থপতিকে, তোমার যত ভাল ছবি আছে সব এখনি নিয়ে এসে দেখাও।

স্থপতি বলল, এখন না, অন্য সময়ে দেখাব।

লুসিয়ানে বলল, কোন কথা নয়, রাণীর হুকুম।

ওতিলে ফিসফিস করে স্থপতিকে বলল, ঠিক আছে তাই নিয়ে এস।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল স্থপতি। তবে কিছু ছবি আনল না।

এদিকে লুসিয়ানের মাথায় হঠাৎ একটা খেয়াল এসে জুটল। তার নাকি একটা পোষা বাঁদর আছে। সেটা তার চাকর কুঁড়েমি করে আনেনি। সে তার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, একটা লোক পাঠিয়ে বাঁদরটাকে আনাও। ওর একটা ছবি আঁকিয়ে নেব স্থপতিকে দিয়ে। শার্লোতে লাইব্রেরী ঘর থেকে নানারকম বাঁদরের ছবির একটা বই আনিয়ে দিল লুসিয়ানেকে। লুসিয়ানে আপাততঃ শান্ত হয়ে তাই পরপর আনন্দের সঙ্গে দেখতে লাগল। এদিকে নৈশভোজনের ডাক পড়তে সব চাপা পড়ে গেল।

দিনের শেষে ডায়েরী লেখার একটা বাতিক হয়েছে ওতিলের। এ বাতিক আগে ছিল না। এডওয়ার্ড যাবার পর এই বাতিকে তাকে পেয়েছে। এইদিন সে তার ডায়েরীতে লিখল :

আমরা ভবিষ্যতের পানে তাকাই, কারণ আমরা ভেবে থাকি ইতস্ততঃ প্রবহমান ঘটনাস্রোতগুলি এদিকে সেদিকে বইতে বইতে আমাদের হয়ত বা উদ্দেশ্য পূরণের পথে নিয়ে যাবে একদিন। আমরা কোন সমাবেশে বা অনুষ্ঠানে যেতে ভালবাসি কারণ আমরা ভাবি এত লোকের মাঝে নিশ্চয় আমরা একজন বন্ধুকে পেয়ে যাব।

অপরের কাছে অন্তরের দ্বার মুক্ত করে দিতে সবাই পারে। এটা সহজ কাজ। কিন্তু অপরের আস্থা অর্জন করতে হলে শিক্ষাদীক্ষা ও মার্জিত রুচির দরকার হয়। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিবাদীরা প্রায় সবকিছুকেই তুচ্ছ ও হাস্যাস্পদ ভাবে। কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁরা কোন কিছুকেই তুচ্ছ ভাবে না। কোন এক বয়স্ক লোকের যুবতী মেয়েদের প্রতি বেশ একটা আগ্রহ ছিল। তা দেখে একজন সমালোচনা করে তার এই কাজের। তখন সে বলে, যুবতী মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের মাধ্যমে আমি আমার হারানো যৌবনকে ফিরে পেতে পারি আর এইটাই সবাই চায়। কোন প্রেম কখনো দোষের নয়। কিন্তু সেই

প্রেমাবেগ বা প্রেমাসক্তি যখন অতিমাত্রায় বেড়ে ওঠে তখনি তা হয় দোষ বা গুণের ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমাদের প্রেম হচ্ছে সেই আশ্চর্য ফোনিক্স পাখির মত। আমাদের এক প্রেমের বস্তু পুড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার ছাই থেকে আর একজন গজিয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

লুসিয়ানে আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যে সারা অঞ্চলে বেশ নাম করে ফেলল। মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট বা আসক্ত করার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল তার। আভিজাত্যবোধের কোন সীমারেখার দ্বারা কখনো নিয়ন্ত্রিত হত না লুসিয়ানে। ছোট বড় নির্বিশেষে যে কোন মানুষের সঙ্গে সে সহজভাবে যেচে কথা বলত। ভাল লেগে গেলে তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করত। আবার কাউকে কোন কারণে খারাপ লাগলে তাও মুখের উপর বলে দিত। অথবা টিপ্পনী কাটত তার উপর।

লুসিয়ানের একটা গুণ ছিল। সেটা হলো তার দানশীলতা। তার একজন সহচর বা সহচরীর হাতে সব সময় টাকার একটা থলে থাকত। যে কোন জায়গায় যে কোন মানুষকে কিছু দেবার ইচ্ছা জাগলেই তৎক্ষণাৎ হুকুম করত লুসিয়ানে এবং তার হুকুমমত সেই টাকা তাকে দিতে হত। কেউ কিছু তার কাছে চাইলে বড় একটা বিমুখ হত না। একদিন এক জায়গায় এক বৃদ্ধাকে শীতে কষ্ট পেতে দেখে একটা দামী শাল তার গায়ে নিজের হাতে জড়িয়ে দিল। সে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে তা দিল যে বৃদ্ধা কোন প্রতিবাদ করার অবকাশ পেল না। না চাইতে অযাচিতভাবে সে তা দিল।

একটি বাড়িতে এক যুবক যুদ্ধে গিয়ে একটি হাত হারায়। সে বড় ঘরের ছেলে। কিন্তু কোন জায়গায় বা ভোজ সভাতে গেলেই সবাই তার কাটা হাতটির কথা জিজ্ঞাসা করত বলে সে কোথাও যেত না। লজ্জাবোধ করত পাঁচজনের কাছে যেতে। সে তাই বিষণ্ন হয়ে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকত। জীবন ও জগতের প্রতি একে একে সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল সে। এমন সময় একদিন ঘটনাক্রমে তার কথা জানতে পেরে তার সঙ্গে আলাপ করল লুসিয়ানে। সে তাকে জোর করে একটি ভোজসভায় নিয়ে গেল। তাকে যত্ন করে পাশে

বসাল। নিজের হাতে তার খাবার ঠিক করে দিল যাতে খেতে কোন অস্থবিধা না হয়। ছেলেটি অবাক হয়ে গেল তার প্রতি লুসিয়ানের সদয় ব্যবহার দেখে। যাকে কেউ দেখতে পারে না, যে একরকম সকলের কাছে অবাঞ্ছিত তার প্রতি লুসিয়ানের আগ্রহ দেখে সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল। এমন কি তার প্রেমিক ও তার ভাবী স্বামীও এর জন্য কোনরূপ ঈর্ষাবোধ না করে খুশি হলো। এদিকে যুবকটিও নূতন করে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পেল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে যেতে শুরু করল।

কিন্তু লুসিয়ানের এত গুণের মাঝে একটা দোষ ছিল। তা হলো ওতিলের প্রতি অহেতুক বিরাগ। ওতিলের প্রতি তার এই মনোভাবের অবশ্য কারণ ছিল। সেটা তার স্বভাবগত। কারণ ওতিলের স্বভাবটা ছিল লুসিয়ানের ঠিক বিপরীত। লুসিয়ানে যতখানি বহির্মুখী ছিল ওতিলে ছিল ঠিক ততখানি অন্তর্মুখী। ওতিলে সব সময় ঘর সংসারের কাজকর্ম নিয়ে থাকত, কোথাও কোন অনুষ্ঠানে যেতে চাইত না দেখে ভীষণ রেগে যেত লুসিয়ানে। এজন্য সময়ে অসময়ে কথায় কথায় ওতিলেকে আঘাত দিতে ছাড়ত না লুসিয়ানে। স্থপতির প্রতি তার বিশেষ আগ্রহের কারণও ছিল ওতিলে। লুসিয়ানে বাড়িতে আসার পর থেকে লক্ষ্য করে স্থপতির প্রতি ওতিলের এক সশ্রদ্ধ আসক্তি আছে। স্থপতির কাজকর্মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ওতিলে। তাই ওতিলের কাছ থেকে কৌশলে স্থপতিকে সরিয়ে আনার জন্যই সে স্থপতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাতে থাকে ওতিলের সামনে।

কিন্তু লুসিয়ানে জানত ওতিলে স্থপতিকে পছন্দ করলেও ভালবাসত না। ওতিলে শুধু একজনকেই ভালবাসত। সে হলো এডওয়ার্ড। তার অন্তরের প্রেমের আসনটিতে তখনো ছিল এডওয়ার্ডেরই একাধিপত্য।

এদিকে লুসিয়ানের ভাবী স্বামী স্থপতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে উঠল। স্থপতি সম্বন্ধে ওতিলে যা যা জানত তা সব বলল তার কাছে। লুসিয়ানের ভাবী স্বামী ব্যারণ যুবকটির সহজাত এক শিল্পানুরাগ ছিল। স্থপতি নিজে একজন শিল্পী বলে তার সঙ্গে সহজেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল অল্পদিনের মধ্যে। বিশেষ করে ছবি সংগ্রহের ব্যাপারে কালানুক্রমিকতা সম্বন্ধে স্থপতির সঙ্গে আলোচনা করে অনেক কিছু জানতে পেরেছিল ব্যারণ। সে একবার লুসিয়ানের কাছে প্রস্তাবও করল যে তাদের বাড়ি সাজাবার জন্য স্থপতিকে একবার নিয়ে যাবে। লুসিয়ানেও খুশি হয়ে মত দিল তাতে।

ওতিলে একদিন কথায় কথায় ব্যারণকে জানাল তারা এতদিন জানত না স্থপতি চলে যাচ্ছে তাদের বাড়ি ছেড়ে। কারণ এখানে পরিকল্পনার কাজ আপাততঃ বন্ধ থাকবে। তাই শার্লোতে তার জন্য অন্য জায়গায় কাজের চেষ্টা করছিল।

দেখতে দেখতে দারুণ শীত পড়ে গেল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। পথ ঘাট কাদায় ভরে যায়। বাইরে বেরোন মুস্কিল হয়ে পড়ে। এমন সময় এ বাড়ির সবচেয়ে সম্মানিত অতিথি কাউন্ট ও কাউন্টপত্নী এসে হাজির হলেন হঠাৎ একদিন।

লুসিয়ানে কথায় কথায় জানতে পারল কাউন্ট নাচগান ভালবাসেন। একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে এক গানের আসরের অনুষ্ঠান করল লুসিয়ানে। সে গীটার সহযোগে গান করল। গীটারটা অন্য একজন বাজাল। কিন্তু কাউন্টের সে গান ভাল লাগল না। তখন আবৃত্তি করল লুসিয়ানে। কিন্তু তাতেও মুগ্ধ করতে পারল না বিশেষ কাউন্টকে।

অবশেষে কাউন্ট এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক অভিনয়ের জন্য পরামর্শ দিলেন তাদের। কাউন্ট লুসিয়ানেকে ডেকে বললেন, তোমাদের বাড়িতে কত রকমের লোক রয়েছে। তোমার নিজেরও বেশ অভিনয় প্রতিভা রয়েছে। একটা কাজ করো, ভ্যান ডাইকের এক বিখ্যাত ছবি আছে। সেই ছবিতে যতগুলি চরিত্র আছে সেই চরিত্রগুলি মুক অভিনয়ের দ্বারা জীবন্ত করে তুলতে পার। ছবিতে যে যেভাবে যে ভঙ্গিমায় অবস্থান করছে তোমরাও তাই করবে। ছবিতে চিত্রিত ভাব ভঙ্গিমাগুলো নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলবে তোমরা।

ছবিটি ভালভাবে দেখল ওরা। তারপর যার যা ভূমিকা সব বিতরণ করে দেওয়া হলো। ছবিতে আছে কোন এক মধ্যবয়সী অন্ধ রাজা সিংহাসনে বসে আছে। তার পিছনে রাণী দাঁড়িয়ে আছে। রাজার পাশে বাঁদিকে আছে তার সেনাপতি। এছাড়া আছে রাণীর কিছু সহচরী। রাণী এক টাকার থলে থেকে কিছু মুদ্রা এক ভিখিরীকে দান করতে যাচ্ছে আর এক বৃদ্ধা সহচরী তাকে তা করতে নিষেধ করছে। বলতে চাইছে অনেক দেওয়া হয়েছে। আর না। আর এক সহচরী রাণীর দেওয়া ভিক্ষা ভিখারীকে দান করছে। ভিখারীটি আছে কিছু দূরে এক ধারে।

একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন ব্যক্তি ওদের দলেই ছিল। তাকে দেওয়া হলো রাজার ভূমিকা। লুসিয়ানে হলো রাণী। স্থপতি অবতীর্ণ হলো রাজার পাশে

দণ্ডায়মান সেনাপতির ভূমিকায়। বাকী ভূমিকাগুলি ভাগ করে দেওয়া হলো অন্যদের।

স্থপতি কাউন্টের নির্দেশমত মঞ্চসজ্জা আর আলোকসম্পাতের দায়িত্ব নিল। অবশেষে একদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হলো। সকলের অভিনয়ই ভাল হলো। লুসিয়ানের সাজসজ্জা ও অভিনয় খুব ভাল হলো। তাকে রাণী হিসাবে বেশ মানিয়েছিল। স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতির লুসিয়ানে প্রায় সব সময়ই ছটফট করে। এই জন্য গান বা আবৃত্তিতে বিশেষ সার্থকতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু এই মূক অভিনয়ে যে স্থৈর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দেয় তা সত্যিই তার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। অভিনয় মূক হলেও লুসিয়ানের দয়া মায়া উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণ ও অন্তরবৃত্তিগুলি যেন এক নীরব ভাষা-ময়তায় সোচ্চার হয়ে ওঠে একসঙ্গে। তার অন্তরের সব সুষমা মূর্ত হয়ে ওঠে প্রায় তার সুসজ্জিত অঙ্গের মধ্যে। মুখের হাবভাবের মধ্যে।

কাউন্ট খুশি হয়ে আর এক জায়গায় এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান করার কথা বললেন। অভিনয় দেখে শুধু কাউন্ট নয়, উপস্থিত সকলেই খুশি। ছবির নির্জীব মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠল অভিনয়ের গুণে। অথচ, কারো মুখে কথা নেই। মানুষের নীরব অঙ্গভঙ্গি এমন সুন্দরভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে পারে না দেখলে তা বোঝা যায় না।

এবার ব্যারণ যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল তাদের দলবল নিয়ে। স্থপতিকে বলে দিল, নতুন বছর শুরু হলেই সে যেন ব্যারণের বাড়িতে চলে যায়।

ওতিলেকে কোন ভূমিকা দেওয়া হয়নি। হয়ত লুসিয়ানের কোন ইচ্ছা ছিল না এতে। অথচ ওতিলের আকর্ষণ তাদের দলের সবার চাইতে বেশী। লুসিয়ানের থেকেও বেশী। স্বভাবতঃই সে লুসিয়ানের থেকে স্থির ধীর বলে তার শান্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য আরো বেশী দেখায়।

ওদের অভিনয় আর পাঁচজন দর্শকের মত ওতিলেও দেখেছিল। আর পাঁচজনের মতই ওদের অভিনয়ের প্রশংসা করেছিল। তারপর রাত্রিতে শোবার আগে অন্য দিনকার মত ডায়েরী লিখেছিলো ওতিলে। আজকাল ওতিলে তার ডায়েরীতে নিজের কোন কথা বা দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা কিছু লেখে না। লেখে শুধু সাধারণভাবে মানবজীবন সম্পর্কে তার মনোভাব বা অভিজ্ঞতার কিছু কথা। সেদিন ওতিলে তার ডায়েরীতে লিখল :

কেউ যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখন তার চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানা

যায় না। তাকে বুঝতে হলে জানতে হলে তার কাছে আমাদের যেতে হবে।

একমাত্র শিল্পের মাধ্যমেই মানুষ যেমন জগৎটাকে এড়িয়ে চলতে পারে তেমনি শিল্পের মাধ্যমেই জগতের সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে। খুব বেশী সুখ বা দুঃখের মুহূর্তেই এই শিল্পীদের প্রয়োজন হবে আমাদের জীবনে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অবশেষে ওরা চলে গেল। সারা বাড়িটা জুড়ে কয়েক মাস ধরে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হৈ হুল্লোড়, নাচগান, লোকজনের ভিড় লেগেই থাকত। সে ঝড়ের প্রকোপটা সবচেয়ে বেশী সহ্য করতে হয়েছে বাড়ির গৃহিণী শার্লোতেকে। অবশ্য ওতিলেকেও খাটতে কম হয়নি। তবু সে শুধু খেটেই খালাস পেয়েছে, কোন চিন্তা ভাবনা করতে হয়নি। এতগুলি সম্মানীত অতিথিদের আদর আপ্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থা সব শার্লোতেকেই করতে হয়েছে।

তবে এই ঝড়ের প্রকোপে কিছুটা কষ্ট পেলেও একটা উপকার এর থেকে পেয়েছে শার্লোতে। সে লুসিয়ানাকে বুঝতে পেরেছে আগের থেকে আরো অনেক নিবিড়ভাবে। সে এখন বড় হয়েছে। তার পছন্দ অপছন্দ, খেয়াল খুশি, মনের গতিপ্রকৃতি এত কাছে থেকে এমন করে জানার দরকার ছিল তার।

শুধু লুসিয়ানে নয়, সে যাকে বিয়ে করতে চলেছে, যে হবে তার সারা জীবনের সঙ্গী তাকেও এই সুযোগে খুব ভাল করে জানতে পারল শার্লোতে। লুসিয়ানের বয়স কম। সে যে তার প্রথম প্রেমের নায়ক নির্বাচনে ভুল করেনি, তার নির্বাচন যে তার জীবনের পক্ষে এমন কিছু অশুভ হবে না এটা মা হিসাবে তার জানা দরকার ছিল। লুসিয়ানের ভাবী স্বামী ব্যারণ যুবকটিকে ভালই লাগল শার্লোতের। ধনী অভিজাত বংশের ছেলে। প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক। পড়াশুনো খুব একটা করেনি। তবু তার রুচিবোধ উন্নত ও মার্জিত। তার আচরণ ভদ্র ও সৌজন্যমূলক। সুতরাং তার উপর স্বচ্ছন্দে তার মেয়ের সব ভার সারা জীবনের জন্য ছেড়ে দিতে পারে শার্লোতে।

লুসিয়ানে চলে যাবার পর তার ব্যাপারে মনে একটা আঘাত পেল শার্লোতে। কোন এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পরোপকারের ঝোঁকে এমন এক

সব বাড়াবাড়ি করে গেছে যা সত্যিই লজ্জার ও দুঃখের কথা। স্থানীয় কোন এক অভিজাত পরিবারের একটি অল্পবয়সী মেয়ের মাথাটা কোন এক ঘটনার পর থেকে খারাপ হয়ে যায়। মেয়েটি বছর কতক আগে ঘটনাক্রমে তার ছোট ভাইএর মৃত্যুর কারণ হয়ে পড়ে। সেই থেকে তার একটা ধারণা জন্মায় সমাজের লোক তাকে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী করছে। অথচ এটা শুধু তার মনের ভয় মাত্র। এই কাল্পনিক ভয় তার এত বেড়ে গেল যে সে কোন সভা বা অনুষ্ঠানে যেত না। বাড়িতে অতিথিদের সামনেও বার হত না। একটা আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ সব সময় বসে থাকত মেয়েটি।

লুসিয়ানে সব কিছু শুনে বলে মেয়েটিকে সে ভাল করে তুলবে। স্বামী ও বিষাদগ্রস্ত মানুষদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারার এক বিরল কৃতিত্ব এর আগে দেখাতে পারায় লুসিয়ানের আত্মবিশ্বাস ক্রমে এক উগ্র আকার ধারণ করে। সে জেদ ধরে মেয়েটিকে সে ভাল করে তুলবেই। তার অপ্রকৃতিস্থ মন প্রকৃতিস্থ করে তুলবে। এই বলে একদিন লুসিয়ানে মেয়েটির ঘরে গিয়ে নানা ভাবে তার মন জয় করে ফেলে। মেয়েটি লুসিয়ানের কথায় ঘর থেকে বাইরে ভোজসভায় এসে হাজির হয়। এত তাড়াহুড়ো না করে লুসিয়ানে যদি মেয়েটিকে ধীরে ধীরে ভাল করে তোলার চেষ্টা করত, একবারে এত লোকের সঙ্গে বার না করে একে একে কিছু কিছু লোকের সামনে বার করে মেয়েটির মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করত তাহলে সে অবশ্যই সফল হত। তা না করে হঠাৎ সকলের সামনে মেয়েটিকে বার করে ভুল করল লুসিয়ানে। তাছাড়া সে ভোজসভায় লোকজনদের মেয়েটি সম্বন্ধে সব কথা বুঝিয়ে বলে সাবধান করে দেয় নি।

ফলে মেয়েটি ভোজসভায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তার পানে চাইতে লাগল কৌতূহলী হয়ে। অনেকে তার পানে সন্দেহজনকভাবে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। ফলে মেয়েটির সেই কাল্পনিক ভয়টি বাস্তবে পরিণত হলো। মেয়েটি হঠাৎ তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়ল। সে ছুটতে ছুটতে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল। এই সময় ওতিলেও সেখানে ছিল। সে লজ্জায় পড়ে যায় লুসিয়ানের কাণ্ড দেখে। ওতিলে অবশ্য তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সেবা করতে থাকে। কিন্তু সেই থেকে মেয়েটির অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে। তার বাড়ির লোকজন বিব্রত হয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা করতে থাকে। একথা শোনার পর মেয়ের

এই অশোভন আচরণে সত্যিই দুঃখিত হয় শার্লোতে।

এদিকে ওতিলেও সেদিন স্থপতির ব্যাপারে কিছুটা দুঃখিত হয়। একদিন লুসিয়ানে তার ছবিগুলো দেখতে চাইলে ওতিলে স্থপতিকে তা আনার জন্ম অনুরোধ করে। কিন্তু স্থপতি তা আনেনি।

ওরা সবাই চলে গেলে কথাটা একদিন তুলল ওতিলে। ও তখন ভেবেছিল ওরা সেই সময় তার ছবি দেখার ব্যাপারে ঠিকমত মনোযোগ দেবে না। তাই তখন আনেনি। যাই হোক, ওতিলে এতে অসন্তুষ্ট হয়েছে জেনে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল স্থপতি।

স্থপতি জানত তার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তবু তার ওতিলেকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। স্বল্পভাষিণী ওতিলের বিষাদগম্ভীর মুখ আর অচঞ্চল ব্যক্তিত্বের এমন একটা মোহপ্রসারী আবেদন আছে যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল স্থপতি। যাবার আগে সে একটা অনুষ্ঠান করে ওতিলের সঙ্গে তার সম্পর্কের একটি মুহূর্তকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে চাইল।

স্থপতি ঠিক করল সে ক্রীস্টমাস ঈভ বা খ্রীস্টের জন্মোৎসব নিয়ে এক মূক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করবে। ওতিলে হবে প্রসূতি মাতা, এক স্বাস্থ্যবান শিশু তার কোলে সদ্যজাত শিশুর মত শোভা পাবে আর তাদের চারপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু রাখাল বালক।

যথাসময়ে যবনিকা তুললে দেখা গেল শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে আর তাকে কোলে নিয়ে নিথর নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে ওতিলে। স্বয়ং ঈশ্বরের মাতারূপে সত্যিই মানিয়েছিল তাকে। স্থপতি আলোকসম্পাতের কাজ করছিল। ওতিলের মুখে ঠিক সেই সময়ে যে স্বর্গীয় সুষমা ফুটে উঠেছিল তা কোন চিত্রকর ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

ওতিলের অভিনয় দেখে শার্লোতে নিজেও মুগ্ধ হয়ে গেল। এই অভিনয় দেখে তার একটি অতৃপ্ত গোপন বাসনা খোঁচা দিতে লাগল তার মনকে। শার্লোতে আশা করেছিল তারও একটি শিশুপুত্র জন্মলাভ করবে। তার কন্যা-সন্তান আছে, কিন্তু পুত্র নেই। একটি শিশুপুত্র লাভে তার মাতৃত্ব সার্থক হবে। কিন্তু সে আশা হয়ত পূরণ হবে না তার।

এদিকে স্থপতি চলে গেলে তার জায়গায় প্রাসাদের বিভিন্ন কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য একজন নূতন লোক নিয়োগ করেছে শার্লোতে। লোকটি এক সহকারী বিদ্যালয় শিক্ষক। অনুষ্ঠানের দিনই লোকটি এসে হাজির হলো।

স্থপতিকে বিদায় দেবার সময় শার্লোতে ও ওতিলে দুজনে মিলে তাকে এক হাতে বোনা ওয়েস্টকোট উপহার দিল। এছাড়া আরো কিছু উপহার আগেই তারা দিয়েছিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

ওতিলে যে বোর্ডিং স্কুলে পড়ত, যেখান থেকে পড়তে পড়তে হঠাৎ চলে এসেছে তার পড়া শেষ না করেই, সেই স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষককে কিছু-দিনের জন্য এখানে বেড়াতে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল শার্লোতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিতে এখানে এসেছেন তিনি। তিনি আসাতে ওতিলে ও শার্লোতে দুজনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে বিশেষভাবে।

এই সহকারীর বয়স অল্প হলেও শিক্ষণকার্যের দক্ষতায় ও শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত বিজ্ঞতার দিক থেকে খুবই নির্ভরযোগ্য। ওতিলে তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত আগে থেকেই। যে বোর্ডিং স্কুলে সহকারী হিসাবে কাজ করত তার হেডমিসট্রেস তার যোগ্যতার জন্য তাকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর বয়স হয়েছিল। অথচ স্কুলটাকে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন এবং অতি যত্নসহকারে তা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হেডমিসট্রেসের তাই একান্ত ইচ্ছা, তিনি তাঁর এই সুযোগ্য সহকারীর উপর স্কুলের সব ভার অর্পণ করে অবসর গ্রহণ করবেন। তাঁর আরও একটা ইচ্ছা, তিনি ওতিলের মত রূপবতী মেয়ের সঙ্গে সহকারীর বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করে তুলবেন। এই বিয়ের ব্যাপারে শার্লোতের সম্মতির অভাব হবে না—একথা তিনি একরকম ধরেই নিয়েছিলেন।

স্থপতি চলে গেলে একদিন শার্লোতে গাঁয়ের সব ছেলেদের সহকারীর সামনে ডাকল। তাদের শৃঙ্খলাবোধ শেখাবার জন্য রোজ বাগানবাড়ির অফিসঘরে তাদের ডাকা হত। তাদের যে পোষাক বিলি করা হত তাই পরে তারা সার-বন্দীভাবে আসত। তারা গাঁয়ের পথঘাট ও পার্ক সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখত এবং সব সময় গাঁয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলত। ওতিলে ভার নিয়েছিল গাঁয়ের মেয়েদের সংঘবদ্ধ করে তাদের সূচীশিল্প ও কিছু কুটিরশিল্পের কাজ শেখাবার। ওতিলে সহকারীকে বলল, আমি কিন্তু এই সব মেয়েদের কোন পোষাক বিলি করি না। ওদের প্রত্যেকের পোষাক আলাদা।

সহকারী প্রতিটি ছেলেকে অল্প দুচার কথা করে বোঝাল। তারপর বলল, আমি তোমার এই কাজকে সমর্থন করি। স্কুলের ছেলেদের একই জাতীয় ও একই রঙের পোষাক পরার প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে তাদের সাম্যবোধ ও ঐক্যভাব জাগে। এক সামরিক শৃঙ্খলাবোধ ও আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে ওঠে তাদের মন। কিন্তু মেয়েদের তা প্রয়োজন হয় না। মেয়েরা সকলে এক কাজ করলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিচেতনা খুবই প্রখর। তারা কন্যারূপে স্ত্রীরূপে ও মাতারূপে যখন যেভাবেই থাকুক না কেন, যে কাজই করুক না, মনে মনে তারা একক ও স্বতন্ত্র রয়ে যায়। কোন নারীর সঙ্গে অন্য কোন নারীর সর্বতো-ভাবে কখনই মিল হয় না। এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রথম থেকে বিলুপ্ত করে না দিয়ে তার মধ্যে তাদের সার্থক হয়ে ওঠার সুযোগ ও শিক্ষা দিতে হবে।

সহকারী শার্লোতেকে বলল, ছেলেদের শিক্ষা দেবার সময় বেশী কথা না বলে তাদের থেকে কাজ আদায় করে নিতে হবে। তারা কিভাবে কতখানি কোন বিষয় বুঝতে পারল সেইটা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তবে এ বিষয়ে ওতিলের বুদ্ধিমত্তাকে স্বীকার না করে পারল না সে।

শার্লোতে এইটাই চাইছিল। তার বহু দিনের গোপন ইচ্ছাটা অনুকূল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছিল পূরণের পথে। এডওয়ার্ডের অনুপস্থিতির সুযোগে ওতিলের মনটাকে এডওয়ার্ডের কাছ থেকে ধীরে ধীরে অনেকখানি সরিয়ে আনতে পেরেছিল স্থপতি তার বিচিত্র শিল্পকর্ম ও শিল্প-প্রতিভার মাধ্যমে। এবার সেই মন স্থপতির অবর্তমানে দুর্বারবেগে আকৃষ্ট হলো সহকারীর দিকে।

তাই সহকারী একদিন কথায় কথায় ওতিলেকে বলল, তুমি বোর্ডিং স্কুলে ফিরে গিয়ে তোমার পড়াটা শেষ করে ফেল। তোমার সহজাত বুদ্ধিমত্তা আছে। তার সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই। অন্যের জন্য এটাকে অপূর্ণ রেখো না।

ওতিলে একবারও প্রতিবাদ করল না। শার্লোতে একথায় খুশি হলো। সে এটাই চাইছিল। এতে দুদিকই বজায় থাকবে। সে নিজে যদি ওতিলেকে জোর করে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিত তাহলে ওতিলে ও এডওয়ার্ড দুজনেই তার উপর রাগ করত, তাকে ভুল বুঝত। কিন্তু সহকারী নিজে এ প্রস্তাব করায় এবং ওতিলে তা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়ায় শার্লোতের কোন দায়িত্ব রইল না এ ব্যাপারে। অথচ শার্লোতের উদ্দেশ্যটাও এতেই সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ওতিলে

বোর্ডিং স্কুলে গিয়ে সহকারীর আরো ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবে। তার প্রতি আরো বেশী করে আসক্ত ও শ্রদ্ধাশীল হবে। আর তখন হেডমিস্ট্রেসের চেষ্টায় ওদের বিয়েটা সহজেই হয়ে যাবে। ওতিলে স্বেচ্ছায় কাউকে বিয়ে করলে এডওয়ার্ডের তাতে কিছুই বলার থাকবে না।

তখন এডওয়ার্ড বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসবে। ঘটনার আঘাতে ওতিলের প্রতি তার যত সব অবৈধ মোহ ও আসক্তি অপগত হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সে ফিরে আসবে শার্লোতের কাছে। সব বাধা বিপত্তির অবসানে তাদের পুরোন প্রেম মেঘমুক্ত চাঁদের মত আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আজও মুহূর্ত গণনা করছে শার্লোতে পরম আগ্রহে। আজো সে এডওয়ার্ডের পথ চেয়ে বসে আছে। তার বিশ্বাস এডওয়ার্ড একদিন তার ভুল বুঝতে পারবেই। সে তার কাছে ফিরে আসবেই। তাদের প্রথম প্রেম যখন একবার প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয় তখন এবারও নিশ্চয়ই জয়ী হবে।

অব্যবহিত পূর্বে যে ঘটনা ঘটে যায় তার কথা মনে রাখে না মানুষ। হয় বর্তমান জীবনের স্রোত তার ঘটনার মাঝে দুর্বার বেগে ঠেলে নিয়ে গিয়ে তাকে সে কথা মনে রাখতে দেয় না অথবা অতীতের মধ্যে তার মনটা ডুবে যায়।

প্রাসাদ থেকে বিদায় নিয়ে স্থপতির চলে যাওয়ার ঘটনা অথবা লুসিয়ানার এত সব দাপাদাপির ঘটনা কোনটাই বিশেষ করে রেখাপাত করতে পারল না শার্লোতে বা ওতিলের মনে। ওরা সে সব স্বচ্ছন্দে ভুলে গেল। সহজভাবে সহকারী ভদ্রলোকের উপর নজর দিল।

তাছাড়া মেয়েদের মনের প্রকৃতিটা অন্যরকম। বড় অদ্ভুত। সে প্রকৃতিতে আছে অদ্ভুত ভাবের লীলা। তাদের মনের গভীরে এক বিশেষ পুরুষের প্রতি গভীরতম আসক্তি এমনভাবে বাসা বেঁধে থাকে যা বাইরের সমাজসম্পর্কের কোন ঘাতপ্রতিঘাত বা কোন প্রতিকূল অবস্থা সে আসক্তিকে বিলুপ্ত বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রমে যে সব পুরুষরা তাদের বহুবার বহু নিবিড় সংস্পর্শে আসে, যাদের চিন্তা বা কর্ম এবং জীবনের গতি প্রকৃতি ভাল লাগে তাদের প্রতিও একেবারে উদাসীন বা অনাসক্ত থাকতে পারে না তারা।

সহকারী ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলে শার্লোতে ও ওতিলে দুজনেই প্রীত হল। তার স্বাধীন ও স্বচ্ছ চিন্তা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিচারবুদ্ধি আকর্ষণ

করল তাদের মনকে।

সেদিন সহকারী প্রাসাদের বাগানে সেই সব পুরনো আমলের গাছগুলি দেখছিল যা এডওয়ার্ডের বাবা একদিন বসিয়েছিল। এই সব গাছগুলির পানে আজ আর কেউ তাকায় না। আজকাল প্রাসাদের লোকেরা নূতন নূতন কায়দায় গাছ বসাতে ব্যস্ত।

হঠাৎ ঘুরতে ঘুরতে শার্লোতে সেদিকে গিয়ে পড়ায় তার সামনে অতীত ও বর্তমানের অপরিহার্য দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা তুলল সহকারী। এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধেই এতক্ষণ ভাবছিল সে।

সহকারী বলল, অতীত ও বর্তমানের চিরাচরিত দ্বন্দ্বটা পিতাপুত্রের জীবন ও ভাবধারার মাধ্যমে বোঝা যাবে ভালভাবে। কোন পুত্র যদি বর্তমানের সাধারণ জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে তাহলে তার পিতার ভাবধারার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধবেই। কারণ প্রায় পিতাই অতীতের ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান। তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতা, সঞ্চয়প্রবণতা ও রক্ষণশীলতার যত সব আতিশয্য এ কালের ছেলেরা সহ্য করতে পারে না। মানতে পারে না। তারা সেই কুটরিটাতে সব দরজা জানালা বন্ধ করে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখতে পারে না যে কুটরিটা আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধকার, রক্ষণশীলতায় শীতল এবং সঞ্চয়-প্রবণতায় একান্তভাবে সংকীর্ণ।

শার্লোতে বলল, ছেলেদেরও দোষ আছে। তারা তাদের পিতামাতার আরব্ধ কাজকর্মগুলোকে একেবারে নষ্ট না করে সেগুলোকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে পারে। সেগুলোকে সার্থক করে তুলতে পারে।

সহকারী বলল, যুগে যুগে মানুষের রুচি পাল্টে যায়। ভাবধারা বদলে যায়, আপনি যে বাগানবাড়ি ও তার পথঘাট কত যত্ন করে, পরিকল্পনা করে নির্মাণ করছেন আপনার পুত্র হয়ত তা আর ভালবাসবে না।

একথা শার্লোতের ভাল না লাগলেও 'তার পুত্রসন্তান' এই কথাটা শুনতে সত্যিই বড় ভাল লাগল তার। সেদিন 'খৃস্টের জন্মোৎসব' অভিনয় দেখতে গিয়ে ওতিলের কোলে একটি স্বাস্থ্যবান শিশুপুত্র দেখে ঐ বয়সের এক পুত্রলাভের বাসনা জাগে তার মনে। সেই বাসনাটাই যেন আরো তীব্র হয়ে উঠল সহ-কারীর কথায়। শার্লোতে হঠাৎ দেখল তার প্রসবকাল আসন্ন হয়ে এসেছে। তার প্রসব না হলে ওতিলেকে এখন ছাড়া চলবে না।

শার্লোতে উঠে পড়েছিল। সহকারী বলল, আসল কথা কি জানেন? সব

পিতার উচিত পুত্রদের নিয়ে সব ব্যাপারে যৌথ কারবার খুলে বসা। তাহলে কোন হাঙ্গামাই হবে না। সব ব্যাপারে পুত্রদের ডেকে তাদের মতামত চাইতে হয়। পরিকল্পনা খাড়া করার কথা বলতে নেই। নিজে সব দায়িত্ব নিতে নেই। তাহলে পুত্ররাও খুশি হয়ে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়। পিতার উপর অযথা দোষ দেয় না।

যথাসময়ে নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল শার্লোতে। যে সব মেয়েরা প্রসবের সময় শার্লোতের কাছে ছিল তারা বলল, ছেলেটি হয়েছে অবিকল এডওয়ার্ডের মত। কিন্তু ওতিলে একথা মোটেই মানতে পারল না। অবশ্য সে মুখে কোন কথা বলল না। শুধু শার্লোত্তেকে অভিনন্দন জানাল।

খবর পেয়ে মিটলার এল। এসে শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে লাগল সে। বৃদ্ধ পুরোহিতকে ডাকা হলো। শার্লোতে এডওয়ার্ডের অভাবটা অনুভব করল। লুসিয়ানের বিয়ের কথাবার্তার সময় এডওয়ার্ড ছিল না আবার পুত্রের জন্মের সময়ও সে নেই।

বৃদ্ধ পুরোহিত শিশুপুত্রের নাম রাখলেন অট্টো।

অনুষ্ঠানের দিন শিশুটি ছিল ওতিলের কোলে। মিটলার বৃদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। মন্ত্র বলতে লাগল। হঠাৎ শিশুটির মুখপানে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল ওতিলে। এমন আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখাই যায় না। ওতিলের কোল থেকে মিটলার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মিটলারও অবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। ছেলেটির মুখের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল।

পুরোহিত অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় একজনের উপর ভার দিয়ে এসেছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনি অতি সংক্ষেপে সারলেন। মিটলার তাকে সাহায্য করতে লাগল নানাভাবে। মিটলার হলো শিশুর ধর্মপিতা এবং ওতিলে হলো ধর্মমাতা। ধর্ম-পিতামাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এক আবেগময় বক্তৃতা দিল মিটলার। তারপর শিশুটিকে বৃদ্ধ পুরোহিতের কোলে দিতেই পুরোহিতের মাথাটা টলতে লাগল। তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো।

কোনমতেই বাঁচানো গেল না পুরোহিতকে। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটল সেই মুহূর্তে।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ওতিলের মনটা বড় ভেঙে পড়েছিল। রাত্রিতে শোবার সময় হঠাৎ এডওয়ার্ডকে মনে পড়ল তার। মনে পড়ল অনেকদিন পর।

মনে হলো এডওয়ার্ড তখনো তার সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। অথবা সামরিক পোষাকে সজ্জিত হয়ে রয়েছে। অথবা পোষাক খুলে বিছানায় শুতে যাচ্ছে। এইভাবে একের পর এক করে বিচিত্রবেশী এডওয়ার্ডের কাল্পনিক মূর্তিগুলো মনের পর্দায় ফুটে উঠল ওতিলের। আর মনে হলো আজও সে এডওয়ার্ডের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। এত সব ঘটনা ঘটা সত্বেও তার মর্মমূল হতে এডওয়ার্ডকে সরাতে পারেনি কেউ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে বাগানের মালীর কাছে এল ওতিলে। বসন্তকাল এসেছে। গাছে গাছে কচি পাতা গজিয়ে উঠেছে। ফুলগাছে ফুল ধরেছে রং বেরঙের। মালী কাজ করছিল ফুলবাগানে। সে বুড়ো হয়েছে। প্রচুর বয়স হয়েছে, তবু এর অপত্যস্নেহের নিবিড়তা আর নিষ্ঠা নিয়ে গাছগুলোকে লালন পালন করে চলেছে সে। গাছগুলোকে যেন সন্তানের মতই ভালবাসে।

মালীকে আর একটা কারণে ভাল লাগে ওতিলের। সে অতিমাত্রায় প্রভুভক্ত। এডওয়ার্ডের প্রত্যাবর্তন সে মনেপ্রাণে কামনা করে প্রতি মুহূর্তে।

কোন ধাত্রী না রেখে ওতিলের উপরেই শিশুকে মানুষ করার ভার দিয়েছে শার্লোতে। ওতিলে ছেলেটাকে প্রায়ই কোলে নিয়ে বেড়ায়। সে ঘুমিয়ে গেলেও তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বয়ে বেড়ায়।

সেদিন শার্লোতে ছেলেটাকে ওতিলের কোলে দিয়ে পাহাড়ের উপর তাদের নবনির্মিত গ্রীষ্মাবাসে বেড়াতে গেল। পাহাড়ের উপর নির্মিত বাড়িটার ছাদে চলে গেল শার্লোতে। সেখান থেকে চারদিকের শোভা বড় মনোরম। পাহাড়ের কোলঘেঁষা বন, সামনের লেক, গ্রামের বাড়ি, খামার, বাগান সবকিছুই বড় চমৎকার ও মনোরম দেখায়।

ওতিলে একবার তার কোলের শিশুটার দিকে তাকাল। শিশুটার মুখখানা ক্যাপ্টেনের মত দেখতে মনে হলো। তার প্রতি মমতা হচ্ছিল তার। এই বিশাল বিষয় সম্পত্তি সব তারই। সহসা তার মনে হলো, এডওয়ার্ড এসে শার্লোতের সঙ্গে আগের মত মিলিত হয়ে পুত্রসুখ উপভোগ করুক। সে শেষ জীবনে সুখী হোক। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ওতিলে সে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে

এডওয়ার্ডের প্রতি তার সব আসক্তি ও তার উপর তার সব দাবি ছেড়ে দেবে। তার এই কল্পিত ত্যাগের মধ্যে তার প্রেমের এক অনাস্বাদিতপূর্ব রস আর অকল্পনীয় মহত্ব খুঁজে পেল।

এদিকে শার্লোতে তখন ভাবছিল ওতিলের বিয়েটা কোথায় কিভাবে দেওয়া যায়। বিয়ে হয়ে গেলে সে প্রাসাদ থেকে চলে যাবে। এডওয়ার্ড এসে তখন বাধ্য হয়ে মনের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য তার সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। তবে ওতিলের বিয়েটা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে হলেই সে খুশি হত বেশী।

পাহাড়ের উপর গোটা বাড়িটার নির্মাণকার্য শেষ। শুধু অলঙ্করণের কাজ বাকী আছে। কোন এক শিল্পী এসে সে কাজ সম্পন্ন করবে। উপরতলার ঘরগুলো বেশ উঁচু বলে বেশ ঠাণ্ডা। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্যাবলী খুব সুন্দর দেখা যায়।

হঠাৎ একদিন এক ইংরেজ পথিক দেশভ্রমণ করতে করতে প্রাসাদে এসে আতিথ্য গ্রহণ করল। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছিল। সঙ্গে একজন লোক ছিল। অতিথির সঙ্গে এডওয়ার্ডের কোথায় নাকি দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়েছিল। সেই আলাপ পরিচয়ের সূত্র ধরেই তিনি এসে হাজির হন।

শার্লোতে ও ওতিলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। তাঁকে দিনকতক থেকে যেতে বলে। ইংরেজ ভদ্রলোক পাহাড়ের উপর বাড়িটা ঘুরে দেখে পাহাড়টার চারপাশও দেখলেন ভাল করে। দেখে তিনি কতকগুলো পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, এই পাহাড়ের ভিতর ঝোপে ঢাকা এক ঝর্ণা আছে। ঝোপ-ঝাড়গুলো কেটে ঝর্ণাটা বার করে তার আশপাশে বসার জায়গা করে দিলে জায়গাটা চমৎকার দেখাবে। তিনি আরো বললেন, বনের ভিতর পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা আছে। বন কেটে সেখানে যাবার পথ করলে সেখানে এক সুন্দর বিশ্রামাগার করা যেতে পারে।

ইংরেজ ভদ্রলোককে পেয়ে খুশি হলো শার্লোতে ও ওতিলে। কথা বলার একজন বিদগ্ধ লোক পেল ওরা। ভদ্রলোক কথায় কথায় একদিন বললেন, এডওয়ার্ডের মত উনিও দেশভ্রমণ করতে ভালবাসেন। তবে এডওয়ার্ডের মত নিশ্চিন্ত নন। ওঁর এক পুত্র আছে। তার উপর বিষয়সম্পত্তির ভার দিয়ে উনি দেশভ্রমণে বার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি কারণ ওঁর একমাত্র পুত্র ভারতবর্ষে গিয়ে বসবাস করছে। সেখানেই জীবন কাটাবার মনস্থ করেছে। এজন্য তাঁর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনার কোন লোক নেই।

প্রসঙ্গক্রমে এডওয়ার্ডের কথা শুনে ওতিলের মনে কষ্ট হলো। তার মনে হলো যুদ্ধে যোগদান করে এডওয়ার্ড এখন কোথায় কত কষ্ট করছে। কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে তা কে জানে।

ইংরেজ ভদ্রলোক একদিন তাঁর দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেয়েদের বিভিন্ন জায়গায় তোলা ছবি দেখালেন। তিনি সব সময় কোন ভাল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেই তার ছবি তুলতেন। এই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটি সব দিকে নজর ও খেয়াল রাখতেন। তিনি এই ক'দিনের মধ্যেই এ বাড়ির সব খবরাখবর নিয়ে ফেলেছেন। তিনি রোজ সন্ধ্যার সময় একটা করে গল্প শোনাতেন। মেয়েরা বেশ উপভোগ করত তাঁর বলা গল্প।

একদিন ভদ্রলোক বললেন, আজ আমি আমার একটা গল্প বলব। কিন্তু কারো কোন কথা বলা চলবে না। সবাই রুদ্ধশ্বাসে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

ভদ্রলোক এবার বলতে শুরু করলেন, কোন এক শহরে পাশাপাশি দুটি বাড়ির দুটি ছেলেমেয়ে একই ঘরে একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। ছোট থেকে তাদের দুজনের মধ্যে এত ভালবাসা ছিল যে তাদের বাবারা ঠিক করেছিলেন তারা বড় হলে তাদের বিয়ে দেবেন।

কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল মেয়েটি ও ছেলেটির মধ্যে আর সেই ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক নেই। তার পরিবর্তে কেমন যেন ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। একদিন তারা আরো কয়েকজন ছেলেমেয়ে মিলে যুদ্ধের খেলা খেলছিল। ছেলেটি যেমন একদল ছেলের নেতৃত্ব করছিল সেনাপতিরূপে মেয়েটিও তেমনি একদল মেয়ের সামনে নেতৃত্ব করতে লাগল। সে কিছুতেই হার মানবে না। যুদ্ধে ছেলেটির জয় হলো। কিন্তু মেয়েটি সে জয় স্বীকার করল না। সে ভয়ঙ্করভাবে আক্রোশভাবাপন্ন হয়ে ছেলেটিকে আক্রমণ করল। তার তখন একমাত্র লক্ষ্য যে কোন প্রকারে ছেলেটিকে আঘাত করা। সে তখন খেলার কথা ভুলে গেল। ছেলেটির গায়ে জোর বেশী থাকায় সে অতিকষ্টে মেয়েটির হাত দুটি ধরে বেঁধে ফেলল।

এই ঘটনার পর মেয়েটির মনে ঘৃণার ভাব আরো বেড়ে গেল আগের থেকে। এটা তাদের অভিভাবকরাও লক্ষ্য করলেন। তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিলেন পরস্পরের কাছ থেকে।

ছেলেটিকে পাঠানো হলো সামরিক স্কুলে। নূতন পরিবেশের মাঝে গিয়ে

সব কিছু ভুলে গেল সে। ধীরে ধীরে বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগল তার মনে। সাফল্যের সঙ্গে গড়ে তুলতে লাগল সে তার ছাত্রজীবন।

এদিকে মেয়েটি একা একা বাড়ির মধ্যে থাকতে থাকতে ক্রমশই নিজের ভুল বুঝতে পারল। ক্রমে সে সব ঘৃণা বিদ্বেষ ত্যাগ করে শান্ত ও সুস্থ মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু ছেলেটি তার থেকে দূরে চলে যাওয়ায় তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার বা মানসিক পরিবর্তনের কথাটা জানাবার কোন অবকাশ পেল না।

এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। এমন সময় মেয়েটির বাল্যবন্ধুর থেকে বয়সে বড় একটি লোক তাদের বাড়িতে আনাগোনা করতে করতে তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। প্রথম প্রথম মেয়েটি তার প্রতি কোন আগ্রহ দেখাল না। তারপর যখন দেখল তার দেহসৌন্দর্যের প্রতি লোকটি অতিমাত্রায় আসক্ত এবং তার থেকে আরো পরিণত বয়স্ক, শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়েদের থেকে লোকটি শুধু তার সাহচর্যই কামনা করে তখন বাধ্য হয়ে লোকটিকে সঙ্গদান করতে লাগল। তার সঙ্গে ক্রমে এক প্রেমসম্পর্ক গড়ে উঠল। তখন মেয়েটির বাবা ভাবল তাদের মেয়ে হয়ত ভবিষ্যতে এই লোকটিকেই বিয়ে করবে।

হয়ত তাই হত। কিন্তু মাঝখানে হঠাৎ আবার এক ঘটনা ঘটল। এই সময় হঠাৎ একদিন মেয়েটির সেই বাল্যবন্ধু পড়া শেষ করে বাড়ি ফিরে এল দীর্ঘ দিন পরে। বাড়িতে এসেই মেয়েটির বাড়িতে গেল তার সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারের জন্য।

ছেলেটির কিন্তু তখন মেয়েটির প্রতি যেমন কোন বিদ্বেষভাব ছিল না, তেমনি কোন প্রেমাসক্তিও ছিল না। তার মনে তখন শুধু একান্তভাবে বিরাজ করছিল বড় হবার কামনা, এক বিরাট উচ্চাশার সমুন্নত আবেগ।

মেয়েটি কিন্তু ছেলেটিকে দীর্ঘদিন পর কাছে পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নোত্থিতের মত জেগে উঠল। ভাবল মনের নিভৃতে এতদিন যার স্বপ্ন দেখছিল, এতদিন যাকে কামনা করছিল সে স্বয়ং তার সামনে এসে গেছে। সে আরও স্বীকার করল, আসলে তার এই বাল্য বন্ধুই তার আকাঙ্খিত পুরুষ। ছোট থেকে তাকেই সে কামনা করে এসেছে। ছেলেবেলায় তার প্রতি যে ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব দেখিয়েছে আসলে তা শুধু তার দৃষ্টি আরও নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করার জন্য। একদিন সুদূর বাল্যে তার অপরিণত মনের অবচেতনে এক অন্ধ আবেগে যাকে আঁকড়ে ধরেছিল আজ পরিণত মনের সমস্ত যুক্তিবোধের আলোকে তার উজ্জ্বল

ভাবমূর্তিটি দেখে অবাক হয়ে গেল মেয়েটি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়েটির এই নবজাগ্রত প্রেমের ডাকে সাড়া দিতে পারল না ছেলেটি। বড় জোর সে তাকে বোনের মত ভালবাসতে পারে। মেয়েটির প্রতি তার কোন কামনা ছিল না বলেই তার নূতন প্রেমিক ভদ্রলোকটির সঙ্গেও যেচে আলাপ করেছিল এবং কোন ঈর্ষাবোধ করেনি সে। এমন কি সে একদিন তার কার্যক্ষেত্রে চলে যাবার কথাও ঘোষণা করল সবার সামনে।

মেয়েটি যখন দেখল কোন রকমেই ছেলেটির মন জয় করতে পারবে না, তখন সে মনে মনে আত্মহত্যা করার জন্য মনস্থির করে ফেলল। এইভাবে ছেলেটির মন পরোক্ষভাবে মৃত্যুর পর জয় করার বাসনা করল। সে মারা গেলে তার মৃত মুখ দেখে ছেলেটি নিশ্চয় আঘাত পাবে এবং তার কথা বেশী করে মনে করবে। এই ধরনের এক আত্মঘাতী বিকৃত জয়ের আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসল মেয়েটিকে।

এদিকে যাবার আগে ছেলেটি এক স্টীমার পার্টির আয়োজন করল। একটি বড় নদীতে স্টীমার ভাড়া করে সবাই মিলে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করল। তাতে তাদের দুজনের বাবা মা ছাড়াও মেয়েটির সেই নূতন প্রেমিকও ছিল। মেয়েটি এই প্রমোদভ্রমণের মধ্যে পেয়ে গেল তার আত্মহত্যার সুবর্ণ সুযোগ। স্টীমার যখন দুটি দ্বীপের মাঝখানে খরস্রোতা এক জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ মেয়েটি ছেলেটির কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমার জন্যই মৃত্যু বরণ করছি। আমার কোন খোঁজ করো না। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করো না।

এই বলে ডেকের উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিল মেয়েটি। ইতিমধ্যে স্টীমারটি প্রায় একটি দ্বীপের কূলে এসে পড়েছে। ছেলেটি তখন আর দেরী না করে পোষাক খুলে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে মেয়েটির কাছে চলে গেল। মেয়েটি তখন জলের মধ্যে ডুবছিল আর উঠছিল। ছেলেটি মেয়েটির অচেতন দেহটি কোনরকমে জলের উপর ভাসিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। নদীর মুখটা সেখানে আরও চওড়া। অবশেষে তারা নদীর ওপারে কূলে গিয়ে উঠল। সেখানে ঘন বন। ছেলেটি দেখল তার মাঝে পায়ে চলার একটি পথ রয়েছে। সেই পথে কিছুদূর গিয়ে দেখে কোন এক চাষীর কুঁড়ে রয়েছে তার মধ্যে। মেয়েটির মধ্যে তখন কোন প্রাণের সাড়া ছিল না।

ছেলেটির কাছ থেকে সব কথা শুনে চাষী দম্পতি আগুন জেলে মেয়েটির হাত পা সেঁকতে লাগলো। অবশেষে তার মধ্যে চৈতন্য সঞ্চার হলো। সে চোখ মেলে তাকিয়ে তার প্রার্থিত বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষকে দেখে তার গলাটা

জড়িয়ে ধরল। তার চোখ দিয়ে প্রবল ধারায় আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছেলেটিও এবার সব অনাসক্তি ও উচ্চাশার আবেগ ঝেড়ে ফেলে মেয়েটিকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। চাষীরা পরার জন্য কাপড় দিল তাদের।

চাষীই ডিঙি বেয়ে ওপারে গিয়ে সেই স্টীমারে খবর দিল।

ওরা তখন খুব ভাবছিল। খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছিল। ভেবেছিল হয়ত দুজনেই স্রোতে ভেসে গেছে। চাষীর কাছে সুখবর পেয়ে ওরা সবাই এসে গেলে ছেলেটি ও মেয়েটি তাদের বাবা মায়ের কাছে আশীর্বাদ চাইল বরবধূরূপে।

গল্প শেষ করে ভদ্রলোক থামতেই দেখা গেল শার্লোতে তার বিষাদ-গম্ভীর মুখখানা নিয়ে উঠে গেল। এই ধরনের এক ঘটনা ক্যাপ্টেনের জীবনে ঘটে এবং এ কাহিনীর সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল আছে।

শার্লোতে উঠে গেলে ইংরেজ লর্ড ভদ্রলোক ওতিলেকে বলল, আমরা বুঝতে পারিনি আমাদের এ কাহিনী শুনে উনি দুঃখ পাবেন মনে। যাঁর আতিথ্যে আমরা পরম সুখে এখানে বাস করছি, কত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি তিনি কোনভাবে মনে দুঃখ পান তা আমরা চাই না।

কিন্তু দু একদিনের মধ্যে ওঁরা বিদায় নিলে সত্যিই মনে দুঃখ পেল শার্লোতে। ওঁদের সাহচর্যে দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। ওতিলেরও বেশ ভাল লাগত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় যুদ্ধ থেকে সসম্মানে ছাড়া পেল এডওয়ার্ড। ছাড়া পেয়ে সরাসরি সে তার খামার বাড়িতে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তার বাড়ির সব খবরাখবর আগ্রহ সহকারে শুনল। অনেক খবর তার জন্য জমে ছিল অনেকদিন ধরে।

এডওয়ার্ড তার খামার বাড়িতে আসার পরেই একদিন তার পুরনো বন্ধু ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে দেখা করতে এল। ক্যাপ্টেনকে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলো এডওয়ার্ড। ক্যাপ্টেনই তাকে খবর দিল তার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে এডওয়ার্ড তাকে ঠাট্টা করে বলল, বিয়ে থা করলে?

ক্যাপ্টেন বলল যে সে তখনো বিয়ে করেনি এবং সে বিষয়ে কিছু ঠিক

করেনি।

এডওয়ার্ড বলল, কথাটা বলার আমার একটা কারণ আছে। তুমি জান আমি ওতিলেকে ভালবাসি। তাকে না পেলে জীবনে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই বলেই আমি এ জীবন ত্যাগের জন্য যুদ্ধে যোগদান করি। কিন্তু সম্প্রতি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ওতিলের প্রতি আমার কামনা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। এ কামনা আমি সংযত বা দমন করে রাখতে পারছি না। আমার একান্ত বিশ্বাস আমি ওতিলেকে একদিন লাভ করবই।

ক্যাপ্টেন বলল, এইভাবে মোহের বশবর্তী হয়ে সব সম্ভাব্য বাধা ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার থেকে তোমার দাম্পত্য সম্পর্ক ও কর্তব্যের কথা ভেবে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া উচিত। তোমাদের নবজাত পুত্রসন্তান তোমাদের মিলনকে আরও দৃঢ় ও আনন্দদায়ক করে তুলবে। তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে আরো মধুর করে তুলবে।

এডওয়ার্ড তার পুত্রসন্তানের কথায় কোনরূপ বিচলিত না হয়ে বলল, দেখ, ছেলের জন্য ভাবি না। আমাদের যা বিষয় সম্পত্তি আছে তাতে ছেলে ভাল ভাবে মানুষ হয়ে উঠবে। যাদের বিষয় সম্পত্তি নেই, বাবা মা নেই সেই সব ছেলেরাও মানুষ হয়।

এডওয়ার্ডকে তার কামনা পূরণের পথে অবিচল দেখে ক্যাপ্টেন বলল, কেন যে অতীত যৌবনের উদ্দাম দিনগুলোকে ফিরে পেতে চাইছ তা জানি না। জানবে, জীবনের যে কোন স্তরে যে কোন বয়সের সীমার মধ্যেই মানুষ তার জীবনকে উপভোগ করতে পারে। প্রকৃতি তার সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। এই উপভোগের জন্য তাকে অতীত বা ভবিষ্যতের পানে তাকাতে হবে না।

সেকথায় কান না দিয়ে এডওয়ার্ড বলল, দেখ, যুদ্ধে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হত। তোমার কথাও মনে হত। আজ এসেছ ভালই হয়েছে। আমি যেমন ওতিলেকে ভালবাসি তুমিও তেমনি শার্লোতেকে ভালবাস। আমি ওতিলেকে বিয়ে করব। তুমি শার্লোতেকে বিয়ে করো। শার্লোতের শিশুপুত্র তার কাছেই থাকবে। তুমি তাকে মানুষ করবে। আমি ওতিলেকে বিয়ে করেই দেশভ্রমণে বেরিয়ে যাব। বিষয় সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়াড়া তোমরা দুজনে মিলে ঠিক করবে।

ক্যাপ্টেন বলল, তুমি ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছ ততটা সহজ নয়। তোমার আমার দুজনেরই একটা চরিত্রগত সুনাম আছে। এ কাজের দ্বারা সে সুনাম

ক্ষুণ্ণ হবে। তাতে সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠবে।

এডওয়ার্ড বলল, সাধারণ মানুষ প্রথম প্রথম হয়ত নিন্দা করবে। পরে তারা ধীরে ধীরে সব ভুলে যাবে। যেমন যায়। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

এডওয়ার্ডের দারুণ পীড়াপীড়িতে অবশেষে আর বাধা দিতে পারল না ক্যাপ্টেন। সে যেমন সমর্থন করতে পারছিল না এডওয়ার্ডকে তেমনি একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারছিল না তার কথাটাকে।

অবশেষে এডওয়ার্ড ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে তার পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বাড়ির দিকে রওনা হলো। দূর থেকে পাহাড়ের উপর নির্মিত তাদের নূতন বাড়ির চূড়াটাকে দেখে আনন্দের আবেগে ফেটে পড়ল এডওয়ার্ড। ওতিলেকে মনে পড়ল তার। ভাবল আজই সন্ধ্যার সময় সব কথা পাকা করে ফেলতে হবে।

এডওয়ার্ড বলল, সে একটা পাশের গাঁয়ে লুকিয়ে থাকবে। ক্যাপ্টেন ঘোড়ায় চেপে প্রাসাদে গিয়ে শার্লোতেকে সব কথা বুঝিয়ে বলবে। তারপর তার মতামত নিয়ে এডওয়ার্ডকে এসে খবর দেবে। এডওয়ার্ডের বিশ্বাস তার এই প্রস্তাবে শার্লোতে রাজী হবেই, কারণ এতে তার স্বার্থ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন সোজা প্রাসাদে গিয়ে দেখল শার্লোতে সেখানে নেই। খবর নিয়ে জানল সে এখন পাহাড়ের উপর নূতন বাড়িতে বাস করে। এখন সে কোথায় বেড়াতে গেছে। বিকালের দিকে আসবে। তাই ক্যাপ্টেন তার পান্থশালায় ফিরে গেল।

এদিকে এডওয়ার্ড আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে এক গোপন পথ দিয়ে তাদের লেকের ধারে পার্কের কাছে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। হঠাৎ দেখতে পেল ওতিলে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর বসে রয়েছে একটা ছেলে কোলে নিয়ে। তখন সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠেনি। এডওয়ার্ড চারদিক নির্জন দেখে সোজা তার কাছে গিয়ে তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। ওতিলেও তাকে জড়িয়ে ধরল। এডওয়ার্ড তার পরিকল্পনার কথা সব বলল। তার উত্তরে ওতিলে বলল, শার্লোতের কাছে আমি ঋণী। তিনি যদি মত দেন তাহলেই এ বিয়ে সম্ভব। তা না হলে আমি তোমায় ত্যাগ করব।

হঠাৎ শিশুটির মুখপানে তাকিয়ে এডওয়ার্ড আশ্চর্য হয়ে বলল, ওর মুখের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মুখের কি আশ্চর্য মিল। শার্লোতের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে

এই শিশুই হবে সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

ওতিলে বলল, অনেকে বলে, ওর চোখগুলো আমার মত।

এডওয়ার্ড ওতিলেকে এবার পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করল। ওতিলেও তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। ওতিলে বলল, এবার তুমি ফিরে যাও ক্যাপ্টেনের কাছে। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। শার্লোতে শিশুর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে।

এডওয়ার্ড চলে গেলে ওতিলে দেখল পাহাড়ে যেতে অনেকখানি পথ পার হতে হবে। কিন্তু লেকটা যদি নৌকোয় পার হয় তাহলে একেবারে বাড়ির গোড়ায় গিয়ে পৌছবে। তখন মুখ আঁধারি হয়ে এসেছে।

নৌকোয় উঠে ছেলে কোলে চেপে নৌকোটা ছেড়ে দিল। ছেলে কোলে থাকায় দাঁড় বাইতে অসুবিধা হচ্ছিল। নৌকোটা টলমল করছিল। হঠাৎ এক সময় বাতাসে নৌকোটা দুলে উঠতেই ওতিলের হাত থেকে দাঁড় ও ছেলে পড়ে গেল। ওতিলে ছেলেটার জামা ধরে তাকে অতিকষ্টে টেনে তুলল। কিন্তু এরই মধ্যে সে অনেক জল খেয়েছিল। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নৌকোটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লেকের মাঝখানে। ওতিলে জলে ডোবা ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করল। নিজের গরম অনাবৃত বুকের উপর বারবার তার ছোট্ট শীতল দেহটাকে চেপে ধরল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

অনুকূল বাতাসে অবশেষে যখন নৌকোটা ঘাটের কাছে এসে গেল তখন রাত অনেক হয়েছে। ছেলেটা কোলে তুলে সার্জেনের কাছে গেল ওতিলে। সার্জেনও অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তখন হতাশ হয়ে শোকে মেঝের উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল ওতিলে।

এদিকে খবর পেয়ে শার্লোতে ছুটে এল বাড়ি থেকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আবেগে অভিভূত হয় না সে। অসাধারণ আত্মসংযমের সঙ্গে সে একবার শিশুটির মুখপানে তাকাল। তারপর ওতিলের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিল।

এদিকে ভোরের দিকে পান্থশালায় এই দুর্ঘটনার খবরটা পৌছলে ক্যাপ্টেন সোজা চলে এল ঘটনাস্থলে। শার্লোতে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। তার গম্ভীর মুখে শান্ত করুণ একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল। পরে বলল, জানতে পারি কি ঠিক এই দুর্ঘটনার সময়ে কোথা হতে কেমন করে এলে?

ক্যাপ্টেন তখন সব কথা খুলে বলল। এডওয়ার্ডের পরিকল্পনা ও প্রস্তাবের কথাও বলল। সব শুনে শার্লোতে বলল, আর আমি বাধা দেব না এডওয়ার্ডকে। আমি যদি আমাদের বিবাহবিচ্ছেদে ,আগেই মত দিতাম তাহলে আমার ছেলেকে হারাতে হত না। এডওয়ার্ডকে বলবে সে যে কোন কাগজে বলবে আমি সই করে দেব।

ক্যাপ্টেন বলল, তাহলে আমাদের বিয়ের কি হবে ?

শার্লোতে বলল, সেকথা পরে ভাবা যাবে। এখন নয়।

ক্যাপ্টেন উঠে পড়ল। মৃত ছেলেটির মুখ খোলা ছিল। সে দেখল সত্যিই ছেলেটির মুখের সঙ্গে তার মুখের সাদৃশ্য আছে। শার্লোতে বলল, নিয়তিই ত আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সব কাজ করিয়ে নেয় মানুষকে দিয়ে। সেখানে মানুষের যুক্তি নীতি বা বুদ্ধির কোন দাম নেই।

ক্যাপ্টেন চলে গেলে ওতিলে চোখ মেলে তাকাল। তার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরলে সে দেখল শার্লোতের কোলের উপর সে শুয়ে আছে। সে উঠে বসে আবেগের সঙ্গে বলল, এই দ্বিতীয়বার আমি তোমার কোলে শুলাম। আর একবার আমার মা মরে গেলে আমি তোমার কোলে শুয়েছিলাম। আমি এক উদার আশ্রয় লাভ করেছিলাম।

শার্লোতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ওতিলে বলল, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। যে আত্মঘাতী আশার খবরটা নিয়ে ক্যাপ্টেন চলে গেল তার বিরুদ্ধে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করছিল আমার। আমি এ ব্যবস্থা মানব না। এই দুর্ঘটনার মাধ্যমে ঈশ্বর আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমার ভুল ভেঙে দিয়েছেন। আমি অন্যায় করেছিলাম, পাপ করেছিলাম এডওয়ার্ডকে ভালবেসে। আমার সেই পাপের প্রতিফল এইভাবে ভোগ করতে হলো আমায়। সে পাপের প্রতিকার আমি নিজেই করব। তুমি এখনি ক্যাপ্টেনকে ডেকে আমার কথা তাকে জানিয়ে দাও।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

দুর্ঘটনার ফলে দেহ মন অনেকটা ভেঙে গিয়েছিল ওতিলের। শার্লোতে তার দিকে অনেক বেশী করে নজর দিয়ে সুস্থ করে তুলল তাকে। সুস্থ হয়ে তার পরিকল্পনার কথা বলল ওতিলে। শার্লোতের ইচ্ছা ছিল, এখানকার

পরিবেশ তাদের শোকাবেগকে জাগিয়ে দেয় সব সময় ; তাই তারা দূরে কোথাও বেড়াতে যাবে দুজনে।

কিন্তু ওতিলে বলল অন্য কথা। সে বলল, আমরা যদি এমনভাবে বসে থাকি তাহলে যত নির্জন ও শান্তিপূর্ণ জায়গাতেই যাই না কেন, আমরা কোন-মতে পরিত্রাণ পাব না কোন শোকাবেগ বা অশুভ অবাঞ্ছিত কোন স্মৃতির প্রভাব থেকে। এসব থেকে মুক্তি পেতে চাইলে আমাদের কাজের মধ্যে ডুব দিতে হবে। বৃহত্তর কর্তব্যসাধনই মানুষকে মুক্ত করতে পারে তার সকল দুঃখ বা অপরাধ চেতনা থেকে।

শার্লোতে তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, তাহলে কি তুমি বোর্ডিং স্কুলে ফিরে যেতে চাও ?

ওতিলে বলল, হ্যাঁ, সেখানেই ফিরে যেতে চাই আমি। অবসর সময়ে আমি শিশুদের দেখাশোনা করব। তাদের মাঝে আনন্দ পাব।

শার্লোতে বলল, কিন্তু সেখানে গেলে সহকারী ভদ্রলোক আরো নিবিড়ভাবে তোমায় চাইতে পারেন। তিনি তোমাকে ভালবাসেন।

ওতিলে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমাকে যারা ভালবাসবে তারা ভাগ্যের কাছে কোন সুখই আশা করতে পারবে না। তাদের জীবনে দুঃখ আর হতাশা নেমে আসতে বাধ্য। এটা আমি ভালই জানি। সুতরাং এ বিষয়ে কোন ভয় নেই আমার।

শার্লোতের মনে কিন্তু এ ব্যাপারে আর একটা ভয় ছিল। সেটা হচ্ছে এডওয়ার্ডের ভয়। কারণ এডওয়ার্ড প্রতিজ্ঞা করেছিল যতদিন ওতিলে শার্লোতের কাছে থাকবে ততদিন সে কিছু করবে না। কিন্তু ওতিলে অন্য কোথাও চলে গেলেই সে তাকে ছিনিয়ে আনবে সেখান থেকে। সে ভয়ঙ্করভাবে দুর্বার হয়ে উঠবে। তাই এ বিষয়ে এডওয়ার্ডের মত জানার জন্য তার কাছে মিটলারকে পাঠাবার মনস্থ করল শার্লোতে।

কিন্তু মিটলার গেল না। না গিয়ে সে শার্লোতেকে পরামর্শ দিল, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও ওতিলেকে। এটা খুব ভাল ব্যবস্থা।

মিটলার দেখল এই সুযোগ। এডওয়ার্ড ও শার্লোতের পুনর্মিলনের পথে একে একে সব বাধাগুলি আপনা থেকে অর্থাৎ অনুকূল ঘটনার আঘাতে সরে যাচ্ছে।

শার্লোতেও তাই মনে করে। তাই ওতিলে প্রাসাদ থেকে চলে গেলে সে

ঘরগুলোকে আগেকার মত সাজাল। যখন ক্যাপ্টেন বা ওতিলে কেউ আসেনি তখন যেখানে যা ছিল তা আবার সেখানে রাখল। অতীত সুখের দিনগুলোকে মাঝে মাঝে আমাদের বর্তমান জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্ম প্রবল কামনা জাগে আমাদের মনে। শার্লোতের মনেও সেই কামনা জেগেছিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ওতিলে রওনা হতেই মিটলার সত্যি সত্যিই একদিন এডওয়ার্ডের খামার-বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। সে সব কথা এডওয়ার্ডকে বলল, ওতিলের সিদ্ধান্ত, তার বোর্ডিং স্কুল যাওয়ার খুঁটিনাটি সব বলল এডওয়ার্ডকে।

মিটলার চলে গেলেই এডওয়ার্ড তার ঘোড়া তৈরি করতে বলল চাকরকে। তারপর তার বিশ্বাসী চাকরকে সঙ্গে নিয়ে পথে যে হোটেলে রাত কাটাতে হবে ওতিলেকে, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। হোটেলের মালিক একজন মহিলা। সে এডওয়ার্ডকে চিনল। এডওয়ার্ড এমন একটি ঘর ভাড়া নিল যার পাশের ঘরে ওতিলে থাকবে। প্রথমে এডওয়ার্ড ভাবল ওতিলের কাছে সে সরাসরি হাজির হবে না। আগে চিঠি দিয়ে তার মন জানবে।

তাই সে একটি চিঠি লিখে ওতিলের টেবিলে রেখে দিল। তাতে লিখল সে ওতিলের উপর জোর করবে না। তবে সে কাছেই আছে। ওতিলে ইচ্ছা করলেই সে আসবে।

কিন্তু ঘটনাক্রমে ওতিলে তার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এডওয়ার্ড। এডওয়ার্ডকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে দুপা পিছিয়ে গেল ওতিলে। তার মুখ চোখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাকে স্পর্শ করার কোন সাহস পেল না এডওয়ার্ড। কোন কথাও বলতে চায় না ওতিলে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে সারারাত পায়চারি করতে লাগল এডওয়ার্ড। ভোরে ওতিলের ঘরে গিয়ে দেখল ওতিলে ঘুমোচ্ছে পোষাক পরেই। কিছুক্ষণ পর সে উঠলে এডওয়ার্ড তাকে নূতন করে সব কিছু ভেবে দেখতে বলল। কিন্তু ওতিলে কোন কথার জবাব দিল না। তাকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল। অবশেষে এডওয়ার্ড তাকে জিজ্ঞাসা করল, বোর্ডিং স্কুলে যাবে?

ওতিলে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। এডওয়ার্ড তখন তাকে বলল, প্রাসাদে শার্লোতের কাছে ফিরে যাবে?

ওতিলে তখন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ওতিলে তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে গাড়িতে বসলে গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ির পিছু পিছু ঘোড়ায় চেপে যেতে লাগল এডওয়ার্ড।

ওদের দেখে অবাক হয়ে গেল শার্লোতে। যেতে যেতে ফিরে এল ওতিলে এবং তার সঙ্গে এডওয়ার্ডকে আসতে দেখে কিছুই বুঝতে পারল না সে। ওতিলে কোন কথা বলল না। শুধু এডওয়ার্ড ও শার্লোতের হাতদুটো ধরে এক করে তার উপর চাপ দিয়ে ছুটে তার নিজের ঘরে চলে গেল।

এডওয়ার্ড তখন আবেগের সঙ্গে শার্লোতেকে জড়িয়ে ধরল। বলল, তুমি ওতিলের উপর নজর দাও। ওকে তুমি ভুল বুঝো না।

ওরা ওতিলের ঘরে গিয়ে দেখল ওতিলে মেঝের উপর শুয়ে আছে। সেই থেকে সম্পূর্ণরূপে মৌনব্রত পালন করে যেতে লাগল ওতিলে। সে খুব অল্প আহার করতে লাগল। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু দরকার। এ বিষয়ে কারো কথা শুনত না সে।

এডওয়ার্ড আগের মত তার ঘরে থাকতে লাগল। শার্লোতের সঙ্গে এখন খুব ভাল বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করলেও ওতিলের আশা একেবারে ত্যাগ করতে পারল না সে।

মিটলার ও ক্যাপ্টেনের কাছে চিঠি পাঠানো হলো। এডওয়ার্ড শার্লোতের উপর চাপ দিতে লাগল ক্যাপ্টেনকে বিয়ে করার জন্য। শার্লোতে বলল, করতে পারি একটা শর্তে। করতে পারি ওতিলে যদি তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

এমন সময় ওতিলে একদিন একটা চিঠি লিখে তার মনের কথা জানিয়ে দিল। সে লিখল, আমাকে তোমরা কেউ বিরক্ত বা বিব্রত করো না। আমি আমার আত্মাকে খুঁজে পেয়েছি। তার পথে এডওয়ার্ড বাধা সৃষ্টি করছে। আমার এই তপশ্চর্যামূলক আত্মনিগ্রহ ও মৌনব্রত যতদিন প্রাণ চাইবে চলবে। এতে তোমরা কেউ বাধা সৃষ্টি করবে না। বন্ধুর মত সব সহ্য করে যাবে।

ওতিলের চিঠি পেয়ে এডওয়ার্ড আর কিছু বলল না। ক্যাপ্টেনের কি একটা জরুরী কাজ ছিল। সে তা সেরে এল।

আবার ওরা চারজনে আগের মত দিন কাটাতে লাগল প্রাসাদে। কারো প্রতি কারো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নেই। ওতিলে কথাটা বললেও অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যের সময় ওরা চারজনে এক জায়গায় থাকে। বসে গল্প করে।

কোনদিন বই পড়ে এডওয়ার্ড। কোনদিন গান বাজনার আসর বসে। শার্লোতের পিয়ানোর সঙ্গে বেহালা বাজায় ক্যাপ্টেন। ওতিলের পিয়ানোর সঙ্গে বাঁশি বাজায় এডওয়ার্ড।

গত বছর এডওয়ার্ডের জন্মদিন পালিত হয়নি। সে ছিল না প্রাসাদে। এবার ঠিক হলো অনাড়ম্বরভাবে তার জন্মদিন পালিত হবে।

সেদিন শার্লোতে আর ক্যাপ্টেন বসে ছিল। মিটলার তার সামনে পায়চারি করছিল। এডওয়ার্ড ঘোড়ায় চেপে বাইরে গেছে। ওতিলে তার ঘরে ছিল। মিটলার আপন মনে ওল্ড টেস্টামেন্টের দশটি উপদেশের এক একটি বলে যাচ্ছিল ও তার ব্যাখ্যা করছিল। মিটলার বলতে চাইছিল আমরা ছেলেদের মাতাপিতার প্রতি ভক্তি করতে শেখাই। কিন্তু আমরা নিজেরা আমাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করে চলি না। যে বৈবাহিক বন্ধন বিধিনির্দিষ্ট ও জীবনের এক পবিত্র সম্পদ তা ছিন্ন করে আমরা ব্যভিচারে মত্ত হয়ে উঠি। সে সম্পর্কের মধ্যে কখনো কোন কারণে ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধ বাধলে তা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত এবং এ বিষয়ে অপরকে যথাসম্ভব সাহায্য করা উচিত।

মিটলার লক্ষ্য করেনি ওতিলে কখন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার কথা শুনছে। এক বিষাদখিন্ন আগ্রহে মিটলারের কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে পড়েছিল ওতিলে। শার্লোতের শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর থেকে তার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে এডওয়ার্ড ও শার্লোতের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে সে পাপ করেছে, এক অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধিনী হয়ে উঠেছে। তার সেই পাপের জন্যই শিশুটির অকাল মৃত্যু ঘটেছে তার হাতে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অপরিসীম আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে দিনে দিনে নিজেকে ক্ষয় করে স্বেচ্ছামৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে চায় সে।

হঠাৎ ওতিলে তার ঘরে চলে যেতে শার্লোতে বিরক্ত হয়ে মিটলারকে বলল, আপনার ঈশ্বরের নীতি উপদেশ ব্যক্ত করা হলো?

এই বলে শার্লোতে ওতিলের ঘরে ঢুকতেই ওতিলের সহচরী ন্যানি নামে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, ছুটে আসুন, আমার দিদিমণি মরে যাচ্ছে।

মিটলার, ক্যাপটেন, শার্লোতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখল, সোফার উপরে শুয়ে পড়েছে ওতিলে। তার অবস্থা সত্যিই বড় ক্ষীণ দেখাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে বুঝলেন, অনাহারজনিত দুর্বলতা ও

কোন দুশ্চিন্তার প্রবল চাপই এর কারণ। ন্যানি বলে যে বাচ্চা মেয়েটিকে গ্রামের এক গরীব পরিবার থেকে এনে ওতিলে তার কাছে রেখেছিল এবং তাকে বড় ভালবাসত ডাক্তার তাকে পাশের ঘরে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ওতিলে আজ কিছু খেয়েছে কিনা।

ন্যানি বলল, সে কিছুই খায়নি। সব আমাকে দিয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার তাকে আরো চাপ দিলে সে বলল, সে কোনদিনই কিছু খায় না।

কথাটা বলেই কাঁদতে লাগল ন্যানি, কারণ তার দিদিমণি একথা বলতে নিষেধ করেছে তাকে। কাঁদতে কাঁদতে কোথায় পালিয়ে গেল সে। তাকে আর বাড়িতে পাওয়া গেল না।

এদিকে ওতিলের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। খবর পেয়ে এডওয়ার্ড ছুটে এসে ওতিলের কাছে গিয়ে বাষ্পাবেগে আকুল হয়ে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না ওতিলে? তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে মরব। মরে একসঙ্গে স্বর্গে গিয়ে দুজনে ভাষাহীন নীরবতায় অনেক কথা বলব যুগ যুগ ধরে।

ওতিলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতিকষ্টে ঠোঁটদুটো কাঁপিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল, বল তুমি বাঁচবে। প্রতিজ্ঞা করো।

এডওয়ার্ড কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, প্রতিজ্ঞা করছি বাঁচব।

কিন্তু এডওয়ার্ডের এ প্রতিজ্ঞা, এ শপথ ওতিলে আর শুনতে পেল না। তার প্রাণবায়ু তার আগেই বেরিয়ে গেছে।

ওতিলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শোকে উন্মাদের মত হয়ে গেল এডওয়ার্ড। শার্লোত্তে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল সারারাত ধরে। পরদিন সকালে একটি কফিনে করে ওতিলের মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে চ্যাপেলে নিয়ে যাওয়া হল, চার্চসংলগ্ন যে চ্যাপেলের উন্নতির জন্য স্থপতি তার সাহায্যে অনেক কাজ করেছে। কফিনের উপরে ছিল কাচের ঢাকনা। ফলে ওতিলের সুসজ্জিত মৃতদেহ ও তার সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কেমন যেন এক স্বর্গীয় দ্যুতি খেলা করছিল তার মুখে।

শোভাযাত্রায় গাঁয়ের অনেকেই যোগদান করেছিল। শোভাযাত্রাটি যখন একটি বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ তার ছাদ থেকে ন্যানি শোভা-যাত্রার সামনে পড়ে যায়। দেখে বোঝা গেল তার দেহের সব হাড় গুঁড়িয়ে গেছে। সবাই ভাবে সে মরে গেছে। ছাদের উপর লুকিয়ে থেকে

তার প্রিয় দিদিমণির মৃত মুখখানি দেখে সে থাকতে পারেনি। বিচলিত হয়ে পড়ে যায়।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ওতিলের কফিনটা ছুঁয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ন্যানি নতজানু হয়ে বসে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার দিদিমণি, আমাকে ক্ষমা করেছে। আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেছে। এইমাত্র আমার কানে কানে বলল।

কবরের কাছে মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে নামিয়ে রাখা হলো। দলে দলে অসংখ্য নরনারী আসছিল। ন্যানির আশ্চর্য জীবনলাভের ঘটনা শুনে সবাই তাদের ছেলেমেয়েদের এনে কফিনটাকে ছোঁয়াচ্ছিল। তাদের ধারণা তাদের সব দুরারোগ্য রোগ ভাল হয়ে যাবে।

রাত্রিতে একটি জ্বলন্ত বাতির পাশে বসে একা মৃতদেহ পাহারা দিতে লাগল ন্যানি। সে কাউকে সামনে থাকতে দেবে না। কেউ তাকে চটাতে সাহস পেল না। রাতের অন্ধকারে কোথা হতে স্থপতি এসে শেষবারের মত ওতিলের মুখখানা দেখে গেল। সার্জেন বসে ছিল চার্চের এক কোণে ন্যানির অলক্ষ্যে অগোচরে।

ওতিলের সমাহিত হবার পর থেকে এডওয়ার্ড সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে উঠল জগৎ ও জীবনের প্রতি। বাঁচার সব আনন্দ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে নিঃশেষে। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় সব সময় একা একা ঘরেই থাকে। খাওয়া দাওয়াতেও কোন রুচি বা আগ্রহ নেই।

এই সময় এডওয়ার্ডের একমাত্র সান্ত্বনার উৎস ছিল একটি পানপাত্র অর্থাৎ একটি কাঁচের গ্লাস। সেই গ্লাসে তার ও ওতিলের স্বাক্ষর ছিল। এই গ্লাসটি পরম যত্নের সঙ্গে কাছে রেখে দিয়েছিল এডওয়ার্ড। এতেই সে রোজ মদ খেত ওতিলের মৃত্যুর পর থেকে।

হঠাৎ একদিন এডওয়ার্ডের মনে হলো এটা ঠিক সেই গ্লাস নয়। দেখতে এক মনে হলেও কোথায় একটা পার্থক্য আছে। চাকরকে ডেকে চাপ দিতে সে স্বীকার করল সেটা ভেঙ্গে যাওয়ায় অন্য একটা আনা হয়েছে তার জায়গায়। একথা শুনে রাগল না এডওয়ার্ড। শুধু সেই দিন থেকে পানাহার ত্যাগ করল একেবারে।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার ঘরে দেখা গেল এডওয়ার্ড মরে পড়ে রয়েছে বিছানায়। মিটলার প্রথমে তা দেখে ডাক্তার ও সকলকে ডাকে।

শার্লোতে বলল, ওতিলের পাশেই সমাহিত করা হবে এডওয়ার্ডকে এবং ভবিষ্যতে সেখানে আর কারো মৃতদেহ সমাহিত করা হবে না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার প্রিয়তমার সঙ্গে মহামিলনের যে স্বপ্ন দেখেছিল এডওয়ার্ড, সে স্বপ্ন যেন তার কোনভাবে বিঘ্নিত না হয় কোনদিন।

সাফারিংস অফ ইয়ং ওয়ার্দার

আমি যথাসম্ভব যত্নসহকারে হতভাগ্য ওয়ার্দারের জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি। জানি, এর জন্য আপনারা আমাকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেবেন। তার মন ও চরিত্রের মহানুভবতার জন্য তাকে শ্রদ্ধা না করে পারবেন না। তেমনি তার দুর্ভাগ্যের জন্য চোখের জল না ফেলেও পারবেন না।

হে সদাশয় পাঠকবর্গ, যাঁরা হতভাগ্য ওয়ার্দারের মতই দুঃখ ভোগ করছেন, তাঁরা অবশ্যই তার দুঃখময় জীবনকাহিনী থেকে কিছু সান্ত্বনা পাবেন। এ বইটি তাঁদের জীবনে পরম বন্ধুর মত কাজ করবে যারা ভাগ্যক্রমে অথবা নিজ দোষে এর চেয়ে ভাল বইএর সংস্পর্শে আসতে পারেননি।

প্রথম

মে ৪, ১৭৭১

এখান থেকে আমার পক্ষে চলে যাওয়াটা সত্যিই কত সুখের। হে আমার প্রিয় অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, মানুষের অন্তর সত্যই বড় অদ্ভুত। তা না হলে যাদের আমি এত ভালবাসি, যাদের সঙ্গে আমি এতদিন জড়িয়ে ছিলাম অবিচ্ছেদ্যভাবে তাদের ছেড়ে যেতে এত আনন্দ হবে কেন? তবু জানি, এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবে তোমরা। ভাগ্যক্রমে যাদের সংস্পর্শে এসেছিলাম তারা আজ কত দুঃখ পাচ্ছে আমার জন্য। হতভাগিনী লিওনোর! তবু এতে আমার কিন্তু কোন দোষ ছিল না। তার বোনের রূপসৌন্দর্য আমাকে মোহমুগ্ধ করেছিল ঠিক, কিন্তু তার বোনের মধ্যে আমার জন্য যে এক প্রেমগত দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল ধীরে ধীরে, তার জন্য আমি কি করতে পারি? তথাপি আমি কি নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলতে পারি? তার সেই প্রেমানুভূতিকে আমি কি প্রশ্রয় দিইনি? তার প্রেমের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিগুলো দেখে আমি কি আনন্দ পাইনি? মানুষের জীবন কত আশ্চর্যের দেখ। নিজের অবস্থার শোধনীয়তায় অনুশোচনা করার অধিকার তার আছে। তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি শুধু নিজের দুর্ভাগ্য বা দুঃখের কথাই বলব না, তার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও জানাব আপনাদের। আমি বর্তমানকে উপভোগ

করব অতীত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। অতীত অতীতই থেকে যাবে। মানুষ প্রায়ই বিবর্ণ বর্তমানকে ছেড়ে কল্পনার পাখায় ভর করে বর্ণাঢ্য অতীতে উড়ে যেতে চায় বলেই তার দুঃখ অনেক বেড়ে যায়। আর তার মনটা এমনভাবে গড়া যে তা না গিয়ে পারে না সে।

দয়া করে আমার মাকে বলবে, আমি তাঁর কথা যতদূর সম্ভব মেনে চলব এবং যথাশীঘ্র চিঠি দিয়ে সব কিছু জানাব। আমি আমার পিসির সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর মেজাজটা কড়া হলেও তাঁর অন্তরটা খুব ভাল। সম্পত্তির যে উত্তরাধিকার হতে আমরা বঞ্চিত আছি সে সম্বন্ধে আমার মার অভিযোগের কথা আমার পিসিমাকে আমি জানিয়েছি। তিনি তার কারণ আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন এবং কোন শর্তে তিনি সে সম্পত্তির অধিকার আমাদের উপর ছেড়ে দিতে পারেন এবং আমাদের দাবির থেকে বেশীও দিতে পারেন তাও বলেছেন। এত সব কথা এই মুহূর্তে বলব না। মাকে শুধু বলবে সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোন কারণ নেই। এ ব্যাপারে আমি একটা জিনিস ভাল করে বুঝেছি, মানুষে মানুষে আসল হিংসা ও প্রতারণার থেকে ভুল বোঝাবুঝিটা আরো ভয়ঙ্কর।

এখানকার নির্জনতাটা সত্যিই ওষুধের মত কাজ করছে আমার অন্তরের ক্ষতের উপর। আমার হিমশীতল অন্তরের কম্পমান সত্তাটার উপর বসন্ত তার নব-যৌবনের সব মধুর উত্তাপটুকু ঢেলে দিচ্ছে। থোকা থোকা ফুলের প্রাচুর্যে ফেটে পড়েছে প্রতিটি গাছপালা বনঝোপ। যে কোন দিকে একবার তাকালেই সৌরভের বিশাল সমুদ্রে মন ভাসতে থাকে। আর তার মধ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পায়।

শহরটা এমন কিছু ভাল নয়। তবে তার চারদিকে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো বড় মনোরম। এই কারণেই বিগত কাউন্ট পাহাড়ের ধারে এক উপত্যকার একটা চমৎকার বাগান তৈরি করেন। তার মাঝখানে একটা শান্তশীতল কুঞ্জ আছে। তিনি সেইখানেই বেশী সময় থাকতেন। এখন আমি সেখানে থাকি। বাগানের মালী আমাকে বড় ভালবাসে। এই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। একদিন আমিই হয়ত হয়ে উঠব এই বাগানের সর্বেসর্বা।

মে ১০,

বসন্তের সকালের মত এক উজ্জ্বল আনন্দোৎফুল্লতা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে। আমি এই শহরের এই মনোরম প্রাকৃতিক

পরিবেশে আমি একা এবং এ পরিবেশ যেন আমারই জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। হে আমার প্রিয়তম বন্ধু, এক প্রশান্ত আত্মোপলব্ধির গভীরে আমি এমনভাবে ডুবে গিয়েছি যে আমার শিল্পগত কাজকর্ম মোটেই হয়ে উঠছে না। এসে থেকে আমি একটা রেখাও আঁকতে পারিনি। অথচ এত বড় শিল্পপ্রেরণা এর আগে আমি কখনো পাইনি।

গভীর অন্ধকারে ঢাকা বনভূমির মাথার উপরে আকাশে যখন সূর্য কিরণ দিতে থাকে আর তার একটা রশ্মি গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বন-স্থলীর সবুজ বুকে তখন আমি লম্বা লম্বা ঘাসের উপর ছোট্ট পাহাড়ী নদীটার ধারে শুয়ে থাকি পা ছড়িয়ে। আমি তখন নদীর কলতানের সঙ্গে ঘাসের ভিতর উড়ে বেড়ানো কীটপতঙ্গের গান শুনি। এই সব অসংখ্য উৎফুল্ল কীটপতঙ্গের প্রাণচঞ্চলতার মধ্যে আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অনুভব করি যিনি তাঁর মনের মত করে আমাদের সৃষ্টি করেন। আর যখন শান্ত ধূসর গোধূলি নেমে আসে আমার বনভূমি ও তার চারপাশের জগতে, যখন সারা আকাশখানা তার বুকভরা নীল ভালবাসা নিয়ে আমার বুকের উপর ঝুলে পড়ে কোন প্রেমময়ী নারীর মত তখন আমার মনের মাঝে শুধু একটা ইচ্ছাই জেগে ওঠে। মনে হয়, হায়, আমি যদি আমার এই অভিজ্ঞতার কথা সব ব্যক্ত করতে পারতাম। মানুষের যে আত্মার স্বচ্ছ মুকুরে ঈশ্বরের সমস্ত অস্তিত্ব প্রতিফলিত হয় সেই আত্মার অব্যক্ত বাণীর মধ্যেই বিশ্বের সকল মানুষ তার মর্মবাণী খুঁজে পায়। কিন্তু হে বন্ধু, এ দৃশ্যের কথা যথাযথভাবে প্রকাশ করা আমার সাধ্যের অতীত। আমি শুধু চোখে যা দেখছি তার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছি। নিজে হারিয়ে যাচ্ছি।

মে ১২,

জানি এই মায়াবী বনভূমিতে কোন দেবদূত নেমে আসে না অথবা এমনও হতে পারে, আমার মনের কল্পনার স্পর্শে স্বর্গে পরিণত হয়ে উঠেছে এই বনভূমি। এই শহরের বাইরে পাহাড়ের এক ঢালু সানুদেশে একটা ঝর্ণা আছে। ঝর্ণাটা বেরিয়ে এসেছে একখণ্ড সাদা পাথর থেকে। ঝর্ণার দুধারে লম্বা লম্বা গাছ। সে গাছের ছায়ায় শীতল হয়ে উঠেছে জায়গাটা। মেলুসিনা ও তার বোনদের মত আমি মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে গেছি এই ঝর্ণাটার সঙ্গে। আমি রোজ সেখানে গিয়ে অন্তত এক ঘণ্টা না থেকে পারি না। দেখতে দেখতে অপরাহ্নের ছায়া গাঢ় হয়ে উঠতেই দূর গাঁ থেকে মেয়েরা জল নিতে আসে এই

ঝর্ণা থেকে। একদিন রাজকন্যারাও ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে যেত অন্য সব মেয়েদের সঙ্গে। এই স্নিগ্ধ শীতল ঝর্ণাধারার কোন অভিজ্ঞতা যার নেই তার মনুষ্যজন্মই একরকম বৃথা।

মে ১৩,

তুমি জানতে চেয়েছ আমার বইগুলো পাঠিয়ে দেবে কি না। আমি শুধু ঈশ্বরের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চাই না। তুমি শুধু সেই ভালবাসার জন্য প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে। আমি আর কোন মানুষ বা পুঁথিগত নির্দেশের দ্বারা চলতে চাই না। আমি শুধু আমার নিজের অন্তরাত্মার নির্দেশেই চলব এখন থেকে। আমি এখন শুধু একটা জিনিসই চাই, তা হলো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকবার আমার বিক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করে ঘুম পাড়াতে হয়। হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমাকে একথা নতুন করে বলার দরকার নেই। তুমি জান, তুমি দেখেছ, কতবার আমার খেয়ালী অন্তর গভীর দুঃখ থেকে অমিত আনন্দের উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে, কতবার আমার অন্তর এক মিষ্টি বিষাদ থেকে এক ভয়ঙ্কর আবেগের প্রবলতায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তরের মত এত বন্ধুর, এত ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্তনশীল আর কোন বস্তু নেই। আমি সেই অন্তরকে এখন রুগ্ন শিশুর মত জ্ঞান করি। তার সব কামনা বাসনা পূরণ করে চলি। তুমি কি ভাবতে এতে জানি না। তবে এমন অনেকে আছে যারা আমাকে এর জন্য কাছে পেলে তিরস্কার করবে রীতিমত।

মে ১৫,

এখানকার তথাকথিত নীচু শ্রেণীর লোকেরা আমাকে এরই মধ্যে বেশ চিনে ফেলেছে এবং ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে তাদের ছেলেমেয়েরা খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে আমার। কিন্তু প্রথম প্রথম যখন আমি তাদের কাছে যাই, নানারকম প্রশ্ন করে নানা কথা জানতে চাই তখন তারা আমাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে। ভাবে আমি উপহাস করছি তাদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে তাদের আরো কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। আমি জানতাম উঁচুতলার লোকেরা তাদের ও নীচুতলার গরীব মানুষদের মধ্যে একটা হিমশীতল ব্যবধান বাঁচিয়ে রাখে। তাদের মধ্যে কিছু লোক আবার গরীবদের কাছে গিয়ে তাদের দুরবস্থা নিয়ে ঠাট্টা করে তাদের বেদনা বাড়িয়ে দেয়।

অবশ্য আমি এটা জানি যে ধনী গরীব সমান নয়, এবং সমান হতে পারে

না। তবে আমি বিশ্বাস করি যে যারা আত্মসম্মানের খাতিরে গরীব অন্ত্যজদের কাছ থেকে দূরে থাকে তারা সেই সব কাপুরুষদের মতই হীন যারা পরাজয়ের ভয়ে শত্রুদের কাছ থেকে দূরে লুকিয়ে থাকে।

সম্প্রতি একদিন আমি যখন ঝর্ণার দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন একটি নীচু শ্রেণীর মেয়ে সেখানে ঘাটে নেমে তার কলসীতে জল ভরছিল। জল ভরা হয়ে গেলে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে কেউ নেই। তার মাথায় কলসীটি তুলে দেবার মত কাউকে না পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঘাটের সিঁড়িতে। আমি তখন তার কাছে গিয়ে বললাম, চল, আমি তুলে দিচ্ছি।

সে তখন প্রথমে আপত্তির সুরে বলল, না, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

আমি বললাম, নাও আর ভনিতা করতে হবে না। এই বলে তার মাথায় কলসীটা তুলে দিতে সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

মে ১৭,

আমি অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করেছি এখানে। কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখনো পাইনি কাউকে। কিন্তু জানি না, কি আছে আমার মধ্যে যা এত লোককে আকর্ষণ করে আমার প্রতি। যদি বল, এখানকার লোকরা কেমন, তাহলে বলব, এখানকার লোকরা আর পাঁচ জায়গার লোকের মতই। বেশীর ভাগ সময় তাদের রুজি রোজগারের চেষ্টাতেই কাটাতে হয়। তবে তারা মানুষ হিসাবে সত্যিই খুব ভাল। তাদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গিয়ে বা নাচগানের আসরে যোগ দিয়ে বড় আনন্দ পেয়েছি।

হায়, আমার যৌবনের বন্ধুকে আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি সে চলে যাবে। আমার সমগ্র অন্তরাত্মার নিবিড়তা দিয়ে আমি আমাদের বন্ধুত্বকে মধুর ও প্রগাঢ় করে তুলেছিলাম। আমাদের দুজনের প্রেমানুভূতি ছিল যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি আমাদের সম্পর্কের নিবিড়তা ছিল পবিত্র। সে আমার থেকে বয়সে কিছু বড় ছিল বলেই কি চলে গেল আমার আগে? আমি তাকে কোনদিন ভুলতে পারব না। তার সংস্পর্শে সাহচর্যে আমার সত্তার পূর্ণতাকে নূতন করে অনুভব করি আমি।

দিনকতক আগে এক যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে নিজেকে বড় পণ্ডিত পণ্ডিত ভাবে। আমি গ্রীক জানি একথা শুনে সে আমাকে খুঁজে বের করে এবং কি কি বই পড়েছে তার কথা সব বলে।

আর একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। লোকটি কোন এক রাজ-

কুমারের কর্মচারী। সে থাকে আমাদের শহর থেকে মাইলখানেক দূরে এক বনের ভিতর যেখানে তার মালিক প্রায়ই শিকার করতে যায়। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরই দুঃখে সে শহরের বাসা ত্যাগ করে বনবাসে গেছে। তার নয়টি ছেলেমেয়ে। তার বড় মেয়েকে নিয়ে ওরা বেশ মজা করে। তার বাড়িতে আমাকে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে।

এ ছাড়া আরো কিছু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে বটে তবে তাদের আমি কোনমতেই সহ্য করতে পারি না। আজ এইখানেই বিদায় নিচ্ছি।

মে ২২,

মানুষের জীবনটা যে স্বপ্ন তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝেছি। অনেকেই অবশ্য এর আগে তা বুঝেছে। আমি বুঝছি আজ। যখন দেখি মানুষের কর্মশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা কত সীমাবদ্ধ, যখন দেখি তার সকল যোগ্যতা ব্যয়িত করে তার প্রয়োজন চরিতার্থ হলেও তার অভাব যায় না জীবনে, যখন দেখি তার জীবনের সকল প্রয়াস, প্রতিশ্রুতি ও আশা ভরসা কুহেলিঘেরা স্বপ্নমাত্র তখন আমি সব আশা ছেড়ে দিই। নীরব হয়ে যাই। তখন আমার মনে হয় এই সমগ্র জগৎটা যেন এক বিরাট কারাগার, যে কারাগারে বন্ধ থেকেও তার ভিতরকার দেওয়ালগুলোকে চিত্রিত করে চলেছি মূঢ়ের মত। তখন আমি জগৎ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে ফিরে আসি আমার নিজের মধ্যে। কিন্তু সেখানেও এক আশ্চর্য জগৎ। অতৃপ্ত কামনায় ভরা অস্পষ্ট সে জগতের অন্তহীন অন্ধকারে আমি হাতড়ে বেড়াই যেন।

শিক্ষক আর শিক্ষাবিদরা এ বিষয়ে একমত হবেন যে শিশুরা কি চায় তা তারা নিজেরাই জানে না। আমার মনে হয় বয়স্ক লোকেরাও তা জানে না। তবে সেই সব মানুষেরাই সুখী যারা দুঃখের ভাত সুখ করে খায়। বড় মন নিয়ে ছোট কাজ সুষ্ঠুভাবে করে যায়। এ জগতে সুখী তারাই যারা আর পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে পারে। যারা তাদের ছোট্ট বাগানটাকে স্বর্গের উদ্যানে পরিণত করতে পারে। জীবনে তারা বদ্ধ জেনেও মুক্তির আনন্দ হতে বঞ্চিত হয় না তারা কখনো। কারণ তারা জানে যে কোন মুহূর্তেই তারা ইচ্ছা করলে বন্ধনকে মুক্তিতে পরিণত করতে পারবে।

মে ২৬,

তুমি হয়ত আগেই জেনেছ ঘুরতে ঘুরতে যে জায়গাটা আমার ভাল লাগে

আমি সেই জায়গাতেই তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে থাকি। এমনি করে পথ চলতে চলতে হঠাৎ একটা জায়গা ভাল লেগে গেল আমার।

জায়গাটা সত্যিই বড় মনোরম। পাহাড়ের উপর একটা গাঁ। গাঁটার নাম ওয়ালহেম। গাঁ থেকে বার হলেই সামনে চোখে পড়বে বিস্তীর্ণ এক উপত্যকা-ভূমি।

আমি যার ঘরে উঠেছি তিনি হচ্ছেন এক বয়স্কা মহিলা। মনটা বেশ উদার এবং মুখটা হাসিখুশিতে ভরা। মোটের উপর প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যায়। জায়গাটা বড় নির্জন আর শান্তিপূর্ণ। আমার বাসার পাশেই আছে দুটো বিরাট লিণ্ডেন গাছ। চারদিকের শূন্য প্রান্তরে তাদের লম্বা লম্বা ডালপালা ছড়িয়ে আছে। আমি সেই গাছের নীচে টেবিল চেয়ার পেতে কফি খাই, অনেক সময় আমার প্রিয় গ্রন্থ হোমার পড়ি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখি একটা চার বছরের দেহাতী ছেলে তার এক বছরের এক ভাইকে কোলে নিয়ে বসে আছে। দৃশ্যটা দেখে আমার এত ভাল লেগে যায় যে আমি সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে শুরু করি।

আঁকতে গিয়ে আমার একটা কথা মনে হলো। মনে হলো প্রকৃতির মধ্যেই আছে অফুরন্ত সৌন্দর্য আর সম্পদের ভাণ্ডার। অনন্ত সৌন্দর্যময়ী ও সম্পদশালিনী প্রকৃতিই কোন শিল্পীকে সার্থক করে গড়ে তুলতে পারে। কোন নিয়মকানুন তা পারে না। নিয়মকানুন মানুষকে কেতাদুরস্ত ও নীতিবাদী করে তোলে ঠিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি তার স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির স্বচ্ছ সুন্দর প্রকাশের পথটাকেও রুদ্ধ বা জটিল করে দেয়। যেমন মনে করো ভালবাসার ব্যাপারটা। মনে করো কোন একটি যুবক একটি যুবতীকে ভালবাসে। সব সময় তার কাছে কাছে থাকে। তার প্রতিটি কর্মে ও আচরণে তার প্রেমাস্পদের প্রতি তার অকৃত্রিম প্রেমানুভূতির সততার পরিচয় দেয়। এমন সময় ধরো, কোন লোক তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, শোন যুবক, তুমি ভালবাস ক্ষতি নেই, কিন্তু কাজকর্ম সব বজায় রেখে অবসর সময়ে ভালবাস, মেয়েটির কাছে অবসর সময়টা স্বচ্ছন্দে কাটাও। কিন্তু ভেবে দেখ, এই উপদেশ মানলে নিয়মকানুনের দ্বারা তার প্রেমানুভূতিকে খর্ব করলে তার প্রেমের সাবলীল গতি-প্রকৃতি কি ক্ষুণ্ণ হবে না?

মে ২৭,

আমার আবেগ আর বাগ্মিতার স্রোতে ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে

গিয়েছিলাম। আমার ছবির বিষয়বস্তু সেই ছেলেদুটো সম্বন্ধে সব বলা হয়নি। মাঠের ধারে পড়ে থাকা একটা লাঙলের উপর বসে আমি ছেলেদুটোর ছবি আঁকছিলাম। বড় ছেলেটার নাম ফিলিপ। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল। অবশেষে বিকালের দিকে তার মা এল শহর থেকে। মেয়েটি বয়সে যুবতী এবং তার মাথায় ছিল একটা ঝুরি।

ছবি শেষ করে আমি বললাম, ফিলিপ, তোমার কাজ হয়ে গেছে। ফিলিপ তার ভাইকে কোলে করে একভাবে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে ছিল। তার মা আমাকে বলল, তার বড় ছেলেকে সঙ্গে করে শহরে গিয়েছিল দুটো জিনিস কিনতে। তার স্বামী সুইজারল্যাণ্ডে গেছে। সেখানে তার এক খুড়তুতো ভাইএর কিছু সম্পত্তি পেয়েছে সে। কিন্তু বেশ কিছুদিন তার স্বামীর কাছ থেকে কোন খবর বা টাকাপয়সা পায়নি সে। ফলে বড় কষ্টে ছেলেদের মানুষ করতে হচ্ছে তাকে।

তবু দেখলাম, মেয়েটির মধ্যে কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই। সহজভাবে সহ্য করে চলেছে ভাগ্যের সব বিড়ম্বনা। জীবনের দুঃখময় দুঃসহ অস্তিত্ব হাসি-মুখে প্রশান্তচিত্তে এইভাবে বহন করে চলার ক্ষমতা যাদের থাকে তাদের সে ক্ষমতা দেখে মনে বল পাই। আমার চিত্তের সব বিক্ষোভ সব অশান্তি দূর হয়ে যায়। আমি দিনের শেষে সেদিন ছেলেগুলির হাতে একটি পেনি দিলাম। এর পর রোজ তাদের সঙ্গে দেখা হয়। আমি কফি খাবার সময় কিছু করে চিনি দিই। মাখন ও রুটি খাবার সময় তার অংশ দিই তাদের। আর প্রতি রবিবার তাদের হাতে দিই একটা করে পেনি।

মে ৩০,

ছবির সম্বন্ধে যে কথা বললাম কবিতার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে। আসলে কোনটা সুন্দর বা অসুন্দর কবিদের তা দেখার দৃষ্টি থাকা চাই আর তার প্রকাশ করার সাহস ও ক্ষমতা থাকা চাই। এ বিষয়ে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলব। ঘটনাটা ঘটেছে এই ওয়ালহেম গাঁয়েই।

আজ একটি তরুণ চাষী যুবকের সঙ্গে আলাপ হলো আমার। সে এক বিধবা মহিলার অধীনে চাকরি করে। মহিলাটির যৌবন আর নেই, তবু তাঁর স্বাস্থ্য এখনো অটুট আর বড় চমৎকার। তাঁর প্রথম স্বামী তাঁর উপর পীড়ন করত বলে সেই দুঃসহ স্মৃতির বশবর্তী হয়ে উনি আর কাউকে বিয়ে করেননি। এবং স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে বৈধব্য জীবন যাপন করে চলেছেন।

কিন্তু তাঁর আচরণ বড় সৌজন্যপূর্ণ। মন বড় উদার। ছেলেটি বুঝতে পারে না, যে মেয়ের এত সুন্দর দেহমন সে কেন লাঞ্ছিত হত তার স্বামীর দ্বারা। সে মহিলাটির বিভিন্ন গুণের অকুণ্ঠভাবে প্রশংসা করতে লাগল। মহিলাটির প্রতি তার আনুগত্য আর অব্যক্তনিবিড় প্রেমানুভূতির শীতল অন্তঃসলিলা আমার মনটাকে স্পর্শ করল। তার কথা বলার আন্তরিক ভঙ্গিমা, তার কণ্ঠের সঙ্গতিপূর্ণ মাধুর্য, তার চোখের দৃষ্টির অবদমিত উত্তাপ—এই সব কিছুর মাধ্যমে সে তার যে মানসী ও অদৃশ্য আনন্দপ্রতিমাকে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করছিল, আমার মনে জেগে উঠল তার ছবি। তাকে দেখতে আমার ইচ্ছা হলো। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম, না, মেয়েটিকে কোনদিন নিজের চোখে দেখব না। দেখব সেই ছেলেটির চোখে, সেই ছেলেটির অব্যক্ত প্রেমানুভূতির রঙে রসে যে মেয়েটি অপরূপা ও অনিন্দ্যসুন্দরী হয়ে উঠেছে। সে আমার চোখের সামনে এলে হয়ত তাকে আর তেমন দেখাবে না।

জুন ১৬,

তুমি লিখেছ কেন আমি তোমাকে চিঠি লিখি না এখন নিয়মিত। তুমি বিজ্ঞ। তুমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। আমি বেশ ভালই আছি। আমি সম্প্রতি আমার মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছি। আমি তাকে—ঠিক জানি না।

কথাটা একসঙ্গে বলে ফেলা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। আনন্দের আবেগে মনটা এখন আমার কানায় কানায় ভরা বলেই হয়ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না আমি সব কথা ব্যক্ত করার। কি করে ঘটল ব্যাপারটা তা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না।

সত্যিই এক দেবদূত। তুমি বলবে সব লোকই তার প্রেমাস্পদকে দেবদূত ভাবে। আমিও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না কেন তাকে দেবদূত বলছি, কোন গুণের দিক থেকে পূর্ণতা অর্জন করেছে সে। তবু একথা সত্যি যে আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে সে। বুদ্ধির সঙ্গে সরলতা, দয়ার সঙ্গে দৃঢ়তা, শান্তশীতল আত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে উষ্ণনিবিড় এক প্রাণ-চঞ্চলতা, সব কিছু মিলে মিশে অতুলনীয়া করে তুলেছে তাকে আমার চোখে।

কিন্তু এত কথা বলেও আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। তার দেহের একটি অঙ্গেরও যথাযথ বর্ণনা দিতে পারছি না। অন্য সময় বলব। না না, অন্য সময় নয়, এখনি বলব। এখন না বললে আর কখনো বলা হয়ে উঠবে না৷ ৮

আমি তাকে দেখে বিচলিত না হয়ে পারিনি। তার আটটি ভাইবোনের মাঝে তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই আমি। এখানে আমি সত্যি সত্যিই সুখী উইলেম।

তোমাকে এর আগে একবার লিখেছিলাম এক রাজকর্মচারী তার বনমধ্যস্থ বাসভবনে আমাকে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমি যাইনি। হয়ত যেতাম না কোনদিন, ঘটনাক্রমে যদি না একদিন হঠাৎ গিয়ে পড়তাম সেখানে।

সুযোগটা এসে গেল হঠাৎ। আমাদের পাড়ার ছেলেরা এমন একটা নাচের আসরের আয়োজন করেছিল যেখানে যেতে হলে সেই বন আর ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হবে।

আমরা সেদিন একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে জনকতক মহিলাও ছিলেন। তাঁরাও এই অনুষ্ঠান দেখতে যাচ্ছিলেন। আমার এক জ্ঞাতি ভাইও সঙ্গে ছিল। গাড়ি বনপথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। আমার জ্ঞাতি ভাই বলল, দেখবে মেয়েটি কত সুন্দর। তাকে আমরা যাবার পথে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নেব গাড়িতে। ওর ভালবাসা পাওয়ার জন্য শহরের একটি লোক চেষ্টা করছে।

ওদের বাড়ির কাছে গাড়িটা থামতেই একজন ঝি এসে বলল, লোত্তে এখনি আসবে। আমি গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘরের ভিতর চোখ মেলে তাকাতেই তার রূপ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। অমন রূপবতী আমি কখনো দেখিনি আমার জীবনে। মেয়েটি আমাকে দেখে বলল, ক্ষমা করবেন, আমার জন্য আপনাদের কষ্ট করতে হলো।

সে তখন তার ভাইবোনদের জন্য রুটি কেটে সকলের হাতে দিচ্ছিল। আমি বুঝলাম তারই নাম লোত্তে। লোত্তে বলল, আমি যাবার জন্য পোষাক পরতে ও তৈরি হতে গিয়ে রুটি কাটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অথচ আমি ছাড়া একাজ করার আর কেউ নেই।

তার কথার উত্তরে আমি কি বলব কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার অপরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য, তার মধুর কণ্ঠস্বর ও নম্র আচরণে আমি বিমুগ্ধ ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। অভিভূত হয়ে পড়েছিল আমার অন্তর।

ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির নাম লুই। বয়স ছবছর। তার মুখখানা দেখতে বড় ভাল। আমি তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব করলাম। ওরা আমার পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। লোত্তের কথায় সে আমার করমর্দন

করতে এলে আমি তাকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলাম।

মেয়েদের মধ্যে লোত্তের পরের বোন সফি। লোত্তের অনুপস্থিতিতে তারই হাতে থাকবে সংসারের ভার। লোত্তে তাকে সব বুঝিয়ে দিল। দুটি ভাই বাইরে আমাদের গাড়ির পিছনে বসে ছিল। ওদের বাবা ঘোড়ায় চেপে কোথায় বেড়াতে গেছেন।

লোত্তে এসে বসতেই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। আমার জ্ঞাতিভাই লোত্তেকে চিনত। সে লোত্তেকে বলল, যে বইটা পাঠিয়েছিলাম পড়েছ? লোত্তে বলল, আমার ভাল লাগেনি। আগের বইটাও ভাল লাগেনি। যখন ছোট ছিলাম, সংসারের কোন দায়িত্ব ছিল না তখন যে কোন উপন্যাস হাতে পেলেই পড়ে ফেলতাম বাছবিচার না করে। কিন্তু এখন সময় কম সুতরাং বাছাই করতে হয়। আমার ভাল লাগে সেই সব উপন্যাস যার মধ্যে আমি পাই আমার বাস্তব জীবনের সার্থক প্রতিচ্ছবি। সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনায় ভরা যে পারিবারিক জীবন আমি যাপন করি সেই ধরনের পারিবারিক জীবনের কথা যে সব উপন্যাসে থাকে সেই সব উপন্যাস সত্যিই খুব ভাল লাগে।

লোত্তের সব কথা আমার মনঃপূত হচ্ছিল না। তবু আমি তার কোন প্রতিবাদ করতে পারছিলাম না। কারণ তার চোখ মুখ ও কথা বলার ভঙ্গিমা দেখে দারুণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তবে সে গোল্ডস্মিথের লেখা ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড নিয়ে যখন কথা বলল তখন তার প্রতিবাদ না করে আমি থাকতে পারলাম না। তাও অনেক পরে প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু সেকথা আর না বাড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল লোত্তে।

উপন্যাসের কথা ছেড়ে লোত্তে এল নাচের কথায়। নাচের প্রসঙ্গ তুলে সে আবেগের সঙ্গে বলল, নাচা বা নাচ দেখার আনন্দ যদি খারাপ হয় তাহলে আমি বলব নাচের থেকে ভাল শিল্প কি তা আমার জানা নেই। যত দুঃখেই পীড়িত হোক না আমার মন, পিয়ানোতে একটা নাচের সুর বাজাতেই সব দুঃখ দূর হয়ে যায় আমার।

সে যখন কথা বলছিল তখন আমি তার কালো চোখের পানে সর্বক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। তার উত্তেজিত ও মৃদু কম্পিত ওষ্ঠাধর, তার তপ্ত ও রক্তাভ গণ্ডদ্বয় আমার অন্তরাত্মাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল একান্তভাবে। আমি নিবিষ্ট মনে তার আদর্শের কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলাম বিনা প্রতিবাদে। অথচ সে কথার মানে কি তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে চাইনি। অবশেষে যখন

গাড়ি এসে ঘটনাস্থলে থামল আর আমি নামলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখছিলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে।

দুজন ভদ্রলোক এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে গেলেন নাচের আসরে। নাচ শুরু হলো। লোত্তে প্রথমে নাচল অন্য জনের সঙ্গে। পরে আমার সঙ্গে কোয়াড্রিল নাচ নাচল। নাচতে নাচতে দেখলাম নাচের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গেছে লোত্তে যে আর কোন কিছু তার মনে নেই। মনে হলো জগৎ ও জীবনের আর সব কথা ভুলে গিয়ে পরিবার সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে শুধু নাচের মধ্যে ডুবে গেছে।

নাচ শেষ হয়ে গেলে আমি তাকে আর একবার এই নাচ নাচতে অনুরোধ করলাম। সে বলল, একবার কেন দুবার নাচব। তবে তারপর ওয়ালৎস নাচ নাচতে হবে তার সঙ্গে। তার সবচেয়ে এই জার্মান নাচ ওয়ালৎস ভাল লাগে। তবে এই নাচে অংশীদার ভাল হওয়া চাই এবং এ নাচে বিশেষ দক্ষতার দরকার হয় বলে সকলে পারে না।

ওয়ালৎস নাচতে গিয়ে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লঘু হয়ে গেল আপনা থেকে; আমার আকাঙ্ক্ষিত যে পরমাসুন্দরী মেয়েকে আমি ধরে আছি তার স্পর্শের মধুর নিবিড়তায় আমার দেহ যেন লঘু হয়ে গেছে অস্বাভাবিকভাবে। আমার মনে হলো আমার দেহের কোন ভার নেই। আমার আত্মা যেন এই লঘু দেহটা ধারণ করে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে যে কোন জায়গায় উড়ে যেতে পারে। আমার মনে হলো আমার প্রিয়তমা লোত্তের হাত ধরে আমি এমনি করে অনন্তকাল ধরে নেচে চলতে পারি। নাচতে নাচতে সারা হলটা আমরা দুজনে ঘুরে বেড়ালাম বাহুবদ্ধ হয়ে।

নাচ শেষ করে আমরা কিছু কমলালেবু খেলাম। লোত্তে নিজে বেশী না খেয়ে অন্য মেয়েদের দিয়ে দিল।

এবার লোত্তের সঙ্গে আমি তৃতীয়বার কোয়াড্রিল নাচতে শুরু করলাম। নাচতে গিয়ে তার চোখে দেখলাম এক সরল অনাবিল আনন্দের স্বচ্ছ সুন্দর প্রকাশ। মনে হলো; তার অন্তরের অসাধারণ শুচিতা ও পবিত্রতাই ফুটে উঠেছে সে চোখের আনন্দে।

এমন সময় একজন মহিলা এসে লোত্তের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে 'আলবার্ত' নামটা উচ্চারণ করল। এ নামের অর্থ আমি বুঝতে না পেরে সরলভাবে লোত্তেকে তা জিজ্ঞাসা করলাম।

লোত্তে আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, আলবার্ট আমার জীবনের অংশীদার হতে চলেছে। তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাটা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে।

কথাটা আমি গাড়িতে মেয়েদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। সুতরাং তা নূতন নয়। তবু আমার কানে যেন বিষ বর্ষণ করল কথাটা। আমার নাচের ছন্দের তাল কেটে যেতে লাগল বারবার। যদিও অবশ্য লোত্তে তা শুধরে নিতে লাগল।

নাচ তখনো সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এমন সময় শুরু হল ঝড়, বৃষ্টি। আমরা পথে আসার সময় দিগন্তে মেঘ জমতে দেখেছিলাম। এখন সেখানে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করেছে। বজ্রের গর্জনে আমাদের বাজনার সুর চাপা পড়ে যাচ্ছিল। পরে বাজনা থেমে গেল। নাচ বন্ধ হয়ে গেল। খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যুতের চমক দেখে আর বজ্রের গর্জন শুনে মেয়েদের অনেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দুজন পড়ে গেল মেঝের উপর। আবার অনেকে ভয়ে তাদের নিজেদের জড়িয়ে ধরতে লাগল।

এমন সময় বাড়ির মালিক এসে আমাদের অন্য একটি ছোট বদ্ধ ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দরজা জানালা বন্ধ থাকায় বজ্রের আওয়াজ তেমন শোনা যাচ্ছিল না। লোত্তে বলল, আমরা সংখ্যা গণনার খেলা খেলতে পারি। তোমরা সব গোল হয়ে বসে থাক। আমি তোমাদের চারদিকে ঘুরব। প্রথমে ধীরে, পরে জোরে। যখন যার কাছে যাব সে তার সংখ্যা বলবে। অর্থাৎ আগের লোকের যে সংখ্যা হবে পরের লোকের হবে তার পরের সংখ্যা। কিন্তু কেউ যদি তার সংখ্যা আমি তার কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চটপট বলতে না পারে তাহলে আমি তার কান মলে দেব অথবা চড় মারব।

আমাদের সকলকে ঘিরে লোত্তে যখন খুব বেগে ঘুরতে লাগল তখন অনেকেই এবং দুবার আমি চড় আর কানমলা খেলাম। তবু বেশ মজা লাগছিল। খেলা শেষ করে লোত্তের সঙ্গে আমি আবার নাচঘরে গেলাম। তখন ঝড় থেমে গেছে।

লোত্তে বলল, আমি ভীষণ ভীরু প্রকৃতির। কিন্তু পরকে সাহস দেবার জন্য তখন আমি সাহসের ভান করছিলাম।

এক জায়গায় লোত্তে তার কনুইএর উপর ভর দিয়ে বসে ছিল। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। সে বলল, তার একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে।

সে তখন জানালা দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখছিল। আমি তার চোখপানে তাকিয়ে দেখলাম তার দুচোখ জলে ভরে গেছে।

তার চোখে জল দেখে আমার চোখেও জল আসছিল। আমি সেই জলভরা চোখের উপর থেকে তার একটি হাত টেনে ধরে চুম্বন করেছিলাম। আমি তাকে ধীরে ধীরে আমার জীবনকাহিনী শুনিয়েছিলাম। সে কাহিনী শেষ করে যখন বিছানায় শুতে গিয়েছিলাম তখন রাত দুটো বাজে।

জুন ১৯,

পরের দিন সকালটাকে বড় উজ্জ্বল আর মিষ্টি মনে হচ্ছিল। সকাল হতেই আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল সকলকে নিয়ে। গাড়িতে আমি সর্বক্ষণ লোত্তের কালো চোখের পানে তাকিয়েছিলাম। সে হয়ত তখন তার বাড়ির কথা ভাবছিল। ভাবছিল তার বাবা আর ভাইবোনদের কথা।

সে যখন গাড়ি থেকে নেমে গেল তখন আমি তাকে বললাম, আজই বিকালের দিকে আমি তাদের বাড়ি যেতে পারি। সে তাতে রাজী হয়ে মত দিল। তার পর থেকে কি যেন হয়ে গেল। সব ওলট পালট হয়ে গেল আমার জীবনে। সেদিন থেকে আমার প্রায়ই মনে হত চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সব থেমে গেছে আপন আপন গতিপথে। মনে হত রাত্রি দিন বলে কিছু নেই।

জুন ২১,

এখন আমি প্রচুর আনন্দের মধ্যে আছি। ঈশ্বর যে আনন্দ একমাত্র সাধু সন্তদের দান করেন সেই রকম আনন্দ আমি উপভোগ করে যাচ্ছি। আমি এখন ওয়ালহেম গাঁয়েই বাস করছি পরম শান্তিতে। এখান থেকে লোত্তেদের বাড়ি মাত্র আধ ঘণ্টার পথ। অথচ আমি যখন এখানে সেখানে যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে ওয়ালহেম গাঁটাকে পছন্দ করি তখন কিন্তু ভাবতে পারিনি এ গাঁয়ে এত আনন্দ পাব একদিন।

দেখ উইলেম, মানুষের মনে আছে পরস্পরবিরুদ্ধ দুটো প্রবৃত্তি। একটা প্রবৃত্তির বশে সে নিজেকে প্রসারিত করতে চায়, সে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চায়। আর একটা প্রবৃত্তির বশে সে নিজেকে সঙ্কুচিত ও কেন্দ্রীভূত করতে চায় এক বিশেষ ধরনের প্রথাগত জীবনযাত্রার মধ্যে। সে তারই মধ্যে জীবনের সব আসক্তি খুঁজে পেতে চায়।

আমার কথাটাই ধরো। আমি যখন এ গাঁয়ে প্রথম আসি তখন এখানকার বন-উপবন দেখে মনে হয়েছিল আমি তার শীতল ছায়ার সঙ্গে মিশে যাই।

এখানকার পাহাড় পর্বত দেখে মনে হয়েছিল আমি যেন ওদের মত উঁচু হই, বিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমির মত আমার বুকটাও প্রসারিত হোক। কিন্তু আমি যখন সত্যি সত্যিই ওদের খুব কাছে গেলাম তখন দেখলাম ওরা যা ছিল তাই আছে। শুধু আমার চোখে ছিল মায়ার কাজল। মানুষ তাই প্রথম জীবনে ঘুরে বেড়িয়ে পরে সে চায় এক নিশ্চিন্ত গৃহকোণ যেখানে সে তার সন্তানদল পরিবৃত হয়ে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর বুকের কাছে এক নিবিড় গার্হস্থ্য সুখ উপভোগ করতে পারবে।

আমি এখন রোজ সকাল হতেই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার 'হোমার' বইখানি নিয়ে আমার হোটেলের বাগানে গিয়ে এক গাছতলায় বসে পড়ি। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে পড়ি। তখন আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় আমি খুব সুখী।

জুন ২৯,

গত পরশু যখন আমি লোত্তেদের বাড়িতে ছিলাম তখন শহর থেকে ডাক্তার আসে তাদের বাবাকে দেখতে। আমি তখন মেঝের উপর ছড়িয়ে থাকা লোত্তের ভাইবোনদের সঙ্গে তাসের ঘর তৈরির খেলা খেলছিলাম।

ডাক্তার ভদ্রলোক শহরের লোক এবং ছেলেদের মোটেই পছন্দ করতেন না। তাছাড়া লোত্তেদের বাড়ির ছেলেরা নোংরা এবং বদমায়েস একথা তিনি প্রায়ই পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াতেন। আমি সেই নোংরা বদমায়েস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করছি দেখে তিনি চটে গেলেন কোন কথা না বলে।

আমার কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থাকতে বা খেলা করতে খুব ভাল লাগে। লোত্তের সঙ্গে তাদের বাড়িতে দেখা করতে গেলে যখন দেখতাম সে কোন কাজে ব্যস্ত তখন তার ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিতাম। পৃথিবীতে যত জীবিত প্রাণী আছে তার মধ্যে শিশুদের আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। মানুষের সব ভাল গুণ তাদের মধ্যে ছোট আকারে দেখতে পাই আমি। তাদের একগুঁয়েমির মধ্যে আমি দেখতে পাই মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তার ক্ষুদ্রতর রূপ। হে ঈশ্বর, তুমি স্বর্গ থেকে তোমার সকল সন্তানদেরই দেখতে পাচ্ছ। তাদের মধ্যে আছে বড় শিশু আর ছোট শিশু। তবে তোমার পরম পুত্র বলে গেছেন তুমি কাজের থেকে বেশী আনন্দ পাও। যাই হোক, আজকের মত বিদায় উইলেম। আজ আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

১,

আমার মনের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। রোগশয্যায় কোন রোগীর পাশে বসে থাকা মানুষের থেকে আমার বিষাদ অনেক বেশী। ঠিক হয়েছে লোত্তে দিনকতকের জন্য শহরে যাবে তাদের কোন এক আত্মীয়ার সেবা করতে। ভদ্রমহিলা শেষ সময়ে লোত্তেকে দেখতে চেয়েছেন।

গত সপ্তায় আমি লোত্তের সঙ্গে একটা ছোট্ট গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গাঁটা এখান থেকে এক ঘণ্টার পথ। লোত্তে তার সঙ্গে তার দ্বিতীয় বোনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেখানে বেলা চারটের সময় পৌছলাম। আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছতেই একটি বুড়ো মানুষ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে ছুটে আসছিল লোত্তের দিকে। মনে হলো লোত্তেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে নবজীবন লাভ করেছে। কিন্তু লোত্তে ছুটে গিয়ে তার পাশে বসল। তার কোলের ছেলেটিকে আদর করল। বুড়োটির নাম প্যাস্টর। আমরা তারই বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। প্যাস্টর কানে কালা বলে লোত্তেকে খুব চিৎকার করে কথা বলতে হচ্ছিল। প্যাস্টর বলছিল সে আর বেশীদিন বাঁচবে না। লোত্তে বলল, অনেক বলিষ্ঠ যুবক অকালে মারা যাচ্ছে। আমি প্যাস্টরের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করলাম।

বাড়ির বাইরে ছিল দুটো বিরাট কাজুবাদামের গাছ। তার ছায়া সারা উঠোনটাকে ছেয়ে রেখেছিল। আমি গাছটার প্রশংসা করতেই প্যাস্টর তার ইতিহাস বলতে শুরু করল।

সে বলল, গাছটা কে বসিয়েছে তা জানি না। তবে ছোট গাছটা বসায় আমার স্ত্রীর বাবা। এ গাছের বয়স হলো আমার স্ত্রীর বয়সের সমান। তার মানে আমার শ্বশুর যেদিন সকালবেলায় এই গাছটা বসান সেই দিন বিকালেই আমার স্ত্রীর জন্ম হয়! সে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা। এ বাড়িঘর একদিন আমার শ্বশুরেরই ছিল। আমি এখানে এসেছিলাম আজ হতে সাতাশ বছর আগে। তখন আমি ছাত্র ছিলাম। আমাকে তিনি ভালবাসতেন এবং পরে তার মেয়েও আমাকে ভালবাসতে থাকে। পরে একদিন আমিই এ বাড়ির মালিক হয়ে বসি।

লোত্তে প্যাস্টরের মেয়ের খোঁজ করতে লাগল। মেয়েটি তার সমবয়সী। প্যাস্টর বলল, তার প্রণয়ী স্মিদের সঙ্গে বেড়াতে গেছে মাঠ দিয়ে। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই প্যাস্টরের মেয়ে ফ্রেদারিক ও স্মিদ এসে গেল। লোত্তেকে

দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে এগিয়ে এসে তার হাত ধরল ফ্রেদারিক। আমরা একসঙ্গে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু ফ্রেদারিকের প্রণয়ী ছেলেটি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় ভাল করে অংশ গ্রহণ করল না। তাকে কেমন যেন অসামাজিক দেখাচ্ছিল। বিশেষ করে আমি যখন ফ্রেদারিকের গা ঘেঁষে বেড়াচ্ছিলাম তখন মুখখানা কালো হয়ে উঠেছিল তার। তা দেখে লোত্তে আমার হাতে চাপ দিয়ে তা লক্ষ্য করতে বলল।

সন্ধ্যের সময় আমরা প্যাস্টরের বাড়িতে ফিরে এলাম সবাই। খাবার টেবিলে বসে আমরা যখন সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম তখন আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম, আমরা সাধারণতঃ আমাদের দুর্দিন বা দুঃখের দিনের জন্য অভিযোগ করি ঈশ্বরের কাছে। আমরা অভিযোগ করে বলি সুখের দিন কত কম। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় এ ধারণা এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। কারণ আমরা যখন কোন সুখের দিন হাতের মুঠোর মধ্যে পাই তখন খোলা মন নিয়ে যদি তা নিবিড়ভাবে উপভোগ করি তার থেকে যে আত্মশক্তি পাব তা দিয়ে অনেক দুঃখ সহ্য করতে পারব। আসলে আমি ফ্রেদারিকের প্রণয়ীকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। প্যাস্টরের স্ত্রী তখন বলল, কিন্তু আমাদের অনুভূতির উপর আমাদের সব সময় জোর খাটে না। কারণ এই সব অনুভূতি দেহের উপর বেশী নির্ভরশীল। সুতরাং দেহ খারাপ থাকলে কোন কিছুতে আনন্দ পাই না।

আমি বললাম, তাহলে সেটা রোগ বলে ধরে নিতে হবে।

লোত্তে বলল, যদি আমার মনে কোন দুঃখ বিষাদ বা বিরক্তির ভাব আসে তাহলে আমি বাগানে গিয়ে একা একাই একটা কোয়াড্রিল নাচ নাচতে থাকি। ফ্রেদারিক আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। তার প্রণয়ীও শুনতে শুনতে এক সময় প্রতিবাদের সুরে বলল, মানুষ সব সময় তার আবেগের উপর খবরদারি করতে পারে না।

আমি বললাম, অস্বস্তিকর আবেগের হাত থেকে সবাই মুক্তি পেতে চায়। এই অস্বস্তিকর আবেগের মাত্রা যদি বেড়ে যায় তাহলে সেটা রোগ বলে ধরে নিতে হবে এবং তার প্রতিকারের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

আমি লক্ষ্য করলাম, প্যাস্টর আমাদের কথা মন দিয়ে শুনছে। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম যাজকরা বক্তৃতামঞ্চ থেকে মানুষের অনেক দোষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। কিন্তু তাঁরা অহেতুক বিষাদ বা বদমেজাজের বিরুদ্ধে

একটা কথাও বলেন না।

প্যাস্টর বলল, গ্রাম্য চাষীদের দোষ নাই। এ দোষ যদি থাকে তাহলে তা শহুরে লোকদেরই আছে এবং শহরের যাজকরাই তার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবে। তবে মাঝে মাঝে এ বিষয়ে কিছু উপদেশ দিলে অবশ্যই আমাদের স্ত্রীরা উপকৃত হবে।

প্যাস্টরের কথায় সবাই হেসে উঠল। কিন্তু ফ্রেদারিকের প্রেমিক যুবকটি বলল, বিষাদ বা বদমেজাজ একটা দোষ একথা আমার কাছে অত্যুক্তি বলে মনে হচ্ছে।

তার উত্তরে আমি বললাম, মোটেই না। যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদের ও অপরের আনন্দকে নষ্ট করি তার অন্য নাম কি হতে পারে বলুন? আমরা কাউকে সুখী না করতে পারি, তাকে আনন্দ না দিতে পারি কিন্তু তার ছোট্ট সুখ বা আনন্দটুকুকে কেড়ে নেব কোন অধিকারে বলতে পারেন? আচ্ছা আপনি কি এমন কোন বিষাদগ্রস্ত বা বদমেজাজী লোকের নাম করতে পারেন যিনি তাঁর অন্তরের বিষাদময়তাকে অন্তরের মধ্যেই চেপে রেখে দিতে পারেন? অর্থাৎ যিনি তাঁর নিজের দুঃখানুভূতির কোনরূপ অভিব্যক্তি না ঘটিয়ে অন্য কারো সুখ বা আনন্দের অনুভূতিকে নষ্ট করেন না? এ বিষাদ কি আমাদের নিজেদের প্রতিই এক বিরাগময় অর্থহীন আত্মাভিমানের দ্বারা লালিত এক আত্মবিরূপতা নয় যা মানবচরিত্রের একটি দোষ ছাড়া কিছুই নয়?

লোত্তে আমার পানে তাকিয়ে হাসল। ফ্রেদারিকের চোখে এক ফোঁটা জল দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, যারা অপরের অন্তরের স্বতস্ফূর্ত আনন্দকে কেড়ে নেয় তাদের ধিক, শত ধিক! যদি কারো একটি মুহূর্তের আনন্দ নষ্ট হয় তাহলে তার সে ক্ষতি পৃথিবীর কোন দান কোন সময় পূরণ করতে পারে না কখনো।

আমরা যেন প্রতিদিন এই কথাই সকলকে বলি যে যদি তোমার অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করার কোন ক্ষমতা থাকে তাহলে তার দ্বারা পরকে আনন্দ দান করো বা সুখী করার চেষ্টা করো। অপরের অন্তরখানি কোন কারণে দুঃখের দ্বারা পীড়িত হলে সে দুঃখের উপর কি কোন শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিতে পার?

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। একটি লোক তার স্ত্রীকে ভালবাসত না। এইভাবে তাদের যৌবন কেটে যায়। কিন্তু মেয়েটির মৃত্যুকালে

তার ম্লান মুখ আর সকরুণ অবস্থা লোকটার মনে করুণা জাগায়। তার হঠাৎ মনে হলো তার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্য সে তার সব কিছু দিয়ে দিতে পারে।

আমাদেরও উচিত এইভাবে প্রতিটি ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তাদের নিরানন্দ অন্তরে এক ফোঁটা আনন্দ সঞ্চারের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা।

আবেগের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার চোখে জল এসেছিল। আমি রুমালে চোখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। যাবার সময় লোত্তে আমায় ডাকতে আমার হুঁস হলো। পথে লোত্তে বলল, তুমি বড় ভাবপ্রবণ। সব কিছুতে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত নয়। এতে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আমি তখন মনে মনে বললাম, তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্যই আমি বাঁচব হে কন্যা।

সে প্রায়ই তার মুমূর্ষু বন্ধু প্যাস্টরকে দেখতে যায়। আর একদিন দুই বোন মেরিয়ানে ও আমেলিয়াকে সঙ্গে করে গিয়েছিল। পথে আমি ওদের সঙ্গী হয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে পথ চলার পর পথে একটা ঝর্ণা পড়ল। আমরা সবাই সেই ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসলাম। স্বচ্ছশীতল জলের ধারা দেখে লোত্তের বোনরাও আনন্দিত হলো। ওদের সঙ্গে একটা গ্লাস ছিল। ঝর্ণার জল পান করার জন্য মেরিয়ানে সেই গ্লাসটা বার করতেই ছোট্ট আমেলিয়া বলল, লোত্তে, তুমি আগে খাও। তার কচি মুখের আধো আধো কথা শুনে আমার ভারী ভাল লাগল। আর আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে ও গালে আন্তরিকতার সঙ্গে চুম্বন করলাম। মেয়েটি তাতে কেঁদে উঠল।

লোত্তে তখন আমাকে বলল, তুমি অন্যায় করেছ। এই বলে আমেলিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে ঝর্ণার ধারে নিয়ে গিয়ে বলল, এই জলে মুখটা ধুয়ে নাও নিজের হাতে। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আর আমেলিয়া তার কচি হাত দিয়ে জল তুলে তার গাল মুখ সব ধুতে লাগল। লোত্তে বলল, এবার হয়েছে। তবু সে ধুয়ে যেতে লাগল। আমি তার মুখ চুম্বন করে যে কলুষ ও অপবিত্রতায় ভরে দিয়েছি সে মুখ তার যেন শেষ নেই।

এই ঘটনায় আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। কথাটা কোন এক লোককে বলি। সে বলে, লোত্তে সত্যিই খুব অন্যায় করেছে। এটা কুসংস্কার, বাচ্চা মেয়ের

মুখ বাইরের কোন লোক চুম্বন করলে সে মুখে দাঁড়ি গজায় বা মুখ অপবিত্র হয় এটা অন্ধ কুসংস্কারমাত্র।

আমার মনে হলো আমরাও অনেক সময় শিশুর মত ভ্রান্তি বা মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হয়ে ভুল করে বসি।

জুলাই ৮,

হায়, কি ধরনের শিশু আমরা! সামান্য দুটো চোখের দৃষ্টির জন্য কত লোভ আমাদের। আমরা সেদিন গাড়িতে করে ওয়ালহেম গাঁয়ে ফিরলাম। গাড়িতে কয়েকজন মহিলা ও দু'টি যুবক ছিল। আর ছিলাম আমি আর লোত্তে। সব সময় সারা পথ ধরে আমি শুধু লোত্তের পানে তাকিয়েছিলাম। শুধু লক্ষ্য করছিলাম সে কোন দিকে কখন তাকায়। কিন্তু একবারও সে আমার পানে তাকাল না। তার দৃষ্টি কেবল এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুরি করছিল। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল তার কালো চোখের চতুর দৃষ্টিতে আমি এক নির্বোধ মাত্র। তার বাড়ির দরজার কাছে গাড়ি থেকে নেমে গেল লোত্তে। সে আমার মুখপানে একবার নীরবে তাকাল মনে হলো। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না সে আমাকেই দেখল না অন্য কাউকে দেখল।

জুলাই ১০,

লোত্তের পাল্লায় পড়ে আমি এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই। বৃদ্ধা অনেকদিন ধরে ভুগছেন। এখন তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। লোত্তেকে তিনি স্নেহ করতেন। একদিন লোত্তের সামনে বৃদ্ধা এক স্বীকারোক্তি করলেন। বড় অদ্ভুত লাগল সে কথা। তাঁর স্বামী বরাবর অতিশয় কৃপণ প্রকৃতির ছিল। তার অবস্থা যখন খারাপ ছিল তখন সপ্তায় যা সংসার খরচ দিত, তার অবস্থা ভাল হলে অর্থাৎ কাজ কারবারের উন্নতি হলেও সেই খরচই দিত। কোন মতেই সে তার থেকে বেশী দিতে রাজী হয়নি। অথচ আগের থেকে সংসারের বহর বেড়ে যাওয়ায় খরচপত্রও বেড়ে যায় প্রচুর। তখন অগত্যা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে স্বামীর ক্যাশবাক্স থেকে প্রতিমাসে চুরি করতে হত। এছাড়া কোন উপায় ছিল না তাঁর। মৃত্যুকালে একথা প্রকাশ না করে শান্তি পাচ্ছেন না তিনি মনে। তাই স্বীকারোক্তি করলেন।

জুলাই ১৩,

না, নিজেকে আমি ভোলাচ্ছি না। আমি সত্যিই তার চোখে স্পষ্ট দেখেছি আমার প্রতি এক অকৃত্রিম মমতাকে মূর্ত হয়ে উঠতে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি

আমার নিজের অন্তরকে বিশ্বাস করি। সে আমাকে সত্যিই—হায়, সে আমাকে ভালবাসে একথাটা যদি আমি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারতাম। সে আমাকে ভালবাসে একথাটা মনে ভাবতেই নিজের কাছে নিজেকে মূল্যবান মনে হতে লাগল আমারও। একথা তোমাকে না বলে পারলাম না। কারণ তোমার বোধশক্তি আছে, হৃদয় আছে।

আমি কিন্তু জানি না সে আমাকে ঠিক ভালবাসে কি না। বুঝতে পারছি না আমার এই ধারণা দুঃসাহসের নামান্তর কি না। তবে লোত্তে যখন তার ভাবী স্বামীর কথা বলে তখন বেশ বোঝা যায় সে তাকে ভালবাসে। সে ভালবাসার সঙ্গে মিশিয়ে আছে অন্তরের উত্তাপ। তখন আমার খুব খারাপ লাগে। নিজেকে ছোট মনে হয়। বঞ্চিত মনে হয়।

জুলাই ১৬,

এক জায়গায় বসে কথা বলতে বলতে যখন আমার হাত বা হাতের আঙুল লোত্তের হাতে কোনভাবে ঠেকে যায় তখন কেমন যেন একটা প্রবল আলোড়ন শুরু হয়ে যায় আমার সারা দেহ মনে। আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরায় শিরায় রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে। এক রহস্যময় অদম্য শক্তি তার দিকে অর্থাৎ তার আরো কাছে টেনে নিয়ে যায় আমায়। তার নিষ্পাপ সরলতা আমার বড় ভাল লাগে। তার মন কত পবিত্র। সে কথা বলতে বলতে আবেগের ঝোঁকে অনেক সময় আমার হাতে হাত দিয়ে বসে। কিন্তু বুঝতে পারে না তার প্রতিক্রিয়া কত ভীষণ আমার পক্ষে।

তবে আমার কাছে সে সত্যিই এক পবিত্র দেবদূতের মত। সে আমার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমারও দেহগত সকল কামনা বাসনারা নীরব নিরুচ্চার হয়ে যায়। আমার সকল দুঃখ বেদনা স্তব্ধ হয়ে যায়। সে যখন পিয়ানো বাজিয়ে গান গায়, তার গানের মিষ্টি সুরে আমারও হৃদয়ের যতসব অন্ধকার, যত সব ভ্রান্তি কোথায় যেন মুহূর্তে উবে যায়। নিজেকে তখন বড় হাল্‌কা মনে হয়। খুব সহজ মনে হয়।

জুলাই ১৮,

বল উইলেম, প্রেম ছাড়া জীবনের কি অর্থ হয়? ম্যাজিক লণ্ঠনের মধ্যে বাতি না থাকলে তার যেমন অবস্থা হয় প্রেম ছাড়া জীবনেরও হয় সেই অবস্থা। অথচ ম্যাজিক লণ্ঠনের প্রভাবে সাদা পর্দার উপর যে সব রঙীন ছবি ফুটে ওঠে সেগুলো মিথ্যা অর্থহীন হলেও আমরা তা শিশুর মত অবাক বিস্ময়ে দেখি।

বিশেষ কারণে আটকে পড়ায় আজ আমি লোত্তেকে দেখতে যেতে পারিনি। আমার বালকভৃত্যটাকে তার কাছে পাঠাই। ছেলেটার পথপানে তাকিয়ে অধীর অপেক্ষা করতে থাকি আমি। সে যখন ফিরে আসে তখন লজ্জায় বিরত না হলে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতাম আমি।

শুনেছি বোলোগনা পাথর নামে এক ধরনের পাথর আছে যা সূর্যের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তুলে ধরে থাকলে তা সূর্যরশ্মিকে আকর্ষণ করে ধরে রাখে তার মধ্যে। আমার বালকভৃত্যটাকেও সেই পাথরের মত মনে হলো আমার। আমার কেবলি মনে হতে লাগল ও লোত্তের কাছে গেলে লোত্তে ওকে দেখেছে কথা বলেছে। তার মধুর দৃষ্টির স্বর্গীয় দ্যুতি ঝরে পড়েছে ওর সারা দেহে এবং তা এখনো লেগে আছে। সে দ্যুতির স্পর্শে পবিত্র হয়ে আছে ওর সারা দেহ। সেই মুহূর্তে অসংখ্য মুদ্রার বিনিময়েও ছেলেটাকে ছাড়তে পারতাম না আমি। বল উইলেম, সেই সময় আমি ছেলেটাকে দেখে ও তার সাহচর্য উপভোগ করে যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা কি মিথ্যা? তা কি অর্থহীন?

জুলাই ১৯,

আজ আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। সকালে উঠে উজ্জ্বল সূর্যের সামনে তাকিয়ে চিৎকার করে কথাটা বলতে ইচ্ছা করছে আমার। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। সারা দিনের মধ্যে আর কিছু করার ইচ্ছা নেই আমার।

জুলাই ২০,

তুমি আমাকে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিদেশে যেতে বলেছ। কিন্তু তোমার পরামর্শ মানতে পারলাম না। আমি নিয়ম শৃংখলার কথা কিছু বুঝি না। আমরা সবাই জানি লোকটা ভাল নয়। তুমি লিখেছ আমার মা চান আমি কোন একটা কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ি। কথাটা শুনে হাসি পেল আমার। আমি কি কাজে নিযুক্ত হইনি? এটা কি কাজ নয়? বাইরের কাজটাই কি সব? যে মানুষ নিজের কোন না কোন উচ্চাশা বা লাভ করার বাসনা ত্যাগ করে শুধু পরের জন্য খেটে খেটে জীবনপাত করে চলে সে বোকা।

জুলাই ২৪,

তুমি আমাকে ছবি আঁকার কথা প্রায়ই বল। এ বিষয়ে আমি স্পষ্ট স্বীকার করতে চাই যে আমি এতদিন কিছুই আঁকতে পারিনি।

প্রকৃতির কাছে গিয়ে আমি আনন্দ পেতাম। প্রকৃতির ঘাস পাথর প্রভৃতি প্রতিটি বস্তুকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পর্যবেক্ষণশক্তি ভাল না

থাকায় আমি আমার চোখের দেখা সেই সব প্রকৃতির বস্তুকে ঠিকমত ফুটিয়ে তুলতে পারিনি অথবা তাদের সম্বন্ধে আমার মনের অনুভূত সত্যকেও প্রকাশ করতে পারিনি। ছবি আঁকার সময় আমার মনশ্চক্ষুর সামনে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। আমার তখন মনে হয় আমার হাতে একতাল কাদামাটি থাকলে আমি তাই নিয়ে কিছু একটা গড়তে পারতাম।

আমি তিন তিনবার লোত্তের একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করি আর তিনবারই ব্যর্থ হই। তাতে আমার নিজের উপর রাগ হয়। অথচ কিছুদিন আগে আমি তা ভালভাবেই পেরেছিলাম।

জুলাই ২৬,

আমি প্রায়ই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এত ঘন ঘন তার কাছে যাব না। যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু হায়, এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু আমি রাখতে পারি না। প্রতিদিনই আমি প্রতিজ্ঞা করি আর প্রতিদিনই আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি। লোত্তের কাছে যাওয়ার প্রলোভন আমি জয় করতে পারি না। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে যাবার জন্য কোন না কোন যুক্তি খাড়া করি এবং কখন এক সময় তার কাছে গিয়ে পড়ি। কোন কোনদিন অবশ্য লোত্তের কাছ থেকে আসার সময় সে আমাকে বলে, কাল তুমি আসবে না? কি বলছ? এই ধরনের কথা শুনে কেউ কখনো ঠিক থাকতে পারে? না গিয়ে থাকতে পারে? অথবা যেদিন লোত্তে এসব বলে না বা যাবার জন্য কোন অনুরোধ করে না সেদিনও দিনটা উজ্জ্বল হলেই আমি আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাড়ি গিয়ে পৌছি। আমার ঠাকুরমা ছেলেবেলায় এক চুম্বক পাহাড়ের গল্প করতেন। সেই অদ্ভুত পাহাড়টা দূর থেকে জাহাজের লোহার পেরেকগুলোকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করত। জাহাজগুলোও সেই আকর্ষণে পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত। আমারও আজ হয়ত সেই অবস্থা।

জুলাই ৩০,

আলবার্ত এসে গেছে, আমাকে এবার যেতে হবে। যদিও মানুষ হিসাবে আলবার্তের মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করি আমি তথাপি আমার সামনে আমার প্রেমাস্পদের কাছে তার উপস্থিতিকে সহ্য করতে পারি না আমি কিছুতেই। আমারই সামনে সে আমার প্রেমের বস্তুকে করায়ত্ত করে ফেলবে এটা ভাবতেও পারি না আমি। অথচ ও তার ভাবী স্বামী, কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। আর পাত্র হিসাবেও সব দিক থেকে যোগ্য আলবার্ত। তার গুণের জন্য আমিও তাকে

পছন্দ না করে পারি না। কিন্তু তা হলেও আলবার্তকে যদি আমার সামনে অভ্যর্থনা জানাত লোত্তে তাহলে আমি তা সহ্য করতে পারতাম না। আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেত। আলবার্তের আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ বড় তীক্ষ্ণ। আমার সামনে সে কোনদিন লোত্তেকে চুম্বন করেনি। লোত্তের প্রতি তার সংযত ও শোভন আচরণ দেখে তাকে আমি ভাল না বেসে পারি না। তাছাড়া আমার প্রতিও সে বন্ধুত্বের ভাব পোষণ করে। অবশ্য বলতে পার লোত্তে আমাকে কিছুটা পছন্দ করে বলেই হয়ত সে আমাকে ভালবাসে। অনেক সময় মেয়েরা সম্ভব হলে তাদের দুজন গুণগ্রাহী বা প্রেমিককে পুষে রাখে, কারণ তাতে তাদেরই লাভ।

কিন্তু আলবার্তকে আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না। তার শান্ত স্বভাব ও আচার-আচরণ আমার চঞ্চল স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। মনের চঞ্চলতা আমি কখনো দমন করে রাখতে পারি না। সে কখনো রাগে না বা মাথা গরম করে না, যেটা তুমি জান আমি মোটেই পছন্দ করি না।

আলবার্ত আমাকে বিজ্ঞ মানুষ বলে জানে। লোত্তের সঙ্গে মেলামেশা করে আমি আনন্দ পাই তা সে জানে। তবু কিছু মনে করে না। অবশ্য আমার অসাক্ষাতে সে লোত্তেকে কিছু বলে কিনা তা জানি না।

সে যাই হোক, লোত্তের সাহচর্যে আনন্দ লাভের পথ বন্ধ হয়ে গেল। তার প্রতি আমার এই আসক্তির প্রবণতা কি নির্বুদ্ধিতা? যাই হোক, যাই বল, সে সুখে থাকত জানি। আলবার্তের আসার আগেই এমন ঘটবে আমি জানতাম। আলবার্ত যখন এসে গেছে তখন লোত্তের উপর আর আমার কোন আসক্তি নেই।

আমার নিজের অসহায়তা ও হতভাগ্য অবস্থায় আমি নিজেই হা-হুতাশ করি। আমি নিজেকেই উপহাস করি। যারা আমাকে এ অবস্থায় ধৈর্য ধরতে বলে অথবা মুখ বুজে সব নীরবে সহ্য করে যেতে বলে তাদেরও উপহাস করি আমি। আমি আজ কাল সময় কাটাবার জন্য শূন্য মনে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। বেড়াতে বেড়াতে এক সময় লোত্তের বাড়িতে পৌছে যাই। দেখি তাদের বাগানে আলবার্ত তার পাশে বসে রয়েছে। তাদের কাছে আমি অনেক সময় কোন কিছু করার বা বলার না পেয়ে ভাঁড়ের মত আজে বাজে কথা বলি অথবা অভিনয় করি। তা দেখে লোত্তে নিজেই অস্বস্তি বোধ করে। একদিন সে স্পষ্টই বলে আমায়, গতকালকার মত ওরকম অভিনয় আর তুমি দেখিও না।

আলবার্ত লোত্তের কাছ থেকে অন্য কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি। লোত্তেকে একা পেয়ে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

আগস্ট ৮,

কিছু মনে করো না উইলেম, যারা আমায় ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দেয়, আমি তাদের দলে তোমাকে ধরিনি। তুমি যে এই ধরনের উপদেশ দেবে তা আমি ভাবতে পারিনি। জগতে ও জীবনে কখনো মানুষ একই সঙ্গে দুটো পথে চলতে পারে না। দুটো পথের মধ্যে একটাকে তাকে বেছে নিতেই হয়, কারণ একটা পথ ধরতে গেলেই অনেক আবেগ বা অনুভূতির স্তর অতিক্রম করতে হয়। তাই তোমার সব যুক্তি ও পরামর্শ ভালভাবে বিবেচনা করে দেখার পরও যদি আমি সেইমত চলতে না পারি তাহলে কিছু মনে করো না যেন।

হয় লোত্তেকে পাবার আশা আছে আবার হয়ত তা নেই। যদি আশা থাকে তাহলে তাকে লাভ করার জন্য আমার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্য আমাকে চেষ্টা করে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। আর যদি তা না থাকে তাহলে এই অস্বস্তিকর আবেগের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। তা না হলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাব আমি।

কিন্তু যন্ত্রণাকাতর কোন মানুষকে কি তুমি যন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করার পরামর্শ দেবে? যে রোগ থেকে এ যন্ত্রণার উদ্ভব হয় সে রোগ কি তার সব সাহস ও শক্তিও নষ্ট করে দেয় না?

তুমি হয়ত যুক্তি দেখিয়ে বলবে দীর্ঘ যন্ত্রণাভোগের থেকে অস্ত্রোপচার মেনে নেওয়া অনেক ভাল। দরকার বুঝলে আমাকেও তাই হয়ত করতে হবে।

আগস্ট ১০,

আমি যদি নির্বোধ না হতাম তাহলে এই অবস্থায় আমি প্রচুর সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারতাম। আনন্দোপভোগের এমন অনুকূল অবস্থা এমন সুন্দর যোগাযোগ ঘটে ওঠে না কোন মানুষের ভাগ্যে। একটি গোটা পরিবারের সকলের ভালবাসা পাওয়া কি সহজ কথা? পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা আমাকে আপন সন্তানের মত ভালবাসেন। পরিবারের ছেলেমেয়েরা সবাই আমাকে তাদের বাবার মতই ভালবাসে। লোত্তে নিজেও আমাকে সহানুভূতির চোখে দেখে। আলবার্ত আমাকে পরম বন্ধুর মত ভালবাসে। সে আজ পর্যন্ত একটি মুহূর্তের জন্যও আমাকে দেখে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়নি। আমার সুখে কখনো ব্যাঘাত ঘটায়নি সে। সবচেয়ে আমার ভাল লাগে

আলবার্ত আর আমি দুজনে যখন পথ চলি আর আলবার্ত আমাকে শোনায় লোত্তের গুণের কথা তখন সত্যিই আমার চোখে জল আসে। আলবার্ত বলে, লোত্তের মা মৃত্যুকালে লোত্তের উপর সংসারের সব ভার দিয়ে যায়। তারপর থেকেই লোত্তে ঘোর সংসারী হয়ে ওঠে। সব ছেলেমেয়েরা তাকে মায়ের মত জ্ঞান করতে থাকে। অথচ ঘর সংসারের এত সব কাজকর্ম করেও তার বিরক্তি নেই মুখে। সব সময় হাসি লেগে আছে সে মুখে। লোত্তের গুণের এই সব কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল আসত। আলবার্ত কিছুদিনের মধ্যেই কাউন্টের কাছ থেকে ডাকযোগে কিছু টাকা পাবে। তার মত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান যুবক খুব কমই আছে।

আগস্ট ১২,

আলবার্ত সত্যিই বড় চমৎকার লোক। গতকাল অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে। গতকাল তার বাড়িতে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে। আমি কিছুদিনের জন্য পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে যাচ্ছি। তার বাড়িতে গিয়ে আমি তার দুটো পিস্তল দেখে আমি সেদুটো চেয়ে বসি। বলি ওদুটো আমায় ধার দাও কিছুদিনের জন্য। পথে কাজে লাগতে পারে।

তখন আলবার্ত তার এই পিস্তলের গল্প বলতে থাকে। সে বলে, একবার সে তাদের গাঁয়ের বাড়িতে তার কোন এক বন্ধুর সঙ্গে তিনমাস কাল থাকে। এই পিস্তল দুটো তখন তার কাছেই ছিল। কিন্তু কোন কাজে লাগেনি। কোন প্রয়োজন হয়নি ওদের। কোন এক বৃষ্টির দিনে হঠাৎ আমার মনে হয় আজ রাতে হয়ত দরকার হতে পারে। হয়ত কোন চোর ডাকাত আসতে পারে। এই ভেবে একজন চাকরকে পিস্তল পরিষ্কার করতে বলি। সে পরিষ্কার করে গুলি ভরে ঝিদের ঠাট্টা করে ভয় দেখাতে থাকে। হঠাৎ একটা গুলি ফস্কে যায় আর তা একটি মেয়ের হাতে লাগে। সার্জেন ডেকে তার চিকিৎসার সব খরচ দিতে হয় আমায়। সেই থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি ওদের আমি ব্যবহার করব না। সেই থেকে ওরা পড়ে আছে এইভাবে। জানবে মানুষ সব বিপদ হতে আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থা করে রাখতে পারে না। বিপদ যখন আসার আসবেই। তার কথা বলা শেষ হলে আমি একটা পিস্তল নাড়াচাড়া করতে করতে তার নলটা আমার মাথায় কপালের কাছে ঠেকিয়ে ধরলাম। আলবার্ত আমার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে বলল, এর মানে কি?

আমি বললাম, ওর ভিতরে গুলি নেই।

আলবার্ত বলল, তা হলেও এর কোন মানে হয় না। মানুষ কিভাবে যে নিজেকে গুলি করে মারে তা আমি বুঝতে পারি না।

আমি বললাম, কোন একটা কাজ ঘটলেই তোমরা সবাই ভালমন্দ নাম দিয়ে বিচার করতে থাক। কিন্তু কোন অন্তর্নিহিত প্রেরণার বশে মানুষটা সে কাজ করতে বাধ্য হলো তা তোমরা কেউ ভেবে দেখ না। সেখানে এত তাড়াতাড়ি বিচারের রায় দিতে না।

আলবার্ত বলল, কতকগুলি কাজ আছে বিশ্বাস করো, সত্যিই খারাপ, তার কারণ যাই থাক, যে কোন দিক দিয়ে তা বিচার করা যাক্।

আমি বললাম, তা হয়ত ঠিক বন্ধু, কিন্তু সেখানেও কথা আছে। মনে করো, চুরি করা পাপ কিন্তু যে মানুষ তাকে নিজেকে বা তার পরিবারকে অনশন আর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চুরি করে সে ঘৃণার যোগ্য না সহানুভূতির পাত্র? কেউ যদি তার অবিশ্বাসী স্ত্রী ও তার অবৈধ প্রণয়ীকে রাগের বশে হত্যা করে তাহলে কে তাকে অপমান করবে? এমন কি আইনেও অনেক সময় এই সব ঘটনার শাস্তিদানে বিরত থাকে।

আলবার্ত বলল, ওটা অন্য ব্যাপার। যে মানুষ আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন কাজ করে তার কোন যুক্তিবোধ বা চিন্তাশক্তি থাকে না। তার আচরণ তখন পাগল অথবা মাতাল লোকের আচরণের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে।

আমি চিৎকার করে বললাম, তোমরা যুক্তিবাদীরা আবেগপ্রবণ লোকদের মাতাল ও পাগল বলে ঘৃণা করো। ঠাণ্ডা মাথায় এসব কথা বলা সহজ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিও কারণ সে অবস্থায় তোমরা পড়নি। তবে দুনিয়ায় যারা বড় কাজ করেছে বা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে তাদের লোকে পাগল অথবা মাতাল বলে বদনাম দিয়ে এসেছে।

আলবার্ত বলল, তুমি আবেগের বশে বাড়াবাড়ি করছ। আত্মহত্যার কথা আলোচনা হচ্ছিল। আত্মহত্যাটাকে কোন মহৎ কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলবে না। তুমি এইখানেই ভুল করছিলে। আসলে আত্মহত্যা কাজটা একটা দুর্বলতা ছাড়া কিছুই নয়। দুঃখের জীবন সহ্য করার থেকে মৃত্যুবরণ করা সহজ বলেই লোকে আত্মহত্যা করে থাকে।

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল। এক উত্তপ্ত আবেগে অন্তর আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবু কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তুমি এটাকে দুর্বলতা বলছ? যখন মানুষ প্রবল অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়, যখন তার চোখের

সামনে তার ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয় তখন যদি সে একা নিরস্ত্র অবস্থায় আধ ডজন সশস্ত্র লোকের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়ে তখন তার সেই মরীয়া ভাবটাকে দুর্বলতা বলবে ?

আলবার্ত আমার মুখপানে তাকিয়ে বলল, কথাটাকে অন্যভাবে নিও না। তুমি যে সব দৃষ্টান্তের উল্লেখ করলে তা ঠিক এখানে প্রযোজ্য নয়।

আমি বললাম, আমার খাড়া করা সব যুক্তি যে অসার, এ অভিযোগ এর আগেও শুনেছি। যাই হোক, কথাটাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, আত্মহননেচ্ছু একটি মানুষের মনের প্রকৃত অবস্থাকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করা।

আলবার্ত কিছু বলার আগেই আমি আরও বললাম, মানুষের প্রকৃতিটা এমন ভাবে গঠিত যে তার সহ্যের একটা সীমা আছে। সেই সীমা কোনভাবে অতিক্রান্ত হলেই সে তা আর সহ্য করতে পারে না। তাহলে আসল কথা হচ্ছে মানুষের সহ্যশক্তির পরিসীমা, সে কতখানি সবল বা দুর্বল তা দিয়ে এ ব্যাপারে তার কোন বিচার চলবে না। দেখতে হবে পার্থিব অপার্থিব যে সব দুঃখ সে পাচ্ছে তা সহ্য করার ক্ষমতা তার আছে কিনা। যদি তা না পারে তাহলে সে আত্মহত্যা করবেই। এক্ষেত্রে সে যদি সে দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসে তাহলে কোনক্রমেই তাকে কাপুরুষ বলা চলবে না, যেমন কোন দূষিত জ্বরের প্রকোপে কোন লোক মারা গেলে তাকে কাপুরুষ বলা চলে না।

আলবার্ত বলে উঠল, তোমার কথা বৈপরীত্যমূলক।

আমি বললাম, যতটা ভাবছ তুমি ততটা নয়। যখন কোন ভয়ঙ্কর রোগের আক্রমণ আমাদের দেহের সব শক্তিকে ক্ষয় করে ফেলে এবং সে ক্ষয় পূরণ হবার কোন আশা থাকে না তখনই সে রোগকে আমরা মারাত্মক রোগ বলি। মানুষের মনও অনেক সময় এই ধরনের ভয়ঙ্করভাবে প্রবল ভাবাবেগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে আক্রমণের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তার থাকে না। কোন সুস্থ বা বলিষ্ঠ মানুষ যেমন কোন অসুস্থ রুগ্ন ব্যক্তিকে সৎ পরামর্শ দিয়ে তার রোগ সারাতে পারে না তেমনি কোন প্রকৃতিস্থ মানুষ তার ঠাণ্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মারাত্মক ভাবাবেগকে প্রশমিত করতে পারে না কোনভাবে।

আমি বুঝলাম এসব কথা বলে আলবার্তকে আমার মনের আসল কথাটা ঠিক বোঝানো যাবে না। আমি তাই এক বিশেষ ঘটনার কথা বললাম।

কিছুদিন আগে স্থানীয় একটা জলাশয়ে একটি মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আমি তার সূত্র ধরে বললাম, কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি কুমারী মেয়ে বাস করত। বাড়িটি রক্ষণশীল বলে সে কোথাও যেতে পারত না। শুধু রবিবার একটু ভাল পোষাক পরে কিছুটা বেড়াতে যেত। তাও আবার তার সমবয়সী বান্ধবীদের সঙ্গে। অন্য দিন শুধু সারাদিনের মধ্যে দু এক ঘণ্টা কোন প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলা ছাড়া অন্য কোন আমোদ প্রমোদের সুযোগ পেত না। আর কোন কোন উৎসবের দিন কোন নাচের আসরে যোগদানের সুযোগ পেত। এইভাবে যখন মেয়েটির দিন কাটছিল তখন একটি লোকের সঙ্গে তার আলাপ হলো এবং সেই আলাপ পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতা ও পরে ভালবাসায় পরিণত হলো। সব কিছু ভুলে লোকটিকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলল মেয়েটি। সারা জগৎ ও জীবনের মধ্যে সেই লোকটিই হয়ে উঠল তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। কিন্তু তাদের ভালবাসাবাসি যখন আদর চুম্বন ও প্রতিশ্রুতির বিভিন্ন স্তর পার হয়ে চরমে উঠেছিল তখনই হঠাৎ একদিন লোকটি মেয়েটিকে ত্যাগ করে চলে গেল। নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল মেয়েটির কাছে। তার মনে হলো, সমগ্র জগতের মধ্যে সে একেবারে একা। তার যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে তার জীবনের অস্তিত্ব জড়িয়ে পড়েছিল সে প্রেমাস্পদ তাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতেই তার অস্তিত্ব হয়ে গেল বিপন্ন। যে ভয়ঙ্কর বেদনায় প্রতি মুহূর্তে নিপীড়িত হচ্ছিল তার সমগ্র অন্তরাত্মা সে বেদনার হাত হতে মুক্তি পাবার জন্য সে আত্মহত্যা করে বসল। এখন বল আলবার্ত, মেয়েটির সেই জটিল মানসিক অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব কি দুরারোগ্য কোন ব্যাধির মতই ভয়ঙ্কর নয়?

অনেকে হয়ত বলতে পারে মেয়েটি কি বোকা! সে কিছুদিন নীরবে অপেক্ষা করলেই হয়ত তার বিক্ষুব্ধ চিত্তাবস্থা শান্ত হত, হয়ত সে আর একজন প্রেমিক খুঁজে পেত। কিন্তু আসলে কি এ কথার কোন অর্থ হয়? কোন লোক দূষিত জ্বরে মারা গেলেও তাকে বলতে হয় সে আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই তার জ্বর সেরে যেত, সে তার ক্ষয় হয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি ফিরে পেত। রক্তের সব তাপ ও উত্তাপতা প্রশমিত হলে সে আবার বাঁচতে পারত।

তবু আলবার্ত আমার যুক্তি মানতে পারল না। সে বলল, আমি এমন এক দুর্বলমনা মেয়ের কথা তুলে ধরেছি যার কোন মানসিক শক্তি নেই। কোন পরিণত বয়স্ক মানুষ যার যুক্তিবোধ প্রবল এবং যা থাকে সে কখনো এ ধরনের

কাজ করতে পারে না।

আমি তখন বললাম, দেখ, মানুষের যুক্তিবোধেরও একটা সীমা আছে। এই যুক্তিবোধ দিয়ে সে তার চিত্তের সব ভাবাবেগকে শান্ত করতে বা তার সব অন্তর্দ্বন্দ্বকে দমন করতে পারে না। যাই হোক, আজ আমি চলি। আসল কথা, এ জগতে সকলেই আপন আপন মনে চলে। কেউ কাউকে বুঝিয়ে তার স্বমতে আনতে পারে না।

এই বলে আমি আমার টুপীটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আলবার্তের ঘর থেকে।

আগস্ট ১৫,

ভালবাসা ছাড়া মানুষকে এত আপন এত অত্যাবশ্যক আর কিছু করে তুলতে পারে না আমাদের কাছে। আমার মনে হলো লোত্তে আমাকে একেবারে ত্যাগ করতে পারবে না। লোত্তেদের বাড়ি আমি একদিন না গেলে চলে না। তার ভাইবোনরা আমাকে রোজ যেতে বলে। আসার সময় বার-বার বলে দেয় 'কাল সকালে এসো যেন।' আমি রোজ সকালে গিয়ে পাউরুটি কেটে তাদের সবাইকে ভাগ করে দিই। তারা আমার কাছে রূপ-কথার গল্প শুনতে চায়। অনেক সময় তাদের জন্য আমি গল্প বানিয়ে বলি।

আগস্ট ১৮,

ভাগ্যের কি পরিহাস! একদিন মানুষ যার থেকে কত আনন্দ পায় পরে একদিন তাই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে তার কাছে।

আমি প্রকৃতিকে কত ভালবাসতাম। প্রকৃতির যে সব বস্তু একদিন আমায় এক চরম আনন্দে পরিপ্লাবিত করে তুলত আমার অন্তর আজ তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে বেদনায় পীড়িত হতে থাকে আমার সে অন্তর। আগে আমি যখন কোন শান্ত গোধূলিবেলায় কোন পাহাড়ের উপর বসে নদী ও প্রস্রবণবিধৌত উপত্যকাভূমির পানে তাকাতাম, কত অজানা পাখির স্বর ঝরে পড়া ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের উপর কত কীটপতঙ্গ উড়ে বেড়াত, তখন মুক্ত আকাশের তলে আমার চারিদিকে পাহাড়ে উপত্যকায় বনে প্রান্তরে সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য দেখে ও তার কথা ভাবতে ভাবতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম আমি। মনে হত সৃষ্টির এই বিশাল ব্যাপক লীলাবৈচিত্র্যের পাশে আমি কত তুচ্ছ, কত নগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে আমি এই বিশ্বসৃষ্টির বৈচিত্র্য থেকে পরম স্রষ্টার চিন্তায় চলে যেতাম। তখন আমার চোখে দেখা প্রতিটি প্রাকৃতিক বস্তু আর প্রাণীর মধ্যে সেই পরম স্রষ্টার বিচিত্র

প্রকাশকেই মূর্ত দেখতাম আমি। মনে হত সেই এক অনন্ত পরম সত্তা বিচিত্র-রূপে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পাহাড়ে অরণ্যে প্রান্তরে, প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ-চঞ্চলতায় ছড়িয়ে আছেন। তাঁর সৃষ্টির আনন্দের একটা সামান্য অংশমাত্র আমাকেও বিভোর করে তুলছে।

আজ সেদিনের কথা ভাবতেও ভাল লাগছে। সেদিন যে অনির্বচনীয় আনন্দের আবেগ অনুভব করতাম আজ তার স্মৃতি আমার আত্মাকে দান করে এক মহান ভাবসমুন্নতি।

আজ আমার মনে আর সে অবস্থা নেই। আজ মনে হচ্ছে আমার মনের উপর যেন যুগান্তব্যাপী এক যবনিকা তুলে দিয়েছে কে। অতীতে একদিন সৃষ্টির এক সর্বব্যাপী আনন্দকে পরিব্যাপ্ত দেখতাম সারা বিশ্ব জুড়ে আজ সেখানে দেখি সাক্ষাৎ মৃত্যুর এক শূন্য বিশাল গহ্বর। আজ সর্বত্র সর্বক্ষণ বিশ্বসৃষ্টিতে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, ঝড় প্রভৃতি ধ্বংসের লীলাটাকেই বড় করে দেখি। মনে হয় এ জগতে সব কিছুই অনিত্য, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি এক সর্বধ্বংসী বিরাট মহাকাল যার চিরউন্মুক্ত করাল বদন প্রতিটি মুহূর্তরূপী কালখণ্ডকে গ্রাস করে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে।

আগস্ট ২১,

এক একদিন সকালে উঠেই তাকে ধরার জন্য দু হাত বাড়িয়ে দিই। রাত্রিতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নের মধ্যে আমার বিছানায় তার খোঁজ করি। স্বপ্নে দেখি কোন এক নির্জন প্রান্তরে আমি তার পাশে বসে আছি। তার একটা হাত ধরে আমি চুম্বন করছি বারবার। জেগে উঠেই হতাশ হই। চোখে জল পড়ে। আমার অন্তর বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আরো কান্না পায়।

আগস্ট ২২,

আমার অবস্থা খুবই খারাপ উইলেম। এক সদাচঞ্চল অর্থহীন চঞ্চলতায় আমার সব উদ্যম ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। চুপ করে বসে থাকতে পারছি না। আবার কোন কাজও করতে পারি না। আমার আর কল্পনাশক্তি নেই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমার কোন আগ্রহ নেই। বই পড়তেও ভাল লাগে না। প্রতিদিন একটা আশা নিয়ে জেগে উঠি। কিন্তু সে আশা কোথায় বিলীন হয়ে যায়। আলবার্তকে দেখে হিংসা হয়। কতবার মনে হয়েছে আমি তোমাকে সেই চাকরিটার কথা লিখি। সেই মন্ত্রী আমাকে অনেক দিন ধরে একটা চাকরি

করার কথা বলছিলেন। আমার অবস্থা এখন রূপকথার সেই ঘোড়াটার মত যে তার অবাধ মুক্তিতে হাঁপিয়ে উঠে আবার লাগাম কাঁধে নিয়ে খাটতে চেয়েছিল এবং মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাকে তার ফলে। আমি কি করব ঠিক তা বুঝে উঠতে পারছি না। আজ আমি যে পরিবর্তন চাইছি তা হয়ত আমার মনের এক গভীর অস্থিরতারই ফল। এ অস্থিরতা থেকে আমার মুক্তি নেই।

আগস্ট ২৮,

আমার মনের রোগ যদি কেউ দূর করতে পারে ত এরাই পারবে। আজ আমার জন্মদিন। আজ সকালে আলবার্তের কাছ থেকে একটা উপহার পাই। সেই উপহারের প্যাকেটে ছিল একটা গোলাপ আর দুখানা বই। লোত্তেকে আমি যখন প্রথম দেখি তখন এই রঙের গোলাপ তার বুকের উপর পরেছিল।

দুখানা বইএর মধ্যে একখানা ছিল আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত হোমারের ওয়েটস্লেন সংস্করণ। বইখানার কথা আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলাম আলবার্তকে। ওরা আমার মনের কথা বোঝে। তাকে কতখানি গুরুত্ব দেয়। জাঁকজমকপূর্ণ অন্য সব উপহারের থেকে এ উপহার আমার কাছে কত দামী। জীবনের কুঁড়ি কত ক্ষণভঙ্গুর উইলেম। কত কুঁড়ি অকালে ঝরে যায়, ম্লান হয়ে যায়। খুব অল্প কুঁড়িই ফুলে ফলে পরিণত হয়। তবে কুঁড়িকে যেমন আমরা ভালবাসি তেমনি পরিণত পাকা ফলকেও অবহেলা করা উচিত নয়। বিদায়, আজ এই পর্যন্ত থাক। এবারকার গ্রীষ্মটা বেশ ভাল লাগছে। আমি প্রায় দিন লোত্তেদের বাগানে লগা দিয়ে উঁচু ডাল থেকে পিয়ারা ফল পাড়ি আর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে লোত্তে তা কুড়িয়ে নেয়।

আগস্ট ৩০,

কী নির্বোধ, কী হতভাগ্য আমি! আমি কি নিজেকে প্রতারিত করছি না? এই অন্তহীন প্রেমাবেগের অর্থ কি? তাকে লাভ করার কথা ছাড়া আর কোন কথা আমার মুখে আসে না। তার ছবি ছাড়া আর কোন ছবি ফুটে ওঠে না আমার মনে। জগতে যা কিছু দেখি লোত্তের সঙ্গে তাকে সম্পর্কযুক্ত করে দেখি। যখন আমি লোত্তের পাশে দু তিন ঘণ্টা ধরে বসে থাকি আর তার সুন্দর মুখ থেকে ঝরে পড়া মিষ্টি কথা শুনি তখন মনে হয় যেন কোন নরঘাতক আমার গলাটা চেপে ধরেছে। মনে হয় আমার কোন অনুভব শক্তি নেই। মনে হয় আমি যেন আর ইহ জগতে নেই। তারপর লোত্তে যদি

দয়া করে তার হাতটা আমার চোখের জলে একবার ভিজিয়ে দিতে দেয় তাহলে আমি আর সেখানে না থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। তখন আমি কোন শূন্য বিশাল প্রান্তরে ঘুরে বেড়াই অথবা কোন খাড়াই পাহাড়ে কষ্ট করে উঠতে থাকি। নিজেকে অকারণে ক্লান্ত করে বা কোন কাঁটাঝোপে দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে অদ্ভুত একটা আনন্দ পাই। অনেক সময় রাত্রে বাসায় ফিরি না। ক্লান্ত দেহে পথেই শুয়ে থাকি। মাথার উপর মুক্ত আকাশে যখন চাঁদ ভাসতে থাকে আমি তখন কোন নির্জন বনভূমিতে কোন গাছের তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। হায় উইলেম, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আমার এ দুঃখের শেষ হবে না কিছুতে।

সেপ্টেম্বর ৩,

আমাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে। তুমি আমার প্রস্তাব সমর্থন করেছ জেনে খুশি হলাম। তোমাকে ধন্যবাদ। এক পক্ষকাল ধরে আমি এ বিষয়ে মনস্থির করার চেষ্টা করি। তাকে ছেড়ে যেতেই হবে। সে আবার শহরে গেছে তার কোন এক বন্ধুর কাছে।

সেপ্টেম্বর ১০,

হায়, আজকের এই রাত্রির কথা যদি আমি তোমাকে চোখের জলের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে পারতাম। আমার অন্তরের সব আবেগ যদি প্রকাশ করতে পারতাম তোমার কাছে। আজ রাতে আমি যে কোন বাধা অতিক্রম করতে পারব। আজ এই নিস্তব্ধ নিঝুম রাত্রির শান্ত বাতাসে বসে নিজের বিক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করার চেষ্টা করছি। সকালের জন্য প্রতীক্ষা করছি। সকাল হলেই ঘোড়া ঠিক করে রওনা হব।

লোত্তে এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। আমার চলে যাওয়ার কথা সে কিছুই জানে না। সে জানে না আর আমাকে সে কোনদিন দেখতে পাবে না। আজই বিকালে তার সঙ্গে আমার কত কথা হয়েছে। আলবার্তও তখন ছিল। আজই বিকালে ওদের বাগানে বাদাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি যখন সূর্যাস্ত দেখছিলাম তখন আলবার্ত ছিল না। বলেছিল ওরা একটু পরে রাতের খাওয়া সেরে আসবে। সামনে নদীবিধৌত উপত্যকাভূমিতে সূর্যাস্তের রং ছড়িয়ে পড়তে দেখছিলাম। এ দৃশ্য আমি কতদিন এর আগে লোত্তের সঙ্গে দেখেছি। কী আশ্চর্য! এ দৃশ্য আমি লোত্তের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার আগেই দেখতে ভালবাসতাম আর আমার এই প্রিয় দৃশ্যটা লোত্তেও ভালবাসত।

এই বাদামগাছের তলায় যেদিন আমি প্রথম আসি সেদিন আমার কেমন যেন ভয় লাগছিল। তার নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় হারিয়ে যেতে যেতে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আমাকে যেন অনেক দুঃখ পেতে হবে। আমাকে অনেক অনেক দুঃখবেদনা সহ্য করতে হবে।

আমি সেই গোধূলিবেলায় সেই বাদামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে লোত্তেকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবছিলাম, তাকে ছেড়ে যাবার বেদনাটাকে আপন মনে লালন করছিলাম এমন সময় আলবার্ত আর লোত্তে এসে হাজির হলো। লোত্তের পাশে আলবার্ত বসল। আমি ওদের সামনে বসলাম। পরে উঠে পড়লাম। আমার অস্থিরতা আর চঞ্চলতাটা চোখে পড়ল লোত্তের। আমি এক জায়গায় চুপ করে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না।

হঠাৎ লোত্তে এক সময় বলল, চাঁদের আলোয় একা একা বেড়ালেই আমার মৃত প্রিয়জনদের কথা কেন মনে পড়ে জান? আমরা হয়ত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকব, কিন্তু আবার কি আমাদের দেখা হবে? আমরা কি চিনতে পারব পরস্পরকে?

আমি লোত্তের একটা হাত চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে বললাম, আবার আমাদের দেখা হবে লোত্তে। দেখা হবে ইহলোকে ও পরলোকে।

বলতে পার উইলেম, লোত্তে কেন আমার চলে যাবার কিছু আগেই ওকথা জিজ্ঞাসা করল?

লোত্তে আবার তখন আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমাদের মৃত প্রিয়-জনরা কি আমাদের কথা জানতে পারে? আমাদের ভালবাসা কি তারা অনুভব করতে পারে? কতদিন নির্জন সন্ধ্যায় আমার মনে হয়েছে আমার মার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার চারপাশে। অশ্রুসজল চোখ তুলে আমাদের পানে তাকিয়ে কতবার মনে হয়েছে মা কি আমার স্বর্গ হতে দেখছেন আমি তাঁকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে চলেছি কিনা। মনে মনে বলি, মা তুমি দেখে যাও আমি আমার ভাই-বোনদের কত ভালবাসি, কত সম্প্রীতি ও ঐক্যের মধ্যে বাস করছি আমরা।

তার সে কণ্ঠস্বর কেমন করে চিঠিতে বোঝাব উইলেম। আলবার্ত একবার বলল, তুমি বড় আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছ লোত্তে। এখন এসব কথা থাক। কিন্তু লোত্তে বলল, সেই সন্ধ্যার কথা মনে ভাব একবার আলবার্ত, যেদিন বাবা বাইরে গিয়েছিলেন, যেদিন আমার ভাই-বোনদের সব ঘুম পাড়িয়ে আমি বসে

প্রার্থনা করছিলাম আর তুমি বই পড়ছিলে। আমি প্রার্থনা করছিলাম ঈশ্বরের কাছে, আমার মার আত্মার কাছে যাতে আমি মার কথা রাখতে পারি, যাতে আমি তাঁর মত হতে পারি।

আমি তখন লোত্তেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও তোমার মার আত্মার শুভেচ্ছা ঝরে পড়ুক তোমার উপর।

লোত্তে বলল, আমার মাকে তুমি দেখনি। দেখা হলে ভাল হত। এটা সত্যিই দুঃখের কথা যে তাঁর মত নারী অকালে চলে গেলেন পৃথিবী থেকে। কিন্তু তাতে তাঁর কোন দুঃখ ছিল না। তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল শুধু তাঁর সন্তানদের জন্য। মৃত্যুকালে মা সব সন্তানদের ডাকলেন তাঁর কাছে। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ছোটরা তার অর্থ বুঝল না। তারপর আমার উপর তাদের দেখাশোনার ভার দিয়ে বললেন, বল লোত্তে, এ ভার তুমি বহন করতে পারবে ?

আমি আমার হাতখানি আশ্বাসের ভঙ্গিতে তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি তখন বললেন, জান এ প্রতিশ্রুতির অর্থ ? মনে করবে আজ থেকে তুমিই হবে ওদের মা। ওদের সব কিছুর ভার তোমার উপর। সেদিন বাবা বাড়িতে ছিলেন না। এ দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তিনি বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সেদিন সেই মুহূর্তে আলবার্ত, তুমিও ছিলে সেখানে। তোমাকেও কাছে ডেকে আমাদের আশীর্বাদ করেন দুজনকে যেন আমরা চিরদিন সুখে শান্তিতে ঘর করি।

হঠাৎ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আলবার্ত লোত্তের ঘাড়ে চুম্বন করে আবেগের সঙ্গে বলল, আজও আমরা তাই আছি লোত্তে।

আলবার্ত সাধারণতঃ সংযমী, আত্মস্থ। কিন্তু সেদিন প্রথম তাকে আবেগের বশীভূত হতে দেখলাম। লোত্তে উঠে পড়ল। আমি তার হাতখানি তখনো ধরে রেখেছিলাম। আমি বললাম, আবার আমাদের দেখা হবে। যে যে আকারেই থাক না কেন আমরা চিনে নেব পরস্পরকে।

লোত্তে বলল, আবার কাল দেখা হবে হয়ত। 'কাল' এই কথাটা শুনে আমার বড় দুঃখ হলো। সে জানত না আমার চলে যাবার কথা।

আমি সেইখানে স্তব্ধ ও বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা দুজনে চাঁদের আলোভরা উপত্যকার উপর দিয়ে হেঁটে গেল ধীর পদক্ষেপে। একটু দূরে গেলে আমি মাটির উপর শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। কিছু পরে উঠে আবার এগিয়ে

গেলাম। দেখলাম সাদা ফ্রকপরা লোত্তের মূর্তিটা বাগান পার হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের বাড়ির সদর দরজায়। আমি দুটো হাত শূন্যে বাড়িয়ে দিলাম।

অক্টোবর ২০,

আমি গতকাল এখানে এসেছি। রাষ্ট্রদূত অসুস্থ থাকার জন্য দিনকতক বাড়িতে বিশ্রাম করবেন। তিনি যদি নির্দয় না হন তাহলে সব ভালভাবে চলবে। কিন্তু আমি দেখছি ভাগ্যে আমার দুঃখ আছে। তবু সাহস অবলম্বন করতে হবে আমাকে। হায়, আমার অন্তরটা যদি একটু হালকা হত। হে ঈশ্বর! তুমি যদি আমায় এত প্রতিভা আর আবেগানুভূতির গুরুভার না দিয়ে আমায় যদি একটু আত্মবিশ্বাস দান করতে!

আর কিছুদিন ধৈর্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু, আমি আমার চারপাশের জনগণের জীবনযাত্রাপ্রণালী নিজের চোখে দেখে অনেক শান্তি পাচ্ছি মনে। নিজের সুখদুঃখ আর পাঁচজন মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তুলনা করে মনটা অনেক হালকা হয়। তাই নির্জনতার মত এত ভয়ঙ্কর বস্তু আর কিছু হতে পারে না। আমরা নির্জনে থাকলেই কল্পনায় আমরা আমাদের থেকে সুখী ও আদর্শ মানুষের ছবি ফুটিয়ে তুলি মনের উপর। নিজেদের অপূর্ণতার কথা মনে করে কষ্ট পাই মনে মনে।

কিন্তু আমরা যদি আর পাঁচজনের সঙ্গে আমাদের অবস্থার তুলনা করে দেখি তাহলে দেখব আমরা অন্যদের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই। ফলে তার থেকে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আমাদের। মনে শান্তি ও স্থিরতা আসে।

নভেম্বর ১৩,

ধীরে ধীরে মনটা স্থির হয়ে আসছে আমার। বিচিত্র ধরনের মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা দেখে আমারও কাজ করতে ইচ্ছা জাগছে। বিভিন্ন রঙের ছাপ পড়ছে আমার মনে। জনৈক কাউন্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। তাঁর মনটা বড় উদার, বড় সহানুভূতিশীল। তাঁর মত লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের কথা। প্রথম আলাপের দিনই আমার প্রতি আগ্রহ জাগে তাঁর মনে। আমার সঙ্গে রোজ কথা বলতে ও গল্প করতে চান। মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার থেকে আনন্দের কথা আর কিছু হতে পারে না।

ডিসেম্বর ২৪,

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হলো। রাষ্ট্রদূত ব্যক্তিটি আমার যথেষ্ট বিরক্তির

কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বুড়ী মেয়েমানুষের মত প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে বড় হৈ চৈ করেন। যেসব লোক স্বভাবতঃ অসন্তুষ্ট প্রকৃতির, কেউ তাদের কখনো সন্তুষ্ট করতে পারে না। আমার স্বভাব হচ্ছে সব কাজ তাড়াতাড়ি করা। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে চাই আমি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেন আবার একবার ভাল করে দেখ। তাতে আমার মাথা গরম হয়ে যায়।

কিন্তু কাউণ্টের বিশ্বাস আর ভালবাসা আমার সব অভাব দূর করে দেয়। কাউণ্ট ত একদিন আমায় স্পষ্ট বললেন, তিনি খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক; রাষ্ট্রদূত ভদ্রলোককে মোটেই দেখতে পারেন না। এই ধরনের লোক সব কাজকে বেশী কঠিন করে তোলে। তবু আমাদের মানিয়ে নিয়ে চলতে হবে। কোন পথিকের সামনে পাহাড় পড়লে তা পার হতে হবেই।

আমাদের রাষ্ট্রদূত আবার আমার সঙ্গে কাউণ্টের ভাল সম্পর্কটা ভাল চোখে দেখেন নি। তিনি এতে বিরক্ত বোধ করেন এবং সুযোগ পেলেই যখন তখন আমার কাছে কাউণ্টের নিন্দা করেন। আমি তার প্রতিবাদ করি আর তা করতে গিয়ে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। গতকাল তাঁর একটা কথা শুনে আমার প্রবল রাগ হয়ে যায়। তিনি বলেন কাউণ্ট আর পাঁচজন সাহিত্যানুরাগী লোকের মত অনেক বিষয় ভাসাভাসাভাবে জানেন। কিন্তু কোন বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি বা পাণ্ডিত্য নেই। আমি তার প্রতিবাদ করে বলি কাউণ্টের চরিত্র আর পাণ্ডিত্য দুটোই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আমাদের। তিনি নিজের দৈনন্দিন কাজকর্ম বজায় করেও অনেক কিছু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এই বলে আর কথার উত্তাপ না বাড়িয়ে উঠে পড়লাম।

আজকের আমার এই অবস্থার জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা আগে শুধু কাজের কথা বলতে। যে লোকটা আলুর চাষ করে, শহরের বাজারে রোজ আলু বেচতে যায় তার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়? এই সব অবাঞ্ছিত অস্বস্তিকর লোকদের মাঝে বসে কাজ করা কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওদের মনের ভাবধারা কত সংকীর্ণ! এক ভদ্রমহিলা সবার কাছে তাঁর দেশের বাড়ি আর বংশ পরিচয়ের গর্ব করেন। তিনি সামান্য এক কেরাণীর মেয়ে। এতে তাঁকে যে সবাই বোকা ভাবে তা তাঁর খেয়াল নেই।

তবে কে কি করছে তা দেখার আমার কোন দরকার নেই। কারণ এ ছাড়া ভাববার অনেক কিছু আছে আমার। তা যে যা খুশি করে করুক, আমি

আপনার নিজের কাজ করে যাব।

সবচেয়ে আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থাটাই খারাপ লাগে আমার। অনেকের মত আমিও মনে করি সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তুলে দেওয়া উচিত। তবে যতদিন আমার মনে সুখশান্তি ছিল ততদিন এ বিষয়ে কোন কিছু ভাবিনি। সেদিন এক যুবতীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। মেয়েটি তার পিসির কাছে থাকে। পিসি ভদ্রমহিলা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। কিন্তু বর্তমানে গরীব হয়ে গেছেন। এখন শুধু বংশ ছাড়া বড়াই করার মত কিছুই নেই। তাঁর চেহারাটার মত মন মেজাজও খারাপ। তিনি সবাইকে ঘৃণার চোখে দেখেন। তিনি এক অফিসারকে বিয়ে করেন। কিন্তু ভদ্রলোক কিছুকাল আগে মারা যাওয়ায় এখন তিনি বিধবা। সম্পূর্ণ একা। এখন তাঁর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবটাও অনমনীয় হয়ে উঠেছে।

জানুয়ারি ৮,

কতকগুলো মানুষ আছে যারা প্রথাগতভাবে তাদের কাজকর্ম চিরকাল যথারীতি করে যেতেই ভালবাসে। যাদের জীবনের লক্ষ্য ও ভাবধারার কোন পরিবর্তন হতে চায় না কখনো। তারা কোন সুযোগ পেলেও গ্রহণ করতে চায় না। গত সপ্তায় একজনের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যায়। যারা আসন বা পদটাকে গুরুত্ব দেয় তারা বোকা। রাজাদের পদ সবচেয়ে বড় হলেও তারা মন্ত্রীদের দ্বারা চালিত হয় আর মন্ত্রীরা চালিত হয় তাদের সচিবদের দ্বারা। যারা বুদ্ধি ও চাতুর্যের দ্বারা অন্যদের নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কাজে লাগাতে পারে তারাই মানুষ।

জানুয়ারি ২০,

আজ আমি তোমাকে চিঠি লিখব লোত্তে। ঝড়ের প্রকোপ হতে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আজ এই পান্থশালাটার একটা ছোট্ট ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আজ এখান থেকেই চিঠি লিখব তোমায়। আমি যখন শহরের পথে এগিয়ে চলেছিলাম আর পাঁচজনের সঙ্গে তখন তোমার কথা মনে হয়েছিল আমার। তারপর ঝড় উঠতেই এখানে এলাম। ঘরে ঢুকতেই তোমার ছবি ভেসে উঠল মনে।

আজ যদি তুমি আমায় দেখতে তাহলে একেবারে অবাক হয়ে যেতে। আজ আমার মনে আর সেই আবেগের বন্যা নেই। সব শুকিয়ে গেছে। আজ আমার মনের মধ্যে কোন আবেগ বা অনুভূতিকে লালন করার মত সময় নেই।

ফ্রলিন নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। তাকে দেখতে তোমার মত। সে বলে আমার আচরণ নাকি খুব ভদ্র ও মার্জিত। মাঝে মাঝে আমরা দুজনে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি। তোমার কথা বলি আমি প্রায়ই। সে তোমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

হায়, আজ ঠিক এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাদের সেই ঘরে বসে থাকতাম তোমার কাছে। তোমার ভাই-বোনেরা খুব বেশী জ্বালাতন করলে আমি তাদের ডেকে বেশ কেমন একটা রূপকথার গল্প শোনাতাম। এখন বরফে ঢাকা প্রান্তরের উপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঝড় সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আমাকে এরই মধ্যে ঘরের খাঁচায় ঢুকতে হবে। আলবার্ত কি এখন তোমার কাছেই আসবে? বিদায়! কেমন আছ তোমরা?

ফেব্রুয়ারি ১৭,

আমার ভয় আমি আমার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বেশীদিন মানিয়ে চলতে পারব না। ভদ্রলোক সত্যিই অসহ্য। তার কাজ করার পদ্ধতিটা একেবারে হাস্যকর, কথায় কথায় তাঁর কাজের প্রতিবাদ না করে পারি না। আর আমি প্রায়ই নিজের মত করে কাজ করে যাই যা তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। সম্প্রতি তিনি রেগে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন মন্ত্রীর কাছে। আমি তাতে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিই। মন্ত্রী তখন ব্যক্তিগত পত্র মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠান। আমাকে শান্ত হতে বলেন। অনেক করে বোঝান। তাঁর মনটা সত্যিই উদার এবং মহৎ। এখন আমি অনেকটা আত্মস্থ হতে পেরেছি। এর মত শান্তির আর কিছু হতে পারে না।

ফেব্রুয়ারি ২০,

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। যে সুখ আমার কেড়ে নিয়েছেন সে সুখ যেন তোমরা পাও।

আলবার্ত, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমি আশা করেছিলাম তোমার বিয়ের খবরটা জানাবে। তাহলে সেদিন আমি আমার ঐ দেওয়ালে টাঙানো লোত্তের ছবিখানা নামিয়ে আমার পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতাম। তোমাদের বিয়ে যখন হয়ে গেছে তখন ও ছবিটার ওখানে থাকার কোন আর অর্থ হয় না। আবার ভাবি থাকলেই বা। আমি ত লোত্তের অন্তরে তোমার পাশেই বিরাজ করছি। লোত্তে যদি আমাকে ভুলে যায় তাহলে হয়ত পাগল হয়ে যাব আমি। এই ধরনের নাটকীয় চিন্তা যেন আমার মনে না আসে।

বিদায় আলবার্ত। বিদায় লোত্তে।

মার্চ ২৫,

এখানেও আমি এমন এক দুঃখের কবলে পড়েছি যে এখান থেকে চলে যেতে হবে আমায়। আমার নিজের দাঁত নিজেই ভাঙতে ইচ্ছে করছে। এর কোন প্রতিকার নেই। সব দোষ তোমাদের। তোমরাই আমাকে এমন এক পদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছ যে পদ গ্রহণ করতে মন আমার চায়নি। কিন্তু তোমরা যাতে আমাকে দোষ দিতে না পার, যাতে বলতে না পার আমার আবেগের আতিশয্য সব কিছু মাটি করে ফেলেছে তার জন্য আমি এক কাহিনীর উল্লেখ করছি।

আমি তোমাদের আগেই বলেছি কাউণ্ট আমাকে ভালবাসেন। গতকাল তাঁর বাড়িতে সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের লোকজনের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ এক ভোজসভায় যোগদান করি আমি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম এ ধরনের ভোজসভায় আমার মত লোকের যোগদান করা সাজে না। আমি হলঘরে কাউণ্টের সঙ্গে পায়চারি করতে করতে কথা বলছিলাম। এমন সময় কোন এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এ পরিবেশ আমার ভাল লাগছিল না। আমি চলে যাবার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় ফ্রলিন নামে আমার পরিচিত সেই মেয়েটি এল। তাকে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু সে অন্যদিনকার মত প্রাণ খুলে কথা বলল না আমার সঙ্গে। এর কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম না ফ্রলিন এই ধরনের পরিবেশ ভালবাসে কি না। চলে যেতে গিয়েও যেতে পারলাম না আমি। এদিকে একের পর এক তথাকথিত সম্মানিত অতিথিরা আসতে লাগল। ব্যারণ, কর্নেল, কাউণ্ট প্রভৃতি কত সব উজ্জ্বল পোষাক পরা গণ্যমান্য অভিজাত সমাজের ব্যক্তিরা। আমি ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিলাম। মহিলারা আমার অবস্থা দেখে এক কোণে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। কাউণ্ট এক সময় আমাকে জানালার ধারে নিয়ে গিয়ে বললেন, ওরা তোমাকে এখানে দেখে বিস্ময় ও অস্বস্তি বোধ করছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই—। আমি তখন কাউণ্টকে বললাম, আমি আগেই এটা অনুভব করেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি যাচ্ছি। কাউণ্ট সহানুভূতির সঙ্গে আমার হাতে চাপ দিলেন। আমি সভা থেকে অসময়ে বিদায় নিয়ে বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাইরে এসে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখতে চলে গেলাম। হোমার পড়তে

লাগলাম।

সন্ধ্যের সময় আমি আমার হোটেলে ফিরে এসে রাতের খাওয়া খেলাম। এ্যাডেলিন এসে আমাকে বলল, তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে। কাউন্ট তোমাকে সভা ত্যাগ করতে বলেছিল। আমি বললাম, বাইরের আলো হাওয়ায় এসে আমি খুশি হই। কিন্তু এ্যাডেলিন বলল, আমার খারাপ লাগছিল। ওরা সবাই তোমার কথা বলাবলি করছিল। এতে আমার রাগ আরো বেড়ে যায়।

এইভাবে আমি দুষ্ট গ্রহের মত যেখানে যাচ্ছি সেখানেই সবাই করুণা করছে। তুচ্ছ ভাবছে। ওই সব অপদার্থ অহঙ্কারী লোকগুলো অকারণে আমার সম্বন্ধে যা তা বলবে এটা আমি চাই না। কোন লোকই তা সহ্য করতে পারে না।

মার্চ ১৬,

আমার সব কিছুই খারাপ লাগছে। এখানে সব কিছুই যেন ষড়যন্ত্র করছে আমার বিরুদ্ধে। আজ ক্রলিনের সঙ্গে দেখা হলো। আমি তাকে ডেকে আমার প্রতি তার সেদিনকার দুর্ব্যবহারের কারণ জানতে চাইলাম। ক্রলিন তখন বলল, কিছু মনে করো না ওয়ার্দার। আমি তোমাকে ঐ ভোজসভায় দেখেই চিন্তিত হয়ে পড়ি। দুজন মাদাম অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত মহিলা তোমাকে দেখে চলে যাচ্ছিল ভোজসভা থেকে। কাউন্ট মুস্কিলে পড়েছিলেন, কারণ তিনি তাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য করার ঝুঁকি নিতে পারছিলেন না। তখন আমার মনে কি দারুণ কষ্ট হচ্ছিল তা তোমায় বোঝাতে পারব না।

আমি দেখলাম কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল ক্রলিনের। সত্যিই সে দুঃখ পেয়েছিল আমার জন্য। ক্রলিন আরও বলল, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় সেই ভোজসভায় আমার পিসিও ছিলেন। তিনি আমাকে পরে তোমার সঙ্গে মেলামেশার জন্য আমাকে অপমান করলেন। তোমার নামেও যা তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু তোমার সমর্থনে আমি খুব বেশী কথা বলতে পারলাম না।

ক্রলিনের প্রতিটি কথা তীক্ষ্ণ ছুরির মত আমার বুকে বিঁধছিল। সে বলল, এই নিয়ে আরও কথা হবে। হিংস্রুটে লোকগুলো অনেক কানাঘুঁষো করবে আমাকে নিয়ে। উইলেম, ক্রলিনের কণ্ঠে প্রকৃত সহানুভূতির স্পষ্ট আভাস পেয়ে সত্যিই আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল একটা ছুরি নিয়ে আমার বুকে আমূল বসিয়ে দিই। আমার নিজের চোখে আমার নিজের রক্ত-

দেখলেই আমি শান্ত হব চিরদিনের জন্য। এছাড়া কোন উপায় নেই। এক ধরনের ঘোড়ার কথা শুনেছি যারা খুব রেগে গেলে বা ক্লান্ত হলে নিজেদের দেহের শিরা কামড়ে আত্মহত্যা করে। আমারও তাই ইচ্ছা হচ্ছিল নিজের দেহের শিরা ছিঁড়ে চিরমুক্তি লাভ করি।

মার্চ ২৪,

আমি কাউণ্টের কাছে আমার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। মনে হয় তা গৃহীত হবে। তোমার মতামত চাইতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইছি। প্রথম কথা আমাকে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় কথা তোমার মত চাইলে তুমি আমাকে থাকতে বলতে। মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলো। তাঁকে সব কিছু সহ্য করতেই হবে। কারণ এ ছাড়া আমার করার কিছুই নেই। ভবিষ্যতে প্রিভি কাউন্সিল বা রাষ্ট্রদূত অফিসের ভাল পদের আশা ত্যাগ করে তাঁর পুত্র চলে গেল। যাই হোক, আমি যাচ্ছি। জনৈক রাজকুমার...আমার সাহচর্য চান। তিনি আমাকে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে বসন্তকালটা কাটাবার কথা বলছেন। মোটামুটি আমাদের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়া হয়েছে। দেখা যাক ভাগ্য পরীক্ষা করে।

এপ্রিল ১৯,

তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমি তোমার দুখানি চিঠিই পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি। আমার ভয় হচ্ছিল আমার মা যদি মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেন তাহলে আমার পদত্যাগপত্র সহজে গৃহীত হবে না। যাই হোক, এখন সব কিছুর শেষ হয়ে গেছে। বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁর চিঠিখানা পড়লে তোমার সত্যিই কষ্ট হবে। রাজকুমার আমাকে একখানি চিঠির সঙ্গে পঁচিশটি ডুকেট দান করেছেন। সুতরাং মাকে যে টাকা পাঠানোর কথা লিখেছিলাম তা না পাঠালেও চলবে।

মে ৫,

আমি আগামী কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আমি আমার জন্মস্থানে বেড়াতে যাব। আমার বাবার মৃত্যুর পর মা আমাকে নিয়ে যে বাড়ি থেকে চিরদিনের মত বেরিয়ে আসেন সেই বাড়িটা আবার দেখব আমি। বিদায় উইলেম, পরে আবার সব জানাচ্ছি।

মে ৯,

তীর্থযাত্রীর মত নিবিড় শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আমার জন্মভূমি দর্শন করেছি।

আমি আমার তীর্থযাত্রা শেষ করেছি। সেখানে পৌছে গাড়িটা দূরে রেখে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম আমি। কত বিচিত্র আবেগানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল আমার অন্তর। সেই লাইম গাছটার তলায় দীর্ঘকাল পরে আবার দাঁড়ালাম। একদিন যখন ছোট ছিলাম, যখন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না, আমার ছোট মনে তখন কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন ছিল! আর আজ যখন বাইরের জগৎ থেকে ঘা খেয়ে ফিরে এলাম সেই জায়গায় তখন আমার সব আশা সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যে স্কুলটায় পড়তাম এখন সেটা এক দোকান ঘরে পরিণত হয়েছে। আমাদের পুরনো বাড়িটার পাশে একটা হোটেলে উঠলাম আমি। শহরের বাইরে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে গেলাম। নদীর ধার আর খামারবাড়ি দিয়ে কত বেড়াতে যেতাম। তখন অবারিত মাঠ আর মুক্ত আকাশ দেখে ইউলিসেসের মত মনে হত সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী অনন্ত; তার শেষ নেই, সীমা নেই। আজকালকার ছেলেরা শেখে পৃথিবী গোল এবং তাদের কাছে পৃথিবী কত ছোট।

আমি রাজকুমারের শিকারের জায়গায় এসে গেছি। লোকটি সত্যিই খুব ভাল। কিন্তু যখন শুনলাম উনি সাধারণতঃ বই পড়ে আর লোকের মুখ থেকে শুনে সব জ্ঞান লাভ করেন তখন একটু দুঃখ পেলাম। আর একটা দুঃখের কথা, উনি আমার অন্তরের থেকে বুদ্ধির উপরেই গুরুত্ব দেন বেশী। কিন্তু উনি জানেন না আমার যা কিছু সম্পদ তা সব আছে আমার অন্তরে।

মে ২৫,

আমার মনে একটা কথা গোপন করে রেখেছিলাম। সেটা তোমায় বলতে চাইনি। ভেবেছিলাম কাজটা হয়ে গেলে বলব। আমি যুদ্ধে যোগদান করতে চেয়েছিলাম। রাজকুমার নিজেই সামরিক লোক। আমি তাঁকে আমার ইচ্ছার কথা জানাতে তিনি এ বিষয়ে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। অনেক যুক্তি দেখালেন।

জুন ১১,

যা বল বলবে আমি আর থাকতে পারছি না। কি হবে থেকে? আমার মোটেই ভাল লাগছে না। রাজকুমার আমাকে তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবেই জ্ঞান করেন। তবু আমি সহজ হতে পারি না। স্বভাবের দিক থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ। তাঁর বুদ্ধি আছে কিন্তু সে বুদ্ধি নীচু স্তরের। আর এক সপ্তা মাত্র এখানে আছি। এখানে এসে একটা লাভ হয়েছে।

আমি কিছু ছবি আঁকতে পেরেছি। তবে রাজকুমারের ছবির প্রতি আগ্রহ থাকলেও তাঁর মনটা বিজ্ঞানভাবাপন্ন। কোন ছবি দেখলেই তার একটা শ্রেণীগত নাম দিয়ে দেন। প্রথাগত রীতিতে সব কিছুর বিচার করে থাকেন।

জুন ১৮,

কোথায় আমি যাচ্ছি? পরে তোমায় গোপনে বলব। এখানে এখনো এক পক্ষকাল থাকতে হবে আমায়। তারপর এক খনি অঞ্চল দিয়ে বেড়াতে যাব। আসলে আমি যাব লোত্তেকে দেখতে। আবার তাকে একবার দেখব। কথাটা উপহাসের মত শোনাচ্ছে। তবু এটা আমার অন্তরের দাবি আর সে দাবি মেটাতেই হবে।

জুলাই ১৯,

হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। তুমি তবে আমাব স্ত্রী হিসাবে আমায় দান করো। তাহলে সারা জীবন আমি তোমার প্রার্থনায় কাটিয়ে দেব। সে যদি আমার স্ত্রী হয়, স্ত্রী হিসাবে আমার বাহুবন্ধনে ধরা দেয়—কথাটা ভাবতেও বুকটা কেঁপে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আলবার্ত যখন তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে তখনকার কথাটা মনে পড়ে যায়।

কথাটা বলা কি উচিত হবে? কেন হবে না উইলেম? আমার সঙ্গে বিয়ে হলে লোত্তে আরো সুখী হত। আলবার্ত ঠিক তার মনের সব বাসনা পূরণ করতে পারবে না। আমার সঙ্গে লোত্তের মনের সব বিষয়ে মিল হয়। কিন্তু আলবার্তের মনের মধ্যে কোথায় একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। অবশ্য আলবার্ত সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসে লোত্তেকে।

আগস্ট ৪,

একা আমিই দুঃখ পাই না। এ পৃথিবীতে অনেকেরই অনেক আশা, অনেক কামনা বাসনা চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায়। সেই লাইম গাছের তলায় যার কুঁড়ে সেই মেয়েটির বাড়ি দিয়ে সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। তার ছেলেটা আমায় ধরে নিয়ে গেল। মেয়েটি বলল, তার ছোট ছেলেটি মারা গেছে। তার স্বামী সুইজারল্যাণ্ড থেকে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। এখন সে অসুস্থ। আমি তার কথা শুনে খুব দুঃখ পেলাম। ছেলেটির হাতে কিছু পয়সা দিলাম। মেয়েটি আমাকে কিছু আপেল দিল জোর করে।

আগস্ট ২১

মাঝে মাঝে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখি আমি। স্বপ্নের মাঝে আনন্দ পাই।

কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিকের জন্য। এই ধরনের স্বপ্নের মাঝে মনে হয় আলবার্ত যদি মারা যায়! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি এক অন্ধকার খাদের প্রান্তে চলে যাই। নিজেই শিউরে উঠি।

যে শহরের নাচের আসরে প্রথম লোত্তেকে নিয়ে আসি এবং যেখানে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় সেই শহরের দ্বারপ্রান্তে সেদিন আবার গেলাম। কিন্তু অতীত সুখের দিনের কোন চিহ্নই নেই সেখানে। সেদিনকার আনন্দের আবেগ বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই আমার মনে। আমার মনে হলো আমি যেন কোন প্রেতাত্মা মৃত্যুর পর আবার ছেড়ে যাওয়া প্রাসাদে ফিরে এসেছি।

সেপ্টেম্বর ৩,

আমি বুঝতে পারি আমি যখন তাকে এমন গভীরভাবে, এমন একান্তভাবে ভালবাসি তখন কি করে তাকে অন্য লোকে ভালবাসতে পারে। আমি ত তাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। জানতে চাই না।

সেপ্টেম্বর ৬,

আমার একবার ইচ্ছা হলো সেই পুরনো কোটটা পরি। এই নীল কোটটা পরে আমি একদিন লোত্তের সঙ্গে তার হাত ধরে নেচেছিলাম। কোটটা তাই প্রিয় আমার কাছে, ওটাকে আজও ভালবাসি। কিন্তু সেটা পুরনো হয়ে গেছে। আর একটা কোট আমি করিয়েছি।

সেপ্টেম্বর ১৫,

মাঝে মাঝে শয়তান আর নরকের কুকুরের বেয়াদপি সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তোমার মনে আছে। চার্চের কাছে সেই বাদাম গাছ-গুলোর তলায় আমি কতদিন লোত্তের সঙ্গে বসে থেকেছি। যাজক সেই গাছ-গুলোকে একদিন নিজের হাতে বসান। সেই সব গাছের ডালপালাগুলো বড় হয়ে চারদিকে সারা উঠোনটাকে ছায়াশীতল করে রাখত। কিন্তু এবার গিয়ে দেখলাম সেই সব গাছগুলো কাটা হয়ে গেছে। মন্ত্রীর স্ত্রীর হুকুম। কথাটা শুনে রাগ হলো আমার। গাঁয়ের সব লোকই এতে ক্ষুব্ধ। কিন্তু কোন উপায় নেই। মন্ত্রীর স্ত্রীর অসুবিধা হচ্ছিল গাছগুলো থাকাতে, ছেলেরা বাদাম পাড়ত। গাছের ডালে আলো বাতাস আটকাত। তাই তাঁর সহ্য হয়নি।

অক্টোবর ১০,

যদি আমি একবার তার কালো চোখের পানে তাকাই তাহলে সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে আমার। সবচেয়ে আমার দুঃখ এই যে আলবার্ত আগের মত

আমার কাছে সহজ হতে পারে না।

অক্টোবর ১২,

হোমার আমার অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। এই মহান প্রতিভাধর কবি কি এক অলৌকিক মায়াময় জগতেই না আমার মনটাকে নিয়ে যান। আমি যেন ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের প্রহারে ক্রমাগত জর্জরিত ও প্রেতাত্মা-অধ্যুষিত কুয়াসাচ্ছন্ন এক বিশাল প্রান্তরে এসে পড়েছি। মনে হচ্ছে যেন প্রেমবিধুরা কোন নিঃসঙ্গ কুমারী তার মৃত প্রণয়ীর তৃণাচ্ছন্ন সমাধি-প্রান্তরের উপর বসে অশ্রুবর্ষণ করছে নির্জনে। আমার মনে হয় যেন কোন বৃদ্ধ চারণ কবি এক শূন্য প্রান্তরে তার পূর্বপুরুষদের সমাধিভূমির মাঝে তাদের কায়াহীন অশরীরী উপস্থিতির মাঝে এক অতিসূক্ষ্ম আত্মিক আনন্দে বিভোর হয়ে হিমশীতল পৃথিবীর পানে তাকিয়ে আছে আর আপন মনে চিৎকার করে বলছে, আমার কবরের উপর দিয়ে কোন পথিক হেঁটে যেতে যেতে হয়ত আমার কথা মনে করবে, হয়ত বৃথাই আমার খোঁজ করবে।

অক্টোবর ১৯,

হায়, আমার বুকের ভিতর কি বিরাট শূন্যতা! আমার কেবল মনে হয় আমি যদি একবার এই বুকে তাকে চেপে ধরতে পারতাম, তাহলে আমার সব শূন্যতা পূরণ হয়ে যেত।

অক্টোবর ২৬,

লোত্তের এক বন্ধু দেখা করতে এসেছিল তার সঙ্গে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বই পড়তে লাগলাম। কিন্তু পড়া হলো না। আমি তাদের কথা শুনতে লাগলাম। ওরা শহরের এক গরীব হতভাগ্য দম্পতির কথা বলাবলি করছিল। স্ত্রীর কাশি হয়েছে, ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। স্বামীটিও ভুগছে, তার হাত পা ফুলে গেছে। ওরা দুজনেই মরবে।

আমি একা একা ঘরে বসে ভাবতে লাগলাম। এই ঘরে লোত্তের কাপড় জামা ছড়ানো আছে। তার কানের দুল রয়েছে টেবিলে। আলবার্তের কাগজপত্রও রয়েছে। আমিও যখন একদিন মরে যাব, এদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাব তখন কি এরা আমার কথা মনে রাখবে? হায়, মানুষের অস্তিত্ব কত ক্ষণভঙ্গুর! তার যে অস্তিত্বকে প্রিয়জনের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যায় সে অস্তিত্ব সেখানে বেশীদিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না। কোথায় হারিয়ে যায়, মিলিয়ে যায়।

অক্টোবর ২৭,

আজকাল একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। কথাটা মনে হলেই দুঃখে বুকটাকে বিদীর্ণ করে ফেলতে ইচ্ছে হয়, মাথাটা ফাটাতে ইচ্ছে যায়। মানুষ কত স্বার্থপর। আমি যদি কাউকে আমার ভালবাসা না দিই তাহলে সে কখনই আমাকে ভালবাসবে না, আমার অন্তর পরম আনন্দের প্রাচুর্যে পূর্ণ থাকলেও আমি অন্য কাউকে সুখী করার চেষ্টা করব না, আমার সে আনন্দের ভাগ দেব না—এটা কখনই উচিত নয়।

অক্টোবর ৩০,

আমি শত শতবার লোত্তেকে চুম্বন করতে গেছি। কিন্তু পারিনি। কোন সুন্দর বস্তুকে দেখে মুগ্ধ হয়েও তাকে স্পর্শ না করে থাকাটা যে কত কঠিন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

নভেম্বর ৩,

প্রায় দিন রাত্রিতে ঘুমোতে ঘুমোতে আমার মনে হয় আমি আর জেগে উঠব না। কিন্তু সকাল হলেই রোজ জেগে উঠি অন্যদিনকার মত। আমি যদি পরের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারতাম তাহলে এতটা কষ্ট আমাকে পেতে হত না। কিন্তু এই সব কিছুর জন্য আমি একা দায়ী—এই বোধ থেকে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায়। আমার কষ্টের মূল কারণ এই যে, আমার জীবনের একমাত্র আনন্দপ্রতিমা হারিয়ে গেছে অকালে। আমি যখন রোজ সকালে জানালা দিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে তাকাই, যখন সকালের সোনা রোদ উপত্যকা-ভূমির উপর ছড়িয়ে থাকা কুয়াশা আর এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাওয়া রূপালি নদীর উপর ঝরে পড়ে তখন সেই মনোরম দৃশ্যের আনন্দ আমার অন্তর থেকে মস্তিষ্কে কেউ নিয়ে যেতে পারে না। আমার সমগ্র অন্তরটা শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণার মত শূন্য হয়ে পড়ে থাকে। ঈশ্বরের কাছে আমার চোখে কিছু অশ্রু দেবার জন্য প্রার্থনা করি, কৃষকরা যেমন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে।

কিন্তু পরে বুঝলাম ঈশ্বর কখনো আমাদের প্রার্থনা অনুসারে বৃষ্টি অথবা রোদ পাঠিয়ে দেন না। একদিন অতীতে ঈশ্বর আমাকে সুখ দিয়েছিলেন তার কারণ তখন আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। ভাল মন্দ সব আবেগ ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহণ করতাম আমি। তাই শান্তি পেতাম সব সময়।

নভেম্বর ৮,

আমার সংযম না থাকার জন্য আমাকে তিরস্কার করেছে সে। অবশ্য খুব

মৃদুভাবে। অনেক সময় আমি একটু মদপান করতে গিয়ে গোটা বোতলটা খেয়ে ফেলি। লোত্তে তখন বলে, না না, আর খেও না। আমি তখন বলি, তুমি যদি নিষেধ করো তাহলে খাব না। তুমি সব সময় আমার আত্মার মাঝে উপস্থিত আছ।......আজ সে যখন গাড়ি থেকে নামে তখন আমি বলে ছিলাম। সে এসেই প্রসঙ্গটা পাল্টে দেয়। তার উপর আমার কোন হাত নেই। সে যা খুশি তাই করতে পারে।

নভেম্বর ১৫,

তোমার সৎ পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ উইলেম। তবে আমি তোমাকে শান্ত হতে বলছি। আমি শেষ পর্যন্ত সহ্য করে যেতে চাই। তুমি জান ধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। এই ধর্ম বহু আত্মার উপাদান, অনেক দুর্বল মানুষের আশ্রয়। কিন্তু তাই বলে কি সকলের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য? বিরাট পৃথিবীতে তাকিয়ে দেখবে হাজার হাজার লোকের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। তা যদি না খাটে তাহলে আমার জীবনেই বা খাটবে কেন? ঈশ্বরের পুত্র কি বলেন নি যে ঈশ্বর যাদের দান করেছেন তাঁর হাতে তারাই তাঁর কাছে থাকবে সব সময়। ভাগ্যে যা আছে তা সব সহ্য করতেই হবে তা সে যতই তিক্ত হোক না কেন। এখন আমার সারা ভবিষ্যৎ এক বিরাট শূন্যতা আর অন্ধকারে ভরা আর সেই অন্ধকারে আমার অতীত বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে আর আমার সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে কেঁপে উঠছে। হে ঈশ্বর, তুমি কি আমাকে ত্যাগ করেছ?

নভেম্বর ২১,

সে বুঝতে পারে না, সে মাঝে মাঝে এক বিষ প্রস্তুত করে যে বিষ তার ও আমার দুজনেরই ধ্বংস ডেকে আনবে। সে যে বিষের পাত্র আমার হাতে তুলে দেয় তাতে আমার ধ্বংস অনিবার্য জেনেও অবশ্য আমি তার সবটুকু পান করি। সে মাঝে মাঝে আমার পানে সদয় দৃষ্টিতে তাকায়। মাঝে মাঝে আমার দুঃখের প্রতি এক অনুচ্চারিত সহানুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে তার ভ্রূযুগলের মধ্যে। গতকাল আমি যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিই তখন সে আমার হাত ধরে বলে, বিদায় প্রিয় ওয়ার্দার! 'প্রিয়' এই কথাটা প্রথম সে বলে আমায়। কথাটা যেন আমার সমগ্র অস্থিমজ্জায় ঢুকে যায়। গতকাল বিছানায় শোবার সময় আপন মনে কথাটা উচ্চারণ করে চলি আমি।

নভেম্বর ২৪,

সে আমার দুঃখের কথা সব বোঝে। আজ তার চোখের দৃষ্টি আমার অন্তরের

গভীরে চলে যায়। আজ সে একা ছিল। আমি কোন কথা বলিনি। সে নীরবে আমার মুখপানে তাকাল। কিন্তু আগের মত তার চোখে মুখে আর সে উজ্জলতা খেলে যেতে দেখলাম না। তবে তার চোখে মুখে আমার প্রতি সহানুভূতিটা আগের থেকে আরও গভীরভাবে ফুটে উঠেছিল। আমি কি তার পায়ে গড়িয়ে পড়ব? তার এই নিবিড় সহানুভূতির প্রতিদানস্বরূপ আমি তাকে অসংখ্য অভিনন্দন ও চুম্বনে তৃষিত করব না? সে হার্পসিকর্ড বাজিয়ে গান করতে লাগল। তার যে ওষ্ঠাধর থেকে মধুর স্বর ও বাণী ঝরে পড়ছিল, সেই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত ওষ্ঠাধর আমি চুম্বন করতে পারব না কখনো। কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। তবু মনে হচ্ছে একাজ পাপের হলেও এ পাপ একবার করে সারা জীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাব আমি।

নভেম্বর ৩০,

আমি নিজেকে নিজে সামলাতে পারছি না। আত্মস্থ হতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি আমি তার ভূত দেখছি যেন। হায় কী দুর্ভাগ্যের কথা!

দুপুরের দিকে আমি গিয়েছিলাম নদীর ধার দিয়ে। যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার। চারদিকে কেমন যেন একটা বিষাদের ভাব বিরাজ করছিল। হিমশীতল পশ্চিমা বায়ু বয়ে আসছিল পাহাড় থেকে। পাহাড় আর উপত্যকার উপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল ঝড়ো মেঘ। পাহাড়ের কোলে ঝোপ ঝাড়ের ভিতর একটা লোক ময়লা সবুজ কোট পরে গাছের শিকড় খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কোন দরকারী ওষধি খুঁজছে সে। আমি গেলাম তার কাছে। লোকটার চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা বিষন্ন ভাব ছিল। তার মাথার কালো চুল দুভাগ করে পিন দিয়ে আটকানো। দেখে মনে হলো লোকটি নিচু শ্রেণীর। আমি তাকে তার পেশার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, সে নোজগে ফুল খুঁজছে। সে তার প্রিয়তমাকে উপহার দেবে। তার প্রিয়তমা ধনী সম্পদ-শালিনী; সে শুধু ফুল চায়। কিন্তু শীতকালে সে ফুল পাচ্ছে না। সে আরো বলল, একদিন তার অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু এখন খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে লোকটির খোঁজ করতে লাগল। আমি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম লোকটি তার ছেলে। এখন ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বছর-খানেক পাগলাগারদে ছিল। এখন ছাড়া আছে। মারধোর করে না, এই ভাবে কি সব খুঁজে বেড়ায় পাহাড়ে জঙ্গলে।

আমি তখন লোকটির উদ্দেশ্যে বললাম, একদিন তুমি সুখী ছিলে। কিন্তু

এটা তুমি বুঝতে পারছ না তোমার এই দুঃখ তোমার আপন অন্তর ও মস্তিষ্ক হতেই উদ্ভূত হচ্ছে।

কিন্তু রুগ্ন মানুষের রোগ নিরাময়প্রচেষ্টাকে উপহাস করা উচিত নয়। তাকে পাগল বলে বিদ্রূপ করা উচিত নয়। হে ঈশ্বর, পরমপিতা, তুমিই আমাদের সৃষ্টি করেছ, আমাদের দুঃখের প্রতিকার এই পৃথিবীর সবখানেই ছড়িয়ে রেখেছ। হে পিতা, তুমি চুপ করে থেকো না আমার দুঃখে। আমি তোমার কাছে অকালে ফিরে যাচ্ছি। তুমি রাগ করো না। আমার যাত্রা গন্তব্যস্থলে গিয়ে শেষ না হতেই মাঝপথে থেমে যাচ্ছে। আমি ফিরে যাচ্ছি তোমার কাছে। এ পৃথিবীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি এইভাবে অকালে ফিরে যাই তাহলে আমাকে কি তুমি তাড়িয়ে দেবে ?

ডিসেম্বর ১,

শোন উইলেম, যে লোকটির কথা আমি তোমাকে সেদিন লিখেছিলাম সেই লোক লোত্তের বাবার অফিসে কাজ করত। সে কেরাণী ছিল। সে মনে মনে লোত্তেকে ভালবাসত। পরে কথাটা প্রকাশ করায় তার চাকরি যায়। তখন থেকে সে পাগল হয়ে যায়। কথাটা আমাকে জানায় আলবার্ত।

ডিসেম্বর ৪,

আমাকে ক্ষমা করো, আমি আর পারছি না। আমি আজ তার পাশে বসেছিলাম। সে গান গাইছিল। তার এক বোন আমার কোলের উপর বসে পুতুল নিয়ে খেলা করছিল। আমার চোখে জল আসছিল। তার হাতে বিয়ের আংটিটা দেখে আমার আরো কষ্ট হচ্ছিল। এমন সময় সে একটি পুরনো গান ধরল। সেই গানের সুরে অতীত সুখের দিনের কথা মনে পড়ল। আমার ব্যথা বেড়ে গেল। আমি তার কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম, দয়া করে গান থামাও, আমি আর পারছি না। সে বলল, ওয়ার্দার, তোমার শরীর খারাপ। তুমি তোমার প্রিয় খাদ্য কিছুই খেতে পারছ না। আমি হঠাৎ চলে গেলাম তার কাছ থেকে।

ডিসেম্বর ৬,

তার ছবিটা সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আমি। স্বপ্নে ও জাগরণে সব সময় তাকে দেখছি আমার চোখের সামনে। চোখ বন্ধ করলেই অন্ধকারে মনের পটে ছড়িয়ে রয়েছে তার ছবি। বিশেষ করে তার কালো চোখ দুটো অন্ধকার সমুদ্র বা খাদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে থাকে আমার মুদ্রিত চোখের সামনে।

হায়, মানুষের জীবন কি অদ্ভুত! যখন সে ইন্দ্রিয়চেতনার শক্তিকে নিবিড়ভাবে চায় না তখন সে শক্তি মিলিয়ে যায় ও বিলীন হয়ে যায়। অথচ যখন সে এ শক্তি চায় তখন সে শক্তি নিবিড় হয়ে ওঠে তার দেহে মনে।

ডিসেম্বর ৮,

প্রিয় উইলেম, আমার অবস্থাটা এখন ঠিক ভূতে পাওয়া লোকের মত। এখন যা আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে আছে তা ভয় বা কামনা নয়। শুধু এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ যেন আমার বুকটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে, আমার গলাটাকে ধরে টিপতে চাইছে। সত্যিই আমি বড় হতভাগ্য। রাত্রিতে আমি প্রায় পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

গত রাতে আমি বাইরে বেরিয়ে যাই। আমি শুনেছিলাম, নদীতে বান এসেছে। কূল ছাপিয়ে নদীর জল ওয়ালহেম গাঁয়ের চারদিক প্লাবিত করে তুলেছে। আমি রাত্রি এগারোটার সময় বাইরে যাই। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! প্রবল বন্যায় প্লাবিত সমস্ত উপত্যকাটা এক সমুদ্রের রূপ ধারণ করেছে। তার উপর ঝড় বইছে। তবে চাঁদের আলো ছিল আকাশে। সে আলোয় বন্যার রূপটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল ঝড়ে আকাশের মেঘগুলো ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়ে মর্ত্যে নেমে এসে বন্যার ব্যাপ্ত জলধারাকে আলিঙ্গন করুক। মনে হলো তাহলে আমি শান্তি পাব।

চারদিকে তাকাতে গিয়ে একটা জায়গায় নজর পড়ল আমার। ফাঁকা প্রান্তরে একটা উইলো গাছের তলায় একদিন বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে লোত্তের সঙ্গে বসেছিলাম। জায়গাটা এখন জলে ডুবে গেছে। গাছটা কোথায় বুঝতেই পারছি না। আমার মনে হলো আমি যেন এমন এক অসহায় বৃদ্ধার মত বসে আছি যে শুধু পরের কাছে রুটি ভিক্ষা করে করে তার নীরস নিরানন্দ জীবনটাকে অহেতুক দীর্ঘায়িত করে চলেছে।

ডিসেম্বর ১৭,

আমার নিজের আচরণে আমি নিজেই চমকে উঠছি বন্ধু। তার প্রতি আমার ভালবাসা কি পবিত্র ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা নয়? সে ভালবাসার মধ্যে কি পাপপ্রবৃত্তি আছে? কিন্তু গত রাত্রিতে, একথা বলতে আমার কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে—আমি তাকে প্রবলভাবে চেপে ধরেছিলাম আমার বুকে। অসংখ্য চুম্বনে সিক্ত করে দিয়েছিলাম তার মুখ। আমার মাথাটা ঘুরছিল। আমি সব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছি। এক সপ্তা হলো আমি কথা বলতে পারি না। চোখে শুধু

জল আসে। কোথাও কোন শান্তি পাই না। এখন পৃথিবী থেকে চলে যেতে পারলেই ভাল।

[পাঠকের নিকট সম্পাদকের নিবেদন]

ওয়ার্দারের শেষ জীবনের কাহিনীর উপাদান আমি পেয়েছি লোত্তে, আলবার্ত আর তার চাকরের কাছ থেকে। সেই কাহিনীটি বলার জন্যই তার চিঠির প্রকাশ বন্ধ করে দিলাম।

ওয়ার্দারের প্রেমাবেগের ক্রমবর্ধমান প্রবলতা আলবার্ত ও তার স্ত্রীর মানসিক শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে তুলছিল। আলবার্ত ক্রমশ ভাবতে শুরু করল ওয়ার্দারের এই ক্রমবর্ধমান প্রেমাবেগ লোত্তের মনটাকেও ক্রমশই প্রভাবিত করে তুলছে। ফলে ওয়ার্দারের প্রতি আলবার্তের মনটা বিষিয়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ। লোত্তের ঘরে যতক্ষণ ওয়ার্দার থাকত ততক্ষণ সে ঘরে যেত না আলবার্ত। একদিন সে তার স্ত্রীকে স্পষ্ট বলে দিল, ওয়ার্দার যেন এত ঘন ঘন তার কাছে না আসে। সেটা লোকচক্ষে দৃষ্টিকটু ঠেকছে।

কথাটা হয়ত জানতে পারে ওয়ার্দার। এই সময় তার আত্মহত্যার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে ওঠে। লোত্তের কাছে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার পর থেকেই এ ইচ্ছাটা জাগে তার মধ্যে। এর সঙ্গে হঠকারিতার কোন সম্পর্ক ছিল না। সে ঠাণ্ডা মাথাতেই এ কাজ করতে চেয়েছিল। তার মনের মধ্যে কি ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল তা উইলেমকে লেখা তারিখহীন একটি চিঠির প্রথম অংশ থেকে জানা যাবে। ওয়ার্দার লিখেছে, তার উপস্থিতি আর আমার প্রতি সহানুভূতি আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক থেকে শেষ অশ্রুবিন্দুটুকুকেও টেনে বার করে নিয়েছে। এবার যবনিকা সরিয়ে পিছনে পা ফেলে যাওয়া। কিসের ভয় কিসের কুণ্ঠা? কারণ পিছনে কি আছে তা আমরা জানি না, কারণ সেখান থেকে ফিরে আসা যায় না। আর একটা কারণ এই যে, মানুষের মনের গঠন প্রকৃতিটাই এমনি। যেখানে আমরা নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত করে জানি না কি আছে সেখানে যত সংশয় আর শঙ্কার অন্ধকার ভিড় করে আসে।

রাষ্ট্রদূত অফিসের চাকরির ব্যাপারটা চাকরি ও রাজনীতিক কাজকর্মের প্রতি তার বিতৃষ্ণাটা বাড়িয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যর্থ প্রেমাবেগের আতিশয্যও বেড়ে যায় তার মনে ভীষণভাবে। এই আবেগের আতিশয্য তার সব প্রাণশক্তি ক্ষয় করে ফেলে ধীরে ধীরে। সে তার প্রেমাস্পদের মনের ভারসাম্যও নষ্ট করে ফেলে। তার এই প্রাণশক্তির নিদারুণ অপচয় এবং তার অসংযত

প্রেমাবেগের ধ্বংসাত্মক পরিণতিই অবশেষে তাকে এই ভয়ঙ্কর কাজে প্রবৃত্ত করে।

ডিসেম্বর ২০,

আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য ধন্যবাদ উইলেম। তুমি আমাকে তোমার কাছে যেতে লিখেছ। এতে আমি কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তুমি আমাকে নিতে আসবে জেনে খুশি হলাম। তবে কিছুদিন অর্থাৎ এক পক্ষকাল দেরি করতে হবে। এখন এখানে বরফ পড়ছে। রাস্তাঘাট খারাপ। আমি তোমাকে চিঠি দেব। আমার চিঠি পেলে আসবে। মাকে তাঁর সন্তানের জন্য প্রার্থনা করতে বলবে। তিনি যেন আমার সব অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার যারা হিতাকাঙ্ক্ষী তারা আমার থেকে কষ্ট পায়—এটাই আমার ভাগ্যে আছে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

সেদিন ছিল রবিবার। খৃস্টের জন্মদিনের আগে। সে গিয়েছিল লোত্তের কাছে। লোত্তে তার ভাই-বোনদের পাওয়া উপহারের পুতুলগুলো গুছিয়ে রাখছিল। ছেলেদের উপহার আর তাদের আনন্দ নিয়ে কথা বলছিল ওয়ার্দার। লোত্তে একসময় বলল, তুমি যদি ভালভাবে চল, তোমার আচরণ শোভন ও মঙ্গলজনক হয় তাহলে তুমিও অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার পাবে। ওয়ার্দার তখন প্রশ্ন করল লোত্তেকে, ভাল আচরণ বলতে কি চাও? আমাকে কি করতে হবে? লোত্তে বলল, আগামী বৃহস্পতিবার খৃস্টের জন্মদিন। ঐদিন সন্ধ্যায় তুমি আসবে, তার আগে নয়। আমার মনের শান্তির খাতিরে অন্ততঃ নিজেকে সংযত করো। এভাবে আর চলে না।

কথাটা গভীর রেখাপাত করে ওয়ার্দারের মনে। সে অশান্তভাবে পায়চারি করতে থাকে ঘরে। লোত্তে বুঝতে পেরে প্রথমটা পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হলো না। ওয়ার্দার স্পষ্ট বলল, না লোত্তে, তোমার সঙ্গে আর আমার কোনদিন দেখা হবে না।

লোত্তে ব্যস্তভাবে বলল, কেন হবে না? অবশ্যই হবে, তবে শুধু নিজেকে একটু সংযত করে চলো। ওয়ার্দারের কথাটা টেনে নিয়ে লোত্তে আবার বলল, কী ভয়ঙ্কর আবেগ নিয়েই না তুমি জন্মেছিলে! অথচ তোমার বুদ্ধি ও প্রতিভা আছে। কিন্তু শুধু একটু আত্মসংযমের অভাবে সব মাটি হয়ে যেতে বসেছে। তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ ওয়ার্দার। শুধু আমার কথাটা। আমি এখন অপরের। আমাকে পাওয়া সম্ভব নয় বলেই আমাকে

পাওয়ার কামনা এমন দুর্বার হয়ে উঠেছে তোমার মনে।

ওয়ার্দার বলল, চমৎকার! বেশ চতুরের মত কথা বলছ ত! কথাগুলো কি আলবার্ত শিখিয়ে দিয়েছে? লোত্তে বলল, কেন, একথা ত সবাই বলবে। জগতে মেয়ের অভাব নেই। একটু খোঁজ করলেই তোমার ভালবাসার পাত্রীকে ঠিকই খুঁজে পাবে। খুঁজে নিয়ে এস। তখন আমাদের বন্ধুত্ব আরও সুখের হয়ে উঠবে।

ওয়ার্দার তখন বলল, আমাকে শুধু একটু সময় দাও। একটু বিশ্রাম করতে দাও। লোত্তে বলল, না, এখন না, তুমি খৃস্টের জন্মদিনের আগে এসো না। এমন সময় আলবার্ত এসে ঘরে ঢুকল। এতে আলবার্ত ও ওয়ার্দার দুজনেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আলবার্ত লোত্তেকে কয়েকটা কাজের কথা জিজ্ঞাসা করে জানল সে কাজ হয়নি। তাতে সে লোত্তেকে তিরস্কারের ভাষায় কি বলল। ওয়ার্দার যাব যাব করেও আটটা পর্যন্ত রয়ে গেল। আলবার্ত তাকে নৈশভোজনে আহ্বান করল। কিন্তু ওয়ার্দার টুপীটা তুলে নিয়ে না খেয়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের বাসায় ফিরে নিজের ঘরে একা চলে গেল ওয়ার্দার। ঘরে ঢুকে কাঁদতে লাগল জোরে। আপন মনে কথা বলতে লাগল উত্তেজিতভাবে। চাকর এসে তার পায়ের জুতো খুলে দিল। ওয়ার্দার তার চাকরকে বলল, সকাল বেলায় তাকে না ডাকা পর্যন্ত সে যেন ঘরে না আসে।

২১শে ডিসেম্বর ছিল সোমবার। ঐদিন সকালে ওয়ার্দার লোত্তেকে একখানা চিঠি লেখে। চিঠিটা তার টেবিলে তার মৃত্যুর পর পাওয়া যায়। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি।

আমি আমার মনস্থির করে ফেলেছি। আমি মরতে চাই। এ কথা আমি তোমাকে বিনা আবেগে লিখছি শান্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায়। এ চিঠি যখন পড়বে তখন থেকে আর আমাকে দেখতে পাবে না। হে প্রিয়তমা, তুমি যখন এ চিঠি পাবে তখন আমার মত এক অশান্ত চঞ্চল লোকের চিরশান্ত কঠিন হিমশীতল মৃতদেহটা কবরে শায়িত হবে। আমার জীবনের শেষদিকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি—এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। গত রাতটা আমি অতি কষ্টে কাটিয়েছি। রাত্রির কষ্ট আমার মৃত্যুবাসনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বুকে একরাশ উত্তেজনার আবেগ নিয়ে যখন তোমার কাছ থেকে চলে আসি তখন এক হিমশীতল শঙ্কায় শিউরে উঠছিল আমার অন্তরাত্মা। সঙ্গে সঙ্গে মনে

অনেক সম্ভাবনা জাগলেও শেষ পর্যন্ত এক সিদ্ধান্তে আমি স্থির ও অনড় হয়ে উঠি। সে সিদ্ধান্ত হলো মৃত্যুর সিদ্ধান্ত। এ মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আমি হতাশা থেকে করিনি, করেছি তোমার জন্য আত্মত্যাগের আদর্শের বশে। হ্যাঁ লোত্তে! কেন মরব না? আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে যেতেই হবে। উন্মত্ততার বশবর্তী হয়ে মাঝে মাঝে তোমাকে ও তোমার স্বামীকে খুন করার কথাও মনে হয়েছে আমার। সুতরাং আমাকে মরতেই হবে। কোন এক সুন্দর বসন্ত সন্ধ্যায় যখন তুমি পাহাড়ে উঠতে উঠতে সামনে উপত্যকার পানে তাকাবে যেখানে আমি প্রায়ই বেড়াতে যেতাম তখন তুমি আমার কথা ভাববে এবং আমার কবরের পানে তাকিয়ে দেখবে। সূর্যাস্তের রঙে রাঙা আমার কবরের পাশের ঘাসগুলো বাতাসে দুলতে থাকবে তখন। চিঠিখানা শান্তভাবে লিখতে শুরু করি। কিন্তু এখন চোখে জল আসছে।

বেলা দশটার সময় তার চাকরকে ডাকল ওয়ার্দার। বলল সে দিনকতকের জন্য বাইরে যাচ্ছে। সব বইপত্র যাকে যা দেওয়া আছে তা যেন সব আনা হয়। ভিখারীদের সাপ্তাহিক বরাদ্দ যেন বেশী করে দিয়ে দেওয়া হয়। তার ঘরে দুপুরের খাবার খেয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে গেল। সোজা চলে গেল লোত্তের বাবার বাড়ি।

লোত্তের বাবা তখন বাড়ি ছিল না। তার ভাইবোনদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। বড় ছেলেটা তাদের জন্য খৃস্টের আসন্ন জন্মদিন উপলক্ষে এক সাদর সম্ভাষণ লিখেছে।

সেখান থেকে সোজা বাসায় ফিরে এল ওয়ার্দার। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও ছটার সময় আবার বেরিয়ে আলবার্তের বাড়ি গেল। গিয়ে দেখল লোত্তে একা রয়েছে ঘরে। ওয়ার্দারকে অসময়ে দেখে ভয় পেয়ে গেল লোত্তে। এখন আলবার্ত বাড়ি নেই। ওয়ার্দারের সঙ্গে বসে কথা বললে আলবার্ত তা সন্দেহ করবে। তাই ঝিকে দিয়ে তার দুজন বান্ধবীকে ডাকতে পাঠাল। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। তখন হতাশ হয়ে ভাবতে লাগল। কিন্তু তার অন্তরের শুচিতায় নিজেই আশ্বাস পেল মনে মনে। ভাবল সে যখন অন্তরে খাঁটি, তার মনে যখন কোন পাপ নেই সে কাউকে কোন ভয় করবে না। সে ওয়ার্দারের কাছে বসে থাকবে। আলবার্ত এলে সব কথা বলবে। এই ভেবে সে ওয়ার্দারের পাশে সোফায় গিয়ে বসল। ওয়ার্দার তাকে বইগুলো ফেরৎ দিতে এসেছে। লোত্তে তাকে আবৃত্তি শোনাতে বলল। ওয়ার্দার পড়তে শুরু করল। বইটার

নাম 'দি সংস অফ সেলমা।'

হে শেষরাতের তারা! মেঘের ভিতর থেকে তুমি মুখ তুলতেই তোমার আলো পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ে শোনা যাচ্ছে তোমার শব্দহীন পদধ্বনি। সমতলভূমির পানে তাকিয়ে তুমি কি দেখছ? ঝড়ের শব্দ আসছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে দূরের পাহাড়ে। আমি আমার মৃত বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি। তাদের গান শুনতে পাচ্ছি। সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ ইউলিন, রাইনো, আলপিন আর মিলোনা। সেলমার ভোজের পর থেকে তোমরা কত বদলে গেছ!

মিলোনা এল তার উজ্জ্বল সৌন্দর্য নিয়ে। তার চোখে জল, মুখে বিষাদ। তার এলো চুল বাতাসে উড়ছিল। তার সকরুণ গান শুনে মৃতরাও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কলমা একা পাহাড়ে পড়ে রইল। সালগাতের আসবে বলেছিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। অথচ সে এল না। এবারে কলমার কথা শোন।

কলমা

এখন রাত্রিকাল। আমি একা। এই বিক্ষুব্ধ ঝড় জলের মাঝে এই পাহাড়ে আমি একা। মাথা গোঁজার মত কোথাও একটা কুঁড়েও নেই।

হে চাঁদ, হে নক্ষত্র, মেঘের আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে এস। আমাকে আলো দিয়ে অন্ততঃ একটু পথ দেখাও। আমার ক্লান্ত প্রেমাস্পদ কোথায় আছে তা দেখিয়ে দাও। আমি এই পাহাড়ের কোণে শ্যাওলাভরা ঝর্ণার ধারে বসি। কিন্তু আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় গেল আমার সালগাত? হে গর্জনশীল বাতাস, হে ঝর্ণাধারা, তোমরা একটু চুপ করো। আমি আমার প্রেমাস্পদকে ডাকছি। তোমরা চুপ না করলে সে আমার ডাক শুনতে পাবে না। এই সেই গাছ, ঝর্ণার ধারা, সেই পাথরের আসন। এখানেই সে আসবে বলেছিল। কিন্তু এল না। হে মৃত আত্মারা, তোমরা নির্জন গিরিকান্তার হতে কথা বল। আমি মোটেই ভীত হব না। আমি সারারাত এইভাবে চোখের জলে কাটিয়ে মৃত্যু বরণ করব। তোমাদের সমাধির পাশে আমাকে একটু স্থান দিও।

রাইনো

ঝড় জল থেমে গেছে। এখন বেলা দ্বিপ্রহর। এখন চারদিক শান্ত। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সবুজ পাহাড়ের মাথার উপর সূর্য দেখা যাচ্ছে।

ঝর্ণার মিষ্টি কলতানের থেকে মিষ্টি কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি আমি? এ কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের সন্তান আলপিনের। হে আলপিন, এই নির্জন পাহাড়ে একা তুমি কি করছ?

আলপিন

হে রাইনো, আমি মৃতদের জন্য চোখের জল ফেলছি। আমার মৃত প্রিয়জনদের জন্য দুঃখে গান গাইছি।

ওয়ার্দারের আবৃত্তি শুনতে শুনতে লোত্তের চোখে জল ঝরে পড়ছিল। এত দুঃখের কথা কখনো শোনেনি সে। তার চোখে জল দেখে ওয়ার্দারের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। সে লোত্তের একটি হাত টেনে নিয়ে তার চোখের জলে ভিজিয়ে দিল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে লোত্তে ওয়ার্দারকে আরও পড়ে যেতে বলল। ওয়ার্দার আবার পড়তে লাগল, কেন তুমি আমায় জাগাচ্ছ হে বসন্ত বাতাস? আমার পাতায় যে শিশিরবিন্দু ঝরে পড়ে তাতে তুমি শীতল হও। কিন্তু আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। তুষারঝড়ে আমার পাতাগুলো সব ঝরে পড়ছে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যে পথিক একদিন আমার যৌবনসৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিল সে কাল আসবে, আমাকে খুঁজবে। কিন্তু দেখতে পাবে না।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না ওয়ার্দার। লোত্তের পায়ের কাছে পড়ে গেল। লোত্তের হাতদুটো টেনে নিয়ে নিজের চোখ ও কপালে চেপে ধরল। ফলে লোত্তের মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। সব ভাবনাচিন্তা ওলটপালট হয়ে গেল। উল্টে গেল তার মনের কাঠামোটা। সেও সহসা উত্তেজিত হয়ে ওয়ার্দারের হাত দুটো টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর চেপে ধরল। তার গালটা ওয়ার্দারের গালে ঠেকল। ওয়ার্দার তখন লোত্তের হাতদুটো নিয়ে নিজের বুকে চেপে তার কম্পমান উত্তপ্ত ঠোঁটদুটো অসংখ্য চুম্বনে ভরিয়ে দিল।

এবার হুঁস হলো লোত্তের। সে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ডাকল, ওয়ার্দার। সে নিজেকে ওয়ার্দারের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করার জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করল।

ওয়ার্দার আর তাকে আটকে রাখল না। তাকে ছেড়ে তার পায়ের তলায় নতজানু হয়ে বসে পড়ল। লোত্তে তখন ভালবাসা আর ক্রোধ এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্বে কাঁপছিল। কম্পিত কণ্ঠে সে বলল, ওয়ার্দার, মনে রেখো এই আমাদের শেষ দেখা।

এই বলে সে শেষবারের মত ওয়ার্দারের পানে তাকিয়ে পাশের ঘরে ছুটে-

চলে গেল। তাকে মরিয়া হয়ে ধরার জন্য হাত দুটো একবার শূন্যে বাড়িয়ে দিল ওয়ার্দার। কিন্তু তখন লোত্তে পাশের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে দিয়েছে।

ঘরের মেঝের উপর হতাশ হয়ে আধ ঘণ্টা মত শুয়ে রইল ওয়ার্দার। পরে হুঁস হতে সে পাশের ঘরের রুদ্ধ দরজায় বাইরে থেকে ডাকল, লোত্তে, শোন একবার। বিদায়কালে শুধু একটা কথা বলতে চাই।

কিন্তু লোত্তে কোন উত্তর দিল না। তখন হতাশ হয়ে ওয়ার্দার চলে গেল। শুধু বলে গেল, চিরদিনের জন্য বিদায় লোত্তে।

লোত্তেদের বাড়ি থেকে সোজা শহরে চলে গেল ওয়ার্দার। তখন বৃষ্টি পড়ছিল গুড়িগুড়ি। তার উপর তুষারপাতও হচ্ছিল। ওয়ার্দার যখন তার বাসায় পৌছল তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। তার চাকর দরজা খুলে দিয়ে দেখল তার মাথার টুপীটা কোথায় পড়ে গেছে। তার গায়ের জামাকাপড় সব ভিজে গেছে।

রাত্রে ভালভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘুমোল ওয়ার্দার। সকালে চাকরকে কফি বানাতে বলল। তারপর একখানা চিঠি লিখল লোত্তেকে।

এই শেষবারের মত চোখের পাতা খুলে চাইছি সূর্যের পানে। আর কোন দিন এই সকালের আলো প্রাণভরে উপভোগ করব না। কথাটা যেন সত্যিই স্বপ্নের মত শোনাচ্ছে। জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর কল্পনা বা চিন্তা অস্পষ্টধূসর এক তরল স্বপ্নের মতই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য কথা দেখ। আজ আমি এই মুহূর্তে আমার দেহ-মনের সব শক্তির নিবিড়তা নিয়ে বেঁচে রয়েছি। অথচ আগামী কাল সকালে আমার অসাড় দেহটা টান টান হয়ে ছড়িয়ে থাকবে। মৃত্যু! কিন্তু কথাটার মানে কি? কত মানুষ মরেছে, কত মানুষ জন্মেছে, তবু এই জন্ম-মৃত্যুর আদি অন্তহীন চক্রাবর্তনের আসল মানেটা কেউ আজও বুঝতে পারেনি।

আমি চলে যাব। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। সেই অন্ধকার সংকীর্ণ কবরে গিয়ে ঢুকে থাকব। কিন্তু চলে যাব মানে? কথাটা কি শুধু এক অর্থহীন শব্দ নয়? মৃত্যু, কবর—এ সব কথার আসল মানে আমি সত্যিই বুঝি না।

আমাকে ক্ষমা করো। আমি গতকালকার কথা বলছি। গতকালই ঐ সময় আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। গতকালই সর্বপ্রথম আমার অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ হতে এক সংশয়হীন সত্য এক প্রবল আবেগে সিক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। আমি সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারি তুমি আমাকে ভালবাস। তুমি

আমাকে ভালবাস। তোমার ওষ্ঠাধর থেকে যে উত্তাপ বেরিয়ে আসে সে উত্তাপ আমার ওষ্ঠাধরকেও পুড়িয়ে দেয়। আমার অন্তরকেও স্পর্শ করে। তবু বলছি ক্ষমা করো আমায়।

তুমি আমাকে ভালবাস একথা আমি জেনেছিলাম আমার প্রতি তোমার চাউনি দেখে, আমার হাতের উপর তোমার হাতের চাপ দেখে। তবু তোমার পাশে যখনি আলবার্তকে দেখতাম তখনি এক উত্তপ্ত সংশয় হতাশ করে তুলত আমায়। আচ্ছন্ন করে তুলত আমার মনকে।

তোমার মনে আছে, তুমি যখন আমাকে মুখে কোন ভালবাসার কথা বলতে না অথবা তোমার হাত স্পর্শ করতে দিতে না তখন তুমি মাঝে মাঝে কিছু ফুল দিতে। সেই ফুল আমি রাত্রিতে ঘরে রেখে তার সামনে অর্ধেক রাত নতজানু হয়ে বসে থাকতাম। সে ফুলের মধ্যে আমি পেতাম তোমার ভালবাসার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। কিন্তু এই বোধ আমার বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। কারণ এইসব পবিত্র প্রতীকের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে কৃপা ঝরে পড়ত আমার উপর তাতে বিশ্বাস আমি ক্রমশই হারিয়ে ফেলতাম।

ভালবাসার এই সব স্বাক্ষর যত পবিত্রই হোক তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু গতকাল তোমার ওষ্ঠাধরে প্রেমের যে উত্তপ্ত নির্যাস আমি লাভ করি, আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুভব করি কোন অবস্থাই তা তুলনীয় নয়। আমার এই বাহু তাকে আলিঙ্গন করেছে। আমার এই ওষ্ঠ তার ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে, এই মুখ তার মুখ চুম্বন করেছে। তুমি আমার। হ্যাঁ লোত্তে, তুমি চিরকালের জন্য আমার।

তাহলে আলবার্ত তোমার স্বামী—এ কথার অর্থ কি? তার মানে এই কি যে তোমাকে ভালবাসা পাপ? তার মানে এই যে আমি তোমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে চাই এবং তোমাকে ভালবেসে আমি পাপ করেছি। তা হোক, এটা যদি পাপ হয় তাহলে এ পাপের স্বর্গীয় সুষমা আমি প্রাণভরে আস্বাদন করতে চাই। তাহলে তাতে আমি শক্তি পাব মনে। আমি আমার ও তোমার পরম পিতার কাছে চলে যাচ্ছি নির্ধারিত সময়ের আগেই। যতদিন পর্যন্ত তুমি সেখানে না যাও এবং আমি তোমাকে তাঁর সামনে অন্তহীন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে না পারি ততদিন আমাদের সেই পরম পিতাই আমাকে সান্ত্বনা দেবেন।

এটা কোন স্বপ্ন বা ভ্রান্তি নয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি অনেক কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি বেশ জানি আমাদের আবার দেখা হবেই। আমি

গিয়ে তোমার মার সঙ্গে দেখা করব। তিনি নিশ্চয় দেখতে তোমার মতই। আমি তাঁকে আমার সব কথা খুলে বলব।

বেলা এগারোটা নাগাদ ওয়ার্দার তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করল আলবার্ত বাড়ি ফিরেছে কি না। চাকর বলল, ফিরেছে। তার ঘোড়া সে দেখতে পেয়েছে। ওয়ার্দার তখন একটা চিরকুট লিখে চাকরের হাতে দিয়ে আলবার্তের কাছে পাঠাল। তাতে লিখল, আমি বাইরে যাচ্ছি কিছুদিনের জন্য, তোমার পিস্তল ছুটো দেবে। বিদায়।

সই না করেই চিরকুটটা পাঠিয়ে দিল ওয়ার্দার।

এদিকে গত সন্ধ্যের সময় সেই ঘটনা ঘটার পর থেকে সারারাত ধরে একটু ঘুমোতে পারেনি লোত্তে। পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল তার অন্তর। একদিকে ওয়ার্দারের নিবিড় আলিঙ্গনের পর থেকে তার প্রতি ভালবাসার আবেগটাকে দূরীভূত করতে পারছিল না কিছুতেই; আবার তার অতীতের নিষ্পাপ নিষ্কলুষ নারীজীবনের হারানো শুচিতার জন্যও দুঃখ হচ্ছিল। আলবার্ত ফিরে এসে ওয়ার্দারের আসার কথা জানতে পেরে বিরক্ত হয়ে নানা-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, তাকে উপহাস করবে, তার মুখে ক্রোধের ছায়া ফুটে উঠবে। এসব কথা মনে করে ভয় পেয়ে গেল লোত্তে। সে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি জীবনে। কিন্তু আজ আলবার্তের কাছে মিথ্যা কথা বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। তার ক্রমবর্ধমান অস্বস্তি তার পাপটাকে বড় করে তুলল তার কাছে। তথাপি এ পাপের যে নায়ক তাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে পারল না অথবা তার মুখ কখনো দেখবে না সে প্রতিজ্ঞাও করতে পারল না। সারারাত অতন্দ্রভাবে চোখের জল ফেলে কাটিয়ে শেষ রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল লোত্তে। সকালে উঠতেই দেখল আলবার্ত এসে গেছে। আলবার্তের উপস্থিতিটা আজ প্রথম অসহ্য ঠেকল তার কাছে। পাছে তার চোখ মুখ দেখে তার নিদ্রা-হীনতার কথা জানতে পারে আলবার্ত এই ভয়ে কাঁদতে লাগল লোত্তে। সে আলবার্তকে বেশ নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। সে আলিঙ্গনের মধ্যে আনন্দের আবেগের থেকে ভয় আর দুশ্চিন্তাটাই প্রকট হয়ে উঠল। আলবার্ত তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে অথবা কেউ এসেছিল কিনা। লোত্তে সত্যি কথা বলল। বলল গতকাল ঘণ্টাখানেকের জন্য ওয়ার্দার এখানে এসেছিল। তখন আলবার্ত বলল, সে এখানে আসার সময়টা ঠিক বেছে নেয়।

এই কথা বলে তার পড়ার ঘরে চলে গেল আলবার্ত। লোত্তে তার কাছে

গিয়ে তার কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। আলবার্ত নীরসভাবে উত্তর করল তার কিছু লাগবে না। সে আপন মনে কি লিখতে লাগল। লোত্তে উল বুনতে লাগল। এইভাবে একঘণ্টা কেটে গেল। লোত্তে আলবার্তকে কি বলল। কিন্তু তার কোন উত্তর দিল না আলবার্ত। লোত্তের মনে অনেক বিষণ্ণ চিন্তা ভিড় করে এল। তাতে তার দুঃখ আরও অনেক বেড়ে গেল। তার চোখে জল এল। সে মুখটা ঘুরিয়ে চোখের জল লুকোতে লাগল।

এমন সময় সেই চিরকুট নিয়ে ওয়ার্দারের লোক এল। চিরকুট দেখে আলবার্ত নীরসভাবে তার স্ত্রীকে বলল, পিস্তল দুটো দিয়ে দাও। আমি তার শুভযাত্রা কামনা করি।

কিন্তু কথাটা বজ্রপাতের মত শোনাল লোত্তের কানে। নানারকম বিপদের আভাসে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার অন্তর। এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় বেদনায় ভরে গেল তার মন। কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না সে। সে নীরবে ঘরে গিয়ে দেওয়ালের তাক থেকে পিস্তল দুটো বার করে ঝেড়ে মুছে ওয়ার্দারের লোকটার হাতে তুলে দিল যন্ত্রচালিতের মত। একবার লোত্তের মনে হল তার স্বামীর পায়ের উপর পড়ে গতকাল যা যা হয়েছে সব বলবে। কিন্তু পরে আবার ভাবল তাতে কোন ফল হবে না। আলবার্তকে অনুরোধ করলেও সে ওয়ার্দারের কাছে যাবে না।

খাবার টেবিল সাজানো হলো। লোত্তের এক বান্ধবী এসেছিল। তার সঙ্গে কিছু কথা বলে কিছুটা হালকা হলো লোত্তে।

এদিকে পিস্তল পেয়ে সেগুলো আগ্রহভরে নিল ওয়ার্দার। যখন শুনলো সেগুলো লোত্তে লোকটার হাতে তুলে দিয়েছে তখন তার আনন্দ বেড়ে গেল। সে রুটি আর মদ আনিয়ে সেই ঘরে বসে খেল। তারপর কি লিখতে লাগল। সে লোত্তেকে লিখল :

এই পিস্তলগুলো তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়েছে। তুমি তাদের গা থেকে ধূলো ঝেড়ে পরিষ্কার করেছ। আমি এগুলোকে তাই অসংখ্যবার চুম্বন করছি। আমি আমার চাকরকে সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল তুমি পিস্তলগুলো যখন তার হাতে তুলে দাও তখন তোমার হাত কাঁপছিল। কিন্তু তুমি আমাকে বিদায় জানাও নি। তবে কি আমার প্রতি তোমার অন্তরের দরজাটা রুদ্ধ করে দিয়েছ? কিন্তু লোত্তে, আমার মনে যে ছাপ তুমি রেখেছ তা হাজার হাজার বছরেও মুছে যাবে না। যে তোমাকে এত জ্বালাচ্ছে তাকে তুমি ঘৃণা

করতে পার না।

খাওয়ার পর কতকগুলো কাগজপত্র বেছে তা নষ্ট করে ফেলল। একবার বাইরে গিয়ে ঘুরে এল ওয়ার্দার। তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। তবু বাইরে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কাউন্টের বাগানবাড়ি পর্যন্ত চলে গেল ওয়ার্দার। তারপর বাসায় ফিরে এল। তারপর রাত্রিতে আবার দুটো চিঠি লিখল। একটা উইলেম আর একটা আলবার্তকে। উইলেমকে লিখল, শেষবারের মত মাঠ বন আর আকাশটাকে দেখে এলাম। তোমাকে শেষবারের মত বিদায় জানাচ্ছি উইলেম। আমাকে ক্ষমা করো। মাকে সান্ত্বনা দিও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। বিদায়। পরে সুদিন এলে দেখা হবে।

এরপর আলবার্তকে লিখল, তোমার দানের প্রতিদান ঠিকমত দিতে পারলাম না আলবার্ত। এজন্য ক্ষমা করো আমায়। আমি তোমাদের মধ্যে অবিশ্বাস জাগিয়ে তোমাদের পারিবারিক শান্তি নষ্ট করেছি। আমার মৃত্যু যাতে তোমাদের সংসারে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্যই আমি মরছি। আলবার্ত, আমার দেবদূতকে সুখী করো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

এরপর লোত্তেকে আবার একটা চিঠি লিখল ওয়ার্দার।

এখন আমার অন্তর চমৎকারভাবে শান্ত। হে ঈশ্বর, শেষ সময়ে আমাকে এই আত্মশক্তি দান করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। জানালার ধারে গিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কিছু নক্ষত্র দেখলাম। লোত্তে, গতকালও তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের দেখেছিলাম। ওদের দেখে তোমার কথা মনে পড়ল।

আমি তোমার বাবাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছি চার্চের উঠোনে সমাধিভূমিতে যে দুটো লাইম গাছ আছে কোণের দিকে আমার দেহটা যেন সেইখানে সমাহিত করা হয়। আশা করি, তিনি তাঁর বন্ধুর জন্য এটুকু অন্ততঃ করবেন। আমার ইচ্ছা ছিল কোন পথের ধারে অথবা কোন নির্জন উপত্যকাভূমিতে আমার দেহটাকে সমাহিত করা হবে।

এবার যে মৃত্যুর পেয়ালা তুমি নিজের হাতে তুলে দিয়েছ লোত্তে আমি তা প্রাণভরে পান করব। আমি তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করছি। তোমার জন্য আত্মত্যাগ করছি—একথা ভেবে এ মৃত্যুতে আনন্দবোধ করছি আমি। প্রিয়জনের জন্য জীবন দান করার ঘটনা এমন কিছু নূতন নয়। আমি এই পোষাক পরেই মরব। এ পোষাক তোমার স্পর্শে পবিত্র হয়ে আছে। যে গোলাপটি

তুমি আমার জন্মদিনে দান করেছিলে সে গোলাপটি আমার মৃতদেহের সঙ্গে সমাহিত হবে কবরে। তুমি শান্তভাবে সবকিছু সহ্য করবে।

পিস্তল দুটো গুলিভর্তি আছে। এখন রাত্রি বারোটা বাজে। বিদায় লোত্তে, বিদায়।

ঐ সময় জনৈক প্রতিবেশী ওয়ার্দারের ঘরে গুলির শব্দ শোনে এবং আগুনের একটা ঝিলিক দেখে। কিন্তু তা শুধু মুহূর্তের জন্য। তার পরমুহূর্তেই সব চুপ হয়ে যায়।

পরদিন সকাল ছটার সময় ওয়ার্দারের চাকর বাতি হাতে তার ঘরে ঢোকে। ঢুকেই দেখে ওয়ার্দার মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে এবং তার পাশে একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে। সে তখন ওয়ার্দারের দেহটা ধরে নাড়া দেয়। কিন্তু সে দেহ নিথর নিস্পন্দ। শুধু তার গলা থেকে ঘর্ঘর একটা আওয়াজ হচ্ছিল। সে তখন ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকে।

আলবার্তকে খবর দেয়। কথাটা শুনে আলবার্তের সামনেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে লোত্তে।

ডাক্তার এসে ওয়ার্দারকে পরীক্ষা করে দেখল কোন আশা নেই। তার নাড়ীতে তখনো অবশ্য স্পন্দন ছিল। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অসাড় হয়ে গেছে। ওয়ার্দার তার ডান চোখের পাশ থেকে রগের ভিতর গুলি করেছে। তার মাথার ভিতরটা গুঁড়ো হয়ে গেছে। তার হাতে আর চেয়ারে রক্ত লেগে ছিল। এর থেকে বোঝা গেছে যে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে গুলি করেছে নিজের মাথায়। তারপর সে চেয়ার থেকে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ে যায়। তার পায়ে জুতো ছিল আর পরনে ছিল প্যান্ট, নীল কোট আর হলুদ রঙের ওয়েস্ট কোট।

ওয়ার্দারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। সারা শহরের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। অনেকে দেখতে আসে। খবর পেয়ে আলবার্ত ছুটে আসে। আলবার্ত ভয় পেয়ে যায়, লোত্তে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

লোত্তের বাবা খবর পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছিল। ওয়ার্দারের দেহটা ধরে বারবার চুম্বন করতে লাগল বৃদ্ধ। সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় ছেলেটিকে সবচেয়ে ভালবাসত ওয়ার্দার। সব ছেলে-মেয়েরা এসে দুঃখে ভেঙে পড়ল। তার হাতটা টেনে নিয়ে চুম্বন করতে

লাগল। বড় ছেলেটি ওয়ার্দারের মুখে মুখ রেখে কাঁদতে লাগল। তাকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে হলো।

দুপুরে মারা গেল ওয়ার্দার। তার নির্বাচিত জায়গায় তাকে কবর দেওয়া হলো। লোত্তের বাবাই সব ব্যবস্থা করল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। লোত্তের বাবা ও সব ভাইবোনেরা উপস্থিত ছিল। কিন্তু লোত্তের অবস্থা খারাপ থাকার জন্য আলবার্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে পারেনি।

আয়রণ হ্যাণ্ড

নাটকের চরিত্র

সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান
গোয়েৎস ভন বার্লিসিঙেন : জনৈক নাইট
এলিজাবেথ : ঐ স্ত্রী
মেরিয়া : ঐ ভগিনী
কার্ল : ঐ পুত্র
লার্সে : ঐ ভৃত্য

ফ্রাঁৎস ভন সিকিঙেন } নাইটদ্বয়
ব্যাম্বার্গের বিশপ
এ্যাডেলবার্ত ভন ওয়েসলিঙেন : নাইট
ফাঁৎস : ওয়েসলিঙেনের জমিদার
এ্যাডেলহেলড্ ভন ওয়ালডর্ফ : সম্ভ্রান্ত মহিলা
মার্গারেট : ঐ সহচরী
ফালদার : মঠাধ্যক্ষ
ওলিয়ারাস : আইনজ্ঞ

মেৎসার
স্লেভার্স
কোহেল
ওয়াইলড্
} কৃষক নেতাগণ

অন্যান্য কৃষকগণ
কন্যার পিতা
উদ্বাস্তুগণ
মাতা

বেদেগণ
ক্যাপ্টেন
বৃদ্ধা
যুবতী
বালক
মার্তিন : জনৈক মঠবাসী
পান্থশালার মালিক
হেলব্রুনের কারাধ্যক্ষ
হেলব্রুনের নাগরিকবৃন্দ
হেলব্রুনের উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ
রাজ্যের সেনাদলের সেনানায়ক ও অফিসারগণ
সম্রাটের অশ্বারোহীগণ
সিকিঙেনের প্রহরীগণ
গোপন বিচারালয়ের বিচারকগণ
বিচারবিভাগীয় কমিশনার
সার্জেন্ট
জনৈক বিশপ
বার্লিসিঙেন
সেলবিৎস
নবদম্পতি
জনৈক বালক
জনৈক বৃদ্ধ
জনৈক মাতা

নাটকের ঘটনাস্থল : জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : ফ্রাঙ্কোনিয়ার অন্তর্গত সোয়ার্জেনবার্গের এক পান্থশালা। মেৎস্লার ও স্লেভার্স নামে দুজন চাষী মদ পান করছিল। ব্যাম্বার্গের বিশপের ব্যাজপরা দুজন সৈনিক আগুনের কাছে এক জায়গায় বসে খাচ্ছিল।

স্লেভার্স। কই হ্যানসেল, আরো মদ দাও। (হোটেলমালিক এসে গ্লাসে মদ ঢেলে দিল। কিন্তু স্লেভার্সের তা পছন্দ হলো না) এটাকে কি তুমি খৃস্টধর্ম বল? ঢাল ঢাল।

মালিক। নাও, এবার হয়েছে? আমরা তোমাকে খুশি করবই। (মেৎস্লারের গ্লাসেও মদ ঢেলে দিল)

স্লেভার্স। হ্যাঁ, এতেই হবে।

মেৎস্লার। (গলা নিচু করে) আচ্ছা, তখন তুমি গোয়েৎসের লৌহহস্ত সম্বন্ধে কি বলছিলে? ব্যাম্বার্গের দুজন লোক তা শুনেছে। তারা কিন্তু এটা পছন্দ করেনি।

স্লেভার্স। (গলা তেমনি নিচু করে) ওরা এখানে কি করছে? এই পথ ধরে কোথায় যাচ্ছে?

মেৎস্লার। ওয়েসলিঞ্জেন তোমাদের কাউন্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রাসাদে গেছে। উনি আজই ব্যাম্বার্গে ফিরে যাবেন। ঐ সৈনিকরা তাঁর দেহরক্ষীদের একটা অংশ মাত্র।

স্লেভার্স। আমি ত ভেবেছিলাম ওরা বিশপের লোক।

মেৎস্লার। সত্যিই তারা তাই। ওয়েসলিঞ্জেনও তাই। বিশপ হচ্ছে তাঁর ডান হাত। কিন্তু আমি বলব ডান হাত নয় ছুটন্ত কুকুর। তবে সে জানে কোথায় যাবার জন্য সে ছুটছে। সে ছুটেছে গোয়েৎসের পিছনে। বিশপ তাঁকে প্রচুর লোক দিয়েছে। সেই সব লোককে গোপন আক্রমণের ব্যাপারে নিযুক্ত করা হয়েছে।

স্লেভার্স। গোয়েৎসের জন্য আক্রমণ? সে দারুণ কৌশলের ব্যাপার।

মেৎস্লার। হ্যাঁ ঠিক তাই। সে কৌশল তার আছে। (গলাটা উঁচু করে) প্রথমে আমি শুনেছিলাম বিশপের সঙ্গে গোয়েৎসের ঝগড়া হয়েছে। পরে মনে হয় সে ঝগড়া মিটে গেছে।

স্লেভার্স। মিটেছে তবে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে। দুজনেই পরস্পরের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। অস্ত্র বার করে। বিশপ তখন না পেরে যুবরাজের কাছে

চলে যায় মিটমাটের জন্য। পরে বিচারে গোয়েৎসই দোষী সাব্যস্ত হয়।

মেৎস্লার। ঠিকই বিচার হয়েছে।

স্লেভার্স। আমি ত বলি গোয়েৎস ভন বার্লিসিঙ্গেন মানুষ হিসাবে খুবই ভাল।

মেৎস্লার। তিনি মহৎ লোক।

স্লেভার্স। কিন্তু শোন। বিচার ও মিটমাটের পর তোমাদের খুনী বিশপ গোয়েৎসের একটা ছেলেকে ব্যাম্বার্গে ধরে নিয়ে যায়। অথচ তার কোন দোষ নেই। কিন্তু খুনী বিশপ—

জনৈক সৈনিক। আমাদের বিশপের সম্বন্ধে কি বলছ তোমরা?

স্লেভার্স। আমরা তোমাদের কোন কথার জবাব দেব না। (প্রথম সৈনিক তাকে আঘাত করল)

মেৎস্লার। এর শোধ নাও স্লেভার্স।

দ্বিতীয় সৈনিক। চলে এস, আমরা তৈরি। (চারজন মারামারি লাগাতে হোটেল মালিক ছুটে এল)

মালিক। শান্ত হও, রক্তলোলুপ নেকড়ের মত মারামারি করো না। যা করবে বাইরে গিয়ে করো। এটা আমার বাড়ি। আমি অশান্তি হতে দেব না। (সৈনিক দুজনকে ধরে দরজার বাইরে নিয়ে গেল) গাধা কোথাকার, কি করছিলে?

মেৎস্লার। তুমি আমাদের গাধা বললে হালমেন। ঠিক আছে আমরা যাচ্ছি। (তারা দরজার কাছে যেতে গোয়েৎসের দুজন সৈনিককে দেখা গেল)

১ম সৈনিক। কি ব্যাপার?

স্লেভার্স। কেমন আছ? গোয়েৎস কেমন?

১ম সৈনিক। কি হচ্ছিল বল?

স্লেভার্স। ব্যাম্বার্গের লোকদের দেখলে?

১ম সৈনিক। ওরা এখানে কি করছিল?

মেৎস্লার। তারা ওয়েসলিঙ্গেনের সঙ্গে প্রাসাদে এসেছিল।

২য় সৈনিক। কতদিন উনি এখানে আছেন?

মেৎস্লার। দুদিন। কিন্তু এখন তিনি চলে গেছেন। চল আমরা ওদের আক্রমণ করি। ওরা বাইরে অপেক্ষা করছে।

১ম সৈনিক। (তার সঙ্গীকে) চলে এস।

স্লেভার্স। কি ব্যাপার ছোকরা। ব্যাম্বার্গের লোকরা আমাদের লড়াইয়ের

আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আমাদের সাহায্য করবে না?

সৈনিকরা। (যেতে যেতে) আমাদের সময় নেই। তোমরা দুজন আছ। ওদের মেরে ফেলতে পারবে। (চলে গেল)

স্লেভার্স। যাও। তোমাদের সাহস নেই বলেই পালাচ্ছ। পরে ভুগতে হবে।

মেৎস্লার। ওরা কার লোক?

স্লেভার্স। কোন নাম বলে না, তবে যার হাত লোহার মত শক্ত ওরা তারই লোক।

মেৎস্লার। গোয়েৎস? তাহলে ঠিক আছে। তরোয়াল থাক বা নাই থাক লাঠি থাকলেই হবে। চল শয়তানগুলোকে মেরে আসি।

স্লেভার্স। ওদের মালিককেও ঘায়েল করব। রাজারাজরা ও বিশপরা আমাদের গায়ের চামড়া যখন তখন ইচ্ছামত জামা খোলার মত টেনে ছাড়াতে চায় একথা আমি বলতে পারি।

মেৎস্লার। আমরা ওদের মজা দেখিয়ে দেব। আমি নূতন আসছি না। অনেকদিনের লোক। তুমি তা জান। চলে এস। (ওরা চলে গেল)

বনমধ্যে একটি কুটিরের বহির্ভাগে বর্মপরিহিত অবস্থায় গোয়েৎস পায়চারি করছিল। তার বাঁ হাতে ছিল লোহার দস্তানা। ডান হাতটি লোহা দিয়ে তৈরি হলেও আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় সে হাতেও পরে আছে লোহার দস্তানা।

গোয়েৎস। এতক্ষণে কি তারা ফিরেছে সেখানে? এতক্ষণে তাদের ত তাকে খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল, এখানে ফিরে আসা উচিত ছিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত এই কুটিরে পড়ে আছি। একটুও ঘুম নেই চোখে। শুধু গাজর খেয়ে আছি আর বৃষ্টির মাঝে ঘোড়ায় চেপে ঘুরছি। অপদার্থগুলো গেল কোথায়। যদি তারা তাকে খুঁজে না পায় তাহলে তারা এসে আমাকে বলবে ওয়েসলিঙেন ব্যাম্বার্গে ফিরে গেছে এবং আমরা তাকে পাইনি এখনো। একটুও ঘুম নেই। শুধু পায়চারি করতে করতে জেগে আছি। (হাতের বোতলের সব মদ শেষ হয়ে গেল) খালি হয়ে গেছে। কই জর্জ, এটা ভরে দাও এবং জেগে থাক। জার্মানির কোন রাজা আমার খাড়া করা এই মাথা নত করতে পারিবে না। আমার নাইটের গৌরবও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কোন বিশপও না। আমি সর্বক্ষণ জেগে আছি, দাঁড়িয়ে আছি মাথা উঁচু করে। শোন ব্যাম্বার্গের বিশপ, আমি জানি তুমি কি চাও। তুমি তোমার ধর্মস্থানের উচ্চপদ হতে অবিচার

চালিয়ে যাচ্ছ আর ওয়েসলিঞ্জেন আমার আত্মীয় স্বজনদের কাছে আমার নামে নিন্দার গরল ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে চাই কতদূর সে এই হীন কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়। জর্জ, এখানে এস।

জর্জ। (বুকে বর্ম আঁটছিল, সেটা নামিয়ে রেখে) যাচ্ছি স্যার।

গোয়েৎস। তুমি নাটক করতে চাও ত আমার প্রাসাদে চলে যাও। এখানে আমরা খেলা করতে আসিনি। কয়েক বছরের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও বক্ষাবরণটা কার ? জোহানের ?

জর্জ। ও ঘুমোতে যাবার আগে আমাকে বর্মটা খুলে দিতে বলল। তাই—

গোয়েৎস। ঘুমোতে চেয়েছিল ? সে জমিদার হয়ে ঘুমোচ্ছে আর আমি প্রহরীর মত জেগে আছি। তাকে বক্ষাবরণীটা ফিরিয়ে দাও গে। তাকে জাগতে বল। মদ দাও। তাকে বর্ম দেবার আগে আমার পাত্রটা ভরে দাও। আচ্ছা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ?

জর্জ। না ত!

গোয়েৎস। হে যীশু, মেরি ও যোশেফ, তারা কেন আসছে না ? জোহানকে বল ঘোড়ায় জিন দিতে। ওরা এসে গেলে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করব না।

জর্জ। ঘোড়া তৈরি। আমি সব দেখে নিয়েছি।

গোয়েৎস। আগের থেকে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে।

জর্জ। তাহলে আজ রাতেই আমি ঘোড়ায় চাপব। আমি যদি যুদ্ধ করতে পারি তাহলে ঘোড়ায় চাপতেও পারব।

গোয়েৎস। কী আজ রাতে! আজ বড় কঠিন অভিযান করতে হবে রাতে। ওয়েসলিঞ্জেনকে ধরতে হবে। গোপন আক্রমণে তোমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। ঘোড়ায় চাপা যদি শিখে থাক তাহলে তোমাকে ফ্রাঙ্কফুর্টের মেলায় যাবার জন্ম একটা ঘোড়া দেব। এখন বরং আমাকে মদ দাও। কি দেখছ দূরে তাকিয়ে ?

জর্জ। সন্ন্যাসীর মত একটা লোক আসছে পায়ে হেঁটে।

গোয়েৎস। সন্ন্যাসী, এত রাতে ? ঠিক আছে, আসতে দাও।

পথিকবেশী এক যুবক সন্ন্যাসীর প্রবেশ

নৈশ নমস্কার। ধর্মের লোক বলে হয়ত রাত পর্যন্ত জেগে আছ। কতদূর থেকে আসছ ?

সন্ন্যাসী। আমি তীর্থক্ষেত্র থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছি। রোমে গিয়েছিলাম

তীর্থ করতে।

গোয়েৎস। আমিও তাই ভেবেছিলাম। (জর্জ মদ এনে দিল) তুমিও মদ খাবে? (সন্ন্যাসী মাথা নাড়ল) এই মদ হারানো উদ্যম, উত্তাপ ফিরিয়ে দেয়। রক্তকে সতেজ করে তোলে। এ বিষয়ে সেণ্ট পলের কথা আশা করি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না। জর্জ, একটা কাপ নিয়ে এস।

সন্ন্যাসী। শুধু জল। সেণ্ট পল বলিষ্ঠদেহী পুরুষ ছিলেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁকে অগাষ্টাইনের অনুশাসন মেনে চলতে হত না। আমার কাছে শুচিতাই হলো বড় কথা।

গোয়েৎস। (জর্জকে) জল নিয়ে এস।

সন্ন্যাসী। বিলাস ব্যসন নয়, আমি আলস্যকেও প্রশ্রয় দিই না।

গোয়েৎস। আমি সারাদিন মদ্যপান করছি আজ, তবু আমাকে দেখে অলস মনে হচ্ছে?

সন্ন্যাসী। না মোটেই না। আপনি ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করছেন মদ খাচ্ছেন। দেখে মনে হচ্ছে একটা সত্যিকারের মানুষ। মনে হচ্ছে আপনার জীবনটাই যেন এক উত্তেজনাপূর্ণ সোনালি মদ। মদ আপনার জীবনকে নূতন করে সৃষ্টি করছে প্রতিমুহূর্তে। জীবন আর মদ এক হয়ে মিশে গেছে। (জর্জ জল এনে দিল সন্ন্যাসীকে)

গোয়েৎস। এক পাত্র মাত্র খাও। এতে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে না।

সন্ন্যাসী। ঠিক আছে, খুব অল্প।

গোয়েৎস। (জর্জকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে) ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাচ্ছ?

জর্জ। এখনো পাইনি।

গোয়েৎস। তাহলে দাসব্যাক রোডে গিয়ে মাটিতে কান পেতে শোন। তারা নিশ্চয় আসছে। (জর্জের প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। আমি গত রাতে সেণ্ট ভিয়েতে ছিলাম। সেখানে প্রিয়র আমার সঙ্গে খুব সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাকে তাঁর বাগানবাড়িতে নিয়ে গেলেন। কতরকমের শাকসব্জী ও তরিতরকারী।

গোয়েৎস। আমার মনে হয় তোমার বাগানের মালী হলে ভাল হত।

সন্ন্যাসী। সত্যিই ভাল হত। শামুকের মত বাইরের জগৎ হতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে থাকার মধ্যে কোন আশা নেই আনন্দ নেই। শুধু ব্যবসা, রাজ-
আর রাজকীয় কাজকর্ম। এই তীর্থযাত্রার অনুমতিলাভের জন্য আমাকে

অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

গোয়েৎস। চার্চের কাজকর্মের কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। রোম তোমার কেমন লাগল ?

সন্ন্যাসী। খুব ভাল লাগল। অসাধারণ এক শহর। আশ্চর্য হয়ে গেছি আমি। আধ্যাত্মিক কাজকর্ম আমি অবাধে অনেকদূর চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

গোয়েৎস। আর একপাত্র মদ পান করো। কি দেখছো ?

সন্ন্যাসী। আপনার বর্ম। সৈনিকের এই বেশ আমাকে মুগ্ধ করে তুলেছে।

গোয়েৎস। এটা তুমি পরতে চাও ?

সন্ন্যাসী। দারিদ্র্য, আন্তরিক শুচিতা আর আনুগত্য বর্মের মতই ভারী। অস্বাভাবিকভাবে ভারী এই জিনিসগুলো আজীবন বয়ে চলেছি আমি। আপনার স্ত্রী আছে ?

গোয়েৎস। অবশ্যই। বেশ সুন্দরী স্ত্রী।

সন্ন্যাসী। তাঁর স্বাস্থ্যপান করি। তিনি নিশ্চয় আপনার জীবনের মুকুটমণি।

গোয়েৎস। যাক সে কথা।

সন্ন্যাসী। জীবনে এই ধরনের সুখ থেকে বঞ্চিত থাকাটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। একথা বলছি বলে মনে ভাববেন না যে আমি এমনই এক দুর্বলচিত্ত যাজক যে তার ধর্মীয় পোষাকের অন্তরাল হতে কামনার কাঁটাগাছগুলো উপড়ে ফেলতে বা তাদের পুষ্পিত করে তুলতে পারে না। আমি আমার শপথ রক্ষা করে চলতে পারি। তবে আমি জানি আমি কি করছি।

জর্জ। (ছুটে এসে) স্যার, দুটো ঘোড়া ছুটে আসছে।

গোয়েৎস। জোহানকে ডাক। তাকে ঘোড়ায় চাপতে বল। আমার ঘোড়া আন। তাড়াতাড়ি করো। স্যার, আমাকে যেতে হবে।

সন্ন্যাসী। আপনার নাম বলুন।

গোয়েৎস। আমার নাম বলাও চলবে না। কিছু মনে করবেন না। এই আমার হাত।

সন্ন্যাসী। বাঁ হাত। আমি কি আপনার ডান হাত স্পর্শ করার যোগ্য নই।

গোয়েৎস। আপনি স্বয়ং সম্রাট হলেও কোন উপায় ছিল না। দেখছেন আমি এক হাতেই লোহার দস্তানা পরেছি।

সন্ন্যাসী। লৌহহস্ত গোয়েৎস। ল্যাণ্ডশাট যুদ্ধের পর আপনি একটা

হাত হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে আমার এক পরিচিত সন্ন্যাসী প্রায়ই যেত। তার কাছেই আপনার একথা শুনেছি। আপনি হাত হারাবার পর ভাল হয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। সব সময় দেওয়ালের পানে মুখ করে থাকতেন। তারপর একজন নাইট এসে যখন বলে সে একটা হাত নিয়ে এবং এক হাতে তরবারি চালিয়ে একটা যুগ যুদ্ধ করে আসছে তখন আপনি সাহস পান। ঈশ্বর আপনাকে যেন বারোটা হাতের শক্তি দান করেন। আমার নাম ব্রাদার মার্তিন, ধর্মতত্ত্বের ডক্টর ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

(গোয়েৎসের হাত চুম্বন করল)

দুজন সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈনিক। বার্লিসিঞ্জেন, আমরা তাকে পেয়েছি।

গোয়েৎস। আমরা তাকে পেতে পারি ?

২য় সৈনিক। আমরা তা পারি।

১ম। চারজন অশ্বারোহী নিয়ে সোয়াজে· থেকে বেরিয়ে পাঁচ মাইল যেতে হবে।

গোয়েৎস। জোহান, তৈরি হয়েছ ? ব্রাদার মার্তিন, ঘুমিয়ে পড়। (সৈনিক-গণসহ প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। ঈশ্বর আপনাকে সঙ্গ দান করুন। আমি এই সাক্ষাৎকার ভুলব না।

জর্জ। আপনি ঘুমোতে চান ?

সন্ন্যাসী। কোন বিছানা আছে ?

জর্জ। না, শুধু কিছু খড় আছে।

সন্ন্যাসী। ওঁরা রেখে গেছেন যাবার সময়। তোমার দরকার আছে ?

জর্জ। আমিও এই সময় লোক মারতে বেরিয়ে পড়ি। ওরা তা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার নাম কি ?

জর্জ। জর্জ।

সন্ন্যাসী। তাহলে সেন্ট জর্জের তুমি আশীর্বাদধন্য। (একটা ছবি বার করে জর্জকে দিল) এই দেখ তার ছবি আর এই তার ড্রাগন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চল। শয়তানকে পদদলিত করে এই সংসার-রূপ অরণ্যে ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চল। আমার শোবার জায়গা দেখিয়ে দাও। (জর্জ তাকে নিয়ে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যাম্বার্গ। বিশপের প্রাসাদের অন্তর্গত একটি প্রশস্ত কক্ষ

(বিশপ নৈশভোজে রত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফালদার, মঠাধ্যক্ষ, লাইট্রেট নামে জনৈক সভাসদ, ওলিয়ারাস নামে জনৈক আইনজ্ঞ ও কয়েকজন ভৃত্য।)

বিশপ। আচ্ছা বলুন ত ডক্টর ওলিয়ারাস, আপনাদের বেলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি জার্মান থেকে খুব বেশী ছাত্র পড়তে আসছে ?

ওলিয়ারাস। প্রচুর সংখ্যক লর্ড বিশপ। ব্যবসায়ী ও অভিজাত শ্রেণী থেকে। একদিক দিয়ে আশার কথা। একটা প্রবচন বাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে কথাটা। লোকে বলে, জার্মান সামন্তদের ছেলের মতই পড়াশুনায় তার গভীর অনুরাগ। এটা শুনতে সত্যিই ভাল লাগে।

লাইট্রেট। ভাল অবশ্য লাগে। তবে আপনি কি মনে করেন এ প্রবাদবাক্যের কথাটার কোন যাথার্থ্য আছে।

ওলিয়ারাস। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত স্যার। রাজপরিবারের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নবিশেষ। সম্রাট স্বয়ং তাদের অনেককে রাজকার্যের বহু উচ্চপদে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন। শুধু ডিগ্রীটা দেবার অপেক্ষা।

বিশপ। এ ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী। আমার প্রশাসনিক কাজে আমায় সাহায্য করার জন্য আমি কিছু আইনের ছাত্রকে ব্যাম্বার্গে নিযুক্ত করতে চাই। আমার যতদূর মনে হয় এই সব তরুণ ছাত্রেরা জার্মান আইনের থেকে রোমক আইন ব্যবসায়ে বেশী অভিজ্ঞ।

ওলিয়ারাস। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিশপ। কর্পাস জুরিস নামে একটা বই আছে। এই বইটা প্রাচ্যের কোন সম্রাটের লেখা বলে মনে হয়।

ওলিয়ারাস। তাঁর নাম জাস্টিনিয়ান।

বিশপ। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি হচ্ছেন বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আমি তাঁর স্বাস্থ্য পান করি।

ওলিয়ারাস। আমিও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

মঠাধ্যক্ষ। তিনি আর ইহজগতে নেই।

বিশপ। না, তাঁর মৃত্যু ঘটলেও যে বই তিনি রচনা করে গেছেন তার মৃত্যু নেই। তার আবেদন নষ্ট হতে পারে না।

ওলিয়ারাস। এই বইখানি সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আইনগ্রন্থ বলা যেতে পারে। এতে আইনের সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। এ বই পড়লে আর অন্য বইএর দরকার হয় না।

মঠাধ্যক্ষ। এতে বাইবেলের টেন কমাণ্ডমেণ্টস্ বা দশটি প্রধান ঐশ্বরিক উপদেশের কথা আছে?

ওলিয়ারাস। সে কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্নভাবে মিশিয়ে বলা আছে।

মঠাধ্যক্ষ। স্পষ্ট করেই তার উল্লেখ করা উচিত ছিল। সম্রাট তা এড়িয়ে গেছেন।

বিশপ। আমার মতে ডক্টর কর্পাস জুরিসে আছে আইনের নামে ব্যাপক অরাজকতা বন্ধের বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। যে সব প্রথাগত অর্থহীন অরাজকতা ও বিশৃংখলা আইনের নামে চলে আসছে সমাজের সর্বস্তরে, তা কি করে বন্ধ করতে হয় তার পথ দেখানো হয়েছে। এতে সর্বস্তরে সুশাসন সম্ভব।

ওলিয়ারাস। আপনি ঠিক বলেছেন। জার্মান দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন সত্যিই ভয়ঙ্কর।

বিশপ। প্রত্যেক গ্রাম বা নগরের একটা করে বাজে ঐতিহ্য আছে। কোন একটা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে থেকে যাকে তাকে আক্রমণ করবে আর নিজেকে স্বাধীন বীর নাইট বলে প্রচার করে বেড়াবে। সে সারা রাজ্যের মধ্যে কারো কাছে মাথা নত করবে না।

লাইবেট্রট। বার্লিসিঞ্জেনের কথা মনে পড়ছে।

বিশপ। অবশ্য ওয়েসলিঞ্জেন ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আরো সব আছে ত। সেই যে কাঠের পাওয়ালা লোকটা যার নাম সেলবিৎস। তার পর আছে ফ্রাঁৎস ভন সিকিঞ্জেন। লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক। আরো কত নাম—আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। কিন্তু এই সব উচ্ছৃংখল প্রকৃতির বীরপুরুষেরা দেশের প্রচলিত অবাস্তর অর্থহীন আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। বিচারকরা এদের স্বপক্ষেই রায় দান করেন। তাই বলি দেশের আইন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। য্যাথার্গে আমি তার জন্য কিছুটা কাজ শুরু করেছি। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সফল হব।

ওলিয়ারাস। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা সফল হবো।

লাইবেট্রট। তবে আমাদের সাবধানে চলতে হবে।

ওলিয়ারাস। আমি আপনাদের সঙ্গে কিন্তু পুরোপুরিভাবে থাকতে পারব না।

লাইবেট্রট। যদি একদল আইনজ্ঞকে তাড়িয়ে আর একদলকে নিয়োগ করা হয় তাহলে তার মাঝখানে কি ঘটে?

ওলিয়ারাস। পরিবর্তন তো হবেই।

লাইবেট্রট। হ্যাঁ পরিবর্তন। আপনি নিশ্চয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে এসেছেন?

ওলিয়ারাস। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি হ্যাঁ তাই।

বিশপ। এতে দুঃখের কি আছে ডক্টর?

ওলিয়ারাস। আমার এই আইনগত পেশার জন্য সেখানে আমায় অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে বিশপ। সম্প্রতি আমি বাড়ি এসেছিলাম আমার পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু আমি আইন ব্যবসায়ী বলে লোকে আমার উপর ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

মঠাধ্যক্ষ। ঈশ্বর রক্ষা করুন। কিন্তু কেন?

ওলিয়ারাস। ফ্রাঙ্কফুর্টে আছে প্রাচীন জনতার আইন। আমরা যারা যুক্তিবাদী তাদের ওরা যুগযুগান্তব্যাপী নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী রূপে দেখে। বর্তমানে সে কাজে অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা গঠিত ট্রাইবুনালে তাদের সে স্বাধীনতা ভালভাবেই রক্ষিত হয়।

লাইবেট্রট। ঠিক তাই। রোমের আইনজ্ঞদের কেউ মানে না। দেশে আইন নেই বললেই চলে। তবে শুধু জনগণের অরাজকতা নয়, আইনের নামেও অবিচার ও অরাজকতা চলছে নির্বিচারে। গভীর রাতে ট্রাইবুনাল বসিয়ে বিচারের নামে প্রহসন হয়। অযোগ্য পুলিশ এবং অপদার্থ বিচারকরা লঘুপাপে সকলকে গুরুদণ্ড দেয়, কত লোককে অন্ধকার কারাগার কক্ষে আবদ্ধ করে রাখে।

ওলিয়ারাস। এমন কিছু ত শুনিনি।

বিশপ। আমি শুনেছি, এটা এমন কিছু নয়। গ্রাম্য লোকের কিছু ঝগড়া বিবাদ, এমন কথা বলে আমার ভোজসভার লোকদের ভয় দেখিও না লাইবেট্রট, অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করো।

লাইবেট্রট। মাপ করবেন ডক্টর। ফ্রাঙ্কফুর্টকে শহর হিসাবে আপনার খারাপ লাগলেও আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। কয়েক বছর আগে সেখানে সম্রাটের অভিষেক উৎসব দেখেছিলাম আমি। কোন অপ্রীতিকর কিছু দেখিনি।

ওলিয়ারাস। আমার বাবা তেলের কারবার করতেন বলে লোকে ঠাট্টা করে

তাঁর ডাক নাম রেখেছিল ওয়েলম্যানস। আমার খুব খারাপ লেগেছিল।

লাইবেট্রট। আপনার নাম আর আপনার অক্ষরটা যদি আর একটু ভাল শুনতে হত তাহলে হয়ত আপনার উপর ফ্রাঙ্কফুর্টের লোকেদের ধারণা আরো ভাল হত।

ওলিয়ারাস। আমার মনে হয় সৌজন্যের সীমা ছাড়িয়ে আপনি যেন আমাকে আঘাত দেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

বিশপ। শান্ত হোন ডক্টর। অপরাধ নেবেন না। লাইবেট্রট, সৌজন্যের পরিচয় দাও।

লাইবেট্রট। আমি আগের মত আপনার বশীভূত আছি লর্ড।

ওলিয়ারাস। আচ্ছা তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোন পরিকল্পনার কথা আপনি জানেন কি লর্ড বিশপ?

বিশপ। সম্রাটের ইচ্ছা এই যে একাজে অচিরে হাত দেওয়া হোক। নাস্তিক বিধর্মী শত্রুদের কবল থেকে তাঁর রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন। এর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই প্রায় ঠিকঠাক। কিন্তু সোয়ানিয়া ও ফ্রাঙ্কোনিয়ার কয়েকজন স্বাধীকারপ্রমত্ত নাইট যেভাবে স্বাধীনতার নামে অরাজকতা ও ধ্বংসকার্য চালিয়ে যাচ্ছে তা বন্ধ না করে সম্রাট এ অভিযানে নামতে পারছেন না। বিশেষ করে ঘৃণ্য গোয়েৎস ত এখন জয়লাভ করতে চলেছে।

মঠাধ্যক্ষ। তার জয়লাভ মানেই ত আপনাদের সকলকে শূয়োরের মত ধরে নিয়ে যাবে। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

বিশপ। ওয়েসলিঞ্জেনের উপর আমার কিন্তু প্রচুর বিশ্বাস আছে। (জয়ঢাকের শব্দ। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ) কি ব্যাপার? কে আবার এল?

ভৃত্য। ওয়েসলিঞ্জেনের দ্বারা প্রেরিত একজন তার মালিক। প্রায় উঠোনে চলে এসেছে।

বিশপ। তাকে এখানে নিয়ে এস বালক। কই কোথায় সেই অশ্বারোহী?

নাইট। যে আজ্ঞে।

বিশপ। সেকি?

লাইবেট্রট। একমাত্র সে-ই কোনরকমে ফিরে আসতে পেরেছে। লৌহহস্ত গোয়েৎসের গোপন আক্রমণে আর সবাই ধরাশায়ী। ওয়েসলিঞ্জেন নিজে বন্দী হয়েছেন।

বিশপ। পবিত্র সন্ট পিটারের কৃপায় যেন তা না নয়

নাইবেট্রট। সত্যিই কি দুঃখের কথা।

বিশপ। লোকটি কথা বলতে পারছে? আমি যাব

নাইট। কিছু কিছু বলতে পারছে।

বিশপ। খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। ওকে আমার পড়ার ঘরে নিয়ে এস।

(ভৃত্য সহ প্রস্থান)

মঠাধ্যক্ষ। আর একটু মদ্যপান হলে ভাল হত।

ওলিয়ারাস। আমার মনে হয়, আপনি খাবার পর বাগানে একটু বেরিয়ে আস্থন। (ওরা সবাই ভোজনপর্ব সেরে বাইরে গেল। মঠাধ্যক্ষ ওলিয়ারাসের কাঁধে ভর করে বেরিয়ে গেল।)

চতুর্থ দৃশ্য

জ্যাক্সথসেন। গোয়েৎসের প্রাসাদ।

(গোয়েৎস তার ঘরে প্রবেশ করে টেবিলের উপর শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রাখল।)

গোয়েৎস। পিটার, এবার ওকে এখানে নিয়ে এস। (দুজন সৈনিক বন্দী অবস্থায় ওয়েসলিঞ্জেনকে নিয়ে প্রবেশ করল) স্বাগত আলবার্ট ভন ওয়েসলিঞ্জেন। আমার প্রাসাদে আপনার শুভাগমন হোক। অনেক দিন আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়। চলুন আমরা হল ঘরে যাই। আমাদের আগমনবার্তা আমার স্ত্রী জানে নিশ্চয়।

১ম সৈনিক। জোহান ছুটে বলতে গেছে।

গোয়েৎস। ঠিক আছে। ও তাই করে। ওকে না বললেও আমার স্ত্রী আমাদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়েই রাঁধুনি, চাকর, ম্যানেজার সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে শুরু করে দিয়েছে এরই মধ্যে। কিন্তু আলবার্ট, আপনি কিন্তু আমায় পাঁচদিন ধরে বনে জঙ্গলে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঘুরিয়ে মেরেছেন। (সৈনিকদের) ওঁর বর্ম খুলে দাও। ওঁর লোকদের কাছে গিয়ে দেখ ওঁর পোষাক সঙ্গে আছে কিনা। কোন জিনিস খোয়া গেলে তার ক্ষতিপূরণ দেব আমরা।

(সৈনিকদের প্রস্থান)

ওয়েসলিঞ্জেন। এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

গোয়েৎস। গুরুত্বপূর্ণই বটে। আমরা তোমার কোন জিনিসপত্র বা ধনরত্ন চাই না, চাই শুধু তোমাকে। তোমাকে একটা চমৎকার টিউনিক উপহার দেব। আট বছর আগে আমি এটা পেয়েছিলাম কাউন্ট প্যালেষ্টাইনের

বিয়েতে পরার জন্য। যাও নিয়ে এস পিটার। (জনৈক সৈনিকের প্রস্থান) সেই সময় তোমার বিশপ যে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। দুই সপ্তা আগে এই বিশপেরই দুটো জাহাজ নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছি। একটা জাহাজ ভর্তি ছিল শুধু সোনার জরির কাজ করা কাপড়। সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিল খৃস্টের একটা মূর্তি। তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আশীর্বাদ করছেন যেন। মনে হচ্ছিল খৃস্ট নিজেই কন্যার পিতা হিসাবে সম্প্রদান করছেন। বিশপকে আমি করমর্দনের জন্য আমার বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিই। তিনি অবাক হয়ে পিছিয়ে যান। তিনি তখন আমার পরিচয় জানতে চান। আমি আমার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিই। উনি তখন রেগে গিয়ে উপরে গিয়ে বরের কাছে অভিযোগ করেন। আমি বলি আমার এই লৌহহস্তের শক্তির পরিচয় একদিন তিনি সরাসরি পাবেন। আমি তাঁকে গত মাসেই তুলে নিয়ে যেতে পারতাম।

ওয়েস। আপনার এই সব দম্ভোক্তি শুনে আমার কি ফল হবে বুঝছি না।

গোয়েৎস। ব্যাপারটাকে সহজ করে তোলার জন্যই আমি এইসব বলছি। আপনি যে আবার বন্দী একথা যেন মনে না করেন। মনে ভাববেন আপনি আমার অতিথি।

ওয়েস। আপনি একজন বীর নাইটের মতই ব্যবহার করছেন। আশা করি, আপনি এই আচরণের প্রথাটিকে অস্বীকার বা অবমাননা করবেন না। তবে আমি একটু নিরিবিলি হতে চাই।

গোয়েৎস। তবে আপনার বিশপ আমাকে তাঁর প্রাসাদে এইভাবে পেলে কিরূপ আচরণ করতেন সেটাও একবার ভেবে দেখবেন।

(জনৈক সৈনিক গোয়েৎসের সাত বছরের ছেলে কার্লকে সঙ্গে করে ওয়েসলিঙ্গেনের জন্য একটা টিউনিক এনে তাকে পরিয়ে দিল)

কার্ল। সুপ্রভাত পিতা।

গোয়েৎস। সুপ্রভাত। আমার অনুপস্থিতিকালে তুমি নিশ্চয় ভাল ব্যবহার করেছ সকলের সঙ্গে।

কার্ল। আমার পিসি বলেছে আমি খুব ভাল ছেলে।

গোয়েৎস। আর তোমার মা কি বলেন?

কার্ল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিনি একথা।

গোয়েৎস। আশা করি তাঁর কথাও একথাকে সমর্থন করবে। আচ্ছা ওয়েসলিঙ্গেন, আমার ছেলে কার্লকে দেখতে আমার মত ত?

ওয়েস। কিছুটা, বেশী নয়।

কার্ল। আমার পিসি আমায় পড়াচ্ছিল বাবা।

গোয়েৎস। কি শিখেছ ?

কার্ল। আমি পড়েছি জাক্স নদীর তীরে অবস্থিত জাক্সথসেন একটি গ্রাম ও দুর্গের নাম। এটি হলো বার্লিশিঞ্জেনের লর্ডদের দীর্ঘ ছশো বছরের সম্পত্তি।

গোয়েৎস। বার্লিশিঞ্জেনের লর্ডরা কারা ?

কার্ল। তা ত জানি না।

গোয়েৎস। তুমি হয়তো তাদের দেখনি।...হায়, এত বই পড়লে, এত শিখলে কিন্তু সে নিজের পিতা বা পৈত্রিক বংশের পরিচয় জানে না। আমরা তার মত বয়সে বংশপরিচয় থেকে শুরু করে গ্রাম, জেলা, রাস্তাঘাট সব জেনে ফেলি। তোমার মা কোথায় কার্ল ?

কার্ল। তিনি রান্নাঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। অনেক ভেড়ার মাংস ও সাদা পাখির মাংস সেঁকা হয়েছে।

গোয়েৎস। খাদ্যতালিকায় কি কি আছে তা ও সব জানে। এবার তোমাকে রান্নার কাজ শেখাব।

কার্ল। আমি আপেল সিদ্ধ খেতে যাচ্ছি।

গোয়েৎস। সাধারণের থেকে পৃথক এক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ও। কেন, তুমি কাঁচা অপেল খাও না ?

কার্ল। সিদ্ধ আপেল খেতে খুব ভাল। আমার পিসি আমার জন্য সিদ্ধ করছে।

গোয়েৎস। তুমি যাও। আমরাও খেতে যাচ্ছি। লর্ড ওয়েসলিঞ্জেনকে সম্ভাষণ জানিয়ে যাও।

কার্ল। হ্যাঁ যাব। আমাদের প্রাসাদে আপনাকে স্বাগত জানাই স্যার। আশা করি, আপনি তৃপ্তিলাভ করবেন ভোজনে।

ওয়েস। (কার্লকে চুম্বন করে) ধন্যবাদ বালক। (কার্লের প্রস্থান) চমৎকার ছেলে। বেশ সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান। এই পশুহত্যা অভিযানে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।

গোয়েৎস। ভোটে হেরে যাওয়া পৌরপিতার মত তুমি এখনো বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছ আলবার্ট মনে মনে।

(এক পুঁটলি কাপড়চোপড় ও পোষাক পরিচ্ছদসহ সৈনিকের প্রবেশ)

ওর নতুন পোষাক এনেছ ? এবার তোমাকে ভাল মানাবে নাও মদ খাও এর আগে আমি এক সন্ন্যাসীকে মদের সঞ্জীবনী ক্ষমতা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলাম আমার মনে হয় সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে তোমার।

(ওয়েসলিঙেন মদপান করার পর গোয়েৎস খালি বোতলগুলো সৈনিকদের দিয়ে দিল) অনেকদিন আগে তোমার সঙ্গে বসে মদ খেয়েছিলাম। তুমি রাজাদের কাছে আত্মবিক্রয় করতে গেলে ?

ওয়েস। আমি কারো কাছে নিজেকে বিক্রি করিনি। আর এই সব ভাবাবেগ-পূর্ণ স্মৃতিচারণের কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। সে যুগ আর নেই।

গোয়েৎস। আমি তা মনে করি না। আমরা যখন মার্গ্রেভের কোর্টে সামান্য চাকরি করতাম তখনকার কথা তোমার মনে আছে ? লোকে আমাদের দেখে বলত ক্যাস্টর ও পোলাক্স।

ওয়েস। ওয়ের্জারবার্গের বিশপ আমাদের এই নামে ডাকত।

গোয়েৎস। তিনি খুব ভাল বিশপ। তখন আমাদের ভাল বন্ধুত্ব ছিল তাঁর সঙ্গে। একদিন পোলকের সঙ্গে একটা বিষয়ে আমার ঝগড়া হয়। সেকথা তোমার মনে আছে ?

ওয়েস। হ্যাঁ, মনে আছে। সে একটা ছুরি নিয়ে তোমায় তাড়া করেছিল।

গোয়েৎস। আর তোমাকেও তখন আমার জন্য কার এক বন্ধুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। অনাবিল বন্ধুত্ব আর ভ্রাতৃত্বে ভরা সেই দিনগুলো আবার জীবনে ফিরে পেতে চাও না আদেলবার্ত ? ভান করে এড়িয়ে যেও না। আমি তোমাকে চিনি।

ওয়েস। তার একটা আকর্ষণ আমিও অনুভব করি। কোন দায়িত্ব নেই, বশ্যতা নেই। স্বাধীনভাবে তোমার প্রাসাদে বাস করা।

গোয়েৎস। আমি হচ্ছি সম্রাটের লোক। একমাত্র সম্রাট ছাড়া আর কারো বশ্যতা স্বীকার করি না আমি।

ওয়েস। তিনি অনেক দূরে বাস করেন।

গোয়েৎস। তুমি বড় নিরাশবাদী আদেলবার্ত। সেদিন যদি আমার কথা শুনতে এবং আমার সঙ্গে ব্রাবাৎ অভিযানে যোগদান করতে তাহলে আজ তোমার এ দশা হত না। ছেলেবেলা থেকে রাজদরবার আর রাজা রাজরাদের প্রতি তোমার একটা ঝোঁক ছিল। প্রাসাদের পিছন দিকে বসে

বাঁদরের কিচির মিচির বা পরচর্চা করা। যে প্রাসাদে শুধু ব্যভিচারিণী অসতী স্ত্রী নেই, আছে স্বাধিকারপ্রমত্তা সেই সব অবিবাহিত কন্যাদের ভিড় যারা অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের পিতাদের অবমাননা করে চলে। আমার বিশ্বাস সেই অশুভ স্থানে থেকে তুমিও দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে গেছ।

ওয়েস। হইনি, তোমার কথামত চললে তা হত।

গোয়েৎস। আমি তোমাকে আসল কথাটা বলতে চাই। তোমার মত লোকের কাছে ব্যাম্বার্গের বিশপ ও তার লোকজনদের কি মূল্য থাকতে পারে? তুমি একজন স্বাধীন নাইট, সেইভাবেই তোমার চলা উচিত। এদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার বন্ধু। যেমন ধর, সেলবিৎস, সিকিঞ্জেন, হাটেলস্ এরা যারা সাম্রাজ্যের মধ্যে খুব নামকরা লোক। ঐ সব প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বার্থপর পুরোহিতদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ওয়েস। আমারও কিছু বলার আছে গোয়েৎস।

গোয়েৎস। কি করে ব্যাখ্যা করবে তুমি? বস্তুর গুণ স্বপ্রকাশ। তাকে ঢেকে রাখা যায় না।

ওয়েস। ঈশ্বরের নামে বলছি বিশপ একজন ভৌম অধিপতি। তার আধ্যাত্মিকতার কথা বলো না। আমার মনে হয় তা তাঁর নেই। ভৌম অধিপতিরূপে পার্থিব বস্তুর প্রতিই তিনি আগ্রহী। তিনি চান তাঁর ভূখণ্ডে শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাক, ব্যবসা বাণিজ্যের গতিবিধি অবাধ হোক। এর জন্য তাঁকে সর্বত্র সুবিচারের ব্যবস্থা করতে হয়। সমান কর ধার্য করতে হয়। অরাজকতা দূর করতে হয়। তোমাদের মত স্বাধীন নাইটরা যে সব নিরীহ চাষীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে অশ্বক্ষুরাঘাতে দলিত ও নিষ্পেষিত করে যায় ঈশ্বর যেন তাদের রক্ষা করেন।

গোয়েৎস। আমি তো কোন চাষীর শস্যক্ষেত্র দলিত করি না বা ক্ষেতখামার জ্বালিয়ে দিই না। আমি সেই অত্যাচারী শহরে ব্যবসায়ীদের বন্দী ও লুণ্ঠন করি যারা গ্রামের গরীব চাষীদের শোষণ করে বিভিন্নভাবে। তার প্রমাণ—এই ধরনের একজন লোক ব্যাম্বার্গে বন্দী হয়েছে।

২য় সৈনিক। হ্যাঁ স্যার।

গোয়েৎস। কে তাকে ধরিয়ে দেয়? ধরিয়ে দেয় ন্যুরেমবার্গের নাগরিকরা। সে কেন সেখানে গিয়েছিল?

ওয়েস। নিশ্চয় কোন সঙ্গত কারণ ছিল।

গোয়েৎস। বিশপের সঙ্গে আমার সমস্ত ঝগড়া যখন আপোষ মীমাংসায় মিটে

যায় তখন তার সেখানে যাওয়ার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? আমি বিচারের রায় মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার একজন যুবককে ধরে নিয়ে যায়।

ওয়েস। আমার মনে হয় বিশপ তা জানে না। এটা তাঁর কোন উদ্ধত কর্মচারির কাজ।

গোয়েৎস। তাহলে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?

ওয়েস। আমি শুনেছি বন্দী অবস্থায় তার আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হয়নি।

গোয়েৎস। সে নিশ্চয় নির্বিবাদে তাদের প্রভুত্ব মেনে না নিয়ে সাহসের পরিচয় দিয়েছে। তাই তার আচরণ ভাল লাগেনি তাদের। আমি তার জন্য গর্বিত।

ওয়েস। তা না হয় হলো। কিন্তু বন্ধু, সম্রাটের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ? তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা তোমার অবশ্যই কর্তব্য। তিনি চাইছেন অর্থ সংগ্রহ করে তুর্কীদের বিতাড়িত করবেন দেশ থেকে। কিন্তু যতবার তিনি এ কাজ করতে যাচ্ছেন ততবারই কি হচ্ছে জান? তাঁর রাজ্যে স্বাধীন অভিজাত জার্মানরা জার্মানদের রক্তপাত করছে। এর কি কারণ থাকতে পারে বলতে পার? তুমি শুধু বলবে, রাজসভায় অনবরত বলবে ষড়যন্ত্র আর ব্যভিচার। আমার মতে অবস্থাটা একটু ভেবে দেখা দরকার তোমার পক্ষে।

গোয়েৎস। আমার অবস্থা! তোমার অবস্থাটা কি?

ওয়েস। আমি তা ভেবে দেখেছি। তবে এখন আমি তোমার হাতে বন্দী।

গোয়েৎস। তুমি যে সম্রাটের সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে অনেক কিছু বললে তাঁর বিরুদ্ধে লোকনিন্দার অন্ত নেই। আর তিনি প্রায় সব সময়ই যুদ্ধের জিগির তুলে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দিতে চান। এইভাবে তিনি তার ম্লান হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তিটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে চান। আমি তাঁকে ভালবাসার থেকে করুণা করি বেশী। আর আমি জানি তুমিও তাঁকে বিভ্রান্ত করছ।

এলিজাবেথের প্রবেশ

হে আমার প্রিয়তমা পত্নী, আমরা ফিরে এসেছি।

এলিজাবেথ। আমি তোমার ভেরীর শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাংস কাটিয়ে রান্না করে আহারের ব্যবস্থা করলাম। আর তুমি এই গার্ড হাউসে বসে মদ খাচ্ছ? (মদের বোতল নিয়ে মদপান করল)

গোয়েৎস। তুমি দেখছ প্রিয়তমা, আমরা একটা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

আচ্ছা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ?

এলি। না, উনি লর্ড ওয়েসলিঙেন না ? তাঁরই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমরা তাঁর কাছে অনেক ঋণী।

ওয়েস। ক্ষমা করবেন ভদ্রমহাশয়া। ঈশ্বর জানেন আপনার বা আপনার পরিবারের সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই। আমরা একই সমাজের লোক এবং একই বীরত্বের উপাসক।

গোয়েৎস। উনি আমার বন্ধু এবং অতিথি। ওকে আলিঙ্গন করো এলিজাবেথ। আমাদের আলাপ আলোচনা সফল হলেই আমরা ওকে সসম্মানে পাঠিয়ে দেব বিশপের কাছে এবং আমাদের যুবকও তখন ফিরে আসবে ব্যাম্বার্গ থেকে। এটা উভয় পক্ষেই মঙ্গলজনক হবে।

এলি। (ওয়েসলিঙেনকে আলিঙ্গন করে) ওর আচরণ ভয়াবহ। বিশপের পাপ ওঁর দেহের গঠনের উপরে কোন বিকৃত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

ওয়েস। আমার পাও ভাল মাদাম। আমার বুট জুতোগুলো খারাপ তাই, নাহলে দেখিয়ে দিতাম কত ভাল নাচতে পারি।

গোয়েৎস। তোমাকে ভাল চটি দেওয়া হবে। তারপর দেখিও তোমার নাচ। এখন হলঘরে চল। সেখানে আমার বোন মেরিয়া ও বাড়ির অন্যান্য লোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এখন তুমি বেশ কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করতে পার। ভাববে জগৎটা কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে অতীতে ফিরে গেছে।

পঞ্চম দৃশ্য

জ্যাক্সথসেন। সন্ধ্যাকাল। গোয়েৎসের প্রাসাদের একটি কক্ষ।

(মেরিয়া সেলাই করছিল এবং কার্ল খেলা করছিল)

কার্ল। আচ্ছা পিসি, লর্ড ওয়েসলিঙেন এখানে বাবার কাছে আর কতদিন থাকবে ? এক সপ্তা ত হয়েই গেল।

মেরিয়া। আমি তা ঠিক জানি না বাছা। তবে উনি বন্দী। উনি এবার থেকে ভাল হয়ে চলবেন এবং ঝগড়া ঝাঁটি করবেন না এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলেই ওঁকে ছেড়ে দেবে তোমার বাবা।

কার্ল। লর্ড কি চলে যেতে চাইছেন না ?

মেরিয়া। আমার মনে হয় চাইছে। সব বন্দীরাই চলে যেতে চায়। আমার মনে হয় শীঘ্রই উনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যাবেন।

কার্ল। বাবা যেমন ভয় দেখিয়ে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে টাকা নেয় তেমনি ওকেও ত ভয় দেখাতে পারে।

মেরিয়া। না, তোমার বাবা তা করতে পারে না।

কার্ল। তুমি সেই গল্পটা বল ত। সেই একটা ছেলে যার অসুখ করায় সে শহরে গিয়েছিল খাবার কিনতে। কিন্তু খাবারের পয়সা একটা বৃদ্ধ ভিখারিকে দিয়ে দেয়। তখন ভিখারীটা হঠাৎ দেবতায় পরিণত হয়ে তাকে বর দেয় তার যে ডান হাত দিয়ে তাকে পয়সা দিয়েছে, তাকে স্পর্শ করেছে সেই ডান হাত দিয়ে কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে ছুঁলেই তার রোগ সেরে যাবে। সে বাড়ি গিয়ে তার রুগ্ন মাকে ছুঁতেই তার রোগ সেরে যায়। এরপর এইভাবে একে একে সে সম্রাট, রোমের পোপ ও অনেক লোকের রোগ সারায়। অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়ে তাতে অনেক গীর্জা ও মঠ বানায়।

এলিজাবেথের প্রবেশ

মেরিয়া। তুমিও ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এমনি করে গীর্জা ও মঠ বানাবে।

এলি। গোয়েৎস নুরেমবার্গ গেছে।

মেরিয়া। কি কারণে?

এলি। সেখানে ব্যবসাদারদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য। ছদ্মবেশে সে এই কাজ করবে। অথচ তার কাটা হাতটার কথা সবাই জানে। আমার মনে হয় লোকটা পাগল।

মেরিয়া। নুরেমবার্গের লোকেরা তাকে ঘৃণা করে। ধরতে পারলে—

এলি। সেটা সবাই জানে মেরিয়া। এইভাবে আমরা বেঁচে আছি। শুনে রাখ কার্ল, তোমার বাবা এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের জন্য ভোজের টেবিলে এই সব ভাল ভাল খাবার জোগাড় করে। আবার এই সব বিপদের মধ্য দিয়েই কোন অন্যায় অবিচার দেখলেও তার প্রতিকার করে। তবে এই সব টাকায় যদি কিছু গীর্জা নির্মাণ করত তাহলে ভাল হত।

মেরিয়া। ও যদি এত সব বিপদের ঝুঁকি না নিত তাহলে খুশি হতাম আমি।

এলি। বিপদের অবশ্য দরকার আছে। আমি কার্লকে বোঝাতে চাই তার বাবা কত বড় বীর। আর সেই বীরত্ব থেকে ও সাহস পাবে। ওর চরিত্রকে গড়ে তুলতে পারবে।

মেরিয়া। ওয়েললিঙেন কোথায় আজকের এই সন্ধ্যায়?

এলি। উঠোনে গোয়ালিনীকে গান শোনাচ্ছে। কার্ল, যাও বিছানায় গিয়ে

শুয়ে পড়। তোমার পিসির কাছে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নাও।

(কার্লের প্রস্থান)

এলি। ওয়েসলিঙ্গেনকে যদি এভাবে অবাধে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের প্রাসাদে ভাল মেয়ে আর একটাও থাকবে না। আমি তাকে বলে দিলাম, আমার সাংসারিক কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে দিতে পারি না তোমায়। সে তখন কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। (বীণা হাতে ওয়েসলিঙ্গেনের প্রবেশ) ঐ এসে গেছেন।

ওয়েস। আপনার স্বামীর লুট করা কিছু পোষাকে তার বন্ধুর যদি উপকার হয় আপনি অবশ্যই তা দেবেন। হে আমার প্রিয়তমা মেরিয়া তুমি সেদিন যে গানটা শুনতে চেয়েছিলে আমি সেটা অভ্যাস করছি। তুমি কি সেটা এখন শুনবে না?

এলি। হ্যাঁ, উপযুক্ত শ্রোতার কাছেই রিহার্সাল দিতে হয়।

ওয়েস। আপনার প্রাসাদের মধ্যে যদি এমন একটা জায়গা আমাকে দেন যেখানে গান গাইলে কেউ শুনতে পাবে না তাহলে খুব ভাল হয়। তাহলে গানটা গাই?

এলি। ঠিক আছে গান। গোয়েৎস এলে বলবেন আমি পশুশালায় আছি।

ওয়েস। স্বামীর দ্বারা উৎপীড়িত এক অসহায় মহিলা। (এলিজাবেথের প্রস্থান) এই গানটা কোন এক নাইটের প্রেতাত্মার দ্বারা গীত হয়। তুরস্ক যুদ্ধে নিহত এই নাইটের প্রেতাত্মা মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ ফিরে এসে তার প্রেমিকার জানালার ধারে এই গান গাইতে থাকে। (গান)

পথ চলতে হবে তোমায় হাজার বছর ধরে
কত পাহাড় বন পার হয়ে মাঝ সমুদ্র পরে।
এই পথেতে ফেলতে হবে অনেক চোখের জল
বর্ষাবাদল ঝরবে মাথায় কতই অবিরল।
মেঘ কাটলে যখন আমায় ডাকবে অনুরাগে।
আমার হাড় কঙ্কাল কবর থেকে উঠবে তখন জেগে।

মেরিয়া। পথের এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সে তাহলে ভালবেসেছিল।

ওয়েস। মেয়েটি ভালবেসেছিল কি না তা গানে জানা যায়নি। তবে ছেলেটির বিশ্বাস তার প্রেমিকার প্রেম হবে মৃত্যুঞ্জয়ী আর সেই প্রেম তাকে অমরত্ব দান করবে।

মেরিয়া। আমি তা বিশ্বাস করি। আমি তোমাকে সুখী করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে রাজী আছি। যে কোন পথের যে কোন বাধা ভাঙতে রাজী আছি। (তারা চুম্বন করল পরস্পরকে)

ওয়েস। মেরিয়া, আজ হতে আমি সম্পূর্ণ তোমার।

মেরিয়া। (ওয়েসলিঞ্জেন পুনরায় চুম্বন করতে চাইলে) আমি তোমাকে আপাততঃ একটি চুম্বন দান করেছি প্রেমের শপথ হিসাবে। আবার পরে হবে।

ওয়েস। তুমি খুব কঠোরতার সঙ্গে মানুষ হলেও আমাদের এই প্রেমের মধ্যে কোন ধ্বংসাত্মক ব্যাপার নেই যাকে ভয় করতে হবে। এ প্রেমের মাধুর্যে স্বয়ং ঈশ্বরও মুগ্ধ হয়ে উঠবেন।

মেরিয়া। ঈশ্বরের কথা আমি শুনতে পারি না। তবে আমাকে প্রেমের চুম্বন, স্পর্শ, কম্পন প্রভৃতির বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। স্যামসনের পতন সম্পর্কে একটা গান আমাকে শেখানো হত।

ওয়েস। ও গান কে তোমায় শিখিয়েছিল ?

মেরিয়া। কনভেণ্টে। আমার বয়স সতের বছর পূর্ণ হলে দাদা আমাকে এখানে নিয়ে আসে। ভালবাসায় বিপদ দুঃখ থাকবেই। তাকে ভয় করলে চলবে না।

ওয়েস। কিন্তু আমি এখান থেকে চলে গেলে কি হবে ? তোমার দাদার এক সৈনিক মুক্ত হলেই আমিও মুক্ত হব এখান থেকে। ব্যাম্বার্গের বিশপ অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

মেরিয়া। তাকে তুমি খুবই ভালবাস ?

ওয়েস। আমি ত তাঁরই লোক।

মেরিয়া। তবে যে বলছিলে তুমি আমার।

ওয়েস। হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু অন্য অর্থে। দুই দিকে দুটি অর্থ। একদিকে রাজনীতি আর একদিকে ব্যক্তিত্ব। আসলে কিন্তু দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মেরিয়া। তুমি আমার হলে আমার দাদার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠবে। তোমাকে বন্দী করে আনতে যাবার আগে সে বলেছিল সে আমারই সুখের জন্য তোমাকে বন্দী করতে যাচ্ছে।

ওয়েস। সে সত্যিই একথা বলেছিল ? তাহলে দুটো দিকের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না। আমি এখান থেকেই বার্লিশিঞ্জেন ও রাজাদের মধ্যে

স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

মেরিয়া। তা যদি সম্ভব হত কত ভাল হত প্রিয়তম।

গোয়েৎস-এর ছদ্মবেশী অবস্থায় প্রবেশ

আদেলবার্ত। কি বলছ? তুমি এখানে? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? মেরিয়া আমি ফিরে এসেছি। ভালই আছি। ব্যাম্বার্গ থেকে একজন অশ্বারোহী এইমাত্র খবর নিয়ে এল বিশপ আমার লোককে ছাড়েনি। তবে রাজার কমিশনের উপর গোটা ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে সে। রাজার সুবিচারের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ইতিমধ্যে তুমি বাড়ি যেতে পার। তবে তোমায় একটা শপথ করতে হবে: তুমি আমার বিরুদ্ধে কখনো অস্ত্র ধারণ করবে না।

ওয়েস। সে শপথ আমি করব গোয়েৎস। আমার একটা হাত তোমাকে দিচ্ছি আর একটা হাত তোমার বোনকে দিচ্ছি। একটা হাত দিচ্ছি আমার চিরদিনের বন্ধুকে আর এক হাত দিচ্ছি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে। এ বিষয়ে তোমার মত কি?

গোয়েৎস। স্যার, আমি অভিভূত। মেরিয়া, এটা তোমার মনঃপূত হয়েছে ত?

মেরিয়া। হ্যাঁ, এতে আমার মত আছে।

গোয়েৎস। আজ থেকে লৌহহস্ত নাইট বার্লিশিঞ্জেনের বন্ধু ও ভ্রাতা হলে তুমি। আমাদের হাত শক্ত হলো। আমি জানতাম এ ঘটনা ঘটবে। গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমি তোমাকে আমার লোহার হাতটা বাড়িয়ে দিতে তুমি সেটা করমর্দন করতে গিয়ে ভেঙে দাও। এখন তার মানে বুঝলাম। অর্থাৎ আমার বোনকে তুমি গ্রহণ করে সরিয়ে নিলে আমার কাছ থেকে। আমার স্ত্রীকে কথাটা বলি। এলিজাবেথ! (জানালার ধারে গিয়ে ডাকতে লাগল) ব্যাম্বার্গকে বিদায় জানিয়ে তুমি আবার তোমার দেশে স্বাধীনভাবে বাস করবে। শোন বোন, ওদের দেশটা বড় চমৎকার। প্রাসাদটার একদিকে পাহাড় আর একদিকে মাইলের পর মাইল লম্বা এক বিশাল বন। সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলের ধারে পাহাড়টা নেমে এসেছে। নদীর প্রান্তরে আঙুরের ক্ষেত। তুমি হবে সেই প্রাসাদের সর্বময়ী কর্ত্রী। (এলিজাবেথের প্রবেশ) এলিজাবেথ, ওদের দেখছ? আমি বিবাহের চুক্তি সম্পাদনের জন্য উকিলকে ডেকে পাঠিয়েছি। টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হবে। তোমার পরামর্শ

চাই এ বিষয়ে।

এলি। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেলেও ভালই হয়েছে। মেরিয়া, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। লর্ড ওয়েসলিঙেন এবার কি করবেন ঠিক করেছেন?

ওয়েস। কি করব এখনো তা ঠিক—

গোয়েৎস। করবে আবার কি? আপাততঃ ও ওর প্রাসাদে গিয়ে ওর সম্পত্তি সব দেখেশুনে নেবে। কয়েক বছর ও সেখানে নেই। সব চাকর-বাকরদের হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

ওয়েসলিঙেনের সতের বছর বয়স্ক বালকভৃত্য ফ্রাঁৎস-এর প্রবেশ

কি বালক! খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে? এখন ভাল ত? মেরিয়া, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তোমার আচরণ যেন শোভন হয়। (মেরিয়া ও এলিজাবেথসহ প্রস্থান)।

ফ্রাঁৎস। স্যার, অসংখ্য লোকের শুভেচ্ছা এনেছি আপনার জন্য। রাজসভার সকলেই উদ্বিগ্ন আপনার প্রতি। আপনার বন্দী হওয়ার ঘটনার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখে জল দেখা যায়।

ওয়েস। বিশপের খবর কি?

ফ্রাঁৎস। আপনি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে আছেন বিশপ শুধু এই কথাটা জানতে চান।

ওয়েস। গোয়েৎসএর লোককে তিনি ছাড়তে চাননি কেন?

ফ্রাঁৎস। আপনার মুক্তির জন্য। বিশপ আমাকে বলেছেন, তিনি আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারবেন না। আপনিই তাঁর প্রাণ। আপনার জন্য দরকার হলে একটা কেন পাঁচশো সৈনিক বেছে দেবেন ও ঘুঁষ দেবেন।

ওয়েস। কিন্তু আমরা আর রাজসভায় ফিরে যাচ্ছি না।

ফ্রাঁৎস। তবে গাঁয়ের বাড়িতে যাবার আগে একবার শহরে গিয়ে দেখা করে এলে হত না? অবশ্য আপনি যা ঠিক করবেন আপনার অনুগত ভৃত্য হিসাবে আমি তাই মেনে চলব।

ওয়েস। কোন দরকার নেই।

ফ্রাঁৎস। কিন্তু আপনার যে সব আসবাবপত্র ও টাকাকড়ি জমা আছে ব্যাম্বার্গে তার জন্য আপনাকে একবার যেতে হবে। তাছাড়া বিশপের নতুন দেবদূতকে একবার দর্শন করবেন না?

ওয়েস আমার কে মেবদূত এল ?

ফ্রাংস এবার কিন্তু একেবারে আলাদা ধরনের। তার দিকে তাকালে মনটা [illegible]ারে মুগ্ধ হয়ে যায়। চোখ ফেরাতে পারি না। উনি বিশপের সঙ্গে দাবা খেলেন, আমি পাহারা দিই দরজায়।

ওয়েস। কি নাম ? গায়ের রং কেমন ?

ফ্রাঁৎস। এ্যাডেলহেড ভন ওয়ালডর্ফ। গায়ের রংটা ঠিক সাদা নয়। চোখগুলো ঘোর বাদামী রঙের। দুকানে সোনার দুল, গলায় ভারী হার। বিশপ আবার তাকে বিভিন্ন আকারের পাঁচটা আংটি দিয়েছেন।

ওয়েস। ভদ্রমহিলার স্বামী নেই ?

ফ্রাঁৎস। আমার মনে হলো ওঁর স্বামী মারা গেছে। তাই মনে হয় রাজসভার পরিবেশে শোকদুঃখ ভোলার জন্য এসেছে।

ওয়েস। এই সব বর্ণনার জন্য ধন্যবাদ। এখন জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই আমরা বাড়ি রওনা হব। তুমি হয়ত জান আমি বিয়ে করতে চলেছি ?

ফ্রাঁৎস। হ্যাঁ স্যার। আমি বেশ বলতে পারি আপনার সব বন্ধুরা কথাটা শুনে খুব খুশি হবেন।

ব্যাম্বার্গ। বিশপের প্রাসাদ

বিশপ ও এ্যাডেলহেড দাবা খেলছিল। লাইবেট্রট ও অন্যান্য সহচরেরা ঘরে ছড়িয়ে ছিল।

লাইবে। শুনে রাখুন ভদ্রমহিলারা, প্রেমের দেবতার শক্তিকে আমাদের তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়। তবে সে শক্তিকে নিজের শক্তি দিয়ে প্রতিহত করারও চেষ্টা করতে হবে।

গান

প্রেমের ঠাকুর আসেন ধেয়ে মশাল হাতে জেলে
তীর ধনুকও আনেন সাথে প্রাণটি নেবেন বলে।

বিশপ। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে ? আমার এটা বিশ্বাসই হয় না।

এ্যাডেলহেড। আচ্ছা লাইবেট্রট। প্রেমের গান না গেয়ে রাজনীতির তত্ত্বের উপর একটা বই লেখা উচিত।

লাইবে। হাতে কলমে রাজনীতি তার থেকে অনেক ভাল।

বিশপ। বিয়ে করবে বলে সে আসতে চাইছে না অথবা এমনও হতে পারে সে আসবে না বলেই বিয়ে করছে। ব্যাপারটা কি তা বোঝা যাচ্ছে না।

এ্যাডেল। মাথা থেকে ও চিন্তা দূর করে দাও। সে চলে গেছে। এটাই যথেষ্ট।

লাইবে। মোটেই না। আপনি চাইলে তাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়।

বিশপ। হ্যাঁ, আমি তাকে ফিরে পেতে চাই। তার মত ভাল সৈনিক আর সুশাসক এখানে আর একজনও নেই।

লাইবে। তাহলে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমাকে পাঠান।

বিশপ। নূতন কথা তাকে তুমি কি বলবে? আমার অবশ্য বলার কিছু নেই। আমি শুধু ওয়েসলিঙেনকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে চাই।

লাইবে। তাহলে আমি যাচ্ছি লর্ড। মনে করুন সে আবার আপনার ভৃত্য হিসাবে এসে গেছে।

এ্যাডেল। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

লাইবে। বিদায়। (প্রস্থান)

বিশপ। এই মধুচক্রের মধ্যে এসে কেমন লাগছে?

এ্যাডেল। আমি বিশেষ করে এই ভ্রমরটির বিরল গুণের কথা এতই শুনেছি যে তার পাখার স্পর্শের কল্পনা করতেই আমার হাত রসে ভিজে যাচ্ছে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই বিশপ, আপনার উদারতার থেকে আমার উদারতাও কিছু কম নয়। বড় জিনিসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার গুণ আমারও কম নেই।

সপ্তম দৃশ্য

জাক্সথলেন। গোয়েৎসের প্রাসাদের একটি কক্ষ।

গোয়েৎস ও সেলবিৎস নামে একটি কাঠের পাওয়ালা এক নাইটের প্রবেশ

গোয়েৎস। আগামী সপ্তায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট এবং মেলাতে কয়েক ওয়াগান ভর্তি মাল পাঠাচ্ছে। কতগুলো ওয়াগন, কখন রওনা হচ্ছে, কতজন প্রহরী পাহারায় থাকবে—সব জানতে হবে। সেলবিৎস, তুমি এবার আমার সঙ্গে থাকবে ত?

সেলবিৎস। হ্যাঁ আছি।

গোয়েৎস। তুমি আর আমি পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর সমান। আর সিকিঙেনের খবর কি?

সেলবিৎস। সে এখন বড় দরের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

গোয়েৎস। আবার বড় রাজনীতি কি? হুরেমবার্গ শহরের বিরুদ্ধে আমার জেহাদ আমি ঘোষণা করেছি। ওরা আমার তরুণ সৈনিককে ধরিয়ে দিয়েছে। ওদের শিক্ষা দিতে হবে। সিকিঞ্জেন কি করছে?

সেল। সে দুএকজন রাজার সঙ্গে কথা বলছে। এখনো নাম বলেনি। তবে সফল হলে আমাদেরই ভাল। তা না হলে আমার কাঠের পায়ের মতই আর একটা বোঝা থাকবে। এখন ওয়েসলিঞ্জেনের কি খবর?

গোয়েৎস। এখনো অবশ্য নিশ্চয়তা নেই। সে আর এখন আমাদের বিরুদ্ধে নেই। তবে টাকা পয়সা ঠিক করার জন্য ওকে হয়ত এখন কৌশলে চলতে হবে। আমরা কি করছি তা তাকে জানিয়ে কি করতে হবে তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছি। (জর্জের প্রবেশ) কি ব্যাপার। তাকে বলেছিলে?

জর্জ। না বলতে পারিনি। উনি সেখানে ছিলেন না।

গোয়েৎস। কি বলছ—সে সেখানে নেই? পাঁচ দিন আগে সে বাড়ি গেছে। তার ত সেখানেই থাকা উচিত ছিল।

জর্জ। সেখানেই তিনি ছিলেন। কিন্তু একদিন লাইবেট্রট নামে একটা লোক এসে ব্যাম্বার্গে নিয়ে গেছে। আমি কি ব্যাম্বার্গে যাব?

গোয়েৎস। না, যাবে না।

সেলবিৎস। আমি লাইবেট্রটের নাম শুনেছি। তোমার ভগ্নিপতি তাহলে ওদের খপ্পরে পড়ে গেছে।

গোয়েৎস। না আমি তা বিশ্বাস করি না। আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। জর্জ, তুমি ব্যাম্বার্গে চলে যাও। আসল ব্যাপারটা কি তা জেনে এসগে। তাকে অবশ্য টাকা পয়সার ব্যাপারটা ঠিক করতে হবে।

জর্জ। স্যার, তিনি যেখানেই আছেন, আমি খুঁজে বার করব। (প্রস্থান)

গোয়েৎস। এতে চিন্তার কিছু নেই। আমি কোন অন্যায় দেখি না। এখন ওকথা আর ভেবো না। এখন আমি হুরেমবার্গের কথা ভাবছি।

সেলবিৎস। আমরা কখন রওনা হব?

গোয়েৎস। আগামী পরশু। তোমার প্রাসাদের কাছে রাস্তাটা যেখানে সরু হয়ে বনের মাঝে ঢুকে গেছে আমি তাদের সেইখানে ধরব। সেটা ঠিক জায়গা নয়?

সেলবিৎস। ঈশ্বর করুন, আমরা যেন সফল হই।

উভয়ে। (বুকের উপর ক্রস এঁকে) হে পবিত্র যীশু!

অষ্টম দৃশ্য

ব্যাম্বার্গ। বিশপের প্রাসাদ। এ্যাডেলহেডের কক্ষ
এ্যাডেলহেড ও মার্গারেটের সহচরী কথা বলছিল

এ্যাডেল। এর মধ্যেই ?

মার্গারেট। এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবতে পারিনি। আমিই তাকে প্রথম দেখছি।

এ্যাডেল। সত্যিই লাইবেট্রট বাহাদুর ছেলে। তুমি তাকে ইচ্ছা করলে পেতে পার। আমি যদি বিশপ হতাম তাহলে আমার সারা দেহটাকে সোনার মত করে গলিয়ে সেই সোনা দিয়ে তাকে এই সকল কূটনীতির জন্য উপহার দিতাম। এখন যাও মার্গারেট, ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে এস। তুমি ওয়েসলিঙেন সম্বন্ধে কিছু বল।

মার্গারেট। তিনি একটা বড় কালো রঙের ঘোড়া এনেছেন। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরের অসংখ্য লোক টুপী খুলে অভ্যর্থনা জানায় তাঁকে।

এ্যাডেল। তিনি এত জনপ্রিয় ব্যাম্বার্গে ?

মার্গারেট। কেন হবে না ? যদি টাকার থলে থেকে পথের দুধারে শুধু টাকা আর সোনা মানুষকে বিলোতে থাকে তাহলে কেন জনপ্রিয় হবে না ? তাকে ত দেখে মনে হয় সম্রাট।

এ্যাডেল। সম্রাট ? তার বয়স কত ?

মার্গারেট। তার মানে আজ হতে কুড়ি বছর আগে সম্রাটকে দেখতে যেমন লাগত ঠিক তেমনি। মাথায় সোনালি চুল। নাকটা অহঙ্কারী সৈনিকের মত চোখ দুটো ধূসর আর সেই চোখের ভিতর কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা। দেখলেই কান্না পায়।

লাইবেট্রটের প্রবেশ

লাইবে। হে ভদ্রমহিলাবৃন্দ ! আমার কৃতিত্বের জন্য আমি গর্বিত। প্রজাপতি ধরা পড়ে গেছে। এবার আমাকে কি পুরস্কার দেবেন দিন।

মার্গা। সে কথা আগেই ভাবা হয়েছে।

এ্যাডেল। তোমাকে কিছু দেবার কথা ভাবিনি। তবে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তোমার কৃতিত্বকে। কেমন করে তাকে প্ররোচিত করলে ?

লাইবে। এটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। (মার্গারেটের হাতটা নিল) এর মতই সহজ। (তার ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগল)

মার্গা। খুব বেশী দূর এগিও না। (হাত ছাড়িয়ে নিল)

লাইবে। আমি তিন দিক থেকে আক্রমণ করেছিলাম। প্রথমে আমি ব্যাম্বার্গে তার যে সব পুরনো বন্ধু আছে তাদের কথা বলেছিলাম। পরে সরকারী পদে থাকার লাভের কথাটা বলেছিলাম বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে। সবশেষে বলেছিলাম প্রশাসনিক দায়িত্ব এবং এ বিষয়ে তার বুদ্ধিগত যোগ্যতার কথাটা।

এ্যাডেল। কিন্তু আমার কথাটা ? আমার নামটা কিভাবে তুলেছিলে ?

লাইবে। মাপ করবেন। আপনার নামটা করেছিলাম তৃতীয় দফায় অর্থাৎ প্রশাসনিক যোগ্যতার কথাটা বলতে গিয়ে। তিনি অবশ্য আপনার নামটা আগেই শুনেছেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা চলছে। আইনগত ব্যাপারে তার প্রশাসনিক দক্ষতা আপনার কাজে লাগতে পারে। বিশপ তাকে আপনার কাছেই ঠেলে দেবেন। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি যাই।

এ্যাডেল। মার্গারেট তোমাকে নিয়ে যাবে। আমার হয়ে সে তোমাকে আরো ভাল করে কৃতজ্ঞতা জানাবে। (মার্গারেটসহ লাইবেট্রটের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

ব্যাম্বার্গ। বিশপের প্রাসাদ। তাঁর পাঠাগার।

বিশপ ওয়েসলিঙ্গেন ও অনুচরবৃন্দ

বিশপ। তুমি এখানে আসতে না আসতেই বলছ চলে যাব। কিন্তু কেন ?

ওয়েস। আমি বার্লিসিঙ্গেনের কাছে শপথ করেছি। আমি এখানে এসেছি শুধু আমার ব্যক্তিগত কিছু কাজ করার জন্য।

বিশপ। তুমি জান পোপের কাছে আমার যথেষ্ট খাতির আছে। আমি এ শপথের বিধান—

ওয়েস। এখন একথা অবান্তর। যা হবার হয়ে গেছে।

বিশপ। হায় সেন্ট পিটার! যদি একবার একথা জানতে পারতাম। তুমি যদি একবার চিঠি লিখে দিতে তাহলে তোমার মুক্তির জন্য যে কোন ঘুঁষ বা সৈন্য পাঠাতে পারতাম। কিন্তু শপথ করা উচিৎ হয়নি। এর পর আমার নগররক্ষার জন্য তোমাকেই সৈন্য পরিচালনা করতে হবে।

ওয়েস। এখন আর একথা বলে লাভ নেই।

বিশপ। একবার বল একথা এ শপথ মিথ্যা। বল এতদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে যে সেবা যে কর্মতৎপরতা তুমি আমাকে দান করেছ তা ঐ অর্ধপাগল লৌহহস্ত

লোকটার সঙ্গে তোমার এই সম্পর্কের দ্বারা নস্যাৎ হয়ে যাবে না।

ওয়েস। আপনার মত লোকের মুখে একথা শোভা পায় না। দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য আমি গোয়েৎসের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছি। আমি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিতে বিশ্রাম করতে চাই। আপনি আমায় অনুমতি দিন।

বিশপ। ঠিক আছে তাই যাও। তোমার নাম, তোমার যোগ্যতা ও বংশপরিচয়ে আর আমারও কোন আগ্রহ নেই। (প্রস্থান)

ওয়েস। ব্যাপারটা ভালভাবে মিটল না। কিন্তু আমি এর থেকে বেশী ভাল করে কথাটা কি করে বলব ?

ফ্রাংস। আর সেই মহিলার কাছে গিয়ে কালকের থাকার কথাটা বলতে হবে আপনাকে।

ওয়েস। সেটা তোমায় দেখতে হবে না। আমি বুঝব কিভাবে বিদায় নেব।

দশম দৃশ্য

ব্যাম্বার্গ। বিশপের প্রাসাদ। এ্যাডেলহেলডের শয়নকক্ষ। সন্ধ্যাকাল।

মার্গারেট ও এ্যাডেলহেলড্

মার্গারেট। বিশপের কাছে সে সত্যিই বিদায় নিয়েছে। সত্যিই সে কাজ সারার জন্য এখানে এসেছে।

এ্যাডেল। ভালই হলো। তুমি যা বলেছিলে তার সম্বন্ধে ততটা ভাল সে নয়।

মার্গা। নয়, তাই নাকি ?

এ্যাডেল। মধ্যরাত্রির দুঘণ্টা পরে সে ঘুমোতে যায় এবং অনেক বেলার পর আমার প্রাতরাশের সময় ওঠে। এরকম লোকের দ্বারা কি হবে ? সে আমাকে বললেও আমি তাকে বিয়ে করব না।

মার্গা। এত তাড়াতাড়ি সে প্রস্তাব তুলতেই পারে না।

এ্যাডেল। আমিই তাকে বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু সে তাতে গুরুত্ব দেয় নি। সে ধনী। জাক্সথসেনের সেই মেয়েটার কথা একবার ভুলে গেলেই সে আবার ফিরে আসবে বিশপের কাছে। আর তার জন্যই আমি এই ফাঁদে পড়েছি।

ওয়েসলিঙেনের প্রবেশ

মার্গারেট। এসে গেছেন।

ওয়েস। সান্ধ্য নমস্কার হে প্রিয়তমা। আপনি কি অসুস্থ ?

এ্যাডেল। আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। তুমি কি মাথাটা একটু টিপে দেবে হাত দিয়ে? মার্গারেট, তুই যা এখন। (মার্গারেট মৃদু হেসে চলে গেল) মাস্টার পীকক বসো।

ওয়েস। আমার জন্যই কি এই মাথাধরা? নাকি এটা বানানো?

এ্যাডেল। এটা হচ্ছে সন্ধ্যার উত্তাপ। ইচ্ছা করলে আমার পোশাকটা খুলে দিতে পার।

ওয়েস। বিছানায় যাবার আগে ওকে পাঠিয়ে দিলে কেন?

এ্যাডেল। তা তোমায় দেখতে হবে না। তুমি ত আর এখানে থাকবে না। একথা কে ভাবতে বলল তোমায় যে আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম এখানে?

ওয়েস। কেন, তোমার সম্পত্তি সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য।

এ্যাডেল। ঠিক আছে ঐ বাক্সটা খোল। ওখানে সব কাগজপত্র আছে। (ওয়েসলিঙেন তা আনল) লর্ড ওয়ালডর্ফের একটা ছোট প্রাসাদ আর কিছু জমি। পড়ে দেখ। স্যাণ্ডগ্রেভ নামে একটা লোক ঐ সম্পত্তিতে দাবি জানাচ্ছে। আমি জানতে চাই এ দাবির অর্থ কি?

ওয়েস। (কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে) একবার দেখে যতদূর মনে হয় তোমার দাবির ভিত্তিটা খুব পাকা নয়। যে কোন সুদক্ষ আইনজীবী তা নস্যাৎ করে দিতে পারে। তবে আজ নয়। কাল সকালে আমি ভাল করে দেখব।

এ্যাডেল। না আজই তোমার মতামত জানাতে হবে। তুমি শুধু তোমার দেহের শান্তি চাও। আর কিছু না।

ওয়েস। আমাকে দুশো মাইল একটা খালি ঘোড়ার পিঠে চেপে কত নদ-নদী পাহাড় বন মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে এখানে। আমাকে দেখে বুঝছ না আমি কত ক্লান্ত।

এ্যাডেল। তাহলে বিছানায় উঠে এস। এই ত শেষবারের মত।

ওয়েস। না, তা নয়।

এ্যাডেল। আমি যে শুনলাম তুমি কাল চলে যাচ্ছ।

ওয়েস। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

এ্যাডেল। তাহলে ত আর প্রেম করাও হবে না আর আমার কাগজ দেখাও হবে না। বিশপ বলছিল তুমি নাকি শপথ করেছ।

ওয়েস। সত্যিই তাই।

এ্যাডেল। হ্যাঁ সত্যিই তুমি ক্ষেত্রবিশেষে একই পাথর থেকে নানা রং বার করে নিতে পার। বার্লিসিঙেনের প্রাসাদে তুমি অমার্জিত দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ, আবার বিশপের পড়ার ঘরে তুমি মার্জিত রাজনীতিবিদ, আর আমার শোবার ঘরে তুমি—। তুমি হচ্ছ অবিশ্বস্ত, অস্থিরমতি এক ব্যভিচারী। তুমি খাড়া হয়ে ভাল করে দাঁড়াতেই পার না। তুমি যাও। (দরজায় করাঘাত)

ফ্রাঁৎস। স্যার ওয়েসলিঙেন!

ওয়েস। কি চাও, এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

ফ্রাঁৎস। বিশপ আপনাকে ডাকছেন। তিনি বলছেন আপনি তাঁর কাজকর্ম বিশৃংখলার মধ্যে ফেলে রেখেছেন। তাঁর সচিবদের কাছে সব বুঝিয়ে দিন।

ওয়েস। এত রাতে। তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? বল—

এ্যাডেল। বল কাল সকালে করবেন। হ্যাঁ আজ যাও। মার্গারেট। (মার্গারেট ছুটে এল) এই সব অভদ্র লোকগুলোকে কেন আমার কাছে পাঠাস?

মার্গা। ওঁর শরীরটা ভাল নেই। আপনি এখন যান স্যার।

ওয়েস। তুমি এখন আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কথা একদিন তোমায় শুনতে হবে। (ফ্রাঁৎস সহ প্রস্থান)

মার্গা। উনি কি সত্যিই চলে যাবেন?

এ্যাডেল। কাল হোক পরশু হোক ও যাবেই। হায় আমার প্রিয়তম, আমার প্রিয় চাতক, প্রিয় কপোত। ওকে আমি সত্যিই ভালবাসি। ওর জন্যে আমার সারা দেহে ক্ষুধা, সারা অঙ্গে দুর্বলতা। মাথাটা আস্তে আস্তে টিপে দে।

প্রথম দৃশ্য

নুরেমবার্গের সন্নিহিত এক বনভূমি। এক খামারবাড়ির সম্মুখস্থ এক প্রাঙ্গণ। চাষীদের এক বিবাহবাসরে কয়েকজন চাষীসহ গোয়েৎস, সেলবিৎস ও মেৎস্লার উপস্থিত ছিল।

কন্যার পিতা। সব চুপ করো। বার্লিসিঙেন ও সেলবিৎস-এর লর্ডগণ আমাদের অনুষ্ঠানে দয়া করে উপস্থিত হয়েছেন। তোমরা সবাই একবাক্যে বল নুরেম-বার্গের ওয়াগনগুলো যেন দখল করতে পারি। তার চাকাগুলো যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারি।

গোয়েৎস। এস আমরা কন্তার স্বাস্থ্য পান করি। তারা যেন দীর্ঘকাল সুখে শান্তিতে সন্তানসন্ততিসহ বসবাস করতে পারে।

সেলবিৎস। কি করে বিয়েটা হলো তা একবার বলে দাও গোয়েৎস।

গোয়েৎস। একবার এক একর জমি নিয়ে এক বৃদ্ধ ও যুবকের মধ্যে ঝগড়া ও মামলা বাধে। বৃদ্ধের কন্তার সঙ্গে যুবকের একদিন দেখা হতে তারা এই মামলা নিয়ে কথা বলে। মিটমাটের কথা ভাবে। পরে এই মিটমাট বিবাহে পরিণত হয়। এইভাবে এই মামলার এমন নিষ্পত্তি হয় যা অসৎ আইনজীবীরা ভাবতেও পারে না। আমাদের জার্মানীর এই সব গ্রাম্য কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে আসছে। (সমবেত ধ্বনি। উকিলরা নিপাত যাক। শহরের লোকরা নিপাত যাক। রাজা-রাজরাদের খতম করো।)

মেৎস্লার। ব্যবসাদারদের পুড়িয়ে মার। রাজা-রাজরাদের খতম করো। উকিলদের ফাঁসি দাও।

গোয়েৎস। থাম থাম। গ্রাম্য জীবনের একটি গুণ এই যে তা একটি শান্তি ও ভারসাম্যকে বজায় রেখে চলে। তোমাদের নিরাপত্তার ভার আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। শহরের লোকরা যেন এখানে আসতে না পারে।

মেৎস্লার। (গান) সবাই থাকি মিলে মিশে, এটাই মোদের ধাম
পাপ করিনি এমন কভু, বলব নাকো নাম।

গোয়েৎস। আমি কন্তার হাত ধরে নাচব। (নাচতে লাগল)

জর্জ ব্যাম্বার্গ থেকে সোজা এসে গোয়েৎসের কানে কানে কি বলল

গোয়েৎস। কি ?

জর্জ। একথা সত্য।

গোয়েৎস। তোমরা নাচগান চালিয়ে যাও। (সেলবিৎসকে ডেকে নিয়ে চলে গেল)

জর্জ। আমি এই কোট পরে ব্যাম্বার্গে গিয়ে রাজপথে দেখলাম বিশপ আর লম্বা বাদামী রঙের রাণীর সঙ্গে ওয়েসলিঙেন চার্চ থেকে বেরিয়ে আসছে। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটি কে। লোকে বলল ভন ওয়ালডর্ফ। তাদের বিয়ে হতে চলেছে।

সেলবিৎস। আমি তোমাকে কি বলেছিলাম ?

জর্জ। ব্যাম্বার্গের মেয়েরা সব বলাবলি করছে ওদের বেশ মানাবে। অতি কষ্টে আমি একবার ওয়েসলিঙেনের সঙ্গে দেখা করতে সে বলল, বার্লিসিঙেনকে

বলবে বন্দী অবস্থায় করা শপথ মানতে আমি রাজী নই। এক ঘণ্টার মধ্যেই তুমি ব্যাম্বার্গ শহর ছেড়ে চলে যাও।

গোয়েৎস। যীশু, মেরী, যোশেফ, এখন থেকে তার সঙ্গে আবার শুরু হলো আমার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কিন্তু আমার বোন মেরিয়াকে কি বলব?

সেলবিৎস। বলবে আর কি, তার সুনামটা নষ্ট হলো। একবার যদি সে ধরা পড়ে তাহলে আমি তার চোখদুটো উপড়ে নেব। আর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে দেব। সে দড়ি ধরে মেরিয়া ইচ্ছামত তাকে পশুর মত টেনে টেনে বেড়াবে। এ কথা শোনার থেকে আমি যদি আমার অন্য পাটাও হারাতাম। (একটা ছেলে ঘরের ছাদ থেকে চিৎকার করে উঠল, ঐ ওয়াগন আসছে) সব প্রস্তুত হয়ে যাও।

গোয়েৎস। সব বেরিয়ে পড়।

বর। চল, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

চাষীরা। ওয়াগন এসে গেছে। চল, সব এগিয়ে চল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অসবার্গ। রাজপ্রাসাদসন্নিহিত বাগানবাড়ি।

ব্যবসায়ীদের প্রবেশ

১ম ব্যবসায়ী। এইখানে দাঁড়াও। মহারাজ, এইদিকেই আসছেন।

২য় ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে কে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি? মনে হচ্ছে ওয়েসলিঙেন।

১ম ব্যবসায়ী। উনি আবার ব্যাম্বার্গের বিশপের বন্ধু।

২য় ব্যবসায়ী। হ্যাঁ আমি জানি।

১ম ব্যবসায়ী। এখন আমাদের কর্তব্য হলো সম্রাটের পায়ের উপর সটান শুয়ে পড়া। আমাদের চরম দুঃখের কথা বলে তাঁর মন গলাতে হবে।

২য় ব্যবসায়ী। তা যদি করো তাহলে ভাল হয়।

সম্রাট ওয়েসলিঙেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসতে ২য় ব্যবসায়ী এগিয়ে গেলে ১ম ব্যবসায়ী তাকে টেনে ধরল।

১ম ব্যবসায়ী। এখন তাঁর নজর এদিকে না পড়া পর্যন্ত থাম।

সম্রাট। না না, আর তা হয় না। বয়স যত বাড়ছে ততই হতাশ হয়ে পড়ছি। কতদিন ধরে আমি তুর্কীদের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী সেনাদল পাঠাচ্ছি। আমার মনে হয় ওয়েসলিঙেন, আমার মৃত্যুর আগে আর এ কাজ হয়ে উঠবে না।

তাছাড়া আরো কত প্রজাদের উন্নতির কাজ করার আছে। কিন্তু আলস্য, ঈর্ষা আর সংশয়ের জন্য তা হয়ে উঠছে না। (ব্যবসায়ীদ্বয় তাঁর সামনে নতজানু হলো)

ব্যবসায়ীদ্বয়। হে সর্বশক্তিমান মহারাজ!

সম্রাট। ওঁরা কারা? ওঁরা কি চান?

ব্যবসায়ীদ্বয়। আমরা ব্যবসায়ী। আমরা—

সম্রাট। উঠে দাঁড়াও। এটা কনস্তান্তিনোপল নয়। (উঠে দাঁড়াল) কোথা হতে আসছ?

১ম ব্যব। নুরেমবার্গ মহারাজ। আমরা আপনার অনুগত প্রজা। আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলায় যাবার পথে আমাদের বত্রিশটা মাল ভর্তি ওয়াগন গোয়েৎস ভণ বার্লিসিঞ্জেন আর হানস্ ভণ সেলবিৎস-এর নেতৃত্বে এক বিশাল জনতা লুট করে নেয়।

ওয়েস। কোন প্রহরী ছিল না?

১ম ব্যব। আমাদের নাগরিক প্রতিরক্ষাবাহিনী ছাড়া ব্যাম্বার্গের বিশপের কিছু অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু ওদের সংখ্যা অনেক বেশী থাকায় আমরা হেরে যাই। সব খোয়া যায় আমাদের। মহারাজ যদি আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য না করেন তাহলে আমাদের শহরে রুটির জন্য ভিক্ষে করতে হবে।

সম্রাট। বার্লিসিঞ্জেন আর সেলবিৎস। একজনের একটা হাত আর একজনের একটা পা নেই। আর তোমাদেরও দোষ নেই। ডাকাতরা মালপত্র কেড়ে নিলেই সাহায্যের জন্য তোমরা রাজার কাছে ছুটে আস আর রাজা যদি কোন সমস্যায় পড়ে কিছু সৈন্য, কিছু কর বা ধনীদের কাছ থেকে কিছু ঋণ চায় তাহলে তখন তোমাদের টিকি দেখা যাবে না। এমন করে প্রাচ্যের কায়দায় প্রণিপাত হবে না রাজার কাছে। (রাজা চলে গেলে ওয়েসলিঞ্জেন ব্যবসায়ীদের আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল)।

ওয়েস। তোমরা অসময়ে এসে পড়েছ। আজ সকাল থেকে ওর মন মেজাজ ভাল নেই। এখন চলে যেও না। চলো দেখি কি করতে পারি।

১ম ব্যবসায়ী। আমরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। ধন্যবাদ। (উভয়ের প্রস্থান)

সম্রাট। ওরা সংখ্যায় অনেক। ড্রাগনের মত ওদের অনেক মাথা।

ওয়েস। এখন শক্তির নীতি অবলম্বন করতে হবে মহারাজ।

সম্রাট। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব। তুমি ত আবার সম্প্রতি বার্লিসিঞ্জেনের

সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছ। নয় কি?

ওয়েস। আমি সাময়িকভাবে পুরনো বন্ধুদের স্মৃতিতে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম ওর আবরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। সে আমাকে তার পার্বত্য নেকড়েদের সঙ্গে টানতে চেয়েছিল। তার বোনকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা পারেনি। তখন বুঝিনি, এখন বুঝছি আমি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে ভাল করেছি।

সম্রাট। তবে বিয়ের ব্যাপারে শপথ ভাঙাটাকে আমি সমর্থন করি না। প্রাচীন নাইটদের এটা রীতি নয়। আবার ত তুমি লেডী এ্যাডেলহেলডের সঙ্গে বোধ হয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছ। তিনি সুন্দরী। আশা করি তোমরা সুখী হবে।

ওয়েস। আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ।

সম্রাট। তুমি তাহলে এই সব স্বেচ্ছাচারী নাইটদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে? তবে মনে রাখবে এই সব পার্বত্য নেকড়েরা কেউ দল থেকে বেরিয়ে গেলে বড় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ওয়েস। হ্যাঁ, ওদের লক্ষ্য হচ্ছে শুধু মানুষের মাথা কাটা।

সম্রাট। রাজাদের পরিষদে ব্যাপারটা অনুমোদিত করিয়ে নিতে হবে প্রথমে। তারপর যে শান্তিমূলক সেনাবাহিনী পাঠানো হবে তার সেনাপতি হবে ত?

ওয়েস। আমাকে সেনাপতি করা ঠিক হবে না। বার্লিসিঙ্গেনের প্রতি আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এখনো জটিলতামুক্ত হতে পারেনি। আপনি অন্য কাউকে এ কাজের ভার দিন। আর একটা কথা মহারাজ। আপনি আমাকে ল্যাণ্ডগ্রেভের বিরুদ্ধে অনুমতি দেবেন?

সম্রাট। কি কারণে?

ওয়েস। তিনি অন্যায়ভাবে আমার স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রাসাদ ও ভূসম্পত্তি দখল করেছেন।

সম্রাট। এই কারণে সকাল থেকে তুমি আমায় অনুনয় করছিলে। নিজের ব্যক্তিগত কারণে অস্ত্রধারণ করতে চাও। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য ওদের দখল করতে চাও না।

ওয়েস। মহারাজ, এই প্রাসাদের দখলিস্বত্ব নিয়ে মামলা হচ্ছে আপনার দরবারে। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে যুদ্ধ নয়। সুতরাং আপনার অনুমতি-

পত্র নিয়ে আমি ব্যক্তিগত অরাজকতার হাত থেকে ও অঞ্চলকে মুক্ত করতে চাই।

সম্রাট। ঠিক আছে। সে অনুমতিপত্র আমি দেব। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। এখন গোয়েৎসদের দখল করার ব্যাপারে আমার সব চিন্তা ব্যাপৃত।

ওয়েস। হ্যাঁ, দখল অবশ্যই করতে হবে।

সম্রাট। কিন্তু এখন দেখছি তুমিও অসমর্থ। তুমিও নির্ভরযোগ্য নও।

জাক্সথসেন। গোয়েৎসএর প্রাসাদের একাংশের একটি কক্ষ।

গোয়েৎস সিকিঞ্জেনের সঙ্গে কথা বলছিল। মেরিয়া কাছে বসেছিল

সিকিঞ্জেন। এটা সত্যিই খুব খারাপ সংবাদ গোয়েৎস। তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

গোয়েৎস। সব আতিথেয়তায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমাকে আমার এই প্রাসাদ থেকে বার করে দিতে হবে সিকিঞ্জেন। আমি আর সেলবিৎস সম্রাটের দ্বারা এই ফরমান মারফৎ দস্যু ও রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষিত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে তোমাদের ভাগ্য বহন করতে হবে। আমার প্রভুর আদেশ।

সিকিঞ্জেন। রাজদরবারের দুষ্ট কীটগুলো এই কাজ করিয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গেই যোগদান করব।

গোয়েৎস। তুমি বরং নিজের কাজে যাও। রাজাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাও। সফল হলে তাতে অনেক কাজ হবে। এখন দেখ ওয়েসলিঞ্জেন কি করে?

সিকিঞ্জেন। এখন তোমাকে কিছু সৈন্য পাঠাব আমি। তারা কোন ব্যাজ বা চিহ্ন না নিয়েই যুদ্ধ করবে।

গোয়েৎস। এজন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ।

সিকিঞ্জেন। এখন একটা জিনিস দিতে চাই তোমাদের। আমি তোমার বোনকে আমার হৃদয় আর হাত অর্পণ করতে চাই।

গোয়েৎস। সেকি! তুমি ত শুনেছ ওয়েসলিঞ্জেনের বাগদত্তা সে। তার কুমারীত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। সে এখন পরিত্যক্ত রমণী। তাকে তোমার হাতে কেমন করে সমর্পণ করব?

সিকিঞ্জেন। কিন্তু এটা তার দোষ নয়।

গোয়েৎস। আমি তা বলছি না। কিন্তু দেশের প্রথা ত মানতে হবে।

সিকিঙেন। তার এখন বয়স খুবই কম। তার জীবনকে নূতন অর্থ দান করতে হবে। আর আমিই তা করব। (মেরিয়ার কাছে গিয়ে) আমার কথা শুনেছ নিশ্চয়।

গোয়েৎস। ফ্রাঁৎস ভণ সিকিঙেন একজন সামন্ত এবং আমার বন্ধু। আমরা তার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

মেরিয়া। আমি আপনার সঙ্গে পরে কথা বলব। আপনার ইচ্ছা সত্যিই উদার। (প্রস্থান)

সিকিঙেন। ও সম্মত হবে। এখন শোন। ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধে নামা আমার পক্ষে হবে বোকামি। কিন্তু তুমি একা পারবে? কত লোক আছে তোমার?

গোয়েৎস। খুব বেশী নেই। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে যারা আমার সঙ্গে আছে তারা এখন আমাকে ছাড়বে না। জর্জকে সেলবিৎসএর কাছে পাঠিয়েছি। এখনই আমরা একসঙ্গে যুদ্ধে বার হব। আমরা দস্যুদের মতই ভয়ঙ্করভাবে যুদ্ধ করব। আমরা রাজসৈন্যদের যুদ্ধ জানি। উপর থেকে দেখে ওদের খুব জমকালো মনে হয়, কিন্তু আসলে ভিতরে কিছুই নেই। মনে হবে এক ঝাঁক ভাড়াটে সৈন্য। একবার আমিও এই ধরনের এক যুদ্ধে যোগদান করি। আমাকে এক আদেশপত্র দিয়ে সেনানায়কের আদেশ পালন করতে বলা হয়। আমি তখন তাদের বলি, আমি কাগজ দেখে যুদ্ধ করি না, যুদ্ধ করি আমার বুদ্ধি আর দৃষ্টিশক্তির জোরে। কনরাদ শটন্‌কে যদি চাও আমি নিজের জোরে তাকে নিয়ে আসব তোমাদের মাঝে।

সিকিঙেন। তুমি আবার উঠে দাঁড়াবে। তুমি তাদের সবাইকে ধ্বংস করবে।

গোয়েৎস। হ্যাঁ, তাই করব। তুমি তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাবে। তবে তুমি এখান থেকে চলে যাবার আগে একবার তোমায় বাড়ির মেয়েদের কাছে নিয়ে যাব। মেরিয়ার কিছু ধনসম্পদ আছে। ওয়েসলিঙেন তার কিছুই স্পর্শ করেনি। এস।

ব্যাম্বার্গ। ওয়েসলিঙেনের বাড়ি।

এ্যাডেলহেলড্‌ ও ফ্রাঁৎস কথা বলছিল

এ্যাডেল। তাহলে সম্রাট হস্তক্ষেপ করেছেন। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো

দস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হলে আমি তাহলে অগসবার্গের আদালতে গিয়ে আমার স্বামীর কাছে গিয়ে দেখা করতে পারব।

ফ্রাঁৎস। সেখানে তিনি থাকবেন না মাদাম। তিনি ল্যাণ্ডগ্রেভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেছেন।

এ্যাডেল। এত তাড়াতাড়ি। এমন স্বামী পাওয়া সত্যিই দুষ্কর যিনি বিয়ে হতে না হতে স্ত্রীর সাহায্যের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে যান। মনে হয় উনি ল্যাণ্ডগ্রেভকে দমন করে বার্লিসিঞ্জেন ও সেলবিৎসকে দমন করার জন্য চলে যাবেন ঐ পথে। এদিকে হয়ত এর মাঝে আসবেন না।

ফ্রাঁৎস। তিনি বার্লিসিঞ্জেনের ব্যাপারে যুদ্ধে যাবেন না মাদাম। সে কাজের ভার অন্য জনকে দেওয়া হয়েছে। ল্যাণ্ডগ্রেভকে দমন করে সোজা আপনার কাছে চলে আসবেন।

এ্যাডেল। অগসবার্গ হতে আসার পথে খেয়েছ ?

ফ্রাঁৎস। খাদ্য পানীয় কিছুই না, আপনি সামনে রয়েছেন এটাই যথেষ্ট।

এ্যাডেল। কাছে এস ফ্রাঁৎস।

ফ্রাঁৎস। আরো কাছে ?

এ্যাডেল। তুমি দেখছি রাজদরবারের আদব কায়দায় অভ্যস্ত। তবে তোমার মধ্যে নিষ্ঠা আছে। এই নাও আমার হাত। চুম্বন করো। এবার যেতে পার। তুমি তোমার কর্তব্য যথোপযুক্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছ।

সম্রাটের সেনাবাহিনীর শিবির। জনৈক ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন অফিসার।

ক্যাপ্টেন। এটা যে কঠিন কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্রাট আমাদের গোয়েৎস বা সেলবিৎস কাউকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তাদের জীবন্ত বন্দী করতে হলে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের।

১ম অফিসার। এই ধরনের অভিযানে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। এই সব নাইটদের বীরত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি।

ক্যাপ্টেন। কিন্তু তুমি আছ আমাদের সঙ্গে। সুতরাং তোমার মনটাকে এইখানে খাপ খাইয়ে নিয়ে কর্তব্য পালন করো।

২য় অফিসার। কেন আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে ধূমায়িত ড্রাগনগুলোর গলা টিপে ধরছি না।

ক্যাপ্টেন। ওদের মুখগুলো বিরাট বড় আর তাতে অনেক দাঁত আছে

ধারাল। আমি প্রথমে বার্লিসিঞ্জেনের কাছে চিঠি পাঠাব আত্মসমর্পণ করার জন্য। তা না করলে ছোট একটা বাহিনী পাঠাব পরীক্ষামূলকভাবে।

অনেক অফিসার। আমাকে তা পরিচালনা করতে দেবেন।

ক্যাপ্টেন। এখানকার রাস্তাঘাট জানা আছে। খুব সাবধান কিন্তু।

জাক্সথসেন। গোয়েৎসের প্রাসাদ

গোয়েৎস ও জর্জ কথা বলছিল

গোয়েৎস। তাকে নিয়ে এস জর্জ।

জর্জ। সে তার নাম বলবে না। তবে সে একজন খাঁটি সৈনিক। তার চোখগুলো কালো।

জর্জসহ লার্সের প্রবেশ

ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। আমি তোমাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে না।

লার্সে। কিন্তু আপনাকে চিনি বার্লিসিঞ্জেন।

গোয়েৎস। কি তুমি চাও?

লার্সে। আমি একটা উপহার এনেছি।

গোয়েৎস। উপহার?

লার্সে। বিস্মিত হবেন না। আমি শুনেছি আপনার লোকের দরকার।

গোয়েৎস। তা অবশ্য বটে। কিন্তু লোভনীয় বেতন কিছু দিতে পারব না। এ প্রাসাদে যারাই বাস করে তারা এখন নজরবন্দী। আমরা কিই বা দেব!

লার্সে। আমি সব জানি। আমি মানুষ দেখে চাকরি করি, টাকার পরিমাণ দেখে নয়।

গোয়েৎস। লোকে তোমায় কি নামে ডাকে?

লার্সে। আমার নাম লার্সে। ফ্রিৎস লার্সে।

গোয়েৎস। তোমার অভিজ্ঞতা কিছু আছে?

লার্সে। যখন প্যালেটাইন আপনাকে কনরাদ শটন্‌কে ধরে আনতে বলেছিল তখনকার কথা মনে আছে? আপনি তখন মাত্র ষোল জন লোক নিয়ে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন।

গোয়েৎস। হাঁ্যা সব মনে আছে। দুজন ছাড়া আর সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। তারা হলো আরহার্ড আর একজন তুমি!

লার্সে। তারা পালিয়ে না গেলে আমরা তোমাদের সকলের মাথা নিতাম।

আমি সব গুলি শেষ করে হেরে গিয়েছিলাম।

গোয়েৎস। (জামা খুলে গায়ে গুলির দাগ দেখিয়ে)- এই দাগ তোমার গুলির দাগ। ছয় সপ্তা লেগেছিল এ ঘা সারতে। তুমি আমার দলে যোগদান করাতে আমি খুব খুশি হয়েছি লার্সে। কতদিন থাকবে ?

লার্সে। এক বছর। এখন আপনি পলাতক অবস্থায় আছেন বলে মাইনে নেব না। লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটা অংশ নেব বেতনস্বরূপ।

গোয়েৎস। না, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমি আমার লোকদের বেতন দেব। তাছাড়া আর লুণ্ঠনের কাজ হবে না।

লার্সে। এখন যুদ্ধের কাজটাই বাজে হয়ে গেছে।

সেলবিৎসএর ব্যাজপরা একজন সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বার্লিসিঞ্জেন, আমার মালিক সম্মানসহ আপনাকে জানিয়েছেন তিনি কাল সকালে পঞ্চাশ জন লোক নিয়ে আসছেন।

গোয়েৎস। খুব ভাল কথা।

সৈনিক। আরো পঞ্চাশ জন সৈনিক ফলওয়ালার বেশ ধরে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেলবিৎস বলেছেন তারাই হবে আক্রমণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী দল। আমরা তাদের কাছে যাব ?

গোয়েৎস। হ্যাঁ, আজ রাতেই। তোমার মালিক অশ্বারোহী দলও নিয়ে আসতে পারেন। আমরা গিয়ে তাদের সঙ্গ নেব। সঙ্গে তোমার ঘোড়া আছে ত লার্সে ?

লার্সে। আছে।

গোয়েৎস। তাহলে চল রওনা হই।

সপ্তম দৃশ্য

বন ও জলাশয়। অন্ধকার বর্ষণঘন রাত্রি।

সম্রাটের ব্যাজপরা দুজন সৈনিকের প্রবেশ

১ম সৈনিক। কি বুঝছ ভাই, তোমাদের দলের আর সব কই ?

২য় সৈনিক। আর ঠাট্টা করো না। যা বৃষ্টি! একেবারে ভিজে গেছি। আমার অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

১ম সৈনিক। দলটার সঙ্গে কোথায় ছাড়াছাড়ি হল তোমার ?

২য় সৈনিক। এই বনটার ওপারে। ঘোড়ায় চেপে যাওয়া ভার। কারণ গোটা পথটা জলে ভর্তি। তুমি কোন পথে এখানে আস ?

১ম সৈনিক। অফিসার খাবার চাইতে আমি যে লোকটা শূয়োর চরাচ্ছিল তার কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে আনি। (দেখাল) একেই বলে যুদ্ধ আর সৈনিকের কাজ। এবার থেকে ব্যাঙের পোষাক পরে আসতে হবে। (ঘোড়ার শব্দ)

২য় সৈনিক। ঐ শোন।

১ম সৈনিক। হা ভগবান, কেউ আসছে। আমি গাছে উঠব। (গাছে উঠল)

২য় সৈনিক। আমি জলে ঝাঁপাব। তোমাকে ওরা দেখতে পাবে। (জলাশয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল)

ভারী পোষাক পরিহিত অবস্থায় গোয়েৎস, লার্সে ও জর্জের প্রবেশ

গোয়েৎস। এখানে ঘোড়াগুলোকে রেখে আমাদের পায়ে হেঁটে এগোতে হবে। (তারা বনের ভিতর চলে গেল)

১ম সৈনিক। (গাছ থেকে নেমে) এখনো আমি বেঁচে আছি। ওরা আমায় দেখতে পায়নি। মাইকেল, চলে এস। (২য় সৈনিক জল থেকে কোনরকমে চিৎকার করে উঠল) কি হয়েছে মাইকেল, কাদায় ডুবে গেছ ? একটা গাছের ডাল ধরো।

সেলবিৎসের দুজন সৈনিকের প্রবেশ

১ম সে. সৈনিক। এদিকে এস। (১ম রাজসৈনিক দু হাত তুলল) তোমার বেল্ট ও তরবারি খুলে দাও।

২য় সে. সৈনিক। আর একজন কই ?

১ম রাজসৈন্য। জলে কাদায় ডুবে গেছে। তোমরা কি বার্লিসিঞ্জেনের লোক ?

১ম সে. সৈন্য। না, সেলবিৎসএর।

১ম রাজসৈন্য। তোমরা কি করবে আমাদের নিয়ে ?

১ম সে. সৈন্য। এখন এস ত আমাদের সঙ্গে।

রাজসৈন্যের শিবির

ক্যাপ্টেন ও অফিসারগণ

ক্যাপ্টেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। বৃষ্টি থেমে গেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই গাছেপালায় রোদ উঠলে আমরা বুঝতে পারব কোথায় এসেছি। অগ্রবর্তী

দলের কোন খবর পেয়েছ ?

২য় অফিসার। তারা ছিন্নভিন্নভাবে দু তিন জন করে ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তাদের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। তারা কাঁদছে।

ক্যাপ্টেন। কোন অফিসার ফিরে আসেনি ?

২য় অফিসার। তারা মরতে পারল না ? সেনাপতি লাঙ্গলট মরলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না।

ক্যাপ্টেন। মন্তব্য করতে হবে না। তোমার যোগ্যতার প্রমাণ পরে হবে। (অগ্রবর্তী দলের জনৈক অফিসার আহত অবস্থায় এক সৈনিকের কাঁধে ভর দিয়ে এল) একি অবস্থা তোমার প.স্পিয়াস ম্যাগনাস ? তোমার খবর কি স্যার ?

১ম অফিসার। আমরা হেরে গেছি একেবারে।

ক্যাপ্টেন। হেরে গেছ ?

১ম অফিসার। গত রাতে যে অবস্থায় পড়েছিলাম তাতে কোন অফিসার কোন অশ্বারোহীদলকে চালনা করতে পারে না। একথা আমি বেশ করে বলতে পারি। জলাশয়ে চোরাবালিতে ঘোড়ার পা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ঘোরালো পথ। অথচ চারদিক থেকে পদাতিক শত্রুরা আমাদের সাপের মত ঘিরে ফেলল।

ক্যাপ্টেন। তোমার সেই বিখ্যাত সৈনিকটি কোথায়, যার স্থানীয় পথঘাট সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান ছিল।

১ম অফিসার। মনে হয় বাড়ি চলে গেছে। কিন্তু আমার দুটো পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে। আমি শুধু কথা বলব, ডাক্তার পাব না।

ক্যাপ্টেন। একে নিয়ে যাও। বাজে ছোকরা কোথাকার ?

অন্য এক অফিসারের প্রবেশ

৩য় অফিসার। আমরা এবার আসল ব্যাপারটা জানতে পারলাম স্যার। বার্লিসিঞ্জেন ও সেলবিৎসের মিলিত সৈন্যদল গত রাত্রিতে আমাদের অগ্রবর্তী দলকে ঘিরে ফেলে। ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এখন তারা এদিকেই আসছে।

ক্যাপ্টেন। তারা সংখ্যায় কত ?

৩য় অফি। একশোর বেশী হবে না। তারা বেশ শৃংখলাবদ্ধ বলে মনে হলো না। মনে হলো তারা মাতাল। তারা ঘোড়া ছেড়ে পায়ে হেঁটে আসছে।

ক্যাপ্টেন। এটা অবশ্য একটা ভাল খবর বটে। আসলে তারা অশ্বারোহী, পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই। তাহলে আমরা অশ্বারোহীদের সরিয়ে আনব।

পদাতিকদের ছড়িয়ে রাখব। তারা ভাববে আমাদের সৈন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ নেই। তারা এলে আমাদের অশ্বারোহীরা তাদের ঘিরে ধরবে। তবে এখানকার চারদিকে মাটি কেমন ?

২য় অফি। ঘোড়ায় চাপা চলবে।

ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে। তুমি সৈন্য চালনা করবে। তবে গতরাতের মত ব্যর্থ হলে ফাঁসি হবে। তোমার পদমর্যাদা যাই হোক।

নবম দৃশ্য

প্রান্তরের সন্নিহিত বনভূমির প্রান্তভাগ।

সেলবিৎসের সেনাদল মঞ্চের উপর পাগলের মত ছোটাছুটি করছিল।

গোয়েৎস, জর্জ ও লার্সে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিল।

গোয়েৎস। জয়ঢাক বাজিয়ে ফিরে আসতে বল। ওদের শান্ত করো জর্জ। জোহানটা গেল কোথায় ? (জর্জ চলে গেল) সেলবিৎস গেল কোথায় ? ওর সৈন্যগুলো কি পাগল হয়ে গেল ?

লার্সে। আপনার লোকের পিঠে গুলি লেগে গেছে। সেলবিৎসের ইসরাইলের বন্য লোকগুলোর মত গালাগালি করছে। ফিরে এস। এর পর আর সেল-বিৎসের মত কোন কাঠের পাওয়ালা লোককে সৈন্য চালনার ভার দিও না।

গোয়েৎস। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে আমার দল সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করো না। তেত্রিশ বছর ধরে আমি সেলবিৎসকে জানি।

লার্সে। যুদ্ধের ব্যাপারে পেশাগত অধিকারটাই বড় কথা। আমি মেরি-গনানোতে একটা গোটা সেনাদলকে চালনা করি।

গোয়েৎস। ঠিক আছে। সেলবিৎস আসছে। সে ফ্রাঙ্কোনিয়ার সবচেয়ে বড় বীর। তোমার চরকায় তেল দাও।

সেলবিৎসের প্রবেশ

সেলবিৎস। আমার লোকজনদের জন্য তোমার ক্ষতি হয়ে গেল গোয়েৎস, এজন্য আমিই দায়ী। ওদের ধরে ধরে চাবুক মারব আমি।

গোয়েৎস। কিছু মনে করো না। ওদের শান্ত করে ফিরিয়ে এনেছি। কোন ক্ষতি হয়নি।

সেলবিৎস। গতকাল ওদের অবশ্য তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু বহু লোক মারা যায়।

লার্সে। পাহাড়ে শত্রুদের অশ্বারোহী আছে। আমরা সংখ্যায় অল্প আছি। এখন কি করব ?

জর্জ। ব্যাস। আরো তিনটে দল দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। তাদের ক্যাপ্টেনকে চিনি। তারা সিকিঞ্জেনের লোক।

সেলবিৎস। হা ভগবান, সিকিঞ্জেন! উনি নিজে আছেন ওদের সঙ্গে?

জর্জ। না।

গোয়েৎস। কি ধরনের সৈনিক ওরা?

জর্জ। ওরা পদাতিক।

সেলবিৎস। আমি শুনেছি ওদের কথা। ওরা সুইজারল্যাণ্ডের লোক। যারা ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদাতিক।

গোয়েৎস। মেরিনানাভোতে ওরা পালিয়ে যায়নি।

লার্সে। ওকথা এখন ভাববেন না। এখন ওরা এসেছে এটাই যথেষ্ট। এখন আমার পরামর্শ শুনুন। সেলবিৎসের দল আরো আগে চলুক। তারপর ঐ সব সুইস পদাতিকরা। তারপর যাব আমরা।

গোয়েৎস। ঠিক আছে তাই হবে। জর্জ, তুমি ওদের বলে দাওগে। জয়ঢাক বাজিয়েদের খবর দাও।

দশম দৃশ্য

সম্রাটসেনাদের শিবির

ক্যাপ্টেন তৃতীয় অফিসারকে দিয়ে একটি চিঠি লেখাচ্ছিলেন

ক্যাপ্টেন। চিঠিটা পাঠাবে সম্রাট আর কমিশনারস্ অব ডয়েট, অগসবার্গ এই নামে। লেখ, ব্যারণ ভন সার বার্লিসিঞ্জেন ও সেলবিৎস এই দুই জন নাইটের বিরুদ্ধে চাপানো অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ পাঠাচ্ছে। আমাদের প্রথম অভিযান ও আক্রমণ ব্যর্থ হয়। পরে শত্রুপক্ষ আবার আক্রমণ করে আমাদের। আমরা সংখ্যায় পাঁচশত ছিলাম মোট। বহু হতাহত হয়। বর্তমানে আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুশতে। শত্রুপক্ষের স্বাধীন নাইট সিকিঞ্জেনের এক পদাতিক সৈন্যদল দেখতে পাই। আরও সৈন্যদল পাঠাবার অপেক্ষায় আছি। এখন থেকে এমন সব লোকের হাতে সৈন্য চালনার ভার দেবেন যারা তার সৈন্যদের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত আছে। নূতন সেনাদল এসে গেলে আমি ভাবছি বার্লি-সিঞ্জেনের প্রাসাদ আক্রমণ ও অবরোধ করব। ওদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার বন্ধু নাইট সেলবিৎস আহত ও মৃতপ্রায়। তার সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। নাও চিঠিটা এই ডাকে পাঠিয়ে দাও। আমার মনে হয়, আমার চাকরি খতম হয়ে গেল।

একাদশ দৃশ্য

আক্সথসেন। গোয়েৎসের প্রাসাদের অন্তর্গত রক্ষীভবন।

সেলবিৎসকে স্ট্রেচারে করে এনে নামানো হলো মেঝের ওপর। মঞ্চের উপর উপস্থিত সৈন্যদের মুখে চোখে ও হাতে পায়ে ক্ষতচিহ্ন ছিল। গোয়েৎস নিজেও ছিল।

গোয়েৎস। সিস্টার, এঁকে আমার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেবে।

সেলবিৎস। না না, আমি এখানেই থাকব। বিছানায় যাব না।

গোয়েৎস। ঠিক আছে, উনি ওখানেই থাকুন। আর সব আহত সৈনিকরা কোথায় ?

জনৈক সৈনিক। তারা নিচেকার ঘরে খড় বিছিয়ে শুয়ে আছে। বলেছি আরো খড় দেব।

গোয়েৎস। ঠিক আছে। মেয়েদের সেবা করতে বল ওদের। আমি নিজে গিয়ে দেখছি।

জর্জের প্রবেশ

জর্জ। আমরা সবাই প্রাসাদে এসে গেছি স্যার।

গোয়েৎস। প্রাসাদের বাইরে ব্রীজগেট বন্ধ করে দাও। পরিখার পাটাতন তুলে দাও। ওরা আমাদের পিছনে আসছে। অবশ্য আমরা কিছু সময় পাব হাঁপ ফেলার। আমরা এখন সংখ্যায় কত আছি গুণে দেখেছ ?

জর্জ। চব্বিশ জন আহত ও অকেজো হয়ে পড়েছে। আমাদের চব্বিশ জন আর সিকিঙ্গেনের আটচল্লিশ জন।

সেলবিৎস। আর আমার কতজন ?

জর্জ। ছয় জন।

সেলবিৎস। হায় ভগবান, মাত্র ছয়। তাও তারা পালিয়ে গেছে।

গোয়েৎস। তারা জানে তুমি মারা গেছ। তারা ভেবেছে তাদের চাকরি শেষ হয়ে গেছে। আমার প্রাসাদ তারা রক্ষা করবে কেন ?

সেলবিৎস। কিন্তু আমি মরিনি।

গোয়েৎস। সিকিঙ্গেন কোথায় ?

জর্জ। তিনি নিচের তলায় তাঁর লোক মিলিয়ে দেখছেন।

গোয়েৎস। একটা আস্ত বোকা। আমি তাকে—লার্সে ফি'রে এসেছে ?

জর্জ। না স্যার। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। তারপর কেউ দেখেনি।

গোয়েৎস। ভেবেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবে। তার মত চালাক ছেলে মরবে না। সে হয়ত এখন সম্রাটের কোন সেনাদলের নেতৃত্ব করছে। একেই বলে পেশাদার সৈনিক। (সিকিঞ্জেনের প্রবেশ) সিল্কের কোট পরে রাজনৈতিক নেতা এলেন। কি করছিলে ওখানে?

এলিজাবেথ ও মেরিয়ার প্রবেশ

এলি। উনি বিয়ের কাজটা সেরে নিচ্ছিলেন। এরপর কখন সময় পাওয়া যাবে ঠিক নেই।

গোয়েৎস। তাই নাকি! তাহলে বিয়ে হয়ে গেছে?

সিকিঞ্জেন। হ্যাঁ হয়ে গেছে। তোমার প্রাসাদ সন্নিহিত চ্যাপেলে গ্রাম্য পুরোহিতকে দিয়ে কাজটা সেরে ফেললাম।

গোয়েৎস। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারতে।

সিকিঞ্জেন। আমি চাইছিলাম শত্রুরা প্রাসাদ অবরোধ না করতে তাকে আমার বাড়ি পাঠিয়ে দেব। তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

গোয়েৎস। কিন্তু বিয়ের চুক্তিপত্র সম্পাদনের কি হলো?

সিকিঞ্জেন। হে ভগবান, এতে অবিশ্বাসের কি আছে। সে চুক্তি পরে করা যেতে পারে। পরে কোন বড় চার্চে ভাল করে বিয়েটা সারা যেতে পারে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে। (সেলবিৎসের কাছে) হ্যালো, কেমন আছ?

সেলবিৎস। আমি এখন কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমার লোক সব চলে গেছে।

সিকিঞ্জেন। তাই নাকি, সব পালিয়ে গেছে?

গোয়েৎস। কিছু লোক ওদের মধ্যে খারাপ।

সিকিঞ্জেন। আমার লোক যারা বেঁচে আছে তারা সব ভাল। কার্যক্ষেত্রে দেখে নেবে।

গোয়েৎস। তুমি এখানে থেকে যাবার মতলব করেছ?

সিকিঞ্জেন। তোমার কি কোন আপত্তি আছে? আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি তোমাকে সাহায্য করব বিপদের সময়।

গোয়েৎস। তার কোন দরকার হবে না। তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাও আধ ঘণ্টার মধ্যে। আমার ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। কার্ল কোথায়?

এলি। সে অসুস্থ। জ্বর হয়ে শয্যাগত হয়ে আছে।

গোয়েৎস। তাহলে ত তাকে পাঠাতে হবেই একটা ঘোড়ায় করে নিয়ে যাও। মেরিয়া তার দেখাশোনা করবে।

মেরিয়া। আমি থাকতে চাই।

গোয়েৎস। না, তোমরা যাও। সিকিঙেন, তোমার লোকদেরও সঙ্গে নিয়ে যাও।

সিকিঙেন। এই বিপদের সময় ওদের ছেড়ে দেবে?

গোয়েৎস। এতগুলো লোককে শুধু শুধু খাওয়াতে আমি পারব না।

সিকিঙেন। ঠিক আছে, এস মেরিয়া। আমরা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

(মেরিয়া সহ প্রস্থান)

গোয়েৎস। বিয়ের দিন মরে স্ত্রীর চোখে জল ফেলার থেকে দু-এক বছর পরে মরা ভাল। কার্লের অসুখ কি খুব বেশী?

এলি। ঠিক বুঝতে পারছি না।

গোয়েৎস। সিকিঙেন বাড়িতে একজন ডাক্তার রাখতে পারে। এ ক্ষমতা ওর আছে।

লার্সে। (দূর থেকে) বার্লিসিঙেন।

গোয়েৎস। কে, লার্সে? ফিরে এসেছ? (জানালা থেকে) লার্সে, পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এস। (সেলবিৎসকে) আমি বলিনি ও আসবে?

সেলবিৎস। আমার কিন্তু ওকে ভাল লাগে না। ছোঁড়াটা মানুষকে সম্মান দিতে জানে না।

গোয়েৎস। এখন তুমি শান্ত হও হাবস। তা না হলে তোমার ক্ষতটা বেড়ে যাবে। নূতনকে অনেক সময় না চাইলেও মানিয়ে নিতে হয়। জল চাই?

সেলবিৎস। না। কাছে এস গোয়েৎস। একটা কথা বলি। সব রাজারাজড়া ও বিশপরা তোমার শত্রু। ওরা সব শহরের লোক। তোমাকে বেশী দিন বাঁচতে দেবে না।

গোয়েৎস। আমি তা জানি।

সেলবিৎস। না না, ওরা গোটা দুনিয়াটাকে দখল করতে চায়। সব ওলট পালট করে দিতে চায়। (লার্সের প্রবেশ) ওর মুখটা কুসুমের মত। ওকে আমি দেখতে পারি না। সহ্য করতে পারি না। (মৃত্যু)

লার্সে। উনি মারা গেলেন?

এলি। উনি মারা গেলেন। তুমি কি করে জানলে?

লার্সে। কারণ আমি কোথায় যাচ্ছি তা ভাল ভাবে দেখি। দেখি আমার পিছনে কে আসছে। কিন্তু ওর আঘাতটা যে এত বেশী তা জানতাম না।

গোয়েৎস। ওদের আসতে আর কত দেরি ?

লার্সে। প্রায় এসে গেছে। আমি নদী পার হতে দেখেছি।

গোয়েৎস। কামান আছে ওদের সঙ্গে ?

লার্সে। না নেই। তবে আমার মনে হলো ওরা দুশোর বেশী। পরে আরো আসতে পারে।

গোয়েৎস। তবু ভাল। জানি না দেওয়ালগুলো কত মজবুত। আমাদের বোধ হয় পিছনের দিকে উপত্যকার ভিতরে চলে যেতে হতে পারে।

লার্সে। এখন থেকে যতক্ষণ পারা যায় ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাক। যতদূর সম্ভব ওদের উপর আঘাত হানা যায় ততই ভাল। (বাইরে, রণদুন্দুভি) শুনছ ? তারা প্রথমতঃ যুদ্ধের আইন মত শুরু করতে চায়। জানালা দিয়ে কিছু বলতে হবে।

গোয়েৎস। ওরা কি বলে আমরা তা শুনব। (জানালা খুলল) বার্লিসিঙেন এর সদর দরজার সামনে কে জয়ঢাক বাজাচ্ছে ? চলে যাও এখান থেকে। হাতে শমন আর সাদা পতাকা নিয়ে এসেছ কি। কি বলতে চাও, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ ? একমাত্র সম্রাট নিজে যদি আসেন তবে আমি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করব। এছাড়া আর কারো কথা শুনব না। (জানালা বন্ধ করে দিতেই বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল) এবার শুরু হলো।

দ্বাদশ দৃশ্য

জাক্সথসেন। গোয়েৎসএর প্রাসাদের অন্তর্গত রান্নাঘর। এলিজাবেথ রান্না করছিল। গোয়েৎসের প্রবেশ

এলি। যা খাবার আছে তাতে তিন দিন চলবে। টানাটানি করলে এক সপ্তা। বড় জোর দুসপ্তা। তারপর ঘোড়ার মাংস খেতে হবে। তারপর ?

গোয়েৎস। ইঁদুর ধরে খেতে হবে আর চামড়ার জুতো সিদ্ধ করতে হবে।

এলি। রোজ কত লোক আহত হচ্ছে। তাদের নিয়ে কি করবে ?

গোয়েৎস। আমি প্রচুর শস্য ও গবাদি পশু ধরে আনতে পারতাম। কিন্তু আনিনি, কারণ চাষাদের উপর নির্ভর করেছিলাম। ভেবেছিলাম তারা আমাদের রসদ সরবরাহ করবে। কিন্তু কেন করল না কে জানে।

এলি। তারা সব কিছু বাঁচিয়ে নিয়ে বসে আছে।

গোয়েৎস। কিন্তু আমি কতবার রক্ষা করেছি। আমাদের লোক কম। আমি লার্সেকে বলেছি আমাদের কামান ছুটো দাগতে। (একটা কামানের শব্দ) একটা হলো। আর কিছুক্ষণ যদি লড়াই করতে পারি তাহলে কিন্তু সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করতে পারব। বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ। ভাবতেই পারা যায় না।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। আমাদের কামানের গোলা বা বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গেছে। লার্সে কামানে গরম জলন্ত কয়লা ভরতে বলেছে।

বুলেটের ছাঁচে সীসে ঢালতে ঢালতে লার্সে প্রবেশ করল

লার্সে। আমার বাবা মা আমাকে কিছু লেখা পড়া শিখিয়েছিল। কিছু টাকাও দিয়ে দিয়েছিল। তাতে ভালভাবেই চলতে পারতাম। কিন্তু মন সেদিকে গেল না। কিন্তু তার বদলে আমি মৃত্যুর জন্য ফাঁদ তৈরি করছি। বার্লিসিঙেন, তুমি দার্শনিক হলে কি এর থেকে কিছু নীতিকথা খুঁজে পেতে?

এলিজাবেথ পাত্রে সুপ ঢালতে শুরু করল

গোয়েৎস। জর্জ, এটা সবাইকে ভাগ করে দাও। আমি ভাবছি ওরা হঠাৎ চুপ হয়ে গেল কেন?

জর্জ। আমি দেখলাম, ওরা ওদের শিবিরে চিৎকার করছে। ওরা বন্দুক আনছে। গোয়েৎস, আমি জানতাম ওরা তা আনবে। আমাদের এই দেওয়ালগুলো গোলা গুলি সহ্য করতে পারবে?

এলি। তুমি সন্ধি করতে পারতে।

গোয়েৎস। তুমি কি বল লার্সে?

লার্সে। আমরা অনেক করেছি। এবার সম্মানের সঙ্গে সন্ধির বিষয় আলোচনা করতে পারি। ওরা আমাদের ক্ষয়ক্ষতি বা লোকসংখ্যা জানে না। বাড়ির অবস্থা জানে না। আপনি চাইলে আমি গিয়ে সন্ধির কথা বলতে পারি।

গোয়েৎস। এলিজাবেথ কি বল?

এলি। এখন না করলে পরে কোন সুযোগই পাবে না।

গোয়েৎস। চলে যাও লার্সে। তবে মনে রেখো, কোন অপমানজনক শর্ত আমি সহ্য করব না। জোরের সঙ্গে বলবে। কোন দুর্বলতা দেখাবে না। লার্সে। বুকে ক্রস আঁকো আর প্রার্থনা করো। (সুপটা গিলেই চলে গেল লার্সে)

গোয়েৎস। ওরা যখন কথা বলছে সেই ফাঁকে তখন আমরা একটু পান ভোজন

সেরে ফেলতে পারি। (তাক থেকে একটা বোতল নিয়ে) আর মদ নেই ?
এলি। আর একটা বোতল তোমার ও আমার জন্য রেখেছি।
গোয়েৎস। না, তা নিয়ে এস সকলের জন্য।

সৈনিকদের প্রবেশ

এস তোমরা বসে পড়। পান ও ভোজনে অংশগ্রহণ কর সকলে। তোমরা সবাই সম্রাটের স্বাস্থ্য কামনা করো। তিনি আমাদের প্রভু এবং আমরা তাঁর ভৃত্য। তবু কেন যুদ্ধ করি বা করছি তা জানতে চেও না। এই শেষ মদ। খেয়ে নাও। আর তোমরা বাঁচবে না। বাঁচতে দেবে না ওরা। যত সব রাজা আর শহরের অভিজাত লোক। ওরা জীবনের সব ছন্দ নষ্ট করেছে। তাই আমরা লড়াই করি। রাজা রাজরারা মানুষকে জোর করে পরাধীন রেখে শাসন করতে চায়।
১ম সৈনিক। সেলবিৎস একটা গান লিখে যায় মরবার আগে।
গোয়েৎস। (গানটা পড়ে) এ গানের মর্ম হলো এই যে, জনগণের আস্থা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। নাইটরা স্বাধীন। তাদের স্বাধীনতা কোন শক্তি কেড়ে নিতে পারে না। সে অধিকার কারো নেই। একমাত্র শয়তানরাই সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চায়।

লার্সের প্রবেশ

লার্সে। আমি কথা বলেছি। সম্মানজনক শর্তেই সন্ধির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হবে। প্রাসাদ ছাড়লেই আমরা স্বাধীন। খাদ্যদ্রব্য যা আছে প্রাসাদে তা ওরা ভোগ করবে। আসবাবপত্রও সব ঠিক থাকবে।
গোয়েৎস। দামী বাসনপত্রগুলো অন্ধকার কুটরিতে পুঁতে রাখ। হাত বন্দুক-গুলো সব নিয়ে নাও। আমি আমার সৈনিকদের সব মুক্তি দিচ্ছি।
সৈন্যগণ। আমরা চিরদিনের জন্য আপনার লোক। লৌহহস্ত বার্লিসিঞ্জেনের লোক।
গোয়েৎস। লৌহহস্ত ! সম্রাট দীর্ঘজীবী হোক।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অগসবার্গ। ওয়েসলিঞ্জেনের বাসভবন।

ওয়েসলিঞ্জেন, এ্যাডেলহেলড, মার্গারেট, ফ্রাংস ও অনুচরবর্গ

এ্যাডেল। তুমি আমার বিশ্বস্ত স্বামী। তুমি ল্যাণ্ডগ্রেভকে পরাস্ত করে

আমার সম্পত্তি উদ্ধার করেছ।

ওয়েস। আমি কি আর এমন করেছি।

এ্যাডেল। অনেক করেছ। আমি নিজে লজ্জাবোধ করছি। আচ্ছা যে স্থপতি আমাদের বাড়িটা নির্মাণ করেছে তার সঙ্গে কথা বলেছ? আমার কিন্তু একটা আস্ত ঝর্ণা চাই বাগানবাড়িতে। বারান্দায় বা ছাদে বেড়াতে বেড়াতে আমি তার গান শুনব।

ওয়েস। দেখ, আমি এই সাম্রাজ্যের প্রশাসন বিভাগে এক দায়িত্বপূর্ণ পদ পেয়েছি। আমার অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। ইতালির কোন স্থপতি কি করে তোমার বাড়ি করবে তা দেখার মত আমার সময় নেই। আমি কখন বসে বাগানবাড়িতে ঝর্ণার গান শুনব? বার্লিসিঞ্জেনের খবর শুনেছ?

এ্যাডেল। ভন সারে তার প্রাসাদ দখল করে বসে আছে আর বার্লিসিঞ্জেন ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওয়েস। তোমাদের মত মাথা-মোটা মেয়েদের কথা শুনে কাজ করলেই ত হয়েছে। শোন, হেলব্রম শহরে বার্লিসিঞ্জেন বন্দী হয়েছে। ভন সারে যা করেছে আমার নির্দেশক্রমেই করেছে। তার বিচার হবে সম্রাটের কমিশনের কাছে। তোমরা জাহান্নামে যেতে পার। আমি কোন দামী গণিকালয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ মনটাকে শান্ত করিগে। দুঃখের বিষয় বাড়িতে এ শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা দুজনে আমার মনটাকে বিষিয়ে তুলেছ। তোমরা কিছুতেই অল্পে সন্তুষ্ট নও। (প্রস্থান)

চতুর্দশ দৃশ্য

হেলব্রম। পান্থশালার একটি কক্ষ।

গোয়েৎস অশান্তভাবে পায়চারি করছিল

গোয়েৎস। বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে আমাকে বন্দী করে আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করা হচ্ছে।

এলিজাবেথের প্রবেশ

এলি। কোন খবর নেই। তোমার কিছু লোককে ওরা মেরেছে। কিছু লোককে বন্দী করেছে। কিন্তু কোথায় তাদের রেখেছে তা কেউ জানে না।

গোয়েৎস। আমাদের লোকরা কোথায়? সিকিঞ্জেন কোথায়?

এলি। সিকিঞ্জেন এখন তার বাড়িতে আরামে আছে। তাকে নিয়ে আমাদের কোন কাজ হবে না। কোন উপকারে লাগবে না সে। সে এখন

সম্রাটের সুনজরে পড়ে, অনেক উপরে উঠে গেছে। এখন তোমার পানে তাকালে সে নিজে পড়ে যাবে।

জনৈক সার্জেন্টের প্রবেশ

সার্জেন্ট। রাজকমিশন পরিষদভবনে আপনাকে ডাকছে।

গোয়েৎস। যাচ্ছি।

সার্জেন্ট। আপনার স্ত্রীকে রেখে যাবেন। তবে আপনি ইচ্ছা করলে তরবারি সঙ্গে নিতে পারেন।

গোয়েৎস। তুমি আমায় যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছ। (প্রস্থান সার্জেন্টসহ)

হেলব্রম। পরিষদভবনের একটি প্রশস্ত কক্ষ

কমিশনার ও অফিসারগণ

১ম কমিশনার। আমি চাই কিছু সৈন্য আদালত প্রাঙ্গণে প্রহরারত অবস্থায় থেকে শান্তি রক্ষা করুক।

সশস্ত্র সার্জেন্টের প্রবেশ

সার্জেন্ট। স্যার, গোয়েৎস ভন বার্লিসিঙ্গেন বাইরে অপেক্ষা করছেন।

১ম কমি। তাঁকে নিয়ে এস।

সার্জেন্ট। আপনি আসুন।

গোয়েৎসের প্রবেশ

গোয়েৎস। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। আপনারা কি করতে চান আমাকে নিয়ে?

১ম কমি। ইচ্ছা করলে বসতে পারেন।

গোয়েৎস। আপনার পায়ের কাছে বসার থেকে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল।

২য় কমি। এখন আদালতের কাজকর্ম সেরে ফেলা যাক।

১ম কমি। শুনুন গোয়েৎস, আপনার ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ আমাদের ন্যায়বিচার আর সম্রাটের করুণার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু আপনার বংশপরিচয়ের কথা বিবেচনা করে সম্রাট আপনাকে তরবারি ধারণের অনুমতি দান করেছেন এবং আপনাকে সাধারণ কারাগারে না রেখে একটা পান্থশালায় পৃথকভাবে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

গোয়েৎস। বিশেষ ধন্যবাদ সেজন্য।

১ম কমি। সম্রাট আপনাকে আরও অনুগ্রহ দান করেছেন। তিনি আপনাকে

আপনার অপরাধ মার্জনা করতে ও মুক্তি দিতে রাজী আছেন যদি আপনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর দান গ্রহণ করেন।

গোয়েৎস। আমি সব সময় সম্রাটের অনুগত প্রজা ছিলাম।

১ম কমি। তাহলে একটা স্বীকারোক্তিতে আপনার স্বাক্ষর দিতে হবে। (এইটা পড়ুন)

গোয়েৎস। (পড়ে দেখতে লাগল) আমি গোয়েৎস ভন বার্লিসিঙেন প্রকাশ্যে স্বীকার করছি যে আমি সম্রাটের বিরুদ্ধে চরম অপরাধে অপরাধী। প্রথমতঃ তাঁর বৈধ অধিকারের ক্ষেত্র লঙ্ঘন করে তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের অবতারণা করি।

গোয়েৎস। সম্পূর্ণ মিথ্যা।

১ম কমি। গোটাটা পড়ুন।

কেরাণী। দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের সমন পাবার পর আমি—

গোয়েৎস। আমি বলেছি প্রথমেই মিথ্যা রয়েছে। সবাই জানে আমি অস্ট্রিয়ার সম্রাটের প্রতি কত অনুগত। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এতে স্বাক্ষর দান করলে আমার সমগ্র জীবন হয়ে উঠবে মিথ্যা।

কমি। এটাই হলো আদেশ। আপনি যদি সই না করেন তাহলে আপনাকে কোন দুর্গে অন্ধকার কারাকক্ষে পাঠানো হবে।

গোয়েৎস। কিন্তু আমি একজন স্বাধীন নাইট, সম্রাটের জ্ঞাতিভাই। আমি রাজকুমারদের মত তোষামোদকারী নই। (তরবারি ধরে)

১ম কমি। আপনি কি সম্রাটের মুখের উপর তরবারি ধরে কথা বলবেন?

গোয়েৎস। না, আপনার মুখের উপর।

১ম কমি। এই যে কে আছ ওঁকে নিয়ে যাও।

জনৈক অফিসারের প্রবেশ

অফিসার। স্যার, কি সব ঘটছে? দুশো জন সৈনিক নিয়ে লর্ড সিকিঙেন আসছে এদিকে।

সিকিঙেনের প্রবেশ

সিকি। নমস্কার, লর্ড কমিশনারগণ, আমি এই ভদ্রলোককে জামীনে মুক্তি দান করার জন্য এখানে এসেছি।

১ম কমি। কি ধরনের জামীন?

সিকি। আমাদের জীবন, সম্পত্তি, নারীদের সতীত্ব সব কিছুর বিনিময়ে এই

জামীন নিতে চাই। তাছাড়া আমার দুশো সৈন্য আছে। তারা একটু আগেও সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করেছে এবং একটা নগর জয় করেছে।

১ম কমি। ঠিক আছে। আপনি জামীনে ওঁকে নিয়ে যেতে পারেন।

সিকিঙেন। ভিড় সরিয়ে দাও।

ভিড় ঠেলে এলিজাবেথের প্রবেশ

গোয়েৎস। এলিজাবেথ—আমি ভেবেছিলাম সিকিঙেন প্যালেটাইনে আছে।

সিকি। আমি তোমার লোকজনদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছি। তাদের অনেকেই বেঁচে আছে। সম্রাট আমার এখনো বন্ধু আছেন।

গোয়েৎস। তিনি তোমার বন্ধু ছিলেন?

সিকি। ওয়েসলিঙেন ও আমার মধ্যে এখন তিনি আমাকেই পছন্দ করেন বেশী। আশা করি তোমার জন্য মার্জনা চেয়ে নিতে পারব। তুমি জাক্স-থসেনে চলে যাও।

গোয়েৎস। কিন্তু তিনি ত জাক্সথসেন দখল করে নিয়েছেন।

সিকি। সেখানে কোন সেনানিবাস করা হয়নি। কেউ তোমার বাধা দেবে না।

গোয়েৎস। আমার ছেলে কেমন আছে?

সিকি। এখনো সেরে ওঠেনি, তবে ভাল হয়ে যাবে।

গোয়েৎস। (এলিজাবেথকে) কি করবে, বাড়ি যাবে?

সিকি। তুমি আমার সঙ্গে প্যালেটাইন অভিযানে যেতে পার।

গোয়েৎস। কারো অধীনে কাজ করার বয়স আর আমার নেই। তোমার জয় কামনা করি।

সিকি। তুমি কি ক্লান্ত? আমার উপর ভর দাও। বাড়ি যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (গোয়েৎস ও এলিজাবেথসহ প্রস্থান)

ষোড়শ দৃশ্য

জাক্সথসেন। গোয়েৎসের প্রাসাদের একটি কক্ষ। সন্ধ্যাকাল।

বাতির আলোয় গোয়েৎস বসে লিখছিল এবং এলিজাবেথ সেলাই করছিল

গোয়েৎস। শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। লেখার জন্য একটা লোক নিযুক্ত করলে ভাল হত।

এলি। তার মাইনে দিতে পারবে?

গোয়েৎস। এমন একদিন ছিল যখন আমি একশোজন অশ্বারোহীর মাইনে

দিয়েছি এবং ঘোড়াগুলোকেও ভালভাবে পুষেছি।

এলি। নিন্দা, অপবাদ, গোপন শত্রুতা প্রভৃতির দ্বারা তারাই তোমার সর্বনাশ করেছে। বইটা শেষ করো। কালিতে লেখা এই সত্যই তোমার নামকে অমর করে রাখবে।

গোয়েৎস। আমার উপর সম্রাটের আর সুনজর নেই। তিনি আমার লেখা পড়বেন না।

এলি। তিনি ঠিক পড়বেন। কাগজে লেখা কালো সত্য তীরের মত তাঁর অন্তরে গিয়ে বিঁধবে। তিনি তোমাকে রাজদরবারে ডাকবেন। ওয়েসলিঙে-নের গলায় দড়ি দিয়ে তোমাকেই তার পদে ভূষিত করবেন। তোমার গৌরবে স্ত্রী হিসাবে আমিও গৌরবান্বিত হব। আজ কিছু লিখেছ?

গোয়েৎস। কিছু লিখেছি। লিখেছি আমার কারাবাসের কথা। (পড়ল)

এলি। তোমার লোহার হাতটা আত্মার মধ্যেও ঢুকে গেছে। সেটাও লোহা হয়ে গেছে। জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা কিভাবে নিজের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হয় তা তুমি জান না। বাড়িঘর সব খুইয়ে স্ত্রীকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ।

গোয়েৎস। এলিজাবেথ—

এলি। কার্ল, তোমার একমাত্র পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। যে তোমার পাশে দাঁড়াত বিপদে আপদে। তোমার পতাকা বহন করত। সে আজ পরের বাড়িতে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন যাপন করছে। আজ আমাদের বাড়িতে বাস করতে হচ্ছে ভাড়া দিয়ে।

জর্জ ও লার্সের শিকারীবেশে প্রবেশ

গোয়েৎস। শিকার কিছু পেলে?

লার্সে। এমন কিছু না। কি করে পাব, খোঁড়া মানুষ চলতে পারি না ভাল করে।

জর্জ। আর একবার যাব?

গোয়েৎস। আমার এ বাড়িতে থাকা নির্ভর করছে আমার সদাচারণের উপর। বেশী বাড়াবাড়ি করো না। তাহলে বাড়ি ছাড়তে হবে।

লার্সে। আকাশে ধূমকেতু দেখা যাচ্ছে।

গোয়েৎস। কি খবর শুনলে?

লার্সে। আজ আট হলো! এর মানে সম্রাটের মৃত্যু অবধারিত।

গোয়েৎস। সেকি ? তিনি কি অসুস্থ ?

সার্সে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং অবস্থা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে।

গোয়েৎস। তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে তা জান ?

সার্সে। যুবরাজ কার্ল।

গোয়েৎস। তার বয়স মাত্র সতের। ওদের মতে চলবে। আমার লেখা পড়বে না।

সার্সে। সোয়াবিয়ার খবর খুব খারাপ। ওখানকার চাষীরা বিদ্রোহ করেছে।

গোয়েৎস। কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ?

সার্সে। আইনের সংশোধন নাকি ওদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। দেশের প্রচলিত আইন, প্রথা, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ওরা। ওরা বলছে জার্মানির সব লোককে ওরা খুন করবে। ওদের পতাকায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবি আর তার উপর একটা বুট জুতো। ওরা চায় ন্যায় বিচার যা ঈশ্বরের বিধান।

গোয়েৎস। জার্মানির সব লোককে মেরে কি করে ওরা ন্যায় বিচার বা ঐশ্বরিক বিধান আশা করতে পারে ? ওরা একদিন আমার কথা শুনত। আমি ওদের বুঝিয়ে বলে দেখতে পারি।

এলি। আমি আকাশে ধূমকেতুর দুধারে দুটো জ্বলন্ত তরবারি দেখেছি। ঈশ্বরের অভিশাপ।

প্রথম দৃশ্য

কৃষকযুদ্ধ। একটি গ্রাম। লুণ্ঠন ও গোলমাল। মঞ্চে ভীত সন্ত্রস্ত জনতার ভিড়।

কয়েকজন সশস্ত্র কৃষকসহ স্লেভার্সের প্রবেশ

স্লেভার্স। ঠিক আছে, এগিয়ে চল। যা কিছু আছে সব পুড়িয়ে ফেল। কেউ বাধা দিতে এলে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে। তার গলা কেটে দেবে।

রক্তাক্ত বর্শাহাতে মেৎস্লারের প্রবেশ

মেৎস্লার। কেমন চলছে ভাই ?

স্লেভার্স। ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। শহরের শেষ হালটা দেখ। এতদিন কোথায় ছিলে ? কি করছিলে ?

মেৎস্লার। ছিলাম উইলেমবার্গে। আমার এই বর্শার ফলাটা পঁয়ত্রিশটা লোকের দেহের মধ্যে ঢুকেছে। এখন সোয়াবিয়ায় পাঁচশো ভদ্রলোকের বাড়ি আছে। সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

স্লেভার্স। এগিয়ে চল। পতাকা উঁচু করে তুলে ধর।

মেৎস্লার। পশ্চিম দিকের পথ ধরে চল। হেলব্রন শহরে কোন সৈনিক নেই। আকাশে ধূমকেতু দেখেছ?

স্লেভার্স। রোজই ত দেখছি। দেখে মনে হয় একটা তরবারি ধরে রয়েছে আর সেই তরবারির হাতলের উপর তিনটে তারকা খচিত আছে। অথবা মনে হয় বিজয়গৌরবে এগিয়ে চলেছে একটা বর্শা কালো মেঘ ভেদ করে।

মেৎস্লার। জয় আমাদের অনিবার্য।

স্লেভার্স। জয় কি তা বুঝি না।

মেৎস্লার। মনে করতো হেলব্রন শহরটা যদি দখল করি। তাহলে সেটা শাসন করতে হবে ত।

স্লেভার্স। লোকে বলছে আমাদের ক্যাপ্টেন বাছাই করতে হবে যে আমাদের কথাটা সম্রাটকে বোঝাতে পারবে। আমি বলি একজন স্বাধীন নাইট হলে ভাল হয়। ধর লৌহহস্ত গোয়েৎস।

মেৎস্লার। হ্যাঁ, উনিই সেই নাইট। (সকলের প্রস্থান)

অগসবার্গ। ওয়েসলিঙ্গেনের বাসভবন।

ওয়েসলিঙ্গেন ও এ্যাডেলহেলডের প্রবেশ

ওয়েস। লোকটা মরতে মরতে মরছে না। ওদিকে সোয়াবিয়ার অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। অথচ দুর্যোগঘন আবহাওয়া আর জল-প্লাবিত পথঘাটের জন্য আমরা সৈন্য পাঠাতে পারছি না। এরকম ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ কখনো দেখিনি। এতত্তেও সম্রাটের মন মাঝে মাঝে সিকিঙ্গেনের প্রতি বা বার্লিসিঙ্গেনের প্রতি টলে।

এ্যাডেল। সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ানের মৃত্যুর কি কোন আশা নেই?

ওয়েস। মরবেন, তবে খবর নিচ্ছেন। তাঁর চিন্তা শুধু তুর্কীদের শক্তিবৃদ্ধি। আমি বলি তারা নাস্তিক হলেও তাদের মধ্যে একজাতীয় শৃংখলা আছে। তাদের সাম্রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত। অথচ আমাদের জাতি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হলেও তাদের বিশ্বাস অটল বা অবিচল নয়। ওরা এখনো ডাকে ঈশ্বরকে। ক্রুশের উপর

দাঁড়িয়ে ছিল তারা এখনো। শাস্তি পায়নি। ওরা হচ্ছে সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দল।

এ্যাডেল। সম্রাট যখন মরে মরবে। যুবরাজ কার্ল হচ্ছেন ভাবী সম্রাট। তুমি তার দিকে নজর দাও। সম্রাটের শয্যাপাশে বেশী সময় দিও না।

ওয়েস। সে ভারটা আমি তোমাকেই দিলাম। তুমিই সেটা ভাল পারবে। তুমি কি তার পাশে কখনো শোওনি?

এ্যাডেল। মোটেই না।

ওয়েস। তাহলে আমি কমিশনে গেলাম কি করে?

এ্যাডেল। অবশ্য তাকে তোমার কথা বলেছিলাম।

ওয়েস। আমি কারো মতে চলতে রাজি নই। আমার নীতি নিজের জোরেই চলবে। তোমাকে আমার গ্রামের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেব। তোমাকে নিয়ে আমার কোন কাজ হবে না।

এ্যাডেল। সোয়ারিয়ার কৃষকরা ন্যায়বিচারের দাবিতে বিদ্রোহ করেছে। তাদের কাছে গিয়ে তার ব্যবস্থা করোগে।

ওয়েস। তুমি আমার স্ত্রী; আমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করলে তোমাকেও শাস্তি পেতে হবে। (প্রস্থান)

অন্য দরজা দিয়ে ফ্রাঁৎসের প্রবেশ

এ্যাডেল। কই যুবরাজ কার্লের চিঠি এনেছ? (ফ্রাঁৎস চিঠি দিলে তা পড়ে দেখল) চমৎকার, এরই মধ্যে প্রেমের সব নিয়ম কানুন জেনে ফেলেছে।

এ্যাডেল। আমি এই সব চিঠি নিয়ে যাওয়া আসা করি। তুমি আমার ও তোমার স্বামীর অন্তরে আঘাত দিয়েছ।

এ্যাডেল। তুমি ব্যাম্বার্গের প্রাসাদে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। তোমার জানা উচিত, রাজদরবার বা প্রাসাদের নারীরা এইভাবেই ভাগ্য ভাঙা গড়ার কাজে এগিয়ে চলে।

ফ্রাঁৎস। এতে কিন্তু তুমি তোমার স্বামীকে ঠকাচ্ছ আর আমাকেও ঠকাচ্ছ। যুবরাজ কার্ল আমার থেকে বড় নয়, আমার থেকে কোন অংশে ভাল বা যোগ্য নয়।

এ্যাডেল। (ফ্রাঁৎসকে কাছে টেনে) ক্ষমা করো ফ্রাঁৎস। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। তবে এখন যাও, একটু পরে তুমি যা চাইবে দেব।

ওয়েসলিঞ্জেনের পুনঃ প্রবেশ

ওয়েস। (ফ্রাঁৎসকে) আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে অভিযান শুরু করেছি। তুই অগসবার্গে থাকবি। সম্রাটের মৃত্যু এবং নূতন সম্রাটের নির্বাচনের খবরটা কামানের গোলার মত ছুটে গিয়ে আমাকে দিবি। (প্রস্থান)

উন্মুক্ত প্রান্তর। দূরে জলন্ত দুটি গ্রাম ও একটি আশ্রম দেখা যাচ্ছে। মেৎস্লার, স্লেভার্স, কোয়েল ও কয়েকজন বিক্ষুব্ধ কৃষকের প্রবেশ। কয়েকজন কৃষক হাতবাঁধা অবস্থায় গোয়েৎস, লার্সে ও জর্জকে মঞ্চের উপর নিয়ে এল।

গোয়েৎস। তোমরা কি চাও? কি বলছ?

স্লেভার্স। তুমি লৌহহস্ত গোয়েৎস না? ওকে এখানে নিয়ে এস।

গোয়েৎস। আমাকে লোকে তাই বলে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন। ওদের হাতের বাঁধন খুলে দাও।

স্লেভার্স। তুমি কি জান কিসের জন্য আমরা লড়াই করছি? আমি বলছি, আমরা জার্মানির এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এমন আইন ওরা পাশ করল যাতে আমাদের মত গরীবদের জমি অন্য কোন ধনী বড়লোক বা সামন্তরা কেড়ে নেয়। তুমি আমাদের ক্যাপ্টেন হবে? আমরা খৃস্টের স্বর্গরাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাই আমাদের দেশে।

গোয়েৎস। আমি? কিন্তু মনে রেখো, এই ব্যাপক নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা খৃস্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কোয়েল। তোমরা যেমন একদিন ওয়াগান লুট করতে আজ আমরাও তেমনি আমাদের অধিকার আদায় করার জন্য লড়াই করছি।

স্লেভার্স। মনে করো লড়াই আমরা বন্ধ করলাম। কিন্তু আমাদের কথাটা ত সম্রাটকে জানাতে হবে। তাঁকে তাঁর মুখের উপর বলতে হবে আমরা কোন রাজাকে মানব না। আমরা স্বাধীনভাবে বাস করতে চাই।

গোয়েৎস। কিন্তু আমার দু'খানা প্রাসাদ ওরা দখল করে নিয়েছে। আমি এখন সম্রাটের হাতে বন্দী।

স্লেভার্স। (অট্টহাসি হেসে) কিন্তু তোমার প্রাসাদ কাদের দখলে তা দেখ।

গোয়েৎস। তার মানে?

স্লেভার্স। তোমার যে প্রাসাদে তোমার স্ত্রী বাস করছে সে প্রাসাদ আমাদের

লোকরা ঘিরে আছে। এইবার কি করবে তা বেছে নাও।

গোয়েৎস। কিন্তু খুনোখুনি বন্ধ করতে হবে। তোমরা যদি স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চাও তাহলে স্বাধীন মানুষের মত ভদ্র আচরণ করতে হবে। একমাত্র সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া কোন মানুষকে হত্যা করা ঠিক না।

স্লেভার্স। ঠিক আছে। তোমার হাত দাও। আমরা ভাই ভাই। তোমার কথা মেনে নেব। ওদের হাতের বাঁধন খুলে দাও।

অরণ্য অঞ্চল। কোন এক অগ্নিদগ্ধ কবরখানা। ওয়েসলিঙেন ও জনৈক অফিসার সম্রাটের ব্যাজ পরেছিল।

ওয়েস। শত শত লোক সারা দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথে ঘাটে পাহাড়ে উপত্যকায় সর্বত্র তারা ছুটে বেড়াচ্ছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করলে আমরা পেরে উঠব না তাদের সঙ্গে। একের পর এক শহর তারা পুড়িয়ে ফেলেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ ছয় শত লোক নিহত হয়েছে। এরপর কোন শহরে গিয়ে দেখব তা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

অফিসার। তাদের বাধা না দিলে সব শহরই ত তারা পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

ওয়েস। আরো সেনাবাহিনী না এলে আমরা কি করে তাদের বাধা দেব? বাকীরা জয়ের জন্য প্রাণপণে লড়াই করছে। এভাবে খণ্ডযুদ্ধ করে আমাদের কোন লাভ হবে না। সর্বাত্মক যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করতে না পারলে আমাদের সব রাষ্ট্র ও সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে।

অফিসার। শুনেছি তারা নাকি অনেক নাইট ও সামন্তদের তাদের সেনানায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছে।

ওয়েস। তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে তারা ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের পক্ষে আশা ও উৎসাহের কথা। ওরা এরপর মিলটেনবার্গ হয়ে হেলব্রম পাহাড়ে যাবে। মিলটেনবার্গেই ওদের বাধা দিতে হবে। সেখানেই ওদের আক্রমণ করতে হবে। কই ফ্রাঁৎস?

ফ্রাঁৎসের প্রবেশ

ফ্রাঁৎস। স্যার, স্যার সম্রাট—

ওয়েস। এখন কার্ল কি সম্রাট হয়েছে?

ফ্রাঁৎস। নির্বাচকরা সর্বসম্মতিক্রমে কার্লকে সম্রাট নির্বাচিত করেছে।

ম্যাক্সমিলিয়ান এক সপ্তা হয় মারা গেছেন। কিন্তু পথের নদীগুলো বানের জলে প্লাবিত হওয়ার সময়ে আসতে পারিনি।

ওয়েস। তা জানি। এই মাসের শেষে তাহলে আমি আমার প্রয়োজনে সব সৈন্য নিয়ে যাব।

অফিসার। নূতন সম্রাট নীতির দিক থেকে কি আগেকার সম্রাটের মতই নমনীয় হবেন ?

ওয়েস। না না। শোন ফ্রাঁৎস, সম্রাট আমাকে কমিশনে নিযুক্ত করলে তার বিনিময়ে নিশ্চয় তাঁর জন্য কিছু করতে হবে। তুমি অগসবার্গে গিয়ে এই চিঠিটা আমার স্ত্রীকে দেবে। তারপর তিনি আমার কথামত কাজ করলে সেটা আমায় এসে বলে যাবে। তোমার হয়তো কষ্ট হবে। কিন্তু কোন উপায় নেই।

ফ্রাঁৎস। এটা আমার কর্তব্য স্যার।

ওয়েস। তোমার টাকা পয়সা আছে ত সঙ্গে ? এই নাও কিছু। (টাকা দিল)

ফ্রাঁৎস। বিদায় স্যার। (প্রস্থান)

ওয়েস। এখন মিলটেনবার্গের মানচিত্রটা দেখ।

পঞ্চম দৃশ্য

মিলটেনবার্গের সন্নিকটস্থ এক পাহাড়। কৃষকদের সৈন্য শিবির। একটি পতাকা উড়ছিল। গোয়েৎস, লার্সে ও জর্জ মঞ্চের উপর ছিল। এক স্তোত্রগান শোনা যাচ্ছিল।

লার্সে। চারিদিকে হত্যাকাণ্ডের মাঝে যখন স্তোত্রগান শুনি তখন মনটা যেন কেমন কেমন করে। কেমন যেন কেঁপে ওঠে বুকটা। যখন আসল যুদ্ধ হবে তখন কি যে হবে তাই ভাবছি।

গোয়েৎস। সৈনিক হিসাবে তোমার কোন যোগ্যতা নেই।

লার্সে। কি করে যোগ্য হব ? আমার হাতটা দেখ। একদিন সেলবিৎসকে তার অযোগ্যতার জন্য দোষ দিতাম। আজ তুমি আমাকে দোষ দিতে পার।

গোয়েৎস। না না, দোষ দিয়ে লাভ নেই লার্সে। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তোমার নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ। তুমি আমার প্রাসাদে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললেই সে তোমার বেতন দিয়ে দেবে। আমার এখন কাজ হলো সম্রাটের কাছে গিয়ে ওদের কথা বুঝিয়ে বলা। আমার নিজের কথাটাও বলব।

জর্জ। আসল যুদ্ধ শুরু হলে আমরা জিতব ত ?

গোয়েৎস। নিশ্চয়, কেন জিতব না ?

জর্জ। যখন আমি প্রথম চাকরিতে ঢুকি তখন ভেবেছিলাম আপনার ঘোড়ার বাগাল হব। তারপর ভেবেছিলাম আপনার ভৃত্য হব। তারপর সৈনিক, তারপর ভেবেছিলাম নিজেই হব এক স্বাধীন নাইট।

গোয়েৎস। আমিও তাই ভেবেছিলাম জর্জ। আমার ছেলের যখন জন্ম হয়, তখন তার উপর অনেক আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। তখন আমার দৃষ্টি পড়ে তোমার উপর। সব মানুষই চায় তার মৃত্যুর পর যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে যেতে।

জর্জ। আপনি কি এই চাষীদের উপর আস্থা রাখেন ?

গোয়েৎস। নিশ্চয়। আমি তাদের দাবির কথা সমর্থন করি। প্রথমে তাদের কাজের মধ্যে ন্যায়বিচার ও যুক্তি ছিল না। এখন ঠিক পথে চলছে। তারা যদি আমার উপর আস্থা রেখে চলে তাহলে অবশ্যই তারা কৃতকার্য হবে।

জনৈক কৃষকের প্রবেশ

কৃষক। লৌহহস্ত কোথায় ?

গোয়েৎস। (হাত দেখিয়ে) কে তুমি ?

কৃষক। আমি বিদ্রোহীদের এক ভাই। আজ সকালে কি হুকুম দিয়েছিলে ক্যাপ্টেন ?

গোয়েৎস। মিলটেনবার্গে একটা দল পাঠিয়ে কিছু খাদ্য কিনতে আর অস্ত্র সংগ্রহ করতে বলেছিলাম।

কৃষক। লৌহহস্ত কোথায় ?

গোয়েৎস। (হাত দেখিয়ে) কে তুমি ?

কৃষক। আমি বিদ্রোহীদের এক ভাই। আজ সকালে তুমি কি হুকুম দিয়েছিলে ক্যাপ্টেন ?

গোয়েৎস। মিলটেনবার্গে একটা দল পাঠিয়ে কিছু খাদ্য কিনতে আর অস্ত্র সংগ্রহ করতে বলেছিলাম।

কৃষক। কিন্তু এ নিয়ে কথা উঠেছে তুমি কেন খাদ্য কেনার কথা বলেছ, কেন জোর করতে নিষেধ করেছ।

গোয়েৎস। কারণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে এটাই ছিল আমার চুক্তি।

কৃষক। মেৎস্লার বলল সে মিলটেনবার্গ শহর পুড়িয়ে ফেলবে তারপর তোমাকে

হত্যা করবে।

গোয়েৎস। আমি সেই আধপাগলা লোকটাকে ত দল থেকে বহিষ্কার করেছি।

কৃষক। দলের লোকরাই তাকে ডেকে এনেছে। তোমার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল তা তারা ভঙ্গ করেছে। আর তারা তোমাকে ক্যাপ্টেন হিসাবে রাখতে চায় না। আমি তোমাকে সাবধান করে দিলাম। আমার নাম জানতে চেও না।

(প্রস্থান)

গোয়েৎস। জর্জ, ঘোড়া ঠিক করো।

ষষ্ঠ দৃশ্য

একই দৃশ্যপট। মেৎস্লার একটা ছেঁড়া রক্তাক্ত সার্ট আর মাথায় পালকওয়ালা একটা শিরস্ত্রাণ পরে থেকে থেকে গান গাইছিল। তাঁর গান শেষ হতেই গোয়েৎস এসে অতর্কিতে তাকে হত্যা করল।

কৃষকরা। (একে একে গোয়েৎসকে ঘিরে ফেলল। গোয়েৎসের মুখপানে তাকাতে লাগল)।

গোয়েৎস। তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ। নিজেদের উদ্দেশ্য নিজেরাই নষ্ট করেছ। আমি গোয়েৎস ভণ বার্লিসিঙেন। সম্রাটের স্বাধীন নাইট। তোমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি কাজ করতে এসেছিলাম তোমাদের স্বার্থে। কিন্তু তা তোমরা করতে দিলে না। ঐ পতাকা ছিঁড়ে ফেল। ছিঁড়ে ফেল ঐ পতাকা। (পতাকা নিজেই ছিঁড়ে ফেলল)। কৃষকরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (মঞ্চের পাশ থেকে রণভেরীর আওয়াজ শোনা গেল।)

জনৈক কৃষক। দেখ দেখ, আমরা আক্রান্ত হয়েছি।

মঞ্চের আর এক দিক থেকে রণভেরীর শব্দ আসতে লাগল।

কৃষক। উত্তর ও পশ্চিম দিক হতে অশ্বারোহীর দল ছুটে আসছে।

অন্য কৃষক। ভাই সব অস্ত্র হাতে নাও, ছুটে চল। আমরা আক্রান্ত।

(গোয়েৎসকে একা ফেলে রেখে তারা পালিয়ে গেল)

সপ্তম দৃশ্য

সম্রাট সৈন্যের শিবির। সন্ধ্যাকাল। ওয়েসলিঙেন ও একজন অফিসার কথা বলছিল।

ওয়েস। এটা আমাদের প্রথম জয় বলা যেতে পারে। আরো অনেক যুদ্ধ বাকি আছে। ওদের নেতা কে জান ?

অফিসার। শুনেছি গোয়েৎস ভণ বার্লিশিঙেন।

ওয়েস। তাকে ধরা হয়েছে?

অফিসার। এখনো ধরা পড়েনি।

ওয়েস। তার মৃতদেহ পাওয়া যায় নি?

অফিসার। না।

ওয়েস। তাকে ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের ধরতেই হবে। ন্যায় বিচার এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। সৈন্য সাজাও। এই রকম আরো ডজনখানেক যুদ্ধ জয় করতে হবে।

পর্বত ও বন। বেদেদের শিবির। রাত্রিকাল।

বেদেদের দলপতি ও কয়েকজন বেদেনী কথা বলছিল।

দলপতি। এদিকটায় ওরা আসেনি ত?

বেদেনী। উপত্যকাটার ওধারে যুদ্ধের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরা আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ওরা মারামারি করে সবাই মরুক। তবেই শান্তি আসবে। আমরা সুখে থাকব।

আহত অবস্থায় গোয়েৎসের প্রবেশ

গোয়েৎস। কে আছ, আমাকে উদ্ধার করো। ভয় নেই, আমি সাহায্য চাই। আশ্রয় চাই।

দলপতি। কে? দেখ, ওর কাছে কোন অস্ত্র আছে কিনা।

জনৈক বেদে। না ওর সঙ্গে কিছু নেই।

গোয়েৎস। (জলন্ত আগুনের কাছে এসে) তোমরা কারা? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। (বেদেরা কাছে এসে আহত গোয়েৎসের পোষাক তুলে দেখল)

দলপতি। লৌহহস্ত সেই মানুষ।

১ম বেদে। একা, শুধু একটা ছোরা।

দলপতি। আমরা কোন দলেই নেই। একেবারে নিঃস্ব উলঙ্গ। আমরা কারো রাজ্যে বাস করি না। কারো বশ্যতা স্বীকার করি না। ঘুরে বেড়াই যেখানে সেখানে। মুরগীর একটা ঠ্যাং খাও। রক্ত বার হচ্ছে। তুমি আহত।

গোয়েৎস। হ্যাঁ, আমি আহত। আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আশ্রয় দিতে পার? হাঁটতে পারছি না আমি।

জনৈকা বৃদ্ধা বেদেনী। এস বাছা, আহা, আগুনের কাছে এস।

১ম বেদে। ঘোড়ার শব্দ। ওরা একে ধরতে আসছে।

২য় বেদে। ওকে ওদের হাতে তুলে দাও।

গোয়েৎস। (মূর্ছিত অবস্থায় হঠাৎ জেগে উঠে) আবার রণভেরী। আমি যাই, জর্জ কোথায়? আমার জন্য তোমাদের বিপদে পড়তে হলো।

ওয়েসলিঙেনের সেনাদল চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল

সৈন্যগণ। (গোয়েৎসকে গ্রেপ্তার করল ও সব বেদেদের হত্যা করল)

নবম দৃশ্য

অগসবার্গ। ওয়েসলিঙেনের বাসভবন। এ্যাডেলহেলডের শয়নকক্ষের পাশের ঘর।

রাত্রিকাল। ফ্রাঁৎস ও মার্গারেটের প্রবেশ

ফ্রাঁৎস। (ব্যস্তভাবে) এ্যাডেলহেলড, এ্যাডেলহেলড—

মার্গারেট। এত রাতে এভাবে ডাকছ কেন! লোকে বলবে কি?

শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল এ্যাডেলহেলড

এ্যাডেলহেড। ওয়েসলিঙেন কি ফিরে এসেছে?

ফ্রাঁৎস। (এ্যাডেলহেলডকে আলিঙ্গন করে) না। এই নাও চিঠি। জান এতে কি আছে? তোমাকে ফ্রাঙ্কোনিয়া গিয়ে তাঁর প্রাসাদে বাস করতে হবে। সঙ্গে কেউ যাবে না এবং তুমি গেছ কিনা তা আমাকে জানাতে হবে।

এ্যাডেল। সেখানে ত বিপ্লব চলছে।

ফ্রাঁৎস। হ্যাঁ, তোমাকে সেখানে বন্দী অবস্থায় থাকতে হবে। তোমাকে হত্যা করাও হতে পারে।

এ্যাডেল। আর এই কাজের ভার তোমাকে দেওয়া হয়েছে?

ফ্রাঁৎস। তিনি আমার মালিক। তাঁর কথা অমান্য করতে পারি না।

মার্গারেট। কিন্তু তুমি ত তাঁকে আগেই ঠকিয়েছ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে। তাঁকে তোমার রক্ষা করা উচিত।

এ্যাডেল। ফ্রাঁৎস, তুমি রোজ রাতের অন্ধকারে আমার ঘরে আসতে আর সকালের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে। আজ বড় অন্ধকার। আমার জীবনের এই অন্ধকারকে হত্যা করে আলো নিয়ে এস আমার জীবনে।

ফ্রাঁৎস। আমি এই তরবারি দিয়ে তার গলা কেটে ফেলব।

এ্যাডেল। না, সবাই তা জানতে পেরে তোমাকে শাস্তি দেবে। তার চেয়ে অন্যভাবে মারতে হবে। (ঘরের ভিতর চলে গেল) ফ্রাঁৎস তাকে অনুসরণ

করল।

মার্গারেট। জানি না বাপু কি হবে। (প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

জাক্সথসেন। গোয়েৎসের প্রাসাদের একটি কক্ষ।

লার্সে ও এলিজাবেথ

লার্সে। ওয়েসলিঞ্জেন এখন হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর এক অন্য মানুষ। তার মুখে এখন শুধু একটা কথা আর তা হলো বিচার চাই, ন্যায়বিচার। এই ন্যায় বিচারের খাতিরে অদম্য হিংসা চালিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য মানুষকে হত্যা করছে ও অসংখ্য ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বার্লিসিঞ্জেন আমাকে যেতে বলেছে। আপনাকে আমার সব বেতন দিয়ে দিতে বলেছে।

এলি। কোথায় তাঁদের দেখেছ?

লার্সে। হেলব্রমে। এবার আর নিস্তার নেই।

এলি। কাপুরুষ পলাতক কোথাকার। তুমি বিশ্বাসঘাতক। চোর।

লার্সে। চোর নই, টাকার পাওনাদার। এবার আর সিকিঞ্জেন নেই। সিকিঞ্জেনের কি হয়েছে জান? সে হেরে গেছে।

এলি। তোমার মুখটা কুকুরের মত দেখতে। ম্যানেজারকে গিয়ে টাকার কথা বল।

লার্সে। আমি মেরিয়াকে চিঠি দিয়েছি ওয়েসলিঞ্জেনের কাছে যাবার জন্য। তবে কোন ফল হবে না। আমি চাই পঁয়তাল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা। আটাশটি মুদ্রা দিলেও আমি আপনাকে হেলব্রমে নিয়ে যেতে পারি। (সকলের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

ওয়েসলিঞ্জেনের শিবির। রাত্রিকাল

ওয়েসলিঞ্জেন ও জনৈক অফিসার

ওয়েস। তুমি ঠিক জান গোয়েৎস হেলব্রমের কারাগারে শৃংখলিত অবস্থায় আছে?

অফিসার। আমি ত স্যার আগেই বলেছি।

ওয়েস। তবে যে আমি আজ সন্ধ্যের সময় শিবিরে আসার পথে বনের ভিতর তাকে দেখলাম। ফ্রাঁৎস। (পেটে একটা যন্ত্রণা হতে ফ্রাঁৎস এসে এক কাপ মদ দিল)

অফিসার। এক সপ্তা আপনার এই যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাক্তার ডাকি।

ওয়েস। এটা হচ্ছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য। ডাক্তার এসে কি করবে? বলবে বিশ্রাম নিতে। কিন্তু দেশের কি অবস্থা জান ত। মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা কত দাঁড়াল?

অফি। একশো সাত। আপনি ইচ্ছা করলে কিছু কমাতে পারেন।

ওয়েস। আমি আইনের হাতে যন্ত্রমাত্র, আমি ত আইনের স্রষ্টা নই। আর কোন চিঠি আছে?

অফি। একটা আছে এই নিন। (প্রস্থান)

ওয়েস। (চিঠি পড়তে পড়তে) গোয়েৎস কোথায়?

মেরিয়ার প্রবেশ

মেরিয়া। আমি ও আমার ভাই বেঁচে আছি। কিন্তু আমার ভাই বেশীদিন আর বাঁচবে না। আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

ওয়েস। তোমরা কি চাও আমার কাছে? তুমি বলবে আমি দোষী। কিন্তু আমি আইনের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। আমি সই করে ফেলেছি। তাকে মরতেই হবে। তুমি সিকিঙ্গেনকে বিয়ে করতে গেলে কেন? নিশ্চয় তাকে ভালবাসনি? আমিও এখন মরতে বসেছি।

মেরিয়া। না, তাকে অবশ্যই আমি ভালবাসতে পারিনি, কিন্তু সে আমাকে যথেষ্ট দয়া এবং সম্মান দান করেছে। ফ্রাঁৎস, কি হয়েছে ওঁর? এত অসুস্থ দেখছি কেন?

ওয়েস। তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো মেরিয়া?

মেরিয়া। আগে করতাম। এখন নয়। এখন তোমাকে দেখে তোমার স্ত্রীর উপর সবচেয়ে বেশী ঘৃণা হচ্ছে।

ওয়েস। তার ত কোন দোষ নেই।

ফ্রাঁৎস। আপনি ভুল করছেন। তিনিই আমাকে বিষ দিয়েছিলেন। আমি তা আপনার মদের সঙ্গে মিশিয়ে দিই। আমাকে তিনি ভালবাসতেন। এক সপ্তা হলো। ঈশ্বর কি আমায় ক্ষমা করবেন? (প্রস্থান)

মেরিয়া। (ওয়েসলিঙ্গেনকে আলিঙ্গন করে) এ্যাডেলবার্গ—

ওয়েস। (সরিয়ে দিয়ে) এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমার উচিত ছিল তোমার দাদার কথামত কাজ করা। কিন্তু পারিনি, কারণ জানতাম সে অন্যায় করছে। সত্যিই তার মাথা কাটা যাওয়া উচিত। (হঠাৎ মেরিয়ার মুখপানে তাকিয়ে গোয়েৎসের মৃত্যুর পরোয়ানাটা ছিঁড়ে ফেলল) এটা করলাম শুধু

তোমার জন্য। মৃত্যুর মুখোমুখি কর্তব্যে ফাঁকি দিলাম। তবে তাকে কারাগারেই থাকতে হবে। কমিশনারদের কাছে গিয়ে বল কারাগারে তার আচরণ ভাল। তাদের মন নরম হলে ছেড়ে দিতে পারে।

ওয়েস। কই মদ, মদ দাও। হায়, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ফ্রাঁৎস ত নেই। মেরিয়া, তুমি যেও না। অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাকে একথা ভাবতে দাও যে তুমিই আমার বিবাহিত স্ত্রী এবং সিকিঞ্জেন তোমার কেউ নয়। শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য।

অন্ধকার কক্ষ। গুপ্ত বিচারসভা।

কালো পোষাক ও মুখোসপরা বিচারকদল।

প্রধান বিচারপতি। গুপ্ত বিচার সভার হে বিচারকবৃন্দ, আপনারা রজ্জু আর ছুরিতে হাত দিয়ে শপথ করেছেন, গোপনে বিচার করে সমস্ত অজানিত পাপের সন্ধান করে পাপীদের শাস্তি দেবেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবেন।

বিচারকবৃন্দ। পাপীদের উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই দেব।

প্রঃ বিচারপতি। ঘোষক, বিচারের কাজ শুরু করো।

ঘোষক। অজানা পাপীদের উপর শাস্তির বিধান ঘোষণা করি। যার হাত যে কোন পাপকর্ম হতে ও যার অন্তঃকরণ কোন পাপচিন্তা হতে মুক্ত সেই একমাত্র কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারে।

অভিযোগকারীর প্রবেশ

অভিযোগকারী। আমার অন্তঃকরণ নির্মল, আমার হাত রক্তের কলুষ হতে মুক্ত। আমি হাত তুলে আমার অভিযোগের কথা বলছি।

প্রঃ বিচারপতি। তুমি কাকে অভিযোগ করতে চাইছ?

অভিযোগকারী। আমি দড়ি আর ছুরি স্পর্শ করে শপথ করে এ্যাডেলহেলড ভণ ওয়েসলিঞ্জেনকে ব্যভিচার ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি। তিনি তাঁর স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন তাঁর ভৃত্যের সহযোগিতায়। ভৃত্য দোষ স্বীকার করেছে।

প্রঃ বিচারপতি। সত্যের দেবতার নামে শপথ করে বলছ একথা সত্য?

অভিযোগকারী। হ্যাঁ সত্য।

প্রঃ বিচারপতি। জান, তোমার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে এই একই অভিযোগে তুমিও অভিযুক্ত হবে?

অভিযোগকারী। জানি।

ঘোষক। (বিচারকদের প্রতি) আপনাদের বিচারের রায় কি?

কিছুক্ষণের জন্য বিচারকগণ নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি আলোচনা করল

প্রঃ বিচারপতি। আমাদের রায় এই অ্যাডেলহেলড ভণ ওয়েসলিঞ্জেন ব্যভিচার ও নরহত্যার দ্বৈত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে দ্বিগুণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। তাকে দুটি শাস্তি পেতে হবে। প্রথমে তার গলায় ফাঁসি দেওয়া হবে। পরে ছুরি দিয়ে তার বক্ষ ভেদ করা হবে। এখনকার মত আমাদের কাজ শেষ।

সকলে। ঈশ্বর আমাদের মার্জনা করুন।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

হেলব্রম। কারাগার মধ্যস্থিত বাগান।

এলিজাবেথ গোয়েৎসকে ধরে এক জায়গায় বসাচ্ছিল।

এলি। সত্যিই তারা দয়া করেছে। তোমাকে শৃংখলিত করা হয়নি। এই বাগান ব্যবহার করতে দিয়েছে তোমায়, ঘরের খাবার খেতে দিচ্ছে। সত্যিই তো ওদের প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

গোয়েৎস। কৃতজ্ঞ? কিসের জন্য? কার কাছে? ওয়েসলিঞ্জেন? সে মারা গেছে। বিশপ অফ ব্যাম্বার্গ? সে আমাকে ভুলে গেছে? সম্রাট? সে আমাকে চেনে না। আমার ছেলে কোথায়?

এলি। কার্ল মারা গেছে।

গোয়েৎস। আমার আর এক ছেলে? কিন্তু কোথায় সে?

এলি। জর্জের কথা বলছ? সে ত তোমার ছেলে নয়। আমি ত জানি না সে কোথায়।

লার্সের প্রবেশ

লার্সে। ওর বোন মেরিয়া এসেছে। দেখা করতে পারবেন কি? (প্রস্থান)

গোয়েৎস। আমার বোন মেরিয়া, ওয়েসলিঞ্জেনের স্ত্রী?

এলি। সিকিঞ্জেনের স্ত্রী।

গোয়েৎস। কিন্তু ওয়েসলিঞ্জেনেরই উচিত ছিল তাকে বিয়ে করা। এখন কোথায় সিকিঞ্জেন?

মেরিয়ার প্রবেশ

সে এখন প্রাসাদে। সে একটা চিঠি দিয়েছে তোমাকে।

গোয়েৎস। এ চিঠি পড়তে আমি চাই না। এতে আছে শুধু দুঃখের কথা। আমার ছেলে কোথায়?

এলি। (লার্সেকে) জর্জের খবর কিছু জান?

লার্সে। মিলটেনবার্গে সে ধরা পড়ে। সেখানেই তাঁর ফাঁসি হয়।

গোয়েৎস। ফাঁসি হয়! গাছে ঝুলিয়ে না ফাঁসি কাঠে?

লার্সে। যেভাবেই হোক ফাঁসি ফাঁসি।

গোয়েৎস। আমার মনে হয় গাছে ঝুলিয়ে। সে ছিল দস্যুর সন্তান। সুতরাং সবুজ কোন বনভূমিতেই তার মৃত্যু হয়েছে। আমি যেমন স্বাধীন নাইট হিসাবে এই বাগানের মধ্যে অর্থাৎ এক স্বাধীন অরণ্য অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করছি। আমি স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, বিদ্রোহী কৃষকরাও স্বাধীনতা চেয়েছিল। এইজন্যই আমি তাদের সমর্থন করেছিলাম। যতদিন সে স্বাধীনতা না পাও লড়াই করে যাবে, সব কিছু ধ্বংস করে যাবে। দরকার হলে নিজেদেরও ধ্বংস করবে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, শৃংখলা, শান্তি। (চেয়ারের উপর ঢলে পড়ল। মৃত্যু)

এলি। কি বলছিল তা সে জানত না। ও অশান্তি চায়নি। পাঁচজনেই এ অশান্তি চাপিয়ে দেয় তার ঘাড়ে। ওয়েসলিঙ্গেনের ভালবাসা থেকে তুমি বঞ্চিত না হলে এভাবে এখানে ওর মৃত্যু হত না।

মেরিয়া। হয়ত আমি তার যোগ্য ছিলাম না। হয়ত তুমিও দাদার যোগ্য ছিলে না। আজ সব দুঃখের জন্য নিজেদের দায়ী করা ছাড়া উপায় কি? দৈনন্দিন এই সব নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেক কিছু শিখে যেতে হবে এলিজাবেথ। না শিখে উপায় নেই।

এগমঁত

নাটকের চরিত্র

পার্মার মার্গারেট : পঞ্চম চার্লসের কন্যা ও নেদারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি।
ক্ল্যারার মা
কাউণ্ট এগমঁত : গড়ের যুবরাজ
ব্রেকেনবার্গ : জনৈক নাগরিকের পুত্র
অরেঞ্জের উইলিয়ম
সোয়েস্ট : জনৈক দোকানদার
আলভার যুবরাজ
জেত্তার : জনৈক দর্জি
ফার্দিনান্দ : ঐ পুত্র
জনৈক সূত্রধর
মেকিয়াভেল : রাজপ্রতিনিধির কর্মচারি
জনৈক সাবান প্রস্তুতকারক
রিচার্ড : এগমঁতের একান্ত সচিব
বুইক : এগমঁতের অধীনস্থ সৈনিক
সিলভা } আলভার কর্মচারি
গোমেৎস }
রুইসাম : পঙ্গু ও বধির সৈনিক
ভ্যানসেন : জনৈক কেরাণী
ক্ল্যারা : এগমঁতের প্রেয়সী
জনগণ, অনুচরবর্গ ও প্রহরীগণ

ঘটনাস্থল : ব্রাসেলস্ শহর

প্রথম অঙ্ক

তীর ধনুক হাতে সোয়েস্ট, বুইক, রুইসাম, সৈনিকগণ ও নাগরিকগণের প্রবেশ। জেত্তার এগিয়ে এসে তার ধনুক উঁচিয়ে ধরল।

সোয়েস্ট। নাও নাও, তীর চালাও। তুমি কিন্তু আমাকে হারাতে পারবে না। তিনটে কালো আংটা পার হতে হবে তীরটাকে। জীবনে কখনো এভাবে তীর চালাওনি। সুতরাং এবছরেও আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেলাম।

জেত্তার। কে তোমার কৃতিত্বকে ঈর্ষা করতে পারে? এ ব্যাপারে তুমি রাজা। তোমার কৌশল ও কৃতিত্বের পুরস্কার অবশ্যই পাবে।

বুইক। জেত্তার, তুমি যা পারলে না আমি তা করে দলের মান রাখব। আমি এখানে অনেক দিন থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট বা ব্যর্থ হই, তাহলে বুঝতে হবে তোমার মত আমি কিছুই শিখিনি।

সোয়েস্ট। এখানে আমার একটা কথা আছে। কারণ জেত্তারের পরিবর্তে তুমি তীর চালালে আমার তাতে ক্ষতি হবে। যাই হোক, তুমি তীর চালাও।

বুইক। (চিৎকার করে) এবার দেখ গুরু। এক, দুই, তিন, চার।

সোয়েস্ট। চার চারটে আংটা। হ্যাঁ, তাই ত।

সকলে। কি মজা! রাজা দীর্ঘজীবী হোন।

বুইক। ধন্যবাদ সকলকে, গুরু ধন্যবাদ। আমার প্রতি এই সম্মানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ।

জেত্তার। একমাত্র নিজেকে, আর কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোন দরকার নেই তোমার।

রুইসাম। একটা কথা আমায় বলতে দাও।

সোয়েস্ট। কি কথা বৃদ্ধ?

রুইসাম। ও ওর প্রভু এগমঁতের মত তীর চালায়।

বুইক। তাঁর তুলনায় আমি কিছুই না। তিনি রাইফেল থেকে এমনভাবে গুলি চালান যা কেউ পারে না। তিনি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না। দরকার হলে কোন বলদের শুধু চোখটাকে বিদ্ধ করতে পারেন। আমি যা কিছু শিখেছি তাঁর কাছে। তাঁর কাছ থেকে কেউ যদি কিছু না শিখতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে একান্তই মাথামোটা। এখন শোন, রাজার নামে মদ নিয়ে এস। তাঁর খরচে মদ আনা হোক।

জেত্তার। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা প্রথা আছে—

বুইক। আমি একজন বিদেশী এবং রাজার লোক। আমি তোমাদের আইনকানুনের কোন ধার ধারি না।

জেত্তার। তুমি তাহলে একজন স্পেনিয়ার্ড দস্যুর থেকে খারাপ। তারাও তাদের দলের নিয়ম মেনে চলে।

রুইসাম। ও কি বলছে?

সোয়েস্ট। (জোর গলায়) ও বলছে ও আমাদের দলের নিয়ম মানবে না। রাজা সব খরচ দেবে।

রুইসাম। তা ঠিক। আমরা তা প্রতিবাদের সঙ্গে গ্রহণ করব। ওর প্রভুর এটাই রীতি। ভাল ব্যাপারে যত পার টাকা খরচ করো।

(মদ আনা হলো)

সকলে। রাজার নামে সবাই আনন্দ করো। মজা করো।

জেত্তার। তোমার প্রভু মানেই ত রাজা।

বুইক। যদি তাই হয় তাহলে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ সকলকে।

সোয়েস্ট। নিশ্চয় তাই। তবে একজন হল্যাণ্ডবাসী কখনো স্পেনের রাজার স্বাস্থ্য সহজে পান করতে পারে না।

রুইসাম। কোন রাজা ?

সোয়েস্ট। (জোরে) স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ।

রুইসাম। আমাদের মহামান্য রাজা ও প্রভু। তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

সোয়েস্ট। তাঁর পিতা পঞ্চম চার্লসকে কি বেশী পছন্দ করতে না তোমরা ?

রুইসাম। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। তিনি ছিলেন সত্যিই রাজার মত রাজা। তাঁর জয়ের হাত প্রসারিত হয়েছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের অধিকর্তা। তথাপি তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হলেই তিনি তোমার প্রতিবেশীর মত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতেন। তুমি যদি তাকে দেখে ভয় পেয়ে যেতে তাহলে সেই ভয় ভাঙাবার জন্য কত কি করতেন। সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ করে তুলতেন। তিনি খুব কম অনুচর নিয়েই পায়ে হেঁটে অথবা অশ্বারোহণে বেড়াতেন। তিনি যখন পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন তখন আমরা খুব কেঁদেছিলাম। তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ ? তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। রাজার মত রাজা।

জেত্তার। বর্তমান রাজা যখন এখানে এসেছিলেন তখন বাইরে বড় একটা বেরোতেন না। যখন বার হতেন প্রচুর রাজকীয় জাঁকজমক সহকারেই বার হতেন। কারো সঙ্গে কথাই বলতেন না।

সোয়েস্ট। তিনি আমাদের হল্যাণ্ডবাসীদের রাজা হতে পারেন না। আমরা চাই আমাদের রাজারাও আমাদের মত হাসিখুশিতে ভরা লোক হবে। নিজে বাঁচবে, আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের উপর ঘৃণা বা অত্যাচার করবে না। আমরা হচ্ছি সরল সাদাসিদে ধরনের মানুষ।

জেত্তার। আমার মনে হয় রাজার পরামর্শদাতারা যদি ভাল হতেন তাহলে রাজার আচরণ আরো ভাল হত।

সোয়েস্ট। না না, তিনি হল্যাণ্ডবাসীদের দেখতে পারেন না। আমাদের প্রতি তাঁর কোন স্নেহ মমতা বা ভালবাসা নেই। তিনি যদি আমাদের ভাল না বাসেন তাহলে আমরাই বা কেন তাঁকে ভালবাসব ? কাউণ্ট এগমঁতকে আমরা সবাই এত ভালবাসি কেন ? কেন আমরা তাঁর প্রতি এত কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁর মুখে আমাদের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালবাসার ভাব স্পষ্ট ফুটে থাকে সব সময়। হাসিখুশির আর সরলতার ভাব সব সময় চোখের পাতায় চিত্রিত।

তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যে কোন অভাগা লোককে বিলিয়ে দিতে পারেন। কাউণ্ট এগমঁত দীর্ঘজীবী হোন। বুইক, তুমিই প্রথমে শুরু করো। আমাদের প্রভুর স্বাস্থ্য পান করো।

বুইক। অন্তরের সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে কাউণ্ট এগমঁতের স্বাস্থ্য পান করছি।

রুইসাম। সেণ্ট কুইন্টিন বিজয়ী।

বুইক। গ্রেভলিনের বীর।

সকলে। কি মজা! আনন্দ করো।

রুইসাম। সেণ্ট কুইন্টিন যুদ্ধেই আমি শেষবারের মত যোগদান করি। আমার ভারী রাইফেলটা নিয়ে আমি বুকে হেঁটে কোনরকমে এগিয়ে চলেছিলাম। তবু আমি তাই দিয়ে ফরাসীদের চামড়া ভেদ করি। আর তার প্রতিদানস্বরূপ তারা পালাবার সময় আমাকে একটা গুলি মেরে যায় যা আমার ডান পায়ে লাগে।

বুইক। আর গ্রেভলিন? বন্ধুগণ, এই গ্রেভলিনের জয় আমাদের সকলের। ফরাসী কুকুরগুলো সব অগ্নিকাণ্ড আর ধ্বংসকার্য ছেড়ে ফ্ল্যাণ্ডার্সে পালিয়ে যায়। আমরা তাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছিলাম। প্রথমে ওদের মধ্যে গোঁড়া অভিজ্ঞ সৈনিকরা প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন প্রবল বিক্রমে গুলি করতে করতে এগিয়ে গেলাম তখন ওরা পিছু না হঠে পারল না। এমন সময় হঠাৎ এগমঁতের ঘোড়াটার গায়ে গুলি লাগে। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমরা তখন সমুদ্রের বেলাভূমির উপর হাতে হাতে জনে জনে সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে থাকি শত্রুদের সঙ্গে। এমন সময় নদীর বুকে সহসা এক কামানের গোলা এসে ফরাসীদের মাঝখানে পড়ল। যারা গোলাবর্ষণ করল তারা ইংরেজ। জাহাজে করে এ্যাডমিরাল মেলিনের অধীনে ডানকার্কের যুদ্ধ থেকে ফেরছিল। ওরা ছোট ছোট জাহাজে করে ফিরছিল। ওরা সংখ্যায় খুব একটা বেশী ছিল না। তাই আমাদের খুব একটা বেশী সাহায্য করতে পারেনি। তাছাড়া ওদের অনেক গোলা আমাদের মাঝে এসে পড়ছিল। তবু ওরা একটা কাজ করেছিল। ওদের ক্রমাগত গোলাবর্ষণের ফলে ফরাসী সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ওদের অনেকে নদীর জলে পড়ে ডুবে যায়। আমরা হল্যাণ্ডবাসীরা উভচর প্রাণীর মত জলে ও ডাঙ্গায় সমানভাবে যুদ্ধ করতে পারি। আমরা তখন সহজেই ফরাসীদের

আক্রমণ করে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। যারা নদীর ওপার দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল তারা কৃষক রমণীদের বর্শার আঘাতে প্রাণ দিল। অবশেষে ওদের রাজা সন্ধি করতে বাধ্য হলো। আর এই সন্ধির জন্য মহান এগমঁতের কাছে আমরা ঋণী।

সকলে। মহান এগমঁতের কাছে আমরা ঋণী।

জেত্তার। পার্মার মার্গারেটের পরিবর্তে ওরা এগমঁতকে রাজপ্রতিনিধি করত।

সোয়েস্ট। ঠিক তা নয়। সত্য সত্য। আমি মার্গারেটের কোন নিন্দা সহ্য করব না। এবার আমার সঙ্গে তোমরা বল, মার্গারেট দীর্ঘজীবী হোক।

সকলে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন।

সোয়েস্ট। সত্যিই ওঁদের বংশে অনেক সাধ্বী মহিলা আছেন।

জেত্তার। তিনি সব ব্যাপারেই বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। তবে শুধু যাজকদের ব্যাপারটাতেই তাঁর কোন বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আমাদের এই ছোট্ট জায়গাটায় চৌদ্দজন বিশপের কি দরকার ছিল তা আমি জানি না। আগে মঠের অধ্যক্ষরা যে কাজ পারতেন সে কাজের জন্য বিদেশীদের নিয়োগ করার কি প্রয়োজন? অথচ আমাদের একথা বিশ্বাস করতে হবে যে এ সব করা হচ্ছে শুধু ধর্মের খাতিরে। মাত্র তিনজন বিশপই একাজের জন্য যথেষ্ট। তাতেই ভালভাবে কাজ চলে যেত। এখন চৌদ্দজন বিশপ সকলেই কাজ না থাকলেও কাজ দেখাবার চেষ্টা করবে এবং ফলে ঝগড়া বাধবে পরস্পরের সঙ্গে। দিনে দিনে ঘোরাল হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। (তারা মদ পান করতে লাগল)।

সোয়েস্ট। কিন্তু এটা রাজার ইচ্ছা। মার্গারেট কি করবে? সে ত রাজার ইচ্ছা পাল্টাতে পারে না।

জেত্তার। তাহলে আমরা ত নূতন প্রার্থনার গানও গাইতে পারি না। আমাদের গান লিখে নিতে হবে। কিন্তু আমি দেখেছি নূতন বিশপদের গান নূতন হলেও তা খারাপ নয়। আমি গেয়ে দেখেছি। তাতে কোন খুঁত নেই।

বুইক। আমরা আমাদের প্রদেশে ইচ্ছামত আমাদের পছন্দমত প্রার্থনার গান বা ধর্মসঙ্গীত গাই। কারণ সেখানে কাউণ্ট এগমঁত আমাদের নেতা। তিনি ওসব ব্যাপারে কোন কান দেন না। সেণ্ট, সাইপ্রেস ও সমগ্র ফ্ল্যাণ্ডার্সে সকলেই ধর্মের ব্যাপারে এই স্বাধীনতা ভোগ করে। (রুইসামের প্রতি) ধর্মসঙ্গীতের মত নির্দোষ আর কিছু হতে পারে না। পারে কি ফাদার?

রুইসাম। এ সঙ্গীত ঈশ্বরের নাম গান, এ সঙ্গীত শিক্ষামূলক।

জেত্তার। লোকে বলছে, ওদের ওই সব গান ঠিক নয়। বরং বিপজ্জনক। ওগুলো আমাদের ত্যাগ করা উচিত। ধর্মের ব্যাপারে নিযুক্ত অফিসারেরা তাদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে যারা ঐ সব গান গায়। মানুষের বিবেকের উপর এইভাবে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উচিত হচ্ছে না। ওরা আমাদের ইচ্ছামত সব কিছু করতে না দিলেও ইচ্ছামত গান গাইতে আমাদের দেওয়া অবশ্যই উচিত।

সোয়েস্ট। ধর্মগত পীড়ন এখানে চলবে না। আমরা ত আর স্পেনিয়ার্ড নই। ওরা অবাধে আমাদের স্বাধীনতার উপর পীড়ন চালাবে। রাজারা যদি এ পীড়ন চালাতে চায় সামন্তরা রাজাদের সেই অন্যায় আতিশয্যকে অবশ্যই খর্ব করে দেবে।

জেত্তার। বড় মুস্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন কোন যাজক আমাদের বাড়িতে প্রচারের কাজে আসে অথবা আমরা কাজ করতে করতে এমনি আপন মনে কোন ফরাসী ভাষায় প্রার্থনাস্তোত্র গাই তখনই আমাদের নাস্তিক ও বিধর্মী বলা হয় এবং সেই অভিযোগে আমাদের কারারুদ্ধ করা হয়। যখন আমরা কোন গ্রাম্যপথে যেতে যেতে কোন সমবেত জনতার সামনে কোন নূতন ধর্মপ্রচারককে ধর্মপ্রচার করতে দেখে থমকে দাঁড়াই তখনই আমাদের রাজদ্রোহী বলে গ্রেপ্তার করে আমাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার চেষ্টা করা হয়। তুমি নূতন ধর্মপ্রচারকদের কথা শোননি ?

সোয়েস্ট। ওরা সত্যিই সাহসী বীরপুরুষ। বেশীদিন আগের কথা নয়। আমি একবার ঐ ধরনের এক প্রচারককে হাজার হাজার জনতার সামনে ধর্মপ্রচার করতে দেখি। আমাদের প্রথাগত ধর্মপ্রচার থেকে তার কথা ছিল স্বতন্ত্র। কথায় কথায় কঠিন লাতিন শব্দ বলেনি সে। তার প্রতিটি কথা তার অন্তরের গভীর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সে বলল, আমরা আজও সব বিষয়ে অন্ধকারে আছি। এই অন্ধকারের মাঝে আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই আলো নিয়ে আসতে হবে। বাইবেল থেকেই সে তার সব কথা প্রমাণ করে।

জেত্তার। সত্যিই ও কথার মধ্যে অনেক কিছু আছে। আমি এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। কথাগুলো আমার মনের মধ্যে আছে।

বুইক। সব লোক আজ ঐ সব কথার পিছনে ছুটে চলেছে।

সোয়েস্ট। ছুটে চলেছে কারণ কথাগুলো একই সঙ্গে নূতন আর ভাল।

জেত্তার। আর এ কথার অর্থ কি ? এর অর্থ এই যে ধর্মের ব্যাপারে ইচ্ছামত

আপন আপন অনুভূতি প্রকাশ বা প্রচার করার অধিকার সকলেরই আছে।

বুইক। এস এস তোমরা। কথা বলতে বলতে মদের কথাটা ভুলেই গিয়েছ। ভুলে গিয়েছ প্রিন্স অফ অরেঞ্জের কথাও।

জেত্তার। তাঁকে আমরা অবশ্যই ভুলব না। তিনি হচ্ছেন সার্থক প্রতিরক্ষার প্রাচীর। ওঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকলে কোন লোককে শয়তানও ছুঁতে পারবে না। উইলিয়ম অফ অরেঞ্জ দীর্ঘজীবী হোন।

সকলে। দীর্ঘজীবী হোন।

সোয়েস্ট। এবার এস বৃদ্ধ টোস্ট খাও।

রুইদাস। এ টোস্ট আমরা খাব পুরনো সৈনিকদের নামে। যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক।

বুইক। ধন্যবাদ বীর বৃদ্ধ সৈনিকরা। যুদ্ধ দীর্ঘজীবী হোক।

জেত্তার। যুদ্ধ আর যুদ্ধ! তোমরা কিসের জন্য চিৎকার করছ তা জান কি? মুখ থেকে এমনি বেরিয়ে যায় একথা ত তা থেকে আলাদা। কিন্তু জেনে শুনে যুদ্ধের জয়গান করার কোন অর্থ হয় না। সারা বছরটা শুধু যুদ্ধের জয়ঢাক শোনা আর যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক করে সৈন্যদলদের ছুটে বেড়াতে দেখা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা কি জান না? তারপর দেখবে অনেকে কিসের জন্য যুদ্ধ করছে তা না জেনেই যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। একদল হারে, একদল জেতে। কত মানুষের প্রাণ যায়, কত নগরী ধ্বংস হয়। কত নারী ও শিশু সর্বহারা ও অনাথ হয় তার ইয়ত্তা নেই। অথচ কার ভাগ্যে কখন এই সর্বনাশা যুদ্ধ আসবে তা কেউ জানে না।

সোয়েস্ট। তা জানে না বলেই অস্ত্রচালনা শিক্ষা করা সকলের উচিত।

জেত্তার। যাদের ছেলে পরিবার আছে তাদের পক্ষে এসব কথা সাজে না। আমি সৈনিকদের চোখে না দেখে শুধু তাদের কথা কানে শুনতে পারি।

বুইক। আমি কিন্তু একথায় রাগ করতে পারি।

জেত্তার। এ কথা তোমাকে উদ্দেশ্য করে বলিনি ভাই। স্পেনীয়দের সৈন্যাবাস থেকে যখন আমরা মুক্ত হই তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

সোয়েস্ট। সত্যিই তোমাদের ওরা দারুণ কষ্ট দেয়।

জেত্তার। নিজের চরকায় তেল দাও।

সোয়েস্ট। তারা তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করে বোধ হয়?

জেত্তার। চুপ করো।

সোয়েস্ট। ওরা বোধ হয় তোমাকে ওদের রান্না ঘর ও শোবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়? (ওরা হাসতে লাগল)

জেত্তার। তুমি একজন মাথামোটা নির্বোধ লোক!

বুইক। শান্ত হও ভাই সব। তোমরা সৈনিক হয়ে শান্তি ও শৃংখলা মেনে চলবে কি? যেহেতু তোমরা আমাদের কথা শুনবে না তোমরা নাগরিকদের নামে টোস্ট খাও।

জেত্তার। আমরা তাতে রাজী আছি। আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই।

সোয়েস্ট। স্বাধীনতা আর শৃংখলাই আমাদের কাম্য।

বুইক। চমৎকার, এতে আমরা সকলেই খুশি। (ওরা মদের গ্লাস বাজিয়ে সকলেই আপন আপন কথা সুর করে গানের ভঙ্গিতে বলতে লাগল)

সকলে। শান্তি আর নিরাপত্তা। স্বাধীনতা আর শৃংখলা।

রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ।

শিকারীর বেশে পার্মার মার্গারেট। সঙ্গে সভাসদগণ ও ভৃত্যগণ।

রাজ প্রতিনিধি। শিকারের ব্যবস্থা বন্ধ করে দাও। আজ আমি শিকারে যাব না। মেকিয়াভেলকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। (অন্য সকলের প্রস্থান) এই সব ভয়ঙ্কর ঘটনা বার বার মনে আসছে আমার। আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না মনে। কোন কিছুতেই আনন্দ পাচ্ছি না। ওদের মুখচ্ছবি, ওদের আদরযত্নের কথা কেবলি মনের সামনে ভিড় করছে আমার। রাজা হয়ত বলবেন এসব আমারই বিচক্ষণতা ও করুণার প্রতিফল। কিন্তু আমার বিবেক শুধু এই কথাই বলে যে আমি যথাযথ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করেছি। আমার ক্রোধের আগুনকে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দেওয়া কি উচিত হত আমার পক্ষে? আমি চেয়েছিলাম সে আগুন ভিতরে ভিতরেই জ্বলুক। সে আগুন আপনাআপনি পুড়ে ছাই হয়ে যাক। আমার বিশ্বাস এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আমার সঠিক জ্ঞান অনুসারে আমার আচরণ খুবই সঙ্গত হয়েছে ঠিক। কিন্তু সে আচরণ কি আমার ভাইএর মনঃপূত হবে? বিদেশী প্রচারকদের ঔজ্জ্বল্যটা যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে সেটা কি সে অস্বীকার করবে? আমাদের দেশের পবিত্র ধর্মস্থানগুলো তারা অপবিত্র করে তুলেছে। তারা জনগণের মনগুলোকে চঞ্চল ও অস্থির করে তুলেছে। তাদের মনে এক ভ্রান্ত বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিদ্রোহীদের ভুল বোঝানো হয়েছে। আর তার ফলে তারা কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। রাজাকে অবিলম্বে সব খবর জানাতে হবে। তা না

হলে মিথ্যা গুজব রাজার কানে চলে যাবে আমার দূত সেখানে যাবার আগেই। রাজা ভাববেন আমি ইচ্ছা করে সমস্ত দরকারী তথ্য যথাসময়ে তাঁকে জানাই নি। আমি বুঝতে পারছি না কি উপায়ে এই অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্ত করব দেশকে। হায়, আমাদের জীবনসমুদ্রের তরঙ্গাবলীর কাছে আমরা কত অসহায়! মনে হয় সে তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। কিন্তু তা না পেরে আমরা নিজেরাই সে তরঙ্গের দ্বারা এখানে সেখানে ছুটে বেড়াই।

মেকিয়াভেলের প্রবেশ

রাজপ্রতিনিধি। রাজার কাছে যে সব কাগজপত্র যাবে তা সব তৈরি হয়েছে?

মেকিয়াভেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আপনার স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত হবে সব কাগজপত্র।

প্রতিনিধি। তোমাদের দেওয়া বিবরণের মধ্যে সব বাস্তব তথ্য ঠিকমত আছে ত?

মেকিয়া। আমাদের প্রদত্ত বিবরণ পূর্ণাঙ্গ এবং তথ্যভিত্তিক। রাজা ঠিক যেমনটি চান। সেণ্ট ওমরে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তা আমি সব জানিয়েছি, কিভাবে এক বিক্ষুব্ধ জনতা পাথর, নানারকম অস্ত্রশস্ত্র, মই দড়ি প্রভৃতি নিয়ে প্রথমে চার্চগুলোকে আক্রমণ করে এবং তার ভিতর থেকে উপাসনাকারীদের বার করে দেয়। কাঁটাতারে ঘেরা গেট দিয়ে জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়ে তারা। সেণ্টদের প্রতিমূর্তিগুলো ভেঙে দেয়। হাতের কাছে যা কিছু পবিত্র পায় তারা সব পদদলিত করে। আমি আরো বলছি কিভাবে বিক্ষুব্ধ জনতা এগিয়ে যেতে যেতে সংখ্যায় আরো বেড়ে যায় এবং সাইপ্রেস নগরীর জনগণ তাদের দেখে নগরদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ঐ জনতা সমস্ত বড় বড় গীর্জা আর বিশপদের লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেয়। এক বিরাট উন্মত্ত জনতা মেলিন, কমিন, ভারভিয়ের, লিলি প্রভৃতি শহরের মধ্যে অবাধে চলে যায়। শহরের কেউ তাদের বাধা দেয়নি। কেমন করে গোটা ফ্ল্যাণ্ডার্স শহরটা এক বিরাট বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে ফেটে পড়ে সেটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা।

রাঃ প্রতিনিধি। হায় হায়! তোমার আবেগময় বর্ণনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে, অশুভ শক্তির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এতে আমার দুঃখও বেড়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তোমার মতামত কি বল মেকিয়াভেল।

মেকিয়া। আমাকে ক্ষমা করবেন। এ বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনার কথা শুনে আপনার মনে হবে সব বাজে। যদিও আপনি আমার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন তথাপি আমার পরামর্শ কখনো গ্রহণ করেন না। আপনি কতবার ঠাট্টা করে বলেননি, তুমি বড় দূরের জিনিস দেখ? বলেছেন, তোমার ঐতিহাসিক হওয়া উচিৎ ছিল। যারা কাজের লোক হতে চায়, কাজ করতে চায় তাদের বর্তমানকে বেশী করে দেখা ভাল। কিন্তু এটা যে ঘটবে তা আগেই বলিনি? এর ইতিহাসের আগেই আভাস দিয়েছিলাম আমি।

রাঃ প্রতিনিধি। আগে হতে আমিও অনেক কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। তবু ঘটনার স্রোতকে এড়াতে পারিনি আমি।

মেকিয়া। এক কথায় বলতে গেলে তাহলে বলতে হয় আপনি নূতন ধর্মমতের ঢেউকে রুখতে পারবেন না। দমন করতে পারবেন না। এই নূতন ধর্মমতের সাধারণ সমর্থকদের মধ্য থেকে প্রকৃত বিশ্বাসীদের পৃথক করে নিয়ে তাদের জন্য আলাদা গীর্জা নির্মাণ করে দিন। তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসুন। তারাও সমাজের অঙ্গ হয়ে উঠুক। একমাত্র এইভাবেই আপনি বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবেন। অন্য যে কোন পন্থা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর তার ফলে সারা দেশ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

রাঃ প্রতিনিধি। আমার ভাই কিভাবে এই সহিষ্ণুতার নীতি প্রত্যাখ্যান করেন তা কি তুমি ভুলে গেছ? তুমি কি জান না তিনি প্রতিটি চিঠিতে আমাকে প্রকৃত সনাতন ধর্ম রক্ষা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন? তুমি কি জান না এই সনাতন ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করার কোন পরামর্শই তিনি মানবেন না? কারা কারা নূতন ধর্মমতে বিশ্বাস করে তা জানার জন্য তিনি প্রতিটি প্রদেশে গুপ্তচর মারফৎ সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সেটা করেন আমাদের অগোচরেই। আমাদের বিস্মিত করে মাঝে মাঝে আমাদের প্রতিবেশীদের কারো কারো নামে নাস্তিকতার অভিযোগ পাঠান। তিনি যখন এই কঠোর নীতি অবলম্বন করে চলেন তখন আমি কেমন করে সহনশীলতার এই নরম নীতি মেনে চলে তাঁর বিরাগভাজন হতে পারি? তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাকবে না এবং তাঁর বিশ্বাসও আমাকে হারাতে হবে।

মেকিয়া। আমি জানি রাজা তাঁর ইচ্ছার সব কথা আপনাকে জানান এবং তা মেনে চলতে বলেন। তিনি চান আপনি দেশে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে

আনার জন্য এমন উপায় অবলম্বন করুন যাতে দেশের লোকের মন তিক্ত হয়ে ওঠে এবং যাতে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন কি করছেন। দেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী, সামন্ত ও সাধারণ নাগরিক সকলেই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের চারদিকে যখন সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে তখন বিশেষ কোন মত বা আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থেকে কি লাভ বলতে পারেন? আশা করি, কোন সদাশয় ব্যক্তি রাজা ফিলিপকে এই পরামর্শ দেবেন যে দেশের প্রজাদের ধর্মের জন্য খুনোখুনি করে মরতে দেওয়া কোন রাজার পক্ষেই উচিত নয়। তার থেকে দেশের মধ্যে দুটি ধর্মমতকে থাকতে দেওয়া ভাল।

রাঃ প্রতিনিধি। এসব কথা যেন আমাকে আর শুনতে না হয়। আমি ভালভাবেই জানি রাজা রাজরারা সব সময় সত্য ও আদর্শের প্রতি অনুগত থাকেন না। সরলতা, দানশীলতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁদের অন্তরে স্থান পায় না। ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে যা হয় তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ঈশ্বর নিয়ে ত ছেলেখেলা করা যায় না। যে ধর্মের জন্য কত লোক প্রাণ দিয়েছে আমাদের সেই প্রথাগত পুরনো ধর্মের প্রতি আমরা ত উদাসীন থাকতে পারি না। আমরা কি আমাদের ধর্মকে এইসব চপলমতি স্ববিরোধিতাপূর্ণ নাস্তিকদের হাতে নিগৃহীত হতে দেব?

মেকিয়াভেল। আমি যা বলেছি তার জন্য আমায় ভুল বুঝবেন না।

রাঃ প্রতিনিধি। আমি তোমাকে জানি এবং তোমার আনুগত্যে আমার বিশ্বাস আছে। তবে এও জানি অনেক মানুষ সৎ ও বিচক্ষণ হয়েও মোক্ষ লাভ করতে পারে না। এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি শ্রদ্ধা করি অথচ যাদের বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ আছে।

মেকিয়াভেল। আপনি কাদের কথা বলছেন?

রাঃ প্রতিনিধি। আমি একথা স্বীকার করছি যে আপনি আজ আমার মনে গভীর বিরক্তি উৎপাদন করেছেন।

মেকিয়াভেল। কি করে?

রাঃ প্রতিনিধি। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা। তাঁর সহজাত ঔদাসিন্যের দ্বারা। আমি যখন চার্চ থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন কাউন্ট এগমঁত ও আরো কয়েকজন আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি তখন এক দুঃসংবাদ শুনে অভিভূত হয়ে পড়ি। আমার কণ্ঠ থেকে সকরুণ বিলাপের ধ্বনি বেরিয়ে আসে। আমি

আমার অন্তর্বেদনাকে চেপে রাখতে না পেরে তাঁকে বলি, দেখছেন, আপনার প্রদেশে কি সব ঘটনা ঘটছে? আপনাকে রাজা কত বিশ্বাস করেন। আপনি কি এসব মুখ বুজে সহ্য করবেন?

মেকিয়াভেল। তখন উনি কি বললেন?

রাঃ প্রতিনিধি। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো এটা যেন একটা তুচ্ছ ব্যাপার। তিনি উত্তর করলেন, হল্যাণ্ডবাসীরা কি এই সংবিধানে সন্তুষ্ট? এটা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। তা যদি হয় তাহলে পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেকিয়াভেল। তিনি ঠিকই বলেছেন। তিনি অন্যায় কিছু বলেননি। আমরা কি করে আশা করতে পারি যে হল্যাণ্ডবাসীদের পার্থিব ও অপার্থিব উন্নতি বিধানের পরিবর্তে তাদের সব অধিকারকে কেড়ে নেবার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছি আমরা সেই হল্যাণ্ডবাসীরা আস্থা স্থাপন করবে আমাদের উপর? নূতন বিশপরা যাদের বাঁচিয়েছেন তাদের সমস্যা কি খুব বেশী? সেই বিশপদের বেশীর ভাগ কি বিদেশী নয়? স্পেনিয়ার্ডরা কি এ দেশের সব কিছু দখল করার দুর্বার প্রবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছে না? সব দেশের মানুষের মত হল্যাণ্ডবাসীরাও চাইছে তাদের দেশের মানুষের দ্বারা শাসিত হতে। কারণ বিদেশীরা সব সময় অন্য কোন দেশ জয় করার পর থেকেই নিজেদের স্বার্থপূরণের চেষ্টা করে থাকে। তারা সব কিছু নিজের রুচি দিয়ে বিচার করে এবং মমতা বা সহানুভূতি ছাড়াই সর্ব বিষয়ে তাদের একাধিপত্য ও প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে থাকে।

রাঃ প্রতি। তুমি কি আমাদের বিপক্ষদের পক্ষ অবলম্বন করছ?

মেকিয়াভেল। অন্তরের সঙ্গে কখনই নয়।

রাঃ প্রতি। তোমার মনের অবস্থা যদি এই হয় তাহলে আমার উচিত এই রাজপ্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করা। এগমঁত ও অরেঞ্জ দুজনেই এই পথ চায়। তারা একদিন শত্রু ছিল পরস্পরের। আজ তারা আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। তারা অভিন্ন আত্মা বন্ধু হয়ে উঠেছে দুজনে।

মেকিয়াভেল। কিন্তু তাদের জোট বড় বিপজ্জনক।

রাঃ প্রতি। সত্যি কথা বলতে কি, এগমঁতের জন্য আমার ভয় হয়। অরেঞ্জকে আমি সত্যিই ভয় করি। আমার মনে হয়, অরেঞ্জের মনে কোন ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আছে যা সে গোপনে লালন করে চলেছে যার কথা সে কাউকে বলে না। বাইরে মুখে শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতার ভাব দেখিয়ে তলায় তলায় আপন কার্যসিদ্ধি করে চলে।

মেকিয়াভেল। অপর পক্ষে এগমঁত যা কিছু করে প্রকাশ্যে বলে করে। সে সব সময় সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে চলে। মনে করে সারা দুনিয়াটাই তার।

রাঃ প্রতি। তার মনে কোন ছলচাতুরী নেই। তাঁকে লোকে কাউণ্ট এগমঁত বলে। এই নামেই তিনি খুশি। কিন্তু তিনি ভুলে যান, তাঁর পূর্বপুরুষরা ওয়েল্ডার ল্যাণ্ড শাসন করতেন এবং 'প্রিন্স অফ গড়ে' এই উপাধি তাঁর প্রাপ্য সম্মান। জানি না এ সম্মান তিনি কখনো দাবি করবেন কি না? জানি না তাঁর মনে কি আছে।

মেকিয়াভেল। তবে তিনি রাজার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত।

রাঃ প্রতি। কিন্তু তা যদি হত তাহলে তিনি রাজার অনেক উপকার করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি যা করছেন তাতে তাঁর নিজেরও কিছু উপকার হচ্ছে না আর তাতে আমাদেরও যথেষ্ট বিরক্তির কারণ ঘটছে। তিনি যে সব ভোজসভার আয়োজন করছেন তাতে সামন্তরা একজোট হবার সুযোগ পাচ্ছে। তাঁর অতিথিরা তাঁর দ্বারা অপমানিত হয়ে বিপ্লবের আদর্শে উন্মাদ হয়ে উঠছে। তিনি সাধারণভাবে রহস্যের যে কথা বলেন তা জনগণের মনে রেখাপাত করে এবং তাঁর সমর্থকদের উচ্ছাস ও নানা কলাকৌশল উত্তেজিত করে তোলে জনতাকে।

মেকিয়া। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তিনি কোন ষড়যন্ত্র করেননি।

রাঃ প্রতি। সে যাই হোক, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। তিনি আমাদের শুধু ক্ষতি করে চলেছেন অথচ তাতে তাঁর নিজের কোন লাভ হচ্ছে না। তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় হেসে উড়িয়ে দেন। ফলে অনেক সময় আমরা যা এড়িয়ে যেতে চাই সেটাকে গুরুত্ব দিতে হয়। তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কোন স্বীকৃত শত্রু বা ষড়যন্ত্রকারীর থেকে তিনি অনেক বেশী বিপজ্জনক। আমার মনে হয় এসব বিষয় রাজসভায় সকলেই জানে। আমি না বলে পারছি না যে এমন একটা দিনও কাটে না যেদিন তিনি আমাকে কোন না কোন বিষয়ে আঘাত দেন না।

মেকিয়া। আমার ত মনে হয় তিনি সব বিষয়ে তাঁর বিবেকের নির্দেশে চলেন।

রাঃ প্রতি। কিন্তু তাঁর বিবেক আবার তাঁর ইচ্ছাতেই চলে। তাঁর ব্যবহার খুব খারাপ। তিনি এমনভাবে সব ক্ষেত্রে আচরণ করেন যেন তিনিই এখানকার সর্বেসর্বা। যেন ইচ্ছা করলে তিনি আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে

পারেন। শুধু সৌজন্যের খাতিরে তা করেন না। এ সবের কোন দরকার নেই।

মেকিয়া। আমার অনুরোধ, আপনি তাঁর সরল হাসিখুশিভরা মানসিক গঠনকে খারাপ ভাববেন না। সব ব্যাপারকে হালকাভাবে দেখাটাই তাঁর স্বভাব। এতে আপনি নিজে দুঃখ পাবেন এবং তাঁকেও দুঃখ দেবেন।

রাঃ প্রতি। আমি কিছুই খারাপ ভাবছি না। আমি শুধু বলছি অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা। আমি তাঁকে জানি। তাঁর বংশমর্যাদা এবং উপাধি তাঁর অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বংশমর্যাদার খাতিরেই কোন আকস্মিক রাজরোষ থেকে তিনি পরিত্রাণ পেয়ে যাবেন। যদি ভাল করে ভেবে দেখ তাহলে দেখবে ফ্ল্যাণ্ডার্সে যে গোলযোগ চলছে তার জন্য তিনিই দায়ী। প্রথম থেকে তিনি বিদেশী প্রচারকদের সঙ্গে আলাপ করেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। আমাকে এখন একা থাকতে দাও। তবে আমার তীরও ব্যর্থ যাবে না। আমি জানি কোথায় তাঁর দুর্বলতা এবং কোথায় আঘাত করতে হবে।

মেকিয়া। আপনি পরিষদের সভা আহ্বান করেছেন? অরেঞ্জ কি সে সভায় যোগদান করবে?

রাঃ প্রতি। আমি আন্তওয়ার্গ থেকে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি তাদের উপর সব দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি। হয়ত তারা আমার সঙ্গে বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে পুরোপুরি সহযোগিতা করে চলবে অথবা নিজেদের বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করবে। একথা চিঠিতে লিখে আমার স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে এস। তারপরে ভাস্কাকে তাড়াতাড়ি মদ্রিসে পাঠিয়ে দাও। সে বিশ্বাসী এবং পরিশ্রমী। সে খুব দ্রুত পৌছতে পারে সেখানে। কারণ আমার ভাই যেন বলতে না পারে যে সে আমাদের লোক পাঠানোর আগেই সব খবর জানতে পেরেছে। তার যাবার আগে আমি কথা বলব তার সঙ্গে।

মেকিয়া। আপনার আদেশ যথাশীঘ্র পালন করা হবে।

জনৈক নাগরিকের বাড়ি।

ক্ল্যারা, তার মা ও ব্রেকেনবার্গএর প্রবেশ

ক্ল্যারা। ব্রেকেনবার্গ, আমার এই কাটা সুতোগুলো ধরবে?

ব্রেকেন। আমায় মাপ করো ক্ল্যারা, আমি তা পারব না।

ক্ল্যারা। এই ছোট্ট কাজটুকু পারবে না? কারণটা কি?

ব্রেকেন। আমি যখন সুতো ধরে দাঁড়িয়ে থাকি তখন তোমার চোখে চোখ পড়ে যায়।

ক্ল্যারা। নাও, দুষ্ট কোথাকার, এসে ধর।

ক্ল্যারার মা। (উল বুনতে বুনতে) একটা গান করো। ব্রেকেনবার্গ খুব ভাল গান করে।

ক্ল্যারা। নাও গান করো। আমার প্রিয় সৈনিকের গান গাও। (গান করতে লাগল ব্রেকেনবার্গের সঙ্গে) গান

যুদ্ধের জয় ঢাক বাজছে।
আমার প্রিয়তম বীর যুদ্ধের জন্য সৈন্য সাজাচ্ছে।
তার বর্শা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত।
তা দেখে আমার দেহের রক্ত ফুটছে
আমার হৃৎপিণ্ড জোরে স্পন্দিত হচ্ছে।
আমি সোজা সাহসের সঙ্গে চলে যাব তার কাছে।
আমরা জয় লাভ করবই।
শত্রুদের জীবন্ত বন্দী করব অথবা গুলি করে মারব।
সৈনিক হওয়া সত্যিই কি মজার ব্যাপার।

ক্ল্যারার মা। রাস্তায় গোলমাল কিসের ব্রেকেনবার্গ ? মনে হয় সৈন্যরা যাচ্ছে।

ব্রেকেন। রাজ প্রতিনিধির দেহরক্ষী বাহিনী।

ক্ল্যারা। এই সময় ? এর মানে কি, (জানালা দিয়ে তাকিয়ে) এ ত সাধারণ রক্ষীবাহিনী নয়। সংখ্যায় অনেক বেশী। সমগ্র সেনাবাহিনী। দেখ ত ব্যাপারটা কি, নিশ্চয় কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার। ও ব্রেকেনবার্গ, একবার সময় করে গিয়ে দেখ ব্যাপারটা কি।

ব্রেকেন। যাচ্ছি। আমি এখনই ফিরে আসছি। (হাতটা ক্ল্যারার দিকে বাড়িয়ে দিলে ক্ল্যারাও তার হাত বাড়িয়ে দিল।)

মা। এত তাড়াতাড়ি ওকে পাঠালে ?

ক্ল্যারা। আমি ব্যাপারটা জানতে চাই। রেগো না। তাছাড়া আমি ওর উপস্থিতি ঠিক সহ্য করতে পারছি না। আমি তার প্রতি একটা অন্যায় করে ফেলেছি। এতে আমি ব্যথিত।

মা। ছেলেটা কিন্তু সত্যিই সরল আর সৎ।

ক্ল্যারা। সত্যিই ওর প্রতি আমার সদয় ব্যবহার করা উচিত। মাঝে মাঝে

ভালবাসার সঙ্গে ওর হাতে মৃদু চাপ দিই। কিন্তু পরক্ষণেই এইভাবে ওর ভ্রান্ত আশা জাগানোর জন্য নিজেকেই ভৎর্সনা করি। আমার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। ঈশ্বর জানেন আমি তাকে ইচ্ছা করে ঠকাচ্ছি না। আমি তাকে আশা করতে বলতে পারছি না, আবার হতাশার মধ্যেও ঠেলে দিতে পারছি না।

মা। এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না।

ক্ল্যারা। আমার তাকে ভাল লাগত এক সময়, আজও লাগে। তাকে বিয়ে করতে পারতাম আমি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় তাকে কখনো ভালবাসতে পারিনি আমি।

মা। তুমি তার সঙ্গে বেশ সুখেই থাকতে।

ক্ল্যারা। তাহলে ভালই হত। আমার জীবনটা শান্তিতে কাটাতে পারতাম।

মা। তা হয়নি তোমার বোকামির জন্যই।

ক্ল্যারা। সত্যিই আমি এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়েছি। জানি না ব্যাপারটা কি করে ঘটল। আমি শুধু এগমঁতের কথা ভাবি। কী অদ্ভুত মানুষ! সারা দেশ পূজো করে তাকে। একমাত্র বাহুবন্ধনের মাঝেই জীবনে সবচেয়ে সুখ পাব না কি আমি?

মা। ভবিষ্যতে তা কি কখনো সম্ভব হবে?

ক্ল্যারা। আমি শুধু প্রশ্ন করি নিজেকে, সে কি আমাকে ভালবাসে?

মা। সন্তানের জন্য মায়ের উদ্বেগের অন্ত নেই। পরিণামে যাই হোক, মার মনে কষ্ট হবেই তার সন্তানের জন্য। তুমি আমার ও তোমার নিজের জীবনকে দুঃখময় করে তুলেছ।

ক্ল্যারা। কিন্তু প্রথমে তুমি আপত্তি করনি।

মা। আমি সত্যিই সব সময় দুর্বলমনা। আমি প্রশ্রয় দিয়েছি।

ক্ল্যারা। এগমঁত যখন ঘোড়ায় চেপে রাস্তা দিয়ে যেত আর আমি জানালা দিয়ে তার পানে তাকিয়ে থাকতাম, যখন এগমঁতও আমার পানে তাকিয়ে হাসত তখন কি তুমি অসন্তুষ্ট হতে না, তোমার কন্যার ভাগ্যে সম্মানিত বোধ করতে না?

মা। বল, যা বলার আছে তোমার।

ক্ল্যারা। তারপর যখন তিনি ঘন ঘন এই পথ দিয়ে আসতে শুরু করলেন এবং সেটা আমার জন্যই আর আমিও যখন জানালার ধারে তাঁর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতাম তখন তুমি কি আমাকে ডেকে সরিয়ে নিতে? তখন কি এক গোপন আনন্দ অনুভব করতে না?

মা। আমি কি তখন ভাবতে পেরেছিলাম এটা এতদূর গড়াবে ?

ক্ল্যারা। (অশ্রু চেপে কাঁপা গলায়) তারপর একদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি উজ্জ্বল পোষাক পরে আমাদের ঘরে হঠাৎ এসে হাজির হন, আমরা তখন বাতি জেলে বসেছিলাম। তোমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। একা আমি শুধু অভিভূত হয়ে পড়ি। চেয়ারে চিত্রার্পিতের মত বসে থাকি।

মা। আমি কি ভাবতে পেরেছিলাম, হতভাগিনী ক্ল্যারা ভালবাসার ব্যাপারে এতখানি এগোবে ? এখন আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

ক্ল্যারা। মা, তুমি কি আমাকে দুঃখ দিয়ে আনন্দ পাচ্ছ ?

মা। তোমার দুঃখে আরো কষ্ট পাচ্ছি আমি। একমাত্র মেয়ে পরিত্যক্তা হয়ে থাকবে এটা কত বড় দুঃখের কথা কোন মার পক্ষে তা জান ?

ক্ল্যারা। পরিত্যাগ! এগমঁতের প্রণয়িনী পরিত্যক্তা ? এগমঁতের অন্তরে আমি স্থান পাওয়ার জন্য কত রাজকন্যা ঈর্ষাবোধ করবে আমার ভাগ্যে! শোন মা যে যা বলে বলুক গোপনে বা প্রকাশ্যে। তবে জেনে রাখবে, যে কুড়ে.ঘরে এগমঁতের প্রিয়তমা বাস করে সে ঘর স্বর্গ।

মা। অবশ্য তার মত সরল প্রকৃতির দয়ালু লোককে সবাই ভালবাসবে।

ক্ল্যারা। তার দেহের শিরায় একফোঁটাও দূষিত রক্ত নেই। সত্যিই মা, তিনি মহান। অত বড় বীরপুরুষ হয়েও তিনি যখন আমাদের ঘরে আসেন তখন কি তিনি তাঁর পদমর্যাদার কথা ভুলে যান না ? তিনি আমার জন্য কত উদ্বেগ প্রকাশ করেন! তিনি সত্যিই আমাদের বন্ধু এবং আমার প্রণয়ী।

মা। আজ কি তিনি আসবেন ?

ক্ল্যারা। তুমি কি দেখছ না কতবার আমি জানালায় যাচ্ছি, যে কোন শব্দে সচকিত হয়ে উঠছি ? যদিও তিনি রাত্রির আগে আসবেন না তথাপি সকাল থেকেই মনে হচ্ছে তিনি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন। আমি বেটাছেলে হলে ভাল হত। সব জায়গায় তার সঙ্গে যেতে পারতাম! যুদ্ধে পতাকা বইতাম তাঁর পাশে।

মা। তুমি ছোট থেকেই বড় চঞ্চল ও খেয়ালী ছিলে। এই চঞ্চল আর এই গম্ভীর। আজ পোষাকটা একটু ভাল পড়বে না ?

ক্ল্যারা। তা পরতে পারি। গতকাল ওঁর একদল সমর্থক তাঁর নামে বাঁধা একটা গান গেয়ে যাচ্ছিল। আমার অন্তরের একরাশ আবেগ আমার কণ্ঠে এসে স্তব্ধ হয়ে রইল। লজ্জা না পেলে আমিও তাদের সঙ্গে সে গান গাইতাম।

মা। সাবধান। তোমার এই আবেগপ্রবণতাই সব কিছু মাটি করে দেবে। তুমি লোকের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে ফেলবে। কিছুদিন আগে তুমি এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে কাউন্ট এগমঁত এর এক কাঠের মূর্তি দেখে চিৎকার করে ওঠ ঐ নাম ধরে। আমি রাগে আগুন হয়ে উঠি তা দেখে।

ক্ল্যারা। চিৎকার না করে আমি পারিনি তখন। গ্রেভলিনের যুদ্ধের পর আমি সর্বত্রই কাউন্টের নাম শুনি আর ছবি দেখি। একটি ছবিতে দেখা যায় কাউন্ট এগমঁতের ঘোড়াটা গুলিতে মারা যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। অন্যান্য কাউন্ট ও আর্লের তুলনায় কাউন্ট এগমঁতের সব কথা শুনে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়।

ব্রেকেনবার্গের প্রবেশ

ক্ল্যারা। কি ব্যাপার?

ব্রেকেন। সঠিক কিছু জানা গেল না। তবে শোনা যাচ্ছে ফ্ল্যাণ্ডার্সের জনগণ বিদ্রোহ করেছে। এখানে যাতে সে বিদ্রোহ ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছেন রাজপ্রতিনিধিটি। শহরের লোকেরা রাস্তায় ও নগরদ্বারে ভিড় করছে। আমি আমার বুড়ো বাবার কাছে চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি। (যাবার জন্য উদ্যত হলো)

মা। বিদায়।

ক্ল্যারা। কাল আসবে? এই বইটা নিয়ে যাও। আর একটা ভাল গল্পের বই এনো।

ব্রেকেন। (হাতটা বাড়িয়ে দিল)

ক্ল্যারা। (হাত না দিয়ে) এরপর যখন আসবে তখন। (মা ও মেয়ের প্রস্থান)

ব্রেকেন। আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার জন্য আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যেতে পারি। হে হতভাগ্য! তোমার পিতৃভূমির এই অবস্থা, দেশের এই দুরবস্থা দেখেও তুমি বিচলিত হও না? তোমার দেশবাসী আর স্পেনীয়রা কি এক? কারা এ দেশ শাসন করছে তা দেখেছ? আমার স্কুল জীবনে আমি অন্য রকম ছেলে ছিলাম। ব্রুটাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে আমার গায়ের রক্ত ফুটতে থাকে উত্তেজনায়। আর আজ সেই আমি এক মেয়ের মোহে আবদ্ধ হয়ে আছি। সে আমাকে ভালবাসে না, অথচ তাকে আমি ছেড়ে যেতে পারছি না। তবে সেকথা কি সত্যি? আমার এক বন্ধু সম্প্রতি আমার কানে কানে বলেছিল

রোজ রাত্রিতে ওর ঘরে লোক আসে গোপনে। আমাকে তাই কায়দা করে সন্ধ্যার আগে পাঠিয়ে দেয়। এটা কখনো সত্যি হতে পারে? এটা কুৎসা, মিথ্যা। ক্ল্যারা নির্বোধ, ঠিক আমি যেমন হতভাগ্য। সে যখন আমাকে তার অন্তর থেকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন এভাবে আমার আর থাকা চলে না। আমার এই দেশের এই দুরবস্থায় আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। যখন যুদ্ধের ভেরী ও জয়ঢাক বাজছে, কামানের গোলা গর্জন করছে তখন আমার দেহের প্রতিটি অস্থিমজ্জা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে অদম্য উত্তেজনায়। কিন্তু তবু আমি যুদ্ধে যোগদান করতে পারছি না। এর থেকে মৃত্যু ভাল। কিছুদিন আগে আমি জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি সাঁতার জানি বলে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বাঁচালাম নিজেকে। সে আমাকে একবার ভালবেসেছিল এই সুখচিন্তাটা আমার অস্থিমজ্জায় ঢুকে পড়েছে। এক ভবিষ্যৎ স্বর্গসুখের আশা আমার জীবনের সব চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। (টেবিলে হাত রেখে) এইখানে সে একদিন বলেছিল। আমি তার চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছিলাম। আমার ওষ্ঠাধরে তার ওষ্ঠের স্পর্শ পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন হে হতভাগ্য, মৃত্যুই তোমার একমাত্র পথ। কিন্তু কুণ্ঠা কিসের? (পকেট থেকে শিশি বার করে) হে বিষ, আমার সব যন্ত্রণা হরণ করো। আমি তোমাকে আমার ভাইএর ওষুধের বাক্স থেকে চুরি করেছিলাম। এই চেষ্টা যেন ব্যর্থ না হয়। এই ভয় ও উদ্বেগ থেকে আমাকে মুক্ত করো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ব্রাসেলস্ শহরের একটি রাজপথ।

জেত্তার ও জনৈক বড় কাঠের মিস্ত্রীর প্রবেশ

মিস্ত্রী। আট দিন আগে গিল্ডে তোমাকে বলিনি জোর গোলমাল হবে?

জেত্তার। এটা কি সত্যি যে ওরা ফ্ল্যাণ্ডার্সেব গীর্জাগুলো লুণ্ঠন করেছে?

মিস্ত্রী। তারা সব চার্চ ধ্বংস করেছে। শুধু চারটে দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে সব চার্চের। সত্যিই ওরা কত নীচ, কত হীন। রাজপ্রতিনিধির কাছে এর প্রতিবাদ জানাতে হবে। আজ এখন যদি আমরা জনগণকে সমবেত করি ও এসব আলোচনা করি তাহলে লোকে বলবে আমরাও বিদ্রোহে যোগদান করেছি।

জেত্তার। প্রথমে সবাই তাই ভাবে। তবে কেন নাক গলাচ্ছ এসব ব্যাপারে?

মিস্ত্রী। সর্বহারা জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলেই আমার অস্বস্তি লাগে। তারা এক বিরাট দাবি জানিয়ে গোটা দেশকে দুঃখের মাঝে ডুবিয়ে দেয়।

(সোয়েস্টের প্রবেশ)

সোয়েস্ট। সুপ্রভাত ভাইসব। কি খবর? শুনছি নাকি বিদ্রোহীরা সোজা এইদিকে আসছে?

মিস্ত্রী। এখানে তারা কিছুতেই কিছু স্পর্শ করবে না?

সোয়েস্ট। এক সৈনিক আমার দোকানে তামাক কিনতে এসেছিল। আমি এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে বলল, আমাদের রাজপ্রতিনিধি বিচক্ষণ মহিলা হলেও এখন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। এখন তাঁর প্রাসাদ সেনাবাহিনীতে ঘিরে রেখেছে। এতে ব্যাপারটা আরো খারাপের দিকে যাবে। শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

মিস্ত্রী। না, তিনি যাবেন না। তাঁর উপস্থিতি আমাদের পক্ষে ভাল। তিনি যদি আমাদের অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেন আমরাও তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। আমরা সবাই তাঁর পাশে দাঁড়াব।

সাবান প্রস্তুতকারকের প্রবেশ

সাবান প্রস্তুতকারক। কী জঘন্য কাজ। গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপার খারাপের দিকে যাচ্ছে। সবাই চুপ করে থাকবে। তা না হলে তোমাদেরও বিদ্রোহী বলবে লোকে।

সোয়েস্ট। এখানে গ্রীসের পণ্ডিতরা আসছেন।

সাবান। আমি জানি অনেকে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেছে। বিশপদের অপমান করছে। রাজাকে গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু যে প্রকৃত অনুরক্ত প্রজা ও ক্যাথলিক (ক্রমশঃ লোক জমে গেল। সবাই শুনতে লাগল এই সব কথা)

ভ্যানসেনের প্রবেশ

ভ্যানসেন। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন। কি খবর?

মিস্ত্রী। লোকটা সত্যিই ভয়ঙ্কর। কিছুই করার নেই।

জেত্তার। লোকটা কি ডক্টর ওয়াইতের সচিব?

মিস্ত্রী। লোকটা আগে ছিল কেরাণী। কিন্তু তার ছলচাতুরীর জন্য বহু জায়গায় ঘা খেয়েছে। এখন সুদ বন্ধকীর কারবার করে। (আরো লোক জড়ো হয়)

ভ্যানসেন। এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে হবে আমাদের মধ্যে।

সোয়েস্ট। আমিও তাই মনে করি।

ভ্যালসেন। তোমাদের যদি অন্ততঃ মস্তিষ্ক বলে কোন জিনিস থাকে তাহলে স্পেনের আধিপত্যের বেড়ী থেকে নিজেদের উদ্ধার করো।

সোয়েস্ট। ও সব কথা বলো না। আমরা রাজার কাছে শপথ করেছি।

ভ্যালসেন। রাজাও আমাদের কাছে শপথে আবদ্ধ।

জেত্তার। একথার মধ্যে যুক্তি? ঠিক আছে, তোমার মতামত বল।

অন্যেরা। শোন ওর কথা। ওর বুদ্ধি আছে। ও চতুর।

ভ্যালসেন। আমার একজন গুরু ছিলেন। তাঁর কাছে অনেক বই ছিল। সেই সব বইএর মধ্যে ছিল আমাদের দেশের সংবিধান। তাতে আমি পেয়েছি আমরা হল্যাণ্ডবাসীরা এর আগে বরাবর আমাদের দেশীয় রাজাদের দ্বারাই শাসিত হতাম। তাঁরা দেশের প্রথাগত আইন কানুনের দ্বারা সাম্যের ভিত্তিতে দেশ শাসন করতেন। যদি কোন রাজা সংবিধান লঙ্ঘন করে বাড়াবাড়ি করতেন কখনো কোন বিষয়ে রাজ্যের জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ত তাঁর উপর। প্রত্যেক প্রদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা তার প্রতিবাদ করতেন। তাঁরা সব সময় রাজাদের কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখতেন।

মিস্ত্রী। এখন চুপ করো। আমরা তা জানি। প্রতিটি সৎ নাগরিকের উচিত দেশের সংবিধানে কি আছে তা জানা।

জেত্তার। ওকে বলতে দাও। আমরা সবার কাছ থেকেই কিছু না কিছু শিখতে পারি।

সোয়েস্ট। ও ঠিকই বলেছে।

অন্যান্য নাগরিকরা। বল বল, এ সব কথা রোজ শোনা যায় না।

ভ্যালসেন। তোমরা নাগরিকরা শুধু বর্তমানটাকেই বড় করে দেখ। তোমরা যেমন নিশ্চিন্তে পৈত্রিক ব্যবসা গ্রহণ করে তা চালিয়ে যাও তেমনি সরকারের শাসন মাথা পেতে মেনে নাও। কোন কিছু খতিয়ে দেখ না। তোমাদের দেশের ইতিহাসে কি আছে তা দেখ না। রাজপ্রতিনিধির অধিকারের সীমা পরিসীমা সম্বন্ধেও কোন খোঁজখবর নাও না। তোমাদের এই ঔদাসিন্যের সুযোগ নিয়েই স্পেনীয়রা তোমাদের উপর বিস্তার করেছে আধিপত্যের জাল।

সোয়েস্ট। রুজি রোজগার ঠিকমত পেলে কে ওসব বিষয়ে মাথা ঘামায়?

জেত্তার। এই সব বিষয়ে কেউ আগে আমাদের বলেনি কেন?

ভ্যালসেন। আমি এখন তোমাদের একথা বলছি। স্পেনের রাজা এখন

যে সব প্রদেশ শাসন করছেন দেশীয় শাসকদের তাড়িয়ে দিয়ে, সে শাসনের কোন অধিকার তাঁর নেই। বুঝলে কথাটা ?

জেত্তার। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বল।

ভ্যালসেন। এটা ত সূর্যালোকের মতই স্পষ্ট। তোমরা কি স্বদেশের আইন কানুন ও দেশীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত হতে চাও না ?

জনৈক নাগরিক। নিশ্চয় চাই।

ভ্যাল। কিন্তু তোমরা যদি এভাবে সব কিছু চলতে দাও তার ফল অন্য দাঁড়াবে। সামান্য একজন নারীর সাহায্যে ফিলিপ যা করতে চলেছে তা এর আগে বীর চার্লস, বীর যোদ্ধা ফ্রেডারিক ও পঞ্চম চার্লসও তা পারেনি।

সোয়েস্ট। এ দেশের প্রাচীন রাজারাও তাই করতেন অনেক সময়।

ভ্যাল। অতীতে কিন্তু রাজারা যাই করুক, আমাদের পূর্বপুরুষরা কড়া নজর রাখতেন সেই সব রাজাদের কাজকর্মের উপর। রাজাদের শাসনে যদি তাঁরা কোন প্রকারে কষ্ট বা অসুবিধা অনুভব করতেন তাহলে তাঁরা সেই রাজার পুত্র বা উত্তরাধিকারীকে হাত করে বন্দী করে রেখে দিতেন। তারপর কোন সুবিধা-জনক শর্তে তাকে মুক্তি দিতেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মানুষের মত মানুষ। তাঁরা জানতেন কিভাবে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। তাই তখন আমাদের স্বাধীনতা কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সোয়েস্ট। আমাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও ?

সকলে। আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে কিছু বল।

ভ্যাল। প্রতিটি প্রদেশেরই কিছু কিছু অধিকার আছে। কিন্তু আমাদের ব্রাবান্ত প্রদেশের অধিকারে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে। আমি তা পড়ে দেখেছি।

জেত্তার। ঠিক আছে।

ভ্যাল। এটা লেখা আছে যে ব্রাবান্তের ডিউকই আমাদের শাসনকর্তা হবেন।

সোয়েস্ট। সেই ভাল।

জেত্তার। একথা সত্যি ?

ভ্যাল। আরো লেখা আছে, তিনি কোনদিন তাঁর কোন স্বেচ্ছাচার, নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বা ক্ষমতা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবেন না আমাদের উপর।

জেত্তার। খুব ভাল। স্বেচ্ছাচারমূলক কোন ক্ষমতা চাপিয়ে দিতে পারবে না।

সোয়েস্ট। ব্যক্তিগত কোন খেয়াল খুশিও নয়।

অন্য নাগরিক। আমাদের রাজ্যে ঐ ধরনের কারো কোন ক্ষমতা বা প্রভুত্বকে প্রশ্রয়ও দিতে পারবেন না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব করতে পারবেন না।

জেত্তার। যে বইএ লেখা আছে সেই বইটা দেখাও।

অন্য একজন। এই বই নিয়ে আমরা রাজ প্রতিনিধির কাছে যাব।

অন্যরা। তুমিই হবে আমাদের প্রবক্তা।

জনগণ। তার গায়ে কেউ হাত দিলে দেখে নেব তাকে। আরো কিছু অধিকারের কথা লেখা থাকলে বল।

ভ্যাল। হ্যাঁ আছে, অনেক ভাল ভাল কথা আছে। লেখা আছে রাজা সামন্তগণ ও সব অঙ্গরাজ্যগুলির মতামত না নিয়ে বিশপদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবেন না। তাছাড়া তিনি দেশের সংবিধান পরিবর্তন করতেও পারবেন না।

সোয়েস্ট। একথা লেখা আছে?

ভ্যাল। আমি তোমাদের দেখাব। দু তিন শতাব্দী আগের লেখা।

এক নাগরিক। তাহলে নূতন বিদেশী বিশপদের কেন আমরা সহ্য করব? সামন্তরা আমাদের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসুক। তা না হলে আমরা গোলমাল করব।

অন্যরা। আমাদের আবার ধর্মমত পীড়নের ভয় দেখানো হচ্ছে।

ভ্যাল। এটা তোমাদেরই দোষ।

জনগণ। আমাদের কাউন্ট এগমঁত ও অরেঞ্জের মত সামন্ত আছেন। তাঁরাই আমাদের অধিকার রক্ষা করবেন।

ভ্যাল। ফ্ল্যাণ্ডার্সে তোমাদের ভাইরা ভাল কাজ শুরু করেছে।

সাবান প্রস্তুতকারক। কুকুর কোথাকার। (ভ্যালসেনকে মারল)

অন্যরা। (সাবান প্রস্তুতকারককে বাধা দিয়ে) তুমি কি স্পেনদেশীয়? (তাকে সকলে আক্রমণ করল)

মিস্ত্রী। চুপ করো তোমরা সকলে। এসবের মানে কি? (নাগরিকদের ভিড় জমে গেল। ছেলেরা শীষ দিতে লাগল। অনেক ছেলে ঢেলা ছুঁড়তে লাগল)

জনতা। আমাদের স্বাধীনতা আর অধিকার।

অনুচরবর্গসহ এগমন্তের প্রবেশ

এগমন্ত। শান্ত হও ভাইসব। কি ব্যাপার ?

মিস্ত্রী। আপনি স্বর্গ হতে দেবদূতের মত যথা সময়েই এসে পড়েছেন প্রভু। তোমরা দেখছ না, কাউন্ট এগমন্ত। ওকে অভ্যর্থনা জানাও।

এগমন্ত। তোমরা এখানে কি করছ ? নাগরিকের বিরুদ্ধে নাগরিক বিবাদ করছে। আমাদের রাজপ্রতিনিধি চলে যাচ্ছেন জেনে তোমরা উন্মাদের মত আচরণ করছ ? তোমরা আপন আপন কাজে চলে যাও। কাজের দিনকে ছুটির দিন ভেবেছ, না ? (জনতা শান্ত হয়ে এগমন্তের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াল)

মিস্ত্রী। ওরা ওদের অধিকারের জন্য লড়াই করছে।

এগমন্ত। সে অধিকার ওরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য হারাবে। তোমরা কারা ? তোমাদের সৎ লোক বলে মনে হচ্ছে।

মিস্ত্রী। আমরা সৎ হবার চেষ্টা করি।

এগমন্ত। তুমি কে ? কি কর ?

মিস্ত্রী। আমি একজন মিস্ত্রী।

এগমন্ত। আর তুমি ?

সোয়েস্ট। এক দোকানদার।

এগমন্ত। তুমি ?

জেত্তার। দর্জি।

এগমন্ত। আমার মনে পড়েছে। আমার লোক হিসাবেই তোমরা কাজ পেয়েছিলে। তোমার নাম জেত্তার নয় ?

জেত্তার। আপনি আজও আমার কথা মনে রেখেছেন ?

এগমন্ত। আমি যাকে একবার দেখেছি, যার সঙ্গে একবার কথা বলেছি তার কথা ভুলি না। যাও, তোমরা আপন আপন কাজ করগে। রাজাকে বিরক্ত করো না। যে সব সৎ নাগরিক শান্তি বজায় রেখে কাজ করে যায় তাদের কখনো স্বাধীনতা বা সুযোগের অভাব হয় না।

মিস্ত্রী। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য প্রভু। মাপ করবেন। ওরা জনগণের মধ্যে সেই সব অপদার্থ অলস অংশ যারা কিছু কাজকর্ম না করে অমনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে অধিকারের জন্য চিৎকার করবে। যত সব মাতাল ভবঘুরের দল। এক পাত্র মদের জন্য ওরা এমন গোলমাল বাধাবে যা হাজার হাজার লোকের শান্তিকে বিঘ্নিত করে তুলবে। ওরা তাই চায়। আমরা যে ঘর কত যত্নে

রক্ষা করে চলি ওরা সে ঘর মশাল দিয়ে জ্বালাতে চায়।

এগমঁত। তোমরা সর্বপ্রকারে সাহায্য পাবে। নূতন নীতির ঢেউকে রুখতে হবে। শুধু গোলমাল করেই অধিকার আদায় করা যায় না। ঘরে যাও। বাইরে এসে ভিড় করো না। শান্ত ও জ্ঞানী লোকরা অনেক কিছু করতে পারেন ঘরে বসে। জনতার মধ্যে অনেকে চলে যায়।

মিস্ত্রী। ধন্যবাদ প্রভু। আমাদের যথাসাধ্য করব। (এগমঁতের প্রস্থান) সত্যিই সজ্জন। প্রকৃত হল্যাণ্ডবাসী।

জেত্তার। আজ ওঁর মত লোককে যদি আমরা রাজপ্রতিনিধিরূপে পেতাম।

সোয়েস্ট। রাজা তাঁর খেয়ালখুশি মত নিজের লোককে বিভিন্ন পদে বসাবে। কোন কথা শুনবে না।

জেত্তার। ওঁর পোষাকে নূতন ফ্যাশানের ছাপ স্পষ্ট। ঠিক স্পেনীয়দের মত।

মিস্ত্রী। ভদ্রলোক বেশ সুদর্শন।

জেত্তার। রাত্রিতে আমি স্বপ্নেও এই সব দেখি।

এগমঁতের বাসভবন

এগমঁতের সচিব টেবিলে কাগজ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে অধৈর্যভাবে উঠে পড়ল।

সচিব। এখনো তিনি এলেন না। আমি কাগজ কলম নিয়ে ছ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। তিনি বেরোবার সময় আমাকে সময়ানুবর্তী হবার জন্য উপদেশ দিয়ে যান। অথচ তিনি এখনো এলেন না। আমার হাতে এখন যে কাজ তা মধ্যরাত্রির আগে সারা হবে না। তিনি অপরের দোষত্রুটির প্রতি উদাসীন। আমার মনে হয় তিনি আর একটু কড়া হলে ভাল হত। ছ ঘণ্টা হলো তিনি রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসেছেন। পথে আবার কার সঙ্গে দেখা হলো কে জানে?

এগমঁতের প্রবেশ

এগমঁত। কি খবর, কাজকর্মের অবস্থা কি?

সচিব। আমি প্রস্তুত। চারজন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

এগমঁত। আমি তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি। মনে হচ্ছে তোমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

সচিব। আপনার আদেশ মত কাজকর্ম সেরে অপেক্ষা করছি আমি। কাগজ-পত্র সব তৈরি।

এগমঁত। ডন্না এলভিয়া যদি জানতে পারে আমি তোমাকে আটকে রেখেছি তাহলে রেগে যাবে আমার উপর।

সচিব। আপনি ঠাট্টা করতে ভালবাসেন।

এগমঁত। না, এতে লজ্জার কিছু নেই। তোমার রুচিবোধ আছে। মেয়েটি সুন্দরী। রাজসভায় তোমার একজন বন্ধু থাকা উচিত, এতে আমার আপত্তির কিছু নেই। চিঠিপত্র কিছু আছে?

সচিব। আছে অনেক। তবে সন্তোষজনক চিঠিপত্রের সংখ্যা খুবই কম।

এগমঁত। বাড়িতে যদি শান্তি থাকে তাহলে সে শান্তি বাইরে বা বিদেশে খোঁজার কোন দরকার নেই। বিশেষ মনোযোগ দেবার মত কিছু আছে?

সচিব। আছে প্রভু, তিনজন বিশেষ দূত অপেক্ষা করছে আপনার জন্য।

এগমঁত। ঠিক আছে, এই বিশেষ দরকারী কাজটা সেরে ফেল তাড়াতাড়ি। একে একে ডাক। ওদের চিঠিগুলো দেখ।

সচিব। কেণ্ট ও তার আশপাশের জেলায় যে সব ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে ক্যাপ্টেন ব্রেডা এক বিবরণ পাঠিয়েছেন। যে গোলমাল চলছিল তার বেশীর ভাগ শান্ত হয়েছে এখন।

এগমঁত। তবে তার বিবরণে নিশ্চয় ব্যক্তিগত বোকামি আর বাড়াবাড়ির কাজের কথাই বেশী আছে।

সচিব। হ্যাঁ, ঠিক তাই প্রভু।

এগমঁত। আর পড়ে শোনাতে হবে না।

সচিব। ভার্ভিয়েরে যে ছয়জন লোক মেরির মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উনি জানতে চেয়েছেন অন্যদের মত তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে কি না।

এগমঁত। ফাঁসির ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগে না। ওদের বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দিতে বল।

সচিব। তাদের মধ্যে দুজন নারী আছে। তাদেরও কি বেত্রাঘাত করা হবে?

এগমঁত। তাদের ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

সচিব। ব্রেডার সেনাদলের মধ্যে ব্রিঙ্ক নামে এক সৈনিক বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ব্রেডা চায় আপনি যেন তাকে অনুমতি না দেন। কারণ সেনাদলে অনেক মেয়ে আছে। তাদের বেদেনীর মত দেখায়। তাদের মধ্যে তাহলে শৃংখলা থাকবে না।

এগমঁত। কিন্তু ওর ব্যাপারে কিছুটা শিথিল হতে হবে আমাদের। ছেলেটি বড় ভাল। ও আমাদের অনেক অনুরোধ করেছিল আসার সময়। তবে এই হলো শেষ অনুমতি দান। ওদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে আমার সত্যিই বড় কষ্ট হয়। এছাড়া আমোদ প্রমোদ বলতে ত ওদের কিছুই নেই।

সচিব। আপনার সমর্থক দুজন লোক এক পান্থশালার মালিকের একটি কন্যাকে একা পেয়ে তার শালীনতা নষ্ট করে।

এগমঁত। মেয়েটি যদি সৎ হয় এবং তার উপর তারা বলপ্রয়োগ করে থাকে তাহলে লোকটাকে পর পর তিন দিন ধরে বেত্রাঘাত করা হবে। আর ওদের সম্পত্তি থেকে বেশ একটা অংশ নিয়ে মেয়েটিকে দিয়ে খুশি করা হবে।

সচিব। একজন বিদেশী ধর্মপ্রচারক ধরা পড়েছে। সে বলেছে সে ফরাসী দেশ যাচ্ছিল। আইন অনুসারে তার ফাঁসি দেওয়া উচিৎ।

এগমঁত। তাকে সঙ্গে করে দেশের শেষ সীমানা পার করে দিয়ে আসবে। সেখানে তার যাবার সময় তাকে সতর্ক করে দেবে যদি সে আবার আসে তাহলে এত সহজে সে ছাড়া পাবে না।

সচিব। আপনার বাড়ির প্রধান কর্মচারী চিঠিতে জানিয়েছে টাকা গোলমালের জন্য ঠিকমত আসছে না। তাই অতি কষ্টে সে আপনি যে টাকার কথা লিখেছেন তা পাঠিয়ে দিয়েছে।

এগমঁত। টাকা চাই-ই। সে দেখুক কি ভাবে কোথা থেকে টাকা পাওয়া যায়।

সচিব। সে তা করবে বলেছে। যে রেমণ্ড তার ঋণ পরিশোধ করেনি তাকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব দিয়েছে।

এগমঁত। কিন্তু সে ত টাকা শোধ করে দেবে বলেছে।

সচিব। পনের দিন আগে সে শেষ দিন দিয়েছিল। তা পার হয়ে গেছে।

এগমঁত। আর পনের দিন সময় দিতে বল। তারপর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সচিব। কিন্তু রেমণ্ড ইচ্ছা করে টাকা শোধ করছে না। তার সামর্থ্য আছে। আপনি যদি সত্যি সত্যিই চাপা দেন সে কোন অজুহাত দেখাতে পারবে না। আপনার কর্মচারি আরো বলেছে, বৃদ্ধ সৈনিক ও বিধবাদের যে মাসিক বৃত্তি আপনি দেন তা আপাততঃ বন্ধ করে দিতে। তারপর একটা কিছু ভাবা যাবে। তারা যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবে এর মধ্যে।

এগমঁত। কিন্তু কি ব্যবস্থা করবে তারা? তারা গরীব। আমার থেকে তাদের টাকার দরকার অনেক বেশী। তাকে এসব ভাবতে হবে না।

সচিব। কিন্তু কি করে সে এত টাকা যোগাড় করবে?

এগমঁত। কি করে যোগাড় করবে সেটা তারই দেখার কথা। আগের চিঠিতে তাকে তা বলা হয়েছিল।

সচিব। বলা হয়েছিল বলেই সে এই সব প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

এগমঁত। এ সব প্রস্তাবে কাজ হবে না। এমন উপায় তাকে খাড়া করতে হবে যা মানা যায়। সবচেয়ে আগে টাকা যোগাড় করতে হবে।

সচিব। কাউন্ট আলভা আবার চিঠি দিয়েছেন। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি এই বৃদ্ধ কাউন্টকে নিজের হাতে চিঠি লেখার কথা আপনার ছিল। তিনি আপনাকে পুত্রের মত ভালবাসেন।

এগমঁত। আমার একেবারে সময় নেই। তোমার হাতের লেখাটা আমার মত। আমার হয়ে তুমিই লিখে দাও। লেখার ব্যাপারটা সবচেয়ে ঘৃণ্য ও অবাঞ্ছিত ব্যাপার। আমি অরেঞ্জের জন্য অপেক্ষা করছি। তাঁর ভয় নিরসনের জন্য কিছু সান্ত্বনার কথা লিখে দেবে।

সচিব। আপনি তাঁকে কি লিখবেন তার একটা আভাস আমাকে দিন। আমি তার একটা খসড়া করে আপনাকে দেখাব। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে আদালতে সেটা আপনার লেখা হিসাবেই গ্রাহ্য হয়।

এগমঁত। আমাকে চিঠিটা দাও। (চিঠিটা একবার দেখে) হে শ্রদ্ধেয় সজ্জন বয়োপ্রবীণ, আপনি কি যৌবনে আপন জীবনের জন্য এত সতর্কতা অবলম্বন করে চলতেন? যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে সব সময় কি যুক্তিবোধের বশে চলতে পারতেন? নিজের জীবনরক্ষার জন্য যে লোককে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতে হয় সে বেঁচে থাকতেও একরকম মৃত। আমার জন্য কাউকে ভাবতে হবে না। আমি অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করি এবং আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু সন্তুষ্ট থাকা দরকার তা থাকি। আপনার নাম করে সে যতটা পারে রাজসভায় আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

সচিব। এই হয়ে গেল? তিনি আরো কিছু চেয়েছেন।

এগমঁত। আর আমি কি বলতে পারি? আরো যদি কিছু লিখতে চাও তাহলে তুমি তা লেখ। আসল ব্যাপার একটাই। তিনি যেভাবে আমাকে বাঁচতে বলেছেন আমি সেভাবে বাঁচতে পারব না। আমি হাসিখুশিতে জীবন কাটাই,

সব জিনিস সহজভাবে গ্রহণ করি। এটা আমার স্বভাব। আমি স্পেনীয় রীতিতে জীবন যাপন করতে পারব না। আমি নূতন নিয়ম কানুনের দ্বারা নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। পারব না সমাধিসুলভ নিরাপত্তা মেনে নিতে। ভবিষ্যতের আনন্দের জন্য বর্তমানের আনন্দচঞ্চল মুহূর্তগুলিকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। অথবা কোন অলস ভয় আর উদ্বেগে দিন কাটাতে পারব না।

সচিব। আমার কথা শুনুন। স্যার, দেখুন উনি আপনার প্রতি উদ্বেগবশতঃ কত সূক্ষ্মভাবে আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আপনি রূঢ় হবেন না। ওঁকে কয়েকছত্র অন্ততঃ সান্ত্বনার কথা লিখে দিন।

এগমঁত। উনি বারবার শুধু একই কথা বলেন। উনি আগে থেকেই জানেন আমি এসব পছন্দ করি না। ধরো, আমার যদি নিদ্রাহীনতা রোগ থাকত এবং সারারাত আমি যদি প্রাসাদের উপর পায়চারি করে কাটাতাম তাহলে উনি আমাকে তার বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে কি করতেন? প্রত্যেককে আপন আপন পথে চলতে দাও। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে দাও।

সচিব। নির্ভীক হওয়া আপনার পক্ষে খুবই ভাল কথা। কিন্তু যাঁরা আপনাকে ভালবাসেন—

এগমঁত। আমাদের হাসিখুশির উচ্ছলতা দিয়ে আমাদের নগ্ন নিঃস্ব জীবনটাকে যদি ভরিয়ে তুলি তাহলে ক্ষতি কি তাতে? জীবনে সব কিছুকে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে কি লাভ বলতে পার? প্রতিদিনের সকালের আলোর অর্থ কি শুধু গত দিনের অথবা ভবিষ্যৎ দিনের কথা চিন্তা করা? জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত খুশি ভাবনা চিন্তা করে স্বার্থসিদ্ধি করে। আমাদের হিতাকাঙ্খী বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছোট জিনিসকে বড় বেশী করে দেখিয়ে গুরুত্ব দান করছেন। যেন মনে হচ্ছে তিনি ভালবেসে আমাদের করমর্দন করতে এসে হাতটা ছাড়ছেন না। অযথা ধরে রেখেছেন।

সচিব। আমার মতে কোন পথচারী তার পাশ দিয়ে কোন রথকে দ্রুত চলে যেতে দেখলে অস্বস্তি ও বিব্রত বোধ করে।

এগমঁত। অদৃশ্য কালের অশ্ব আমাদের ভাগ্যের যে রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে তার রশ্মি ধরে সে রথ চালনা করে কেউ কিছু করতে পারে কি? সে রথ কোথায় যাচ্ছে কেউ জানতে পারে কি? কেউ কি বলতে পারে কোথা থেকে সে এ জীবনে এসেছে?

সচিব। হে আমার প্রভু শুনুন।

এগমঁত। আমি অনেক উপরে উঠেছি, আরো উপরে উঠতে চাই। সাহস, শক্তি এবং আশা আকাঙ্খা আচ্ছন্ন করে আছে আমার সমগ্র অন্তরাত্মাকে। আমি আমার উচ্চাভিলাষের সর্বোচ্চ স্তরে এখনো উঠতে পারিনি। একবার সেখানে উঠে গেলে আমি সাহসের সঙ্গে সেখানে অবশ্যই টিকে থাকব। আর যদি বজ্রপাত, ঝঞ্ঝা বা ভুল পদক্ষেপের জন্য খাদের মধ্যে পড়ে যাই তাহলেও দুঃখ করব না, অসংখ্য ব্যর্থ বিড়ম্বিত লোকের মত সেই খাদের মধ্যেই অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকব। কাজের ক্ষেত্রে কুণ্ঠা বা দ্বিধার কোন স্থান নেই আমার জীবনে। কারণ জীবনের মূল্যবান সব কিছুই যে কোন মুহূর্তে ত্যাগ করতে পারি আমি।

সচিব। হে আমার প্রভু, একটু ভেবে দেখুন দয়া করে, আপনি কি বলছেন তার অর্থ আপনি জানেন না।

এগমঁত। কাগজপত্র ঠিক করে পাঠিয়ে দাও সব। অরেঞ্জ এখনি এসে পড়বে। দূতদের পাঠিয়ে দাও নগরদ্বার বন্ধ হবার আগেই। কাউন্টের চিঠিটা আগামী কাল পর্যন্ত রেখে দাও। এলভিয়ার সঙ্গে দেখা করে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবে তাকে। রাজ প্রতিনিধির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবে। তাঁর শরীর ভাল নেই। অবশ্য মুখে তিনি একথা স্বীকার করেন না। (সচিবের প্রস্থান)

অরেঞ্জের প্রবেশ

এগমঁত। এস এস অরেঞ্জ, তোমাকে কেমন চঞ্চল দেখাচ্ছে।

অরেঞ্জ। রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের আলোচনা সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?

এগমঁত। আমি ত তাঁর আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। আমি এর আগে তাঁকে এইভাবেই অনেকবার দেখেছি। তবে আজ তাঁকে অসুস্থ মনে হলো।

অরেঞ্জ। তুমি লক্ষ্য করনি আগের থেকে আজ উনি অনেক গম্ভীরভাবে কথা বলছিলেন। দেশজোড়া বিদ্রোহের পটভূমিকায় আমাদের ভূমিকা সম্বন্ধে কটাক্ষ করে কথা শুরু করলেন। তারপর তাঁর সেই পুরনো কথাটা তুললেন অন্য বারকার মত। অর্থাৎ আমরা হল্যাণ্ডবাসীরা তাঁর বন্ধুত্বকে যথাযথ স্বীকৃতি দান করছি না। তাঁর কাজ করতে এখানে আর ভাল লাগছে না। রাজা যা খুশি করতে পারেন। একথা শুনেছিলেন ?

এগমঁত। আমি তখন অন্য কথা ভাবছিলাম। যাই হোক, তিনি মেয়েমানুষ।

অন্য মেয়ের মত তিনিও ভাবেন সবাই তাঁর কথা অপ্রতিবাদে মেনে নেবে। যত সব জাতীয় ঝগড়া বিবাদ, দলগত বিরোধ অকস্মাৎ কোন এক ঐন্দ্রজালিক কথার প্রভাবে মিটে যাবে। সব বিক্ষোভ নিমেষে শান্ত হয়ে যাবে। যখন দেখেন আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না তখন তিনি রেগে যান, অশুভ পরিনামের কথা বলেন, চলে যাবার ভয় দেখান। এ ছাড়া কিই বা করবেন।

অরেঞ্জ। এবার মনে হয় তাঁর এই ভীতি প্রদর্শন সত্যে পরিণত হবে।

এগমঁত। কখনই না। কতবার আমি তাকে যাবার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর ভাইএর রাজসভায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ম্লান দেখাবে। সেখানে সুবিধা হবে না। ইতালিতে গিয়ে পুরনো আত্মীয় স্বজনদের কাছে গিয়ে কোনরকমে দিনযাপন ছাড়া আর কোন পথ নেই।

অরেঞ্জ। এটা তিনি করতে পারবেন না কারণ এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট কুণ্ঠা আছে। তবে এছাড়া তাঁর কোন উপায় নেই। কারণ নূতন অবস্থার জটিলতা প্রত্যাখ্যাত ও অবহেলিত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে। এখন তিনি যদি সত্যি সত্যিই চলে যান তাহলে রাজা নিশ্চয় অন্য একজন প্রতিনিধি পাঠাবেন।

এগমঁত। কেন, নূতন যিনি আসবেন তাঁরও মাথায় অনেক পরিকল্পনা থাকবে। প্রথম কয়মাস পরিকল্পনা রূপায়ণে কেটে যাবে, তারপর সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে বেশ কয়েকমাস কেটে যাবে। একটা প্রদেশের গোলমাল কাটাতেই হয়ত গোটা একটা বছর কেটে যাবে। মোট কথা আসল কাজ তিনি মোটামুটি কিছু না করে কোনরকমে সব কিছু একটু একটু করে ঠেকিয়ে রাখবেন।

অরেঞ্জ। কেন; রাজাকে ত একটা পরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

এগমঁত। কিসের পরীক্ষা?

অরেঞ্জ। কেন, রাজপ্রতিনিধিকে সাহায্য করার জন্য যে সংস্থা রয়েছে সেই সংস্থাই কাজ চালিয়ে যাবে।

এগমঁত। কি করে তা সম্ভব?

অরেঞ্জ। এগমঁত, আমরা দাবার খেলোয়াড় হয়েও আমাদের প্রতিপক্ষের অগ্রগতিকে কোন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এখন আমি সচেতন হয়েছি। বিজ্ঞানী যেমন সব জিনিসের অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন আমিও তেমনি

সব পক্ষের গতি প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে চলেছি। আমার মনে হয় বড় রকমের একটা গোলযোগ ঘটবে রাজার সঙ্গে। উনি নিশ্চয় অন্য কোন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এগমঁত। আমি তা বিশ্বাস করি না। কোন মানুষ বার্ধক্যের সময়ে যখন দেখে জগৎ ও জীবনটাকে নিজের ইচ্ছামত চালানো যায় না তখন সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। নতুন কোন ব্যবস্থা বা পথের কথা ভাবে না।

অরেঞ্জ। রাজা একটা ব্যবস্থা কখনো নেননি।

এগমঁত। কি সে ব্যবস্থা?

অরেঞ্জ। তিনি মনে হয় জনগণ ও দেশীয় রাজা রাজরাদের অধিকার খর্ব বা উচ্ছেদ করবেন।

এগমঁত। অনেকেই অনেক দিন ধরে এ ভয় করে আসছে। এ উদ্বেগের আমাদের কোন কারণ নেই।

অরেঞ্জ। একদিন এ বিষয়ে আমার একটা উদ্বেগ ও সংশয় ছিল। এখন সেই সংশয়টা সত্যে পরিণত হয়ে উঠেছে।

এগমঁত। আমাদের মত অনুগত লোক রাজা পাবেন কোথায়?

অরেঞ্জ। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের কথা তুললে রাজা যদি রেগে যান, যদি তিনি আমাদের সেই দাবিকে আমাদের আনুগত্য ও রাজভক্তির অভাব হিসাবে গণ্য করেন?

এগমঁত। সে ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। গোল্ডেন ফ্লীস এর নাইটদের সমবেত হতে বল। তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে আমরা তাই মেনে নেব।

অরেঞ্জ। কিন্তু যদি বিচারের আগেই শাস্তির রায় বেরিয়ে যায়?

এগমঁত। রাজা ফিলিপ এত বড় অন্যায় করবেন না। তিনি বা তাঁর পারিষদ এই বোকামির ঝুঁকি নিতে পারেন না।

অরেঞ্জ। যদি তাঁরা এই অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার ঝুঁকি নেন তাহলে কি হবে?

এগমঁত। না অরেঞ্জ। এটা অসম্ভব। আমাদের বৃথা ধরপাকড় করে তারা অত্যাচারের ঢেউটাকে এতখানি উঠতে দিতে পারেন না। যে বাতাস এই মিথ্যা ভিত্তিহীন সংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে সেই বাতাস থেকেই দেশে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহের আগুন। কিন্তু তার ফল রাজা কি পাবেন? তিনি ত আমাদের উপর সরাসরি কিছু করতে পারেন না। তবে যদি গুপ্তহত্যার পথ নেন। কিন্তু

তাতে ত সারা দেশময় আগুন জ্বলে উঠবে। স্পেনের সঙ্গে আমাদের চির-দিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

অরেঞ্জ। আমাদের কবরের উপর যদি অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে আর সেই আগুনে যদি শত্রুদের রক্ত অঞ্জলির মত ঝরে পড়ে তাহলে তাতে আমাদের লাভ কি বলতে পার? কথাটা ভেবে দেখ এগমঁত।

এগমঁত। কিন্তু কি করে তাঁরা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবেন?

অরেঞ্জ। আলভা সসৈন্যে এগিয়ে আসছে।

এগমঁত। আমার তা বিশ্বাস হয় না।

অরেঞ্জ। আমি তা জানি।

এগমঁত। রাজপ্রতিনিধি একথা জানেন বলে মনে হলো না।

অরেঞ্জ। আর এই কারণেই আমার বিশ্বাসটা বেড়ে যায়। রাজপ্রতিনিধি তাকে আশ্রয় দেবে। আমি তাঁর রক্তপিপাসার কথা জানি। তিনি তাঁর সঙ্গে সৈন্যদল নিয়ে আসছেন।

এগমঁত। তাতে জনগণ ক্ষেপে উঠবে। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে।

অরেঞ্জ। জনগণের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

এগমঁত। না, না।

অরেঞ্জ। চল আমরা আপন আপন প্রদেশে চলে যাই। সেখানে আমরা আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারি। ডিউক আমাদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতায় নামবে না।

এগমঁত। উনি যখন আসবেন আমরা ওঁকে অভ্যর্থনা জানাব না?

অরেঞ্জ। আমরা দেরি করব এ ব্যাপারে।

এগমঁত। রাজা আসার সঙ্গে সঙ্গে ডিউক-যদি রাজার নামে আমাদের ডেকে পাঠায়?

অরেঞ্জ। আমরা এড়িয়ে যাব।

এগ। যদি ওরা চাপ দেয়?

অরেঞ্জ। আমরা অজুহাত দেখাব, আসব না।

এগ। তাহলে যুদ্ধ ঘোষিত হবে। আমরা বিদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত হব। যুক্তিবোধে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে বিভ্রান্ত করো না অরেঞ্জ। আমি জানি তুমি ভয়ে মাথা নত করো না কখনো। তবে একবার ভেবে দেখো কোন কিছু করার আগে।

অরেঞ্জ। আমি ভেবে দেখেছি।

এগ। আর একথায় ভেবে দেখ তোমার কাজ অন্যায় হচ্ছে কি না। তুমি একথা না বললেও সমস্ত প্রদেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীরা সব রকমের কঠোর অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে এবং তার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে। যে যুদ্ধ যে গোলমাল আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি তোমরা তাই বাধিয়ে তুলবে। যাদের স্বাধীনতার জন্য তখন লড়াই করবে তারাই কোথায় চারদিকে মরে পড়ে থাকবে। কত নারী শিশু ও মানুষ চারদিকে মরবে।

অরেঞ্জ। আমরা সাধারণ মানুষ নই এগমঁত। অসংখ্য মানুষের জন্য আমাদের আত্মবলির যদি দাম থাকে তাহলে সেই অসংখ্য মানুষের জন্য আমাদের বেঁচে থাকারও প্রয়োজন আছে।

এগ। কিন্তু সবাই যখন মরে তখন যে স্বার্থপরের মত বাঁচতে চায় সে তার নিজের সততায় নিজেই সংশয়াপন্ন হয়ে ওঠে।

অরেঞ্জ। নিজের উদ্দেশ্যের সততায় যদি আমার বিশ্বাস থাকে তাহলে আমি এগিয়ে যেতে বা পিছিয়ে যেতে পারি।

এগ। তোমার কাজ থেকেই প্রমাণ হবে তুমি ভয় পেয়ে গেছ।

অরেঞ্জ। জ্ঞান ও সাহসের সঙ্গেই অবশ্যম্ভাবী এক বিরাট শক্তির সম্মুখীন হতে হবে আমাদের।

এগ। আসন্ন বিপদের সময়ে দেখতে হবে কোন রকম একটু আশা পাওয়া যায় কিনা।

অরেঞ্জ। আমাদের দাঁড়াবারও কোথাও জায়গা নেই। আমরা শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি।

এগ। রাজার আনুকূল্যের কি কোন দাম নেই ?

অরেঞ্জ। সে আনুকূল্যের ভিত্তি শুধু সংকীর্ণ নয়, পিচ্ছিল।

এগ। ঈশ্বরের নামে বলছি তাঁর সম্বন্ধে ভুল কথা বলা হচ্ছে। তাঁর সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা আমি কখনই মেনে নিতে পারব না। চার্লসএর পুত্র এত নীচ হতে পারে না।

অরেঞ্জ। রাজার কাজের কোন মূল্যই নেই।

এগ তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের আগে ভাল করে জানা উচিত।

অরেঞ্জ। আমরা এইটুকু বুঝি যে তার এই বিপজ্জনক পরীক্ষা নীরিক্ষার ফল

কি হবে তা নিয়ে অপেক্ষা করা আমাদের উচিত হবে না।

এগ। যে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলের আমরা সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হতে পারি তা কখনো বিপজ্জনক হতে পারে না।

অরেঞ্জ। তুমি রেগে যাচ্ছ।

এগ। আমি আমার নিজের চোখ দিয়ে দেখতে চাই।

অরেঞ্জ। তোমার চোখ খোলা রয়েছে বলে তুমি ভাবছ সব দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তা ঠিক নয়। একবার যদি তুমি আমার চোখ দিয়ে দেখতে! আমি চলে যাচ্ছি। আলভাকে আসতে দাও। ঈশ্বর যেন তোমায় রক্ষা করেন। সে প্রচুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে আসছে। গোটা শহরটাকে ঘিরে ফেলবে। তবে শত্রুরা আমাদের দুজনকে একসঙ্গে না পেলে হয়ত একজনকে নাও ধরতে পারে। যাই হোক, খুব সাবধানে থাকবে। সব কিছু সতর্কতার সঙ্গে দেখবে। এখানে যা যা ঘটবে তার কথা আমাকে সব জানাবে।

এগ। কি করবে তুমি?

অরেঞ্জ। (হাত ধরে) আমার কথা শোন। আমার সঙ্গে চল।

এগ। একি অরেঞ্জ, তুমি কাঁদছ?

অরেঞ্জ। কোন হারানো বন্ধুর জন্য কাঁদাটা কি অন্যায়?

এগ। তুমি আমাকে হারানো বন্ধু বলে ভাবছ?

অরেঞ্জ। হ্যাঁ এগমন্ত, তুমি হারিয়ে গেছ। ভেবে দেখ, আর খুব অল্প সময়ই বাকি আছে। বিদায়। (প্রস্থান)

এগ। (একাকী) অপরের চিন্তা আমাদের উপর এক এক সময়ে কি অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। আমার মনে কোন ভয় ছিল না। কিন্তু তার অনুরোধ আমার মনে ভয়ের সঞ্চার করছে।

তৃতীয় অঙ্ক

রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ

রাঃ প্রতি। আমি হয়তো এটা আগেই ভেবেছিলাম। মানুষ আশা ও উদ্বেগের আতিশয্যের বশবর্তী হয়ে ভাবে তার সব কামনা পূরণ হবে। দূর থেকে মনে হয় সে একদিন লক্ষ্যে পৌঁছবেই। হে রাজন, দেখে যাও আমি রাজত্ব করতে করতে কত সহজে তা ছেড়ে দিয়ে যেতে পারি।

মেকিয়াভেল পিছনে এসে দাঁড়াল

রাঃ প্রতি। এস মেকিয়াভেল, আমি চিঠিটার কথা ভেবে দেখছি।

মেকিয়া। চিঠির বিষয়বস্তুটা কি তা জানতে পারি ?

রাঃ প্রতি। এতে আমার প্রতি মমতা আর রাজ্যের প্রতি উদ্বেগ দুটোই আছে। আমি এই সব প্রদেশে রাজার স্বার্থ দেখতে গিয়ে যে দৃঢ়তা, শ্রম ও আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছি তার প্রশংসা করেছেন তিনি। বিক্ষুব্ধ জনগণ আমাকে জ্বালাতন করছে শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আমার নীতি ও বিচক্ষণতায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মেকিয়া। তিনি ত আপনার কাছে এর আগেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

রাঃ প্রতি। কিন্তু এই প্রথম তাঁর চিঠিতে এত অলঙ্কারের ছড়াছড়ি দেখলাম।

মেকিয়া। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

রাঃ প্রতি। এই সব প্রস্তাবনার পর তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে এখানে একদল সৈন্য না থাকলে আমি কিছু করতে পারব না। তিনি আরও বলেছেন জনগণের চাপে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সৈন্য তুলে নিয়ে আমরা ভুল করেছি। এখানে একটা সৈন্যাবাস থাকলে এদিককার জনগণ হঠাৎ বিদ্রোহ করতে পারবে না।

মেকিয়া। কিন্তু তাতে জনগণ ক্ষেপে যাবে।

রাঃ প্রতি। রাজা মনে করেন, একজন কুশলী সেনাপতি যিনি কথায় কথায় যুক্তির ধার ধারেন না তিনিই সাধারণ মানুষ, সামন্ত, নাগরিক ও কৃষক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যে কোন বিরোধ বা সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। তাই তিনি এক শক্তিশালী সেনাদলসহ আলভাকে পাঠাচ্ছেন।

মেকিয়া। কোথায় পাঠাতে হবে তা আগে জানতে চেয়েছিলেন ?

রাঃ প্রতি। রাজা কোন মত নেন না কারো। পাঠাতে ইচ্ছে হয়েছে পাঠাচ্ছেন।

মেকিয়া। আপনি তাহলে একজন সুদক্ষ সেনাপতির সাহায্য লাভ করবেন।

রাঃ প্রতি। আমি সাহায্য পাব ? কি বলছ মেকিয়াভেল ?

মেকিয়া। আপনার মনে কি আছে তা কি করে জানব ?

রাঃ প্রতি। এটা সত্যিই আমার খারাপ লাগছে। রাজা স্বরাষ্ট্র সচিবের লেখা চিঠিতে সই করার আগে তাঁর ভেবে দেখা উচিত ছিল।

মেকিয়া। ওরা কি এ কাজের গুরুত্ব আগে থেকে বুঝতে পারছেন না ?

রাঃ প্রতি। আমি তাদের চিনি। রাজা আর তাঁর পারিষদ মিলে একটা

ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছেন। তাঁরা চান কঠোর হস্তে সব বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু সামনে না এসে বিশ্বস্ত একজনের উপর ভার দিয়ে পাঠাচ্ছেন।

মেকিয়া। এতদূর এগিয়ে গেছেন ?

রাঃ প্রতি। রাজার পরিষদে সব রকমের লোকই আছে। তার মধ্যে আছেন সৎ, অভিজ্ঞ ও নরমপন্থী রোভারিগো। তিনি খুব উপরে উঠতে চান না, আবার খুব নিচেতেও নামতে চান না। তারপর আছেন খাড়াখাড়ি মেজাজের এ্যালোঞ্জো, আছেন পরিশ্রমী ফ্রেনেডা, আছেন ধীর স্থির ভার্গাস। আবার এঁদের মাঝে আছে কোটরাগত চক্ষুবিশিষ্ট তোলেঙ্গানা কোটরাগত চোখে আগুনের দৃষ্টি। রাজাকে সব সময় পরামর্শ দেন মেয়েদের দ্বারা কোন কাজ হবে না। মেয়েরা পোষমানানো ঘোড়ায় চড়তে ওস্তাদ, কিন্তু কোন ঘোড়াকে পোষ মানাতে পারে না। রাজনীতির লোকদের কাছ থেকে এসব কথা আমি ছোট থেকে শুনে আসছি।

মেকিয়া। আপনি আপনার ছবি থেকে ঠিক রংই বাছাই করেছেন।

রাঃ প্রতি। কিন্তু যে সব রঙের কথা আমি বললাম তার মধ্যে আলভার মত উজ্জ্বল রং আর কারো আছে কি ? আলভা প্রতিটি মানুষকেই নাস্তিক ও বিশ্বাসঘাতক ভাবে, কারণ একমাত্র এই অভিযোগের দোহাই দিয়ে তাদের উপর যথেচ্ছ পীড়ন চালানো যাবে, তাদের ইচ্ছামত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা যাবে। আমি এখানে এতদিন ধরে যে সব ভাল কাজ করেছি তা ওরা দেখতে পাবে না। যে সব বিবাদ ও গোলমাল অতীতে কখন ঘটে গেছে, যে বিক্ষোভ শান্ত হয়ে গেছে আলভা এসে সেইগুলো খুঁচিয়ে তুলবে। এইভাবে সে রাজার কাছে এমন একটা মিথ্যা ছবি তুলে ধরবে যাতে মনে হবে এখানকার মানুষ একে অন্যকে ধরে ধরে খাচ্ছে। সে এখানকার মানুষদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। এদের পশু ও রাক্ষস মনে করে আর ভাবে শুধু আগুন আর বারি দিয়েই সব বিদ্রোহ সব বিক্ষোভ ঠাণ্ডা করা যাবে।

মেকিয়া। ব্যাপারটাকে আপনি খুব বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি রাজপ্রতিনিধি থাকছেন ?

রাঃ প্রতি। আমি জানি কিভাবে মানুষকে পদচ্যুত না করেও সরানো যায়। রাজকর্মে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। প্রথমতঃ ও এসে ওর নিয়োগপত্র দেখাবে তাতে যত সব দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কথা লেখা থাকবে। এইভাবে সে তার নজের প্রভুত্ব প্রসারিত করবে ধীরে ধীরে। আমি যদি তার কোন কাজ

করি তাহলে সে গোপন নির্দেশের কথা বলবে। আমি তা দেখতে চাইলে সে তা এড়িয়ে যাবে কৌশলে। সে হয়ত অন্য একটা কাগজ দেখাবে। আমি তা না মানলে সে সরাসরি আমার হস্তক্ষেপ মানবে না। যে কাজ আমি ভয়ে করতে পারব না তা সে অনায়াসে করবে। আমার সব পরিকল্পনা এইভাবে ব্যর্থ করে দেবে সে।

মেকিয়া। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করছে।

রাঃ প্রতি। তার কঠোরতা আর নিষ্ঠুরতা নিবিয়ে যাওয়া বিপ্লবের আগুনটাকে আবার জ্বালিয়ে তুলবে। আমার চোখের সামনে আমার সব আরব্ধ কাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ তার কুকর্মের জন্য আমাকে দোষ পেতে হবে।

মেকিয়া। ধৈর্য ধরুন।

রাঃ প্রতি। চুপ করে থাকার মত আত্মসংযম আমার আছে। তাকে আসতে দাও। সে এলে আমি যথাসম্ভব তাকে স্থান করে দেব সে আমাকে সরিয়ে দেবার আগেই।

মেকিয়া। এতবড় একটা ব্যবস্থা এত হঠাৎ গ্রহণ করা হলো!

রাঃ প্রতি। এর কঠোরতা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আজ যিনি দেশশাসন করছেন, যাঁর হাতে অজস্র মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে তাঁকে হঠাৎ সিংহাসন থেকে নেমে এসে কবরে যেতে হলো।

ক্ল্যারার বাসভবন।

ক্ল্যারা ও তার মা

ক্ল্যারার মা। ব্রেকেনবার্গের মত ভালবাসা আমি কোথাও কখনো দেখিনি। শুধু রোমান্স বইয়েই এই ধরনের ভালবাসার কথা শোনা যায়।

ক্ল্যারা। (পায়চারি করতে করতে গান করছিল) প্রেমের রোমাঞ্চকর আবেগের সঙ্গে কোন আনন্দের তুলনা হয়?

মা। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তুমি এগমঁতকে ভালবাস। তবু যদি তুমি তাকে একটু ভাল চোখে দেখ তাহলে সব সত্ত্বেও সে তোমায় বিয়ে করতে পারে।

ক্ল্যারা। আনন্দ অশ্রু আর কত চিন্তা ভাবনা,
আশা ভয় আর বেদনা,
কখনো জয়ধ্বনি, কখনো বা দুরাশার হাহাকার,
প্রেমের রোমাঞ্চর অনুভূতির সঙ্গে আর কোন আমাদের তুলনা হয়?

মা। ছেলেমানুষি আর করো না।

ক্ল্যারা। এটা ছেলেমানুষির গান নয়। এই গান দিয়ে আমি অনেক বড় মানুষকে ঘুম পাড়িয়েছি।

মা। তোমার মাথায় শুধু প্রেমের চিন্তা। কিন্তু তুমি যদি ব্রেকেনবার্গের দিকে একটু নজর দিতে, তাকে ভালবাসতে তাহলে সে তোমাকে সুখী করতে পারত।

ক্ল্যারা। হ্যাঁ, তাই নাকি!

মা। হ্যাঁ তাই। তোমরা যারা ছেলেমানুষ, তারা শুধু বর্তমানটাকেই বড় করে দেখে। তারা ভুলে যায় যৌবন আর সুখী প্রেম চিরদিন থাকে না। তখন মানুষ যদি কোনরকমে কোথাও মাথা গোঁজার মত একটু ঠাঁই পায় তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় তার জন্য।

ক্ল্যারা। সে সময় যদি একান্তই আসে তাকে আসতে দাও। আগে হতে তার কথা ভেবে কোন লাভ নেই। তোমাকে ছাড়া আমি বেঁচে থাকব এগমঁত? এটা অসম্ভব।

পোষাকে আবৃত অবস্থায় এগমঁতের প্রবেশ। তার মাথার টুপীটা সামনের দিকে টানা ছিল।

এগ। ক্ল্যারা।

ক্ল্যারা। (এগিয়ে এসে) এগমঁত! তুমি এসেছ প্রিয়তম? (আলিঙ্গন করে) সত্যিই কি তুমি?

এগ। সান্ধ্য নমস্কার মা।

মা। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তুমি একদিন না আসায় আমার মেয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। আজ সারাদিন ধরে তোমার কথাই ও ভাবছে এবং তোমার গানই করছে।

এগ। আপনি আমাকে কিছু খাবার দেবেন?

মা। আমাদের কাছে খাবার চাওয়াটা তোমার মহানুভবতা। কিন্তু দেবার মত কিছুই নেই।

ক্ল্যারা। তুমি চুপ করো মা। নিশ্চয় আছে। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। তুমি কিছু ভেবো না। উনি যখন এখানে থাকেন তখন আমার মোটেই কোন ক্ষিদে থাকে না। ওরও কোন ক্ষিদে থাকতে পারে না আমার কাছে যতক্ষণ উনি থাকবেন।

এগ। তুমি কি তাই মনে কর?

ক্লারা। আজ তোমাকে কেন নিরুত্তাপ দেখাচ্ছে ? তুমি আমাকে চুম্বন কর নি। তোমার হাতদুটো পোষাকে ঢাকা কোন নবজাত শিশুর মত। হাত ঢেকে রাখা ত কোন প্রেমিক বা সৈনিকের কাজ নয়।

এগ। কখনো কখনো কোন সৈনিক যখন আক্রমণের কথা ভাবে তখন সে হাত গুটিয়ে থাকে।

মা। তুমি ভাল করে বস আরাম করে। আমি রান্নাঘরে আছি। তুমি যতক্ষণ থাক ক্লারা আর কিছু ভাবতে পারে না। আমাদের সামান্য যা কিছু আছে তা খেতে হবে তোমায়।

এগ। আপনার শুভেচ্ছাই সবচেয়ে বড় জিনিস। (মার প্রস্থান)

ক্লারা। এবার প্রিয়তম ?

এগ। এবার যা খুশি তোমার তাই বলতে পার। (উপরকার আবরণটা সরিয়ে দিয়ে) এবার আমার হাত মুক্ত।

ক্লারা। কি উজ্জ্বল পোষাক ! তোমাকে স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছি।

এগ। (আলিঙ্গন করে) এবার তুমি খুশি ত ? আমি বলেছিলাম একদিন আমি স্পেনীয় কায়দায় পোষাক পরে আসব এখানে।

ক্লারা। আমি কিছু বলিনি এ নিয়ে, কারণ ভাবতাম তুমি এসব পছন্দ করো না।

এগ। এবার নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ ত।

ক্লারা। সম্রাট তাহলে অবশেষে 'গোল্ডেন ফ্লীস' উপাধি দান করলেন।

এগ। হ্যাঁ দান করেছেন। এ উপাধি এ পোষাকের অর্থ একমাত্র সম্রাট নিজে ছাড়া আমার কাজকর্মের জন্য কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। নাইটদের মধ্যে এ উপাধি সবচেয়ে বড়। তোমার প্রেমের সঙ্গেই এর একমাত্র তুলনা করা চলে।

ক্লারা। এ পোষাকের মখমল কত উজ্জ্বল। সূচীশিল্পের কাজ কত সূক্ষ্ম।

এগ। প্রাণভরে দেখ।

ক্লারা। তুমি একদিন আমাকে এর ইতিহাস বলেছিলে। কত শ্রম কত সাধনার মধ্য দিয়ে এ উপাধি পাওয়া যায়। কিন্তু আমি ত কোন সাধনা করি নি। আমার প্রেমের সঙ্গে কখনই এর তুলনা চলে না। তোমাকে জনগণ কত ভালবাসে।

এগ। অথচ তাদের জন্য বড় কাজ কিছু করতে পারিনি। অনেকে অবশ্য না

চেয়েই ভালবাসা পায়। তবে যে কোন ভালবাসাই সাধনার বস্তু। আজ রাজ প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করেছিলে?

এগ। হ্যাঁ, করেছি।

ক্ল্যারা। তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল ত?

এগ। আমরা যতদূর সম্ভব পরস্পরের উপকার করে থাকি।

ক্ল্যারা। অন্তরের সঙ্গে তাকে কি পছন্দ করো?

এগ। আমাদের মত অবশ্য আলাদা। তবে উনি বুদ্ধিমতী, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তা উনি জানেন। তবে আমার জন্য উনি অনেক কাজও পান। উনি সব সময় আমার আচরণের মধ্যে কোন গোপন ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় কিনা তার সন্ধান করেন। অথচ সত্যিই তা নেই আমার মনে।

ক্ল্যারা। সত্যিই কোন ষড়যন্ত্র নেই কি এখানে?

এগ। একটা ছাড়া। অরেঞ্জ এখন একটা রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অরেঞ্জ মনে হয় কিছু ষড়যন্ত্র করছে এবং রাজ প্রতিনিধি তার মুখ দেখে তার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করছে।

ক্ল্যারা। কিছু ধরতে পেরেছেন?

এগ। তিনি রাজ প্রতিনিধি—এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়।

ক্ল্যারা। মাপ করো। আমি বলতে চেয়েছিলাম তিনি কি ভুল করেছেন?

এগ। আপন কার্যসিদ্ধির জন্য সব মানুষ যা করে উনিও তাই করছেন।

ক্ল্যারা। আমি আজকাল এ জগতে স্বস্তি পাচ্ছি না কিছুতে। কিন্তু আমাদের রাজ প্রতিনিধি মেয়ে হয়েও কেমন দৃঢ়চিত্ত, পুরুষসুলভ কঠোরতায় সিদ্ধ। উনি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। খুব ধীর স্থির।

এগ। তবে বিপদের সময় উনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন।

ক্ল্যারা। কি রকম?

এগ। ওঁর ঠোঁটের উপরে গোঁফ আছে একটু। বাতরোগও আছে।

ক্ল্যারা। তবু ওঁর কাছে যেতে ভয় লাগে।

এগ। তার মানে তুমি ভীরু নও, নারীসুলভ এক লজ্জা অনুভব কর শুধু।

(ক্ল্যারা এগমণ্ডের হাত টেনে নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল।)

এগ। তোমার চোখ তোল প্রিয়তমা।

ক্ল্যারা। তোমাকে আলিঙ্গন করতে দাও। তোমার চোখের মধ্যে আমার

জীবনের সব আশা আনন্দ বিশ্বাস খুঁজে নিতে দাও। সত্যি করে বল তুমি কি সেই এগমঁত, মহান কাউন্ট এগমঁত! তুমি কি সেই এগমঁত যাকে নিয়ে জগতে এত হৈ চৈ, যার নাম সংবাদপত্রের শিরোনামায়, যে সমস্ত প্রদেশের একমাত্র আশা ভরসা?

এগ। না ক্ল্যারা আমি সে এগমঁত নই।

ক্ল্যারা। তা কি করে হয়?

এগ। আমাকে বসে কথাটা বলতে দাও ক্ল্যারা। সে এগমঁত হচ্ছে, বিষণ্ণ, চিন্তাশীল, অনমনীয়, আত্মরক্ষায় সতত বিব্রত, সে এগমঁত এমন সব বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত যাদের সে বিশ্বাস করতে পারে না, এমন সব লোক তাকে ভাল-বাসে যারা নিজেদের মনের খবরই জানে না, সেই এগমঁতের কোন আবেগ অনুভূতির কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু তোমার সামনে যে এগমঁতকে দেখছ ক্ল্যারা, সে শান্ত, ধীর, নিরুদ্বিগ্ন। সে তার প্রেমাস্পদের উপর নিবিড় বিশ্বাসে ও আশ্বাসে ঢলে পড়তে পারে। (আলিঙ্গন করল) এ হচ্ছে তোমার এগমঁত।

ক্ল্যারা। আমাকে মরতে দাও। জগতে এর থেকে সুখের আর কিছু হতে পারে না।

চতুর্থ অঙ্ক

রাজপথ

জেত্তার ও মিস্ত্রী

জেত্তার। শোন পড়শী, কথা আছে একটা।

মিস্ত্রী। নিজের চরকায় তেল দাও। মুখে চাবি দাও।

জেত্তার। শুধু একটা কথা। নতুন খবর কিছু আছে?

মিস্ত্রী। না, শুধু আমাদের কথা বলতে বারণ।

জেত্তার। তার মানে?

মিস্ত্রী। এই বাড়িটার কাছে এস। ডিউক আলভা এখানে এসে আদেশ জারি করেছে রাস্তায় তিনজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বললেই তারা রাষ্ট্র-দ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।

জেত্তার। হায়, হায়।

মিস্ত্রী। রাজনৈতিক কথা আলোচনা করলেই কারাবরণ ভোগ করতে হবে।

জেভার। হায়! আমাদের সব স্বাধীনতা জাহান্নামে গেল।

মিস্ত্রী। কেউ যদি সরকারের সমালোচনা করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। তাড়াতাড়ি এক বিশেষ বিচারসভা গঠিত হয়েছে। তার সামনে প্রতিটি পরিবারের লোকজনদের আদেশ করা হয়েছে, তারা যদি তাদের ঘরে গড়ে ওঠা সরকার বিরোধী কোন চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দিতে পারে তাহলে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

জেভার। চল আমরা বাড়ি যাই।

মিস্ত্রী। অনুগত লোকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তাদের জীবন বা ধন সম্পত্তির কোন ক্ষতি হবে না।

জেভার। যে মুহূর্তে ডিউক আলভা শহরে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছে সমস্ত আকাশখানা কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে।

জেভার। যে সব সৈনিক রাজাকে ঘিরে আছে তাদের মত সৈনিক কখনো দেখিনি আমরা। আমাদের দেশের সৈন্যরা অনেক ভাল। তাদের মুখে হাসি থাকে। তারা কথা বলে। কিন্তু যখন নীরব গম্ভীর মুখে রাজসৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয় ওরা সবাই এমন এক একটি প্রাণহীন যন্ত্র যাদের মধ্যে এক একটা শয়তান ভরা আছে।

মিস্ত্রী। ঐ সব সৈনিকদের কেউ 'থাম' বলে চিৎকার করে উঠলেই যে কোন পথচারী থেমে যাবে।

জেভার। আমি ত সে ডাক শুনে পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাব।

মিস্ত্রী। বাড়ি চল।

জেভার। এর ফল কখনই ভাল হবে না।

সোয়েস্টের প্রবেশ

সোয়েস্ট। কি খবর পড়শী বন্ধু?

মিস্ত্রী। চুপ চুপ। চল চলে যাই এখান থেকে।

সোয়েস্ট। শুনেছ?

জেভার। অনেক কিছু শুনেছি।

সোয়েস্ট। রাজপ্রতিনিধি চলে গেছে।

জেভার। তাহলে ঈশ্বর ছাড়া আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই।

মিস্ত্রী। উনি আমাদের একটা আশ্রয়স্থলস্বরূপ ছিলেন।

সোয়েস্ট। তিনি হঠাৎ গোপনে চলে গেছেন। ডিউকের সঙ্গে তাঁর মনের

মিল হয়নি। তবে তিনি সামন্তদের জানিয়েছেন তিনি আবার ফিরে আসবেন। তবে বিশ্বাস হয় না কারো।

মিস্ত্রী। আমাদের সামন্তরা সুখে থাকুন। তাঁরা ত এর প্রতিবিধান করতে পারতেন। আমাদের সব অধিকার চলে গেল।

জেত্তার। আমাদের অধিকার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলো না। আমি বিপদের আভাস পাচ্ছি। যে কুয়াশা ঘন হয়ে উঠেছে তা ভেদ করে আর সূর্য উঠবে না।

সোয়েস্ট। অরেঞ্জও চলে গেছে।

মিস্ত্রী। তাহলে আমরা একেবারে পরিত্যক্ত ও অসহায়।

সোয়েস্ট। কাউন্ট এগমঁত এখনো এখানে আছেন।

জেত্তার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাঁর হাত শক্ত করো যথাসাধ্য। একমাত্র উনিই আমাদের সাহায্য করতে পারেন এ বিপদে।

ভ্যানসেনের প্রবেশ

ভ্যান। অবশেষে আমি কিছু সাহসী নাগরিকের দেখা পেলাম যারা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে না।

জেত্তার। আমাদের চলে যেতে দাও। তোমার দেহে আঘাত লেগে আছে।

ভ্যান। ঘুঁষি বা আঘাতকে ভয় করলে কিছুই করতে পারব না আমি। সৈনিক কখনো আঘাতের কথা চিন্তা করে না।

জেত্তার। ব্যাপার আরো ঘোরালো হয়ে উঠছে।

ভ্যান। যে ঝড় ক্রমশই এগিয়ে আসছে তার আঘাতে তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে।

মিস্ত্রী। চুপ না করলে তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হবে।

ভ্যান। শোন অসহায় ইঁদুরের দল। বাড়ির মালিক একটা বিড়াল ছেড়ে দিয়েছে আর তার ভয়ে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমরা আগে যা করতাম এখনো তাই করব। শুধু মুখে কিছু বলব না।

মিস্ত্রী। তুমি বড় দৃষ্টিহীন।

ভ্যান। ডিউককে একা থাকতে দাও। বুড়ো বিড়ালটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সে ইঁদুরের বদলে এক একটা আস্ত শয়তান ধরেছে। ওকে শুধু ফুর্তিতে পানাহারে মত্ত থাকতে দাও। আমি শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকব। প্রথম প্রথম ও বুঝবে কয়েকটা ইঁদুরকে ফাঁদে ধরার থেকে দিব্যি খেয়ে ফেলে ফুর্তি

করা ভাল। যাও যাও, আমি ওদের রীতিনীতি জানি।

মিস্ত্রী। এমন কথা আমরা বলতে পারি না কখনো। এতে আমরা নিজেদের বিড়াল ভাবতে পারব না।

ভ্যাল। নিজেরা বিব্রত বা বিপন্ন বোধ করো না। ঈশ্বর তোমাদের নিয়ে মাথা ঘামান না।

জেত্তার। মিথ্যাবাদী, নিন্দুক।

ভ্যাল। আমি জানি কারা মিথ্যাবাদী নিন্দুক। কারা ভীরু কাপুরুষ।

মিস্ত্রী। একথার মানে? কার কথা বলতে চাইছ?

ভ্যাল। আমি বলছি কাউন্টের কথা।

জেত্তার। এগমঁত? তার আবার ভয়ের কি আছে?

ভ্যাল। তিনি এক রাতেই যা হারিয়েছেন তাতে আমার এক বছর চলে যাবে। তাঁর ঘাড়ে যদি আমার মাথা থাকত তাহলে তিনি অনেক লাভবান হতেন।

জেত্তার। নিজেকে বড় চালাক মনে ভাব। তবু জেনে রাখবে এগমঁতের মাথার চুলে যে বুদ্ধি আছে সে বুদ্ধি তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে নেই।

ভ্যাল। তা হয়ত হবে। তবে এই সব সামন্তরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করে চলে। এঁদের আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত ছিল।

জেত্তার। দেখছ, লোকটা কেমন যা তা বলে যাচ্ছে।

ভ্যাল। বলে যাচ্ছে কারণ সে ত আর দর্জি নয়।

জেত্তার। উদ্ধত কাপুরুষ কোথাকার।

ভ্যাল। আমার ইচ্ছে হয় তোমার মত সাহস তিনি অবলম্বন করে শহর ছেড়ে চলে যান।

জেত্তার। কি যা তাই বলছ, আকাশের নক্ষত্রের মতই তিনি নিরাপদ।

ভ্যাল। লক্ষ্য করেছ, ওদের একজন কেটে পড়েছে? যদি কোন সামন্তকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে বিদ্রোহ করতে পারবে?

জেত্তার। আঃ।

ভ্যাল। তাদের জন্য তোমার নিজের দেহের হাড় পাঁজরার ঝুঁকি নিতে পারবে?

সোয়েস্ট। এঃ।

ভ্যাল। আঃ, উঃ, এঃ—এই সব বলে যাবে। সুতরাং যা ঘটার ঘটে যাবে। ঈশ্বর ওঁদের রক্ষা করুন।

জেত্তার। এরকম মহান ও সৎ এক ব্যক্তি কথনো কিছুকে ভয় করে না।

ভ্যাল। শয়তানরা সব জায়গাতেই নাক গলিয়ে নির্দোষকে দোষী সাজায়।

মিস্ত্রী। কোন নির্দোষ মানুষকে দোষী সাজিয়ে লাভ ?

ভ্যাল। নির্দোষ ব্যক্তিরা খুব সাহসী হয়। শয়তানদের জেরার আঘাতে তারা টিকতে পারে না। মাথার ঠিক রাখতে পারে না। রেগে গিয়ে আবোলতাবোল বলে ফেলে আর তাদের অসাবধানতাপ্রসূত কথাবার্তার সুযোগ নিয়ে শয়তানরা তাদের দোষী সাজিয়ে বাহবা নেয়। অনেক সময় ফাঁসিকাঠে ঝোলায়।

জেত্তার। ও বেশ কথা বলতে পারে।

মিস্ত্রী। ওর কথায় মাছিরা ভয় পেতে পারে, বোলতারা নয়।

ভ্যাল। লম্বা চেহারার ডিউক কিন্তু এক ভয়ঙ্কর ধরনের মাকড়শা। বেটে মোটা অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত মাকড়শা নয়। রোগা লম্বা বিষাক্ত মাকড়শা। যাদের সুতোগুলো বেশ শক্ত।

জেত্তার। এগমঁত গোল্ডেন ফ্লীস উপাধিধারী নাইট। তার উপর কে হাত দেবে ? তার বিচার করতে পারে একমাত্র তার সমগোত্রীয় নাইটের দল। সুতরাং তোমার এই সব কথার কোন দাম নেই।

ভ্যাল। তোমরা কি ভাব আমি তাঁর ক্ষতি চাই ? আমি চাই তিনি ঠিক পথে চলুন, নিরাপদে থাকুন। আমার কথা শোন, তোমরা চলে যাও, টহলদারী সৈন্যদল আসছে। ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না কোনদিন। ওদের পোষ মানানো যাবে না।

ইউলেনবেরি প্রাসাদ। ডিউক অফ আলভার বাসভবন

সিলভা। ডিউকের আদেশাজ্ঞা সবাইকে বলে দিয়েছ ?

গোমেৎস। যথাসময়ে। প্রতিটি টহলদারী সেনাদলকে এক নির্দিষ্ট সময়ে এক নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হতে বলা হয়েছে। অথচ একটি দল অন্য দলের কথা জানে না। এখন তারা শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এইভাবে ঘেরাওকার্য সম্পন্ন হবে। তুমি এর কারণ জান ?

সিলভা। আমি শুধু হুকুম তামিল করতে পারি। ডিউকের প্রতি আনুগত্য ছাড়া আর আমার জানার কিছু নেই।

গোমেৎস। তুমিও দেখছি ডিউকের মতই কম কথা বল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমার কাছে এসব ভাল লাগে না। আমি ইতালিতে হালকা কাজ করতেই অভ্যস্ত ছিলাম। আমি সৈনিক হিসাবে অনুগত হলেও কথা বলতে ভালবাসি।

সিলভা। তিনি ত আমাদের এখানে নীরবে নিয়ে এসেছেন। কোন কথা কাউকে বলেননি।

গোমেৎস। সে বিষয়ে বলার কিছু নেই। তবে আমরা যারা ইতালি থেকে এক বিরাট সৈন্যদলকে এখানে সুইজারল্যাণ্ড ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে চালিয়ে নিয়ে আসতে দেখেছি তারা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছি। কত বিপদের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। আপনাদের যাত্রা শুভ হয়েছে।

সিলভা। আবার এখানেও দেখ। সব শান্ত, যেন কোন গোলমাল হয়নি।

গোমেৎস। আমরা যখন এখানে আসি তখনও শান্ত ছিল সব।

সিলভা। প্রদেশগুলো সব শান্ত। এখন শুধু বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কিছু লোক বাইরে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু ডিউক সে পথ বন্ধ করে দেবেন।

গোমেৎস। ডিউকের একাজ নিশ্চয় রাজার প্রশংসা অর্জন করবে।

সিলভা। এখন ডিউকের সেবা করাই আমাদের পক্ষে বিধেয়। রাজা যদি এখানে আসেন তাহলে ডিউক যাদের কাজের প্রশংসা করবেন তারা নিশ্চয় পুরস্কৃত হবে।

গোমেৎস। তুমি কি মনে কর রাজা সত্যি সত্যিই আসবেন?

সিলভা। এমন সব প্রস্তুতিকার্য চলছে যা দেখে মনে হয় রাজার আসার প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

গোমেৎস। আমার ত তা মনে হয় না। তাহলে মনের কথা মনে রেখে দাও। রাজা যদিও না আসেন তিনি চান তাঁর আসার গুজবটা রটে যাক।

ফার্দিনান্দের প্রবেশ

ফার্দি। আমার বাবা এখনো আসেন নি?

সিলভা। আমরা তাঁর আদেশের অপেক্ষায় আছি।

ফার্দি। রাজকুমারেরা শীঘ্রই এখানে আসবেন।

গোমেৎস। আজই তাঁরা আসবেন।

ফার্দি। অরেঞ্জ আর এগমঁতের আসার কথা আছে।

গোমেৎস। (সিলভাকে চুপি চুপি) আসল ঘটনার কিছু আলো পাচ্ছি মনে হচ্ছে।

সিলভা। কোন কথা বলো না।

ডিউক অফ আলভার প্রবেশ

আলভা। গোমেৎস!

গোমেৎস। (এগিয়ে এসে) কি প্রভু ?

আলভা। সৈন্যদের বিভিন্ন জায়গায় নিযুক্ত করে তাদের যথাযথ নির্দেশ দান করেছ ?

গোমেৎস। যথাযথভাবে প্রভু। টহলদারী সেনাদের—

আলভা। ঠিক আছে। সিলভা আসল সময়টা ঘোষণা করলেই প্রাসাদ অভিমুখী রাস্তায় সৈন্যদের প্রহরায় নিযুক্ত করবে। পরে যা করার তা পরে জানবে।

গোমেৎস। আমি যাচ্ছি প্রভু।

আলভা। সিলভা।

সিলভা। বলুন প্রভু।

আলভা। তোমার মধ্যে যে গুণের আমি প্রশংসা করি সেই গুণের পরিচয় আজই তোমাকে দিতে হবে। যেমন ধরো, সাহস, সংকল্প, অবিচল কর্ম-তৎপরতা প্রভৃতি।

সিলভা। আমাকে এই সুযোগ দান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আলভা। রাজকুমারেরা আমার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এগমঁতের একান্ত সচিবকে গ্রেপ্তার করবে। আর যাদের দরকার তাদের কাজের সব ব্যবস্থা করে রেখেছ ?

সিলভা। আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। পূর্বনির্দিষ্ট গ্রহণের মতই তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

আলভা। ওদের সবাইকে দেখেছ সম্প্রতি ?

সিলভা। সবাইকে। বিশেষ করে এগমঁতকে। আপনি আসার পর থেকে একমাত্র এগমঁতেরই কোন পরিবর্তন হয়নি। সারাদিন ধরে সে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায় আর রাত্রিতে সে লুকিয়ে যায় তার প্রেমিকার কাছে। অন্য নাইটরা তাদের বাড়িতে মরার মত ভয়ে ভয়ে বাস করছে।

আলভা। তাহলে ত এখনি কাজ শুরু করে দিতে হয়।

সিলভা। আমি ওদের সবাইকে নিয়ে আসব। আপনার কথামত তাদের সরকারী সম্মানে ভূষিত করব। তারা এখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আপনাদের কথায় কথায় ভয়ে ভয়ে ধন্যবাদ দেয়। তাদের মধ্যে অনেকে দেশ ছেড়ে পালাতে চায়। কিন্তু অনেকে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তা পারছে না। মোট কথা তারা সবাই ভয় ও সংশয় হতে মুক্ত হতে চাইছে। আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে

পারছি আপনার পরিকল্পনা সার্থক হবে।

আলভা। যা হয়েছে তাতে আমি খুশি। অবশ্য এখনো ভেবে দেখার অনেক কিছু আছে। ভাগ্যদেবীর খেয়াল বড় অদ্ভুত। অনেক সময় অনেক সুগঠিত নির্ভুল পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, আবার অনেক সাধারণ বাজে পরিকল্পনা সার্থক হয়। রাজকুমারেরা এসে গেলেই গোমেৎস রাস্তায় সৈন্য বসিয়ে দিক। তখন তুমি এগমঁতের সচিবকে গ্রেপ্তার করবে। আমার ছেলে যেন এই খবরটা রাজপরিষদে দেয়।

সিলভা। আমি আশা করি আজ সন্ধ্যায় আপনার কাছে হাজির হব। (আলভার প্রস্থান) আমি অবশ্য একথা মুখে আনতে সাহস পাচ্ছি না তবু আমার মন বলছে আলভা যা মনে করছে তা হবে না। প্রথম দিকে বেশ কিছু লোকের ক্ষয় ক্ষতি হলেও ভাগ্যদেবীর খেয়ালে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।

(প্রস্থান)

আলভা। (ছেলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে) শহরটা ঘুরে কেমন দেখলে ?

ফার্দি। রাস্তায় রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে ঘুরে দেখেছি সব শান্ত। তোমার পাহারাদার সৈন্যরা এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে শহরের বিভিন্ন জায়গায় যাতে কেউ টু শব্দটি করতে পারছে না। এখন শহরটাকে দেখে মনে হয় যেন ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত ও বজ্রবিদ্যুতের দ্বারা বিধ্বস্ত কোন স্তব্ধ সমভূমি। পশু পাখি পর্যন্ত ভয়ে বার হচ্ছে না।

আলভা। আর কিছু ঘটেনি ত ?

ফার্দি। এগমঁত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাজারে গিয়েছিল। তার ঘোড়াটা খুব ভাল ছিল। সে বলল, আজ আপনার কথামত আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

আলভা। আজই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

ফার্দি। সব নাইটদের মধ্যে এগমঁতকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

আলভা। তুমি বড় হঠকারী। মানুষের ভালটা বেশ চিৎকার করে বললে অনেক সময় তোমায় বিপদে পড়তে হয়।

ফার্দি। ঠিক আছে, এবার থেকে তোমার ইচ্ছামত চলব।

আলভা। তোমার চপলমতি যৌবনের কথা ভেবে তোমাকে ক্ষমা করলাম, তবে ভুলো না কোন কাজের জন্য আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে এবং তোমাকেই বা কি করতে হবে।

ফার্দি। অন্যায় বুঝলে আমাকে তিরস্কার করবে।

আলভা। শোন পুত্র। এগমঁত এবং অরেঞ্জ এখানে আসবে। এখনো তোমাকে খুলে বলা হয়নি কি ঘটতে চলেছে। ওরা এখান থেকে আর যেতে পারবে না।

ফার্দি। তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি ?

আলভা। ওদের গ্রেপ্তার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখন তোমাকে কি করতে হবে তা জেনে নাও। সব কিছুর কারণ পরে বলা হবে। তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তোমার কাছেই আমি বিশ্বাস করে সব গোপন কথা বলতে পারি। আমি শুধু তোমাকে আনুগত্যই শেখাব না, সঙ্গে সঙ্গে শেখাব কি করে হুকুম করতে হয়। কি ভাবে কোন বড় কাজ করতে হয়। আমি তোমাকে এই বিশাল সম্পত্তি দান করে যাব। রাজাকে দিয়ে যাব এক অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক।

ফার্দি। যখন সারা রাজ্য তোমার ভয়ে কাঁপছে তখন তুমি আমাকে কত ভালবাসছ। সত্যিই তোমার কাছে আমি কত ঋণী।

আলভা। এখন শোন কি করতে হবে। অরেঞ্জ ও এগমঁত এসে গেলেই প্রাসাদে যাবার গেটটা রাজপথে পাহারা জোরদার হয়ে উঠবে। তুমি থাকবে গেটের কাছে। সিলভা এগমঁতের সচিবকে গ্রেপ্তার করে ফিরলেই তুমি একটা কাগজ নিয়ে আমার কাছে যাবে। তাহলে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারব। অরেঞ্জ এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তার তরবারিটা কেড়ে নেবে। আমি এগমঁতকে এখানে বসিয়ে রাখব।

ফার্দি। আজ তোমার আদেশ পালন করতে প্রথম আমার অন্তরটা ভারী হয়ে উঠছে।

আলভা। আজ তোমার জীবনে সবচেয়ে শুভ দিন।

সিলভার প্রবেশ

সিলভা। আণ্টওয়ার্গ থেকে দূত এসেছে অরেঞ্জের চিঠি নিয়ে। সে আসছে না।

আলভা। দূত তাই বলছে ?

সিলভা। না, আমার মন বলছে।

আলভা। (চিঠি পড়তে পড়তে ইশারা করতে দুজনে সরে গেল) সে আসছে না। ভয় করছে। লোকটা সতর্ক এবং বিচক্ষণ, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে। অনেক

বড় কাজ হঠাৎ সার্থক বা ব্যর্থ হয়। কিন্তু সুযোগ কখনো দুবার আসে না। আমি অনেক ভাবনাচিন্তা করে যে কাজের পরিকল্পনা খাড়া করেছি সে কাজ করতে গিয়ে আজ সংশয় জাগছে কেন মনে? অরেঞ্জ যদি পালিয়ে যায় তাহলে অন্যদের গ্রেপ্তার করা কি উচিত হবে? এগমঁতকেও কি তাহলে আমার হাতের মুঠো থেকে পালিয়ে যেতে দেব? যা কিছু অদম্য ভাগ্য কি তাকেও দমন করে? কতদিন ধরে কত কষ্টে এই পরিকল্পনা খাড়া করেছি। সব আশা আমার লক্ষ্যে প্রায় উপনীত হয়ে পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে আমি পড়ে গেলাম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। (একটা শব্দ শুনে) এগমঁত এসে গেছে। তুমি নিঃশব্দে নিশ্চিন্তে চলে এলে অথচ কোন রক্তের গন্ধ পাও নি? কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওনি? যে ভ্রান্তির বশে এগমঁত আজ আমার হাতে এসে ধরা দিয়েছে সে ভুল ভ্রান্তি ভবিষ্যতে নাও ঘটতে পারে। এই কে আছ শোন! (সিলভা ও ফার্দিনান্দের প্রবেশ) আমার আদেশ পালন করো। আমি আমার উদ্দেশ্য থেকে কখনো বিচ্যুত হই না। কাছাকাছি থাকবে। আর একজনকে গ্রেপ্তার করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে না যে ছিল রাজার সবচেয়ে বড় শত্রু। যাও তাড়াতাড়ি, তাকে অভ্যর্থনা জানাও। (ওরা চলে গেলে আলভা পায়চারি করতে লাগল)

এগমঁতের প্রবেশ

এগমঁত। আমি জানতে এসেছি রাজা আমাদের কাছ থেকে কি ধরনের সেবা চান। তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য এখনো অবিচল আছে।

আলভা। তিনি প্রথমে আপনার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ চান।

এগমঁত। কি বিষয়ে? অরেঞ্জ কি এসেছে? আমি ভেবেছিলাম তাকে এখানে দেখতে পাব।

আলভা। দুঃখের বিষয় তিনি এই সংকটের সময় এলেন না। রাজা শান্তি স্থাপনের কাজে আপনাদের পরামর্শ চান। তিনি চান আপনারা এ কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। এই সব বিক্ষুব্ধ প্রদেশে যাতে স্থায়ী ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য তাঁকে সর্বরকমে সাহায্য করবেন।

এগমঁত। আমার থেকে এটা আপনি ভালভাবে জানেন স্যার যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকের মন শান্তই ছিল। কিন্তু নূতন সেনাদল আসার পর থেকে তাদের শান্ত মন সহসা সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আলভা। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে রাজা যদি আমাকে একাজে নিযুক্ত

না করতেন অর্থাৎ আমি যদি এ ব্যাপারে প্রশ্ন না করতাম তাহলে হয়ত ভাল হত।

এগম´ত। আমাকে মাপ করবেন। রাজা সৈন্য পাঠিয়ে ভুল করেছেন না তিনি নিজে এলে ভাল করতেন সেটা বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। সে যাই হোক, সৈন্যদল এসে গেছে, রাজা আসেননি। তবে আমাদের রাজপ্রতিনিধির কাছে আমরা কতদূর ঋণী সেকথা যদি ভুলে যাই তাহলে আমরা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেব। এটা আপনাদের জেনে রাখা উচিত রাজপ্রতিনিধি তাঁর সাহস, বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্বের জোরে বিক্ষুব্ধ লোকদের শান্ত করেছিলেন, সমস্ত বিদ্রোহীদের ফিরিয়ে এনেছিলেন শান্তি ও শৃংখলার রাজ্যে।

আলভা। আমি তা অস্বীকার করছি না। বিদ্রোহের অবসান ঘটেছে, প্রজারা আবার অনুগত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারা যে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করবে না, বিক্ষুব্ধ হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে? তার খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করা ঠিক হবে? তাদের ভবিষ্যৎ রাজভক্তি ও আনুগত্যের কে আশ্বাস দেবে? এক্ষেত্রে তাদের শুভেচ্ছাটাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

এগম´ত। জনগণের শুভেচ্ছাই কি কোন রাজার পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্বল নয়? রাজ্যের সমস্ত প্রজাপুঞ্জ ও জনগণ যদি রাজার পাশে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে রাজার হাত শক্ত হয় না কি? তাতে রাজার নিরাপত্তা আরো বেড়ে যায় না কি?

আলভা। আপনি কি আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বলেন যে বর্তমানে দেশে এখন এই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে?

এগম´ত। রাজা যদি সাধারণভাবে সকলকে মার্জনা করার কথা ঘোষণা করেন তাহলে জনগণের মন অবশ্যই শান্ত হয়ে উঠবে। তাহলে তাদের আস্থা ফিরে আসবে।

আলভা। কি করে তা সম্ভব? যারা রাজাকে অপমান করেছে ও আমাদের ধর্মস্থানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, বিদেশে চলে যাবার ভয় দেখিয়েছে তাদের ছাড়া যায় কি? তারা বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে কে জানে আরো বড় অপরাধ ঘটতে পারে।

এগম´ত। কোন অপরাধ বা উন্মত্ততার কাজের জন্য কঠোর শাস্তি না দিয়ে তা মার্জনা করা উচিত নয় কি? বিশেষ করে যখন এই আশা আর আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছে যে এ ধরনের অপরাধ কখনো আর ঘটবে না? এই ক্ষমা বা

মার্জনার দ্বারা রাজাদের প্রভুত্ব আরো বেশী করে প্রতিষ্ঠিত হয় না কি? সেই সব রাজারাই যুগে যুগে গৌরব লাভ করেন না কি যাঁরা ক্ষমা গুণে ভূষিত?

আলভা। ধর্ম ও ঈশ্বরের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা রাজা ও রাজকর্মচারীদের উচিত নয় কি? ঈশ্বর নিজের হাতে যা করেন না, যে অপরাধের প্রতিশোধ নেন না, রাজার উচিত তা করা। আমার পরামর্শ চাইলে আমি এই কথাই বলব যে যারা অধর্মাচরণ করে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

এগমঁত। আপনি কি মনে করেন প্রতিটি লোককে শাস্তি দিতে পারবেন? প্রতি দিন শুনছি ভয়ে কত মানুষ ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ধনীরা তাদের ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নিয়ে চলে যাচ্ছে আর গরীবরা বাধ্য হয়ে পড়ে থাকছে।

আলভা। যারা যাবার যাবে। এই জন্যই ত রাজা এখানকার স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে পরামর্শ চাইছেন। তবে পরামর্শ মানে বর্তমান অবস্থার যথাযথ চিত্রণ নয়, অথবা ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তার অনুমান নয়। যেখানে এক গুরুতর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে এক মিথ্যা আশার ছলনায় মুগ্ধ হয়ে কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কি উচিত? এই পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই নয় কি যে বিদ্রোহীরা অবাধে আবার নূতন বিপ্লবের পরিকল্পনা করবে? এ ব্যাপারে তারা প্রকাশ্যে কিছু না করলেও তাদের যথেষ্ট ইচ্ছা আছে।

এগমঁত। (নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে) সব পরিকল্পনা যেমন খারাপ নয়, তেমনি সব মতলবেরই ভুল ব্যাখ্যা করতে নেই। এখন জোর গুজব শোনা যাচ্ছে যে রাজা আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলোয় শান্তি বজায় রেখে আইনমাফিক শাসন করতে চান না; তিনি চান নিঃশর্তে জনগণের সব অধিকার কেড়ে নিতে। ধর্ম এমন একটা কৌশলগত আচরণ বা রক্ষাকবচ যা সামনে রেখে যে কোন কুউদ্দেশ্য সাধন করা যায়। যে পবিত্র প্রতীক জনগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করে নেয় সে প্রতীককে ব্যাধরা ফাঁদ হিসাবে ব্যবহার করে।

আলভা। একথা আপনার মুখ থেকে আমাকে শুনতে হবে?

এগমঁত। আমি একথা নিজের মন থেকে বলছি না, আমি যা গুজব হিসাবে শুনেছি তাই বলছি। সব জায়গায় ধনী গরীব শিক্ষিত অশিক্ষিত সব লোক এই কথা বলাবলি করছে যে হল্যাণ্ডবাসীদের উপর জোর করে পরাধীনতার জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের স্বাধীনতার জন্য কে জামীন থাকবে?

আলভা। স্বাধীনতা? যতক্ষণ সঠিক অর্থে কথাটা প্রয়োগ করা হয় ততক্ষণ,

এটা ভাল। কিন্তু জনগণ কি ধরনের স্বাধীনতা চায়? তারা যদি ঠিক পথে চলে, ন্যায়সঙ্গত কাজ করে চলে তাহলে রাজা তাদের কিছুতেই বাধা দেবেন না। না, তা তারা করবে না। তারা মারামারি খুনোখুনি করতে না পারলেই নিজেদের পরাধীন ভাববে। দেশের উপর যখন বিদেশী শত্রুর আক্রমণের খড়্গ ঝুলছে তখন দেশের জনগণ শত্রুকে বাধা না দিয়ে, শত্রুর কথা না ভেবে নিজের জন্য ঝগড়া মারামারি করছে। শিশুর মত ওদের অসংযত শক্তিকে খর্ব করতেই হবে। আসলে জনগণের জ্ঞান বা বয়স কোনটাই বাড়ে না। ওরা চিরকাল শিশুই রয়ে যায়।

এগমঁত। রাজারও জ্ঞান কত সামান্য! বহু লোক মাত্র একজনের উপর তাদের সব দায়িত্বভার ছেড়ে দেবে এটা ঠিক নয়। একজন অথবা তাঁর কর্মচারীদের উপর। তাঁর এই সব কর্মচারীরা মনে করেন একমাত্র তাঁরাই জ্ঞানী আর বাকি সব নির্বোধ।

আলভা। নিশ্চয় তাই, কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রভু নয়।

এগমঁত। তাই বলে তারা আর কাউকে স্বাধীন থাকতে দেবে না। যাই হোক, তারা যা করতে চায় করুক। আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি এবং আবার বলছি আপনারা যে ব্যবস্থা নিতে চলেছেন তাতে কোন কাজ হবে না। আমি আমার দেশবাসীকে চিনি। তারা সকলেই এক একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি, কর্মী, কর্মক্ষম, স্থির ধীর, প্রাচীন প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাদের বিশ্বাস অর্জন করা কঠিন। কিন্তু একবার তা পেলে রক্ষা করা সহজ। তারা অনমনীয়, দৃঢ়চেতা। তাদের ধ্বংস করা যায় কিন্তু করায়ত্ত করা যায় না।

আলভা। (এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে) আপনি রাজার সামনে কি বলেছেন তা একবার বলবেন কি?

এগমঁত। তিনি যদি আমাকে প্রাণখুলে বিশ্বাস করতেন, যদি অবাধে আমার মনের কথা বলার সুযোগ দিতেন তাহলে তাঁর ও তাঁর প্রজাদের মঙ্গল হত।

আলভা। কোনটা তাঁর পক্ষে লাভজনক তা শুনতে পারি কি?

এগ। আমি তাঁকে বলব, একদল ভেড়া চরানো সহজ, বলদদের নিয়ে মাঠে লাঙল চালানোও এমন কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আপনাকে যদি কোন ভাল জাতের ঘোড়ায় চড়তে হয় তাহলে সে ঘোড়াকে পোষ মানাতে হবে। তার মনের কথা বুঝতে হবে। তার কাছ থেকে অযৌক্তিক কিছু দাবি করলে চলবে না। দেশের নাগরিকরা তাদের দেশের পুরনো সংবিধান অনুসারে

স্বদেশের লোকদের দ্বারা শাসিত হতে চায়। স্বার্থহীন, সহানুভূতিশীল স্বদেশবাসীর হাতেই তারা তাদের ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে পারে।

আলভা। এই সংবিধান পাল্টাবার জন্য একজন রাজপ্রতিনিধিকে নিযুক্ত করা উচিত নয় কি? জগতে যখন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, তখন এই সব সংবিধানই কেন বা অপরিবর্তিত রয়ে যাবে? বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলেই এই সব সংবিধানে অনেক ত্রুটি আছে। সেই সব ত্রুটির ছিদ্র দিয়ে অনেক চালাক চতুর লোক গলে যায় অর্থাৎ তাদের স্বার্থসিদ্ধি করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এইভাবে তারা সমগ্র জাতির ও সমাজের ক্ষতিসাধন করে শাস্তি এড়িয়ে যায়। এইজন্যই ওরা পুরনো সংবিধানের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাশীল।

এগমণ্ড। আবার এই সংবিধানের অবাধ ইচ্ছামত সংশোধন থেকে এই কথাই বোঝা যায় না কি যে বহু লোক যে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না সে ক্ষমতা একজন ভোগ করবে? রাজা তাঁর প্রতিটি ইচ্ছা ও কামনা অবাধে পূরণ করতে পারবেন বলেই কি তিনি অবাধ স্বাধীনতা চান? আবার যদিও আমরা কোন রাজাকে সুশাসক হিসাবে বরণ করে নিই, তথাপি তাঁর উত্তরাধিকারী তাঁর মত সুশাসক হবেন কি না তার কিছু ঠিক আছে? আবার কেউ আমাদের সেই রাজার খামখেয়াল হতে রক্ষা করবেন কি যিনি বিভিন্ন প্রদেশে এমন সব কর্মচারীদের শাসক হিসেবে পাঠিয়ে দেবেন যাদের সেই সব প্রদেশ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই এবং যারা আসল দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত শাসনকার্য চালায়।

আলভা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে রাজা তাঁর রাজক্ষমতা তাঁর হাতেই রেখে দেবেন। আর এটাও স্বাভাবিক যে রাজা তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সেই সব লোকদের নির্বাচন করবে যারা তাঁকে বোঝে বা বোঝবার চেষ্টা করে এবং যারা তাঁর যে কোন আদেশ বা ইচ্ছা বিনা শর্তে পূরণ করে চলে।

এগ। তেমনি এটাও খুবই স্বাভাবিক যে দেশের নাগরিকরা তাদের সেই সব স্বদেশবাসীদের দ্বারা শাসিত হতে চাইবে যারা তাদের মত একই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছে ও লালিত পালিত হয়েছে, যাদের ভাল মন্দের ধারণা বা সকল চিন্তাভাবনা তাদের মতই।

আলভা। আমার মনে হচ্ছে দেশের সামন্তরাও সাধারণ নাগরিকদের মত একই কথা ভাবছে।

এগ। এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। দেশ শাসনের জন্য যাদের দরকার নেই

এমন সব নূতন লোককে যদি পাঠানো হয় তাহলে জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠবেই। রাজার প্রেরিত প্রতিনিধিরা যদি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত জাতির স্বার্থের ক্ষতি করে তাহলে জনগণ বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়বেই।

আলভা। এসব কথা আমার শোনা চলে না। কারণ আমি একজন বিদেশী।

এগ। আপনার কাছে এসব কথা বলছি, তার মানে এই যে আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

আলভা। সে যাই হোক, আমি ও কথা শুনতে চাই না। রাজা আমাদের এই আশায় এখানে পাঠিয়েছেন যে আমি সামন্তদের সমর্থন পাব। রাজা যা চান তা করবেন। এখন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করুন কিভাবে জনগণের উন্নতি করা যায়। এ অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। রাজা তাই বিক্ষুব্ধ জনগণের ক্ষমতা খর্ব করতে চান। তাদের মধ্যে যারা বিপজ্জনক তাদের বলি দিতে চান যাতে বাকি লোকেরা রাজার সুশাসনে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। রাজার হচ্ছে এই সংকল্প। রাজার এই সংকল্পের কথা সামন্তদের জানাবার জন্ত আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি আপনাদের পরামর্শ চাই কি করতে হবে সে বিষয়ে না, কিভাবে কি করতে হবে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে সেই বিষয়ে।

এগ। আপনার কথা জনগণের ভয়কে সত্য প্রমাণিত করছে। রাজা যে সংকল্প করেছেন অন্য কোন রাজা আজ পর্যন্ত তা করেননি। তিনি প্রজাদের শাসন করার জন্য তাদের মনোবল, স্বাধীনতা, মান মর্যাদা, সব চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে চান। তিনি তাদের সুখের জন্য তাদের সব স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে দেবেন। রাজাকে আমরা দোষ দিচ্ছি না, তাঁর কাজের প্রতিবাদ করছি না, তবে এ বিষয়ে তিনি ভুল পরামর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তিনি হঠকারীর মত ভুল পথে চলছেন।

আলভা। এই যদি আপনার মনোভাব হয় তাহলে আপনার মতের সঙ্গে আমাদের মতের কোনদিন মিল হবে না। যদি ভাবেন রাজার সংকল্প ভাবনা চিন্তা না করেই হালকা ভাবে করা হয়েছে তাহলে রাজার সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করার পরিচয় দেওয়া হবে। এই সব অর্থহীন রাজপ্রতিবাদে সময় দেওয়া আর সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। জনগণের কাছ থেকে আমি আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণ আর সামন্তদের কাছ থেকে চাই সৎ পরামর্শ এবং সমর্থন যা হবে তাঁদের নিঃশর্ত কর্তব্যপালনের সামিল।

এগ। আমাদের মাথা দাবি করুন, তাহলে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যারা মহান তাদের কাছে মাথা নত করা আর মাথা দান করা একই ব্যাপার। দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এতক্ষণ বৃথাই আমি এত কথা বলেছি। আমি শুধু মাতালকে কিছুটা আন্দোলিত করেছি, কাজের কাজ কিছুই করতে পারিনি।

ফার্দিনান্দের প্রবেশ

ফার্দি। মাপ করবেন। একটা চিঠি আছে যার উত্তর এখনই দিতে হবে।

আলভা। কই দেখি চিঠিতে কি আছে। (সরে গেল)

ফার্দি। (এগমঁতকে) একটা ভাল ঘোড়া জনগণ আপনার জন্য এনেছে।

এগ। ঘোড়াটা যদি তোমার পছন্দ হয় তাহলে কাজের কথাটা ভাবা যাবে।

ফার্দি। সেটা শীঘ্রই ভাবা হবে।

আলভা। (ইশারা করতে ফার্দিনান্দ সরে গেল)।

এগ। নিশ্চয়! আমাকে তাহলে যেতে দিন। জানি না আর কি আমি বলতে পারি।

আলভা। আপনার পক্ষে এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে আপনি আপনার মতামত বাইরে ব্যাপকভাবে প্রকাশের আর সুযোগ পাবেন না। অসতর্কতাবশতঃ আপনি অন্তরের গোপন কথা সব বলে ফেলেছেন। সেই কথাই আপনার বিরুদ্ধে এমন সাক্ষ্য দান করবে যা কোন প্রতিপক্ষ পারবে না।

এগ। আপনার এই তিরস্কারে আমি কোনরূপ বিচলিত নই। আমি আমার অন্তরকে জানি। আমার এ অন্তর রাজার প্রতি বরাবর অনুরক্ত। আজ যারা রাজার সেবা করতে গিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে তাদের থেকে আমি বেশী অনুরক্ত। আজ আমাদের আলোচনা অসন্তোষজনকভাবে শেষ হলেও আশা করি জনগণের উন্নতি এবং রাজার সেবার খাতিরে একদিন আমরা ঐক্যবদ্ধ হবই। আজ যে সব সামন্ত অনুপস্থিত তাঁদেরও আসতে দিন। এই আশা নিয়ে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি।

আলভা। (ইশারা করল) দাঁড়ান এগমঁত। আপনার তরবারি—

এগ। (বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থামল) এটাই কি ছিল আপনার অভিমত? এই জন্যই কি আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল? (তরবারি বার করে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করল)

আলভা। রাজার আদেশ। আপনি আমার বন্দী। (প্রহরীরা ক্ষণিক থেমে

এগমঁতকে ঘিরে ধরল)

এগ। রাজা! অরেঞ্জ! অরেঞ্জ! (একটু থেমে তরবারি দিয়ে দিল) নাও। এই তরবারি আমি এতদিন রাজার স্বার্থে ব্যবহার করে এসেছি, আত্মরক্ষার জন্য। (প্রহরীসহ প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

রাজপথ। গোধূলিবেলা

ক্ল্যারা, ব্রেকেনবার্গ ও নাগরিকবৃন্দ

ব্রেকেন। বল প্রিয়তমা, এখন তাহলে কি করবে?

ক্ল্যারা। আমার সঙ্গে এস ব্রেকেনবার্গ। যে জনগণ তাকে এত ভালবাসে সেই জনগণই তাকে উদ্ধার করবে। আমি জানি, দেশের প্রতিটি নাগরিকের মুখে তাঁর মুক্তিকামনা আগুনের মত জ্বলছে। এখন শুধু নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সে তাদের কি উপকার করেছে সেকথা তাদের আজও মনে আছে এবং তারা জানে একমাত্র তার বলিষ্ঠ বাহুই তাদের রক্ষা করতে পারে। তার স্বার্থে, তাদের নিজেদের স্বার্থে দরকার হলে তাদের জীবন বিসর্জন দিতে হবে।

ব্রেকেন। হায় হতভাগ্য তরুণী! দেখছ না, কী ভয়ঙ্কর শক্তি আমাদের কেমন লৌহবন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

ক্ল্যারা। কিন্তু এ শক্তি অজেয় বলে মনে হচ্ছে না আমার। কিন্তু শুধু বাজে কথা বলে কোন লাভ হবে না। কিছু প্রবীণ লোক আসছে এদিকে। শোন ভাই সব। তোমরা এগমঁত কেমন আছে তা জান?

কাঠের মিস্ত্রী। মেয়েটা কি চায়? ওকে চুপ করতে বল।

ক্ল্যারা। কাছে এস যাতে নিচু স্বরে কথা বলতে পারি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে হবে। এক উদ্ধত অত্যাচারী শক্তি তাকে বন্দী করে তার জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। রাত্রি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। চল আমরা এগিয়ে যাই, অন্য নাগরিকদের ডাক। আমাদের ঐক্যবদ্ধ দেখে শত্রুরা ভয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দেবে। সে মুক্ত হয়ে আমাদের ধন্যবাদ দেবে। কাল সকালে সে দেখবে মুক্ত আকাশে স্বাধীনতার রক্তসূর্য।

মিস্ত্রী। তোমার দুঃখ কি বালিকা?

ক্ল্যারা। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না? আমি বলছি কাউন্টের কথা,

এগমঁতের কথা।

জেত্তার। ও নাম আর বলো না। ও নাম ভয়ঙ্কর।

ক্ল্যারা। বলব না? এগমঁতের নাম বলব না? যে নাম সর্বত্র খোদাই করা আছে, যে নাম আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে সে নাম উচ্চারণ করব না? কি বলছ বন্ধু সব। আমার পানে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? আমি ত তোমাদের মনের কথাই বলছি। তোমরা আমার সঙ্গে চিৎকার করে বল আমরা চাই এগমঁতের স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু।

জেত্তার। ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। এ কাজ বড় কষ্টের।

ক্ল্যারা। থাম, থাম, চলে যেও না। তার নামে চমকে উঠো না। একদিন কেণ্ট থেকে এগমঁত আসবে এ কথা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা রাজপথে বেরিয়ে পড়ে অপেক্ষা করতে তার জন্য। তারপর তার ঘোড়ার হ্রেষারব শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আপন আপন কাজ ফেলে চলে আসতে। দরজার কাছে ছেলে কোলে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ছেলেদের দেখিয়ে বলতে, ঐ দেখ এগমঁত। উনি হচ্ছেন সবার থেকে বড়। যে সুদিন যে সৌভাগ্য যে সমৃদ্ধি তোমাদের পিতারা আনতে পারেনি সেই সুদিন ও সমৃদ্ধি উনি আনবেন। ভবিষ্যতে তোমাদের সেই ছেলেরা যখন এগমঁতের কথা জানতে চাইবে তখন তাদের কি বলবে? আমরা বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট করে বিশ্বাসঘাতকতা করছি তার সঙ্গে।

সোয়েস্ট। লজ্জার কথা ব্রেকেনবার্গ, এইভাবে ওকে নিয়ে বেরিও না। বিপদ ঘটবে। হয়ত—

ব্রেকেন। প্রিয়তমা ক্ল্যারা, চল আমরা যাই। তোমার মা কি বলবে?

ক্ল্যারা। তুমি কি ভাবছ আমি শিশু, আমি পাগল? তোমরা নিজেদের অন্তরের কথা নিজেরাই শুনতে পাচ্ছ না। এই বিপদের যবনিকার অন্তরাল হতে একবার তোমাদের দৃষ্টি অতীতে ও একবার ভবিষ্যতে প্রসারিত করে দাও। এগমঁত যদি না বাঁচে তাহলে তোমরা বাঁচতে পার কি? একবার ভেবে দেখ কথাটা। তার শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার শেষ নিঃশ্বাসও স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে। তোমাদের জন্য সে কি কোন ত্যাগ করেনি, রক্ত দান করেনি? আজ সেই শক্তিধর মানুষটি অন্ধকার কারাগারে মাথার উপর গুপ্তহত্যার সম্ভাবনা নিয়ে বসে বসে হয়ত তোমাদের কথাই ভাবছে। সে শুধু পাঁচজন মানুষের মঙ্গলের কথাই ভাবত। তাদের জন্য প্রার্থনা করত।

মিস্ত্রী। শোন আমার কথা, চুপি চুপি বলি।

ক্ল্যারা। পুরুষের শক্তি ও অস্ত্র আমার নেই। কিন্তু আমার আছে সাহস আর বিপদের প্রতি ঘৃণা যা তোমাদের নেই। আমি তোমাদের নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাব। উড্ডীয়মান পতাকা যেমন বীর যোদ্ধাদের পথ দেখিয়ে প্রেরণা দান করতে করতে এগিয়ে নিয়ে চলে তেমনি আমার অন্তরের জ্বলন্ত পতাকা তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমার সাহস ও ভালবাসা ছিন্নভিন্ন জনগণকে আবার ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করবে।

জেত্তার। ওকে নিয়ে যাও। দেখলে মায়া হচ্ছে।

ব্রেকেন। ক্ল্যারা, দেখছ না কোথায় রয়েছ তুমি ?

ক্ল্যারা। কোথায় ? সেই আকাশের নিচে যে আকাশের দিগন্তপ্রসারী তোরণদ্বারের মধ্য দিয়ে এগমঁত একদিন বিজয়গর্বে চলে যেত। আমি দেখেছি ঐ সব জায়গার ধারে কত লোক দাঁড়িয়ে তাকে দেখত। সে যদি অত্যাচারী হত তাহলে জনগণ আজ তার বিপদে উদাসীন থাকতে পারত। কিন্তু তারা তাকে ভালবাসত। শোন বন্ধুগণ, একদিন তোমরা তাকে দেখে হাতে টুপী নিয়ে নাড়তে। আজ সেই হাতে তোমরা তরবারি ধরতে পার না ? একদিন আমি এই বাহু দিয়ে তাকে আলিঙ্গন করতাম। আজ তার জন্য কিছুই করতে পারছি না। অথচ জগতে প্রতিরক্ষামূলক পরিকল্পনার দ্বারা কত কার্য সাধিত হয়েছে। তোমরা কারাগারের পথ ঘাট সব জান। কোন কিছুই অসম্ভব না। যা হোক কিছু একটা ভেবে ঠিক করো।

ব্রেকেন। তুমি যাবে কি ?

ক্ল্যারা। ঠিক আছে।

ব্রেকেন। ঐ কোণে আলভার প্রহরী রয়েছে। তোমার অন্তরে যুক্তিবোধ জেগে উঠুক। তুমি কি আমাকে কাপুরুষ ভাব ? তোমার জন্য আমিও আমার জীবন বিপন্ন করে তুলব এতে সন্দেহ আছে কি ? তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমার পরিকল্পনা অবাস্তব অসম্ভব ? শান্ত হও, তুমি আত্মহারা হয়ে পড়েছ।

ক্ল্যারা। আত্মহারা ? তুমিই আত্মহারা হয়ে পড়েছ। একদিন তুমি তাকে দেখে আনন্দে ধ্বনি দিতে, কত উল্লাস করতে, তোমাদের জীবনের একমাত্র আশা ভরসার স্থল বলে মনে করতে, আজ তার বিপদে তাকে অস্বীকার করছ, বুঝতে পারছ না তার ধ্বংস তোমাদেরও ধ্বংস অনিবার্য।

ব্রেকেন। চল, বাড়ি চল।

ক্ল্যারা। বাড়ি!

ব্রেকেন। একবার স্মরণ করে দেখ, এই সব রাস্তায় তুমি একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া কখনো বার হতে না। ছুটির দিন নীরবে চার্চে যেতে। আর আজ তুমি সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলের সামনে কথা বলছ চিৎকার করে।

ক্ল্যারা। বাড়ি! হ্যাঁ, বাড়ি চল ব্রেকেনবার্গ। আমার স্মরণ হয়েছে। কিন্তু জান কি, আমার বাড়ি কোথায়? (সকলের প্রস্থান)

কারাগার

এগমঁত একাকী

এগ। হে আমার পুরনো বন্ধু! আমার চিরবিশ্বস্ত বন্ধু নিদ্রা, আমার অন্যান্য বন্ধুর মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে? আগে আমার স্বাধীন চোখের উপর না চাইতেই তুমি প্রেমের মালা হাতে নেমে আসতে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করতে। কত যুদ্ধবিপর্যয়ের মাঝে ও বিক্ষুব্ধ জীবনসমুদ্রের তরঙ্গমালার দ্বারা তাড়িত হয়ে আমি কতবার তোমার বাহুযুগলের উপব মাথা রেখে বিশ্রাম লাভ করেছি। ঝড়ে ঝঞ্ঝায় আমার অন্তর কখনো বিচলিত হত না। কিন্তু আজ আমার অন্তর বিচলিত হচ্ছে কেন? তার কারণ, আজ সে ঘাতক কুঠারের শব্দ শুনতে পেয়েছে। কাঠুরিয়ার আঘাতে অবিচল মহীরুহের মত আমি আজও দাঁড়িয়ে আছি খাড়া হয়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ পারব না। আমার পাতার মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু হে আমার অন্তর, এর আগে কত দুঃখকেই ত তুমি তোমার ভ্রূযুগল হতে ঝেড়ে ফেলতে সহজে, কিন্তু আজ এই আশঙ্কাটাকে কেন অপসারিত করতে পারছ না? আর মৃত্যু বিচ্ছিন্নরূপে তোমার সামনে এলেও তুমি অবিচলিত ও শান্ত থাকতে। কখনো কম্পিত হওনি। কিন্তু আসলে মৃত্যুভয় আমাকে যতখানি বিচলিত না করছে ততখানি বিচলিত করছে আমার এই অন্ধ কারাগার যা সমাধিগহ্বরের ভয়ঙ্কর প্রতীকরূপে বীর ও কাপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই ভয় দেখায়। এর আগে রাজসভার সামন্তদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করতে করতে বিরাট হলঘরের লম্বা লম্বা দেওয়ালগুলোর মাঝে বিরক্তি বোধ করতাম, তখন হঠাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার ঘোড়ায় চেপে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতাম, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতাম মুক্ত উদার পৃথিবীতে। বাতাসে ভেসে বেড়াত ফুলের সুবাসরূপী প্রকৃতির সম্পদ। স্তব্ধ নিশীথে আকাশ হতে ঝরে পড়ত নক্ষত্রের অনন্ত কিরণমালা। আমি তখন ছুটে বেড়াতাম, লাফিয়ে

বেড়াতাম মাতৃস্পর্শে উল্লসিত শিশুর মত আর আমার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হয়ে উঠত আমার সত্তার অনন্ত শক্তি। অরণ্যে প্রান্তরে দুর্বার বেগে বয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের মত আমার দুরন্ত স্বাধীনতা সর্বত্র স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হত।

এখন মনে হচ্ছে যে সুখ একদিন ভোগ করে এসেছি তা সুখের স্বপ্ন বা ছায়ামাত্র। হে আমার জীবন, বিশ্বাসঘাতক নিয়তি কোথায় তোমায় নিয়ে এসেছে। জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যু ও সমাধি গহ্বরের আস্বাদন দান করার জন্যই কি নিয়তি তোমাকে এনেছে এখানে? এই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরের পাথরগুলো হতে এক দুর্গন্ধ বার হয়ে জীবনের সব স্রোতকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। রাজার যে ন্যায়বিচারে তোমার প্রচুর আস্থা ছিল, যে রাজপ্রতিনিধির বন্ধুত্বকে তুমি প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দান করেছ, তা কি নৈশ উল্কার মত অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে? অরেঞ্জ কি কোন দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কার্যকরী করবে না? দেশের জনগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কি তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধার করবে না?

হে কারাপ্রাচীর, তুমি চারদিক থেকে আমাকে আবদ্ধ করে রেখে প্রহরা দিচ্ছ। কিন্তু তুমি যেন জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যম থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করো না। যে সাহস দিয়ে আমি একদিন উদ্বুদ্ধ করতাম তাদের সে সাহস যেন আমার বুকে ফিরে আসে আজ। হ্যাঁ, তারা হাজারে হাজারে এসে গেছে। তাদের সম্মিলিত প্রার্থনা আকাশকে স্পর্শ করছে। নবোদিত সূর্যের মত নূতন স্বাধীনতাকে বরণ করে নেবার জন্য এগমঁত এগিয়ে চলেছে। আমি অনেক পরিচিত মুখ দেখতে পাচ্ছি। ও ক্ল্যারা, তুমি যদি পুরুষমানুষ হতে তাহলে এই স্বাধীনতাদিবসে সবচেয়ে আগে আমি দেখতাম তোমাকে।

ক্ল্যারার বাসভবন

ক্ল্যারা

ক্ল্যারা। (পাশের ঘর থেকে একটা বাতি আর এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে একটা টেবিলের উপর তা নামিয়ে রাখল) ব্রেকেনবার্গ, এ কি তুমি? বিশেষ গোলমাল? এখনো কেউ এলো না? তবু আমি এই বাতিটা জানালার ধারে রেখে দেব। এতে সে বুঝতে পারবে আমি এখনো তার জন্য জেগে আছি, তার পথ চেয়ে বসে আছি। ব্রেকেনবার্গ বলেছিল সে আমাকে খবর দেবে। কিসের খবর? এগমঁতের ফাঁসি হয়েছে—এই খবর? কী ভয়ঙ্কর নিশ্চয়তা! কে তার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দেবে?—রাজা না ডিউক? এর কোন প্রতিকার নেই। অরেঞ্জ ইতস্তত: করছে। রাজপ্রতিনিধি পদত্যাগ করে চলে গেছে।

একদিন যারা বন্ধু ছিল তারাও সবাই বিমূঢ় ও দ্বিধাগ্রস্ত। মানুষের বিশ্বাস-ঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতার অনেক কাহিনী এর আগে আমি শুনেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। আজ হলো। এই হচ্ছে জগৎ। তার মত লোকের প্রতি কারো মনে হিংসা থাকা উচিৎ নয়। তবু শয়তান সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার বস্তু সেই মানুষটিকে অকস্মাৎ ধ্বংস করে ফেললে। তুমি বলতে আমি তোমার। আমি বলতাম তুমি আমার। কিন্তু আজ আমি মুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমি অসহায় অক্ষম, তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। এভাবে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। তার থেকে আমাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করো। আমি পাথরে মাথা ঠুকে মরব আর তার মুক্তির কথা ভাবব। আজ আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন থাকলেও আসলে বন্দী, আমার স্বাধীনতা এক নিস্ফল বেদনায় ভরা। তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি আমি। কে চুপি চুপি আসছে মনে হচ্ছে। ব্রেকেনবার্গ, এস, আমি তোমার জন্য দরজা খোলা রেখেছি।

ব্রেকেনবার্গের প্রবেশ

ক্ল্যারা। তোমাকে দেখে খুব ভীত ও মলিন দেখাচ্ছে। বল ব্রেকেনবার্গ, কি খবর!

ব্রেকেন। আমি তোমার জন্য অতি কষ্টে গলিপথে ও ঘুরপথে এসেছি এখানে। বড় বড় সব রাজপথে অসংখ্য সৈন্য মোতায়েন আছে।

ক্ল্যারা। বল, কি সব ঘটছে এখন।

ব্রেকেন। আমার কান্না পাচ্ছে। শোন ক্ল্যারা, আমি তাঁকে ভালবাসতে পারিনি। তিনি ছিলেন ধনী অভিজাত ঘরের লোক। আমি গরীব। তিনি আমাদের আশা দিতেন। গরীবদের নিঃসঙ্গ নিজস্ব ভেড়াটাকে আরো সুন্দর সমৃদ্ধ তৃণভূমির আশ্বাস দিতেন। তাই প্রতিদিন ভাবতাম আমাদের সব দুঃখের এবার শেষ হবে।

ক্ল্যারা। সে সব কথা ভুলে যাও ব্রেকেনবার্গ। এখন তার খবর বল। তার কি ফাঁসি হয়েছে?

ব্রেকেন। আমি জানি তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।

ক্ল্যারা। এখনো কি বেঁচে আছে?

ব্রেকেন। হ্যাঁ জীবিত আছেন।

ক্ল্যারা। কি করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার তুমি? অত্যাচারীরা তাদের

বলির বস্তুকে রাত্রিতেই হত্যা করে। সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে তার রক্ত-স্রোত বয়ে চলেছে। সব মানুষ ঘুমিয়ে আছে যখন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মুক্তির স্বপ্ন দেখছে তখন তার আত্মা আমাদের কাপুরুষতায় ক্ষুব্ধ হয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে আর নেই। আমার সঙ্গে ও নিজের কাছে প্রতারণা করো না।

ব্রেকেন। না, এখনো তিনি বেঁচে আছেন। বিদেশী স্পেনদেশীয় সাম্রাজ্য-বাদীরা আমাদের দেশের জনগণের উপর চরম প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করছে। এখনো যারা মুক্তির স্বপ্ন দেখছে তাদের ওরা শেষ করে দেবে।

ক্ল্যারা। বল, আরও বল। আমারও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করো শান্তভাবে। আমি সেই মৃত্যুর দেশের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে যেখান থেকে সান্ত্বনার বাণী ভেসে আসবে না আমার জন্যে।

ব্রেকেন। এখানে সেখানে সৈনিকদের টুকরো টুকরো কথা থেকে জানতে পারলাম বাজারের কাছে ওরা এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমি লুকিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমার এক জ্ঞাতি ভাইএর বাড়িতে যাই। সেখান থেকে আমি জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসি। প্রহরারত সৈনিকরা ইতস্ততঃ মশালের আলো ঘোরাচ্ছিল। সেই আলোয় হঠাৎ চকিতে দেখতে পেলাম একটা বিরাট বধ্যভূমি নির্মিত হচ্ছে। সাদা রূপোর মত কাঠের স্তম্ভগুলো কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। মনে হলো কাদের প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা হচ্ছে। ইতস্ততঃ ছড়ানো মশালের আলোগুলো সরিয়ে নিতেই আবার গভীর হয়ে উঠল রাত্রির অন্ধকার।

ক্ল্যারা। চুপ করো ব্রেকেনবার্গ। ভূতপ্রেতগুলো চলে গেছে। হে রাত্রি, তুমি তোমার কালো যবনিকা বিস্তার করো পৃথিবীর উপর। পৃথিবী আর এসব সহ্য করতে পারছে না। পৃথিবীমাতা মুখ ব্যাদান করে ওদের নির্মিত বধ্যভূমি গ্রাস করে ফেলবে আর সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর এমন এক দেবদূত পাঠাবেন যে এগমঁতকে আলোকিত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্যে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমিও সেখানে যাচ্ছি তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য।

ব্রেকেন। কোথায় যাবে তুমি, কি করবে?

ক্ল্যারা। আস্তে কথা বলো না। তা না হলে কেউ জেগে উঠবে। এই শিশিটা চিনতে পারছ ব্রেকেনবার্গ? একদিন তুমি যখন তোমার দুঃখের জীবন শেষ করে দেবার জন্য আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছিলে সেদিন আমি এটা তোমার

কাছ থেকে কেড়ে নিই। আজ আমি—

ব্রেকেন। সমস্ত সাধুদের নামে বলছি শোন।

ক্লারা। তুমি আমাকে বাধা দিও না। যে সহজ মৃত্যু তুমি একদিন লাভ করতে চেয়েছিলে সে মৃত্যু লাভের পথে আজ বাধা সৃষ্টি করো না। যাবার আগে শেষ মুহূর্তে আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি। আমি তোমাকে কত গভীর-ভাবে ভালবেসে এসেছি। আমার ভাই অল্পবয়সে মারা যায়। আমি তোমাকে তার আসনে বসিয়েছিলাম। তুমি আরো পেতে চেয়েছিলে। ঘটনাক্রমে আমি তা দিতে পারিনি। আজ তোমাকে আমার ভাই বলে ডাকতে দাও। আজ আমার বিদায়ী আত্মার কাছ থেকে তার ভালবাসার শেষ চিহ্ন হিসাবে এই চুম্বনটুকু গ্রহণ করো।

ব্রেকেন। তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে মরতে দাও। একসঙ্গে মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করতে দাও। শিশিতে যা বিষ আছে তাতে দুজনের জীবনের অবসান ঘটবে।

ক্লারা। থাম। তোমাকে বাঁচতেই হবে। তুমি আমার মার দেখাশোনা করবে। তাঁর কাছেই থাকবে। তুমি না থাকলে মার দিন চলবে না। তুমি বেঁচে থেকে আমার জন্য, দেশের জন্য ও সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার জন্য চোখের জল ফেলবে যিনি দেশকে উদ্ধার করতে পারতেন সকল বিপদ থেকে। আজ মনে হচ্ছে জগতের গতি হঠাৎ থেমে গেছে। আমার হৃদস্পন্দন আর কিছুক্ষণ মাত্র। বিদায়।

ব্রেকেন। তোমার জন্য যেমন আমরা বাঁচছি, আমাদের জন্য তুমিও বেঁচে থাক। তোমাকে ছাড়া আমাদের জীবন দুঃসহ ও দুঃখময় হয়ে উঠবে। আমরা তোমার পাশে সব সময় দাঁড়াব। তুমি আমার একার নও, সকলের হয়ে বেঁচে থাক।

ক্লারা। চুপ করো ব্রেকেনবার্গ, তুমি যেখানে আশা দেখছ সেখানে আমি দেখছি শুধু হতাশা।

ব্রেকেন। জীবিতদের আশার অংশ নিয়ে বেঁচে থাক। মৃত্যুর খাদের পাশে দাঁড়িয়ে তার অতল গভীরে একবার তাকিয়ে দেখে ফিরে এস।

ক্লারা। আমি তা দেখেছি, সব কুণ্ঠা সব দ্বিধা জয় করেছি। আমাকে আর ডেকো না।

ব্রেকেন। রাত্রির অন্ধকারে তুমি অভিভূত হয়ে পড়েছ। তোমার চোখে ধাঁধাঁ

লেগেছে। তাই কোন আলো দেখতে পাচ্ছ না। কিন্তু সব আলো এখনো নিবে যায়নি।

ক্ল্যারা। হায়, হায়, তুমি আমার চোখের উপর থেকে মায়ার কুয়াশাটা নির্মম-ভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে। সত্যিই রাত্রির কুয়াশা কেটে গেলে সকালে সূর্য উঠবে। বিকৃতদেহ পরিত্রাতা পরমপিতার দিকে যৌথ হাত তুলে তাকাবেন। কিন্তু সূর্যের আলোয় সব কিছু ঢাকা পড়ে যাবে। পরম পিতা তা দেখতে পাবেন না। সকালের কথা আমাকে মৃত্যুর কথাটা বেশী করে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। (জানালার ধারে গিয়ে বিষের বড়ি খেল)

ব্রেকেন। ক্ল্যারা, ক্ল্যারা!

ক্ল্যারা। (টেবিলের কাছে গিয়ে জলপান করল।) আরো কিছু বিষ আছে। কিন্তু তুমি তা খেও না। যা খুশি করো। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। মাকে এখন জাগিও না। তা না হলে আমার হত্যার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে।

ব্রেকেন। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমাকে কত ভালবাসত। অথচ আজ আমাকে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে রেখে গেল। এখন জীবন আর মৃত্যু দুটোই ঘৃণ্য আমার কাছে। সে আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। ও এগমঁত, তুমি কত ভাগ্যবান! তার হাত থেকে স্বর্গে তুমি বিজয়মুকুট লাভ করবে। সে স্বর্গে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবেই। আজ তোমার ভাগ্যে ঈর্ষা হচ্ছে আমার এবং এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুদূর স্বর্গে যেতেও আমি রাজী। এখন স্বর্গ ও মর্ত্য দুটোই বেদনাদায়ক আমার কাছে। এখন আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে মৃত্যুই একমাত্র কাম্য বস্তু। (প্রস্থান)

কারাগার

(এগমঁত বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। চাবি খোলার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মশাল হাতে কয়েকজন ভৃত্য প্রবেশ করল। তাদের পিছনে ছিল কয়েকজন সৈনিক। ঘুম থেকে চমকে উঠল এগমঁত।)

এগ। কে তোমরা আমার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিলে। তোমাদের ঐ দুর্বিনীত দৃষ্টির অর্থ কি?

সিলভা। আপনার দণ্ডের কথা ঘোষণা করার জন্য ডিউক আমায় পাঠিয়েছেন।

এগ। তুমি ঘাতককেও সঙ্গে করে এনেছ কি যে ফাঁসির হুকুম তামিল করবে?

সিলভা। আপনি শীঘ্রই আপনার মৃত্যুদণ্ডের কথা জানতে পারবেন।

এগ। তোমার অন্যান্য জঘন্য কাজের সঙ্গে এ কাজ খুবই সংগতিপূর্ণ। এ কাজের পরিকল্পনা রাত্রিবেলায় করে রাতেই এ কাজ সম্পন্ন করতে চাও যাতে লোকে দেখতে না পায়। তার থেকে এগিয়ে এস, পোষাকের অন্তরালে লুকিয়ে রাখা তরবারি নিয়ে এগিয়ে এস আমার কাছে। এই আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। এইভাবে চিরকাল স্বাধীনচেতা মানুষের মাথার উপর অত্যাচারীদের খড়্গ নেমে আসে।

সিলভা। আপনি ভুল করছেন। ন্যায়পরায়ণ বিচারকেরা আপনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন এবং প্রকাশ্য দিনের আলোতেই সেই দণ্ডাজ্ঞা পালিত হবে।

এগ। তাহলে ত তাদের ঔদ্ধত্য সব কল্পনা ও বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সিলভা। (দণ্ডাদেশটি জনৈক অনুচরের কাছ থেকে নিয়ে) রাজার নামে এবং রাজার দ্বারা যথাযথভাবে যে কোন শ্রেণীর প্রজাদের এমন কি গোল্ডেন. ফ্লীস উপাধিধারী নাইটদেরও বিচার করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমরা ঘোষণা করছি যে—

এগ। রাজা কি এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন?

সিলভা। আমরা ঘোষণা করছি যে আমরা কঠোরভাবে তদন্তকার্য চালিয়ে দেখলাম যে আপনি হেনরি কাউন্ট এগমঁত, গড়ের রাজকুমার, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী এবং এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আপনার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করছি—অতি প্রত্যুষে আপনাকে এখান থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে জনসাধারণের চোখের সামনে অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে আপনার মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হবে।—আলভার ডিউক কার্দিনান্দ, বারোজন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ বিচারসভার সভাপতি।

আপনাকে আপনার দণ্ডের কথা জানানো হলো। আর অল্প সময় বাকি আছে। এর মধ্যে আপনি আপনার বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিন। (সিলভার প্রস্থান)

এগ। (কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখ তুলে) তুমি রয়ে গেলে? তুমি কি তোমার উপস্থিতির দ্বারা আমার মৃত্যুর বিভীষিকাকে আরো বাড়িয়ে দিতে চাও? নারীসুলভ হতাশা আর বিষাদের চাপে কতখানি আমি ভেঙে পড়েছি তুমি কি সেই খবরটা তোমার পিতাকে জানাতে চাও? তবে তাকে বলবে সে কাউকে ঠকাতে পারবে না। প্রথমে চুপি চুপি, পরে প্রকাশ্যে একথা সকলেই বলে বেড়াবে যে ঐ লোকটাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ আর বিদ্রোহ বাধিয়ে

তা মেটাতে আসে। আজ তার বলিতে পরিণত হই আমি। হ্যাঁ, ও আমার বহুদিন ধরে হিংসা করে আসছে এবং বহুদিন হতে আমার ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করে আসছে।

তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তোমার বাবার সঙ্গে আমি প্রায়ই পাশা খেলতাম। আমি কোন দানে জিতে গেলে ও রেগে যেত। নিজের পরাজয়ে দুঃখবোধ না করে আমার জয়ে ঈর্ষাবোধ করত ও। তারপর একবার হাজার হাজার লোকের সামনে স্পেনদেশীয় ও হল্যাণ্ডবাসীদের মধ্যে একটা বাজী হয়। তাতেও আমি জয়লাভ করি। আমার বলই লক্ষ্যে আঘাত করতে সমর্থ হয়। আজ ও তার প্রতিশোধ নিল। আজ ওর বল লক্ষ্যে আঘাত হানল। তবে তাকে বলবে এইভাবে হীন চাতুর্য ও কৌশলের সাহায্যে যারা কার্যসিদ্ধি করে বা কোন জয় লাভ করে তাদের জগতের লোক ঘৃণা করে। যে পিতার জন্য তোমাকে লজ্জা ভোগ করতে হচ্ছে, যাকে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারবে না, সম্ভব হলে সেই পিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

ফার্দি। কোন বাধা না দিয়ে আমি আপনার সব কথা শুনলাম। আপনার ভর্ৎসনাবাক্য আমার দেহের লোহার বর্মের উপর ঝরে পড়ল। কিন্তু কোন আঘাত দিতে পারল না। তবে অন্তরে আঘাত ও বেদনা আমি পূর্ণমাত্রায় অনুভব করছি। এটা দুঃখের বিষয় যে এ দৃশ্য আমায় দেখতে হলো।

এগ। তুমি শোকে ভেঙে পড়ছ? এত বিচলিত হচ্ছ কেন? এই জঘন্য ষড়-যন্ত্রের জন্য কি শিলষে অনুশোচনা বোধ করছ? তোমার বয়স কম, স্বভাবে ধীর স্থির, আমার সঙ্গে তোমার সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য ছিল। আমি তোমাকে দেখে তোমার অনেক কথা সহ্য করতাম। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করে ভুল করেছি। তুমিই আমাকে উপরে ভালমানুষির ভাব দেখিয়ে এই বিপদের মধ্যে ফেলেছ। তুমি একটা আস্ত দানব, কিন্তু এখন যাও, আমায় শেষ সময়ে একটু একা থাকতে দাও যাতে আমি পৃথিবীর সবাইকে বিশেষ করে তোমাকে ভুলে যেতে পারি।

ফার্দি। কি বলব আমি? আমি শুধু তোমাকে দেখছি আর নিজের অস্তিত্বের কথাটাও ভুলে যাচ্ছি। আমি বাধ্য হয়ে আমার পিতার ইচ্ছাপূরণের যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছি, শেষ মুহূর্তে আমি জানতে পেরেছি তার আসল মতলবের কথা। যেটা আমাকে সবচেয়ে বিচলিত করেছে তা হলো আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাবের কথা। তুমি মরছ আর আমি তোমার মৃত্যুর কথাটা

জানাতে এসেছি। তোমার জন্য হা হুতাশ করছি।

এগ। কী অদ্ভুত কণ্ঠস্বর! কার কণ্ঠ থেকে সান্ত্বনা ঝরে পড়ছে আমার সমাধি গহ্বরে যাবার পথে। তুমি আমার জীবনের একমাত্র শত্রুর পুত্র, অথচ তুমি হত্যাকারীদের ষড়যন্ত্রে জড়িত নও।

ফার্দি। হে নিষ্ঠুর পিতা, তোমার এই আদেশের মধ্যে আমি তোমার স্বরূপটিকে চিনতে পারছি। তুমি জানতে, আমার অন্তরটা কোমল এবং সেটা আমার মার স্বভাব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলে ধিক্কার দিতে। যাতে আমি অপরের বিপদে অবিচলিত থাকতে পারি, গভীর বেদনাকে অবলীলাক্রমে চেপে রাখতে পারি তার জন্যই তুমি এই মানুষটির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছ।

এগ। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছি। শান্ত হও।

ফার্দি। হায়, আমি যদি নারী হতাম! আমাকে আরো ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার কথা বল।

এগ। তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছ। ভুলে যাচ্ছ কোথায় আছ তুমি।

ফার্দি। আমার বেদনার আবেগকে ব্যক্ত করতে দাও। যখন আমার সমগ্র অন্তরসত্তা প্রবলভাবে বিচলিত হচ্ছে ভিতরে ভিতরে তখন আমি বাইরে কৃত্রিম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পারব না। তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি কেমন করে তোমাকে এখানে দেখব এগমঁত।

এগ। এ রহস্যের অর্থ কি?

ফার্দি। এর মধ্যে রহস্যের কিছু নেই।

এগ। সামান্য এক ব্যক্তির দুর্ভাগ্যে কি করে তুমি এতদূর বিচলিত হলে?

ফার্দি। তুমি এক সামান্য ব্যক্তি নও। আমার বাল্যকালেই তোমার কথা শুনে তোমার কৃতিত্বের কথা শুনে তোমাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করি আমি। যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি তোমার প্রতি। তুমিই আমার ছিলে একমাত্র আদর্শ পুরুষ। তোমাকে কতবার দেখতে চেয়েছি। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছি। কিন্তু এভাবে এখানে যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে তা ভাবতেই পারিনি।

এগ। তবে জেনে রাখ বন্ধু, আমিও তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি তোমার প্রতি। একটা কথার উত্তর দাও। আমার জীবন নেওয়ার ব্যাপারে তোমার পিতা কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ?

ফার্দি। হ্যাঁ, সত্যিই তাই।

এগ। এমনও ত হতে পারে যে এই মৃত্যুদণ্ডের দ্বারা আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে, আসলে অপমান করা হচ্ছে এবং নূতন করে রাজার বশ্যতা স্বীকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ফার্দি। না, তা নয়। প্রথমে আমার তাই মনে হয়েছিল। এই ভ্রান্ত আশার দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলাম আমি। পরে দেখলাম তা মিথ্যা। তোমার ধ্বংস অনিবার্য।

এগ। আমার কথা শোন। তোমার অন্তর যদি আমার জন্য এতই কাঁদে, যে অত্যাচারী আমাকে শৃংখলাবদ্ধ করেছে তাকে যদি তুমি ঘৃণা করো তাহলে আমাকে মুক্ত করো। তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমানের পুত্র। তোমার হাতে ক্ষমতা আছে। বল আমরা পালিয়ে যাই। আমি পথ চিনি। কিছুদূর গেলেই আমার বন্ধুদের দেখা পাব। ভবিষ্যতে রাজা নিশ্চয় আমার মুক্তিদাতাকে ধন্যবাদ দেবেন। তিনি হয়ত আমার এই শাস্তির কথা কিছুই জানেন না। আমার মৃত্যুদণ্ডের কথা পরে জানতে পেরে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু কোন উপায় থাকবে না বলে মেনে নিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং আমার মুক্তির পথ করে দাও।

ফার্দি। থাম থাম। তোমার প্রতিটি কথা আলোর হতাশাকে আরো ঘণীভূত করে তুলছে শুধু। পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই। পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এই চিন্তাই আমার মনোকষ্ট আরো বাড়িয়ে দেয়। আমি নিজের হাতে যে জাল বিস্তার করেছি তার প্রতিটি গ্রন্থি কত শক্ত, কত সুকঠিন তা আমি ভালভাবেই জানি। আমিও তোমার মত বন্দী। মুক্তির কোন পথ খোলা থাকলে আমি অকারণে এমন করে দুঃখ প্রকাশ করতাম না। আমি প্রতিবাদ করেছি। তার পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করেছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমার জীবনের অবশিষ্ট আনন্দটুকু পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার জন্যই উনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

এগ। তাহলে মুক্তির কোন উপায় নেই?

ফার্দি। না, নেই।

এগ। মুক্তির কোন উপায় নেই। হে মধুর জীবন, সমস্ত অস্তিত্ব ও কর্ম-তৎপরতার আনন্দজনক উৎস, আমাকে কি সত্যিই বিদায় নিতে হবে তোমার কাছ থেকে? কিন্তু যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে নয়। নীরবে চলে যেতে হবে।

তোমার এত তাড়াতাড়ি মরা চলবে না। কিন্তু জীবন ও মৃত্যুর এই ফাঁকটাকে কোন সেতুবন্ধনের দ্বারা পূরণ করতে পার না? আরও একবার তোমার হাতটা ধরতে দাও। তোমার চোখে চোখ রেখে তাকাতে দাও। তোমার সৌন্দর্য আমার আবেগানুভূতির সমস্ত নিবিড়তা ও তীক্ষ্ণতা নিয়ে অনুভব করতে দাও। তারপর আমি বিদায় নেব তোমার কাছে চিরদিনের জন্য।

ফার্দি। আমি কি দাঁড়িয়ে নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত সব দেখব না কি তোমায় সাহায্য দান করব? দুঃখের কান্নায় কোন লাভ হয় কি? এই ধরনের ব্যথার চাপে যেন কোন অন্তর ভেঙ্গে না যায়।

এগ। শান্ত হও।

ফার্দি। তুমি শান্ত থাকতে পার, তুমি শান্তভাবে জীবনত্যাগ করতে পার। বীরপুরুষের সাহসিকতা নিয়ে ঘোরতর সংগ্রামে এগিয়ে যেতে পার। কিন্তু আমি কি পারি? তুমি তোমার নিজের আত্মা ও আমাদের সকলকে জয় করতে পার। তুমি বিজয়ী বীর। কিন্তু আমি শুধু বেঁচে থাকতে পারি। আমার মনে হচ্ছে আমার জীবনে আর কোন আনন্দ নেই। ভোজসভাব মধ্যে আলো খুঁজে পাচ্ছি না। আমার পতাকা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং জটিল।

এগ। হে আমার তরুণ বন্ধু, তোমাকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হারালাম। তুমি আমার মৃত্যুর জন্য নিজে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছ। তুমি আমার পানে তাকাও। তুমি আমাকে হারাতে না। আমার জীবনের দর্পণে যেমন আমাকে দেখছিলে তেমনি আমার মৃত্যুর দর্পণেও আমাকে দেখতে পার। মানুষ মানুষের কাছে থাকলেই যে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করে তা নয়। দূরে থেকেও সে সঙ্গ লাভ করতে পারে। এতদিন আমি আমার নিজের জন্য বেঁচেছি, এবার মৃত্যুর পর তোমার জন্য বাঁচব। আমার আদর্শ অনুসরণ করে চলবে, মৃত্যুকে কখনো ভয় পাবে না। আমার জীবন ত গ্রেভলীনের যুদ্ধেও শেষ হতে পারত। জীবনে অনেক সুখ ভোগ করেছি। নিজের বিবেকের নির্দেশমত অনেক কর্তব্য পালন করেছি। আমার জন্য দুঃখ করো না।

ফার্দি। আমাদের জন্য তোমার বাঁচা উচিত ছিল। এবং ইচ্ছা করলেই তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারতে। তুমি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছ। কতবার শুনেছি তোমার শত্রু-মিত্ররা তোমার যোগ্যতা বা গুণাগুণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলে একমত হয়েছে। তারা একবাক্যে

স্বীকার করেছে তুমি বিপজ্জনক পথে চলেছ। আমি তোমাকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি। তোমার কোন বন্ধু ছিল না?

এগ। আমার বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল।

ফার্দি। তোমার বিরুদ্ধে অতীত সব অভিযোগ আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখেছি। তোমার উত্তরও পড়েছি। তাতে তোমার আচরণ কিছু আপত্তিকর মনে হলেও তাতে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মত কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল না।

এগ। ওসব কথা এখন থাক। মানুষ ভাবে সে তার জীবনকে পালিত করছে, তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু আসলে তার সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় ভাগ্যের দ্বারা। এসব কথা আর ভাবতে চাই না। আমার রক্তপাতে যদি দেশের মধ্যে শান্তি আসে তাহলে সে রক্ত প্রবাহিত হোক। যদি পার তোমার পিতার অসংযত মারাত্মক ক্ষমতাকে সংযত করার চেষ্টা করো। বিদায়।

ফার্দি। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

এগ। আমার লোকজনদের তোমার অধীনে কাজ করে যাবার জন্য পরামর্শ দিয়ে যেতে চাই। আমার হাতে অনেক যোগ্য লোক আছে। আমার সচিব রিচার্ডের খবর কি?

ফার্দি। সে আপনার আগেই চলে গেছে। তাকে ওরা ফাঁসি দিয়েছে রাষ্ট্র-দ্রোহিতার অপরাধে।

এগ। আর আমি বাঁচতে চাই না। মানুষের মন যতই বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল হয়ে উঠুক না প্রকৃতি একদিন তার প্রভাবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেই তার উপর। শিশু যেমন না জেনে মায়ের শীতল কুণ্ডলীর মধ্যে নিশ্চিন্তে ঘুমোয় তেমনি অনেকে পরিণামের কথা চিন্তা না করে কাজ করে, জেগে ঘুমোয়। কিন্তু তাদের সে ঘুম একদিন ভাঙবেই। আর একটা কথা। একটি কুমারী মেয়েকে আমি ভালবাসতাম। তুমি তার দেখাশোনা করবে। তোমার মন উদার। আমার বুড়ো এ্যাডলফাসের খবর কি?

ফার্দি। সে এখনো মুক্ত এবং জীবিত আছে।

এগ। এ্যাডলফাস মেয়েটির বাড়ি চেনে। সে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মেয়েটি এক পরম রত্নবিশেষ। পথ দেখিয়ে তার কাছে নিয়ে যাবার জন্য বুড়োকে কিছু পুরস্কার দিও। বিদায়।

ফার্দি। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না।

এগ। (দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে) বিদায়।

ফার্দি। আমাকে আর এক মুহূর্ত থাকতে দাও।

এগ। না বন্ধু, আর না। (ফার্দিনান্দকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে পরে চলে এল। ফার্দিনান্দ দুঃখে অভিভূত অবস্থায় চলে গেল)

এগ। (একা) হে নিষ্ঠুর মানব, তুমি জান না তোমার পুত্র আমার কত উপকার করেছে। যে মানসিক যন্ত্রণা গতকাল আমাকে সারা রাত্রি ধরে জাগিয়ে রেখেছে সে যন্ত্রণা থেকে সে আমায় মুক্তি দিয়েছে। এখন আমার মনে শান্তি বিরাজ করছে অবাধে। (সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে বিছানায় বসল) হে মধুর নিদ্রা, বিশুদ্ধ সুখের মত চলে এস আমার চোখে। সুখ দুঃখের সব অনুভূতিকে মিশিয়ে দিয়ে এক নিগূঢ় ঐক্যতানের স্রোত বইয়ে দাও আমার মনে। এক শান্তমধুর আশার ছলনায় মুগ্ধ করে বিস্মৃতির গভীরে আমাকে ডুবিয়ে দাও। (এগমঁত ঘুমিয়ে পড়ল। গানের শব্দ শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ দেওয়ালটা ফাঁক হয়ে যেতে তার ভিতর থেকে স্বর্গীয় পোষাকে আবৃত ক্ল্যারার বেশে মুক্তির দুত নেমে এল স্বর্গ থেকে। এগমঁতের দিকে এগিয়ে গেল। এগমঁতের অবস্থা দেখে প্রথমে দুত খুব দুঃখিত হলো পরে তাকে সাহস দিল মূর্তিটি। বোঝাল তার মৃত্যুর ফলে এগমঁতকে সমস্ত প্রদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই বলে তার মাথায় লরেল পাতার মুকুট পরিয়ে দিল। এগমঁত ঘুমের ঘোরেই তার মাথায় হাত দিতে গেল, এমন সময় দূরে সামরিক সঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যেতেই তার ঘুম ভেঙে গেল, আর ক্ল্যারার বায়বীয় মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল।)

কোথায় গেল মুকুট। হে সুন্দর মূর্তি দিনের আলো আসাতে তুমি চলে গেলে! একাধারে আমার দুটি আনন্দের বস্তু—স্বর্গীয় স্বাধীনতা আর আমার প্রিয়তমার মূর্তি। সে মূর্তির পায়ে ও পোষাকে রক্ত লেগে ছিল। সে রক্ত আমার ও অনেক বীরের রক্ত। এত রক্তপাত কখনো বৃথা যাবে না। হে বীর জনগণ, এগিয়ে চল, স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। সমুদ্রের ঢেউ যেমন সব বাধাকে চূর্ণ করে এগিয়ে চলে তেমনি তোমাদের সংগ্রামের ঢেউ অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

(জয়ঢাকের শব্দ)

ঐ শোন। একদিন ঐ শব্দ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য আহ্বান করত। আমি তখন কত আনন্দে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতাম বীরের মত। আজ আমি এই অন্ধকার কারাগার হতে এক গৌরবময় মৃত্যুর রাজ্যের পথে এগিয়ে

চলেছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য আজ আমি মৃত্যুবরণ করছি। এই দেশ ও দেশবাসীর জন্যই আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম আর সেজন্যই আমার এই উৎসর্গ। (স্পেনদেশের সৈনিকদের দেখা গেল দৃশ্যপটে) এস, এগিয়ে এস। যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা পরিবৃত হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে আমার। চারদিকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দ্বারা যতই পরিবৃত হয়েছি ততই দ্বিগুণভাবে অনুভব করেছি প্রাণশক্তির অদম্য প্রবাহকে। (জয়ঢাকের শব্দ) শত্রুরা এগিয়ে আসছে। ভাই সব, চারদিকে ঝলসে উঠছে তাদের তরবারি। তবু সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে চল। তোমাদের পিতামাতা, পুত্র পরিবার সব তোমাদের পিছনে আছে। মনে রেখো এই সব বিদেশী সৈনিকরা নিজেদের ইচ্ছায় একাজে আসেনি, এসেছে তাদের নেতাদের কথায় বাধ্য হয়ে। তোমাদের প্রিয় দেশবাসীকে রক্ষা করার কাজে আমার আদর্শ আমার পথ অনুসরণ করো। (সৈন্যদের সঙ্গে এগমঁত দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই যবনিকা পাত হলো)

গুড উইমেন

হেনরিয়েত্তা আর আর্মিদোরো ওরফে আমেলিয়া আজ কিছুদিন হলো এ বাগানে বেড়াতে আসছে। এখানে সামার ক্লাবের অন্য সদস্যরাও আসে। কিন্তু অন্য সদস্যরা আসার আগেই ওরা চলে আসে, কারণ এই নির্জন অবকাশে ওরা দুজনে পরস্পরের একান্তনিবিড় সান্নিধ্যে পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পায়, ওদের আসক্তি আর আনন্দলিপ্সার উত্তাপটা বেশ কিছুটা শীতল হয়। ওরা আশা করে শীঘ্রই ওরা মিলিত হবে প্রেমসম্পর্কের স্থায়ী বন্ধনে।

হেনরিয়েত্তার মনটা ছিল হাসিখুশিতে ভরা। সে তার বান্ধবী আমেলিয়াকে দূর থেকে দেখতে পেলেই ছুটে যেত তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কিন্তু প্রায় দিন দেখা যেত সামার হাউসের বসার ঘরে আমেলিয়া একমনে বই ও পত্রপত্রিকাগুলো উল্টে পাল্টে দেখছে অথবা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এইটাই তার স্বভাব। এইজন্যই সন্ধ্যার দিকে প্রায় দিন সে এখানে আসে। আসে শুধু পড়ার জন্য। অন্য সবাই যখন গল্পগুজব করে, পাশা খেলে ও তখন কোন দিকে না তাকিয়ে কোন শব্দে বিচলিত না হয়ে একমনে বই পড়ে যায়। কোন যুক্তিপূর্ণ কথা ছাড়া অন্য কথায় যোগ দেয় না।

হেনরিয়েত্তা কিন্তু বেশ কথা বলত। অল্পতেই খুশি হত সে আর যাকে তাকে যখন তখন প্রশংসাও করত। পরে সিনক্লেয়ার নামে তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে।

সেদিন সামার হাউসে হেনরিয়েত্তা ও আমেলিয়া দুজনেই যখন বসেছিল তখন সিনক্লেয়ার এসে হাজির হতেই হেনরিয়েত্তা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, কি খবর?

সিনক্লেয়ার তার ব্যাগটা খুলতে খুলতে বলল, একটু পরেই দেখতে পাবে। একটা খবর তোমাদের দিচ্ছি। তোমাদের দেখবার জন্য কয়েকটা যুবতী মেয়ের ছবি বার করছি। এ বছরের ক্যালেণ্ডারের বারোটা পাতায় ওদের এই ছবিগুলো ছাপা হবে।

হেনরিয়েত্তা হাসিমুখে বলল, তুমি নিশ্চয় আমাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করছ না। আমি ভাবছি কি এমন নূতন ঘটনা ঘটল যার অভিজ্ঞতা মেয়েদের সম্বন্ধে

তোমার ধারণাটা উঁচু করে দিল।

সিনক্লেয়ার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে শুধু হাসল। আমেলিয়া প্রথমে ধীর স্থিরভাবে সিনক্লেয়ারকে দেখে নিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে বলল, আমি ওর মুখ দেখে বুঝতে পারছি ও এমন কিছু দেখাবে যা আমাদের ভাল লাগবে না। পুরুষ মানুষরা সব সময় মেয়েদের এমন একটা কিছু খুঁজে বেড়ায় যা তাদের হাস্যাস্পদ করে তুলবে।

সিনক্লেয়ার বলল, তুমি কথাটাকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ আমেলিয়া, এবং বিদ্রূপ করতে চাইছ। আমি তাহলে দেখাব না ছবিগুলো। আমার প্যাকেট খুলব না।

হেনরিয়েত্তা বলল, না না, দেখাও ছবিগুলো।

সিনক্লেয়ার বলল, ওগুলো দুষ্ট মেয়ের ছবি, হাস্যকর।

হেনরিয়েত্তা বলল, আমরা ওদের শ্রেণীভুক্ত নই। ওদের সমাজ যেমন আমাদের ভাল লাগে না তেমনি ওদের ছবিগুলো না দেখলেও চলবে।

তবু সিনক্লেয়ার দেখাতে চাইল ছবিগুলো আর হেনরিয়েত্তা সঙ্গে সঙ্গে সিনক্লেয়ারের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে তার থেকে ছটা ছবি খুলে টেবিলের উপর রাখল। ছবিগুলো একবার দেখে তাসের মত গুটিয়ে রাখল হেনরিয়েত্তা। নাকে এক টিপ নস্য নিয়ে বলল, চমৎকার! ছবিগুলো জীবন্ত দেখাচ্ছে। এই ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে মাদাম অমুকের যার সঙ্গে আজ সন্ধ্যের সময় দেখা হবে আমাদের। এই ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে আমার বাবার পিসির মত। এই সব ছবির মেয়েগুলো আকারে কুৎসিত হলেও মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের চেনাজানা কোন না কোন মেয়ের থেকে তোলা।

আমেলিয়া কিন্তু কোন আগ্রহ দেখাল না ছবিগুলোর উপর। সে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, এই সাদৃশ্যের কোন মানে হয় না। কোন কুৎসিত বিকৃত মেয়ের সঙ্গে কোন কুৎসিত চেহারার মেয়েরই সাদৃশ্য থাকতে পারে, সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের সাদৃশ্য হয়। এদের সঙ্গে আমাদের কোন মেয়ের কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে না।

সিনক্লেয়ার বলল, কোন কুৎসিত ও বিকৃত চেহারার লোকের ছবি থেকে আমরা যা মজা পেতে পারি তত মজা কিন্তু কোন সুন্দর লোকের ছবি থেকে পেতে পারি না।

আর্মিদোরো এতক্ষণ জানালার ধারে বসে সব কিছু শুনছিল। সে হঠাৎ

বলে উঠল, 'সৌন্দর্য আমাদের মনকে উন্নত করে। কিন্তু অসুন্দর বা কুৎসিত আমাদের মনকে নিচে নামিয়ে আনে।'

কথাটা বলেই সে আলোচনার টেবিলে না এসে পাশের ঘরে চলে গেল। সামার ক্লাবের সদস্যসংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ এখানে আসে। একজনের সঙ্গে একজনের বন্ধুত্ব ও মেলামেশার সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। কার প্রতি কার আগ্রহ বা আসক্তি কতদিন থাকবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে যারা এখানে আসে তারা সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রুচির লোক। তারা পরস্পরের গুণ বা যোগ্যতার মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রত্যেকেই আপন আপন রুচি অনুসারে আমোদ প্রমোদের উপকরণ গ্রহণ করে। তবে এখানে যে সব সাধারণ আলোচনা হয় তা প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সময় লিটন নামে এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির হলো। ব্যবসার ব্যাপারে লিটনকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয় ও নানা লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়, এজন্য লিটনের অভিজ্ঞতা প্রচুর। তবে তাস খেলায় তার ভাল হাত আছে। তার স্ত্রীও একজন সুযোগ্য মহিলা। স্বামীর বিশেষ বিশ্বাসভাজন। তবে সে বাড়িতে একা একা থাকতে পারে না। তাই সময় পেলেই ক্লাবে বা কোন সংগঠনে চলে আসে।

ক্লাবের সদস্যরা পরস্পরের পরিচিত হলেও এখানে তারা পাঠকদের কাছে অপরিচিত আগন্তুক হিসাবেই গণ্য হবে। আমরা তাদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দেব।

লিটন টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে ছবিগুলোর পানে তাকাল। হেনরিয়েত্তা বলল, আমাদের মধ্যে তর্ক বেধেছে। আমার মতে হাস্যকর কোন বিকৃত চেহারার লোকের ছবির মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা ছবির ভেতর আকর্ষণ করে আমাদের।

আমেলিয়া বলল, কারো অনুপস্থিতিতে নিন্দা করতেও খুব ভাল লাগে। সে নিন্দার একটা আকর্ষণ আছে।

হেনরিয়েত্তা বলল, কিন্তু যাই বলো, এই ছবিগুলো কি মনে রেখাপাত করে না?

আমেলিয়া বলল, আর এই জন্যই ত আমি এগুলো ঘৃণা করি। অবাঞ্ছিত বস্তুর দুর্বার আকর্ষণই কি অশুভ শক্তির মত আমাদের জীবনকে বৃহত্তর আনন্দের

ক্ষেত্র বলে টেনে নিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায় না ?

হেনরিয়েত্তা বলল, তোমার মতামত ব্যক্ত করো লিটন।

লিটন বলল, আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করব, বিরোধের অবসান ঘটাব। আমার কথা হলো, মানুষের মধ্যে ভাল মন্দ দুই-ই আছে। শিল্পীরা যেমন সুন্দর দেবদূতের ছবি আঁকবে তেমনি তারা কালো কুৎসিত শয়তানদের ছবিও আঁকবে। সুতরাং তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

আমেলিয়া বলল, আমার কথা হচ্ছে ব্যঙ্গচিত্রের শিল্পীরা নিজেদের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমার আপত্তি সেইখানে।

লিটন বলল, তোমার কথা ঠিক। তবু আমি বলব যে সব শিল্পীরা শুধু সুন্দরের কারবার করে তারাও নিজেদের সীমা অনেক সময় ছাড়িয়ে যায়।

আমেলিয়া বলল, কিন্তু যে সব ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী মহাপুরুষদের ছবি বিকৃত করে আঁকে তাদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।

হেনরিয়েত্তা বলল, এটা আমারও মনের কথা। এই ধরনের শিল্পীরা বড় বড় প্রতিভাবান মানুষদের ছবি বিকৃত করে মানুষের মনে রেখাপাত করতে চায়। এইভাবে মানুষকে আনন্দ দিতে চায়।

সিনক্লেয়ার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার সে বলল, হে মহিলাবৃন্দ, এবার আমার আনা ছবিগুলোর কথা হোক।

লিটন বলল, আমার মতে এখানে এক কুকুরপ্রীতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাও কোন শিল্পসম্মত উপায়ে হয়নি।

আমেলিয়া বলল, এ কথায় আমার কোন আপত্তি নেই। আমি আবার ঐ জন্তুটাকে দেখতে পারি না।

সিনক্লেয়ার বলল, তাহলে বলতে হবে আপনি ব্যঙ্গচিত্রের শত্রু। আর কুকুর জাতিরও মিত্র নন।

আমেলিয়া বলল, কেন কুকুররা ত মানুষদেরই এক ব্যঙ্গাত্মক রূপ।

লিটন বলল, তোমার হয়ত মনে আছে কোন এক নাবিক এক শহর সম্বন্ধে বলেছিল সে শহরে শুধু কুকুর আর আধ পাগলা কতকগুলো বোকা লোক থাকে।

সিনক্লেয়ার বলল, পশুদের প্রতি আমাদের আসক্তি আমাদের স্বাভাবিক স্নেহমমতার আবেগকে কমিয়ে দেয়।

আমেলিয়া বলল, কুকুরদের সামনে আমাদের আবার যুক্তিবোধ বজায়

থাকে না।

সিনক্লেয়ার বলল, একমাত্র মাদাম লিটন ছাড়া এখানে আর কারো কুকুরের প্রতি আসক্তি নেই। উনি ওঁর সুন্দর গ্রেহাউণ্ডটার প্রতি খুব বেশী আসক্ত।

লিটন বলল, এ আসক্তি আমারও আছে। আমি একটা প্রমাণ দিতে পারি জন্তুরা কিভাবে মানুষের মনকে তাদের প্রেমের বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এই বলে লিটন তার স্ত্রীর মত নিয়ে গল্প বলতে শুরু করে দিল।

আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। আমাদের বিয়ের একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ কোন এক জরুরী কাজের জন্য দূর দেশে যেতে হলো আমায়। সেখানে আমাকে বেশ কিছুদিন থাকতে হলো। যাবার সময় আমি আমার গ্রেহাউণ্ড কুকুরটাকে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। কুকুরটা আমার প্রেমিকার বাড়িটা জানত। আমার সঙ্গে সে বহুবার তাদের বাড়ি গিয়েছে। তাই আমার অবর্তমানে সে আমার প্রেমিকার বাড়িতে রয়ে গেল। আমার প্রেমিকাও কুকুরটাকে খুব ভালবাসত। তার সাহচর্যে আনন্দ পেত। আমার কুকুরটার নাম ছিল মেটা। প্রথম প্রথম সে আমার প্রেমিকার কাছে ভালই ছিল। সে জানত আমি শীগগির ফিরে আসব। কিন্তু আমার যখন ফেরার কথা ছিল তখন ফিরতে পারলাম না। অনেক দেরি হতে লাগল। তখন কুকুরটা আমার জন্য ভেবে ভেবে মারা গেল।

এদিকে আমি আর আমার কুকুরটা না থাকায় আমার প্রেমিকার নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। বাড়িতে মন টিকত না তার। এমন সময় একটি যুবক তার বাড়িতে প্রায়ই আসা যাওয়া করত। বাড়িতে ও বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গ দান করত। তবু কিন্তু কুকুরটার কথা ভুলতে পারল না আমার প্রেমিকা।

আমাদের পাড়ায় আমার এক বিচক্ষণ বন্ধু ছিল। তারও একটা গ্রেহাউণ্ড কুকুর ছিল। কুকুরটা দেখতে ছিল আমার কুকুরের মত। সে একদিন কুকুরটা নিয়ে আমার প্রেমিকার বাড়িতে যেতেই আমার প্রেমিকার মনে হলো সেই মরা কুকুরটা যেন আবার ফিরে এসেছে। সে খুশি হয়ে কুকুরটাকে বাড়িতে রেখে দিল। কুকুরটাকে দেখে আমার কথা ও আমার সেই কুকুরটার কথা তার মনে হল। তার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল।

আমি ফিরে এসে দেখলাম আমার কুকুরটাই যেন আমার প্রেমিকার বাড়িতে

রয়েছে। কিন্তু সে আমাকে আসতে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। তা দেখে বললাম প্রাচীনকালের সেই বিশ্বস্ততা আমাদের কুকুরটা ভুলে গেছে। বিশ বছর পরেও ইউলিসেসকে দেখে চিনতে পেরেছিল তার কুকুর। আমার প্রেমিকা তখন বলল, তবে ওই কুকুরই তোমার পেনিলোপের সতীত্ব রক্ষা করেছে।

কথাটার মানে পরে আমাকে বুঝিয়ে বললে আমি সব বুঝতে পারলাম। আমার প্রেমিকার বিশ্বস্ততায় আমি খুশি হলাম। আমাদের প্রেম সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়ে উঠল।

এমন সময় মাদাম লিটন তার স্বামীকে বলল, তুমি ত এখন নিশ্চয় তাস খেলবে। আমি ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়িয়ে আসি।

লিটন তার স্ত্রীর হাত ধরে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে বলল, কুকুরটাকেও নিয়ে যাও প্রিয়তমা।

তখন উপস্থিত সকলে এ গল্পের তাৎপর্য বুঝতে পেরে হাসতে লাগল। সিন-ক্লেয়ার বলল, তুমি এমন একটি কাহিনী বললে যা তোমাদের বিবাহে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমি একটি কাহিনী জানি যাতে দেখবে কুকুরের প্রভাব একটি প্রেমসম্পর্ককে নষ্ট করে বিবাহের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। গল্পটা বলি।

আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। আমার ভাগ্যেও এমনি বাইরে যাবার ঘটনা ঘটে। আমিও যাবার সময় একটি কুকুর রেখে যাই আমার প্রেমাস্পদের কাছে। তবে আমাদের বিয়ের কথাটা পাকা হয়নি। আমি যথাসময়ে ফিরে এসে আমার প্রেমাস্পদের কাছে যাই। আমার ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তাকে শোনাতে ইচ্ছা হয় আমার। আমি বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে তাকে সব কথা বলি। আমার ধারণা ছিল এ সব শুনে সে খুশি হবে। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে দেখলাম, আমার প্রেমিকা শুধু কুকুর নিয়েই ব্যস্ত। আমি তখনকার মত চলে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। এবারেও দেখলাম তার সমস্ত মন জুড়ে আছে তার কুকুরের প্রতি এক অস্বাভাবিক প্রীতি আর মমতা। এমত অবস্থায় আমাদের প্রেমসম্পর্কের সমস্ত উত্তাপ ক্রমশঃ শীতল হয়ে এল। আমি একদিন সে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলাম এবং বুঝলাম এর একমাত্র কারণ হলো একটা কুকুর।

আর্মিদোরো পাশের ঘর থেকে এসে আলোচনায় আবার যোগদান করল। সে বলল, মানুষের উপর ইতর প্রাণীর প্রভাব নিয়ে যত গল্প আছে সেগুলো এক

জায়গায় সংকলন করা উচিত। আমি একটি গল্প বলব যাতে দেখা যাবে একটি প্রাণী কিভাবে এক মর্মান্তিক ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ফার্দিনান্দ আর কাদার্নো ছিল সামন্ত পরিবারের তুটি যুবক। ছোট থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। রাজসভার লোক থেকে সামরিক অফিসার হয় তারা তুজনেই। একসঙ্গে তুজনে নানাধরনের প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। কার্দানোর কাছে একমাত্র আকর্ষণের বস্তু ছিল সুন্দরী মেয়ে। ফার্দিনান্দ ভালবাসত খেলাধূলা। কার্দানো ছিল উদ্ধত ও দাম্ভিক প্রকৃতির। অন্য বন্ধুটি ছিল সন্দেহপ্রবণ এবং স্বল্পভাষী।

কার্দানোর স্বভাবটা ছিল বড় অদ্ভুত। সে একের পর এক করে এক একটি মেয়েকে ভালবাসত আর কিছুদিন পর তাদের ছেড়ে দিত। আর প্রতিবারই একটি মেয়েকে ছেড়ে যাবার সময় একটি কুকুরকে রেখে যেত তার কাছে।

ক্রমে ফার্দিনান্দ কার্দানোর এই স্বভাবের কথা জানতে পারে। কিন্তু সেদিকে তার কোন আগ্রহ ছিল না। সে নিজে যথাসময়ে বিয়ে-থা করে ঘর সংসারে মন দেয়। এমন সময় কার্দানো একবার তার বাড়িতে ও তাদের পাড়ায় এসে কিছুদিন থাকে।

কার্দানো তার বাড়ি থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর কাছে একটি মনোরম কুকুর দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় ফার্দিনান্দ। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহ সহকারে তার স্ত্রীর কাছে জানতে চায় এ কুকুর কোথায় সে পেল। তার স্ত্রী তখন বলে, কার্দানো যাবার সময় এটা তাকে দিয়ে গেছে।

মুহূর্তমধ্যে মাথাটা ঘুরে যায় ফার্দিনান্দের। কুকুরটা কোল থেকে সজোরে ফেলে দেয় মাটিতে। রাগে গর্জন করতে করতে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কাদার্নোর নোংরা স্বভাবের কথাটা মনে পড়ে যায় তার আর সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ জাগে স্ত্রীর চরিত্রের উপর। তার মনে হয় নিশ্চয় কার্দানো গোপনে আসক্ত ছিল তার স্ত্রীর প্রতি। তার স্ত্রীকে ভালবাসত সে এবং অন্যক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও সে তার ব্যর্থ প্রেমের প্রতীকস্বরূপ রেখে গেছে এই কুকুরটা।

কারো কোন আবেদন নিবেদনে কাজ হলো না। প্রকাশ্যে বিবাহবিচ্ছেদ না করলেও দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেল ফার্দিনান্দ।

আর্মিদোরোর গল্প শেষ না হতেই ঘরে ঢুকল ইউলেনিয়া। সে একজন গুণবতী মহিলা এবং নামকরা লেখিকা। তার সঙ্গ সবাই চায়। সে ঘরে ঢুকতেই ছবিগুলো তাকে দেখিয়ে তার মতামত চাওয়া হলো।

আমেলিয়া বলল, এই ছবিগুলো ক্যালেণ্ডারে ছাপার জন্য ঠিক হয়েছে। তবে কোন লেখক এর অর্থ কেউ বলতে পারবে না।

সিনক্লেয়ারও তাই মনে করে। ছবিগুলো একেবারে নিন্দার যোগ্য নয়। প্রত্যেকটা ছবির একটা করে মানে আছে। কিন্তু সেগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তা না হলে শিল্পীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

আমেলিয়া বলল, প্রথমেই একটি ছবির কথা ধরো। এতে আছে এক যুবতী কোন কিছু লিখতে লিখতে তার আর্মচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর একটি নারী তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে একটি ছোট্ট বাক্স তার সঙ্গীর হাতে তুলে দিচ্ছে। এর অর্থ কি?

সিনক্লেয়ার বলল, আমি এর অর্থ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে দেখব কি? আমার মনে হয়, যে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছে সে একজন লেখিকা আর তার পাশে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সে তার মহিলাভৃত্য, তার হাতে আছে একটা দোয়াত যাতে লেখিকা ঘুম থেকে উঠেই আবার তার লেখা শুরু করতে পারে।

কিন্তু ক্লাবের অন্যতম সদস্য প্রতিভাবান শিল্পী আর্বন এ অর্থ মেনে নিতে পারল না। সে বলল, প্রত্যেক লেখক বা লেখিকার দোয়াত রাখার জায়গা থাকে। কিন্তু এখানে একজন ভৃত্যের হাতে দোয়াত রাখার প্রয়োজন কি। তাছাড়া যখন তার কোন প্রয়োজনই নেই, যখন লেখিকা লেখার কাজ করছে না তখন তার দোয়াত ধরে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি এবং তার চোখের জল মোছারই বা অর্থ কি হতে পারে?

হেনরিয়েত্তাও একথা সমর্থন করল। সিনক্লেয়ার বলল, আমি শিল্পীর সমর্থনে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে শিল্পী ইচ্ছা করেই একটা হেঁয়ালি রেখেছে যাতে দর্শকরা ও সমঝদারেরা কিছু একটা কল্পনা করতে পারে।

আর্বন বলল, আমার মতে যাদের ছবি আঁকা হয়েছে সেই সব মূর্তির মুখে অল্প করে কথা লিখে দিতে বল। তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যেত।

সিনক্লেয়ার বলল, এমন ছবি বুদ্ধিমানদের জন্য। যে সে এমন ছবির অর্থ বুঝতে পারবে না। একমাত্র বুদ্ধিমানরাই এর থেকে বুদ্ধিগত আনন্দ লাভ করতে পারে।

আর্মিদোরো বলল, ঐ অশ্লীল ছবিগুলো নিয়ে এখনো আলোচনা চলছে? ওগুলো ভাল ছবি হলে এতক্ষণে সরিয়ে রাখা হত।

আমেলিয়া বলল এই ছবিগুলো ক্যালেণ্ডারে ছাপা হলেও একবার দেখার

সঙ্গে সঙ্গেই এ ক্যালেণ্ডার কেউ কারো হাতে তুলে দিতে উপহার হিসাবে দিতে পারবে না। কোন লোক ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে নিয়ে যাবে না।

আর্মিদোরো বলল, আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের যে লেখিকা রয়েছে সেই ইউমেলিয়া এর ব্যাখ্যা করে এই ছবিগুলোর ভাল দিকটাকে দেখাবে।

সিনক্লেয়ারও এ প্রস্তাব সমর্থন করল। বলল, ওঁর ফেয়ারী টেল গল্পটা আমরা গতকাল বিশেষভাবে উপভোগ করেছি।

ইউমেলিয়া বলল, গল্পটা আমার নয়। আমার এক বান্ধবীর।

আর্মিদোরো বলল, এ গল্পের উৎসের কথা জানলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনারা।

ইউমেলিয়া সে কাহিনী শুরু করল।

আমি একবার এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হই। তার কতকগুলি সদ্‌গুণ ছিল। সে একবার দারুণ বিপদে পড়ে। মেয়েটি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েকটি কারণে বাধ্যবাধকতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লোকটি অবশ্য মেয়েটিকে বিয়ে করবে বলে কথা দেয়। কিন্তু বিয়ের আগেই মেয়েটির মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে দেহসংসর্গে লিপ্ত হয় ভদ্রলোক। এমন সময় অবস্থার তাড়নায় ভদ্রলোককে ফ্রান্স যেতে হয়। অথচ মেয়েটি তখন তার গ্রামের বাড়িতে সব সময় এই ভয় করছিল যে বুঝিবা সে মা হতে চলেছে। মেয়েটি তার সব কথা চিঠির মাধ্যমে আমাকে জানাত। আমি তাকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিতাম। আমি তাকে প্রায়ই এই কথা বলতাম যে যদি তার সন্তান হয় তাহলে বিচলিত হলে চলবে না। তাকে তার মার কর্তব্য পালন করে যেতেই হবে। আমি তাকে কতকগুলি রূপকথার গল্প সাজিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে সে এইগুলি পড়ে সময় কাটাতে পারত। বর্তমান জীবনের দুর্বিসহ অবস্থায় ও নানারকমের দুশ্চিন্তায় মনটা যখন তার হাঁপিয়ে উঠেছিল তখন আমার পাঠানো রূপকথাগুলি পেয়ে সে খুশি হলো। সে এক কল্পনার জগৎ খুঁজে পেল। সে তখন তার অতীত জীবনের যত সব সুখ দুঃখের কথা লেখার চেষ্টা করতে লাগল।

আমেলিয়া তখন বলল, আর লিখতে গিয়ে সে হয়ত দোয়াতটাকে কাছে রাখতে ভুলে গিয়েছিল।

ইউমেলিয়া বলল, মেয়েটির সব চিঠিগুলি আমার কাছে আছে। এই সব

চিঠিতে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাগুলি যেমন তার প্রেম, মা হবার ভয়, তার সন্তানপ্রসব, তার স্বামীর ফিরে আসা এবং তার বিয়ে কল্পনাসমৃদ্ধ করে লেখা হয়েছে। তার বিয়ের দিনে শেষ হয় তার কাহিনী যে কাহিনী আপনারা গতকাল শুনেছেন।

লিটন বলল, আগেকার কালে ডায়েরী রাখার প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন এটা সেকেলে ব্যাপার হয়ে গেছে। আমি জানি এক শিক্ষয়িত্রী ডায়েরী রাখতেন। রোজকার ঘটনা যথাযথভাবে ডায়েরীতে লেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোন কথা সে গোপন রাখত না। সব ডায়েরীতে লিখত আর মাঝে মাঝে তা পড়ে সবাইকে শোনাত। কিন্তু ডায়েরীটা হাতছাড়া করত না কখনো। কাউকে দিত না। একদিন ডায়েরীটা তার স্বামীর হাতে পড়ে এবং সে কৌতূহলবশতঃ তা পড়তে পড়তে এমন কতকগুলি কথার সম্মুখীন হয় যাতে তার ডায়েরী পড়ার সব আনন্দ চিরদিনের মত চলে যায়।

হেনরিয়েত্তা বলল, আমাদের আলোচনা কিন্তু সৎ মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। অবাঞ্ছিত মেয়েদের কোন কথা আমরা বলতে বা শুনতে চাই না।

লিটন বলল, কেন, ভাল মন্দ সব রকম মেয়ের কথাই ধরা উচিত।

সিনক্লেয়ার বলল, তাহলে ত ক্যালেণ্ডারের এই ছবিগুলি ঠিকই নির্বাচিত হয়েছে। এতে ভাল মন্দ সব রকম মেয়ের ছবিই আছে।

আমেলিয়া বলল, এই ক্যালেণ্ডারের শিল্পী যেমন বাজে মেয়েদের ছবি দিয়ে আমাদের নারীজাতির অপমান করেছে তেমনি আমি চাই এমন কতকগুলি মেয়ের ছবি ও ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে যারা সংসারের মুকুটমণি, যে সব নারীদের সদগুণাবলী সংসারকে সুন্দর করে তোলে।

লিটন বলল, তাহলে বলি শোন। একবার একটি যুবক একটি হোটেল লীজ নিয়ে চালাতে শুরু করে। সে সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। তবে তার মদ খাওয়ার অভ্যাস থাকায় রোজ একবার করে মদের দোকানে যেত। কিন্তু নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মে কোন অবহেলা করত না। সে যথাসময়ে বিয়ে করে। তার স্ত্রী ছিল খুব বুদ্ধিমতী আর হিসেবী। যুবকটি কিন্তু ব্যবসা-গত লেনদেন বা টাকাপয়সার কোন হিসেব রাখত না। তার উপর কিছু বাজে খরচ এবং দানও করত। হোটেলের বাসিন্দারা যখন কোন মোটা টাকা দিত যুবকটিকে সে তখন সে টাকা জমা করে ব্যাঙ্কে রাখার ব্যবস্থা করত না, তার

থেকেই খরচ করতে শুরু করে দিত। খরচ করতে করতে টাকাটা ফুরিয়ে যেত। এইভাবে সে সমস্ত আয় খরচ করে ফেলত। একটা পয়সাও সঞ্চয় করতে পারে নি কারবার থেকে। তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী এই সব ভালভাবে দিনের পর দিন লক্ষ্য করে একটা মতলব আঁটল। সে তার স্বামীর টাকা থেকে রোজ কিছু করে গোপনে সরিয়ে রাখতে লাগল। তার স্বামী কিছুই টের পেল না। এইভাবে সে অনেক টাকা জমাল। প্রথমে অল্প অল্প করে পরে বেশী করে সরাতে লাগল। একদিন তার স্বামী টাকার টানাটানিতে পড়ল। তার স্ত্রীর কাছে এসে যুবকটি বলল, বাড়িওয়ালার ভাড়া দিতে হবে, অথচ টাকা নাই ক্যাশে। কি করে কি হলো, কি করে সব টাকা ফুরিয়ে গেল তা বুঝতে পারছিল না। কোন হিসেব না রাখার জন্য তার স্ত্রী তাকে অনেক তিরস্কার করল। লোকটি তার ভুল স্বীকার করল। তারপর স্ত্রী ঘর থেকে অনেক টাকা বার করে আনল। সে যত টাকা এতদিন ধরে সরিয়েছে তা সব হিসেব করে গুছিয়ে রেখেছে। সে টাকায় সব ঋণ শোধ করেও অনেক বেঁচে রইল। এর পর থেকে যুবকটি টাকা পয়সার সব ভার তার স্ত্রীর উপর ছেড়ে দিল। তার স্ত্রীও তার হিসেবী বুদ্ধির দ্বারা সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়ে সেই টাকায় গোটা হোটেলটা বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিল। সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের সংসার। মেয়েটির নাম ছিল মার্গারেট।

সিনক্লেয়ার বলল, এখন দেখছি মেয়েটির সমস্ত প্রেম, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার উদ্দেশ্য হলো সংসারের সব কর্তৃত্বভার অর্জন করা। নারীদের প্রভুত্বস্পৃহা সম্বন্ধে তোমাদের মতামত আমি জানতে চাই।

আর্মিদোরো বলল, ইউমেলিয়া, তুমি লেখিকা হিসাবে নিজের জাত সম্পর্কে নিরপেক্ষ। তোমার লেখায় নারীজাতিকে বড় করার বা তাদের দোষ ঢাকার কোন প্রচেষ্টা নেই।

ইউমেলিয়া বলল, দেখুন আপনারা যাকে প্রভুত্ব বলছেন তা এক স্বাধীনতা কামনা বা স্বাতন্ত্র্যবোধ ছাড়া কিছুই নয়। নিজের প্রভুত্ব সবাই উপভোগ করতে চায়। সব মানুষই তাই চায়। নারীরাও মানুষ। কিন্তু সমাজে পুরুষের স্বাধীনতা ও প্রভুত্ব বেশী বলে নারীদের কোথাও কোন প্রভুত্ব দেখলে সেটা বেশী চোখে পড়ে। তাই নারীরা একবার অতি কষ্টে কোন রকমে প্রভুত্ব পেয়ে গেলে জোর কামড় দিয়ে ধরে থাকে, ছাড়তে চায় না।

লিটন বলল, যে সব মেয়েরা কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সঞ্চয়ী তারা ঘরে প্রভুত্ব

অর্জন করে। সংসারের সব কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে আসে। আর যারা সুন্দরী তাদের প্রভুত্বের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় সারা সমাজের সর্বত্র। তাদের সব জায়গায় জয়। আবার যারা কোন না কোন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছে তারাও সমাজের এক বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রভুত্ব লাভ করে।

আমেলিয়া বলল, তাহলে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

সিনক্লেয়ার বলল, কিন্তু সব নারী এই তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এর বাইরেও এক শ্রেণীর নারী আছে। তাদের কথা ধরলে নারীজাতির প্রতি আমাদের সব প্রশংসা নিন্দায় পরিণত হবে।

সিনক্লেয়ার বলল, প্রথম তিন শ্রেণীর নারীরা সংসারে ও সমাজে বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে।

হেনরিয়েত্তা বলল, আজ যে কোন দিকে আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে?

সিনক্লেয়ার বলল, হতে পারে অনেক দিকে। আমি বলছি এক শ্রেণীর মেয়েদের কথা যারা কোন কাজই করে না। যারা কুঁড়ে অকর্মণ্য। তারা কোন কাজ না করেও শুধু অন্যদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে এক ধরনের প্রভুত্ব অর্জন করে।

হেনরিয়েত্তা বলল, কিন্তু তোমার চতুর্থ শ্রেণীর নারীর খবর কি? তার কথা বল।

সিনক্লেয়ার বলল, আমাদের দেশের কথা বলছি না। কিন্তু এখনো এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার নারীরা স্বাধীনতা পায়নি। তারা সব সময় বিষাদে আচ্ছন্ন থাকে। অবশ্য আমাদের প্রতিবেশী কোন কোন দেশেও এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের অকারণে মুখটা সব সময় ভার-ভার থাকে। তারা কাউকে শান্তি দিতে পারে না। নিজেরাও শান্তি পায় না। এই বিষাদ একটা রোগ, এই রোগ কিছুটা শারীরিক, কিছুটা মানসিক। আমি এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

সিনক্লেয়ার বলল, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। আমি ভেবেছিলাম এই ক্লাবে বিভিন্ন রকমের লোক আসে। তাদের কেউ না কেউ আমার ছবি-গুলোর অর্থ ঠিকমত ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু এর আগে মেয়েদের এই সব ছবিগুলোকে সবাই শুধু অহেতুক গালাগালি দিল। কেউ বোঝার চেষ্টা করল না। স্নুতরাং আমি বিদায় নিচ্ছি।

আর্মিদোরো সিনক্লেয়ারকে লক্ষ্য করে বলল, তোমার ইচ্ছাই পূরণ হলো। আজকে যা যা আলোচনা হয়েছে আমি তার সব নোট নিয়ে রেখেছি। পরে সেগুলো সম্পাদনা করলে দেখা যাবে শিল্পী মেয়েদের অকারণে আক্রমণ করেননি। মেয়েদের ব্যঙ্গ করে যে ছবিগুলি এঁকেছেন তার একটা করে অর্থ আছে। সবাই ভাল মেয়ে নয়।

হেনরিয়েত্তা প্রতিবাদের সুরে বলল, এটা কিন্তু ঠিক কাজ করনি আর্মিদোরো। আমরা সহজভাবে খোলা মন নিয়ে মেলামেশা করি। কিন্তু অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলা আমাদের কথাগুলো যদি লিখে রাখ এবং পরে সেগুলোকে ছেপে আর পাঁচজনকে মজা দান করো তাহলে সেটা কিন্তু ভাল হয় না

এ ফেয়ারী টেল

সারা দিনের কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে নদীর ধারে তার কুঁড়েঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল ফেরীঘাটের বৃদ্ধ মাঝি। নদীটা বড়। তার উপর সম্প্রতি প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। মাঝরাতে হঠাৎ এক প্রবল চিৎকারে ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠল মাঝি। বুঝল জনকতক পথিক নদী পার হওয়ার জন্য তাকে ডাকছে।

কুঁড়ের দরজা খুলেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠল মাঝি। অবাক হয়ে দেখল ঘাটের কাছে বাঁধা তার নৌকোর পাশে দুজন পরী নাচছে। বড় সুন্দর সে নাচ। পরী দুটি ছিল পথিকদের সঙ্গে। তারা মানুষের মত গলায় মাঝিকে বলল, যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাদের পার করে দিতে হবে।

মাঝিও দেরি না করে নৌকো ছেড়ে দিল। পথিকরা দুর্বোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছিল আর হাসছিল। মাঝে মাঝে নাচানাচি করছিল আর তাতে নৌকোটা দুলছিল। মাঝি বলল, এতে নৌকো উল্টে যেতে পারে। কিন্তু এ কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিয়ে আরো বেশী করে দাপাদাপি শুরু করে দিল।

যাই হোক, অবশেষে নৌকো নদীর ওপারে গিয়ে ভিড়ল। পথিকরা তখন কতকগুলো সোনার টাকা নৌকোর পাটাতনে ফেলে দিয়ে বলল, এই নাও তোমার পারিশ্রমিক।

মাঝি বলল, তোমাদের সোনার টাকা ফিরিয়ে নাও। এতে তোমাদেরও বিপদ ঘটতে পারে, আমারও বিপদ হতে পারে। একটুকরো সোনা যদি কোন রকমে নদীর জলে পড়ে যায় তাহলে নদী আমাকে ও আমার নৌকোটাকে গ্রাস করে ফেলবে।

পথিকরা বলল, আমরা যা একবার দিই তা ফিরিয়ে নিই না।

মাঝি তখন সোনার টাকাগুলো কুড়িয়ে তার টুপীর মধ্যে ভরে নিয়ে বলল, এগুলো তাহলে আমি নদীর ধারে মাটিতে পুঁতে ফেলব।

এমন সময় পরী দুজন নৌকো থেকে নেমে চলে যাচ্ছিল। মাঝি বলল, তোমরা আমার পারের কড়ি দিয়ে যাও।

পরীরা বলল, যে লোক সোনা নেয় না সে লোকের কোন মজুরী পাওয়া উচিত নয়।

মাঝি বলল, পৃথিবীর মাটিতে জন্মানো ফল ছাড়া আমি কিছু নিই না। আমাকে তিন রকমের ফল দিতে হবে আমার পারের কড়ির বদলে।

পরীরা বলল, পরে দেব। এই বলে তারা চলে গেল। মাঝিও নৌকো ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিল, কিন্তু নদী পার না হয়ে সেই দিকের তীর ঘেঁষে নিচে নেমে যেতে লাগল। কিছুদূর যাওয়ার পর নদীর ধারে একটা পাহাড় দেখতে পেল। আরো দেখল পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড খাদ। মাঝি সেই খাদের ভিতর সোনার টাকাগুলো সব ছুঁড়ে দিল। তারপর নৌকো ঘুরিয়ে সে চলে গেল।

সেই খাদের ভিতর এক মায়াবী রাক্ষসী থাকত। সোনার প্রতি তার খুব লোভ ছিল। সে সোনার টাকাগুলো একে একে সব গিলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার গা দিয়ে এক জ্যোতি বার হতে লাগল। কোথা থেকে এই সোনা এল তা জানার জন্য গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল রাক্ষসী। যে দিকে যে পথে সে যেতে লাগল তার গা থেকে বার হওয়া আলোর ছটায় আলোকিত হয়ে উঠল রাত্রির সে অন্ধকার পথ। সে আলোর ছটায় গাছের পাতাগুলো পান্নার মত সবুজ ও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। রাক্ষসী যদিও পাহাড় আর শুকনো প্রান্তর ভালবাসে, তথাপি সে জলাশয়ের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত যেতে লাগল। অবশেষে সে সেই পরী দুজনের দেখা পেল। সুন্দর পরীদের দেখে তাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা হলো।

রাক্ষসী পরীদের জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে সোনার টাকাগুলো এসেছে তার সন্ধান তারা দিতে পারে কি না। সে বলল, আমি যখন আমার পাহাড়ের খাদের ভিতর বসেছিলাম তখন মনে হলো স্বর্গ থেকে একরাশ সোনার টাকা ঝরে পড়ল আমার মুখে।

পরীরা বলল, এই কথা? আচ্ছা এই নাও। এই বলে তারা যতই গা নাড়া দিতে লাগল ততই সোনার টাকা ঝরে পড়তে লাগল। সে টাকা সংখ্যায় এত বেশী যে রাক্ষসী তা খেয়ে শেষ করতে পারছিল না। সেই সব সোনার টাকা খেয়ে আরও বেড়ে গেল রাক্ষসীর দেহগাত্রের উজ্জ্বলতা। এদিকে পরীদের সেই হতে আলোর ছটা কিছুটা ম্লান হয়ে গেল। যাই হোক, রাক্ষসী বলল, তোমরা আমাকে অনেক দিয়েছ, কি বর চাও বল।

পরীরা বলল, সুন্দরী পদ্ম কোথায় থাকে বলতে পার? তুমি আমাদের তার প্রাসাদে এখনি নিয়ে চল।

এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাক্ষসী বলল, এ বর ত এত তাড়াতাড়ি দান করতে পারব না। পদ্ম থাকে নদীর ওপারে। এই দুর্যোগঘন রাত্রিতে নদী পার হওয়া সম্ভব নয়।

পরীরা বলল, দুষ্টু নদীটা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ও আমাদের মাঝে এক ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মাঝিকে ডাক।

রাক্ষসী বলল, মাঝি এপারের লোককে নিয়ে যাবে ওপারে। কিন্তু ওপারের লোককে যাকে একবার পার করেছে তাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। তবে আগামী কাল দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে আমি নিজেই তোমাদের পার করে দেব।

পরীরা বলল, কিন্তু দিন দুপুরে ত আমরা পার হই না, বা কোথাও যাওয়া আসা করি না।

রাক্ষসী বলল, তাহলে কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তাহলে তোমরা এক দৈত্যের ছায়ার উপর ভর করে নদী পার হতে পারবে।

পরীরা বলল, তা কি করে সম্ভব?

রাক্ষসী বলল, নিকটেই এক রাক্ষস বাস করে। তার দেহটা এমনই দুর্বল ও অশক্ত যে সে তার হাত দিয়ে একটা তৃণখণ্ডও তুলতে পারে না। তার ছায়াই সব কাজ করে। তাই সে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সময় সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সন্ধ্যের সময় দৈত্য নদীর ধারে এলে তার ছায়ার উপর তোমরা চেপে বসলেই সে তোমাদের পার করে দেবে।

তখন পরীরা ও রাক্ষসী আপন আপন জায়গায় চলে গেল। রাক্ষসী তার পাহাড়ের খাদের ভিতর গিয়ে এক সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে আরও গভীরে যেতে লাগল। অন্ধকারে তার গায়ের আলোকছটায় পথ চিনে চিনে সম্প্রতি সে এই সুড়ঙ্গটাকে আবিষ্কার করেছে। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গুড়ি মেরে গিয়ে একটা অদ্ভুত জায়গায় পৌছল রাক্ষসী। দেখল মার্বেল পাথরের এক বিরাট মন্দির চত্বরের ওপর এক বিশাল সোনার মূর্তি। দেখল কোন এক রাজার প্রতিমূর্তি। দেহটা বিশাল হলেও মাথাটা ছোট।

রাক্ষসীকে দেখে প্রতিমূর্তিটি জীবন্ত মানুষের মত কথা বলতে লাগল। রাক্ষসীকে বলল, সোনার থেকে দামী কি?

রাক্ষসী উত্তর করল, আলো।

রাজা জিজ্ঞাসা করল, আলোর থেকে স্বচ্ছ কি?

রাক্ষসী বলল, কথা।

কথা বলতে বলতে রাক্ষসীর আর এক জায়গায় চোখ পড়তে দেখল রূপোর এক প্রতিমূর্তি। এটিও কোন এক রাজার। তার মুকুট ও রাজদণ্ড মূল্যবান ধাতু দিয়ে সজ্জিত। মূর্তিটির পিছনের দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে আলো আসছিল। তাতে রাক্ষসী আর একটি পিতলের তৈরি প্রতিমূর্তি দেখতে পেল। কিছু পরে আর একটি মূর্তি দেখতে পেল।

রাক্ষসীর কি মনে হলো সে চতুর্থ প্রতিমূর্তিটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এমন সময় একটি বাতি হাতে বৃদ্ধ কৃষক কোথা থেকে সেখানে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে সোনার রাজমূর্তিটি বলে উঠল, এখানে আমাদের আলো আছে। তুমি আবার আলো নিয়ে এলে কেন?

বৃদ্ধ বলল, তুমি ত জান আমি কোন অন্ধকারকে আলোকিত করতে পারি না।

রূপোর রাজমূর্তিটি বলল, আমার রাজ্য কখন ধ্বংস হবে?

বৃদ্ধ লোকটি বলল, অনেক দেরি আছে।

পিতলের রাজমূর্তি বলল, আমার কখন উত্থান ঘটবে?

বৃদ্ধ বলল, খুব শীঘ্রই।

রূপোর রাজা বলল, আমি কার সঙ্গে মিলিত হব?

বৃদ্ধ বলল, তোমার বড় ভাইএর সঙ্গে।

রূপোর রাজা বলল, ছোট ভাইএর কি হবে?

বৃদ্ধ বলল, তার মৃত্যু ঘটবে।

চতুর্থ রাজমূর্তিটি বলল, আমি কিন্তু এখনো ক্লান্ত হয়ে উঠিনি।

ইতিমধ্যে রাক্ষসী গোটা মন্দিরটা ঘুরে চতুর্থ রাজার কাছে গিয়ে দেখল তার সুন্দর মুখে বিষাদ জমে রয়েছে। মূর্তিটি কি ধাতুতে তৈরি তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে মনে হলো সোনা, রূপো আর পিতল অর্থাৎ যে তিনটি ধাতু দিয়ে তার তিন ভাইএর মূর্তিগুলি গঠিত সেই তিন ধাতুর মিশ্রণে ও সমন্বয়ে তার প্রতিমূর্তিটি গড়া। তবে গঠনকার্যে কিছু ত্রুটি থাকায় ধাতুগুলি ঠিকমত মিশ্রিত হয়নি।

সোনার রাজা বৃদ্ধকে বলল, তুমি কতগুলি ধাঁধা বা রহস্য জান?

বৃদ্ধ বলল, তিনটি।

রাজা বলল, কোনটা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ?

বৃদ্ধ বলল, যেটি আগেই প্রকাশিত হয়েছে।

পিতলের রাজা তখন বলল, তুমি ওটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবে ?

বৃদ্ধ উত্তর করল, চতুর্থ ধাঁধাটি না জানা পর্যন্ত পারব না।

চতুর্থ রাজা বলল, আমি গ্রাহ্য করি না তোমাদের।

রাক্ষসী বলল, আমি চতুর্থ ধাঁধাটি জানি। রাক্ষসী বৃদ্ধের কাছে গিয়ে তার কানে কানে কথাটা বলল।

বৃদ্ধ হঠাৎ চিৎকার করে গম্ভীর গলায় বলল, সময় হয়ে গেছে।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কথাটার তীব্র প্রতিধ্বনি চারদিকে শোনা যেতে লাগল। প্রতিমূর্তিগুলো কাঁপতে লাগল। তখন বৃদ্ধ লোকটি পশ্চিম দিকে ও রাক্ষসী পূর্বদিকে চলে গেল।

বৃদ্ধ বাতি হাতে যেদিকেই যেতে লাগল সেদিকটার সব পাথর সোনা, সব গাছ রূপো আর সব জীবজন্তু মূল্যবান ধাতুতে পরিণত হয়ে উঠল। কিন্তু তার বাতির আলো অন্য কোন আলোর কাছে কাজ করে না। শুধু এক নরম আলো বিকীরণ করে। বৃদ্ধ তার কুঁড়ে ঘরে ফিরে দেখল তার স্ত্রী কাঁদছে বসে বসে। তার স্ত্রী বলল, তোমাকে আজ বাইরে যেতে দিয়ে কি ভুলই না করেছি।

বৃদ্ধ বলল, কি হয়েছে ? বুড়ী বলল, দুজন পরী এসে আমাদের দেওয়ালে যে সব সোনা ছিল তা সব তুলে নিয়েছে। পরে তারা গা ঝাড়া দিতে কিছু সোনার টুকরো তাদের গা থেকে ঝরে পড়ে আর তাই থেকে একটা টুকরো আমাদের প্রিয় কুকুর খেয়ে ফেলতেই সে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এতে আমার মনে দারুণ দুঃখ হয়। এমন জানলে আমি তাদের হয়ে ঘাটের মাঝিকে তাদের ঋণ শোধের দায়িত্ব নিতাম না।

বৃদ্ধ বলল, ঋণটা কি ?

বুড়ী বলল, তিনটে পিঁয়াজ আর তিনটে করে দু রকমের ফল।

বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার কথামত তাদের কাজ দেবে। ওরা সাধ্যমত আমাদের উপকার ঠিক করবে।

বুড়ী বলল, আমি কাল সকালেই নদীর ধারে মাঝিকে তা দিয়ে দেব।

বৃদ্ধের ঘরের ভিতর এতক্ষণ যে আগুন জলছিল তা নিবিয়ে যেতে বৃদ্ধ তার

বাতিটা আবার জ্বালল। সেই রহস্যময় বাতির আলোয় চারদিকের পাথরের দেওয়ালগুলো সব সোনা হয়ে গেল। আর তাদের মরা কুকুর হয়ে উঠল অতি মূল্যবান এক উজ্জ্বল ধাতু। বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বলল, একটি ঝুড়িতে এই মূল্যবান পাথরটি আর ফুলগুলি সাজিয়ে তুমি পদ্মের কাছে চলে যাও। রাক্ষসীর পিঠে চেপে নদীর ওপারে গিয়ে তুমি চলে যাবে সুন্দরী পদ্মের প্রাসাদে। যে পাথরটিকে একবার ছুঁলেই আমাদের কুকুর আবার প্রাণ ফিরে পাবে। পদ্মকে বলবে, তার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তার সব বিপদ সব দুঃখ সুখে পরিণত হবে।

বুড়ী তার ঝুড়িতে সব কিছু সাজিয়ে সকাল হতেই বার হয়ে পড়ল তার কুঁড়ে থেকে। এ ঝুড়িতে মরা কোন জীবজন্তু একেবারে হালকা হয়ে যায়। কিন্তু কোন টাটকা শাকসব্জী ভীষণ ভারী হয়ে ওঠে। বুড়ীর তাই ঝুড়ি মাথায় পথ হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। নদীর কাছাকাছি যেতেই বুড়ী দেখল, সেই দৈত্যটা নদীর জল থেকে উঠে আসছে। সে বুড়ীর কাছে এসে তার ঝুড়ি থেকে একটা করে ফুল খেয়ে ফেলল।

বুড়ী একান্তে ভাবল তার বাগানে গিয়ে ফুলগুলো আবার নিয়ে আসবে। কিন্তু ভাবতে ভাবতে অনেকটা সময় কেটে গেল। এদিকে ফেরীঘাটের মাঝিও এসে গেল। মাঝির নৌকোতে এক পথিক ছিল। মাঝিকে দেখে বুড়ী বলল, সেই পরীদের ঋণ মেটাতে এসেছি। এই নাও তোমার জিনিস। কিন্তু মাঝি দুটি করে ফুল দেখে রেগে গেল। বুড়ী অনুনয় বিনয় করে বলল, এখন থেকে নয় ঘণ্টার মধ্যে আমি বাড়ি থেকে বাকি ফুলগুলি এনে দেব। কিন্তু মাঝি বলল, নদীর ভাগ না নিয়ে আমি এর থেকে কিছু নিতে পারব না। তুমি তাহলে নদীর জলে তোমার হাত ডুবিয়ে শপথ করো, তুমি বাকি ফুল এনে দেবে যথাসময়ে।

বুড়ী তাই করল। কিন্তু জল থেকে হাতটি বার করে আনতে দেখল তার ফর্সা হাতটা কালো হয়ে গেছে। মাঝি বলল, তুমি ঋণ শোধ করে দিলেই হাতটা আবার সাদা হয়ে উঠবে। না দিলে ঐ রকমই রয়ে যাবে চিরকাল।

বুড়ী বলল, না, আমি ঋণ শোধ করে দেব। এই বলে সে ঝুরি নিয়ে চলে গেল। ফুল না থাকায় ঝুড়িটা খুব হালকা বোধ হচ্ছিল। সে নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখল মাঝি যে যুবক পথিককে নদী পার করে এনেছিল সেই যুবকটি নদীর বালুচরের উপর দিয়ে কোথায় হেঁটে চলেছে। যুবকটি দেখতে খুব

সুন্দর। তার সঙ্গে কথা বলার অনেক চেষ্টা করল বুড়ী। কিন্তু যুবকটি হেঁটে যেতে লাগল। অবশেষে বুড়ী তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে হাঁটাতে পেরে উঠবে না। আমি সবুজ রাক্ষসীর সাহায্যে নদী পার হয়ে সুন্দরী পদ্মের কাছে যাব।

এ কথা শুনে যুবক বলল, আমিও যাব সেখানে। কিন্তু কি উপহার নিয়ে যাচ্ছ ?

বুড়ী বলল, আমি আমার গোপন কথা কিছুই বলব না যদি তুমি তোমার কথা না বল।

বুড়ী প্রথমে তার সব কাহিনী বলতে যুবকটি ঝুড়ি থেকে পাথরের মপকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল। সে বলল, আমারও একদিন রাজ্য ছিল ধনদৌলত ছিল। কিন্তু এখন আমার কিছুই নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব।

কিন্তু তার নিজের জীবনকাহিনীর কথা কিছু বলল না। বুড়ীর কৌতূহল কিন্তু মিটল না। যুবকটি বরং বুড়ীর কাছে জানতে চাইল, বাতি হাতে সেই বৃদ্ধ লোকটি কে, সেই রহস্যময় বাতির আলোর অর্থ কি এবং তার দুঃখের শেষ কি করে হবে।

কথা বলতে বলতে দূরে নদীর উপর এক বিরাট সেতু দেখতে পেল তারা। সেতুটা সূর্যের আলোয় অতিশয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এত উজ্জ্বল বস্তু কখনো তারা দেখেনি।

তারা পান্নার মত সবুজ ও উজ্জ্বল সেতুর উপর দিয়ে নদী পার হতে লাগল। কিন্তু ওপারে না পৌঁছতেই সেতুটা সেই সবুজ রাক্ষসীর চেহারায় পরিণত হলো। সে তখন তার পিঠে করে তাদের ওপারে পৌঁছে দিল। তারা ধন্যবাদ দিল রাক্ষসীকে।

এখান থেকে ওরা যাবে পদ্মের প্রাসাদে। তারা সেখানে কোন লোক চোখে না দেখলেও কাদের ফিস ফিস কথা কানে এল তাদের। বুঝল আরও জনকতক লোক পদ্মের কাছে যাবে সন্ধ্যের সময়।

ঝুরি নিয়ে বুড়ী সন্ধ্যে হতেই পদ্মের বাগানে চলে গেল একা। সে দেখল পদ্ম বীণা সহযোগে গান গাইছে আর গানের সুরের যাদুতে মাতাল হয়ে উঠছে চারদিকের বাতাস, হ্রদের জলে ঢেউ জাগছে। বুড়ী বলল, তোমাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তার থেকে তুমি এখন অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছ পদ্ম।

পদ্ম কিন্তু নিজের প্রশংসা মোটেই শুনতে চাইল না। সে বলল, আমার

একটি ছোট পাখি ছিল। আমার বীণার উপর বসে গান করত। একটু আগে সে মারা যায়। তার কবর থেকে আর একটি গাছ গজিয়ে উঠবে আমার বাগানে। আমি যাদের ভালবাসি তাদের মৃতদেহ কবর দিয়ে তার উপর একটি গাছের চারা বসাই।

বুড়ী বলল, যে কোন দুঃখ ও বিপর্যয়ের অবসান হবেই। তারপরেই আবার সুখ। কোন চিন্তা নেই। আমি তাহলে চলি। নদীকে আমার প্রতিশ্রুত ফুলগুলি এনে না দিলে আমার হাতটা এমনি কালো আর ছোট রয়ে যাবে।

যাবার সময় তার ঝুরি থেকে সেই পাথরটা বার করে বলল, এটা আমার স্বামী উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছে তোমাকে। আমাদের কুকুর মপ পাথর হয়ে গেছে। একে তুমি জীবন দান করে নিজের কাছে রেখে দেবে। এ তোমাকে বড় আনন্দ দেবে। আমরা তাতেই সুখী হব।

পদ্ম বলল, তুমি তাহলে আমার পাখিটিকে নিয়ে যাও। তোমার স্বামীকে বলে এর মৃতদেহটিকে পাথরে পরিণত করে দেব। পরে আমি একে জীবন দান করে আবার পাখিতে পরিণত করব। তখন এই পাখি আর তোমাদের মপ আমার কাছে থেকে আমাকে আনন্দ দান করবে।

বুড়ী ঝুরি মাথায় করে চলে যেতেই সবুজ রাক্ষসী এসে হাজির হলো। এসে পদ্মকে বলল, মন্দির নির্মিত হয়ে গেছে।

পদ্ম বলল, কিন্তু সে মন্দির নদীর উপরে দাঁড়িয়ে নেই কেন?

রাক্ষসী বলল, আমি রাজাদের সঙ্গে দেখা করেছি ও কথা বলেছি।

পদ্ম বলল, কখন তারা জানাবে?

রাক্ষসী বলল, আমি নিজের কানে এক আকাশবাণী শুনেছি সময় হয়ে গেছে। আর দেরি নেই।

পদ্মের মুখটা উজ্জল হয়ে উঠল। এমন সময় তার তিনজন সহচরী এসে প্রস্তুত হয়ে উঠল তার সেবার জন্য। পদ্ম তখন সেই পাথরটার উপরে ঝুঁকে কি করতেই মপ বেঁচে উঠল। মপকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল পদ্ম। চমৎকার দেখতে কুকুরটা। তাকে কোলে নিয়ে মাঝে মাঝে বুকে চেপে ধরে চুম্বন করতেও লাগল। মপকে পেয়ে বেশ খুশি মনে খেলা করছিল পদ্ম। কিন্তু হঠাৎ সেই বিষণ্ণ যুবকটি এসে পড়ায় বাধা পেল পদ্ম। যুবকের হাতে ছিল সেই বাজপাখিটা যে পদ্মের ছোট পাখিটাকে আজই হত্যা করে।

যুবকের হাতে বাজপাখিটিকে দেখেই রেগে গেল পদ্ম। বলল, ও পাখি

নিয়ে এখানে আসা তোমার উচিত হয়নি।

যুবক বলল, এর জন্য আমার পাখিকে দোষ না দিয়ে তোমার ভাগ্যকে দোষ দেওয়া উচিৎ

এদিকে পদ্মের আদর পেয়ে মপের সাহস বেড়ে যাচ্ছে। সে আরও আদর চাইতে লাগল পদ্মের কাছে। পদ্মও তার ঘাড়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগল। একবার হাততালি দিয়ে মপকে যেতে বলল পদ্ম। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছুটে গিয়ে ফিরিয়ে আনল। তারপর তাকে কোলে বসিয়ে বুকের উপর চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করতে লাগল।

যুবকটি তা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল বিস্ময়ে। সে বলল, আমি তোমার জন্য সর্বস্বান্ত হয়েছি। আমাকে কি এই দৃশ্য দেখতে হবে? সামান্য একটা ইতর প্রাণী তোমার ভালবাসা, তোমার বুকের স্বর্গ আর চুম্বন আলিঙ্গনের মাধুর্য লাভ করছে তা আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে? আমি কি তাহলে ঐ মাধুর্য লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে নদীতীরের নির্জন পথ ধরে অজানার দিকে চলে যাব? না তা যাব না, তোমার বুকে যদি পাথর থাকে তাহলে আমি সে পাথরে পরিণত হব। তোমার স্পর্শে যদি মৃত্যু থাকে তাহলে আমি সেই মৃত্যু লাভ করব।

এই বলে পদ্মের দিকে এগিয়ে গেল যুবকটি। পদ্ম হাত বাড়িয়ে নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু যুবকটি তা শুনল না। অবশেষে পদ্মকে জোর করে স্পর্শ করতেই যুবকটির প্রাণহীন দেহটি ঢলে পড়ল মাটিতে। শোকে দুঃখে চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল পদ্মর। তার সহচরীরা তাকে হাতীর দাঁতের চেয়ারে বসিয়ে বীণা বাজিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল। রাক্ষসী বলল, বাতি হাতে সেই বৃদ্ধকে ডেকে পাঠাও। এখনো আশা আছে।

এমন সময় ঝুরি মাথায় সেই বুড়ী এসে হাজির হলো। বলল, নদীর কাছে আমি ঋণী বলে মাঝি বা দৈত্য আমাকে নদী পার করতে চাইছে না। এদিকে আমার হাতটা আরো কালো ও ছোট হয়ে যাচ্ছে।

রাক্ষসী বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, কোন চিন্তা নেই। তুমি তোমার স্বামীকে পাঠিয়ে দাওগে। তুমি যাও, সেই পরীদের দেখতে পাবে। চোখে না দেখলেও তাদের কথা শুনতে পেয়ে অনুরোধ করবে। তারা অথবা দৈত্য তোমাকে নদী পার করে দেবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে একটি বাজপাখি দেখতে পেল রাক্ষসী। তার

লালচে পাখাগুলো সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তার পরেই বাতি হাতে সেই বৃদ্ধ এসে হাজির হলো। তাকে দেখে পদ্ম বিশেষ খুশি হলো। বলল, এত তাড়াতাড়ি কেমন করে তুমি এলে?

বৃদ্ধ বলল, আমার হাতের বাতি যখন নিভে আসে তখন আমি বুঝতে পারি কোথাও আমার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর তখনি আমি আকাশে মুখ তুলে তাকাই। দেখি একটি পাজপাখি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, বাতি হাতে বৃদ্ধ একটি উঁচু পাথরের উপর বসে রাক্ষসীকে বলল, তুমি সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে মৃতদেহকে ঘিরে থাক। পদ্মের মৃত পাখিটাকেও ওই কুণ্ডলীর মধ্যে এনে দাও।

ইতিমধ্যে বুড়ী একটা ঝুড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল। বৃদ্ধ তার বাতির আলো কুণ্ডলীপরিবৃত যুবকের মৃতদেহের উপর ফেলতে লাগল। কিন্তু রাত্রি ঘন হয়ে ওঠায় তখন কিছু হলো না। এমন সময় পরীরাও এসে হাজির হলো। রাত্রিতে শুধু পরীরা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। বৃদ্ধের বাতি আলো ছাড়াও পদ্ম আর পরীদের গা থেকে জ্যোতি বার হচ্ছিল। সকাল হতে একটি মিছিল করে সার দিয়ে সবাই নদীর দিকে এগিয়ে চলল। প্রথমে পরীরা, পরে ঝুড়ির ভিতর মৃতদেহ ও সেই মৃত পাখিটি ভরে তাই মাথায় করে বৃদ্ধা, প্রতিবেশিনী রাক্ষসী, বাতি হাতে বৃদ্ধ, সুন্দরী পদ্ম আর তার সহচরীরা।

রাক্ষসী সেতুর রূপ ধারণ করে ওদের সবাইকে নদী পার করে দিল। নদীর ওপারে গিয়ে রাক্ষসী বলল, আমি নিজের জীবন দিয়ে ওদের বাঁচাব। তারপর পদ্মকে বলল, তোমার দুটি হাতের একটি মৃতদেহের উপর আর একটি হাত আমার উপর রাখ।

পদ্মর একটি হাতের স্পর্শে যুবক ও তার সেই পাখিটি বেঁচে উঠল। যুবক উঠে দাঁড়াল। তবে তার স্মৃতি তখনো ফিরে আসেনি। আর একটি হাতের স্পর্শে রাক্ষসীর অসংখ্য মূল্যবান ধাতুটুকরোতে পরিণত হলো।

রাক্ষসীর কথামত সেই সব ধাতুটুকরো ঝুড়িতে ভরে ভাসিয়ে দেওয়া হলো নদীর জলে।

এরপর বৃদ্ধ পরীদের বলল, আমি তোমাদের সেই মন্দিরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। তোমাদের কাছে আছে মন্দিরের চাবিকাঠি। তোমরা চাবি খুলে দিলে আমরা প্রবেশ করব তার মধ্যে।

ওরা গিয়ে দরজা খুলে মন্দিরের ভিতর ঢুকতেই সোনার রাজা বলে উঠল,

কোথা হতে আসছ তোমরা ?

বৃদ্ধ তার বাতি হাতে বলল, পৃথিবী হতে।

রূপোর রাজা বলল, কোথায় যাবে তোমরা ?

বৃদ্ধ উত্তর করল, পৃথিবীতেই ফিরে যাচ্ছি।

পিতলের রাজা বলল, কি চাও তোমরা আমাদের কাছে ?

বৃদ্ধ বলল, তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

চতুর্থ রাজা কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সোনার রাজা বলল, তোমরা চলে যাও। আমার এ সোনা তোমাদের জন্য নয়।

এরপর তারা রূপোর রাজার কাছে গেল। রাজা বলল, আমি তোমাদের খাওয়াতে পারব না। তোমরা অন্য কোথাও যাও।

এর পর তারা চতুর্থ রাজার কাছে যেতে রাজা জিজ্ঞাসা করল, কে বিশ্বকে শাসন করবে ?

বৃদ্ধ উত্তর করল, যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে ?

রাজা বলল, তাহলে সে হচ্ছে আমি। বৃদ্ধ বলল, সময় হয়ে গেছে। কিছু পরেই দেখা যাবে।

পদ্ম তখন চতুর্থ রাজার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে চুম্বন করল। হে দয়ালু পিতা, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। এই বলে মূর্তিটিকে জড়িয়ে ধরল পদ্ম। গোটা পৃথিবীটা কেঁপে উঠল। গোটা মন্দিরটা ভয়ঙ্করভাবে দুলতে লাগল। যুবকটি ভয়ে বুড়ীকে জড়িয়ে ধরল।

এবার ওরা বুঝতে পারল মন্দিরটা একটা বিরাট জলজাহাজের মত এগিয়ে চলেছে। বৃদ্ধ বলল, আমরা নদীর উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা শীঘ্রই আমাদের লক্ষ্যে পৌছব।

মন্দিরের কড়ি বরগাগুলো ভেঙ্গে পড়তে লাগল। যুবককে তার পাশে দাঁড়িয়ে সাহস দিতে লাগল বৃদ্ধ। বুড়ীর কাছে ছিল পদ্ম। হঠাৎ গুপ্ত পাহাড়ে ধাক্কা লাগা জাহাজের মত আটকে গেল চলমান মন্দিরটা। ওরা অন্ধকারে বুঝতে পারল একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে পড়েছে ওরা। ঘরটা ভিতর থেকে বন্ধ। একটা বাতি জ্বলছে ঘরের ভিতরে।

দরজা খুলে গেলে দেখা গেল সেখানে ফেরীঘাটের মাঝি রয়েছে। বৃদ্ধ তার বাতির আলো দেখাল। যুবক একটি জায়গায় বসল। পদ্মকে বসাতে হলো অন্য জায়গায়। বৃদ্ধা বলল, আমার হাতটা কালো হয়ে রইল। ছোট

হতে হতে এটা এবার উবে যাবে।

বৃদ্ধ বলল, সকালের আলো ফুটে উঠতেই নদীতে স্নান করে আসবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে বলল, নদীর ঋণ শোধ করা হয়নি। স্নান করলে আমার গোটা দেহ কালো হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বলল, সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে।

সকাল হতে প্রথম সূর্যের আলো ফুটে উঠতেই বৃদ্ধ চিৎকার করে বলল, 'জ্ঞানবিদ্যা, রূপ আর শক্তি—এই তিনটি জিনিসই পৃথিবীকে চালায়।' এই তিনটি শব্দের নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সোনার, রূপোর ও পিতলের তিনজন রাজা উঠে এল একে একে। কিন্তু চতুর্থ মাটির তলায় ঢুকে গেল।

এরপর বৃদ্ধ লাঠি হাতে যুবককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। পিতলের রাজার সামনে এসে থামল ওরা। রাজা যুবককে বলল, বাঁ হাতে এই অস্ত্র ধারণ করো। ডান হাতটি মুক্ত রাখ।

পরে ওরা রূপোর মূর্তির কাছে গেলে মূর্তিটি তার হাতে রাজদণ্ডটি দিয়ে বলল, তুমি আমার সব ভেড়া অর্থাৎ গবাদি পশুগুলি গ্রহণ করবে ও বেড়াবে।

সোনার রাজা তার গলায় ওক পাতার মালা পরিয়ে দিয়ে বলল, সব সময় মহানকে বরণ করে নেবে।

এবার বৃদ্ধ লক্ষ্য করল, তিন রাজার কাছ থেকে অস্ত্র, রাজদণ্ড আর মালা—এই তিনটি জিনিস পেয়ে যুবকটির দেহমনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। অস্ত্র ও রাজদণ্ড লাভ করে সে দেহে পায় প্রচুর শক্তি। আর মনে পায় দৃঢ়তা। আর ওক পাতার মালাটি গলায় পরার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক ভাবে উজ্জ্বল। এবার সে হারানো স্মৃতি ফিরে পায়।

যুবকটি তখন আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, হে আমার প্রিয়তমা পদ্ম, তোমার খণ্ড অন্তরের শুচিতা ও ভালবাসার থেকে পৃথিবীতে অন্য কি আকাঙ্খার বস্তু থাকতে পারে?

এরপর বৃদ্ধের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, হে আমার প্রিয় বন্ধু, আর একটি শক্তির কথা ভুলে গেছ তোমরা। তা হলো প্রেমের শক্তি।

এই বলে সে অবগুণ্ঠিত পদ্মকে আলিঙ্গন করল। পদ্মের গালদুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বৃদ্ধ হাসিমুখে বলল, প্রেম শাসন করে না, তবে নিয়ন্ত্রিত করে।

এতক্ষণ ওরা লক্ষ্য করেনি। এবার ওরা দেখল নদীর ধারে এক বিরাট সেতু নির্মিত হয়েছে। নদীর বুক থেকে স্তম্ভ গড়ে উঠে সে সেতুকে ধারণ করে আছে। তার উপর দিয়ে জনস্রোত এগিয়ে আসছে। অসংখ্য নরনারী এ পারের সেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের নূতন রাজা ও রাণীকে অভিবাদন জানাতে আসছে।

বৃদ্ধ বলল, সেই রাক্ষসীর স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করো। কারণ সেই তোমাদের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন দান করে। এই নদীর সেতুও গড়ে উঠেছে তারই প্রচেষ্টায়।

রাণীর মোট তিনজন সহচরী ছিল। একজন তার হাতীর দাঁতের চেয়ার, একজন পাখা আর একজন বীণা ধারণ করে থাকত। অবশ্য আর একজন নূতন যুবতী সহচরী দেখা গেল।

আসলে সে হচ্ছে সেই বৃদ্ধা। এখন যুবতীতে পরিণত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। বাতিহাতে বৃদ্ধ তা দেখে বলল, তুমি এখন যুবতী হয়েছ, আগে আমার স্ত্রী ছিলে। এখন তুমি যে কোন যুবককে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পার আজকের এই শুভ দিনে।

যুবতী বলল, তুমি বুঝতে পারছ না তুমি নিজেও ত যুবক হয়ে উঠেছ।

এদিকে সূর্য ক্রমশঃ আকাশের উপরে উঠতে লাগল। সেই বিরাট আকাশ দৈত্যটা সেতুর উপর যেতে যেতে হাত দিয়ে সূর্যটা আড়াল করায় তার বিশাল হাতের কালো ছায়ায় অস্বস্তি অনুভব করছিল চলমান জনতা। অনেকে ভয়ে নদীর জলে পড়ে যাচ্ছিল। তাই দেখে নূতন রাজা দৈত্যকে আক্রমণ করার জন্য তরবারি নিষ্কাশণ করতে যাচ্ছিল কোমর থেকে। কিন্তু বৃদ্ধ তাকে নিবৃত্ত করল। বলল, ওর সময় হয়ে এসেছে। এখনি ওর ছায়া চিরতরে অপসারিত হবে।

সত্যিই দৈত্যটি হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল পথের উপর। তার বিপুলাকার মৃতদেহটার চারদিকে ভিড় জমে উঠল কৌতুহলী মানুষের।

অবশেষে জনতা নূতন রাজা ও রাণীকে দেখার জন্য মন্দিরের দিকে আসতে লাগল। রাজা ও রাণীকে দর্শন করে ফিরে যাবার পথে জনতা অবাক চোখে দেখল তাদের পথে সোনার টুকরো ঝরে পড়ছে। শুধু একবার নয় পথের কয়েক জায়গায় কয়েকবার এই ঘটনা ঘটল।

কবিতাগুচ্ছ

বসন্ত দিনের কবিতা (Mailied)

Wie herlick leuchet mir die Natur

দেখ দেখ, প্রকৃতি কেমন নববধূর মত
নবসাজে সজ্জিত হয়েছে শুধু আমারই জন্য ;
দেখ দেখ, কেমন সূর্যের আলো হাসি হয়ে
ঝড়ে পড়ছে কুয়াশা ভেজা মাঠে মাঠে।
ফুল ফুটে উঠছে প্রতিটি গাছের ডালে ডালে
হাজার কণ্ঠে ফেটে পড়ছে অরণ্যের নীরব আত্মা।
হে পৃথিবী, হে সূর্য, হে সুখ তোমরাও
ফুটে ওঠ মানুষের বুকে বুকে ;
হে আমার প্রেম, সবুজ পাহাড়ের উপর ঝুলতে থাকা
সোনালি মেঘের মত ঝুলতে থাক আমার অন্তরের আকাশে।
ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমার জীবনের শূন্য প্রান্তর।
হে আমার প্রিয়তমা, আমার গভীর ভালবাসা
কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তোমার মদির চোখের
নীল তারার গভীরে ; আমি তোমাকে ভালবাসি
ঠিক যেমন উড়ন্ত চিল ভালবাসে নীল আকাশকে,
ঠিক যেমন সকালের ফুল ভালবাসে আকাশের সোনালি গন্ধকে।
তুমি আমাকে দিয়েছ যৌবনের আনন্দ, তাই ত
আমি তোমাকে ভালবাসি আমার রক্তের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে।
আমার সুখে আমাকে ভালবাসার সুখে চিরসুখী হও প্রিয়তমা।

পথের ধারে গোলাপ (Heidenros lein)

Sah ein knub ein Roslein Stehu

পথের ধারে ফুটে ওঠা এক রক্ত গোলাপ দেখে
একটি ছেলে ছুটে গেল তার দিকে।
আহা কি সুন্দর গোলাপ, তাজা রক্তের মত টকটকে লাল

ছেলেটি বলল, 'গোলাপ, আমি তোমায় তুলব।'
গোলাপ বলল, 'আমাকে তুললে আমি তোমাকে
কাঁটা দিয়ে বিঁধব যাতে আমার কথা চিরকাল মনে থাকে।'
দুষ্টু ছেলেটা সত্যি সত্যিই গোলাপটাকে তুলে ফেলল
বৃন্ত থেকে আর গোলাপটাও তাকে বিঁধতে লাগল
কাঁটা দিয়ে ; চিৎকার বা অভিযোগ অনুযোগে কোন ফল হলো না।
অবশেষে গোলাপকে হার মানতে হলো
ছেলেটার দুষ্টুমির কাছে, সহ্য করতে হলো তার অশালীন ঔদ্ধত্যের
রঙীন উচ্ছ্বাসকে

অভ্যর্থনা ও বিদায়

Es Schling mein Hez

আমি ঘোড়ায় চাপতেই আমার মনের আগেই
আমার অন্তরটা দ্রুত স্পন্দিত হতে হতে চলে গেল সেখানে।
রাত্রির কোলে প্রথমে ঢুকে গেল পৃথিবী আর তার পাহাড়গুলো।
কুয়াশায় গা ঢেকে বিশালদেহী ওকগাছগুলো রইল দাঁড়িয়ে
আর ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে অন্ধকার
উঁকি মারতে লাগল অসংখ্য ভীরু কালো চোখ মেলে।
এমন সময় মেঘের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ ;
বাতাস আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল পাখা মেলে।
রাত্রির পেট থেকে বেরিয়ে আসা দানবগুলো
আমাকে ভয় দেখাতে লাগল বিভিন্নভাবে,
কিন্তু আমার সাহস আর সংকল্পের কাছে হার মানল তারা।
আমার রক্তে ছিল এক ভয়ঙ্কর উত্তাপ, চোখে ছিল দুঃসাহসী আলো।
তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখ থেকে
বেরিয়ে এল এক উদার আলোর ঝলকানি, তোমার মুখের
আনন্দকে ঘিরে ছিল এক উজ্জ্বল বসন্তের সমারোহ।
আমার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল আনন্দে।
হে ঈশ্বর, আমি এতখানি আশা করিনি, আমি এর যোগ্য নই।

কিন্তু হায় সকালের সূর্য সরে যেতেই বিষাদ নেমে এল অন্তরে ;
তোমার চুম্বনে যে আনন্দ পেয়েছিলাম সে আনন্দ
দুরন্ত বেদনা হয়ে নেমে এল তোমার চোখের কম্পমান পাতায়।
আমি বিদায় নিলাম তোমার কাছ থেকে, তুমি তাকিয়ে রইলে
আমার পথপানে, তাকিয়ে রইলে সজল চোখে।
তবু ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে যে সুখ পেয়েছি
হে ঈশ্বর, কেন তার কোন তুলনা নেই ? কেন, কেন ?

গ্যানিমেড (Ganymed)

Wie in Morgenglanz

হে আমার প্রিয় বসন্ত, সকালের আলোয় কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তোমায়
তোমার প্রেমের উত্তাপ আমার বুকে নিয়ে আসছে
অফুরন্ত সৌন্দর্য আর আনন্দের রঙীন সমারোহ।
আমি যদি তোমায় বুক ভরে আলিঙ্গন করতে পারতাম !
আমি যখন তোমার বুকে শুয়ে থাকি তোমার ফুল তোমার ঘাস
এসে বাসা বাঁধে আমার বুকের মাঝে।
তোমার দেহগাত্রের বাতাস শীতল করে দেয় আমার বুকের
জ্বলন্ত কামনাকে, সকালের বাতাস হাত বুলিয়ে দেয় আমার গায়ে ?
কুয়াশাঘেরা উপত্যকার ওপার হতে নাইটিঙ্গেলরা আমায় ডাকে।
'যাচ্ছি' বলে ছুটে যাই আমি, ক্রমাগত উঠতে থাকি উপরে।
মেঘেরা নেমে আসে। আমি চিৎকার করে বলি, হে পিতা,
তোমার বুকে স্থান দাও, আমাকে আলিঙ্গন করো।

থেলের রাজা (Der konig in Thale)

থেল দেশে এক রাজা ছিলেন।
তাঁর স্ত্রী মৃত্যুকালে এক সোনার কাপ দিয়ে যান রাজাকে।
রাজা জীবনে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন সেই কাপটিকে,
যতবার তিনি মদপান করতেন সেই কাপ থেকে,

যতবার ভোজসভায় সেটিকে ব্যবহার করতেন ততবারই
চোখ থেকে জল ঝরে পড়ত তাঁর।
মৃত্যুকালে রাজা তার গোটা রাজ্য ও রাজ্যের সব কিছু
নিঃশেষে দিয়ে গেলেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের।
কিন্তু সেই কাপটি কাউকে দিলেন না।
তারপর এক শেষ ভোজসভায় শেষবারের মত সেই কাপ থেকে
মদপান করে জানালা দিয়ে কাপটিকে ফেলে দিলেন
প্রাসাদের পাশে বয়ে যাওয়া সমুদ্রের জলে।
স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাজা পতনশীল
সেই কাপটির দিকে, তাকে ডুবে যেতে দেখলেন ধীরে ধীরে,
তারপর চক্ষু দুটি মুদ্রিত হয়ে এল আপনা থেকে
জীবনের সব মদ পান করা হয়ে গেছে তাঁর।

প্রমিথিয়ুস (Prometheus)

হে জিয়াস, তোমার মেঘাস্ত্র দ্বারা সমস্ত স্বর্গলোক
সমস্ত অন্তরীক্ষ ছেয়ে দাও, পাহাড়ে পর্বতে
কাঁটাগাছ উপড়ে ফেলতে থাক অর্বাচীন বালকের মত
তোমার শক্তির অপচয় করো ইচ্ছামত।
অনেক কষ্টে গড়ে তোলা আমার পৃথিবী
তুমি ভেঙে দাও, যে ঘর তুমি কোনদিন নিজে বাঁধনি,
যে ঘরের শান্তির আস্বাদ নিজে কখনো পাওনি,
আমার সেই কত সাধের ঘরের শান্তি পুড়িয়ে ছারখার করে দাও।
হে স্বর্গস্থ দেবতাবৃন্দ, এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে
তোমাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া মানুষের উৎসর্গ আর অঞ্জলির উপর
বেঁচে থাকতে হয় তোমাদের ; ভিক্ষুক আর শিশুর মত নির্বোধ
আশাবাদী ঐ সব মর্ত্য মানুষগুলো না থাকলে অনশন করতে
হত তোমাদের, শুকিয়ে মরতে হত স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের।
যখন আমি শিশু ছিলাম এবং কোন ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তাম,
তখন সূর্যের দিকে বিহ্বল দৃষ্টি তুলে কাতর প্রার্থনা জানাতাম,

অলক্ষ্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে, ভাবতাম তারা শুনতে পাবে আমার কথা।
কিন্তু উদ্ধত অত্যাচারী, টিটানদের হাত থেকে কে আমায় রক্ষা করেছে?
কে আমায় রক্ষা করেছে নিশ্চিত মৃত্যু আর দাসত্বের নিষ্ঠুর কবল থেকে?
হে আমার উজ্জ্বল অন্তরাত্মা, তুমি কি নিজেকে নিজে উদ্ধার করনি?
অথচ নিজেকে নিজে উদ্ধার করে সে উদ্ধারের জন্য শৈশবসুলভ
অজ্ঞতাহেতু ধন্যবাদ দিয়েছ সেই সব উদাসীন দেবতাদের।
কেন আমি তোমায় সম্মান করব জিয়াস? কি কারণে?
তুমি কি কখনো আমার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ব্যথাভার দূর করেছ?
তুমি কি কখনো আমার ত্রাসক্লিষ্ট দুচোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছ?
সর্বশক্তিমান কাল আর শাশ্বত নিয়তি কি তোমার আমার
দুজনেরই অবিসম্বাদিত প্রভু নয় যারা আমায় সামান্য মানুষে পরিণত
করেছে?
তুমি কি মনে ভাব আমার অপুষ্পিত স্বপ্নগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে
পারেনি বলেই আমি জীবনকে ঘৃণা করতে থাকব, চলে যাব দূর অরণ্যে?
কিন্তু জেনে রেখো আমি এখানে এই পৃথিবীর বুকেই বসে আছি এবং
থাকব,
মানবজাতিকে গড়ে তুলব আমার মনের মত করে।
তারা হয়ে উঠবে আমারই মত পৌরুষে অপরাজেয়, সুখে দুঃখে অবিচলিত।
তারা দুঃখ ভোগ করবে, কাঁদবে, আনন্দে উদ্বেল হবে।
আর আমারই মত তোমার মত যত সব দেবতাদের উপেক্ষার চোখে
দেখবে।

চরকায় চাকায় (Greecher am Spinnrrade)

Meine Ruh ist hin

আমার জীবনের সব শান্তি চলে গেছে, নীরব ব্যথাভারে
ভারী হয়ে উঠেছে আমার অন্তর, সে শান্তি ফিরে পাব না আর কখনো
না, আর কখনই না।
যে সব জায়গায় সে নেই সে সব জায়গা এক একটা আস্ত কবর
বলে মনে হয় আমার কাছে, সমস্ত জগৎটা হয়ে ওঠে দুঃসহভাবে তিক্ত।

আমার মাথা ঘুরে গেছে, মন হয়ে গেছে ছিন্নভিন্ন।
আমার জীবনের সব শান্তি চলে গেছে, অন্তর হয়ে উঠেছে ভারী
এ শান্তি আর কখনো ফিরে পাব না জীবনে।
আমি আমার ঘরের জানালা দিয়ে কখনো তাকালে
শুধু তারই খোঁজ করি, ঘরের বাইরে গেলে যেন
এগিয়ে যাই তারই দিকে।
তার সুন্দর চেহারা, মুখের হাসি, চোখের দৃষ্টি, কথা বলার ভঙ্গিমা,
হাতের মৃদুচাপ আর চুম্বন—না না আমি কখনো ভুলব না।
আজ আমার অন্তর একান্তভাবে চাইছে শুধু তার অন্তরকে
আর দেহ চাইছে তার দেহকে প্রাণভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে,
চাইছে তার চুম্বনের দুরন্তমধুর চাপে সমস্ত চেতনা হারিয়ে ফেলতে।

হ্রদের ধারে (Auf dem see)

und frische Nahrung, neus blut

আমি এখন এই মুহূর্তে বিরাজ করছি উদার প্রকৃতির বুকের উপর।
সহস্রধারায় উৎসারিত তার বুকের রক্ত পান করছি আমি।
তার অফুরন্ত প্রাণবায়ু শোষণ করে নিচ্ছি আমি
আমার শুষ্ক নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে।
এইভাবে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠছি আমি, ফেটে পড়ছি
অদম্য প্রাণশক্তির অমিত উচ্ছ্বাসে।
ঢেউএর তালে তালে আমাদের নৌকোটা দুলছে
অভ্রলেহী পাহাড়গুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের পথের দুপাশে।
হে আমার আয়ত উদার চক্ষু, কিসের ভারে অবনত হচ্ছ তুমি ?
সোনালি স্বপ্নগুলো আবার ফিরে এসেছে ? কিন্তু আমি ত
বিদায় দিয়েছি তাদের। চলে যাও হে সুবর্ণ স্বপ্নরাজি, কোন প্রয়োজন নেই
এখানে তোমাদের, কারণ এখানে আছে জীবন, আছে প্রেম।
তরঙ্গায়িত এ হ্রদের জলে সোনার মত কাঁপতে থাকে
আকাশের অসংখ্য তারার প্রতিফলন, দুপাশের নুয়ে পড়া গাছের

পরিণত ফলেরা প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে সে জলে।
আর ঠিক তখনি পলাতক নরম কুয়াশার দল দিগন্তের বুকে
ঘন হয়ে পান করতে থাকে আশ্চর্য এক আলোর নির্যাস।

শরৎ (Herbstgefule)

Fetter grine, du lanb

আমার জানালার ধারে বেড়ে ওঠা হে আঙুরলতার
পাতাগুলি, তোমরা আরো সবুজ হয়ে ওঠ।
হে জাম ফলের দল, তোমরা বড় হও, পরিণত
ও পূর্ণাবয়ব হয়ে ওঠ আরো তাড়াতাড়ি।
সূর্যমাতার শেষ দৃষ্টির রশ্মি মমতার তাপ দান করছে তোমাদের,
উদার আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে নীল স্নেহের পশরা,
চাঁদের মিষ্টি নিঃশ্বাস শীতল করছে তোমাদের দেহগাত্রকে।
সবচেয়ে বড় কথা, আমার সজীব প্রেমের তপ্ত অশ্রুর ধারা
সিক্ত হচ্ছ তোমরা।

নৈশ পথিকের গান—১ (Wandurers Nacthlic 1)

Der du von dem Himmel bist

তুমি স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমার দুঃখ বেদনার
সব আবেগকে স্তব্ধ করে দাও। আবার আমাদের মত
যারা হতভাগ্য তাদের অন্তর পূর্ণ করে দাও দ্বিগুণ সান্ত্বনা দিয়ে।
কিন্তু এই সব আনন্দবেদনার অর্থ কি? আমার এসব ভাল লাগে না
হে মধুর শান্তি, আমার বুকে এস, বুকে এস আমার
আর আমি কিছুই চাই না।

২

সমস্ত পাহাড় আর গাছের মাথাগুলো শান্ত, আশ্চর্যভাবে শান্ত।
চারদিক এত শান্ত যে কারো নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যায় না।
অনবরত কিচমিচ করতে থাকা ছোট্ট ছোট পাখিগুলো

বনের গভীরে চলে গেছে। একটু থাম,
সব বিক্ষোভের ঢেউ পেরিয়ে শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে উঠবে
তোমারও অন্তরাত্মা।
ওদের মত তুমিও শান্ত হয়ে উঠবে, নীরব হয়ে উঠবে।

চাঁদের প্রতি (An dev Mond)

Fullest wieder Bisch and Tal

আবার তুমি সমস্ত অরণ্য আর উপত্যকাকে তোমার
কুহেলিকাময় ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিয়েছ।
অবশেষে আমার আত্মাকে মুক্তি দিয়েছ তুমি।
পরম বন্ধুর মত তুমি তোমার স্নিগ্ধ দৃষ্টির আলো
ছড়িয়ে দিচ্ছ আমার প্রতিটি ঊষর প্রান্তরে।
অতীতের সুখ দুঃখের প্রতিটি শব্দ ধ্বনিত
প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে আমার শূন্য অন্তরে।
একা একা আনমনে পথ হেঁটে চলেছি আমি, আমার পথের দুধারে
কত আনন্দ বেদনার ফুল ফুটে আছে, অথচ তাদের দিকে
আমি ফিরেও তাকাই না, শুধু এগিয়ে চলি আমি একা একা।
হে নদী, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গর্জন করতে করতে
ছুটে চল তুমি, আমি জানি সব হাসি সব চুম্বন মিথ্যা।
আজকের এই মূল্যবান রত্নটি একদিন লাভ করেছিলাম
আমি, একথা আজ ভুলে যেতে চাই আমি।
পাহাড় আর উপত্যকার মধ্য দিয়ে অশান্ত বেগে ছুটে চল নদী।
শীতের রাতে বা মুক্তোর মত বসন্তের সকালে
সমানভাবে তুমি বয়ে চল, গর্জন করতে করতে ছুটে চল।
কোন রাগ দুঃখ না করে যে সব আসক্তিকে ঝেড়ে ফেলে
সরে যেতে পারে জগৎ থেকে সেই সুখী। সেই একমাত্র সুখী।
হায়, অন্তহীন রাত্রির অন্ধকারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অবস্থায়
একা একা অন্তরের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানো সত্যিই কি
ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

জলের উপর আত্মার গান (Gesung der Geister uber der Wasserrn)

Des Menchen Seele

মানুষের আত্মা ঠিক জলের মতন, জল যেমন
আকাশ থেকে পড়ে আকাশেই উঠে যায় ; আবার
পৃথিবীতেই ফিরে আসে তেমনি মানুষের আত্মাও
স্বর্গ থেকে আসে, স্বর্গকামনায় উন্মুখ থাকে সারাজীবন
অবশেষে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে।
পাহাড়, পর্বত হতে যে স্বচ্ছ জলধারা বেগে ঝরে পড়ে
পৃথিবীর সমতলে সেই জল বাষ্পীভূত হয়ে পরিণত হয়
ঘন মেঘে, যে মেঘ বৃষ্টির স্বচ্ছ রূপালি জল
হয়ে ঝরে পড়ে মাটির পৃথিবীতে।
সমতলভূমি এ জলের গতি যেখানে অব্যাহত অপ্রতিহত
সেখানে সে শান্ত স্বচ্ছ, সেখানে সে মাথার আকাশ
দুপাশের পাহাড় আর গাছপালার প্রতিফলন স্বচ্ছন্দে
ধারণ করে তার শান্ত বুকে।
কিন্তু বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে পদে পদে গতি তার
ব্যাহত ও প্রতিহত সেখানে উচ্ছল প্রতিবাদে সে ফেনায়িত।
বাতাস জলকে দেখতে ভালবাসে, ভালবাসে তার তরঙ্গমালাকে।
তাই জলও বাতাসকে দেখে ফুলে ওঠে আনন্দে,
আবেগে উচ্ছ্বাসে।
হে মানবাত্মা, তুমি কত জলের মত, তোমার ভাগ্য
বাতাসের মত কতই না অস্থির, কতই না চঞ্চল।

মানবতার সীমা (Grenzen der Menschlitef)

Wenn der uralte

আমাদের প্রাচীনতম পরম পিতা যখন শান্ত হাতে
কৃষ্ণকুটিল মেঘমালা হতে বিদ্যুদ্দাম বিচ্ছুরিত করেন
তখন সেটাকে তার উজ্জ্বল পোষাকের অংশ ভেবে
চুম্বন করি, সঙ্গে সঙ্গে শিশুসুলভ এক বিকম্পনে
আলোড়িত হয়ে ওঠে আমার বুক।

কোন মানুষ কখনো দেবতাদের সমান মহত্ত্ব অর্জন
করতে পারে না, কারণ যদি বা সে কোন রকমে
তার উদ্ধত অহঙ্কারী মাথাটাকে নক্ষত্রদের রাজ্যে তুলে
নিয়ে যেতে পারে কখনো তাহলে সে কোথাও পাবে না
তার পা রাখার জায়গা, তখন সে হয়ে উঠবে
মেঘ আর বাতাসের হাতে অসহায় এক খেলার পাত্র।
যদি সে এই পৃথিবীর শক্ত মাটির উপর মাথা তুলে দাঁড়ায়
তাহলে তার সে মাথার উদ্ধত উচ্চতা এমন কি কোন
ওক বা আঙুরগাছের মাথার সমানও হতে পারবে না,
দেবতা ত দূরের কথা।
তাহলে দেবতা ও মানুষের মাঝে পার্থক্য কোথায়?
দুজনের মধ্যে অনন্তকাল থেকে বয়ে চলেছে
অসংখ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত শাশ্বত এক ব্যবধানের নদী।
সে নদীর তরঙ্গ মাঝে মাঝে আমাদের উপরে তুলে দেয়।
কখনো বা আমাদের গ্রাস করে, আমাদের ভাসিয়ে বা
ডুবিয়ে নিয়ে যায়।
এক সঙ্কীর্ণ আংটা দিয়ে ঘেরা আমাদের জীবনের অস্তিত্ব।
এইভাবে পাশাপাশি আমাদের অসংখ্য জীবনাস্তিত্বের
আংটা যুক্ত হয়ে অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত করে তুলছে
আমাদের জীবনধারা ও বংশপারম্পর্যকে।

মেঘের রাজা (Erl konig)

Wer reitel so spat durch Naceht and Wind

কে এত রাত্রিতে এই উত্তাল বাতাসের মধ্য দিয়ে
ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে জনমানবহীন পথের উপর দিয়ে?
কোন এক শিশুপুত্রসহ পিতা যাচ্ছে, বনের মধ্যে
শিশুপুত্রটিকে চেপে ধরে কনকনে বাতাসের কামড় থেকে
রক্ষা করছে তাকে।

পিতা বলল পুত্রকে, হে আমার পুত্র, কেন তুমি মুখটাকে

ঢেকে রাখছ? পুত্র বলল, পিতা, দেখছ না উজ্জ্বল
পোষাক পরিহিত সোনার মুকুট মাথায় মেঘের রাজাকে?
পিতা বলল, ওটা আসলে রাজা নয়, মেঘের সৃষ্ট এক অলীক অবয়ব।
'হে আমার প্রিয় শিশু, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার সঙ্গে
কত মজার মজার খেলা খেলব, নদীর ধারে কত ভাল ভাল ফুল আছে।
কত উজ্জ্বল চকচকে জমকালো পোষাক আছে আমার মার কাছে।'
পিতা, পিতা, শুনতে পাচ্ছ না, মেঘের রাজা কি বলছে আমার কানে কানে
'চুপ করো পুত্র, ও হচ্ছে শুকনো পাতায় লাগা বাতাসের শব্দ।'
'শোন শোন হে শিশু, তুমি আমার কাছে আসবে? আমার মেয়ে
তোমার দেখাশোনা করবে, রোজ রাতে সে নাচবে,
তোমায় ঘুম পাড়াবে।'
শোন, শোন পিতা, মেঘের রাজার কন্যাকে দেখতে পাচ্ছ না?
'আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার সুন্দর চেহারা মুগ্ধ করেছে
আমাকে, যদি তুমি আমার কাছে না আস তাহলে জোর করে
তোমায় ধরে আনব আমি, জোর করে টেনে আনব তোমায়।'
'পিতা পিতা, দেখতে পাচ্ছ না, মেঘের রাজা আমায় ধরে
নিয়ে যাচ্ছে, আমায় আঘাত করেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেঘের রাজা—'
ভীত সন্ত্রস্ত পিতা তাই ঘোড়ায় চেপে তার আহত পুত্রকে নিয়ে
পালিয়ে যাচ্ছে অজানার পথে। কোন রকমে একটা গ্রাম্য খামারে
তাকে পৌছতেই হবে। কিন্তু হায় ছেলেটা তার পিতার কোলেই
মারা গেল।

বীণাবাদকের গান (Herfenspieler)

Wer nie sein Brot mit Trunen

যার কষ্টার্জিত রুটির উপরে চোখের জল ঝরে পড়েনি,
যে কখনো সারারাত বিছানায় বসে কেঁদে কাটায়নি,
সে কখনো ঈশ্বরের মহিমাকে জানতে পারেনি।
হে ঈশ্বর, তুমিই আমাদের জীবন দান করো,
দরিদ্রদের অন্তরকে দোষ দিয়ে কলুষিত করো তুমিই।
তারপর দুঃখের সীমাহীন যন্ত্রণায় তুমিই তাদের ফেলে দাও।

মিগনন (Mignon)

Kennest du das land

তুমি কি জান সে দেশের ঠিকানা যেখানে লেমন ফুল ফোটে
থোকা থোকা, যেখানে সোনারবরণ কমলালেবু চকচক করতে থাকে
ঘন শ্যামল পাতার ফাঁকে ফাঁকে, যেখানে সবুজ বাতাস
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে নীল আকাশ থেকে আর
মার্বেল গাছগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত ?
সে দেশের ঠিকানা তুমি জান কি ?   আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই
দেশেই।

সেখানকার বাড়িটা তোমার জানা আছে যার বিরাট ছাদটা
দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো স্তম্ভের উপর, যার সুসজ্জিত হলঘর
আর উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠগুলো নির্জনতায় স্তব্ধ হয়ে আছে আর
মর্মর প্রস্তরের প্রতিমূর্তিগুলো তোমারই পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে ?
তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি সেখানেই যাব, সেই দেশেই যাব।
সে দেশের পথ তুমি জান কি ?
চারদিকের বড় বড় পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে কুয়াশাঘেরা পথগুলো
এঁকেবেঁকে চলে গেছে, যেসব পাহাড়ের গুহায় প্রাচীন ড্রাগন
বাস করে, কত ঝর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়ে যাদের মাথা থেকে।
সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে আমরা সেখানে সেই দেশেই যাব প্রিয়তমা।

নিয়তির গান (Parzenlied)

Es furchte die Gotter

মানবসন্তানদের অবশ্যই ভয় করে চলতে হবে দেবতাদের।
কারণ দেবতাদের শাশ্বত হাতেই আছে আইনকানুনের
যত সব অনুশাসন যা তাঁরা ইচ্ছামত প্রয়োগ করতে পারেন।
যে সব মানুষকে দেবতারা তুলে দেন উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে
সেই সব মানুষরা থাকে আরো ভয়ে ভয়ে, কারণ
সেই শিখরের উপর যেখানে দেবতাদের ভোজসভা বসে সেখানে
আছে বড় বড় মেঘের খাড়াই পাহাড় আর তার মাঝে মাঝে আছে

সীমাহীন শূন্যতা যেখানে একটু কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলেই
মানুষকে পড়ে যেতে হবে তলিয়ে যেতে হবে সীমাহীন অন্ধকার
আর শূন্যতার মাঝে।

অথচ দেবতারা অবলীলাক্রমে এক মেঘের পাহাড় থেকে
আর এক পাহাড়ে যাওয়া আসা করেন, সোনার টেবিলে
অনন্তকাল ধরে চলে তাঁদের ভোজসভা।
এইসব দেবতারা কোন মানুষকে ভালবাসলেও তার
বংশধরদের পরে চিনতে পারেন না, ভালবাসেন না।
এ কথা নিয়তির, নিয়তির এ গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত
হয়ে চলেছে পাহাড়ে পর্বতে আবহমান কাল হতে।

রোমক শোকগাথা—১ (Romische Elegien)

Froh empfind cih mich nun

চিরায়ত সাহিত্যের এই উদার পটভূমিতেই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করি আমি,
সবচেয়ে আনন্দ পাই, অতীত ও বর্তমান একযোগে কথা কয় যেন।
হোরেসের কথামত এ গ্রন্থের পাতা উল্টে যাই আমি রোজ,
পাই নূতন নূতন আস্বাদন। কিন্তু সারারাত আমাকে কাটাতে হয়
আমার প্রিয়তমার নিবিড়তম সাহচর্যে, যে সঙ্গসুখে হয়ত কোন
উপদেশ বা জ্ঞান অর্জন করি না, কিন্তু তাতে দ্বিগুণীকৃত হয়
আমার আনন্দের আবেগ। আমি যখন আমার প্রিয়তমার
মর্মরপ্রস্তরসন্নিভ সুন্দর বক্ষস্থল আর নিতম্বের উপর হাত বুলিয়ে দেখি
তখনও আমি অনেক কিছু শিক্ষা পাই, অতীতের অসংখ্য সুন্দরী
নারীর সঙ্গে তাকে তুলনা করি, তার অঙ্গলাবণ্যের মেদুর স্পর্শে
আমি পাই এক অগ্রপ্রসারী অনুভবের ব্যাপকতা।
আমি তার আলিঙ্গনের নিবিড়তার মাঝে কবিতা লিখি,
আমার কবিতা সুন্দর হয়ে ওঠে তার দেহ সৌন্দর্যের ছোঁয়ায়।
কখনো বা ঘুমিয়ে পড়ি তার বুকের উপর মাথা রেখে।
দিনের বেলায় আমার প্রিয়তমার সময় না হলেও সারাটি রাত
এইভাবে সঙ্গ ও সেবা দান করে চলে আমাকে সে।

দেখতে দেখতে গভীর হয়ে আসে নিশীথ রাত্রি, ম্লান হয়ে আসে
আমার বাতির আলো, আর সেই রহস্যময় নৈশ অবকাশে
আমার মন চলে যায় প্রাচীন রোমের সুদূরে আর তখনি
সহসা মনে হয় আমার এই কালোত্তীর্ণ সুন্দরী প্রিয়তমাই হয়ত বা
প্রাচীন রোমের সেই কর্মক্লান্ত ত্রয়ীশাসকদেরও সঙ্গ ও সেবা দান
করত ঠিক এইভাবে।

রোমক শোকগাথা—২

Herbstilick lenchtet die Flamame

এই সান্ধ্য আগুনের কাঠগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগেই
এসে হাজির হবে আমার প্রিয়তমা, বৎসরের অফুরাণ আনন্দের
উত্তাপে উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের সেই নৈশ মিলনকাল।
আমাদের সেই মিলনশয্যা ছেড়ে পরদিন সকালেই চলে যাবে
আমার প্রিয়তমা, কিন্তু তার যাবার সময় নির্বাপিত অগ্নির
ভগ্নস্তূপে জ্বলে উঠবে আবার নূতন এক অগ্নিশিখা,
নির্বাপিতপ্রায় আনন্দাগ্নির প্রায়ান্ধ শীতলতায়
আবার জেগে উঠবে প্রাণমাতানো আনন্দের উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা।

রোমক শোকগাথা—৩

Zunde min Licht an knabe

বাতিটা জ্বালিয়ে দাও হে বালক, অবশ্য এখনো
দিনের আলো আছে, সন্ধ্যে হতে এখনো আধঘণ্টা বাকি আছে,
বাড়িগুলোর ওধারে সূর্য ঢাকা পড়লেও পাহাড়গুলোর মাথা থেকে
এখনো সরে যায়নি সূর্যরশ্মি।
না না, জানালার কপাটগুলো এখনি বন্ধ করো না, শুধু
বাতিটা জ্বালিয়ে দাও, এখনি এই মুহূর্তে বাতি জ্বালাও।
আমার প্রিয়তমা সন্ধ্যে হলেই আজ এসে পড়বে।
হ্যাঁ, ঠিক সে আসবে, ইতিমধ্যে হে আমার বাতি,
রাত্রির উজ্জ্বল দূত, সে না আসা পর্যন্ত আমাকে সান্ত্বনা দেবে তুমি।

প্রিয়তমার সান্নিধ্য (Nabe des geliebten)

Ich denke deirm

সূর্যের আলো যখন চকচক করতে থাকে সমুদ্রের ঢেউএর উপর
তখন তোমার কথা মনে পড়ে, যখন ঝর্ণার জলধারায়
প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে চাঁদের আলো, তখনো মনে পড়ে তোমার কথা
ধূসর ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে যখন সুদূরের পথরেখা
তখন তার মধ্যে আমি তোমাকেই দেখি, আমি তোমায় দেখি
যখন গভীর নিশীথে সংকীর্ণ কোন সাঁকোর উপর
কাঁপতে থাকে কোন চলমান পথিক।
ক্ষুব্ধ গর্জনে যখন ফেটে পড়ে কোন উত্তাল ঢেউ তখন
যত দূরেই থাক না তুমি মনে হয় আমি তোমার কাছেই আছি,
মনে হয় আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা।
মাঝে মাঝে আমি চলে যাই নির্জন বনপথে, তার সুনিবিড় সুপ্রাচীন
স্তব্ধতার মাঝে আমি শুনতে পাই কত না বলা কথা।
তুমি যত দূরেই থাক না, আমি তোমার কাছে কাছেই থাকি,
তুমিও আমার কাছে কাছেই থাক।
এখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে, একটু পরে তারা উঠবে আকাশে,
তারারা কিরণ দেবে আমাকে, যদি তুমি এখন এই মুহূর্তে
নেমে আসতে আমার কাছে, থাকতে আমার কাছেই।

পরিবর্তনের মাঝে অপরিবর্তনীয় (Dauer in Wechsel)

Hiel ta diesen fruhen Segen

হায়, মাত্র আর একটা ঘণ্টা যদি বাঁচিয়ে রাখতে
এই সৌন্দর্যের সজীব সমারোহকে। কিন্তু হায়,
নিদাঘের উত্তপ্ত ঝড় মুহূর্তে ঝরিয়ে দেবে সব ফুলগুলোকে।
ফুল ঝরে গেলেও গাছের যে সবুজ পাতাগুলো ছায়া দান
করবে আমায় সেই সব পাতাদের দেখেও কিছু আনন্দ পাব আমি।
শরতে যখন এই সব পাতারাও বিবর্ণ হয়ে উঠবে তখন
আবার কোন ঝড় এসে ঝরিয়ে দেবে ওদের।

যদি তুমি ফল পেতে চাও গাছ থেকে তাহলে দেরি করবে না।
তাড়াতাড়ি করো, কারণ এ ফল বেশীদিন থাকবে না,
পেকে গেলেই ঝরে পড়বে, আবার জন্মাবে নূতন ফল।
এ বন এ বাগান ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে ঋতুতে ঋতুতে।
এই সব গাছ স্নিগ্ধশ্যাম এক নূতন শ্রী নূতন শোভা
ধারণ করে প্রতিটি বর্ষায়।
যেমন ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে নদীর জল, একই নদীতে
তুমি কখনই সাঁতার কাটতে পার না দুবার। শুধু নদী কেন,
তুমি নিজেও ত বদলে যাচ্ছ, যে সব সৌধ যে সব প্রাসাদ
একদিন পাহাড়ের মতই অটল মনে হত তাদের রূপ আজ
বদলে যাচ্ছে তোমার পরিবর্তনশীল চোখের দৃষ্টিতে।
তোমার যে ওষ্ঠাধর একদিন চুম্বন স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত,
তোমার যে পা একদিন পাহাড়ের উপর অটল
সাহসে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকত তারা আজ নেই।
যে হাত তোমার একদিন পরের কত উপকার করত
মঙ্গল সাধন করত অকাতরে তা আজ নেই, এমন কি
তোমার দেহাবয়বও বদলে গেছে অনেকখানি।
এখন যেন তুমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, অন্য দেহ, অন্য মন।
এখন তোমার শুরু আর শেষ সব একাকার হয়ে যাক,
তুমি খুব দ্রুত এইভাবে বদলে যাও, তবে কাব্যকলার
অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে ধন্যবাদ দাও, এই পরিবর্তমান জগৎ ও জীবনের
মাঝে যা কিছু অপরিবর্তনীয় যা কিছু অক্ষয় তাকে তুলে ধরে রাখেন তিনি
চিরসুন্দর করে রাখেন তিনি যুগ যুগ ধরে তোমার অন্তরাত্মাকে
আনন্দ দান করার জন্য।

পেয়েছি (Gefunden)

Ict ging on walde

নির্জন বনভূমির মাঝে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমি
অথচ কোন কারণ ছিল না, বিশেষ কোন কিছু চাইছিলাম না।

একটি ছায়াঘেরা কুঞ্জে ছোট্ট ফুল দেখছিলাম আমি,
সন্ধ্যাতারার মত জ্বল জ্বল করছিল ফুলটা, যেন
একজোড়া সুন্দর চোখ চেয়ে আছে আমার পানে উজ্জ্বলতম দৃষ্টিতে।
ফুলটা আমি ছিঁড়তে গেলে ফুলটা বলল আমায়,
আমাকে তুমি ছিঁড়ে ফেললেই ত শুকিয়ে যাব আমি।
আমি তখন শিকড় সমেত গোটা ফুল গাছটাকে উপড়ে
আমার সুন্দর বাগানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম।
সে জায়গাটাও বেশ নির্জন এবং গাছটাতে এখন ফুল ফোটে।

উৎস ও রূপান্তর (Selige Schnsucht)

Sagt es niemad, nur dien weisen

একথা একমাত্র বিজ্ঞ ছাড়া আর কাউকে বলো না,
কারণ সাধারণ মানুষ একথা শুনলে বিদ্রূপ করবে,
বিদ্রূপ করবে আমাকে যদি বলি আমি শুধু তাদেরই প্রশংসা করি
যারা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চায়।
মিটমিটে বাতিজ্বলা প্রেমঘন যে নিশীথে তোমার জন্ম হয়
যে নিশীথে তুমি জন্মদান করো তোমার সন্তানকে সেই নিশীথে
স্বল্পায়িত দীপালোকে কত আশঙ্কা ভিড় করে আসে
আজ তোমার মনে।
তুমি কিন্তু এই নিশীথ রাত্রির ছায়ান্ধকারে বসে থাকতে চাও না,
তুমি চাও আরও উপরে উঠতে, তুমি চাও আরও উন্নত মিলন।
কোন দূরত্ব অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না তোমার পথে,
মোহমুগ্ধ উদ্‌ভ্রান্তপ্রাণ পতঙ্গের মত তুমি উড়ে যাও,
উড়ে যাও শুধু জ্বলে পুড়ে মরার জন্য।
আসল সত্যটা শেষ পর্যন্ত না জানা পর্যন্ত তোমার কোন
রূপান্তর হয় না, কোন পরিবর্তন হয় না,
এক অবাঞ্ছিত অতিথির মত ঘুরে বেড়াও এই অপরিচিত পৃথিবীতে।

কাব্য ও রূপাবয়ব (Lied and Gebilde)

Mag der Grieche Seinen ton

কোন এক গ্রীক শিল্পীকে কাদামাটি দিয়ে একটি মূর্তি গড়তে দাও,
তার সেই শিল্পকর্ম থেকে যত খুশি আনন্দ পেতে দাও তাকে।
কিন্তু আমি সে আনন্দ পেতে চাই না। আমি ইউফ্রেতিস নদীতে
হাত ডুবিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেরিয়ে লাভ করব যত সব
ক্ষণভঙ্গুর আনন্দ।

এইভাবে যখন শীতল হয়ে উঠবে আমার অন্তরাত্মার উত্তাপ
তখন আপনা থেকে গান বেরিয়ে আসবে আমার কণ্ঠ থেকে।
সে গান কোন কবির হাতে পড়লে নিরবয়ব জলও হয়ে উঠবে মূর্ত।
ঐ দেখ প্রিয়তমা, ঐ সব সবুজ গাছের শাখায় কত ফল ঝুলছে,
ঝুলছে কত দিন ধরে আর যে শাখাগুলো তাদের কোলে আশ্রয় দিয়েছে
ফলগুলোকে সেই সব শাখারা শুধু হাওয়ায় দুলছে।
সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে আমার বাদামী অন্তরটা ঐ সব ফলের মতই
ফুলে উঠেছে পেকে উঠেছে ভিতরে ভিতরে।
সে অন্তর আমার বাতাসের স্পর্শ চায়, চায় স্বর্গের মুখ দেখতে।

প্রাচীন বিজ্ঞদের উক্তি : অর্ফিক (Urworte, Orphich)

Wie the dem Tag

নিয়তি

যেদিন তুমি প্রথম এই পৃথিবীতে এসেছিলে তখন গ্রহনক্ষত্ররা
যেভাবে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অভিবাদন জানিয়েছিল সেইভাবেই জীবন
শুরু হয়েছে তোমার। সেই সব গ্রহনক্ষত্রদের অবস্থানজনিত
আইনের দ্বারা অনুশাসিত হচ্ছে তোমার জীবন।
সিবিন ও প্রাচীন ভবিষ্যদ্বক্তারা বলেছেন নিয়তির এই
অনুশাসন থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। কোন কাল কোন শক্তি
তোমার জন্মদিনে গড়ে ওঠা ভাগ্যের কোন পরিবর্তন করতে পারবে না।

দৈব

তথাপি এক পরিবর্তনশীল শক্তি আমাদের কাছে কাছে থেকে

নিয়তির কঠোর বিচার ও অনুশাসনকে আনন্দে পরিণত করে তোলে
আমাদের। হে দৈব, তুমি একা থাক না, মানুষের সমাজে থেকে
তুমি খাপ খাইয়ে নাও সবার সঙ্গে। জীবনে আমাদের
কোন কোন ঘটনা হয় অনুকূল কোন কোন ঘটনা হয় প্রতিকূল।
আমরা কেউ কেউ ঘটনা নিয়ে পুতুলের মত খেলা করি।
হে দৈব, তুমি হচ্ছ সেই আলোক শিখা যার পথ চেয়ে
বসে আছে আমাদের অসহায় জীবনের বাতিগুলো।

প্রেম

এই প্রেম কখনো মরে না, স্তব্ধ হয় না একেবারে।
মনে হয় এ প্রেম পাখির মত ডানা মেলে উড়ে যাবে আকাশ থেকে,
সমস্ত বসন্ত দিন জুড়ে আমাদের বুক ও মাথার চারদিকে উড়তে থাকে।
কখনো কখনো সে প্রেম জানিয়ে যায়, আমাদের দুঃখ দেয়,
কিন্তু একেবারে পালায় না, আবার ফিরে আসে আর তখন সকল বেদনার
অবসানে অফুরন্ত আনন্দের চঞ্চল আবেগে বিকম্পিত হয়ে ওঠে
আমাদের অন্তর। অনেক অন্তর অনেককে বিলিয়ে দেয় নিজেদের,
কিন্তু যারা মহান তারা হয় এককেন্দ্রিকতায় অবিচল।

প্রয়োজন

আবার কেউ গ্রহনক্ষত্রের বিধান, নিয়তির অনুশাসন আর নিয়ন্ত্রণ।
আমাদের ইচ্ছারাও নিয়তির দাস, তারা যন্ত্রবৎ নিয়ন্ত্রিত হয়
নিয়তিজনিত প্রয়োজনের দ্বারা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্য নেই।
ফলে যা আমাদের অতি আকাঙ্ক্ষিত, যা আমরা অন্তর দিয়ে
ভালবাসি তাদের আমাদের অন্তরই প্রত্যাখ্যান
করতে বাধ্য হয় অবস্থার চাপে। তার ফল এই হয় যে
আমরা যারা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করি এবং সেই মত চলি
তাদের অবস্থা হয়ে ওঠে আরও খারাপ, আরও দুঃখজনক

আশা

আমাদের চারদিকে ঘিরে থাকা পিতলের নিশ্ছিদ্র দেওয়ালে
যে কঠিন দরজা আছে সে দরজার তালাও খোলা যেতে পারে।
সুদূর প্রাচীনকাল হতে পাহাড়ের মত অচল অটল
হয়ে দাঁড়িয়ে আ ঐ দেওয়াল আর দরজা

তার উপর সচল এক সত্তা অবাধে ঘুরে বেড়ায়।
মেঘ বৃষ্টি আর কুয়াশার মধ্য দিয়ে আমাদের তুলে নেয় অনেক উপরে।
আমাদের উড়ে চলার পাখা দেয়।
শুভ্র সমুজ্জ্বল পদ্মের মত শান্ত দীপালোক বা দূরাগত
নক্ষত্রালোকের মত হৃদয় হতে বেরিয়ে আসে প্রেমের আলো।
প্রাচীন নার্সিসাস ফুল ফুটে ওঠে বাগানে। একমাত্র
এই ফুলই হয়ত জানে সে কার জন্য ফুটছে।
ক্রমে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকারে।
শান্ত আলোকচ্ছটা বিকীরণ করে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠছে
নির্জন আকাশে।
অন্ধকার আর সন্ধ্যা কুয়াশায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে অথবা
অস্পষ্ট দেখাচ্ছে সব কিছু। লেকের কালো জল অন্ধকারে
কালো হয়ে উঠছে আরও।
এবার দূর আকাশে চাঁদের আলো দেখতে পাচ্ছি।
জলের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ছিপছিপে চেহারার
উইলো গাছের শাখাগুলো উড়ন্ত কুন্তলচূর্ণের মত বাতাসে উড়ছে।
আর তাতে চাঁদের আলোটা কাঁপছে আর কম্পমান
সেই আলোছায়ার খেলা দেখতে দেখতে অন্তরে এক
প্রশান্তি নেমে আসছে আবার যা আগে অনুভব
করিনি কখনো।

আত্মজীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৭৪৯ সালের ২৮শে আগস্ট দুপুরের ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এসেছিলাম এই পৃথিবীতে। এসেছিলাম ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরের একটা ঘরে। আমার জন্মলগ্নে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি এমন কিছু খারাপ ছিল না। সূর্য বা রবি ছিল কন্যা রাশিতে। বৃহস্পতি ও শুক্রের দৃষ্টি ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। বুধও বক্রী ছিল না। শনি ও মঙ্গল ছিল উদাসীন। আমার জন্মের উপর একমাত্র চন্দ্রের দৃষ্টি ছিল বক্রকুটিল, যে দৃষ্টির বক্রতা শোধরায়নি কখনো আমার সারা জীবনের মধ্যে।

আমরা থাকতাম আমার বাবার মার বাড়িতে। আমার ঠাকুরমাকে আজও মনে পড়ে আমার। উনি থাকতেন একতলায় পিছনের দিকে একটা বড় ঘরে। সুন্দর রোগা রোগা চেহারার এক মহিলা। সব সময় সাদা ফিটফাট পোষাক পড়ে থাকতেন। আমি আর আমার ছোট বোন প্রায়ই তাঁর চেয়ারের কাছে খেলা করতাম। অসুস্থ অবস্থায় তিনি বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমরা তাঁর বিছানায় উঠে খেলতাম। কিন্তু তিনি বিরক্ত হতেন না কখনো।

শৈশবের অনেক দুষ্টুমির মধ্যে একদিনের একটা দুষ্টুমির কথা মনে আছে। একবার একটা মাটির বাসনপত্রের এক মেলা বসে শহরের শেষপ্রান্তে। সেখান থেকে আমাদের রান্নাঘরের জন্য অনেক মাটির থালা ও নানা রকমের পাত্র কেনা হয়। একদিন বিকালে বাড়িতে খেলার কিছু না পেয়ে একটা মাটির প্লেট রাস্তায় ছুঁড়ে দিই। মাটির পাত্রটা বাঁধানো রাস্তায় পড়ে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। আমি আনন্দে হাততালি দিতে লাগলাম। আমার সে আনন্দে আমার এক প্রতিবেশীও আনন্দ পেলেন। আমি চীৎকার করে উঠলাম, 'আর একটা।' সত্যিই আর একটা মাটির পাত্র এনে এইভাবে ভাঙ্গলাম। এইভাবে আমার প্রতিবেশী দর্শক ভণ অকসেনস্টাইনকে খুশি করার জন্য একে একে সব মাটির পাত্রগুলো সেদিন ভেঙ্গে ফেললাম আমি। সেদিন যেন শুধু ভাঙ্গার আনন্দে মত্ত ও আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম আমি।

আমাদের বাড়ির সামনের দিকে ছিল বড় রাস্তা আর পিছনের দিকে ছিল প্রতিবেশীদের বড় বাগান। বাড়ির তিনতলার ঘরটাকে বলা হত বাগানবাড়ি।

কারণ সে ঘরের প্রতিটি জানালার ধারে ধারে অনেক রকম লতা ও চারা গাছ টবের উপর সাজিয়ে রাখা হত। আমি ছোটবেলায় সেখানে বসে আমার পড়া তৈরি করতাম। আরো বড় হয়ে আমার কোন খুশির ভাব এলেই আমাদের তিনতলার সেই বাগান ঘরটাতে চলে যেতাম। কিন্তু মনে কোন বিষাদ জমলে সে ঘরে কখনো যেতাম না। জানালার ভিতর দিয়ে প্রসারিত আমার দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে চলে যেত শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এক সবুজ প্রান্তরে। আজ বেশ বুঝতে পারছি এই ঘরটাই আমার শিশুমনে প্রথম এনে দেয় নিভৃত চিন্তার প্রেরণা। আর কিছু অস্পষ্ট অব্যক্ত কামনার বাধাবন্ধহীন ব্যাকুলতা। আমি স্বভাবতই গভীরতাপ্রিয় এবং ভাবুক প্রকৃতির। এই ঘরে এলেই আমি যেন আমার সে প্রকৃতিকে খুঁজে পেতাম।

ছেলেবেলায় রাত্রিবেলাটা আমার ভারী খারাপ লাগত। ছায়া ছায়া বিষণ্ণতায় ভরা পুরনো আমলের বাড়িটা রাত্রির অন্ধকারে কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাত। তার উপর তখনকার দিনে ছেলেদের ভয় জয় করতে শেখাবার জন্য রাত্রিবেলায় একে একে শোয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমার বাবা মাও সেই ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের জন্য। এক একদিন শোবার জন্যে একা ঘরে ভয় লাগতেই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতাম। বাবা বকতেন। তখন মা একট ফন্দী আঁটেন। তখন পীচফল পাকার সময়। আমার মা বলেন যে কোন ভয় না করে একা ঘরে ঘুমোতে পারবে তাকে পীচ ফল বেশী করে দেওয়া হবে রোজ। এইভাবে ফলের লোভে পুরস্কারের লোভে ভয় জয় করতে শিখেছিলাম আমরা।

কেন জানি না আমার বাবা ছিলেন রোমক সংস্কৃতির উপাসক। ইতালীয় ভাষা, ইতালীয় গান, ইতালীয় শিল্পকলা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অগাধ। আমাদের বাড়ির একটা ঘর ভর্তি ছিল ইতালীয় ছবিতে। জিওতিনাৎসী নামে একজন প্রবীণ ইতালীয় সঙ্গীত শিক্ষক আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমরা গান শিখতাম। আমার মা ক্লেভিকর্ড বাজাতে শিখতেন। বিয়ের পর মাকেও গান শিখতে হয় বাবার জেদে পড়ে।

আমার ঠাকুরমা মারা যাবার পর বাড়িটা আমূল সংস্কার সাধন করলেন। পুরনো বাড়িটা ভেঙে তার জায়গায় গড়লেন নূতন ধাঁচের নূতন বাড়ি আর আমাদের পাঠালেন পাবলিক স্কুলে। আমি যেন নূতন এক জগতে এসে পড়লাম। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রথম

মেলামেশা শুরু হলো আমার। আগের থেকে অনেক বেশী স্বাধীনতার সঙ্গে শহরের বিভিন্ন এলাকাগুলো ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লাগত যেন নদীর সেতুর উপর দাঁড়িয়ে নদীর স্রোত আর মালবোঝাই নৌকোর আনাগোনা দেখতে। নিচেকার নদীর স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেতুর উপর দিয়ে অবিরাম চলে যেত জনস্রোত। কৌতূহলী হয়ে আমি দুদিকেই তাকাতাম। মাঝে মাঝে ঘিঞ্জী বাজারের নোংরা পথ পার হয়ে রঙীন জলছবি কিনে আনতাম। আবার মাঝে মাঝে চলে যেতাম রোমার হিলে। তবে আর একটা জিনিস ভাল লাগত আমার। তা হলো উঁচু উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পুরনো কালের দুর্গ, বড় বড় বাড়ি আর বাগান দেখতে। অদেখা অচেনা কুহেলিঘেরা অতীতের প্রতি কেমন যেন এক সকরুণ মমতা গড়ে উঠেছিল আমার মনে। কিছু কিছু রূপকথা আর ইতিবৃত্ত শুনে সে মমতা বেড়ে উঠেছিল। আমরা শুনেছিলাম শার্লেমেদের রূপকথা, শুনেছিলাম কেমন করে হ্যাপস রুডলফ তার বীরত্ব আর সাহসিকতার দ্বারা শান্তি এনেছিল অশান্তির মাঝে। চতুর্থ চার্লস ও স্বর্ণবলদের কথাও শুনেছিলাম আমরা।

আমার মন কিন্তু পুরোপুরি অতীতাশ্রয়ী ছিল না। ম্যানবজীবনের বিচিত্র অবস্থা যথাযথভাবে দেখার একটা আগ্রহও ছোট থেকে গড়ে উঠেছিল আমার মনে। ধনীর প্রাসাদ থেকে শুরু করে গরীবের কুঁড়ে আর কলকারখানাসংলগ্ন শ্রমিকবস্তীগুলো ঘুরে মানবজীবনের যে সব ছবি আমি পেয়েছিলাম সে ছবির মধ্যে কোন সৌন্দর্য ছিল না, কোন গুরুত্ব ছিল না। তাছাড়া সে সৌন্দর্য বা গুরুত্ব আমি দেখতেও চাইনি। তবু বলব অকৃত্রিম অকপট স্বাভাবিকতায় ভরা সে ছবির একটা নিজস্ব গুরুত্ব একটা অন্তর্নিহিত মূল্য ছিল আমার ক্রমোদ্‌ভিন্ন ও ক্রমাত্মপ্রকাশমান শিশুমনের কাছে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়ির বাইরে এক অভিষেক উৎসব চোখে পড়ে আমার। আমরা ছেলেমানুষ বলে দারোয়ানরা দয়া করে আমাদের ভিতরে কিছুদূর ঢুকে দেখতে দেয়। এত জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের ঘনঘটা জীবনে কখনো দেখিনি। তারপর বাড়িতে লোকের মুখে শুনেছিলাম আর একটি অভিষেক উৎসবের কথা। সে অভিষেক হলো সপ্তম চার্লসের অভিষেক যে অভিষেক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন পরমাসুন্দরী সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা। সে উৎসবে যেমন সব পুরুষদের দৃষ্টি দুর্বার বেগে গিয়ে পড়েছিল মেরিয়া থেরেসার

উপর তেমনি সব নারীদের দৃষ্টিও কেড়ে নিয়েছিল সর্বাঙ্গসুন্দর চার্লসএর দুটি অপরূপ ভাসা ভাসা নীল চোখ।

যে কোন মেলা ও উৎসব দেখতে ভাল লাগত আমার। যেমন সেটি বার্থোলোমিউর মেলা আর পাইপার কোর্ট উৎসব। পাইপার কোর্ট উৎসব অনুষ্ঠিত হত শহরের যত সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের দ্বারা অতীতের একটি দিনের স্মৃতিরক্ষার্থে। এই দিনটিতে ব্যবসায়ীরা একযোগে এক আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারী চাঁদা তোলার রীতির অবসান ঘটায়। সম্রাট তাদের দাবী মেনে নেন। এই উৎসব আমার খুব ভাল লাগত। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষদের কীর্তি-কলাপগুলোকে আমাদের চোখের সামনে যেন অবিকল মূর্ত করে তুলত। এ উৎসবে নিষ্প্রাণ অতীত হয়ে উঠত যেন রঙে রসে জীবন্ত।

আমাদের বাড়িটা নূতন হয়ে ওঠার পর যে জিনিসগুলো সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করত আমার তা হলো বাবার সংগৃহীত বই আর ছবি। বিভিন্ন ধরনের বই সংগ্রহ করার বাতিক ছিল বাবার। তার মধ্যে ছিল চিরায়ত লাতিন সাহিত্য, ইতালীর কবিদের রচনা, ট্যাসোর সমগ্র রচনা, আইনের বই, অভিধান আর বিজ্ঞান ও কলার বিশ্বকোষ। এছাড়া কিছু সমালোচনাগ্রন্থও ছিল। তবে প্রতি বছরই বাবা কিছু আইনের বই কিনতেন।

আগে আমাদের পুরনো বাড়িটার দোতলার ছায়ান্ধকার যে ঘরখানায় দামী ছবিগুলো সাজানো থাকত সে ঘরে মোটেই মানাত না ছবিগুলোকে। নূতন বাড়ির একটা চকচকে ঝকঝকে ঘরে যখন নূতন করে সাজানো হলো ছবিগুলো তখন তাদের সৌন্দর্য যেন অনেকগুণে বেড়ে গেল আগের থেকে। বড় বড় ছবিগুলো সব ছিল কালো ফ্রেমে আঁটা। তবে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বাবার একটা বিশেষ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি বলতেন, বড় বড় শিল্পীর আঁকা পুরনো ছবি ভাল, কিন্তু বর্তমান কালের শিল্পীদের আঁকা ছবির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্তমানকালের এই সব ছবিই একদিন কালোত্তীর্ণ-মর্যাদা লাভ করে চলে যাবে অতীতের মধ্যে। বাবা বলতেন শিল্প সাহিত্য বা যে কোন বস্তুর ক্ষেত্রে অতীতের বলেই যে কোন বস্তু ভাল হতে হবে তার কোন মানে নেই।

এই নীতির বশবর্তী হয়েই বাবা হার্ত, ট্রটম্যান, বেমব্রাঁ, স্কিৎস প্রভৃতি ফ্রাঙ্কফোর্টের নামকরা শিল্পীদের বাড়িতে এনে ছবি আঁকাতেন। তাই দিয়ে ঘর সাজাতেন।

কিন্তু একবার একটি অসাধারণ ঘটনা আমার মনের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। আমার শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। ১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে লিসবন শহরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ঘটে যায় শহরে তা কল্পনাতীত আর তার খবর এক ব্যাপক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে সারা ইউরোপের মধ্যে। এই ঘটনায় ষাট হাজার লোক নিহত হয়। অসংখ্য বাড়িঘর, চার্চ, অফিস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। চারদিকে ফেটে যাওয়া মাটির ভিতর থেকে ধোঁয়া ও আগুন বার হতে থাকে। অসংখ্য উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ ফেনায়িত করাল মুখ মেলে এগিয়ে আসে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় এবং রাজপ্রাসাদের একটা বড় অংশ গ্রাস করে ফেলে। এই ভূকম্পন আরো অনেক জায়গায় অনুভূত হয়। এই ভয়াবহ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে ধার্মিক দার্শনিক বিজ্ঞানী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষই ভয় পেয়ে যায়। পণ্ডিতরা এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যাই করতে পারে না। আমার বালকমনেও এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এ ঘটনা। আমি কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে ঈশ্বরকে কেন ধর্মশাস্ত্রের প্রথমেই বিশ্বের পরম স্রষ্টা সংরক্ষক ও পিতা হিসাবে দেখানো হয়েছে যিনি মানুষের ভাল মন্দ কর্মের বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তির বিধান করে থাকেন সেই ঈশ্বর ভালমন্দ এতগুলি মানুষকে কেন নির্বিচারে এই ব্যাপক ধ্বংসের কবলে ঠেলে দিলেন। আমি ত দূরের কথা ধর্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরাও এর কারণ খুঁজে পেলেন না অনেক চেষ্টা করেও।

ওল্ড টেস্টামেণ্টে যে ক্রুদ্ধ দেবতার কথা লেখা আছে পরের বছর গ্রীষ্মকালে একদিন সেই ক্রুদ্ধ দেবতার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম হঠাৎ। তিনি আমাদের দেখা দিলেন মত্ত ঝড়ের বেশে। আমাদের বাড়ির পিছন দিকের বাগান থেকে বজ্রবিদ্যুৎসহ এক প্রচণ্ড ঝড় ছুটে এল সহসা। লণ্ডভণ্ড করে দিল আমাদের বাড়ির সাজানো ঘরগুলোকে। অনেক জানালার কাচ ভেঙে দিল। সে ঝড়ের প্রচণ্ডতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ভয়ে আমরা ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছিলাম। কিন্তু বাবা সেগুলো জোর করে খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জলে ভেসে যেতে লাগল ঘরগুলো। সত্যিই আমার বাবার মনটা ছিল শক্ত, খুব মজবুত। কোন ঘটনার আঘাতেই সে মন ভাঙতে চাইত না। বাবা চাইতেন আমাদের মনও বাল্যকাল থেকে অমনি শক্ত ও মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে। অমনি করে সব ভয় জয় করতে পারবে।

সেকালে শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়া ভাল ছিল না দেশে। শিক্ষাদানের

নামে সর্বত্রই চলছিল আত্মম্ভরিতার প্রচার। আমার বাবা তাই আমার স্কুল জীবনেই বাড়িতে নিজে আমাদের অনেক জিনিস পড়াতেন। তিনি বলতেন যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী তাঁর কাছ থেকে সেই বিষয় শিখতে হবে।

পড়াতে গিয়ে আমার সহজাত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতে লাগলেন বাবা। আমার বোনকে বাবা যখন ইতালি ভাষা ও সাহিত্য পড়াতেন তখন আমি ঘরের এক কোণে বসে তা শুনে অনেক কিছু শিখে নিতাম। বাবা স্পষ্ট একদিন আমাকে বললেন, আমি যদি তোর মত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি পেতাম তাহলে আরো বড় হতাম জীবনে।

বাবা লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিদ্যায় পাশ করেন। বাবা বলতেন তিনি জীবনে যা কিছু শিখেছেন প্রচুর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে শিখেছেন। অপরিসীম একাগ্রতা আর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করে শিখেছেন। তাঁর সহজাত গুণ আর প্রতিভা বলে নাকি কিছু ছিল না।

আমার বাবা ও স্কুলের শিক্ষকরা যা পড়াতেন অল্প সময়ের মধ্যেই তা আয়ত্ত করে ফেলতাম আমি। কিন্তু একটা বিষয় আমার পড়তে ভাল লাগত না। তা হলো ব্যাকরণ। আমার মতে ব্যাকরণের নিয়ম কানুনগুলো মোটেই নির্ভর-যোগ্য নয়, কারণ সেগুলো ব্যতিক্রমে ভরা এবং সেগুলো ব্যাপক সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে শিখতে হয়। তাই আমার তখনকার কোন লেখার মধ্যে কিছু কিছু ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকলেও ছন্দ, অলঙ্কার ও রচনালিখনে কোন ছেলে পেরে উঠত না আমার সঙ্গে।

বাবা একদিন আমায় বললেন আমার স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কলেজে যাব। তিনি আরো বললেন তাঁর মত আমাকেও লিপজিগে গিয়ে শিখতে হবে আইনবিদ্যা। অন্যান্য পিতার মত আমার পিতাও স্বভাবতই আশা করতেন তাঁর আরব্ধ কাজকে আমি শেষ করব, তাঁর মনের কোণে জমে থাকা গোপন স্বপ্নকে সার্থক করে তুলব। তিনি বললেন, লিপজিগ ছাড়া আমাকে যেতে হবে ওয়েৎসলার, র‍্যাটিসবন এবং তারপর ইতালি। ইতালি থেকে আসার পথে যেতে হবে প্যারিসে। তাঁর মতে ইতালি থেকে আসার পরে প্যারিস ছাড়া আর কোন জায়গা ভালই লাগবে না। কিন্তু কেন জানি না বাবা আমাকে একটা জায়গা যেতে নিষেধ করলেন। সে জায়গা হলো গটিনজেন। অথচ ঐ জায়গাটা যাবার খুব ইচ্ছা ছিল, আশা ছিল।

ইতালি দেশটার প্রতি বাবার কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল। সে

দেশের নদী সমুদ্র, পাহাড় প্রান্তর, বন উপবন, ভাষা সাহিত্য, শিল্প সব কিছুই যেন অনবদ্য অতুলনীয় ছিল তাঁর কাছে। স্বভাবত তিনি স্বল্পভাষী ও রাশভারি প্রকৃতির হলেও তিনি যখন আমার কাছে নেপলস শহরের বর্ণনা করতেন তখন কেমন যেন আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠত তাঁর নীরস অন্তর। তথাকথিত সেই ভূ-স্বর্গে সেই মুহূর্তে কল্পনার পাখা মেলে ছুটে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠত আমার বালকমন।

প্রতি রবিবার আমাদের এক সভা বসত। সভা মানে কবিতার আসর। আমরা কয়েকজন সহপাঠি মিলে একটি করে কবিতা লিখে আনতাম। আর তা একে একে পাঠ করতাম। ছন্দ ও অলঙ্কারে আমার কিছু জ্ঞান হয়েছিল। তাই আমার কবিতায় ছন্দপতন বিশেষ ঘটত না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, আমি যেমন আমার যে কোন লেখায় আনন্দ পাই তেমনি অন্য যে সব ছেলের ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে কোন জ্ঞান নেই তারাও তেমনি আনন্দ পায় নিজেদের লেখায়। তারা প্রত্যেকেই মনে করে তাদের আপন আপন লেখা সবচেয়ে ভাল। কিন্তু একটা ঘনটায় আমি খুব ব্যথা পেলাম। আমাদের এক সহপাঠি বন্ধু তার শিক্ষকের কাছ থেকে কবিতা লিখে এনে বলত, সেটা তার লেখা। সে তার লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনা করে অন্যায়ভাবে দাবি করত আপন শ্রেষ্ঠত্বের। অবশেষে আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম হতাশ হয়ে। কিন্তু আর একটি ঘটনায় আমি আবার ফিরে পেলাম আমার হারিয়ে যাওয়া আশা আর উৎসাহ। একদিন আমাদের শিক্ষকরা আমাদের মত যে সব ছেলেরা কবিতা লিখত তাদের নিয়ে এক কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে কিন্তু আমার কবিতাই সাধারণভাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করল।

সেকালে শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার ছিল না। পাঠ্যপুস্তক আর বাইবেল ছাড়া অন্য কোন বাইরের বই পড়তে পেতাম না আমরা। কিন্তু যে কোন ভাবে হাতে একটা বই পেলাম আমি। বইটা খুব ভাল লেগে গেল আমার। বইটা হলো ওভিদের, 'মেটামরফসিস' বা রূপান্তর। এ বইএর প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র ছবির মত ভাসতে লাগল আমার মনে। আমি অবসর পেলেই সে বইএর ছত্রগুলো আবৃত্তি করে ফেলতাম।

এরপর আরও কয়েকটা বই পড়ার সৌভাগ্য হয় আমার। যেমন ফেনেলনের 'টেলিমেকাস', ড্যানিয়েল দিফোর 'রবিনসন ক্রুসো'। ক্রুসো পড়ে মনে হলো ফলসেনবার্গ দ্বীপ কল্পনার সৃষ্টি নয়, তা বাস্তবে আছে। আর একখানা

বই আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তুলল। তা হলো লর্ড এ্যানসনের 'ভয়েজ রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড'। বাস্তব ঘটনা ও পরিবেশের সঙ্গে দেশীয় রূপকথার এমন অপূর্ব মিলন আমি আর কোথাও দেখিনি।

ঐ সময় আমাদের শহরে ছেলেদের জন্য বেশ কিছু মধ্যযুগীয় রূপকথার বই বিক্রি হতে থাকে। তরুণ ছেলেমেয়েদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ঐ সব বই। এই সব বইয়ের মধ্যে ছিল দি এমপারার অক্টেভিয়ান, দি ফেয়ার মেলুসিনা, দি ফোর সালয় অফ হাইম, দি ওয়ানডারিং জু'। সহজ ভাষায় লেখা এই সব বই পড়ে আমরা তার গল্পগুলো সহজেই বুঝতে পারতাম। অর্থাৎ এইভাবে দ্বিতীয়বার তাদের রস আস্বাদন করার সুযোগ পেলাম।

পড়াশুনোর আনন্দে বেশই বিভোর হয়ে ছিলাম আমি। কিন্তু বনভোজনের সময় হঠাৎ ঝড় এসে যেমন তার সব আনন্দ উপভোগ উড়িয়ে নিয়ে যায় মুহূর্তে তেমনি হঠাৎ অসুখ এসে ছিন্নভিন্ন করে দিল আমার সেই আনন্দকে। হঠাৎ একদিন জ্বর ও বসন্তরোগে আক্রান্ত হলাম আমি। বেশ কিছুদিন ভুগে যখন ভাল হলাম তখন দেখি পড়াশুনার দিক দিয়ে পেছিয়ে গেছি আমি। কিন্তু সবচেয়ে সমস্যার সৃষ্টি করলেন আমার বাবা। অসুখের দ্বারা আমার পড়ার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতি পূরণের জন্য তিনি আমায় রোজ দ্বিগুণ পড়ার কাজ দিতে লাগলেন। আমার শরীর তখনও খুব দুর্বল। আমার খুবই কষ্ট হচ্ছিল সে পড়ার কাজ করতে। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

দুঃখে যখনি অধৈর্য হয়ে পড়তাম আমি, অধৈর্যের পীড়নে যখন পীড়িত হতাম তখন নিজের মনকে নিজেই বোঝাতাম। তবে স্টইক সন্ন্যাসীদের কথা থেকে শেখা ও খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্বে পড়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নামক গুণটিকে সেই বয়সেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলাম আমি। সেই গুণই আমাকে সান্ত্বনা দিত যে কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে।

তবে বাবার এই শিক্ষাগত পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে আমরা ভাইবোনে চলে যেতাম আমাদের দিদিমার বাড়ি। আমাদের দিদিমা দাদামশাই দুজনে তখনো জীবিত ছিলেন। তাঁদের বাড়িটা ছিল আমাদের শহরেই ফ্রেডবার্গ স্ট্রীটে। পুরনো দুর্গের মত বাড়িটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। ভাল লাগত শুধু বাড়ির পিছনের দিকের বিরাট বাগানটা। সে বাগানের একদিকে ছিল ফুলের গাছ আর একদিকে ছিল শাকসব্জী আর ফলের গাছ। এর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ছিল জাম আর জামরুল

গাছ। গেলেই আশ মিটিয়ে ফল পেড়ে খেতাম গাছ থেকে। আমার দাদা-মশাই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবি। কিন্তু রোজ কোর্ট থেকে এসেই খোস্তা নিয়ে বাগানবাড়িতে চলে যেতেন। মালী থাকা সত্ত্বেও নিজের হাতে ফুলগাছ-গুলোর যত্ন নিতেন। সারা বাগানটা তদারক করে বেড়াতেন।

আর একটা কারণে আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম আমাদের দাদা-মশাইকে। সে কারণটি হলো এই যে তিনি ভবিষ্যতের সব কিছু বলে দিতে পারতেন। তিনি নাকি স্বপ্নে অনেক জিনিস আগে হতে জানতে পারতেন। একবার নিজের সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন দাদামশাই। তিনি দিদিমাকে বলেন, সরকারের আইনবিভাগের একটি পদ অল্পদিনের মধ্যেই শূন্য হবে আর সেই শূন্য পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হবেন। কিছুদিন পর দেখা গেল সত্যিই এক ভদ্রলোক মারা গেলেন সেই বিভাগে আর তাঁকেই সরকার সেই পদে বসাল। দাদামশাই একমাত্র দিদিমার কাছে বলেন তিনি নাকি স্বপ্নে একথা জানতে পারেন। আর একটি মৃত্যুর কথাও আগেই বলে দেন তিনি।

আমি একবার দাদামশাইএর বইখাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি খাতায় দেখি কি সব রহস্যময় কথা লেখা রয়েছে। আজ রাত্রিতে অমুক আমার কাছে এসেছিল। অমুক ছাড়া সবাই চলে গেল। এইভাবে কারো নাম না করে তিনি অনেক কথা খাতায় লিখতেন। তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমার দুই মাসী ছিল। আমাদের শহরের মাঝেই দুজনের বিয়ে হয়েছিল দু জায়গায়। এক মাসীর বাড়ি ছিল বাজারের কাছে ঘিঞ্জী জায়গায়। কিন্তু সে মাসী ছেলেবেলায় আমাদের বড় ভালবাসত। শুধু আমাদের নয়, পাড়ার অনেক গরীব ছেলেমেয়েদেরও সমানভাবে ভালবাসত মাসী। তাদের গা পরিষ্কার করে দিত। চুল আঁচড়ে দিত। কোলে পিঠে করে খেলা করত তাদের সঙ্গে।

আমার এক মাসীর বাড়িতে একটা ছোটখাটো গ্রন্থাগার ছিল। আমি একদিন সেখানে হোমারের এক গদ্যানুবাদ দেখতে পাই। কিন্তু তাতে ট্রয় জয়ের পূর্ণ বিবরণ পেলাম না। পেলাম শুধু বিকৃত রুচির কতকগুলি ছবি। ছবিগুলি দেখে তখন আনন্দ পেলেও এখন বুঝছি সেগুলি খুবই খারাপ ছবি। আমার মেসোমশাইকে কথাটা বলতে তিনি আমাকে ভার্জিল পড়ার কথা বললেন।

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম বিষয়েও আমাদের শিক্ষা দান করা হত। কিন্তু তখনকার দিনের প্রোটেস্টান্ট ধর্ম আমাদের মনকে তৃপ্ত করতে পারেনি। সে ধর্মের কথা ছিল শুধু কতকগুলো নীরস নীতিশিক্ষার কথা যার সঙ্গে আমাদের হৃদয় ও উপলব্ধির কোন সম্পর্ক ছিল না। এই জন্যই হয়ত ধর্মের ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছিল অনেক সম্প্রদায়। অনেক মত, অনেক পথ।

তবে আমি ধর্মের কথা বিভিন্নভাবে শুনেছিলাম তাতে আমার একটা কথা মনে হয়েছিল ঈশ্বর সম্বন্ধে। মনে হয়েছিল আমি ঈশ্বরকে খুঁজব প্রকৃতির মাঝে। আমি খুঁজব সেই ঈশ্বরকে যিনি একাধারে সারা বিশ্বের স্রষ্টা এবং পরিচালক, যে ঈশ্বরের মধ্যে নেই কোন ক্রোধ, বা রোষের প্রচণ্ডতা, আছে শুধু অফুরন্ত সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের স্রোতই বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে প্রকৃতির মাঝে খেলা করে চলেছে সর্বক্ষণ।

আমার মনে হয়েছিল যে ঈশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তিনিই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে কাজ করে থাকেন সেই ঈশ্বরই প্রকৃত ঈশ্বর। তবে এই ঈশ্বরকেই মানুষের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত করে তুলতে হবে। এই ঈশ্বরই মহাশূন্যে গ্রহ নক্ষত্রের গতিপ্রকৃতি পরিচালনা করে থাকেন। তবে আমার এ কথাও মনে হয়েছিল যে এ ঈশ্বরের কোন আকার নেই। এ ঈশ্বর অরূপ নিরাকার।

একদিন এই ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য ওল্ড টেস্টামেণ্টের কায়দায় এক বেদী তৈরি করলাম। তার উপরে আগুন জ্বালাতে হবে। সেই আগুনের শিখা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের, ভগবানের প্রতি ভক্তের সুনিবিড় কামনার দ্যোতক হয়ে জ্বলতে থাকবে।

একদিন ভোর হতেই উঠে পড়লাম আমি। তখনো সূর্য উঠতে দেরি আছে। সূর্য ওঠার আগেই বেদীতে আগুন জ্বালব আমি। কিন্তু সুগন্ধি কাঠ কোথায়? একমাত্র সুগন্ধি ধূম পরিবৃত অগ্নিই হতে পারে আমার অন্তরের প্রতিনিধি। অনেক কষ্টে আমি অবশেষে কিছু সুগন্ধি চন্দনকাঠ যোগাড় করে বেদীর উপর রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করলাম। আমার ধারণা আমি এইভাবে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাব। তখন সূর্য উঠেছে, কিন্তু চারদিকের বাড়িগুলোর আড়ালে সে সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম না। যাই হোক, বেদীতে আগুন জ্বলতে লাগল। সুগন্ধি ধোঁয়া উঠতে লাগল যজ্ঞবেদী হতে। আর আমি চোখ বন্ধ করে একমনে ধ্যান করতে লাগলাম ঈশ্বরে

চোখ বন্ধ করে একমনে ধ্যান করছিলাম। কিন্তু দেখতে পাইনি যজ্ঞ বেদীর আগুন প্রবল হয়ে কখন বেদীর কাছে রাখা ফুল, পূজোর উপকরণ ও আরো কিছু জিনিসপত্র সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। আমার নিজের ঘরে এই পূজার আয়োজন করেছিলাম আমি। হঠাৎ ধ্যান ভেঙ্গে গেল আমার। না ভাঙলে ঘরের সমস্ত জিনিস এবং এমন কি আমিও পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।

তারপর একাজ আর আমি কখনো করিনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার সাতটা বছর বেশ শান্তিতেই কেটেছিল। সারা দেশে তখন বিরাজ করত নিরঙ্কুশ শান্তি। কিন্তু সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তির ধারা। এল অশান্তি। এল যুদ্ধ। ১৭৫৬ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখে বাধল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রুশিয়ার যুদ্ধ। প্রুশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেদিন অস্ট্রিয়ার প্যাক্সলি শহরের উপর। রাজনৈতিক মতামতের দিক থেকে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল আমাদের দেশের লোকেরা। একদল সমর্থন করতে লাগল প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিককে আর একদল সমর্থন করতে লাগল অস্ট্রিয়াকে।

আমাদের পরিবারের মধ্যেও দেখা দিল এক ফাটল। আমার দাদামশাই অস্ট্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন অথচ আমার বাবা সম্রাট সপ্তম চার্লস কর্তৃক মনোনীত ইম্পিরীয়াল কাউন্সিলএর সদস্য হিসাবে অবলম্বন করলেন ফ্রেডারিকের পক্ষ। ফলে রবিবার আর আমাদের দাদামশাইএর কাছে যাওয়া হত না। এমন কি মা নিষেধ করে দিয়েছিলেন তাঁর নাম যেন কখনো উচ্চারণ না করি।

সুতরাং তখন আমার বালক মনেও পড়েছিল প্রুশিয়ার প্রভাব। প্রুশিয়ার হয়ে অনুভব করতাম জয়ের আনন্দ। কিন্তু আমার দাদামশাইএর কথা মনে করে সেই আনন্দের মাঝেও অনুভব করতাম এক নিদারুণ বেদনা। সঙ্গে সঙ্গে লিসবনের সেই ভূমিকম্পের মত এই যুদ্ধের ঘটনাটাও নূতন করে প্রচণ্ডভাবে কাঁপিয়ে দিল আমার ঈশ্বরবিশ্বাসের ভিত্তিভূমিটাকে। আমার কেবলি মনে হত আমার দাদামশাই সব দিক দিয়ে একজন আদর্শ চরিত্রের মানুষ হয়েও কেন আজ রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণ ও শহরের বহু বিশিষ্ট লোকের কাছ থেকে পাচ্ছেন দুঃসহ অবহেলা আর অপমান? এখানে কি ঈশ্বরের

করার কিছুই নেই ? আর জনমতেরই বা সততা কোথায় ? কোথায় তাদের ন্যায় বিচার ? লোকে কি বলবে বলে ছোট থেকে আমাদের যে জনমতের জুজুর ভয় দেখানো হয় আসলে সে জনমত অর্থহীন।

যুদ্ধের সময় ছেলেদের বাইরে বার হতে দেওয়া হত না। সারাদিনই আমাদের মত সব সময় ছেলেদের থাকতে হত বাড়ির ভিতর। তাই মাঝে মাঝে আমাদের আমোদ প্রমোদের জন্য পুতুলনাচের অনুষ্ঠান হত। আমাদের বাড়িতে একবার পুতুলনাচ হয়েছিল আর তাতে হয়েছিল পাড়ার ছেলেমেয়েদের প্রচুর ভিড়।

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলায় স্বপ্ন দেখতাম আমি আর সেই স্বপ্নের কথাগুলোকে গল্পের মত করে বলতাম আমার খেলার সঙ্গী সাথীদের কাছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কথা বিশ্বাস করত। কেউ আবার স্বপ্নের কথা অর্থাৎ বন, বাগান বাড়ি কোথায় আছে তা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করত।

একদিনকার এমনি এক স্বপ্নের কথা মনে আছে আমার। একদিন রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আয়নার সামনে নূতন পোষাক পড়ে দাঁড়িয়ে আছি। তখনো আমার সাজসজ্জা শেষ হয়নি, এমন সময় এক সুদর্শন যুবক এসে হাসিমুখে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাতে সে বলল, তুমি জান আমি কে ? আমি বললাম তোমাকে দেখতে লাগছে ছবিতে দেখা বুধগ্রহের মত। সে বলল, হ্যাঁ, আমি তাই। দেবতাদের এক বিশেষ অনুরোধে আমি এসেছি তোমার কাছে। তার হাতের উপর রাখা তিনটি আপেল দেখিয়ে সে তখন বলল, দেখতে পাচ্ছ এই আপেলগুলি ? আমি ভাল করে দেখলাম তার হাতের তিনটি আপেল তিন রংএর এবং সেগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। একটি আপেল লালচে, একটি সোনালি আর একটি সবুজাভ। আমি তখন হাত বাড়িয়ে আপেলগুলি নিতে গেলাম তার হাত থেকে। কিন্তু সে সরে গিয়ে বলল, এগুলি তোমার জন্য নয়। তুমি এই আপেলগুলি শহরের তিনজন খুব সুন্দর যুবককে দেবে। তাহলে তারা তাদের পছন্দমত সুন্দরী স্ত্রী খুঁজে পাবে। এই বলে আপেলগুলি আমার হাতে দিয়ে যুবকটি চলে গেল। আমি আপেলগুলি হাতে নিয়ে দেখতে লাগলাম আশ্চর্য হয়ে। কিন্তু আপেলগুলি সহসা বড় হতে হতে মাঝারি আয়তনের তিনটি পুতুলের আকার ধারণ করল। তারা রূপান্তরিত হলো তিনটি নারী মূর্তিতে। তাদের শাড়ীর রং ছিল ঠিক সেই আপেল তিনটির মত। তাদের মধ্যে দু'জন পালিয়ে গেল আমার আঙুলের

ফাঁক দিয়ে। আর একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে তার পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে নাচতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে তার নাচ দেখতে লাগলাম। আমি ভাবলাম সে আমায় ধরা দেবে। তাই যেমন তাকে ধরতে গেলাম অমনি আমার মাথায় কে যেন জোর আঘাত দিল আর আমি পড়ে গেলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে গিয়েছিল আমার।

স্টইক সন্ন্যাসীদের অনেক আত্মনিগ্রহের কথা শুনে আমিও নিজের উপর তা প্রয়োগ করতাম। এর মধ্যে একটি আত্মনিগ্রহ আমাদের শিখতে হল শিক্ষকদের কাছ থেকে। সেটা হলো দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করতে শেখা। এই সহন শক্তি শিক্ষা দেওয়াই হলো বেশীর ভাগ খেলাধূলার লক্ষ্য। আমাদের শিক্ষক আমাদের মুখে গায়ে ঘুঁষি মেরে যেতেন আর তাই চুপ করে আমাদের সহ্য করে যেতে হত। কোন কথা বলতে পেতাম না। এর থেকে আমরা ক্রোধ দমন করতে ও দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করতাম।

১৭৫৭ সালটা মোটের উপর শান্তিতে কেটে গেল। যে সব সংসারে রাজনৈতিক মতামতের জন্য ফাটল ধরেছিল সে সব সংসারেও অনেকটা শান্তি ফিরে এল। ফাটলের অনেকখানি পূরণ হলো। আমার বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন না। দেশভ্রমণে বার হয়েছিলেন।

অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে অবশেষে ঘরে ফিরলেন বাবা। ফিরে কি মনে হলো, আমাদের শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানে এক অবৈতনিক প্রশাসকের পদ চাইলেন। কিন্তু তাঁর সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হতে বড় ব্যথা পেলেন। যাই হোক, ঠিক এই সময় উফেনব্যাক নামে একজন নামকরা গাইয়ে আসেন আমাদের শহরে। আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন চলে যায় সেই দিকে।

ব্যারণ ভণ বেকেন নামে এক সামন্তের কথা আমার আজও মনে আছে। তিনি বড় অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। একবার শহরের বহু ভিখারিকে বাড়িতে ডেকে তাদের প্রত্যেকের ছেড়া কাপড় আর কম্বল সব কেড়ে নিয়ে তাদের পোষাক বিতরণ করেন এবং এক ঘোষণা জারি করে বলে দেন, প্রতি সপ্তাহে তিনি তাঁর বাড়িতে ভিখারিদের কিছু দান করবেন। কিন্তু যারা এই দান নিতে চায় তাদের প্রত্যেককে ফর্সা জামা কাপড় পরে আসতে হবে। তিনি সমাজের অভিজাত শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন তেমনি নিঃস্ব গরীব ও ভিখারিদের খাওয়াতেও ভালবাসতেন।

এরপর মনে পড়ে আমার ডাক্তার ওর্থের কথা। তিনি ধনী ঘরের সন্তান হয়েও প্রচুর পড়াশুনো করেন। জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য, ও প্রশাসনিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো সরকারী পদ গ্রহণ করেননি। তিনি 'রিফরমেশান অফ ফ্যাঙ্কফোর্ট' নামে একখানি বই লেখেন এবং তা প্রকাশ করেন। আমি যৌবনে বইখানি পড়েছিলাম। বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। জন মাইকেল ভণ লোয়েন নামে আর এক লেখকের কথা মনে আছে। তিনি 'কাউন্ট অফ রিভেরা' ও 'দি ট্রু রিলিজিয়ন' নামে দুখানি বই লিখে বেশ নাম করেন। প্রথম বইখানি শিক্ষামূলক রোমান্স। তাতে অভিজাত সমাজের জন্য বেশ কিছু নীতি শিক্ষার কথা ছিল। আর দ্বিতীয় বইখানি ধর্ম বিষয়ে বিতর্কে ভরা। এই বই পড়ে অনেক ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে নেমে যান। এর ফলে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর এবং তাঁকে লিনজেনের সভাপতির পদ দান করেন।

আমাদের প্রতিবেশী ভণ অকসেনস্টাইনের নাম আগেই করেছি। তাঁর তিনটি ছেলে ছিল। এই পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জীবদ্দশায় কোন নাম যশ লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু মৃত্যুর পর হঠাৎ খ্যাতি অর্জন করেন প্রচুর। মৃত্যুকালে যাজকের কাছে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করে যান তাঁর মৃতদেহ সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাবে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা। এতে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর অনেকে রেগে যায়। কিন্তু পরে দেখা গেল অনেকে আবার এই রীতি গ্রহণ করছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এই রীতির পক্ষপাতী হয়ে ওঠে কারণ এতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ কম পড়ে।

আমাদের শহরের আর এক অদ্ভুত পরিবারের কথা মনে আছে। সে পরিবারের নাম হলো সেনকেনবার্গ পরিবার। তাদের বাড়িতে একটি পোষা খরগোস ছিল বলে সেই জন্য স্থানীয় রাস্তার নাম হেয়ার স্ট্রীট হয় আর সেই পরিবারের তিনটি ছেলেকে তিনটি খরগোস বলত পাড়ার লোক। অথচ পরবর্তীকালে তিনটি ছেলেই আপন আপন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করে। বড় ছেলে ছিল রাজপরিষদের নামকরা সদস্য। দ্বিতীয় ছেলে ছিল সুযোগ্য জেলাশাসক। আর তৃতীয় ছেলে ছিল ডাক্তার।

ভন লোয়েন যেমন অভিজাত সমাজের উচ্ছৃংখল লোকদের নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন, ভন মোসের নামে এক ব্যবসায়ী তেমনি কয়েকখানি বই লিখে ব্যবসায়ীদের অসাধুতা দূর করে তাদের সৎ

জীবন যাপন করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী মহল তাঁর কথা শুনেছিল বলে মনে হয় না। ফলে মনে কোনদিন শান্তি পাননি মোসের। এমন একটা দুঃসহ দুরন্ত অনুভূতির সঙ্গে সারাজীবন তাঁকে যুদ্ধ করে যেতে হয়েছিল যে অনুভূতিকে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না তাঁর পক্ষে আবার সে অনুভূতিকে একেবারে দূর করেও দিতে পারছিলেন না মন থেকে।

আমার বাবা মনে করতেন ছন্দই হলো কবিতার প্রাণ। তাই বেছে বেছে সেই সব প্রবীণ ও নবীন কবিদের কাব্যগ্রন্থ কিনে ঘরে সাজিয়ে রেখেছিলেন যাঁরা ছন্দে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যানিৎস, হেগেডর্ণ ড্রোনিংগার, জগেলার্ত ও হলার।

এমন সময় ক্লপস্টক নামে একজন আধুনিক কবি হঠাৎ নাম করে বসলেন, তাঁর 'মেসিয়া' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ আমাদের শহরের প্রায় ঘরে ঘরে স্থান পেল। অনেকে আবৃত্তি করত তাঁর কবিতা। বাবা সব নামকরা আধুনিক কবিদের কবিতার বই ঘরে কিনে সাজিয়ে রাখতেন। নূতনদের বাবা পছন্দ করতেন, কিন্তু ক্লপস্টকের কবিতা 'হেক্সামিটার' বা ষষ্ঠপার্বিক ছন্দে লেখা বলে বাবা তাঁর কবিতার বই কেনেন নি। বাবা বলতেন, ও ছন্দ ছন্দই নয়।

যাই হোক, আমাদের পরিবারের এক বন্ধু 'মেসিয়া' বইখানি আমার মার হাতে দিয়ে যান। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হলেও বইখানি পছন্দ করেছিলেন এবং এর অনেক কবিতা তিনি আবৃত্তি করে পড়তেন। আমরাও মার সহযোগিতায় বাবাকে লুকিয়ে বাড়িতে সে বইএর অনেক কবিতা মুখস্থ করতাম।

একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটল। সন্ধ্যের দিকে নাপিত এসে বাবার ঘরে তাঁর দাড়ি কামাবার জন্য মুখে সাবান মাখাচ্ছিল। ঠিক এই সময় আমরা দুই ভাইবোনে চাপা গলায় আগুনের কাছে এক কোণে বসে 'মেসিয়া' কাব্যগ্রন্থের একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমাদের ভাব এসে গিয়েছিল। হঠাৎ আবেগের মাথায় আমার ছোট বোন একটা ছত্র বলতে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে আর নাপিত চমকে যাওয়ায় তার হাত থেকে অনেকটা সাবানের ফেনা পড়ে যায় বাবার জামার উপর। বাবা রেগে গিয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করে অবশেষে বইটির কথা জানতে পারলেন। সেইদিন থেকে ক্লপস্টকের 'মেসিয়া' কাব্যগ্রন্থখানি চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হলো বাবার বিচারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৭৫৯ সাল এসে গেল। কিন্তু নববর্ষের পারস্পরিক সাদর সম্ভাষণের মিষ্টি আবহাওয়াটা কেটে যেতে না যেতেই আমাদের শহরের উপর নেমে এল দুর্দিনের করাল কালো ছায়া। ফরাসী সৈন্যরা দলে দলে আমাদের শহরের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যেতে লাগল। শহরের কৌতূহলী জনতা রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে তাদের দেখল। কিন্তু তাদের বাধা দেবার কোন ক্ষমতা ছিল না আমাদের। এমনি করে একদিন দেখা গেল শহরের সামান্য রক্ষীদের হারিয়ে দিয়ে শহরটা দখল করে নিল ফরাসীরা।

শান্তিপ্রিয় শহরবাসীদের কাছে এক বিরাট দুঃখের কারণ হয়ে উঠল ব্যাপারটা। কিন্তু সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেলেন আমার বাবা। কারণ তাঁর নূতন বাড়িটার এক বড় অংশ ছেড়ে দিতে হলো বিদেশী সৈন্যদের অফিসের জন্য। বাবা ছিলেন প্রশিয়ার পক্ষে তাই কার্যতঃ তিনি বন্দী হয়ে রইলেন তাঁর ঘরে।

কাউণ্ট থোরেন নামে এক ফরাসী সামরিক অফিসার অফিস খুলল আমাদের একতলার বাইরের ঘরে। ফরাসী সৈনিকরা ঘিরে রইল বাড়িটাকে। নগরবাসী ও ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে কোথাও কোন দ্বন্দ্ব বা বিবাদ বাধলে এবং কোন পক্ষ অভিযোগ জানালে থোরেন তার বিচার করবে এবং শাস্তি বিধান করবে। সারা দিন তার কাজকর্মের অন্ত ছিল না।

কিন্তু লোক হিসাবে খারাপ ছিল না থোরেন। আসার প্রথম দিকে একদিন আমাদের বাড়িটা বাবার সঙ্গে ঘুরে দেখার সময় আমাদের ছবির ঘরটা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। বলে এই সব শিল্পীদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাদের সঙ্গে আলাপ করবে। আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করত থোরেন। রোগা ছিপছিপে চেহারার মানুষটা ছিল লোহার মত শক্ত এবং অসাধারণ গাম্ভীর্যে ভরা মুখে ছিল বসন্তের দাগ। কিন্তু কড়া সামরিক অফিসার হলেও শিল্প সংস্কৃতির প্রতি থোরেনের অনুরাগ ছিল অপরিসীম। আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই তা দেখে।

তবু কিন্তু বাবার মন ভিজল না, গলা ত দূরের কথা। মা ত থোরেনের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাধ করে ফরাসী শিখতে লাগল। আমাদের পরিবারের বন্ধুরা ও মা নিজে বাবাকে বোঝাতে লাগল, থোরেন ছাড়া অন্য লোক এলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। কিন্তু থোরেন যত ভাল লোকই হোক বাবা এই

চাপিয়ে দেওয়া অবাঞ্ছিত পরাধীন পরিবেশটাকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছিলেন না মনে মনে। আগে তিনি আমাদের যেভাবে পড়াতেন এখন তেমন করে মন দিতে পারলেন না পড়ানোয়। কোন কাজেই আর তাঁর উৎসাহ নেই।

কাউন্ট থোরেনের সঙ্গে একজন দোভাষী ছিল। সে হচ্ছে আমাদের শহরের লোক। ফরাসী এবং জার্মান দুই জানত বলে এই কাজ পায়। সে রোজ কাজ সেরে আমাদের বাড়ির ভিতরে এসে মজার মজার গল্প বলত। কোন কোন মামলায় থোরেন কি কি রায় দিত তার একটা করে ফিরিস্তি দিত। এই সব গল্প শুনে আমার মা ও আমরা মজা পেতাম। এই দোভাষী আবার অবসর সময়ে আমার মাকে ফরাসী ভাষা শেখাত।

অদ্ভুত একটা রোগ ছিল থোরেনের। সে রোগের নাম হলো হাইপো-কনড্রিয়া বা বিষাদময়তা। মাঝে মাঝে গম্ভীর ও বিষাদগ্রস্ত হয়েও পড়ত থোরেন। কাজ ফেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরের মধ্যে চলে যেত। আর বার হত না, কারো সঙ্গে দেখা করত না। একমাত্র খাস চাকর ছাড়া কেউ তার কাছে যেতে পারত না। এক এক সময় দু'তিন দিন পর্যন্ত এইভাবে থাকত। আমরা বলতাম ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে। ভূতটা ছেড়ে গেলেই আবার স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠত থোরেন।

একবার থোরেন সত্যি সত্যিই শহরের নামকরা আধুনিক শিল্পীদের ডেকে তাদের কাছ থেকে তার পছন্দমত বেশ কিছু ছবি কিনে নেয়। সেই ছবিগুলো আমাদের এক ঘরে ভরে রাখে। ঘরখানা স্টুডিওর মত দেখাত। তার মত কড়া সামরিক অফিসারের সূক্ষ্ম শিল্পরুচি দেখে আশ্চর্য হলাম আমরা। একদিন ছবির ঘরে ঢুকে আমি একটা ফটোর বাক্সের তালা খুলে তার মধ্যে কোন নিষিদ্ধ ছবি দেখার চেষ্টা করি। ঢাকনা বন্ধ করার আগেই কাউন্ট থোরেন ঘরে ঢুকে আমাকে এভাবে দেখে দারুণ রেগে যায়। গম্ভীরভাবে আমাকে হুকুম দেয় আমি যেন আটদিন এ ঘরে আর না ঢুকি। আমার দোষের কথা বুঝতে পেরে আমি মাথা নত করে নীরবে বেরিয়ে যাই ঘর থেকে। সে হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম আমি।

এই সময় আমি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করি। কিছু কিছু কথা বলতে পারতাম এবং বুঝতাম। এমন সময় একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম অপ্রত্যা-শিতভাবে। আমাদের শহরের একটা থিয়েটারে তখন বেশ কয়েকদিন ধরে

ফরাসী নাটক দেখানো হচ্ছিল। আমার দাদামশাই আমাকে একখানা 'সীজন' টিকিট দিয়েছিলেন যাতে আমি রোজ যে কোন নাটক দেখতে পারি। আমার বাবা এটা না চাইলেও মার সহযোগিতায় আমি সেখানে যেতাম। কিন্তু মিলনান্তক নাটক আমার মোটেই ভাল লাগত না। সে নাটকের সংলাপ কোন রেখাপাত করত না আমার মনে। ভাল লাগত বিয়োগান্ত নাটক। দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে বাঁধা ছন্দায়িত সংলাপ, নায়ক নায়িকার ধীরোদাত্ত কণ্ঠস্বর, সদা সতর্ক পদক্ষেপ ও অঙ্গসঞ্চালন, গুরুগম্ভীর পরিবেশ—সব মিলিয়ে আমার বড় ভাল লাগত। অনেক সংলাপ আমার মুখস্থ হয়ে গেল।

দিরোনেস নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে একবার তার বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বোনটি বয়সে আমাদের থেকে কিছু বড় ছিল। দেখতে মেয়েটি ভাল ছিল—সবল সুগঠিত চেহারা, বাদামী রং, কালো চুল। কিন্তু তার ভাসা ভাসা চোখগুলো সব সময় বিষাদের ছায়ায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। মেয়েটিকে আমার ভাল লাগে এবং তার কাছে আমাকে প্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকি। যখনি তাদের বাড়ি যেতাম আমি কোন ফুল বা ফল বা কোন না কোন একটা জিনিস উপহার দিতাম মেয়েটিকে। কিন্তু কোন কিছুতেই তার মুখে হাসি ফোটাতে পারিনি আমি। অবশেষে একদিন মেয়েটির বিষাদের কারণ জানতে পারলাম। একদিন তার ঘরে বিছানার পাশে দেয়ালে একটি ফটো দেখলাম। ছবিটি এক সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকের। দিরোনেস আমাকে যা বলল তাতে বেশ বুঝতে পারলাম, ঐ ভদ্রলোক তাদের মার প্রথম পক্ষের স্বামী। এবং তার দিদি হচ্ছে ঐ ভদ্রলোকের মেয়ে। তারা দুই ভাই তার মার এ পক্ষের স্বামীর ছেলে। এবার বুঝলাম তার বাবাকে সকলে হারিয়ে পিতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্যই মেয়েটি সতত বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে।

কাউণ্ট থোরেন ছিল ফরাসী রাজার লেফটন্যাণ্ট। সেই সূত্রে বহু গণ্যমান্য ফরাসী লোক ও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রায়ই দেখা করতে আসত তার সঙ্গে। এক সময় দেখা গেল রাজা নিজে এলেন কাউণ্টের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করার জন্য। দেখলাম থোরেনের কাছে ঘন ঘন সেনাবাহিনীর অফিসারেরা দেখা করতে আসছে। এমন সময় শহরে একটা গুজব রটনা হয়ে গেল। শোনা গেল প্রুশিয়ার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আবার আসছেন। তিনি শীঘ্রই ফরাসীদের তাড়িয়ে দেবেন ফ্রাঙ্কফোর্ট শহর থেকে। অনেকে ব্যগ্রভাবে

সেই মুক্তির দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কথাটা শুনে আমার বাবা খুব আশান্বিত হলেন। খুশি হলেন মনে মনে। কিন্তু আমার মা কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। তাঁর কথা হলো এই যে ফরাসীদের শহর থেকে তাড়াতে গেলেই যুদ্ধ বাধবে। ফরাসীরা তাতে হেরে গেলেও পালিয়ে যাবার সময় যে ক্ষয়ক্ষতি করে যাবে তার ফল খুবই খারাপ হবে। তার থেকে যে অবস্থা বর্তমানে রয়েছে তাই থাক।

শহরের মধ্যে প্রচুর সৈন্য আনাগোনা করতে লাগল। আমাদের বাড়িতে দিনরাত সমানে লেগে থাকত ভিড় আর গোলমাল। বাড়ি থেকে ছেলেদের বার হতে দেওয়া হত না। আমার বাবা ছিলেন প্রুশিয়ার পক্ষে। যুদ্ধ শুরু হতেই তিনি এগিয়ে গেলেন বিজয়ী বীরদের শহরে বরণ করে আনার জন্য। কিন্তু বাবা বেশ কিছুটা শহরের বাইরে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন উল্টো ফল ফলেছে। দলে দলে আহত বন্দী জার্মানরা ফিরে আসছে শহরে। শুনলেন ফরাসীদের অবস্থা বর্তমানে ভাল। আপন দেশবাসীদের বন্দীদশা দেখে বাবা কেমন যেন আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তিনি হতাশ মনে বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরে এসে দুঃখে জলস্পর্শ করলেন না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আকাশ পাতাল কি সব ভাবতে লাগলেন। মা ও আমরা সকলে পীড়াপীড়ি করেও কিছু খাওয়াতে পারলাম না বাবাকে।

সেদিন থোরেনকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। সে অফিস থেকে ঘোড়ায় চেপে কোথায় যাচ্ছিল। আমরা তার কাছে গিয়ে তার হাত চুম্বন করলাম। সে খুশি হয়ে আমাদের মিষ্টি দেবার হুকুম দিল তার লোকদের। কিন্তু ঘরে ফিরে বাবার জন্য খুব খারাপ লাগছিল আমাদের। বাবা তখনো কিছু খাননি। অনেক করে কোনমতে মধ্যাহ্নভোজনে রাজী করালাম আমরা। নিচেকার খাবার ঘরে গিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।

কিন্তু তখন আমরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আমরা তাঁকে এর দ্বারা বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। বাবা উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় দুর্ভাগ্যক্রমে থোরেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মুখোমুখি হতেই থোরেন বাবাকে বলল, এই ভয়ঙ্কর বিপদটা যে এত সহজে কেটে গেল এর জন্য তুমি আশা করি নিজেকে ও আমাদের সম্বর্ধনা জানাবে।

আমার বাবা কিন্তু গম্ভীর মুখে বললেন, কোনক্রমেই না। তার থেকে তুমি আমি সব যদি নরকে যেতাম তাও ভাল ছিল।

এতে কাউণ্ট থোরেন রেগে গিয়ে বলল, এর জন্য দুঃখ পেতে হবে তোমায়। তুমি বুঝতে পারবে এভাবে অকারণে আমাকে অপমান করা তোমার উচিত হয়নি।

সেকথায় কান না দিয়ে বাবা নিচে নেমে এসে খাবার টেবিলে বসলেন। সাধ্যমত যা পারলেন খেলেন। কাউণ্ট থোরেনকে কিছু শক্ত কথা বলে মনটা যেন কিছুটা হালকা হয়েছে তাঁর।

কিন্তু সে রাতে আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম এক তুমুল ব্যাপার ঘটে যায়। জানতে পারলাম পরের দিন সকালে। দোভাষী সেই ফরাসী ভদ্রলোকের কাছ থেকে সব শুনলাম আমরা। শুনলাম গত রাতে আমরা বাড়ির ছেলেরা শুতে যাবার পর থোরেন বাবাকে গ্রেপ্তার করে গার্ড হাউসে নিয়ে যাবার হুকুম দেয়। বাবার পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। তার অধীনস্থ কর্মচারীরা সে হুকুম তামিল করতে কিছু দেরি করে আর সেই অবসরে দোভাষী সব নিয়মকানুন ভুলে গিয়ে কাউণ্ট থোরেনের খাস কামরায় চলে যায়। মা ও আমাদের নামে আবেদন জানায় থোরেনের কাছে। বলে এ দণ্ডাদেশ মকুব করতেই হবে। থোরেন বলে, সে এ অপমান কিছুতেই সহ্য করবে না। তার হুকুম নড়চড় হবার নয়। কিন্তু দোভাষী অনেক করে বুঝিয়ে বলতে থাকে, আমার বাবা আসলে লোকটা খারাপ নয়, হঠাৎ কি মনে করে কথাটা বলে ফেলেছেন। তা ছাড়া আমার মা ও আমরা ছেলেমেয়েরা তার আনুগত্য ত মেনেই নিয়েছি। সুতরাং থোরেনের মত একজন সদাশয় অফিসার যিনি সকলের সব অভিযোগ ধৈর্য ধরে শুনে সকলের প্রতি সুবিচার করেন তাঁর পক্ষে সামান্য একটা তুচ্ছ ব্যাপারে একজন নিরীহ লোককে এ শাস্তি দান করা শোভা পায় না।

যাই হোক, অবশেষে দোভাষীর আবেদন মঞ্জুর হয়। শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেয় থোরেন। পরের দিন দোভাষী আমাদের বাড়িতে এসে এ ব্যাপারে থোরেনের সঙ্গে যা যা কথা হয় সব গর্বের সঙ্গে বলে যায়। কোন খুঁটিনাটি বাদ দেয়নি। এর মধ্যে হয়ত কিছু অত্যুক্তিও থাকতে পারে।

সেই দিন থেকে কেমন যেন বেশী গম্ভীর দেখাত থোরেনকে। বাবাও সাবধান হয়ে যান। হঠাৎ দেখা গেল একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল থোরেনের মাথায়। সে শহরের নামকরা আধুনিক চিত্রশিল্পীদের ডেকে যে সব ছবি কিনেছিল তাতে তার মন ঠিকমত তৃপ্ত হয়নি। সে লক্ষ্য করেছিল তাদের হাত ভাল হলেও প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ দিকে প্রতিভা আছে। কেউ প্রাকৃতিক

দৃশ্যাবলী ভাল ফুটিয়ে তুলতে পারে, কেউ মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা, কেউ মানুষের মন ও দেহ। থোরেন সবাইকে ডেকে বলল, তোমরা সবাই মিলে এমন একখানি বড় ছবি আঁকবে যাতে এই সব কিছু থাকবে, সার্থকভাবে ফুটে উঠবে। সকলের সব প্রতিভা একখানি ছবির মধ্যে ধরে রাখবে থোরেন এই ছিল তার অভিপ্রায়। তার এই অভিপ্রায়ের অর্থ শিল্পীরা ঠিক বুঝতে না পারলেও মোটা টাকার লোভে রাজী হয়ে গেল সকলে। সে ছবির কাজ শেষ হতেই একদিন দেখা গেল থোরেন তার সব সংগৃহীত ছবি গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিল তার ভাইএর কাছে। আমাদের ঘরটা খালি হয়ে গেল।

তার অফিস সমেত থোরেনকে আমাদের বাড়ি থেকে যাবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন যায় ফরাসী রাজার কাছে। অবশেষে সে আবেদন মঞ্জুর হয় এবং একদিন তার দলবল নিয়ে আমাদের বাড়ি থেকে চলে যায় থোরেন। তবু তার কথা আমি ভুলিনি কখনো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমার নিজস্ব ঘরখানা আবার আমি ফিরে পেলাম। এই ঘরে থাকত থোরেনের ছবিগুলো। ঘরটা খালি হলেও বেশ কিছুদিন ধরে সেই সব ছবির ভূতগুলোকে আমি যেন আমার ঘরের দেওয়ালগুলোতে চলাফেরা করতে দেখতাম।

কাউন্ট থোরেন ও তার দলবল চলে যাওয়ার পর ঘরগুলো পরিস্কার ও ঝাড়ামোছা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাড়াটে এল। এলেন প্রসিদ্ধ আইনজীবি বাবার অন্যতম বন্ধু মরিৎস। মরিৎস নিজের আইনব্যবসা ছাড়াও বড় বড় সামন্ত পরিবারের ও রাজপরিবারের মামলা মোকদ্দমা দেখাশোনা করতেন। মরিৎস বাবার কাছে প্রায়ই এলেও তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা ঘর থেকে বেরোয় না। আমাদের বাড়িতে আসত না। তাই থোরেনরা চলে যাবার পর আমাদের বাড়িটাকে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত।

মরিৎস শিল্পী না হলেও কিছু কিছু আঁকতে পারতেন। আমি ঘরবাড়ির স্কেচ করে তাঁকে দেখাতাম। তারপর ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিংএ মন দিলাম। আমার বাবা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিজে শিখে আমাকে শেখাতেন। তারপর গান। অনেকদিন ধরেই আমাদের গান শেখাবার কথা হচ্ছিল। অবশেষে ঠিক হলো আমরা ভাইবোনে হার্পসিকর্ড শিখব। কিন্তু মাস্টার পছন্দ হচ্ছিল

না। এমন সময় একদিন আমার এক সহপাঠি বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখি সে একজনের কাছে ঐ বাজনা শিখছে। শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি আমার ভাল লাগল। তাঁর ডান ও বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো সমানে চলত এবং প্রত্যেকটা আঙুলের একটা করে নাম দিয়েছিলেন। কখন কোন আঙ্গুলটা চালাতে হবে তা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিতেন।

আমি বাড়ি ফিরে বাবা মাকে বলে সেই শিক্ষককে নিযুক্ত করালাম। কিন্তু লোকটার নীরস গুরুগম্ভীর ভাব দেখে অল্পদিনের মধ্যেই মোহমুক্ত হলাম আমরা। আমার বোন ত আমায় গাল দিতে লাগল। আমার বাবা অবশ্য আমার গান বাজনা শেখার উপর তেমন জোর দিতেন না। তিনি শুধু চাইতেন আমার বোনই কিছু গান বাজনা শিখুক। আর চাইতেন আমার পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আমি কিছু ছবি আঁকতে শিখি।

এই সময় পিফেন নামে এক ফরাসী যুবককে দিয়ে এক বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ফরাসী ছাড়া গ্রীক ও লাতিন ভাষা শেখানো হত। পিফেন গান বাজনাও জানত। মস্ত বড় গাইয়ে ফেলতিনি নোরার সঙ্গে তার ভাব ছিল এবং নোরার কাছ থেকে এক বড় পিয়ানো কিনে আনে আমার বোনের জন্য। এই পিয়ানো বাজনা শিখতে আমার বোনের বড় কষ্ট হত। এই সময় বাবা আবার ইংরাজি ভাষা শিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষকও নিযুক্ত করেন।

ছোট থেকে আমার ইহুদী ভাষা শেখার শখ ছিল। আমারও আশা ছিল এই ভাষা শিখে আমি ওল্ড টেস্টামেণ্ট গ্রন্থটি পড়তে পারব। আমার প্রায়ই মনে হত ইহুদী জাতি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ঈশ্বরের অনুগৃহীত এমনই এক জাতি যারা পৃথিবীর মধ্যে হাজার বছরের ইতিহাস রচনা করেছে। যুগ যুগ ধরে কত কথা ও কাহিনী গড়ে উঠেছে তাদের নিয়ে। কল্পনার পাখায় চড়ে আমার মন চলে যেত সেই সুদূর পৌরাণিক অতীতের অজানা রাজ্যে। একটি পরিবার কিভাবে বংশ বিস্তার করে এগিয়ে যায় আরবের টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস বিধৌত ভূখণ্ড হতে প্যালেস্টাইন জর্ডন ও পরে ঈজিপ্টের পথে। কত সব মরুভূমি, পাহাড়, নদী সমুদ্রের দেশ ঘুরে ঘুরে একটি জাতি এগিয়ে চলেছে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে। আব্রাহাম, মোজেস, জ্যাকব, র‍্যাশেল, জোশেফ প্রভৃতি কত সব পৌরাণিক চরিত্র ভিড় করে আসত আমার মনে। তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আত্মদহন, দুঃখ কষ্ট, প্রেম ভালবাসা সব নাড়া দিত আমার মনকে। হাজার বছরের একটা প্রকাণ্ড অতীতের ধূসর পটভূমিকা সহসা জীবন্ত হয়ে উঠত

আমার মনে।

বাইবেলের এই সব ঘটনা ও চরিত্র নিয়ে আমি এক বিরাট পদ্য রচনা শুরু করে দিলাম। লেখা শেষ হলে আমাদের বাড়িতে যে যুবকটি থাকত এবং যার হাতের লেখা খুব ভাল ছিল তাকে দিয়ে ভাল করে প্রথম থেকে লেখা করালাম। তারপর বই বাঁধাই কারখানা থেকে ভাল করে বাঁধাই করে বাবাকে দেখালাম। এই বই আমি লিখেছি আমার অবসর সময়ে আমার পড়ার কাজ বাঁচিয়ে। দেখে খুশি হলেন বাবা।

আমার বাবা বলতেন কোন কাজ শুরু করলে তা যেমন করেই হোক শেষ করতে হবে। কাজের পথে যত বাধা, বিপত্তি, দুঃখকষ্ট আসুক না কেন তা শেষ করতেই হবে। তাঁর মতে মানুষের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য হবে পূর্ণতা, আর তার একমাত্র গুণ হবে অধ্যবসায়। তাই দীর্ঘ দিনের শ্রম ও সাধনায় এ কাজ আমি সম্পন্ন করেছি তা দেখে প্রীত হলেন বাবা।

কিন্তু আমি যাই করি বা যত ভাষাই শিখি, লেখা বা ছবি আঁকায় যত কৃতিত্বই দেখাই তাঁর মূল লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হননি বাবা। তিনি একবার যা বলেন তা ভোলেন না। একবার যা লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেন তার থেকে সরেন না। তিনি চেয়েছিলেন আমাকে নিয়ে আইন পড়িয়ে তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবেন। তাই তিনি একদিন হঠাৎ আমাকে একটি হালের আইনের বই দিলেন পড়তে। যদিও আমার কাছে বইখানি খুবই কঠিন ঠেকছিল তবু বাবার হুকুম তা পড়ে শেষ করতেই হবে।

একদিন আমাদের শহরে নেহাৎ কৌতূহলের বশে ইহুদীদের বস্তী দেখতে যাই। তারা যে ঘিঞ্জী নোংরা বস্তীতে থাকত তা দেখে দুঃখ হত আমার। ঈশ্বরপ্রেরিত যে জাতির কথা বাইবেলে কত 'ফলাও' করে পড়েছি সেই জাতির অবশিষ্টাংশ এরা। এদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হয় আমার। আমি আমার অবসর সময়ে মাঝে মাঝে সেই বস্তীতে যেতাম। তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতাম। অনেক উৎসবে যোগ দিতাম। আমি খৃস্টান হয়েও তাদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হতাম আমি।

আমার ইচ্ছা না থাকলেও যৌবনে পা দিয়ে আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে ঘোড়ায় চাপা ও ফেন্সিং খেলা শিখতে হলো আমায়। আমাদের শহরে তখন দু'জন ফেন্সিং খেলোয়াড় এ খেলা শেখাতেন। একজন জার্মান ও আর এক ফরাসী ভদ্রলোক। আমি ফরাসী ভদ্রলোকের কাছেই ঐ

খেলা শিখতে থাকি। তবে ঘোড়ায় চাপা ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। পরে অবশ্য আমি খুব ভাল ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠি এবং এক নাগাড়ে কয়েকদিন ঘোড়ার পিঠে চেপে থাকতে পারি অক্লান্তভাবে।

আমি বড় হয়েছি দেখে বাবা আমাকে এই সময় তাঁর ব্যবসায় সাহায্য করতে বলেন। আমাদের যে কারখানায় অনেক লোক কাজ করত এবং বাবাকে যেখানে দেখাশোনা করতে হত দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে সেখানে যেতে বললেন বাবা। কাজের তদারক করতে বললেন। কর্মীদের উপর নজর রাখতে বললেন। এইভাবে কর্মস্থলে গিয়ে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কটিকে ভালভাবে দেখতে পাই। আর তা থেকেই অদ্ভুত এক সাম্যবোধ জাগে আমার মনে। উচ্চ, অভিজাত ও নিম্ন সকলের মধ্যে কোথায় প্রকৃত পার্থক্য তা বুঝতে চাই আমি। সব মানুষ সমান হোক তা আমি হয়ত চাইনি। আমি চেয়েছিলাম মানবজীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে অন্ততঃ সমতা বিরাজ করুক, কারণ শ্রেণী নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যেই আছে অস্তিত্বের সংরক্ষণ প্রচেষ্টা বাঁচার এক অপরিহার্য তাগিদ।

এই সময় ভন ওলেনস্লেগার আমাদের পরিবারের খুব প্রিয় হয়ে ওঠেন। ওলেনস্লেগারের নাটকে বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি যুবকদের নিয়ে বেশ আমোদ প্রমোদ করতে পারতেন। তাঁর নাটক করার খুব সখ ছিল। তাঁর নির্দেশনায় আমরা স্লেগারের ক্যানিয়ুট মঞ্চস্থ করি। এতে আমি আমার বোন ও ছোট ভাই তিনজনেই তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করি। এরপর রেসিনের লেখা ট্র্যাজেডী ব্রিটানিকাসও মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে নীরোর ভূমিকায় অভিনয় করি। আমার বোন নেয় এগ্রিপিয়ার ভূমিকা। এইভাবে ভন ওলেনস্লেগার এক রীতিমত নাট্যপ্রীতি জাগিয়ে তোলেন আমার প্রথম যৌবনে।

১৭৬৩ সালের প্রথম বসন্তে একদিন এক জাতীয় উৎসবে মেতে ওঠে আমাদের শহর। কারণ ঐ দিন হুবার্তসবার্গ সন্ধি সম্পাদিত হয়। কিন্তু চার দিকের আনন্দোৎসবের মাঝে আমার কেবলি মনে পড়তে থাকে ভন রেনেকের কথা। আপন কন্যার সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে স্বেচ্ছাকৃত এক প্রায়ান্ধকার কারাজীবন যাপন করে চলেছেন তিনি। তাঁদের মুখে আমি কোন দিন বিন্দুমাত্রও হাসি ফুটে উঠতে দেখিনি। একবার তাঁর পরিবারের বন্ধুস্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে তাঁর মেয়ে পালিয়ে যায়। এটা মনঃপুত না হওয়ায় তিনি

তাদের সন্ধান করেন। সন্ধান পেয়ে মামলা করেন। কিন্তু তাঁর প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় মামলায় হেরে যান রেনেক। হেরে গিয়ে তাঁরা বাড়ির একতলায় এক অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নেন। সে ঘর হতে তিনি বিশেষ বার হতেন না। সে ঘরের দেওয়াল চুণকাম করা হয় না কখনো। কিন্তু রেনেক আমাকে বড় ভালবাসতেন এবং তাঁর ছোট ছেলেকে আমার সঙ্গে মিশতে বলতেন।

আমি তাঁর কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খিটখিটে মেজাজ অনেকটা শান্ত ও নরম হত। তাঁর বাড়িতে গেলে খাওয়া দাওয়া ভালই হত। তিনি অতিথিবৎসল ছিলেন। কিন্তু তাঁর একটা স্টোভ ছিল। সেই স্টোভটা জ্বালতে গেলেই ধোঁয়া হত আর তাতে অতিথিদের কষ্ট হত। একদিন এক অতিথি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রেনেক বলেন মানুষকে যে সব অশুভ শক্তি কষ্ট দেয় তারা যদি ঈশ্বরের কাছে যেত তাহলে ভাল হত। একবার তাঁর মেয়ে তাঁর প্রথম ছেলেকে নিয়ে দেখা করতে আসে। জামাই ভয়ে আসেনি। কিন্তু যে মেয়েকে নিয়ে এত কাণ্ড, এত মামলা মোকদ্দমা সে মেয়ের আর মুখদর্শন করবেন না তিনি। আমার প্রতি রেনেকের কিছুটা দুর্বলতা ছিল। তাঁর অনমনীয় মনকে নমনীয় করার জন্য আমাকে ডাকা হল। অবশেষে অনেক করে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে একবার নাতির মুখ দেখার জন্য রাজী করালাম রেনেককে। যে রেনেক সেই অন্ধকার ঘরখানা ছেড়ে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসনের সেই জগৎ ছেড়ে কোথাও বার হতেন না সেই রেনেককে নিয়ে প্রতি রবিবার বিকালে বেড়াতে বেরোতাম। তিনি গোলাপী রং ভাল না বাসলেও তাঁকে গোলাপী ফুল ভালবাসতে শিখিয়েছিলাম।

ভন ম্যালাপার্ট নামে এক ধনীও রেনেকের মত একা একা থাকতেন। কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে রেনেকের ভাব করিয়ে দিই। ম্যালাপার্টের ফুলবাগানে বসন্তে ফুলের ছড়াছড়ি হত, যেখানে সেখানে রেনেককে পাঠিয়ে দিতাম কৌশলে।

এরপর মন হুফ্রাৎ হুয়েসজেনের কথা। ধর্মের দিক থেকে তিনি সংস্কারপন্থী ছিলেন না বলে কোন সরকারী পদ পাননি। কিন্তু কৃতী আইনজীবী হিসাবে নাম করেছিলেন। হুয়েসজেনের মাথায় টাক ছিল। সব সময় মুখে হাসি লেগেই থাকত। গণিতে তাঁর জ্ঞান ভাল ছিল এবং তিনি নিজের বুদ্ধিতে এমন এক ঘড়ি তৈরি করেন যা ঘণ্টা মিনিট ছাড়া সূর্য চন্দ্রের গতিবিধি বলে দিতে পারত। কিন্তু হুয়েসজেন আইন বিদ্যাকেই সবচেয়ে ভালবাসতেন এবং মনে

করতেন প্রত্যেক ছাত্রেরই আইন পড়া উচিত। কারণ এই আইনের দ্বারা নিপীড়িত উৎপীড়িত মানুষের উপকার করা যায় সবচেয়ে বেশী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার শিক্ষা, স্বভাব, গৃহ পরিবেশ এমনই ছিল যে আমি সমাজের নিচুর তলার লোকদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। কখনো কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠত না তাদের সঙ্গে। বিশেষ করে মিস্ত্রী বা কারিগরদের আমি দেখতে পারতাম না। কোন অসাধারণ বা বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে যাবার সাহস ছিল আমার। কিন্তু সে কাজ সম্পন্ন করার মত উপযুক্ত কৌশল ও কর্মশক্তি ছিল না।

এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আমি একটা জটিল ঘটনাজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি। আমি বলেছি পাইলেদস্ নামে আমার এক বন্ধু ছিল। একদিন ফোর্ট গ্যালাসের কাছে পাইলেদস্এর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার। তার সঙ্গে তার দু একজন বন্ধু ছিল। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌজন্য বিনিময়ের পরই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, আমি তোমার কবিতা আমার সঙ্গীদের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলাম। কিন্তু তারা কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না যে এটা তোমার লেখা।'

আমি বললাম, কবিতা সম্বন্ধে যার যা খুশি বলতে পারে। এতে বলার কিছু নেই। ছেড়ে দাও।

পাইলেদস্ কিন্তু অত সহজে ছাড়ল না। সে বলল, আমার বন্ধুদের বক্তব্য, এই ধরনের কবিতা লেখার জন্য যে ধরনের শিক্ষাদীক্ষা থাকা দরকার তা তোমাদের নেই। আমি কোন উত্তরই দিলাম না। তখন পাইলেদস্ তার সঙ্গীদের বলল, ঠিক আছে। তোমরা ওকে যে কোন বিষয়বস্তু দাও। ও সঙ্গে সঙ্গে এইখানেই কবিতা লিখে দেবে।

আমি তাতে রাজী হলাম। তখন ঠিক হলো আমাকে একটি প্রেমপত্র ছন্দোবদ্ধ কবিতায় লিখে দিতে হবে। ধরে নিতে হবে কোন এক যুবতী তার প্রেমিককে তার মনের কথা জানাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়লাম। ওরা আমাকে সাদা কাগজ দিল। ওরা কাছাকাছি থেকে আমার উপর নজর রাখতে লাগল। আমি লিখতে শুরু করলাম। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম যেন কোন তরুণী যুবতী আমাকে ভালবাসে এবং সে আমাকে

তার মনের গভীর গোপন কথাগুলো জানাচ্ছে।

কবিতাটা শেষ হলে পাইলেদস্ ও তার বন্ধুরা একবাক্যে প্রশংসা করল আমার। তারা আমাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। বলে গেল শীঘ্রই আবার দেখা হবে।

সত্যিই দেখা হলো। গ্রামাঞ্চলে এক প্রমোদভ্রমণের ব্যবস্থা হলো। পাইলেদস্ তার একদল বন্ধু নিয়ে হাজির হলো। তারা সবাই বলল, আমার চিঠিটা নিয়ে একটা বেশ মজার ব্যাপার করেছে তারা। তাদের এক বন্ধুর ধারণা মাত্র একদিনের পরিচয়েই এক যুবতী তার প্রেমে পড়েছে। ওরা তাই আমার সেই ছন্দোবদ্ধ প্রেমপত্রটিকে একটু সম্পাদনা করে অন্য হাতে লিখিয়ে সেই বন্ধুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছে। সে চিঠি পেয়ে বন্ধু ভাবছে তার প্রেমিকাই সে চিঠি লিখেছে। এবার সে সে চিঠির জবাব দিতে চায়। কিন্তু সে ক্ষমতা তার নেই। তাই আমার সাহায্য একান্ত দরকার।

খেলাচ্ছলে ছলনা ও প্রতারণা করে ছেলেবেলায় আমরা অনেক আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু এখন দেখলাম সব বয়সের মানুষই এ ধরনের ছলনায় আনন্দ পায়। যাই হোক আমি মত দিলাম। তারা চিঠির উপাদান আমাকে দিয়ে দিল। আমি লিখে দিলাম।

এরপর একদিন সন্ধ্যার সময় কোন এক হোটেলের এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ পেলাম আমি। গিয়ে দেখলাম পাইলেদস্এর সেই প্রেমিক বন্ধুটিই এই ভোজসভায় ব্যয়ভার বহন করছে। আমি গিয়ে বসলাম। খেলাম। কিন্তু ওদের সঙ্গ আর আমার ভাল লাগছিল না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এ ধরনের লেখা আর লিখব না। অকারণে একটি মানুষকে ছলনার দ্বারা প্রতারিত করে বিগত সন্ধ্যাটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎ একটা মিষ্টি ঘটনা ঘটে আমার মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল।

খাবার পর আমাদের কিছু মদের দরকার ছিল। আমাদের মধ্যে একজন হোটেলের পরিচারিকাকে ডাকল। কিন্তু পরিচারিকার বদলে এল পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে। নাম তার গ্রেচেন। তার মুখ চোখে অপরূপ লাবণ্য। সুন্দর সুগঠিত দেহ। আঁটসাঁট পোষাক। একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের অনুরোধে আমাদের কাছে বসে একপাত্র মদ পান করল গ্রেচেন।

সেদিন সন্ধ্যায় সেইখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটলেও আমার মনের মধ্যে

সব সময় সব জায়গায় গ্রেচেনের ছবিটা আনাগোনা করতে লাগল। যেহেতু তার বাড়িতে যাওয়ার কোন অজুহাত ছিল না আমার সেই হেতু একদিন চার্চে গেলাম তার দেখা পাবার আশায়। দেখা পেলাম। কিন্তু তার কাছে গিয়ে আলাপ করতে পারলাম না।

সেদিন না পারলেও আবার একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। পাইলেদস্ আবার আমাকে ডাকল সেই হোটেলের কোন এক সান্ধ্য ভোজসভায়। তার বন্ধুর যে প্রেমপত্র আমি লিখে দিয়েছিলাম সেটা তারা মিথ্যা করে বলেছে নির্দিষ্ট ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে। এবার মেয়ের তরফ থেকে উত্তর দেবার পালা। সেই উত্তর আমায় লিখতে হবে। এসব লেখা আর লিখতাম না আমি। কিন্তু হোটেলে গেলে গ্রেচেনকে দেখতে পাব বলে রাজী হয়ে গেলাম।

হোটেলে গিয়ে আমি আবার লেখা পড়ে শোনালাম। আমি যেন গ্রেচেনকে লক্ষ্য করেই এ চিঠি লিখেছি। কিন্তু আসলে পাইলেদস্এর বন্ধু যে মেয়েটিকে ভালবাসে সে ধনী ঘরের মেয়ে। সুতরাং কিছু অদল বদল করতে হলো। গ্রেচেন কাছ থেকে সব শুনছিল। এক সময় আমার বন্ধু উঠে যেতেই গ্রেচেন নিজে থেকে আমার কাছে মৃদু ভৎর্সনার স্বরে বলল, এসব কি করছেন আপনি? এটা অপরকে প্রতারণা করা হচ্ছে। এতে লাভ কি?

আমি বললাম, আসলে ব্যাপারটা মজার। নির্দোষ আমোদ।

গ্রেচেন বলল, এটা একটা মজার ব্যাপার নিশ্চয়, কিন্তু নির্দোষ না, মোটেই। আমি দেখেছি এর মধ্য দিয়ে অনেক যুবক নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

আমি বললাম, এখন আমি কি করব। চিঠিটা লেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু কিছু সংশোধন দরকার।

গ্রেচেন বলল, থাক, সংশোধন করতে হবে না। পকেটে রেখে দাও। আমি একজন গরীব মেয়ে। আমাকে ওরা প্রথমে চিঠিটা নকল করতে বলেছিল। আমি রাজী হইনি। আর তুমি ধনী ঘরের পুরুষ ছেলে হয়ে জেনে শুনে এমন কাজ করছ যাতে কোন ভাল হবে না, বরং তার থেকে অনেক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।

গ্রেচেনের এই সব কথায় তাকে আরও ভাল লেগে গেল আমার। আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়লাম আমি। আমি বললাম, কি হবে টাকা পয়সা বা ধন ঐশ্বর্যে যদি আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে না পাই।

এমন সময় আমার হাত থেকে আমার লেখা চিঠিটা নিয়ে শান্তভাবে

পড়তে লাগল। পড়ে আপনার মনে বলল গ্রেচেন, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত ভাল লেখা কোন ভাল বা সৎ উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

গ্রেচেন চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে দিলে আমি বললাম, কোন প্রেমিকার কাছ থেকে এই ধরনের চিঠি পাওয়া কতই না ভাগ্যের কথা। আচ্ছা, যদি কেউ তোমাকে ভালবেসে শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ধরনের লেখা লেখে তাহলে তুমি কি করবে ?

আমি কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই গ্রেচেন মৃদু হেসে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে কলম দিয়ে কাগজটাকে তার সই করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আবেগে আত্মহারা হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। কিন্তু গ্রেচেন বলল, না আলিঙ্গন বা চুম্বন নয় পারলে পরস্পরকে আমরা ভালবেসে যাব।

কাগজটা পকেটে ভরে রেখে বললাম, এ আর কেউ পাবে না। ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। তুমি আমাকে মুক্ত করলে অবাঞ্ছিত এই ব্যাপারটা হতে।

গ্রেচেন বলল, তোমার বন্ধুরা না আসতেই চলে যাও।

আমার যেতে মন সরছিল না। তবু যেতে হবে। গ্রেচেন আমার দুটো হাতের মধ্যে হাত নিয়ে মৃদু ছাপ দিল। আমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। জল এল। গ্রেচেনের চোখেও জল এল। আমি তার হাত দুটো তুলে নিয়ে আমার মুখের উপর একবার চেপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম।

প্রথম প্রেমের আবেগের সঙ্গে যেন এক আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা জড়িয়ে থাকে। গ্রেচেনের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যের এক নূতন জগৎ খুলে গেল আমার সামনে। আমার জীবন যৌবন যেন হঠাৎ অর্থময় হয়ে উঠল। আমি তার সই করা সেই কাগজটা বার বার পকেট থেকে বার করে সেটাকে চুম্বন করতে লাগলাম। বুকের উপর চেপে ধরলাম।

পরের রবিবার আবার আমি নিজের থেকে পুরনো বন্ধুদের আড্ডায় গেলাম। চিঠিটা ঠিক করে দিইনি বলে তারা মোটেই রাগ করেনি আমার উপর। বরং তারা নিজেরা যেচেই বলল, তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এই ধরনের বাজে কাজ আর করবে না। এর থেকে আমি যদি কিছু বিয়ের ও মৃত্যুর উপর কবিতা লিখে দিই, তাহলে তার থেকে তারা উপকৃত হবে এবং আমিও যা পাব তাতে হোটেলের বন্ধুদের খাওয়ার খরচটা হয়ে যাবে।

তারা সবাই ছিল স্বল্পবিত্ত ঘরের ছেলে। সবদিন হোটেলে কিছু খাবার

পয়সা থাকে না। তাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমি রাজি হয়ে গেলাম। তারা পরদিন সন্ধ্যায় আমাকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করল। গ্রেচেনও নাকি তাদের সঙ্গে থাবে। গ্রেচেনের কথা শুনে উল্লসিত হয়ে আমি পরের দিন সন্ধ্যার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই হোটেলে হাজির হলাম। গ্রেচেনকে দেখে খুশি হলাম। বন্ধুরা সব হই হুল্লোড় করতে লাগল। গ্রেচেন এক পাশে বসে চুপ করে রইল। আমার চোখ সব সময়ই প্রায় নিবদ্ধ ছিল গ্রেচেনের উপর। ঠিক হলো, তার বন্ধুরা একে একে তাদের জীবনের লক্ষ্য কি তা বলে যাবে। পাইলেদস্‌এর পর আমি বললাম।

আমার প্রতি আচরণের ব্যাপারে গ্রেচেন একটা সঙ্গতি আর রীতি মেনে চলত। আমি যখন কিছু লিখতাম বা পড়তাম তখন সে আমার কাছে ঘন হয়ে বসে আমার পিঠের উপর হাত রেখে তা দেখত। কিন্তু আমি যদি কখনো তার পিঠে বা কাঁধের উপর হাত রাখার চেষ্টা করতাম তাহলে সে সরে যেত। গ্রেচেনের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া শক্ত ছিল। সে কখনো চরকা কাটার কাজ করত, কখনো বা সেলাই-এর কাজ করত। কখন কোথায় কি কাজ করত তা বোঝাই যেত না। একদিন আমার লোকের জন্য একটা নামকরা বড় ফুলের দোকান থেকে ফুল আনতে গিয়ে দেখি গ্রেচেন অন্য পোষাক পরে সেই ফুলের দোকানে অস্থায়ীভাবে কোন এক কর্মচারীর পদ পূরণ করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে গ্রেচেন ইশারা করে আমাদের পরিচয়ের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করল।

পরে গ্রেচেনকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, তোমরা সেদিন আমার জীবনের লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলে নারীদের উচিত ভদ্র কাজের মধ্য দিয়ে তাদের অবসর সময় কাটানো। আমি সেদিন দেখলাম একটি ফুলের দোকানে একদিনের জন্য একটি কাজ খালি আছে। তাই ঢুকে গেলাম।

তবু আমার মনে হলো গ্রেচেনের মত সুন্দরী মেয়ের পক্ষে ঐ দোকানের কর্মচারিণীরূপে মোটেই মানায় না।

একদিন সন্ধ্যার সময় হোটেলে খাবার পর একটা মজার খেলা হলো। গ্রেচেন ও তার এক জ্ঞাতি ভাই কবিতা লেখা শিখতে লাগল আমার কাছে। মোটামুটিভাবে তাদের একে একে শিখিয়ে দিতে লাগলাম কিভাবে ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু শিখিয়ে দিলেও তারা তা পারল

না। তবু গ্রেচেন কাছে থাকায় আমার খুব ভাল লাগছিল খেলাটাকে।

একদিন সন্ধ্যার সময় তারা ডেকে বললেন জোশেফ রাজা নির্বাচিত হচ্ছে। অভিষেক উপলক্ষে দারুণ ধুমধাম হবে। সত্যিই অভিষেক উপলক্ষে যে উৎসব চলল, নানারকমের ঐশ্বর্যের যে বিপুল সমারোহ দেখলাম তার তুলনা হয় না।

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আমার ঘরে বসে আমি বিশ্রাম করছি এমন সময় মা এসে মুখ ভারী করে বললেন, শুনছি আজকাল তুমি নাকি কুসঙ্গে মিশছ। আমাদের কানে সব কথা এসেছে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বল।

কোন এক তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা তিনি সমস্ত ব্যাপারটার তদন্ত করবেন। কাউন্সিলার স্নিদেলই তদন্ত করবেন।

স্নিদেলের কথা মনে পড়ল আমার। একদিন উনিই 'মেসিয়া' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিয়েছিলেন আমাদের।

স্নিদেল এসে আমার সামনে চোখে জল নিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার মত এক নিরীহ যুবক সঙ্গদোষে ধাপে ধাপে নরকের পথে নেমে যাবে এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।

আমি বললাম, আমি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় বা অপরাধ করিনি এবং কোন কুসঙ্গেও মিশিনি।

স্নিদেল বললেন, দেখ, আমাকে বাধা না দিয়ে কথাটা স্বীকার করাই ভাল।

আমি বললাম, কি জানতে চান আপনি?

স্নিদেল বললেন, তুমি একটি লোকের চাকরির জন্য তোমার দাদামশাই-এর কাছে সুপারিশ করেছিলে?

আমি বললাম, হ্যাঁ করেছিলাম।

স্নিদেল আরও তিনজন ছেলের নাম করে বললেন, তুমি এদের সঙ্গে মেলা-মেশা কর?

আমি বললাম, প্রথম ছেলেটি ছাড়া আমি ওদের কাউকেই চিনি না।

স্নিদেল তখন আমার উপর স্বীকারোক্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। বললেন, তুমি কোথায় কোথায় যাও, কার কার সঙ্গে মেশ আমরা সব জেনেছি। আমার কাছে স্বীকার না করলে ম্যাজিস্ট্রেটের লোক আসবে। সেটা খুব খারাপ হবে। তুমি অপরের হয়ে চিঠি লিখে দিয়েছ। অনেক জাল

চিঠি ধরা পড়েছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, কার্যতঃ আমি কোন অন্যায় করিনি ঠিক। তবে আমি নিম্নশ্রেণীর এমন সব ছেলেদের সঙ্গে মিশেছি যারা যে কোন অপরাধ করতে পারে। অবশ্য তারা আমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

অবশেষে আমি স্নিদেলকে বললাম, যা যা হয়েছে আমি সব আপনাকে বিশ্বাস করে বলব। তবে যেন আমার কথা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং আমি যাদের সঙ্গে মিশতাম তাদের যেন অযথা কোন শাস্তি দেওয়া না হয়।

প্রথম থেকে অর্থাৎ পাইলেদস্‌এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যা যা হয়েছিল যা যা আমি করেছিলাম বা লিখেছিলাম সব বললাম স্নিদেলকে, গ্রেচেনের কথাও বললাম। বলে মনে ব্যথা পেলাম দারুণ। ভাবলাম এ সব না বললেই ভাল হত। আমার কোন ক্ষতি না হলেও তাদের ক্ষতি হবে হয়ত। যাই হোক, আমার চোখে জল দেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে স্নিদেল।

স্নিদেল চলে গেলে আমি মেঝের উপরে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার বোন এসে একসময় সান্ত্বনা দিল আমায়। বলল, কোন ভয় নেই। বলল, নিচেতে বাবার কাছে আর একজন দাঁড়িয়েছিল। স্নিদেল গিয়ে তাদের সব বলতে তারা সন্তুষ্ট হলো। সবাই হাসাহাসি করতে লাগল। সবাই বলল, ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

তবু আমি আমার বন্ধুদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রইলাম। যারা একদিন আমায় বিভিন্নভাবে আনন্দ দান করেছে, সঙ্গ দান করেছে তাদের জন্য দুঃখ হতে লাগল আমার। আমি বাড়ির মধ্যে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলাম। সারা দিনরাত বাড়ির মধ্যেই ভেবে ভেবে কাটাতে লাগলাম।

পরদিন বাবা আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু আমি গেলাম না। দিনকতকের মধ্যেই আমার অসুখ করে গেল। ডাক্তার ডাকতে হলো। অসুখের মধ্যেই আমার বন্ধুদের ভাগ্য সম্বন্ধে স্নিদেলের কাছ থেকে জানতে চাইলাম। অবশেষে আমাকে জানানো হলো আমার বন্ধুদের কারো কিছুই হয়নি। গ্রেচেন শহর থেকে গ্রামে চলে গেছে। তবে আমার মনে হলো, গ্রেচেন নিজে থেকে যায়নি। তাকে হয়ত আমার জন্যই যেতে বাধ্য করা হয়েছে। আর একথা ভাবতে গিয়ে অসুস্থ শরীরেই দারুণ কষ্ট পেলাম মনে। আমার মনে হলো পাইলেদস্ অথবা গ্রেচেন হয়ত চিঠি লিখেছিল আমায়। কিন্তু সে চিঠি আমাকে দেওয়া হয়নি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার দেখাশোনার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করা হলো। ভদ্রলোক বেশ অমায়িক লোক। এর আগে আমার বাবার বন্ধুর এক ছেলেকে পড়াতেন। সেই ছেলেটি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেছে। ঠিক হলো, ভদ্রলোক আমার পাশের ঘরে থাকবেন এবং আমাকে সঙ্গ ও সান্ত্বনা দান করে সাহায্য করবেন আমার আরোগ্য লাভে। মোটামুটি ভদ্রলোককে আমার ভালই লাগল।

কথা বলে জানলাম উনি আমার সব কিছুই শুনেছেন। আমি তাঁকে একদিন কথায় কথায় গ্রেচেনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, গ্রেচেন খুব ভাল মেয়ে। তদন্তকারীদের সামনে গ্রেচেন খুব ভাল সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সম্বন্ধে কি বলেছে? উনি তখন উত্তর করলেন, আপত্তিকর কিছুই বলেনি; বরং খুব ভাল কথা বলেছে। তদন্তকারীরা তার আচরণে মুগ্ধ। গ্রেচেন বলেছে, 'তুমি নাকি ছেলেমানুষ। তোমাকে ও ভাই-এর মত স্নেহ করত। তুমি যাতে কুসঙ্গে না মেশ বা কারো প্ররোচনায় বিপথে না যাও তার জন্য ও সাবধান করে দিত তোমায়। এখন সে গ্রামে চলে গেছে। তোমাদের বন্ধুদেরও কোন ক্ষতি হয়নি।

কথাটা শুনে কিন্তু মনে দুঃখ পেলাম আমি। গ্রেচেনের উপর রাগও হলো। গ্রেচেন আমাকে ছেলেমানুষ ভেবে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। যে একদিন আমার লেখা কবিতার প্রশংসা করেছিল নিজের মুখে। সেই গ্রেচেন আমাকে তুচ্ছ ভেবে আমার গুরুত্বকে উড়িয়ে দিয়েছে। ভাবলাম গ্রেচেনের নাম আর করব না। তার কথা কখনো ভাবব না।

আমার দেখাশোনার জন্য যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁকে আমি আমার 'ওভারসীয়ার' বলতাম। একটু সুস্থ হলে আমি আমার ওভারসীয়ারের সঙ্গে বেড়াতে বার হলাম একদিন। কিন্তু শহরের পথে বার হতেই আমার মনে হতে লাগল পাইলেদস্ আর তার বন্ধুদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হতে লাগল মনে মনে। যেদিকেই তাকাই ভয় ভয় ঠেকে, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে কি বলব তাদের? তাদের দেখা না গেলেও তাদের প্রেতগুলো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের সব পথে ঘাটে। আমি আমার ওভারসীয়ারকে বললাম বন দিয়ে বেড়াতে চলুন। লোকালয় ভাল লাগছে না।

ফার, ওক প্রভৃতি বড় বড় গাছগুলোর শীতল ছায়ার মধ্যে বসে বসে ভাবছে

বড় ভাল লাগছিল আমার। তবে কোন কথা নয়, শুধু একা থাকতে মন চাইছিল আমার। আমি একটা গাছের তলায় একা একা বসেছিলাম। আমার ওভারসীয়ার ছিলেন একটু দূরে। নির্জন বনভূমির শান্তশীতল স্তব্ধতায় আমার অন্তরের সব জ্বালা দুঃসহ স্মৃতির সব উত্তাপ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। বনভূমিতে ও ফাঁকা মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে ছবি আঁকার শখ হলো আমার। আমার দু-একটা ছবি দেখে বাবাও খুশি হলেন। তিনি নিজে ছবি ভালবাসতেন। আমার ওভারসীয়ার এই সময় বাবাকে বললেন আমি দেহ ও মনের দিক থেকে সেরে উঠেছি। আমি খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি নিজেকে বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে।

আগের থেকে কিছু স্বাধীনতা পেলাম আমি। বাইরে বেড়াতে দেওয়া হলো আমাকে। পাহাড় অঞ্চলে চলে গেলাম বেড়াতে। হামবার্গ, ক্রোনবার্গ থেকে শুরু করে রাইনের উপত্যকা পর্যন্ত বেড়ালাম। কিছু ছবিও আঁকলাম। কিন্তু ছবিগুলো তাড়াহুড়ো করে আঁকায় মোটেই ভাল হয়নি। ছবি নয় যেন কতকগুলো ছবির কাঁচা উপাদান। তবু বাবা ধৈর্য ধরে সেগুলো নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বসে গেলেন। সম্পূর্ণ বা আংশিক সংশোধনের চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমাদের বাবা ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। তিনি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাওয়া দাওয়ার উপর নজর রেখেছেন, পিতার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন এতেই তিনি সন্তুষ্ট। মা ছিলেন শিশুর মত সরল, আত্মভোলা। বাড়িতে আমার বোনই যেন একমাত্র কথা বলার লোক। আমার থেকে মাত্র এক বছরের ছোট আমার বোনই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

এই সময় এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তার কাছে আমি ইংরেজি ভাষা শিখতাম। আর সে আমার কাছে জার্মান ভাষা শিখত। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসত। আমার বোনকে ভালবাসত সে এবং ইংরেজি ভাষাতেই সে তার ভালবাসার কথা জানাত। ছেলে হিসাবে সত্যিই সে ছিল যোগ্য সব দিক দিয়ে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মুখ চোখ স্বাভাবিক। মুখে ছিল কিছু কিছু বসন্তের দাগ। আমার বোনের চেহারাটাও বেশ লম্বা আর সুগঠিত ছিল। মুখখানা তত সুশ্রী ছিল না। এ নিয়ে আমার বোনের দুঃখ ছিল মনে। কিন্তু গুণের দিক থেকে সে ছিল তুলনাহীনা।

মাঝে মাঝে আমরা প্রমোদভ্রমণে বার হতাম। বেশীর ভাগই নৌকোয় করে জলপথে যাওয়া হত। সবাই প্রায় জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী অথবা প্রণয় প্রণয়ীতে মিলে যেত। আমার বোনও তার সেই ইংরেজ প্রণয়ীকে সঙ্গে নিয়ে যেত। একমাত্র আমারই কোন সঙ্গী ছিল না। আমি শুধু একা একা তাদের সব আনন্দ লক্ষ্য করে যেতাম। তাই নিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলোকে আমার অনুভূতির রসে ভিজিয়ে আমার কবিতার মধ্যে নূতনভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করতাম।

এমনি করে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। নূতন পরিবেশে গিয়ে কেমন লাগবে, আমার জীবন কি রূপ নেবে, আমার শিক্ষাদীক্ষা কেমন হবে, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত রইল না আমার মনে। তবে একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলাম আমি। অর্থাৎ আমাদের শহরটা ফেলে দূরে থাকতে পারব। গ্রেচেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকেই শহরটাকে আর মোটেই ভাল লাগত না আমার। মনে হত এ শহরটা থেকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পেলে বেঁচে যাই। আমার জীবন থেকে গ্রেচেন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার যৌবনজীবন হতে প্রথম প্রেমের সবুজ সজীব চারা গাছটা মূল সমেত উৎপাটিত হয়ে যায় একেবারে। তার জায়গায় কোন নূতন চারা গাছ গজিয়ে উঠতে অনেক সময় লাগবে। আমি আর শহরের মধ্যে গ্রেচেনদের পাড়া দিয়ে যেতাম না। গোটা শহরটা আমার বন্দীশালা বলে মনে হল।

আর কোন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আগের মত মিশতাম না আমি। বেশী কথা খুব একটা বলতাম না। কবিতাই ছিল আমার অবিরাম সহচর। সময় কাটাবার একমাত্র উপায়।

অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় যাবার দিনটি এসে গেল। পুস্তক-বিক্রেতা ফ্লেসার সম্প্রতি আমার সঙ্গী হলেন। ফ্লেসারের স্ত্রী উইটেনবার্গে তাঁর বাপের বাড়ি যাচ্ছেন। আমরা যাব লিপজিগ। জীবনে প্রথম বাড়িঘর শহর বাবা মা আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দূরে যাচ্ছি আমি। প্রত্যেককেই একবার করে যেতে হয়। এটাই হয়ত প্রকৃতির নিয়ম। কারণ এইভাবেই মানুষ স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তখনই যখন সে বাড়ি ঘর বাবা মা, ভাই বোনের সাহচর্য ও সাহায্য ছেড়ে স্বাধীনভাবে কোথাও গিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করতে যায়।

লিপজিগ বিরাট শহর। কাজ কারবারের প্রচুর ভিড়। অসংখ্য কর্মব্যস্ত

মানুষের বিপুল আলোড়নে সব সময় স্পন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে হুক্রাথ বমি নামে একজন অধ্যাপকের হাতে পরিচয়পত্র দিলাম। তিনি ইতিহাস আর আইনবিদ্যার অধ্যাপক। কিন্তু আমার আইন মোটেই ভাল লাগে না। আমার ঝোঁক হচ্ছে প্রাচীন বিষয়ের সাহিত্য পাঠের উপর। প্রথমেই কথাটা বললাম না।

পরে অবশ্য আমার ইচ্ছার ব্যাপারটা শুনে আমাকে ভাল করে বোঝালেন হুক্রাথ। তিনি বললেন আইন পড়লে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিষ্কার হয়। তাছাড়া আমার বাবার একান্ত ইচ্ছা আমি আইন পড়ি। মনে আমার যাই থাক। হুক্রাথের কথা ও যুক্তি আমার ভাল লাগল। অধ্যাপকদের মধ্যে হুক্রাথকেই আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাঁর স্ত্রীও আমাকে ছেলের মত ভালবাসতেন। তিনি রুগ্ন বলে বাড়ি থেকে সন্ধ্যার দিকে কোথাও বেরোতেন না। তাই আমাকে রোজ সন্ধ্যার সময় যেতে বলতেন তাঁদের বাড়ি। আমার কাছে অনেক বড় বড় পরিচয়পত্র ছিল। আমি অভিজাত বংশের ছেলে। তাই অল্প দিনের মধ্যেই শহরের অভিজাত সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম। তাদের মনোমত পোষাক পড়ে ও তাদের মতোমত ভাষা বলে তাদের সঙ্গে অনেক মিশতাম। কিন্তু তাদের আদবকায়দা আমার ভাল লাগত না।

তর্কবিদ্যার জন্য দর্শনবিদ্যার ক্লাশে যেতে ভাল লাগত না আমার। তাছাড়া দর্শনের অধ্যাপক জগৎ, জীবন, আত্মা, ঈশ্বর সম্বন্ধে যা যা বললেন তা আমার আগে থেকেই জানা ছিল।

আইনবিদ্যার ক্লাশেও ঐ একই অভিজ্ঞতা। আমার কাছে আইনের যে সব বই ছিল এবং যেসব তত্ত্ব ও বিষয় পড়তাম, বুঝতাম, শিখতাম, অধ্যাপক তাই বোঝাতেন। কিছু নূতন কথা বলতেন না। এজন্য তাঁর বক্তৃতার সব কিছু খাতায় লিখে নেবার কোন উৎসাহ পেতাম না। অবশ্য আমি এটাও উপলব্ধি করলাম, আমি যে পরিমাণ পড়েছি সেই পরিমাণে পাঠ্য বিষয়গুলি হজম বা আত্মস্যাৎ করতে পারিনি। এজন্য আরো সময় দরকার।

প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও অভিজাত সমাজের মেয়ে পুরুষদের প্রতি কিছুদিন পর বিতৃষ্ণা জেগে উঠল আমার মনে। আমার মনে হতে লাগল, ওরা যেন আমার সব স্বাতন্ত্র্যকে গ্রাস করে নিতে চাইছে। ওরা চাইছে আমি নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলি ওদের মাঝে। আমার এতদিনের ধ্যান ধারণা,

ভাবধারা, চিন্তা কল্পনা সব কিছু নস্যাৎ করে দিয়ে তার জায়গায় ওদের চিন্তা ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তাই অভিজাত সমাজের সভা সমিতির থেকে মাদাম বমির সাহচর্য আমার অনেক ভাল লাগত। উনি জার্মান কবিতার একজন বড় সমঝদার ছিলেন। উনি যখন দেশের আধুনিক কবিতায় সমালোচনা করতেন তখন আমি তা মন দিয়ে শুনতাম। উনি বলতেন যে সব দুর্বলমনা কবি বসন্তকালীন সুখপিয়াসী পাখির মত শুধু বসন্তের গান গায় তাদের আমি দেখতে পারি না। আমি ভালবাসি সেই সব কবিতা যার মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হয়েছে চিরকালের কোন শাশ্বত কথা বা কাহিনী।

তাঁর স্বামী হফ্রাথ বমি সাধারণভাবে কবিতা মোটেই পছন্দ করতেন না। হফ্রাথ দম্পতির বাড়িতে আর একজন সহৃদয় অধ্যাপকের সংস্পর্শে আমি আসি। তিনি হলেন অধ্যাপক মোরাস। উনিও মাদাম হফ্রাথকে সমর্থন করতেন কবিতার আলোচনায়। মোরাসের মিষ্টি ব্যবহার আমার এত ভাল লেগে গেল যে আমি তাঁর বাড়ি যাওয়া আসা শুরু করেছিলাম। মাদাম বমির থেকে আরও যুক্তিপূর্ণ ও পরিণত ভাষায় চিরায়ত সাহিত্য সম্বন্ধে আমায় বুঝিয়ে দিতেন মোরাস।

জেনেমিয়াদস নামে আরও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। তিনি কবিতা মোটেই ভালবাসতেন না। তিনি শুধু প্রবন্ধ লিখতে বলতেন। আবার আমার কোন গদ্য রচনাও ভাল লাগত না তাঁর। তিনি বলতেন আমার গদ্য রচনার রীতি বড় সেকেলে। তাছাড়া তার মধ্যে যে পরিমাণে রোমান্সের আবেগ আছে সে পরিমাণে জীবনবোধমূলক কোন সারবস্তু নেই। আমিও তা স্বীকার করলাম। চিঠিতে মানুষ যেমন তার প্রিয়জনের কাছে আবেগ প্রকাশ করে তেমনি আমারও সব লেখাতেই আবেগের আতিশয্য এসে যেত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমি যে যুগে জন্মেছিলাম সে যুগ জার্মাণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে ছিল সমৃদ্ধির যুগ। তার পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য ছিল বিদেশী ভাষা ও চিন্তাধারার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত। রাজনৈতিক কারণে বিদেশী প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট

হয়ে যায় কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে। অকস্মাৎ সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক বিরাট প্লাবন আসে যেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সেই প্লাবন দ্বারা আনীত পলি মাটিতে যে সৃষ্টি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তার মধ্যে স্বদেশী ভাষা আর স্বদেশী চিন্তাধারাই ছিল প্রধান উপজীব্য। সে যুগের নামকরা লেখকদের মধ্যে লিসকাউ, রাবেনাও ও গটশেড, বেলির প্রভৃতির নাম অবশ্যই করতে হয়। সৃজনশীল সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনা সাহিত্যও উন্নত হয়ে উঠেছিল বিশেষভাবে।

আমি যে সব সাহিত্যরসিক বন্ধুদের সঙ্গে খুব বেশী মিশতাম তাঁরা হলেন ক্লোজার আর কেনেন। তাছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসে লেখা আর সমালোচনা পড়ে আমার একটা ধারণা স্পষ্ট হলো। আমাদের যুগের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দোষ এই যে সে যুগে সব লেখাই অনাবশ্যকভাবে আবেগপ্রধান ও দীর্ঘায়িত হয়ে উঠত। তাতে আসল বক্তব্য খুব কম থাকত আর যাও বা থাকত তা থাকত অস্পষ্টভাবে কুয়াশায় ঢাকা। আমি বুঝলাম লেখার মধ্যে আরো স্পষ্টতা, পরিমার্জিত চিন্তাশীলতা ও সংক্ষিপ্ত প্রয়োজন। আমার কিন্তু রেনির আর উইল্যাণ্ডের লেখা খুবই ভাল লাগত। উইল্যাণ্ডের লেখার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল আলোছায়ার এক অপূর্ব খেলা। বাস্তব অভিজ্ঞতার এক প্রখর প্রতপ্ত আলোর ঝলকানির সঙ্গে অবাস্তর এক আদর্শের ছায়াপাত।

প্রাণমাতানো এক চঞ্চল খেলায় মেতে উঠত তাঁর লেখার মধ্যে। এই আবহাওয়ার মধ্যে আমিও লেখা শুরু করে দিলাম। কবিতা লেখার উপর জোর দিলাম। আমার কিছু লেখা বাড়িতে বাবার কাছে ফেলে আসি। তারপর এখানে এসে বহু সুযোগ্য সাহিত্যরসিক ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশার ফলে আগের থেকে অনেক পরিণত লেখাও কিছু লিখি। কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম।

এই সময় গ্রেচেনের মত আর একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। সেও হোটেলে কাজ করত। তার নাম ছিল এ্যানেত্তে। মেয়েটি গ্রেচেনের মতই ছিল সুন্দরী। কিন্তু গ্রেচেনের থেকে অনেক শান্ত ও নম্রস্বভাবা। গ্রেচেনের তেজস্বিতা ও দৃঢ়তা তার ছিল না। সে আমাদের খাবার তৈরি করত, রাত্রে মদ এনে দিত। আমাদের ফরমাশ খাটত। তাকে খুব ভাল লেগে গেল আমার। এই ভাল লাগা যতই ভালবাসায় পরিণত হয়ে উঠল ততই তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতো আমার মনে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম এ সন্দেহ অকারণ, সত্যিই সে নিরীহ। তবু মন আমার বুঝত না। কেবলি মনে হত

সে হয়ত গোপনে আরো কাউকে ভালবাসে, মনে হত হয়ত সে বহুবল্লভা। অথচ আমি জানতাম এ্যালেক্তে আমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এবং আমাকে খুশি করার জন্ম সে অনেক কিছু করে। তবু একদিন আমি আমার সন্দেহের কথা তাকে বলে কত মনোকষ্ট দিলাম তাকে।

তবে এ্যালেক্তের প্রতি আমার আবেগের প্রবণতাটা কমতে আমি প্রেমিকদের খামখেয়াল নামে একটা নাটিকা লিখে ফেললাম। গ্রেচেনের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে যে পরিণাম ভোগ করতে হয়েছিল আমার তাতে একটা শিক্ষা হয়েছিল। আমার তথাকথিত ভদ্র সমাজটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছিলাম। যে অভিজাত সমাজ মুখে বড় বড় স্থায় নীতি আইন কানুন প্রভৃতির কথা বলে তারাই সুড়ঙ্গ পথে পার করে বেশী। এই নৈতিক অনুশাসন সব বাইরের ব্যাপার। মুখের কথা যা শুধু সমাজের উপরিপৃষ্ঠে ভেসে বেড়ায়। সমাজের গভীরে বা মানুষের বাস্তব আচরণে তার কোন স্থান নেই। শহরের পিচঢালা মসৃণ রাজপথের দুধারে বড় বড় সুদৃশ্য বাড়িগুলোতে যারা বাস করে তারা লোকচক্ষে ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণী। সবাই তাদের খাতির করে। কিন্তু সেই সব বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আমি দেখেছি অবৈধভাবে টাকা রোজগার, অবৈধ সংস্পর্শ, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি নানা অকর্ম কুকর্ম ও অশান্তি লেগেই আছে সেখানে। তার উপর তাদের বাড়িতে খুন, ডাকাতি, মেয়ে নিয়ে অশান্তি, বিষ খাওয়া প্রভৃতি কত অশান্তি। অনেক সময় অনেক পরিবারের বন্ধু হিসাবে আমি তাদের বিপদে সাহায্য করলাম। সেইসব বিপদের কথা বাইরে প্রকাশ করতাম না। এইসব পরিবারের কোন নোংরামি বা দুর্ঘটনার কথা বাইরে বড় একটা প্রকাশ হত না বলে কেউ জানতে পারত না। এই সব পারিবারিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে আমি দু একটা ছোট নাটকও লিখেছিলাম। কিন্তু যত কুকর্মের কথা স্থূলভাবে বলা ছিল বলে সে নাটক সার্থক শিল্পরসে তা উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

এরপর কিছু হনসির নাটক লিখি আমি। এই সময় মাদাম বনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে আমি আর বিশেষ যেতাম না তাঁদের বাড়িতে। তাঁর স্বামীর আইনের বক্তৃতা আমার ভাল লাগত না। তিনি আমাকে প্রায়ই বকতেন। তাই আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। একদিন তাঁর ক্লাসে আমি তাঁর বক্তৃতার নোট না লিখে আমার খাতার পৃষ্ঠায় ছবি আঁকছিলাম। তাই দেখে আমার পাশের ছাত্ররা অমনযোগী হয়ে

পড়ছিল।

আমার অমনোযোগী মনটাকে আরও গভীর ও আগ্রহশীল করে তোলার জন্য অধ্যাপক লোকটি আমাকে ধর্মের দিকে টানার চেষ্টা করলেন। নিয়মিত চার্চে যাওয়া, স্বীকারোক্তি করা, সমবেত প্রার্থনা ও যোগ প্রভৃতির প্রতি অভ্যাস গড়ে তুলতে বললেন। এসবও আমার ভাল লাগত না। তবু গেলার্তকে আমাদের ভাল লাগত। তাছাড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ধর্মীয় রীতিনীতি আমার মোটেই পছন্দ হত না। অথচ গেলার্ত আমাদের বোঝাতে চাইত ক্যাথলিকদের থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের রীতিনীতি অনেক ভাল। এখানে স্বীকারোক্তির জন্য বাধ্য করা হয় না কোন মানুষকে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বীকারোক্তির পক্ষে, কারণ মানুষ অনেক গোপন অব্যক্ত কথা ব্যক্ত করে হালকা হয়ে বলে ওঠে মনে মনে। আমার এই ধরনের একটা গোপন কথা ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে এক বিরাট সংশয় ছিল আমার মনে। এই সংশয়ের কথা আমি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চাই কোন সহৃদয় মানুষের কাছে। কিন্তু তার কোন ব্যবস্থাই নেই আমাদের ধর্মীয় রীতিতে।

হঠাৎ এক মহান ব্যক্তির সংস্পর্শে এলাম লিপজিগ শহরে। আমি যেন এই ধরনের এক মানুষকেই খুঁজছিলাম। তিনি হলেন বেহ্‌রিস্ক। আগে তিনি কাউণ্ট লিন্দেনানের ছেলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল তখন তিরিশের কিছু বেশী। রোগা অথচ সুগঠিত চেহারা। লম্বা নাক। সাদাসিদের উপরেই বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন পোষাক পরতেন।

বেহ্‌রিস্ক এক অদ্ভুত মানুষ। কবিতা তিনি ভালবাসতেন। তবে আধুনিক কোন কবির কবিতাই ভাল লাগল না তাঁর। আমার সঙ্গে এবিষয়ে কিছু অমিল ছিল তাঁর। তবু বেহ্‌রিস্ক তাঁর সেই ভাল না লাগার কথা এমন সুন্দরভাবে বুদ্ধির সঙ্গে পরিহাসরসিকতা মিশিয়ে বলতেন আর তার উপর আমি কিছু বলতে পারতাম না। তাছাড়া তাঁর জার্মাণ ভাষা ও সাহিত্যে পড়াশুনা ছিল প্রচুর। লিখতেও ভাল পারতেন। এক উন্নতমানের রুচিবোধ ছিল তাঁর আর তাই দিয়ে যে কোন কবিতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাল মন্দ দিকগুলো বলে দিতে পারতেন তিনি।

বেহ্‌রিস্ক আমায় ভালবাসতেন। তাঁর প্রেরণাতেই নতুন করে কবিতা লিখতে শুরু করি আমি। কিন্তু বেহ্‌রিস্ক এক শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিলেন। আমার কবিতা তখন ছাপানো চলবে না। আমি আমার লেখা

কবিতাগুলো তাঁর হাতে লিখে দেব আর তিনি সেগুলোর থেকে বেছে ভাল করে লিখে তার একটা সংকলন বাঁধিয়ে আমার হাতে তুলে দেবেন।

এই ধরনের একটা সংকলন সত্যিই সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করল বেহ্‌রিস্কের চেষ্টায়। লেখাগুলো খুবই প্রশংসা পেল। সংকলন পড়ে বাড়ি থেকে বাবা এক চিঠি লিখে পাঠালেন আমায় প্রশংসা করে। অধ্যাপক ক্লোডিয়াস ও গেলার্ত গদ্য ও পদ্যের রীতি সম্বন্ধে কিছু গালভরা উপদেশ দিলেও মোটের উপর ভাল বললেন।

কিন্তু হঠাৎ বেহ্‌রিস্কের মৃত্যু ঘটায় আমি দারুণ মুষড়ে পড়লাম। উনি ছিলেন একাধারে আমার বন্ধু, পরিচালক এবং প্রধান উপদেষ্টা। সেই বেহ্‌রিস্ককে বাদ দিয়ে জীবনে কিভাবে চলব তা খুঁজেই পেলাম না। এক অদম্য শোকাবেগের বিহ্বলতায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল আমার।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বেহ্‌রিস্কের পর যিনি আমার সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি হলেন ওয়েজার। বেহ্‌রিস্কের সঙ্গে কতকগুলো বিষয়ে যেমন তাঁর পার্থক্য ছিল তেমনি আবার কতকগুলো সাদৃশ্যও ছিল। এই কারণেই দুজনের মধ্যে আসে তুলনার কথা। সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের কথা, বেহ্‌রিস্কের মত ওয়েজারও অন্তহীন কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিতে চাইতেন জীবনটাকে।

ওয়েজার ছিলেন শিল্পরসিক। নিজেও আঁকতে পারতেন। তবে বেহ্‌রিস্ক যেমন কাব্যরসিক হয়েও আধুনিক কবিতা পছন্দ করতেন না, তেমনি ওয়েজারও শিল্পরসিক হলেও আধুনিক শিল্প পছন্দ করতেন। তিনি প্লেজেনবার্গ প্রাসাদে এ্যাকাডেমি অব ডিজাইন এর অধিকর্তা ছিলেন। তবে অবসর সময়ের সমস্তটাই ছবি এঁকে কাটাতেন। প্রাচীন শিল্পরীতিতেই তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। ওয়েজারের একটা গোঁড়ামি ছিল ;—একবার যদি তিনি কাউকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন তাহলে সে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হতে কখনও টলতেন না তিনি। কোন অবস্থাতেই তাঁর মতের পরিবর্তন হত না।

ওয়েজার যে ঘরে থাকতেন সে ঘরটা ছিল শিল্পরসের আবহাওয়ায় সিক্ত। বেহ্‌রিস্কের সংস্পর্শে এসে আমি যেমন নাটক ছেড়ে নূতন করে কবিতা লিখতে শুরু করি, তেমনি ওয়েজারের সংস্পর্শে এসে নূতন করে চিত্রশিল্প আঁকতে

শুরু করি। তবে আধুনিক শিল্প বাজে হচ্ছে ওয়েজারএর এ মত কিছুতেই মানতে পারলাম না আমি।

আমি আমার ছবি আঁকার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। শিল্প সম্বন্ধে ওয়েজারের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করত। কিন্তু ওয়েজারের নিজের আঁকা ছবিগুলো মোটেই ভাল লাগত না আমাদের। তাঁর হাতে কোন বস্তুর আকৃতিটা মোটেই ফুটে উঠত না ভাল করে।

ওয়েজারের আর একটা বড় কাজ হলো থিয়েটারের জন্য একটা বড় বাড়ি নির্মাণ। সে বাড়ির সামনে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লিস ও এ্যারিস্টোফেনসএর মূর্তি স্থাপন করা হলো আর সেই সব মূর্তির চারপাশে রইল আধুনিক জার্মানীর নাট্যকারদের মূর্তি। আবার তার সঙ্গে ছিল কলাবিদ্যার বিভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ছবি।

ওয়েজার চিত্রশিল্প সৃষ্টির কাজে নিজে খুব সার্থক না হলেও আমাদের আঁকার কাজে শিক্ষা দিতেন ভাল। আঁকার কাজে শিক্ষার্থীদের কোথায় কি ত্রুটি তা ঠিক ধরতে পারতেন। তবে নিজের হাতে কোন বিষয়ে দেখিয়ে না দিয়ে তিনি শুধু আমাদের দোষটা ধরিয়ে ভাবতে বলতেন যাতে আমরা নিজেরাই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারি।

এই সময় দার্জেনভিলের লেখা চিত্রকরদের জীবনীগ্রন্থটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হলো। এই অনুবাদটির মধ্য দিয়ে চিত্রকলার এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলাম আমরা। আবার আমার মনে এই সব বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শিল্পীর ছবি দেখে কবিতা লেখার প্রেরণা জাগত আপনা থেকে।

ওয়েজারের আর একটা গুণ ছিল। মৃত ব্যক্তিদের ছবি আঁকতে ভালবাসত। মৃতদের স্মরণ করার একটা ঝোঁক ছিল।

তখন লিপজিগ শহরে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমন্বয় ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে তিনজন ছিলেন বেশ নামকরা। তাঁরা হলেন হুবার, ক্রুশফ আর উইক্‌লার। হুবার জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসটাকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এটা সত্যই বিরাট কাজ যার জন্য ফরাসীরা কৃতজ্ঞ থাকবে চিরদিনের জন্য। বাকী দুজন ছিলেন শিল্পরসিক।

কিন্তু আমাদের চূড়ান্ত রসতৃপ্তি ঘটেনি। কিছুতেই মন ভরছিল না আমাদের। আমরা চাইছিলাম এক নূতন আলো। চাইছিলাম আমাদের পরিচিত কোন শিল্পী সে আলো নিয়ে আসবে।

মানুষের মন সাধারণতঃ দুভাবে আনন্দ পায়। এক হচ্ছে প্রত্যক্ষী-করণ আর অন্যটি হলো ধ্যানধারণ। প্রত্যক্ষীকরণের মধ্য দিয়ে আনন্দ পেতে হলে হাতের কাছে পার্থিব বস্তু বা উপাদান ভাল থাকা চাই। কিন্তু ধ্যান-ধারণার একটা সুবিধা এই যে এর মাধ্যমে বাস্তব প্রতিরূপ ছাড়াই কোন ভাল বিষয়বস্তুকে মনের মতো উপভোগ করা যায়।

এই সময় আমি আর্ণল্ডের 'দি হেস্ট্রি অফ দি চার্চ এ্যাণ্ড অফ হেরেটিকস্' নামে একখানি বই পাই হাতে। বইখানি পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর্ণল্ডের মতে ধর্ম বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমার মতের মিল হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা যাই হোক, ধর্মের ইতিহাস ও দর্শন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে মানবাত্মা নিরন্তর সংকোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে। মানুষের সত্তাটি একাধারে আত্মগত ও বিশ্বগত। কখনো সে সত্তা বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে নিজের মধ্যে নিজেকে কেন্দ্রীভূত করে সংগঠিত করে চলেছে, আবার কখনো বা নিজেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত করতে চাইছে। নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বসন্তকাল আসতেই আমি ভালভাবে সেরে উঠলাম। আমি আমার হারানো স্বাস্থ্য আবার ফিরে পেলাম। আর আমার বাড়িতে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাছাড়া বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও ভাল যাচ্ছিল না। তিনি এমনভাবে কথা বলতেন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যাতে মনে হত সব কিছু মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, মানুষ যেন ইচ্ছামত জীবনের যে কোন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কথায় কথায় আমিও কয়েকটি ক্ষেত্রে আঘাত দিয়ে ফেলেছি তাঁকে।

এরপর আমি স্ট্রেসবার্গ শহরে আইন পড়তে গেলাম। রাইন নদীর ধারে অবস্থিত ছবির মত সাজানো শহরটাকে আমার ভাল লাগত। শহরটার চারদিকে বড় বড় গাছে ভরা প্রান্তর। নদীর ধারটা বড় চমৎকার।

আমি সেখানে আমার আইনপড়া সম্পর্কে ডক্টর সালিকম্যান নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বললাম। আমাকে কতদিন থাকতে হবে, কতগুলি

বক্তৃতায় যোগদান করতে হবে সেসব বিষয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন এখানে কাজ চালাবার মত মোটামুটি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, আইনবিদ্যা গভীরভাবে পড়তে হবে জার্মানির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি আমাকে বলতেন, এখন যা করে হোক একটা ডিগ্রী নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দাও।

এতে কিন্তু আমার মন ভরছিল না। আমি সব কিছুর ইতিহাস জানতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম আমি যা পড়ব তার ক্ষেত্রটি হবে একই সঙ্গে বিরাট ব্যাপক এবং গভীর এবং আমি তাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করব।

আমি যে বোর্ডিংয়ে থাকতাম সেখানে বেশীর ভাগ সদস্য ডাক্তারী ছাত্র ছিল। তারা সব সময় চিকিৎসাবিদ্যার কথা বলত। ডাক্তারি পড়ার ছাত্রদের তাদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগের আতিশয্যের কারণ প্রধানত দুটো। প্রথম কথা, মানুষের রোগ ও দেহতত্ত্বের ব্যাপারটার একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে। মানুষ হিসাবে সবাই তা জানতে চায়। আর একটা কারণ আর্থিক লাভ। ডাক্তারি পাশ করে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলেই আসবে টাকা আর প্রতিষ্ঠা। এজন্য দেখতাম ডাক্তারির ছাত্ররা সব সময় সর্বশক্তি দিয়ে পড়াশুনো করত অথবা গভীর আগ্রহের সঙ্গে পড়ার বিষয়ে আলোচনা করত।

আমি আইনের ছাত্র হলেও তাদের আলোচনার স্রোত আমাকে অনেক সময় অনেক দূরে টেনে নিয়ে যেত। দেহতত্ত্বকে কেন্দ্র করে সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহকে বাড়িয়ে দিত।

এমন সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যা আমাদের মনটাকে দিনকতকের জন্য পড়াশুনোর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ খবর এল অস্ট্রিয়ার ডিউককন্যা ও ফ্রান্সের রাণী মেরি আঁতানোৎ স্ট্রেসবার্গ হয়ে ফ্রান্সে তাঁর স্বামীর কাছে যাবেন। স্ট্রেসবার্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হবে এবং শহরের বাইরে রাইন নদীর তীরে অবস্থিত এক সুসজ্জিত প্রাসাদে তিনি ফ্রান্সের রাষ্ট্র-দূতদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবে মেতে উঠল সারা শহর। পরে প্যারিসে বাজী পোড়ানো হলো। হুড়োহুড়ি ও পুলিশের বাড়াবাড়িতে কিছু লোক নিহত ও আহত হলো।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ও প্রভাবশালী কর্মচারি মাৎসম্যান-এর সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় হয়ে গেল। সে ছিল ভাল বাগ্মী এবং বিচক্ষণ। তার সঙ্গে অনেকে মিশতে চাইত। কিন্তু আমার বিভিন্ন বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান

ছিল এবং আমার বিচারবুদ্ধি সংস্কারমুক্ত ছিল বলে সে আমাকেই বেশী পছন্দ করত তার সঙ্গী হিসাবে। সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে পরামর্শ দিত বিভিন্ন বিষয়ে।

আমি স্ট্রসবার্গে ফ্রান্সের রাণীর আগমন উপলক্ষ্যে জীবনে এই প্রথম ফরাসী ভাষায় একটি কবিতা লিখি।

গ্রেচেনের সঙ্গে আমার প্রেম সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আমি সাধারণত আনন্দোৎসবের ঘটনাকে এড়িয়ে চলতাম। আমি নিজেকে যেন আত্মনিগ্রহের পথে ঠেলে দিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। ফ্রাঙ্কফুট ও লিপজিগে থাকার সময় আমোদ প্রমোদের সাধারণ উপকরণ বা উপাদান থেকে সরে থাকতাম আমি।

কিন্তু স্ট্রসবার্গে আসার পর এ বিষয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সুযোগ পেয়ে গেলাম। একে একে নাচের আসরে যেতে শুরু করলাম। শুধু শহরের মধ্যে নয়, মাঝে মাঝে গ্রামাঞ্চলেও যেতাম। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেলেই যেমন জার্মান শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে চর্চা করতাম তেমনি সন্ধ্যের দিকে কোথাও কোন নাচগানের আসরে সুযোগ পেলেই যোগদান করতাম।

এক সময় লার্সে নামে এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। আলাপ পরিচয় হতে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠি আমরা। সে সব সময় নিজেকে নায়ক ভাবত। সে প্রায়ই বলত ঈশ্বর তাকে নায়ক করেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। কি যুদ্ধ কি প্রেম সবেতেই সিদ্ধহস্ত সে। যুদ্ধের বীর ও প্রেমের নায়ক হিসাবে সে সব সময় তার মাথা উঁচু করেই থাকবে। দ্বিতীয় কোন ভূমিকা সে কখনো কোথাও গ্রহণ করবে না। আমি তার কথা মনে রেখেছিলাম, 'আয়রণ হ্যাণ্ড' নাটকে ফ্রাঁৎস লার্সে নামে একটি চরিত্রের মধ্যে তাকে মূর্ত করে তুলি আমি। সে সব সময় বড় বড় কথা বলত এবং সে কখনো কোন অবস্থায় কারো কাছে মাথা নত করলেও আত্মমর্যাদা ত্যাগ করত না।

শুধু নাচের আসরে গেলেই হবে না। ভাল নাচ শিখতে হবে। ওয়ালৎস নৃত্য আমার শিখতে ভাল লাগত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোন পারদর্শিতা ছিল না। তাই আমি একজন নাচের শিক্ষকের কাছে নিয়মিত নাচ শিখতে লাগলাম। তাঁর একটা ছোট বেহালা ছিল। আমি অল্প দিনের মধ্যেই ভালভাবে নাচ শিখে তাঁকে সন্তুষ্ট করলাম।

তাঁর দুটি মেয়ে ছিল। তাদের বয়স তখনো কুড়ি পার হয়নি। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তাদের মধ্যে ছোট এমিলিয়ার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ

হয়ে উঠলাম আমি। কিন্তু এমিলিয়ার আমার এই ঘনিষ্ঠতা বড় বোন লুসিণ্ডা মোটেই ভাল চোখে দেখত না। উল্টে ঈর্ষাবোধ করত এমিলিয়ার উপর।

একদিন এক বুড়ীর কাছে তার ভবিষ্যৎ গণনা করতে যায় লুসিণ্ডা। আমি তাকে ও তার বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। বুড়ী লুসিণ্ডার হাত দেখে বলে, তার প্রেমিক দূরে আছে। সে যাকে ভালবাসে সে কিন্তু তাকে ভালবাসে না; সুতরাং মিলনের আশা কম। তাদের প্রেমের মাঝখানে একজন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে চিঠিপত্র লিখে বা কিছু টাকা দিয়ে দেখতে পার।

লুসিণ্ডা বলল, আমার ভালবাসা যদি সত্য হয় তাহলে আর কিছুই লাগবে না। সে আমার প্রেমের প্রতিদান দেবেই।

বুড়ীকে টাকা দিয়ে চলে এলাম আমরা। আমি প্রায়ই তাদের বাড়ি যেতাম। একদিন এমিলিয়া তার জীবনের সব কথা খুলে বলল আমায়। সে বলল, সে আগে একটি ছেলেকে ভালবাসত। সে এখন দূরে। তবু আজও তাকে ভালবেসে যায়। তবে তুমি আসার পর থেকে তোমার গুরুত্বকেও অস্বীকার করতে পারছি না। এদিকে আমার দিদি লুসিণ্ডা আবার তোমাকে ভালবাসে অথচ তুমি আমার প্রতি আসক্ত। হায় তুমি আমাদের দুজনের কাউকেই সুখী করতে পারলে না। একজনকে ভালবেসে শুধু দুঃখ দিলে আর একজনকে ভালবাসা দিতে না পেরে দুঃখ দিলে।

আমরা সোফায় বসে কথা বলছিলাম। এমিলিয়ার কথা শেষ হতে আমি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন করলাম। সে বলল, এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা। আমি উঠে পড়লাম। সে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এল।

এমন সময় লুসিণ্ডা ঝড়ের বেগে পাগলের মত ঘরে ঢুকল। তার বোনকে বলল, একা তোর কাছেই ও শুধু বিদায় নেবে? আমি কেউ নই? এর আগেও তুই এইভাবে আমার প্রেমিককে ছিনিয়ে নিয়েছিস।

এই বলে সে জোর করে আমাকে ধরে আমার গালে তার চোখ দুটো ঘষতে লাগল। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর আমাকে ছেড়ে দিয়ে সোফার উপর সটান শুয়ে পড়ল লুসিণ্ডা। এমিলিয়া তার কাছে গেলে সে তাকে সরিয়ে দিল।

আমি কোনরকমে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। মনে মনে সংকল্প করলাম এ বাড়িতে জীবনে আর কোনদিন আসব না।

দশম পরিচ্ছেদ

জুং স্টিলিংএর মত হার্ডারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার একটা বিরাট আকর্ষণশক্তি ছিল যা আমাকে ক্রমাগত টানত তার দিকে। তার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশলেও তাকে কিন্তু আমি আমার কতকগুলো ব্যক্তিগত গোপন কথা বলিনি। যেমন গোয়েৎস ভণ বার্লিশিঞ্জেন ও ফাউস্টকে নিয়ে আমি যে লেখার কথা ভাবতাম তাদের কথা বলিনি তাকে।

যাই হোক, হার্ডারের একবার অসুখ করতে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্য মন হাঁপিয়ে উঠল আমার। আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। হার্ডার রোগমুক্ত হতেই আমরা ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে হার্ডার আর একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আর দুজন পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীকে নিয়ে আমি ঘোড়ায় চেপে জেবার্ণের পথে রওনা হলাম।

জেবার্ণে একমাত্র দেখার জিনিস হলো বিশপের প্রাসাদ। এরপর আমরা পাহাড়ের উপর ওঠে জেবার্ণ স্টেয়ার্স নামে এক স্থাপত্যকীর্তির বিরাট নিদর্শন দেখলাম। তখন সবেমাত্র সূর্য উঠছিল পাহাড়ের মাথায়। সেদিন ছিল রবিবার। বেলা নটার সময় আমরা পাহাড় থেকে নিচে শহরে নেমে এলাম।

এরপর আমরা বুখনওয়েলার নামে আর একটি শহরে গেলাম। সেখানে ওয়েল্যাণ্ড নামে আমাদের এক বন্ধু ছিল। সে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। আমরা আরো উপরে ওঠার মনস্থ করলাম। পার্বত্য প্রদেশের আরো মনোরম দৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল আমাদের। পাহাড়ের উপর অবস্থিত লিচেনবার্গের প্রাসাদ দেখার পর দক্ষিণ পূর্ব দিকে এগিয়েই সহসা সামনে দেখতে পেলাম আলসেসির বিশাল প্রান্তর যা দূরে বহুদূরে পাহাড়ের ছবি আঁকা দিগন্তের কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে।

পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়, নদী, যা কিছুই দেখি তাই বিস্ময় সৃষ্টি করে আমার মনে। তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়। পথে কোন নদী দেখলেই মনে হয় ছুটে যাই তার উৎসদেশে। কোন পাহাড় দেখলেই মনে হয় তার মাথায় উঠে যাই। দেখি তার বুকের অরণ্যের মাঝে।

এরপর আমরা উত্তর-পশ্চিমের পর্বতমালার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এগিয়ে যেতে লাগলাম লোরেনের পথে। এরপর শুরু হলো অরণ্যপথ। এক একটা পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক একটা গহন অরণ্য। পথে যেতে

যেতে একটি মুখখোলা কয়লাখনি দেখলাম। তারপর দেখলাম এক জলন্ত আগ্নেয়গিরি। পাহাড়ের মাথায় পাথরগুলো আগুনে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে। অনবরত ধোঁয়া উঠছে। পাহাড়ের কাছে যেতেই আমাদের পায়ে গরম অনুভব করলাম। কেউ জানে না কখন কিভাবে আগুন এল এখানে।

এরপর ফেরার পালা। এই সময় ইংরেজ লেখক ও কবি গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' বইখানি আমাকে সঙ্গদান করত। বইখানির জার্মান অনুবাদ পড়তে ভাল লাগত আমার। আমার প্রিয় সেসেনহেমে ফিরে এলাম।

ওয়েল্যাণ্ড আমাদের সঙ্গেই ছিল। আমরা যে গাঁয়ের পান্থশালায় ডেরা নিয়েছিলাম সেখানে এক পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হই আমি। সে পরিবার ওয়েল্যাণ্ডের পরিচিত। পরিবার মানে দুই বোন এক ভাই আর বাবা মা। আমার মনে হলো, ঠিক যেন সম্প্রতি পড়া গোল্ডস্মিথের ওয়েকফিল্ড। প্রতিটি চরিত্র হুবহু মিলে যাচ্ছে। আমার অবশ্য ছোট বোন ফ্রেডারিকাকেই বেশী সুন্দরী ও আকর্ষণীয় বলে মনে হত, তবে বড় বোনও কম সুন্দরী নয়।

ওদের বাবার থেকে মার ব্যক্তিত্বই বেশী মনে হলো। শিক্ষিতা ও মার্জিতরুচি-সম্পন্না ভদ্রমহিলাকে দেখলে একই সঙ্গে ভয় ও শ্রদ্ধা জাগে। বোন দুজনের মধ্যে দেখলাম গ্রাম্যতা ও নাগরিকতার দ্বৈত সমন্বয়ে গড়া একটা মিশ্র ভাব।

বিশেষ করে ছোট বোন সুন্দরী ফ্রেডারিকার সঙ্গে আলাপ করে তার স্বভাবের অনাবিল মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। একদিন তার কাছে বসে অনেকটা সময় কাটালাম। পরে ওয়েল্যাণ্ডকে প্রশ্ন করলাম, ফ্রেডারিকা কি কাউকে ভালবেসেছিল বা এখনও বাসে? সে কি কারো বাগ্‌দত্তা? ওয়েল্যাণ্ড আমার সব প্রশ্নের উত্তরেই 'না' বলল। আমি বললাম, কোন মানুষ ভাল না বাসলে এত প্রাণ খুলে হাসতে পারে না। আমার মনে হলো ফ্রেডারিকা নিশ্চয় কাউকে ভালবেসে হারিয়ে আবার তাকে খুঁজে পেয়েছে। জীবনের পরম ধনকে হারিয়ে পাওয়ার দ্বিগুণ আনন্দে তাই এত আত্মহারা। অথবা তার কোন দীর্ঘায়িত প্রণয়সম্পর্ক আশা নিরাশার চড়াই উৎড়াই পার হয়ে অবশেষে শুভ পরিণয়ে সার্থক হতে চলেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আবার ফিরে এলাম আমার পড়ার জায়গায়। ফিরে এলাম আমার ছাত্র-জীবনে। মনের মধ্যে সংকল্প গড়ে তুললাম, আইনবিদ্যায় আমার কৃতিত্বের

সঙ্গে পাশ করতে হবে। চিকিৎসাবিদ্যা আমাকে আকৃষ্ট করলেও আমার আরব্ধ কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করতে হবেই।

তবু সেসেনহেম গাঁয়ের সেই সন্ধ্যাটা ভুলতে পারলাম না। ভুলতে পারলাম না ফ্রেডারিকার কথা। আমি সেখানে এক সন্ধ্যায় একটা গল্প লিখে ওদের শুনিয়েছিলাম। ওরা আগ্রহ সহকারে শুনেছিল। গল্প শেষ হলে আমায় আবার এই ধরনের গল্প লিখতে বলেছিল।

ওদের কথা ভেবেই আমি একদিন ঘোড়ায় করে আবার গিয়ে উঠলাম সেসেনহেম গাঁয়ে।

আমি ফ্রেডারিকাদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম ওরা দুই বোনে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই সে তার দিদিকে বলল, সে যা বলেছিল তা সত্য হলো। আমি আজ তাদের বাড়ি যাব একথা সে নাকি আগেই অনুমান করে তার দিদি অলিভিয়াকে বলেছিল।

অলিভিয়া হাসতে লাগল। ওদের মা আমাকে আত্মীয়ের মতই সহজভাবে অভ্যর্থনা করলেন। পরদিন সকালে ফ্রেডারিকা আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেল। ওর মা ও দিদি ব্যস্ত ছিল বাড়ির কাজে। আজ ওদের বাড়িতে কয়েকজন অতিথি আসবে। সেদিন ছিল রবিবার। ফ্রেডারিকার পাশে ছুটির দিনের উজ্জ্বল সকালটাকে এমনএক সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশে কাটাতে অদ্ভুত ভাল লাগছিল আমার।

ওদের বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম ওদের অতিথিরা এসে গেছে। দেখলাম ওরা ফ্রেডারিকাকে সবাই খুব ভালবাসে। আমি জীবনে যত মেয়ের সংস্পর্শে এসেছি তাদের সাধারণতঃ দু শ্রেণীতে ভাগ করে দেখি আমি। এক শ্রেণীর মেয়েদের ঘরের মধ্যে ভাল লাগে। ভাল লাগে তাদের পাকা গৃহিণীরূপে। আমার মনে হয় ফ্রেডারিকা এমন শ্রেণীর মেয়ে যাকে ভাল লাগে ঘরের বাইরে। সে যখন মুক্ত আকাশের তলে বিস্তৃত পথের উপর দিয়ে চলে তখন তার দেহের অপূর্ব যৌবন সৌন্দর্য ফুল্লকুসুমিত উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে যেন মিশে এক হয়ে যায়। তার মুখের হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ যেন নীল আকাশ থেকে টাটকা ঝরে পড়া এক আশ্চর্য বস্তু। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য সে যেন ঘরের মধ্যেও বয়ে আনে আর তাই বোধ হয় যে কোন অপ্রীতিকর প্রতিকূল অবস্থাকে অত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে ফ্রেডারিকা।

ওদের বাড়িতে থাকার সময় একদিন রাতে হঠাৎ লুসিণ্ডাকে স্বপ্নে দেখলাম।

সে স্বপ্ন উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে উঠল আমার দেহের সমস্ত রক্ত। মনে হলো লুসিণ্ডা আমাকে আবেগের সঙ্গে ধরে আমার মুখে চুম্বন করে আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। তার মুখে ফুটে উঠেছে তীব্র ঘৃণার ভাব। সে তার বোনকে অভিশাপ দিচ্ছে। অভিশাপ আমার উপরেও বেশ কিছুটা পড়েছে। আর সেই অভিশাপ বর্ষণের মাঝে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে তার বোন।

আমি আবার শহরে ফিরে এলাম। ফ্রেডারিকার বাবাকে একটা কথা দিয়েছিলাম। উনি একটা বাড়ি তৈরি করতে চান গাঁয়ে। কিন্তু ওঁর পরিকল্পিত নক্সাটা কারো পছন্দ হচ্ছে না। আমি তাই শহরে এসেই আমার এক পরিচিত স্থপতিকে দিয়ে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর বাড়ির নক্সা করালাম। এরপর ফ্রেডারিকাদের আসতে বললাম স্ট্রসবার্গ শহরে। এ শহরে ওদের এক আত্মীয় পরিবার আছে। সেখানে এসে ওরা সহজেই উঠতে পারে। ওরা কিন্তু কেউ শহরে আসতে চায় না। অলিভিয়া ত একেবারে গ্রাম্য আচারে ব্যবহারে। কিন্তু ফ্রেডারিকারও কোন মোহ বা আগ্রহ নেই শহরের প্রতি। কিন্তু আমি ত ওদের বাড়ি কতবার গেছি, কতদিন থেকেছি। আর ওরা আমার একটা অনুরোধ রাখবে না।

অবশেষে ওরা এল। কিন্তু সত্যিই আমার ভাল লাগল না। আমার মনে হলো আমি সত্যিই ভুল করেছি। যাদের আমি মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে মুক্ত আকাশের তলে প্রবহমান নদীর ধারে নুয়েপড়া গাছের ছায়ায় দেখেছি, যাদের অঙ্গলাবণ্যকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখেছি, তাদের শহরের এই ইট কাঠ পাথরের কৃত্রিম পরিবেশে মোটেই ভাল লাগল না।

অবশ্য অন্তরের ভালবাসা কোন পরিবেশ মানে না। প্রতিকূল পরিবেশকেও অনুকূল করে তোলে। তবু পরিবেশের আনুকূল্যে ভালবাসা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বেশী। সার্থকতা লাভ করে সহজে। তাই ওরা যখন চলে গেল তখন আমার মনে হলো আমার বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। আমি আবার সহজভাবে পড়াশুনায় মন দিতে পারলাম।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে পড়তে আসার সময় আমি আমার বাবাকে কথা দিয়ে এসেছিলাম আমি ভালভাবে আইন পাশ করব। বিশ্ববিদ্যালয় লাতিন ভাষায় লেখা আমার গবেষণার কাজ সমর্থন করল। আমি আইনের ডিগ্রী পেলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমায় বলল, এখন এই মুহূর্তে সেটা যেন প্রকাশ না করি। পরে ভাল করে আরো বড় করে সেটা লিখে যেন প্রকাশ করি। বাবাকে

একথা জানালে তিনি আমাকে সেটা এখনি প্রকাশ করতে বললেন। কিন্তু আমি ভবিষ্যতে সেটা আবার ভাল আকারে প্রকাশ করার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

আমি ডিগ্রী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক স্কফলিন মারা গেলেন। আমার মনের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, তবু পড়াশুনার অন্ত ছিল না তাঁর। সারা জীবন ধরে তিনি রয়ে গেছেন শিক্ষার্থী। অসাধারণ হয়েও সাধারণ এই নিরহঙ্কার মানুষটি সহজেই টেনে নেন আমার মনকে। তিনি আমাদের পড়াতেন রাজনীতি।

এই সময় ফরাসী সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনো করি। কিন্তু সে সাহিত্যের কাছে আমি যা আশা করেছিলাম তা পেলাম না। ভলতেয়ার যিনি দীর্ঘকাল ফরাসী সাহিত্যের ক্ষেত্রটিকে আচ্ছন্ন করে ছিলেন তিনি সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। দিদেরো, রুশো, হলবার্ক প্রভৃতি এঁদের কল্পনা এতই নীচু যে আমরা তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারিনি আমাদের চিন্তাভাবনাকে।

সাহিত্যের মধ্যে আমি যা খুঁজছিলাম হঠাৎ তা পেয়ে গেলাম। এক অভাবিত সাফল্যের সঙ্গে পূর্ণতার সঙ্গে পেয়ে গেলাম শেকস্‌পীয়ারের মধ্যে। শেকস্‌পীয়ার নিয়ে তখন স্ট্রসবার্গে জ্ঞান চর্চা শুরু হয়েছিল। তাঁর মূল রচনার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ভাষায় অনূদিত রচনাও বিভিন্ন জায়গায় পড়া ও অভিনীত হত। শেকস্‌পীয়ারের উপর আমার বন্ধু হার্ডার একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। এই রকম অনেকেই লিখত তখন। আলোচনা করত চারদিকে।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে আমি একবার ওডিলেনবার্গে তীর্থযাত্রায় যাই। সেখানে গিয়ে অদ্ভুত এক কাহিনী শুনি। রোমান আমলের এক সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মাঝে দেখতে পাই একটি ভূমিসাৎ প্রাসাদের একটি দেওয়াল আজও দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলত ঐখানে কোন এক ধর্মপ্রাণা কাউন্ট-কন্যা একা একা এক পবিত্র ধর্মজীবন যাপন করতেন। আমি সে কাহিনী শুনে সেই অদৃষ্টপূর্ব কাউন্টকন্যার এক মূর্তি কল্পনায় খাড়া করি।

কিন্তু যখন যেখানে যাই ফ্রেডারিকাকে ভুলতে পারি না কখনো। স্মৃতির মাঝে সমানে চলে তার স্বচ্ছন্দে আনাগোনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দীর্ঘ অনুপস্থিতি আর দেশভ্রমণের পর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। এবার কিন্তু আগের থেকে দেহমন দুটোই আমার অনেক উজ্জ্বল। মাকে আবার তেমনি মমতাময়ী ও স্নেহময়ীরূপে ফিরে পেলাম আমি। আপোষহীন অনমনীয় বাবা আর কল্পনাপ্রবণ আবেগপ্রবণ আমার মাঝে মা-ই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধন। তিনি আমাদের সব দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিতেন।

এই সময় আমরা শহরে এক সান্ধ্যসভায় যাতায়াত করতাম। শহরের উচ্চ-শিক্ষিত বিশিষ্ট লোকরা সেখানে আসতেন। তাঁরা আমাকে সাহিত্যসৃষ্টির কাজে দারুণভাবে উৎসাহ যোগাতেন। আমার সমাপ্ত, অসমাপ্ত বা আরব্ধ অনেক লেখা আমি তাঁদের কাছে পড়ে শোনাতাম। তাঁরা সব মন দিয়ে শুনতেন এবং উৎসাহ দিতেন। ফাউস্টের পরিকল্পনার কথাটা তাঁদের আমি প্রথম বলি। বলি যে মেফিস্টোফেলিসের মত এক বন্ধু সত্যিই আমি আমার জীবনে পেয়েছিলাম।

এই সময় বাইবেল নিয়েও নূতন করে পড়াশুনা করি। ওল্ড ও নিউ টেস্টা-মেণ্টের সব ধর্মগত সত্যকে মেনে নিতে পারল না আমার মন। আমি সব কিছু চিরে চিরে বিচার করে দেখলাম। আমার যুক্তিবাদী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভাবাপন্ন মনে প্রথাগত ও ধর্মগত সত্য সম্পর্কে নানা রকমের প্রশ্ন জাগতে লাগল।

এত সব সত্বেও ফ্রেডারিকার কথাটা ভুলতে পারলাম না কিছুতেই। আর তার জন্যই কাব্যচর্চা করতে লাগলাম আবার। এই কাব্যরসই আমাকে মুক্তি দিল সকল বেদনার হাত থেকে। অন্য সব জার্মান আধুনিক কবিদের মধ্যে ক্লপস্টকের লেখা আমার ভাল লাগত। আর প্রাচীনদের মধ্যে ভাল লাগত হোমার।

ঘটনাক্রমে আমি দুজন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হই যাদের প্রকৃতি আমার ভাল লাগে এবং যাদের জীবনকে আমি গোয়েৎস ও ওয়ার্দার এই দুই রচনার নায়ক হিসাবে মূর্ত করে তুলি। অবশ্য ওয়ার্দারের মধ্যে আমার নিজের গভীর অন্তর্জীবনের ব্যথা বেদনার অনেকখানি মিশে ছিল। ওয়ার্দার ছিল আমার বন্ধু এবং তার অপ্রাপণীয়া প্রেমিকা লোত্তে যেন ছিল আমারও প্রেমিকা। তবে ওয়ার্দারের মত আমার প্রেমাবেগ অতখানি ভয়ঙ্কর এবং আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারেনি।

ক্রোসার বলে আমার এক বন্ধু আমার বোনের প্রতি তার প্রেমাসক্তির

কথা প্রকাশ করে। আমার বোনকে বিয়ে করতে চায় সে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হয়ে যাই তার কথা শুনে। অবশ্য এর কোন প্রতিবাদও করিনি আমি।

আমার বন্ধু বাগ্মী মার্ককে দেখেই আমি গোয়েৎস ভন বার্লিশিঞ্জেনের কথা ভাবি। মার্ককে সঙ্গে করে আমি একবার ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে কবনেস্তস্-এর পথে রওনা হই। পথে পাই রাইন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত অনেক শান্ত সুন্দর সাজানো এক গ্রাম।

জেরুজালেম নামে একটি ছেলে তার এক বন্ধুর স্ত্রীকে ভালবাসত। এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে জয় করতে পারেনি সে কোনমতে। তাই সে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। জেরুজালেমের এই হৃদয়যন্ত্রণা আর মৃত্যুই আমার ওয়ার্দারের পটভূমি রচনা করে। আমি তখন ওয়ার্দারের মধ্য দিয়ে জেরুজালেম ও আমার নিজের ব্যর্থ প্রেমের অনতিক্রম্য বিষাদ ও বেদনাকে এক বাঙ্ময় রূপ দান করি। এক ভ্রান্ত আবেগপ্রবণ যুবকের অপ্রকৃতিস্থ মনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলি আমি এই রচনার মধ্যে। ওয়ার্দারের আত্মহত্যার কথা লিখতে গিয়ে আমি নিজেও এই আত্মহত্যার কথা ভাবি এবং যুক্তি দিয়ে তা সমর্থন করি।

'ওয়ার্দারের দুঃখ' এই ছোট্ট বইখানি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তার আবেদন অপরিসীম। ওয়ার্দারের দুঃখ সকল শ্রেণীর নরনারীর মর্মকে স্পর্শ করে বিদীর্ণ করে।

গোয়েৎস ভন বার্লিশিঞ্জেনকে নিয়ে লেখা নাটকখানিও সে যুগের সত্যকে অনেকখানি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আমার বিভিন্ন রচনা যতই প্রকাশিত হতে লাগল ততই সাড়া পড়ে গেল আমার বন্ধুদের মধ্যে। আমার যেসব পুরনো বন্ধুদের কাছে আগে আমার কত কবিতা ও বিভিন্ন রচনা পড়ে শোনাতাম, তাদের মতামত চাইতাম তারা তখন ভাবতেই পারেনি সেই সব রচনা একদিন প্রকাশিত হবে ও জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

এইসব দেখে এবং আমার প্রকাশিত সাড়া জাগানো অনেক রচনা পড়ে পুরনো বন্ধুরা যেমন দেখা করতে আসত আমার সঙ্গে তেমনি অনেক

সাহিত্যানুরাগী নূতন বন্ধুও জুটল।

এইসব বন্ধুদের মধ্যে লেঁৎস ছিল অন্যতম। সে বড় হাসাতে পারত। তার এই পরিহাসরসিকতার জন্য আমার ভাল লাগত তাকে। এই লেঁৎস একবার তার লেখা একটি কাব্যনাটক আমাকে দেখাবার জন্য নিয়ে আসে। কাব্যনাটকটি তার প্রেমাস্পদকে নিয়ে লেখা। সে এক সুন্দরী মহিলাকে ভালবাসত। কিন্তু মেয়েটির প্রতি আরো কয়েকজন আসক্ত ছিল এবং লেঁৎস তার সঙ্গে ব্যবহার করে কিছুই বুঝতে পারত না মহিলাটি তাকে ঠিক ভালবাসে কিনা। মহিলাটি ছিল খুব খেয়ালী। এক সময় খুব ভাল থাকে, আবার এক সময় খুব রেগে যায়। যাই হোক তার মিলনাত্মক কাব্যনাটকটি Diesoldatin বা সৈনিকগণ পড়ে আমার মোটেই ভাল লাগল না। আমি সরাসরি চিঠিতে জানালাম, এর মধ্যে কবিতাই নেই, তুমি এ লাইনের লোক নও। তার থেকে তুমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা গদ্যে লিখে একটা প্রেমের গল্প খাড়া করার চেষ্টা করো।

এরপর আমার 'আয়রণ হ্যাণ্ড' নাটকটি প্রকাশিত হলে লেঁৎস তার সমালোচনা করে এক চিঠি দিল। আমার প্রতিভার সঙ্গে তার প্রতিভার তুলনা করল। যাই হোক, আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিলাম। আসল কথা লেঁৎস কবিতা লিখত সে ছিল বড় খেয়ালী। কোন একাগ্রতা ছিল না। তাই দেশের কাব্যাকাশে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

অথচ আমার অন্য আর এক বন্ধু ক্লিঙ্গার ছিল কিন্তু লেঁৎস-এর ঠিক বিপরীত। সে দৃঢ়চেতা, অধ্যবসায়ী। সেও কবিতা লিখত এবং এখনো টিকে আছে কাব্যের জগতে। সে ছিল রুশোর ভক্ত। তার লম্বা ছিপছিপে চেহারার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল।

এই সময় ল্যাভেটার নামে এক খৃস্টান সাধক আমাদের দেশে বেড়াতে আসে। আমার সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে। আমার বন্ধু ক্রনিল কিটেনবার্গও একজন নিষ্ঠাবান খৃস্টান। এদের দুজনের মধ্যে প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হত। আসলে ল্যাভেটার ছিল ভক্ত। তার দেহ মন দুটোই ছিল খৃস্টের উপর সমর্পিত। কিন্তু ক্রলিন ও আমার দেহমনের সমস্ত চেতনা ল্যাভেটারের মত খৃস্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল না। খৃস্টধর্মের মহিমা আমরা মনে মনে স্বীকার করি। মোট কথা, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে

পার্থক্য থাকবেই সকল ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে। ভক্তির মধ্যে মানুষ চিরকাল তার আবেগ অনুভূতি কল্পনা সব ঢেলে এক সাকার ঈশ্বরকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু জ্ঞান সব সময় মানুষকে টেনে নিয়ে যায় নির্বিশেষ নিরাকার ঈশ্বরের দিকে। কারণ বিশুদ্ধ জ্ঞান কখনো কোন সীমা মানতে চায় না।

ক্রলিন ভণ কিটেনবার্গ ছিল জ্ঞানযোগী। সে নিয়মিত যোগসাধনা করত বলে আমি তার কাছে প্রায়ই যেতাম। যতক্ষণ তার কাছে থাকতাম ততক্ষণ আমার চিত্তের সকল সংক্ষোভ, অন্তরের সমস্ত দ্বন্দ্ব ও আলোড়ন স্তব্ধ হয়ে থাকত তার প্রভাবে। আমি বেশ কিছুক্ষণের জন্য এক পরম আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতাম। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম তার শরীর ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবু সে যখন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে জানালার ধারে একটি চেয়ারে বসে আমার কথা অথবা আমার কোন লেখা শুনত তখন তার দেহগত অসুস্থতার কথা একটুও জানতে পারা যেত না।

সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় ক্রলিনের কাছে বসে থাকতে আমার খুব ভাল লাগত। মনে হত গোটা পৃথিবীটার রূপ রং সব বদলে গেছে। মনে হত গোধূলির ছায়া-ছায়া ধূসরতায় শুধু আমার নয়, পৃথিবীর সব মানুষের সব কামনা বাসনার দুরন্ত রং মুছে গেছে চিরদিনের মত। ক্রলিন প্রায়ই বলত একমাত্র ঈশ্বরই মানুষের বেদনার্ত আত্মাকে চিরশান্তি দান করতে পারেন।

এটা ছিল তার পরম বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে আমি কখনো আঘাত দিতাম না কোন ছলে।

এই সময় মোরাভীয় ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হই আমি এবং ক্রলিনের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে আসি। মোরাভীয়রা বলত মানুষের ধর্মজীবন এবং বাস্তব জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। যে সমাজে শিক্ষকরা হবে শাসক এবং ধর্মযাজক হবে বিচারক সেই সমাজই হবে আদর্শ সমাজ।

আমি একবার এক যুবরাজের আমন্ত্রণে মেয়েন্সে বেড়াতে যাই। আমার বাবা একদিন অনেক রাজসভায় ঘুরে বেড়ালেও যুবরাজ বা রাজকুমারদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করতেন না। ক্রলিনকে আমি মায়ের মত জ্ঞান করতাম এবং তাকে আমার ব্যক্তিজীবনের সব কথা বলতাম। কিন্তু সে তখন শয্যাগত থাকায় তার পরামর্শ নেওয়া হলো না। যুবরাজের সঙ্গে আমার একটা বিষয়ে মতপার্থক্য হলো। উনি গ্রীক শিল্পরীতি পছন্দ করেন না। আমার মতে দেহগত শক্তি ও সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশই গ্রীকশিল্পকলার লক্ষ্য। এই

শিল্পরীতি তাই অসংখ্য শিল্পীকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যুগিয়ে আসছে।

আমি বাড়ি ফিরে আসতেই আমার বাবা আমাকে বিয়ে দিয়ে আমাকে সংসারী করার জন্য পরিকল্পনা করেন। আমি কিন্তু এ বিষয়ে তখনো মনস্থির করে উঠতে পারিনি। আমার দু একজন বন্ধুও আমাকে আমাদের ফ্রাঙ্কফুট শহরে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করার জন্য অনুরোধ করে বিশেষভাবে।

আমাকে আমার কাকা নাগরিক পরিষদ থেকে কৌশলে সরিয়ে দিলেও তখন আমার কাজের অভাব ছিল না। অনেক অফিস এজেন্সীতে আমি চেষ্টা করলেই কাজ পেতাম। এই সময় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েটি সুন্দরী এবং গৃহকর্মনিপুণা। সবদিক দিয়ে আদর্শ স্ত্রী হবার যোগ্য। কিন্তু আমি খেলার ছলে উড়িয়ে দিলাম এ পরিকল্পনাটাকে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

একদিন আমার এক বন্ধু সন্ধ্যের সময় কোন গানের আসরে যাবার জন্য অনুরোধ করল। মানুষ কোনভাবে একবার নাম করলেই অনেক বন্ধু জুটে যায়। অনেক জায়গা থেকে অনেক নিমন্ত্রণ আসে। গানের এই আসরটি বসবে কোন এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে।

বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ের একটু পরেই বেরিয়ে পড়লাম তাড়াহুড়ো করে।

কোন একটি বাড়ির একতলায় একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম আমরা। ঘরটির আসবাবপত্র সাধারণ ধরনের হলেও ঘরখানি প্রশস্ত। ঘরের মধ্যে লোক ছিল অনেক। ঘরের মাঝখানে একটি পিয়ানো ছিল। এই বাড়ির মালিকের একমাত্র মেয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইবে।

আমি পিয়ানোর কাছেই বসলাম। মেয়েটি যখন গান শুরু করল আমি তার চেহারা এবং গতিভঙ্গি ভাল করে লক্ষ্য করলাম। তার চেহারা মোটামুটি সুন্দর। কিন্তু তার সবচেয়ে যেটা ভাল লাগল তা হলো তার প্রতিটি আচরণের মধ্যে শিশুসুলভ এক সরলতা। গান শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে এসে আলাপ করল আমার সঙ্গে। আমি বললাম, এটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই আপনার প্রতিভার সঙ্গেও পরিচিত হলাম।

আমরা পরস্পরের মুখপানে তাকালাম। কিন্তু আমরা কেউ কথাবার্তায় আবেগের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলাম না। আমাদের আপন আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাঁধ দিয়ে ঘেরা একটি ব্যবধানকে সাবধানে বজায় রেখে চললাম আমরা। আমার বিদায় নেবার সময় মেয়েটির মা ও সে নিজে আমাকে শীঘ্রই আর একবার তাদের বাড়ি যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালো।

আমিও সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতাম। তার মধ্যে আমার এক মনোমত সঙ্গীনীকে খুঁজে পেলাম।

এই সময় বাবার সঙ্গে আমার অনেকদিন পর মতবিরোধ হলো।

জীবন সম্বন্ধে আমার উন্মার্গগামী দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই ভাল লাগত না আমার বাবার। আমি সব সময় মানুষের মধ্যে যে বৃহত্তর জীবনাদর্শের সন্ধান করে যেতাম তা কখনো কারো মধ্যে খুঁজে পেতাম না। ফলে সব মানুষকেই অপূর্ণ বলে মনে হত আমার। যারা সৎ, তারা সাধারণতঃ ধার্মিক হয়, তারা কাজের লোক হতে পারে না। আর যারা কর্মঠ, যারা কাজের লোক তারা বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারে না।

আমার অন্যতম পুরনো বন্ধু জুং স্টিলিং ছিল চোখের ডাক্তার। আমাদের ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের হের ভণ লার্সেনার নামে এক ধনী বয়স্ক ভদ্রলোকের দুটি চোখই খারাপ হয়ে যায়। তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে যান। এদিকে তখন স্টিলিং চোখের ছানি অপারেশনের দ্বারা নাম করেছিল। চোখ অপারেশনে তার হাত এত ভাল যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সফল হয়। লার্সেনারকে শহরের ডাক্তাররা পরামর্শ দেন স্টিলিংএর কাছে অপারেশন করতে।

সুতরাং স্টিলিংকে আসতে বলা হয় এবং ঠিক হয় সে এলে আমাদের বাড়িতেই উঠবে। সে আসবে জেনে আমার বাবা মাও খুশি হন।

যথাসময়ে স্টিলিং এসে অপারেশন করল লার্সেনারের দুটি চোখ। কিন্তু অপারেশন শেষ করার পর স্টিলিং কিন্তু খুশি হতে পারল না। সে বলল, দুটি চোখ এক সঙ্গে অপারেশন করা উচিত হয় নি তার, যদিও লার্সেনার ও তাঁর লোকজনরা তাকে তাই করতে বলেছিল। এর আগে যে স্টিলিং প্রায় একশোটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। সেই স্টিলিং লার্সেনারের ক্ষেত্রে সাফল্যের আশ্বাস দিতে পারল না। অথচ সফল হলে লার্সেনারের কাছে পেত প্রচুর টাকা। সে অনেক কিছু আশা করেছিল। স্টিলিং আমার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করল, অপারেশন

ভাল হয়নি। সে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

স্টিলিং স্বভাবতঃ ছিল নীতিবাদী এবং ধর্মপ্রবণ। সে ভালবাসা আর সহানুভূতিসূচক পরিবেশ ছাড়া টিকতে পারত না। সে কোথাও কোন মানুষের কাছে আন্তরিকতা না পেলে তাকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে একই সঙ্গে সমন্বত করে চলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল স্টিলিংএর। সে একই সঙ্গে ছিল বর্তমানে স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আবার সে ছিল ভবিষ্যৎমুখী ও আশাবাদী।

তবে স্টিলিংএর একটা জিনিস আমার পছন্দ হত না। সে তার জীবনের সব ব্যর্থতা ও সফলতাকে ঈশ্বরের বিচার হিসাবে ব্যাখ্যা করত। কোন কাজে সফল হলে বলত ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সফল হয়েছে। আবার কোন কাজে ব্যর্থ হলে বলত তার কোন ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ঈশ্বর তিরস্কার করেছেন এই ব্যর্থতার মাধ্যমে। আমি তার একথা শুনতাম। কিন্তু কোন মন্তব্য করতাম না। কোন উৎসাহ দিতাম না। যাই হোক, এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে অতিশয় আঘাত পেয়েছিল সে মনে। সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছিল ভীষণভাবে। সে বলত টাকা এবং নামযশ দুটির থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে। এইভাবে ভগ্নহৃদয়ে বিদায় নিল সে আমাদের কাছ থেকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেদিনের সেই গানের আসরে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সেই লিলি স্কোরেন নামে মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ধীরে ধীরে আলাপ পরিচয়ের সব স্তর অতিক্রম করে প্রণয়ে পরিণত হলো। প্রায়ই সন্ধ্যার সময় আমি তাদের বাড়ি যেতাম। সে আমাকে একে একে তার নিজের ও পরিবারের অনেক কথা অনেক কাহিনী বলতে থাকে। সে বলে তার মধ্যে আমাকে আকর্ষণ করার একটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু এবার সে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। কারণ সে আমার দ্বারাও কম আকৃষ্ট হয়নি। এর আগে সে যেমন অপরকে আকর্ষণ করত তেমনি কেউ তার কাছে এলে স্বচ্ছন্দে তাকে এড়িয়ে যেতেও পারত। কিন্তু এবার সে নাকি জব্দ হয়ে পড়েছে আমার কাছে।

লিলি সাধারণতঃ আমার কাছে সাদাসিদে পোষাক পরে আসত। কিন্তু তাকে নিয়ে যখন কোন নাচগানের আসরে যেতাম তখন সে রীতিমত জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পড়ত। অনেক গহনা পড়ত। কিন্তু সেই সব জমকালো পোষাক ও মূল্যবান অলঙ্কারের উজ্জ্বলতার মাঝে আমি যেন সেই একই লিলিকে

দেখতাম। দেখতে দেখতে তার সেই পোষাক ও অলঙ্কারের উজ্জ্বলতা উবে যেত আর তার চেহারাটা অনাবৃত হয়ে উঠত আমার চোখের সামনে এক অকপট স্পষ্টতায়। তার সেই স্ফীত বুকের রহস্য কতবার অনাবৃত করে দিয়েছে আমার কাছে সেই বুক একই ভাবে আছে। যে অধরোষ্ঠ কতবার চুম্বন করেছি। সেই অধরোষ্ঠেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই দৃষ্টি, সেই হাসি সব ঠিক আছে।

আমি আমার কাব্যচর্চা করে গেলেও লিলির সংস্পর্শে আসার পর কিছু গান লিখেছিলাম। এ গান কেউ শুনলে বা গাইলে বেশ বুঝতে পারতাম লিলির সঙ্গে কাটানো আমার সেই আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্তগুলি কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে এই সব গানের মধ্যে।

শীতের পর বসন্ত এল। কিন্তু এ বসন্তকে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলেই অনুভব ও উপভোগ করা যায় বেশী। কোন নদীর ধারে ফাঁকা মাঠে কোন নির্জন ফুলের বনে এ বসন্তের মায়াময় আবেশ সারা দেহমনে উপভোগ করা যায়। বিশেষ করে বসন্তের এই মনোরম গ্রাম্য পরিবেশ কোন নূতন প্রেম সম্পর্কের পক্ষে খুবই অনুকূল।

আমি সাধারণতঃ সকালের দিকটা কাব্যচর্চা বা লেখা-লেখির কাজ করতাম। দুপুরের দিকটায় আমাদের বাড়ির কাজ অর্থাৎ বাসার কোন কাজের কথা বললে করে দিতাম। বাবা সাধারণতঃ বিষয় সম্পত্তি বা আইনের ব্যাপারে আমার পরামর্শ নিলেও উনি নিজেই সব কাজ করতেন। ওঁর নিজের আইন জ্ঞান ছিল। তাছাড়াও বিভিন্ন লোককে আইনের পরামর্শ দেবার জন্য উনি ওঁর অধীনে কিছু উকীলকে রেখে দিয়েছিলেন। তাদের দিয়েই দরকার হলে কাগজপত্র সই করাতেন। আমি বেড়াতে যেতাম বিকালে এবং আমার আমোদ প্রমোদের ব্যাপারগুলো সন্ধ্যের দিকেই সারতাম।

এই সময় জন আঁদ্রে নামে আর একজন সঙ্গীতসাধকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় যে গানকে ভালবাসত এবং যাকে আমি গান লিখে দিতাম। সে আমার গান সুর সহযোগে গেয়ে শোনাত। একটু সঙ্গে এইভাবে গান ও কবিতার রস উপভোগ করতাম।

কুমারী ডেলফ্ নামে একটি মেয়ে লিলিদের বাড়ি যাতায়াত করত। লিলির মা তাকে ভালবাসত। ডেলফ্ লিলির সঙ্গে আমার প্রেম সম্পর্কের কথা জানত। একদিন সে লিলির মার কাছ থেকে আমাদের বিয়ের অনুমতি সহ

লিলিকে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে বলে, নাও, পরস্পরের হাতে হাত দাও।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। মনে হলো ডেলক্‌ যেন এক অসাধ্য অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছে। সে আমাদের বাড়ির মতও নিয়েছে।

যাই হোক, আমরা দুজনেই হাতে হাত রাখলাম। পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। সঙ্গে সঙ্গে লিলির রূপটা আরও সম্পূর্ণ হয়ে উঠল আমার চোখে। সে এমনিতেই দেখতে সুন্দরী ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিক হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো হঠাৎ সে যেন আগের থেকে অনেক বেশী সুন্দরী হয়ে উঠেছে। তখন থেকে তার দেহের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার মনের সব সুষমা আমার শুধু একান্তভাবে আমার।

লোকে বলে মানুষ নাকি তার আকাঙ্ক্ষিত সুখ বা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় বেশী দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না স্থির ভাবে। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের ও লিলিদের বাড়ির সম্মতি পেয়ে আমরা দুজনেই যেন হাতে চাঁদ পেয়েছিলাম। কিন্তু আবেগের উন্মাদনায় একটা দিক তলিয়ে দেখিনি। সেটা হলো আর্থিক দিক।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম বাবা এ বিয়েতে কোন রকমে মত দিলেও তিনি মনে প্রাণে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি পুত্রবধূ হিসাবে চেয়েছিলেন আরো অভিজাত বাড়ির মেয়ে। সুতরাং তিনি আমাকে এ বিয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য নাও করতে পারেন। আমি তখন স্বাধীন ভাবে অর্থ উপার্জনের কথা ভাবলাম। চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম কার্যক্ষেত্রে ততটা সহজ বলে মনে হলো না।

আমি অনেকখানি দমে গেলাম। এদিকে আমার বোনের বিয়েটা সেই ক্লোজারের সঙ্গে হয়ে গেল। কিন্তু আমার বোন আমাকে বার বার লিলিকে বিয়ে করতে নিষেধ করল। কেন তা জানি না।

কেন জানি না, লিলির সঙ্গে আমার বিয়েতে কোন পক্ষের অমত না থাকলেও দুটি পরিবারের মধ্যে যাওয়া আসা বা কোনরকম ঘনিষ্ঠতা কেন হলো না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

লিলির ব্যাপারে আমার বোনের আপত্তির কারণ হলো দুটি পরিবারের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে বিরাট তারতম্য। আমার বোন স্পষ্ট করে আমায় বলল, তুমি কি ভেবেছ তুমি লিলিকে বিয়ে করে এনে আমাদের পুরনো বাড়িটার একটা ঘরে ভরে রেখে দেবে? সে আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। সে আমাদের বাড়ির অতিথি স্বজনদের ঠিকমত অভ্যর্থনা জানাতে পারবে না।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম শুধু আমার বোনের কথাগুলো। কিন্তু কোন কথা বললাম না। তাকে শুধু বললাম, এখনই কিছু বলতে পারছি না। তবে তোমার কথা মনে থাকবে।

আমি সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গেলাম কিছুদিনের জন্য। জুড়িখে গিয়ে দেখা করলাম ল্যাভেটারের সঙ্গে। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ল্যাভেটার। দারুণ খুশি হলো। তার স্ত্রীকেও বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহিলা বলে মনে হলো। মনে হলো ভদ্রমহিলা সব বিষয়েই সমর্থন করে চলে তার স্বামীকে। দুজনে কী অদ্ভুত মিল।

সমগ্র সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগল রাইনের জলপ্রপাত। এটি হচ্ছে শাফসেন পার্বত্য অঞ্চলে। তারপর যে জিনিসটি ভাল লাগল আমার তা হলো জুরিখের লেক। এই দুটি দৃশ্যই আমি জীবনে কখনো ভুলব না।

আমি ল্যাভেটারকে তার দেহতত্ত্বের গবেষণার কাজ সম্বন্ধে খবর জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, কাজটা এখনও শেষ হয়নি। তবে তার প্রায় অর্ধেক লেখা ছাপা হয়ে গেছে। এতে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব লেখা আছে তা সবই তার অভিজ্ঞতালব্ধ।

রাইনের নিম্ন উপত্যকা ধরে আমি ল্যাভেটারদের সঙ্গে নূতন করে যাত্রা শুরু করলাম। আমার ভ্রমণ তখন শুরু হয়েছে সবেমাত্র। দেখলাম ল্যাভেটারের গবেষণার কাজের সত্যিই বেশ প্রচার হয়েছে। ও যেখানেই যাচ্ছিল বহু লোক ওকে দেখতে ও ওর সঙ্গে আলাপ করতে আসছিল। অনেক বিদেশী ভ্রমণকারীও ওঁর নাম শুনেছে। লোকের ভিড় দেখে ল্যাভেটার নিজেও বিব্রত হচ্ছিল।

আমরা মানুষের ভিড় এড়িয়ে জনপদ থেকে দূরে চলে গেলাম থাটি পর্বতের

রাজ্যে। গোলোকধাঁধার মত কত প্রায়ান্ধকার গিরিপথ, কত সুদৃশ্য পর্বত-শৃঙ্গ যার উপরে মেঘের উপর মেঘ জমেছে। তুষার আর কুয়াশা জমে আছে যাদের গায়ে। আবার এক এক জায়গায় পথের দুধারে দাঁড়িয়ে আছে খাড়াই পাহাড়। ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটে আঁকা। এ পাহাড় যুগ যুগ ধরে স্থাণুর মত অচল অটলভাবে এই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সুখদুঃখের যে তরঙ্গ মানুষের জীবনকে ক্রমাগত অসহায়ভাবে দোলাচ্ছে সে তরঙ্গ ওদের কাছে যেতে পারে না। ওদের স্পর্শ করতে পারে না।

পাহাড়ের রাজ্যে অনেক ঘোরাফেরার পর আমরা সেই পার্বত্য প্রদেশে এক তীর্থস্থান দর্শন করলাম। সেটা হলো মেরিয়া আইনসীভাইন চার্চ। চার্চটি এক উঁচু পাহাড়ের উপর। সে পাহাড়ে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে উঠলাম আমরা। তারপর অতিকষ্টে গিয়ে দেখলাম ডেভিল স্টোন বা শয়তানের পাথর।

আবার আমরা সমতলে ফিরে এলাম। আবার সেই উদার উন্মুক্ত প্রান্তর আর কুয়াশা ঢাকা হ্রদ। আমরা অনেক পথ পার হয়ে অনেক ওঠানামা করে অবশেষে নিশ্চিন্ত ও পরিপূর্ণ বিশ্রামের আশায় সেণ্ট গথার্ড হসপিনে এসে উঠলাম। এখানে এক ফাদার আমাদের ইটালি যাবার কথা বললেন। কিন্তু জার্মানি ফিরে যাবারই মনস্থ করলাম।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবার সময় আমি একটি কবিতায় লিখেছিলাম, আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি লিলি, কিন্তু না, আমি তোমার বন্ধনে আজও আবদ্ধ আছি। আমি একের পর এক বন পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে চলেছি, কিন্তু যেখানেই যাচ্ছি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারছি না। তুমি দেখছি সব সময় আমার সঙ্গেই আছ।

বাড়ি ফিরে তাই আমি লিলির সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে শুনলাম লিলিকে আমার অনুপস্থিতিকালে বোঝানো হয়েছে আসল ব্যাপারটা। বোঝানো হয়েছে আমার আশা তাকে ত্যাগ করতেই হবে। এ বিচ্ছেদ অনিবার্য। তার উত্তরে লিলি নাকি তাদের বলেছে সে আমার জন্য আমার সঙ্গে তার সবকিছু ছেড়ে বাড়িঘর দেশ আত্মীয়-স্বজন সব

ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে।

লিলির জন্য আমিও তা পারি। কিন্তু আমি পরক্ষণেই অন্য কথা ভাবলাম। ভাবলাম, আমার বাবার এই সুন্দর সাজানো বাড়ি, এত সব বিষয় সম্পত্তি, এই নিশ্চিন্ত আরামঘন জীবনযাত্রা সবকিছু ত্যাগ করে অজানা দূরদেশে গিয়ে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না। সুতরাং লিলির এ প্রস্তাবে আমি সাড়া দিতে পারলাম না। তার প্রতি আমার ভালবাসায় কোন ফাঁকি না থাকলেও আমি তা পারলাম না।

এই সময় এগমঁত নাটকটি লেখা শুরু করি। 'আয়রণ হ্যাণ্ড'এ যেমন নেদারল্যাণ্ডবাসীদের বিদ্রোহের ঘটনাকে রূপদান করেছি, তেমনি এ নাটকের বিষয়বস্তুও রাজনৈতিক। এতে দেখাতে চেয়েছি, কোন স্বৈরাচারী দুর্ধর্ষ শাসকের কাছে গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা বা অধিকারের কোন মূল্য নেই। এই নাটকে আমি আবার আমার প্রতিহত প্রেমাবেগকেও বাণীরূপ দান করলাম।

এইভাবে লিলির কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি বাড়ির মধ্যে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করলাম। এক মনে এগমঁত নাটক লিখে যেতে লাগলাম। এই সময় ওয়েগনারের কাউন্টের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাবার মনস্থ করি। কিন্তু যথাসময়ে কাউন্টের দূত না আসায় আমি ইতালি চলে যাওয়ার স্থির করি।

ইতালি যাবার পথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল ডেলফের সঙ্গে। দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল লিলির কথা। যাকে এড়িয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছি সে যেন আমার সামনে অন্যের রূপ ধরে এসে দাঁড়াল। ডেলফ আমায় অনেক করে বুঝিয়ে বলল। আমার সংসারজীবন সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা বলল। কিন্তু আমার মনে কোনরূপ সাড়া জাগাতে পারল না সেকথা। কেমন যেন বৈরাগ্যে ধূসর হয়ে গেছে আমার সে মন। আমার প্রতিহত প্রেমাবেগ এক ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আবর্তিত হতে লাগল যেন। গ্রেচেন, ফ্রেডারিকা, লিলি—এদের সকলের মধ্যে সেই এক নারী, এক প্রেম ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধরে এসেছে আমার কাছে, কিন্তু কোন না কোন কারণে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে আমার কাছ থেকে। আমি এবার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত সব মোহ থেকে। আমি এখন তাদের আর কাউকেই চাই না।

হোটেল থেকে ইতালির পথে আবার যাত্রা শুরু করব, এমন সময় ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে লোক এল। একটি চিঠি দিল। ওয়েগনারের কাউন্টের লোকের আসতে কেন দেরি হয়েছে তার কারণ তাকে সবিস্তারে লেখা আছে। কাউন্টের অনুরোধ ফিরে যেতে হবে। অগত্যা আবার জার্মানির পথ ধরলাম।

পথে ভাবতে লাগলাম, আমি কোথায় চলেছি তা যেন আমি জানি না। শৈশব হতে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে আমার সারা জীবন ধরে আমি কি খুঁজে চলেছি? পাহাড়ে প্রান্তরে জলে স্থলে সুন্দরে অসুন্দরে, রূপে অরূপে, ইন্দ্রিয়ে ও অতীন্দ্রিয়ের মাঝে কি খুঁজেছি আমি? যা খুঁজেছি তা কি আমি পেয়েছি কোনদিন? তা কি কেউ পায়?

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। চালকের হাতে লাগাম ধরা। আমার মনে হলো, কোন এক অদৃশ্য দেবতার দ্বারা প্রবৃত্ত হতে হতে অবিরাম কালের অশ্ব ছুটে চলেছে সারা বিশ্বজীবনের বিপুলায়তন বেগভার নিয়ে। সেই আশ্চর্য অশ্বের লাগাম ধরার শক্তি সবার নেই। হয়ত কোন মানুষেরই নেই। তবু মানুষের মত বাঁচতে হলে সে লাগামটা শক্ত মুঠিতে ধরে রাখতেই হবে।

॥ সমাপ্ত ॥